তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

১৮৪৩ শক

ব্রাহ্মসম্বৎ ৯২

কলিকাতা

৫৫ নং আপারচিৎপুর রোড্

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩২৮। খৃঃ ১৯২১। সম্বৎ ১৯৭৮। কলিগতাব্দ ৫০২২।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বিংশ কল্প, তৃতীয় ভাগ।

১৮৪৩ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯২।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী।

একমেবাদ্বিতীয়ং

বিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৯২

৯৩৩ সংখ্যা　　　　　　　　　　　　　　　　　১৮৪৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নরোত্তম।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ঋষি নরোত্তম আজি উঠেছে জাগিয়া।
সেই কথা ধরামাঝে যেতেছি ঘোষিয়া॥
ন্যায়ের বিজয়গীত পশে তাই কানে।
স্বাধীনতা উন্মাদনী বাজে তাই প্রাণে॥
সবাই যে ডাকে সবে ভাই ভাই বলি'।
শত্রুমিত্র উচ্চনীচ ভেদ গেছে চলি'॥
সরলতা প্রাণে ধরি' চলে সোজা পথে।
দেশের সুনাম রাখি' ধরে সত্যপথে॥

দেশের বিভাগ আর রেখো না রেখো না।
বিহার উড়িষ্যা বঙ্গ পৃথক ভেবো না॥
মাদ্রাজ বোম্বাই কোথা, কোথা শিখভূমি!
কোথা গঙ্গা-উপকূলে আর্য্যাবর্ত্তভূমি।
কোথারে রাজপুতানা মধ্যদেশ কোথা!
আপনার ভাই বলি' ডাক গো প্রাণের মাঝে—
তবে না শুনিবে দেশে মঙ্গল-বিজয় বাজে?
　　মন্ত্র কর দৃঢ় সখা,
　　মিলনেরে এক লক্ষ্য;—
তবে না যাইবে ঘুচে দুঃখ দৈন্যব্যথা॥

তখন আর একশ্রী
　　ফুটিবে সবার মুখে।
আবাল বৃদ্ধ সবার
　　আনন্দ খেলিবে বুকে॥
অটুট একতা-বন্ধ
　　খুলিবে না আর কভু।
আশীষ দেবেন শিরে
　　বিশ্বভুবনের প্রভু॥
উঠিবে জাগিয়া দেশে
　　নরনারী শত শত।
অক্ষত চরিত্র লয়ে
　　ধরমে করমে রত॥
মায়ের সন্তান বীর
　　সাহসে অটল ধীর।
রূপে গুণে কি সুন্দর
　　নরোত্তম-বংশধর!

দুঃখক্লেশ ও ভগবৎপ্রীতি।*

একটী বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—কি ঝঞ্ঝাটের ভিতর দিয়া, কি হৃৎকম্পনের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে এই বৎসরের শেষ দিনে উপস্থিত হইতে হইয়াছে! ঝঞ্ঝাট ও হৃৎকম্পনের কথা বলিলাম—কিন্তু এই ভাব মনে আসে কেন? ইহার স্পষ্ট উত্তর এই যে, আমরা আমাদের হৃদয়কে মঙ্গলস্বরূপে ডুবাইয়া রাখিতে চাহি না, তাঁহাকে হৃদয়ের সঙ্গে ডাকি না; তাঁহার প্রকৃত উপাসনা করিতে

* নববর্ষ উপলক্ষে ১৩২৮ সালের ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভবনে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত।

ভুলিয়া গিয়াছি। প্রতিদিন যদি সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের প্রতি সমুদয় হৃদয়ের প্রীতি অর্পণ করিতে থাকিতাম এবং তাঁহার মঙ্গলভাবে অটল বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিতাম, তাহা হইলে শত ঝঞ্ঝাটকেও ঝঞ্ঝাট বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না এবং তাহা হইলে হৃৎকম্পনের অবসরও উপস্থিত হইত না। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যে উপাসনাপ্রণালী অবলম্বনে আমরা ভগবানকে ডাকিয়া থাকি, সেই প্রণালীর দিকে কেবল দৃষ্টি না রাখিয়া তাহার মর্ম্ম অনুসরণ করিয়া যদি ভগবানকে পুত্রবিত্ত সকল হইতে প্রিয়তম জানিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত ডাকিতে থাকি, তাহা হইলেই আমাদের সকল ভয় সকল ভাবনা সুদূরে পলায়ন করিবে।

আমরা সমাজমন্দিরে সপ্তাহে সপ্তাহে অথবা প্রতিদিন আসিলেও, যদি হৃদয়ের ভক্তি লইয়া না আসি, শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে যদি সমস্ত হৃদয়ের সহিত উপাসনার মধ্যে প্রবেশ না করি, তবে কোনই সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই। বরঞ্চ তাহাতে কুফলেরই সম্ভাবনা। ভক্তিশ্রদ্ধা লইয়া যদি দেবমন্দিরে উপস্থিত হইতে না পার, তবে দেবমন্দিরে আসিও না। দেবমন্দিরে আসিয়া অশ্রদ্ধার বীজ ছড়াইয়া অমঙ্গলের আগাছার সৃষ্টি করিও না। আমরা এই প্রকার অশ্রদ্ধা পোষণ করিয়া সমাজে আসি বলিয়াই আজ ব্রাহ্মসমাজ এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে;—উপদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক বিষয়টী আমাদের সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠে। কিন্তু এটী ভাবিয়া দেখি না যে, যে কার্য্যের জন্য সমাজে আসিলাম, সে কার্য্য কতদূর সম্পন্ন করিলাম; ভগবানকে প্রাণের সিংহাসনে বসাইবার যে উদ্দেশ্য লইয়া আসিলাম, সেই উদ্দেশ্য কতটুকু সাধিত হইল। কাজেই আমরা যেমন শুষ্কমনে রিক্তহস্তে সমাজে আসি, তেমনই শুষ্ক মনে, তেমনই রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিয়া যাই।

যাঁহারা ভগবানকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত ডাকিয়াছেন, তাঁহারা যে কি তৃপ্তিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের এক একটী কথা হইতেই বুঝা যায়। তাঁহারাই ভগবানকে রসস্বরূপ বলিতে পারিয়াছেন, আর কেহ তেমন ভাবের সরল কথা প্রচার করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের এই উক্তি নিরর্থক নহে—তাঁহারা সেই নিবিড় আনন্দের সহিত প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়াই, সমাধিস্থ হইয়াই প্রিয়তম পরমেশ্বরকে রসস্বরূপ বলিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সেই ভগবদ্ভক্তদিগের শিষ্যানুশিষ্যরূপে আমাদেরও সেই অধিকার লাভে অগ্রসর হইতে হইবে। যেখানে ভগবানের নাম-কীর্ত্তন হইবে, যেখানে তাঁহার স্তুতিগীত হইবে, সেইখানেই আনন্দ লাভ করিবার অভ্যাস করিতে হইবে। এই অভ্যাস-সাধনে সিদ্ধ হইলেই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আনন্দলাভের অধিকার জন্মিবে।

সমাজমন্দিরে উপাসনার সময়ে নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকা প্রার্থনীয় হইলেও ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, ভগবান যেমন সমাজমন্দিরেও জাগ্রত থাকেন, সেইরূপ তিনি জগতের সর্ব্বত্র, প্রত্যেক অণুপরমাণুতেও আছেন, সেইরূপ তিনি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়মন্দিরেও নিত্য জাগ্রত আছেন। প্রকৃত ধর্ম্মের এই মর্ম্মকথা অনেক সময়ে ভুলিয়া গিয়া ধর্ম্মের বহিরঙ্গকেই আমরা বড়ই জোরে আঁকড়াইয়া ধরি; মন্দিরের দেবতাকে ভুলিয়া গিয়া মন্দিরকেই প্রাধান্য দিয়া থাকি; প্রকৃত উপাসনার মূলতত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া উপাসনা প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব বা অশ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে থাকি। ধর্ম্মসাধনের উন্নতি করিবার অভিলাষ থাকিলে এইপ্রকার বহিরঙ্গ সাধনের প্রতি অতিমাত্র ঝোঁক দিবার বিষয়ে আমাদিগের সাবধান হওয়া উচিত, নতুবা ধর্ম্মসাধনে যাঁহারা অগ্রসর নহেন, তাঁহারা আমাদিগেরই দৃষ্টান্তে চিরজীবন ঐ সমস্ত বহিরঙ্গ লইয়াই কাটাইয়া দিবেন।

উপনিষদ্ এই কথা কি স্পষ্টভাবে এবং কি প্রকার বলের সহিত বলিয়াছেন—"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ, যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" যে এই তেজোময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ এই আকাশে আছেন, এবং যে এই তেজোময় অমৃতময় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ এই আত্মাতে আছেন, তাঁহাকেই জানিয়া মানব মৃত্যুকে অতিক্রম করে। ঋষিরা এই আত্মাকেই পরমাত্মার অধিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠতম সিংহাসন বলিয়া

উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদিগের প্রত্যেককেই স্বীয় আত্মাকে এই প্রকার শ্রেষ্ঠতম সিংহাসনরূপে প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ যত্ন লইতে হইবে। কেবল সমাজমন্দিরের উপাসনায় যোগদান করিয়া, বক্তৃতা অথবা গান শুনিয়া তৃপ্তিলাভেই যেন আমাদের যত্ন পর্য্যবসিত হয় না। কেবল আমাদের নিজের জন্যও নহে, আমাদের সকল ভাইভগ্নীদেরও আত্মাকে পরমাত্মার অধিষ্ঠানের উপযুক্ত করিয়া লইতে হইবে।

এই কার্য্যে আমাদিগকে নির্ভয়ে লাগিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার কার্য্যে লাগিয়া গেলেই ভগবান স্বয়ং তাঁহার অভয়-বর্ম্ম আমাদিগকে পরাইয়া দিবেন; 'মাভৈ'রবের দুন্দুভি বাজিয়া অশ্রদ্ধাবানদিগের অন্তরে ভীতি উৎপাদন করিবে। তাঁহার কার্য্যে যাঁহারা প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের জননী কৃতার্থ হয়েন এবং বংশ পবিত্র হয়। রিপুগণ তাঁহাদিগকে প্রলোভন দেখাইতে সাহস করে না।

শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকে দুঃখক্লেশ কোন প্রকার ভয় দেখাইতে পারে না; বিপদ আপদ তাঁহাকে বিমূঢ় করিতে পারে না। তিনি ভগবানের উপর সমস্ত হৃদয়ের প্রীতি স্থাপন করিয়া নির্ভয় হয়েন; বিপদ-আপদকে সম্পদের সোপান বলিয়া গ্রহণ করেন। যে ভগবানের এক ইঙ্গিতে সমস্ত ব্রহ্মাচক্র সুনিয়মে ভ্রাম্যমাণ, সেই ভগবানের বলের উপর যিনি নির্ভর করিতে পারেন, তিনি আবার দুর্ব্বল কিরূপে? সেই মহাবলের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই নিকট হইতে বল সঞ্চয় করিয়া নিজেরাও মহাবল হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঋষিদের সবল উক্তিসকল দুর্ব্বল ভীরুদিগেরও অন্তরে বলসঞ্চার করিতে পারিতেছে। ঋষিদের কথা ছাড়িয়া দিলেও এ যুগের বাবা নানক, চৈতন্যদেব, রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পরমহংস রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের উক্তিতেও যে আমরা আমাদের শোকতাপের সময়ে বিপদআপদের সময়ে বল পাই শান্তি পাই, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহারাও নিজেদের সমস্ত হৃদয় সেই মহাবলের চরণে নিবেদন করিয়া দিয়া জগতে বল বিতরণ করিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা সম্মুখস্থ পর্ব্বতসমান বাধাবিঘ্নসকলও হাসিতে হাসিতে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। এমন কি, দুঃখক্লেশকে তাঁহারা আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিতেও প্রস্তুত হইতেন, ইচ্ছা করিতেন—দুঃখনাশন ভগবানের সংস্পর্শ লাভ করিবার সম্ভাবনা আসিত বলিয়া। এই ভাবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বরদানে উদ্যত হইলে দৌপদী বিপদলাভেরই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই ভাবই ধর্ম্মের প্রকৃত অবস্থা। কেবল মুখের মন্ত্রোচারণ হইতে এই অবস্থা আসিতে পারে না—হৃদয়ে ভগবানের অধিষ্ঠান হইলেই, সত্যকার ধর্ম্মভাবের উপর দাঁড়াইতে পারিলেই বিপদকে সত্যসত্যই সম্পদের সোপান বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে; দুঃখক্লেশকে আনন্দের কারণ বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি। এই ভাবের উপর দাঁড়াইয়া সংসারে বিচরণ করিলে যে বলবীর্য্য, যে ধৈর্য্য, যে বিশ্বপ্রেম, যে পরোপকারের ভাব হৃদয়ে প্রকাশ পায়, সংসারে তাহার তুলনা পাওয়া দুরূহ। এই সকল ভক্তদিগের সকল কার্য্যের একমাত্র লক্ষ্য থাকে—ভগবানে প্রীতি ও তাঁহারই প্রিয়কার্য্যসাধন। শতসহস্র বিপদআপদেও তাঁহারা এই লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয়েন না। আমরা যাহাকে বিপদ বলি, অথবা আমরা যাহাকে সম্পদ বলি, তিনি সকল অবস্থাকেই সম্পদ বলিয়া গ্রহণ করেন, কারণ এগুলি তাঁহার প্রিয়তম প্রাণপ্রভুর স্বহস্তের দান। তাঁহাকে যখন তিনি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে সঙ্গী বলিয়া মঙ্গলময় সখা বলিয়া অনুভব করিতেছেন, তখন তাঁহার নিকট বিপদের স্বমূর্ত্তি প্রকাশের অবসর কোথায়?

প্রাণপ্রিয় পরমেশ্বরকে প্রিয়তম সখা বলিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার, তাঁহাকে ভাল বাসিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনের অধিকার, বিপদ ও সম্পদ উভয়কেই তুল্যরূপে ভগবানের স্বহস্তের দান বলিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার, কেবল তোমার নহে, কেবল আমার নহে, কেবল ধনীর নহে, কেবল নির্ধনের নহে, কেবল সাধুর নহে, কেবল অসাধুর নহে, কিন্তু দেশকালজাতি ও অবস্থানির্বিশেষে সকল মানবেরই আছে; এক কথায়, ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধনের অধিকার প্রত্যেক মানবের আছে। তুমি যে

অবস্থায় পড় না কেন, তুমি যে কার্য্যে ব্রতী হও না কেন, সকল অবস্থা ও সকল কার্য্যের মধ্যে ভগবানকে কেন্দ্রভূমিতে রাখিলে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছ উপলব্ধি করিয়া সেই সকল কার্য্য করিতে থাকিলে কোন কার্য্যই তোমার নিকট ভারবহ বোধ হইবে না, তোমার সকল কার্য্যই তখন কল্যাণপ্রসূ হইবে।

আজিকার দিনের মহত্ব খুবই বেশী—অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে দৃষ্টি করিয়া এই মহত্ব আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। কালের মহাসাগরের যে অংশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, সেই অংশে দাঁড়াইয়া একবার অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর—কত—কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে—সামান্য কয়েকদিন মাত্র বলিতে গেলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে—তাহার পরে আর তো কিছুই দেখিতে পাই না। আবার সম্মুখে ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কর—কত সহস্র লক্ষ কোটী যুগ-যুগান্তর সম্মুখে পড়িয়া আছে—ইহার কেশাগ্রসমান এক অংশও ঠিক দেখিতে পাই কিনা সন্দেহ, তাহার পর আর তো কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই অপার মহাসাগরের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া কালের ভৈরবগর্জ্জনের প্রতি মনোযোগ দিলেই তো প্রাণ ভয়ে ত্রাসে আঁৎকাইয়া উঠে। তাই এই সন্ধিক্ষণই তো ভগবানকে জীবনপ্রদীপরূপে উপলব্ধি করিবার শুভ অবসর। তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, তিনিই আমাদের গন্তব্যপথ আলোকিত করিয়া দিবেন, তিনিই আমাদের কর্ত্তব্যসমূহ স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন। সেই জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতিতে আমাদের জীবন পরিপুষ্ট হইবে। তাঁহার জ্যোতি আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের শত সহস্র উপায় উন্মুক্ত করিয়া দিবে। সেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধং পুরুষের সুতীব্র তেজে আমাদের অন্তরের সমস্ত অশ্রদ্ধা, সমস্ত দুর্নীতি দগ্ধ হইয়া যাইবে। সেই প্রেমসূর্য্যের উদয়ে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হইবে, আমাদের দুঃখনিশার প্রভাত হইবে। সেই সূর্য্যের কিরণে আমরা সম্মুখস্থ দুঃখবিপদসমূহ দেখিতে পাইয়া অনায়াসে অতিক্রম করিতে পারিব। যখন আমাদের সমস্ত আশাভরসা নির্ব্বাপিত হইবে, তখন তাঁহারই মুখজ্যোতি একমাত্র আমাদিগকে শান্তিদান করিবে। তিনিই আমাদের অন্ধকারের আলো, তিনিই আমাদের সকল দুঃখের একমাত্র শান্তি এবং তিনিই আমাদের সকল ভয়ের সকল ভাবনার মধ্যে একমাত্র অভয়পদ, একমাত্র রক্ষাকবচ।

সুদূর অতীত ও সুদূর ভবিষ্যতের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আজ নির্ভীক হৃদয়ে অগ্রসর হও, পাপতাপের যে কালিমা তোমার আত্মায় মাখাইয়াছ, আজ তাহা ঝাড়িয়া ফেল; প্রতিজ্ঞা কর যে ভবিষ্যতে আর পাপপঙ্কে ঝাঁপ দিবে না—যিনি সকল ভয়ের ভয়, যিনি ভয়ানকের ভয়ানক, আবার যিনি পাবনের পাবন এবং যিনি রক্ষকদিগেরও রক্ষক, তিনিই তোমাকে তুলিয়া ধরিবেন। প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিবে যে, ভগবান তোমাকে তাঁহার করুণাধারায় কি প্রকার অভিষিক্ত করিয়া দিবেন; সঙ্গে সঙ্গেই দেখিবে যে, পাপ তোমাকে স্পর্শ করিতে আর সাহস করিবে না। তাঁহার এমনই সুনিয়ম যে পাপ করিলেই অনুতাপ আসে এবং সেই অনুতাপের অগ্নিতেই আত্মার সমস্ত কলঙ্ক দগ্ধ হইয়া যায়। আর তখন তিনি স্বীয় অতুল মহিমাতে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে সুশীতল করিয়া দেন। তিনি কখনই আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। আমাদের দুর্ব্বলতার কারণে আমরা প্রতিপদে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণে উদ্যত হইলেও সেই অমৃতস্বরূপ পরমেশ্বর আমাদের পার্শ্বে নিত্যসহচররূপে থাকিয়া প্রতিপদে আমাদিগকে অমৃতের পথে পরিচালিত করেন। আমরা সেই অমৃতের সন্তান। এই সত্য উপনিষদকার ঋষি বড়ই বলের সহিত ঘোষণা করিয়া আমাদের আত্মাকে সাহসে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। আমরা সেই অমৃতের পুত্র হইয়া কখনই মৃত্যুর দাসত্ব স্বীকার করিতে পারি না এবং সেই মৃত্যুর ছায়া পাপের সহিত কোনও সম্বন্ধও বজায় রাখিতে পারি না। ইহা যেন আমাদের মনে থাকে, আমরা যে মুহূর্ত্তে পাপের সহিত এতটুকু সম্বন্ধ রাখিব, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের পিতা, মাতা, সখা ও প্রভু পরমেশ্বরের সহিত ততটুকু সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলাম, ততটুকুই মৃত্যুর মলিনপঙ্কে অবগাহন করিলাম।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ভগবানের সহিত আমাদের প্রত্যক্ষ যোগের কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া আমাদিগকে মৃত্যুর পথ হইতে রক্ষা পাইবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এই শিক্ষা দিতেছেন যে, আমরা পাপীতাপীই হই অথবা নিষ্পাপ হই, সেই অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বর আমাদিগকে এক মুহূর্ত্তেরও জন্য পরিত্যাগ করেন নাই এবং কখনও—কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। যদি দৈবাৎ আত্মাকে পাপদগ্ধ করি, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে "পাপ করিয়া অনুতাপ করিলেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায় এবং পাপ আর করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেই মানুষ পবিত্র হয়।" ভগবান সত্যই আমাদিগকে এতই ভালবাসেন যে, আমরা শত অপরাধে অপরাধী হইলেও সহস্রবার তাঁহার বিরুদ্ধে চলিলেও, তিনি আমাদিগকে তাঁহার দিকে ফিরিবার জন্য দশ সহস্রবার তাঁহার স্নেহের ডাকে ডাকিতে থাকেন; আর আমরা একটুখানি তাঁহার দিকে যাইতে না যাইতেই আমাদের সমস্ত অঙ্গ হইতে পাপের ধূলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া আমাদিগকে কি স্নেহভরে কি প্রীতির সঙ্গে ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন! তাঁহার এই প্রেম যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি জানেন না যে কি ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবেন। আজ জীবনের মহাসন্ধিক্ষণে তাঁহাকে পিতা বলিয়া, তাঁহাকে সখা বলিয়া, তাঁহাকে পাপবিনাশন প্রভু বলিয়া আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই শুভমুহূর্ত্তে একবার সকলে মিলিয়া ধ্যানস্থ হইয়া আসুন তাঁহার সেই মূর্ত্তি আত্মস্থ করিয়া লই।

হে প্রিয়তম জীবনবল্লভ পরমেশ্বর, তোমার অভয়চরণে আসিয়া আজ দাঁড়াইয়াছি, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। তোমার আশ্রয় লইবার অধিকার চিরবর্দ্ধিত কর। তোমার অক্ষয় আনন্দসাগরে আমাদিগকে নিত্য অবগাহন করিবার অধিকার প্রদান কর। দুঃখ বিপদ যতই আসুক না কেন, সমস্তই আনন্দে বহন করিবার ইচ্ছা ও শক্তি প্রদান কর। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও নিশীথে, সকল সময়েই তোমারই জয়গান যেন আমাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়—হৃদয় রসস্বরূপ তোমাকে লাভ করিয়া যেন আনন্দময় হইয়া উঠে।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী গান্ধারী—তাল তেতালা।

বিমল প্রভাতে বিমল আলোকে
বিমল হৃদয়ে জাগো!
প্রীতি-কুসুম-অঞ্জলি ঢালি'
চরণে,—আশীষ মাগো!
বিমল প্রাতে বিহগ গাহে
নিখিল ফুল্ল-নয়ানে চাহে—
আজি, লুটায়ে হৃদয় তাঁহারি পায়ে
তাঁহারি শরণ মাগো॥

শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল।

রাগিণী তোড়ি-ভৈরবী—তাল ঠুংরী।

শুনিয়া তোমার অভয় বাণী
ঘুচিল বেদনা-জ্বালা!
নিভিল সকল চিত্ত-দহন
ফুটিল কুসুম-মালা!
দূরে গেল মোহ-তিমির-ভার
ঘুচে গেল ভয় ছুটিল আঁধার,—
শান্তি-কমল শুভ্র-অমল
করিল জীবন আলা!
সংসার পথে বিচরিব সুখে
তোমারে ডাকিব ভয়ে শোকে দুখে
নির্ভয়ে আমি গাহি যাব গান,
জীবন পায়ে দিব ডালা!
আজ, দুঃখ নাহি মোর, বেদন নাহি,
আনন্দে আজি সবা মুখ চাহি
আনন্দে আমি তব গান গাহি
গাঁথি হৃদি ফুল-মালা॥

শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল।

ঈশ্বর প্রাপ্তি।

(ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ জি ভাণ্ডারকর লিখিত প্রবন্ধের শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদ)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছিল, দুঃসংস্কাররূপ সংস্কার যে পরিমাণে শিথিল হয় সেই পরিমাণে ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য যায়। এবং

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

"আর কাহারও উপর চিত্ত না রাখিয়া আমার প্রতিই যে যোগী একনিষ্ঠরূপে নিবিষ্ট এবং আমাকেই সর্ব্বদা স্মরণ করে সে আমাকে সহজে প্রাপ্ত হয়" এই বচন অনুসারে যে ঈশ্বরকে স্মরণ করে ঈশ্বর তাহার নিকট সুলভ; অর্থাৎ ঈশ্বরেতে সে বিলীন হয়। এই প্রকারে ঈশ্বরের নিত্য স্মরণে অন্য কাহারও প্রতি আর অনুরাগ থাকে না; তখন পরম পুরুষ যে ভগবান তাঁহারই প্রতি অনুরাগ অন্তঃকরণে পোষণ করায় যাঁহার মধ্যে এই সর্ব্বভূত বিদ্যমান এবং যিনি এই সমস্ত উৎপন্ন করিয়াছেন এবং এই সমস্তে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন সেই পরমপুরুষের সাক্ষাৎকার মনুষ্যের হয়, মনুষ্য তাঁহাকে লাভ করে। ইহা নিম্নোক্ত শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥

ঈশ্বর আছেন; তিনি এই আশ্চর্য্য বিশ্বের মধ্যে বিরাজমান আছেন; তিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে বাস করিতেছেন, তিনি অনাদ্যনন্ত ইত্যাদি জানিলেও কেবল জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না,—সেই জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরসম্বন্ধে প্রেম উৎপন্ন হইয়া তাঁহার দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া চাই। তুকারাম বাবার "জীবনা বাঁচুনী তলমলী মাসা। প্রকার হা তৈসা হোতো জীবা॥ না সাঁপড়ে ঝালে ভূমিগত ধন। চবযাতে মন ভুয়াপরী॥ মাতে চা বিয়োগ ঝালিয়া হী বালা। তো বলবলা জাণা দেবা॥ সাগারে তে কিতী তুজ্ঞাসী প্রকার। সকলাঁচে সার পায় দাবী॥ তুকা ম্হণে কায় করাবে তেঁ ন কালে। হৃদয় মাঝে জলে ভেটী সাঠী॥" এই অভঙ্গের মধ্যে প্রতিবিম্বিত অত্যন্ত প্রেমমূলক জাজ্বল্যমান যে উৎকণ্ঠা তাহা অন্তঃকরণে উদিত হওয়া চাই, তাহা হইলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাইবে। প্রেম অর্থাৎ প্রীতি অথবা অনুরাগ—ইহারই যোগে ঈশ্বরের দর্শনলাভের জন্য, সতত তাঁহার সহবাস লাভের জন্য, মনুষ্য বহু চেষ্টা করে। কেবল পরোক্ষ জ্ঞানে তাহার সে বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না। কেবলমাত্র জ্ঞান পঙ্গু। জ্ঞানযোগে অন্তঃকরণে একবার প্রবল ভাবের উদ্রেক হওয়া চাই, তাহার পর মনুষ্যের প্রবৃত্তি হইবে। যাহার সম্বন্ধে অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ প্রীতি আছে সেই শিশুর জন্য মাতা কতই আপন দেহ ক্ষয় করেন, এবং প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে জীবনকেও সঙ্কটে ফেলেন। অতএব ঈশ্বরসম্বন্ধে হৃদয়ে প্রেম পোষণ না করিলে তাঁহার প্রাপ্তিসম্বন্ধে মনুষ্যের চেষ্টাযত্ন হয় না। এই অভিপ্রায়েই, অনন্য ভক্তিভাবের দ্বারা সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপ উপরি-উক্ত বচনে কথিত হইয়াছে।

এইরূপ, স্বকীয় কার্য্যের দ্বারা ঈশ্বরসাধনার এক প্রকারভেদ আছে। কিন্তু ভক্তিমার্গের মধ্যে আর এক মুখ্য উপায় আছে, তাহা অবলম্বন করিলে সহজে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। সে উপায় সৎ-সমাগম অর্থাৎ সাধুদিগের সহিত সমাগম অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরের ভক্ত তাহাদের সহিত একত্র সহবাস করা। এই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় এই বচনটি আছে:—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাং উপযান্তি তে॥

"আমি সকলের আদিকারণ; আমা হইতে সকলই প্রসূত হয়, এই কথা মনে করিয়া, যে জ্ঞানী সে প্রীতিসহকারে আমাকে ভজনা করে; এবং আমাতেই চিত্ত স্থির রাখিয়া, তাহার মন প্রাণ দেহ সে আমি, এইরূপ আত্মার অবস্থা করিয়া আমার বিষয় পরস্পরকে জানায়, আমার সম্বন্ধে সর্ব্বদা আলাপ করিয়া তুষ্টি ও আনন্দ লাভ করে। এইরূপ আমাতে সতত নিবিষ্ট হইয়া প্রীতির সহিত যাহারা সর্ব্বদা একত্র মিলিয়া ভজনা করে আমি তাহাদিগকে এইরূপ বুদ্ধি দিই অর্থাৎ তাহাদের অন্তঃকরণে এইরূপ স্ফূর্ত্তি উৎপন্ন করি যে তাহার যোগে তাহারা আমার নিকট আসে, অর্থাৎ তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।" এই বিষয়ের চিন্তা করিলে তাহার চিত্তে অত্যন্ত মহত্ত্ব উৎপন্ন হয়। দশজন একত্র বসিয়া সমানভাবে ঈশ্বরের প্রতি মন দিলে, আর কোন

বিষয়ের চিন্তা না করিলে, ঈশ্বরই আমাদের প্রাণ এইরূপ মনের অবস্থা হইলে, এবং ঈশ্বরপ্রসঙ্গে পরস্পরের সহিত আলাপ করিলে, সকলেরই মন তল্লীন হইয়া যায়। অন্যের ভাবে আমাদের ভাব বর্দ্ধিত হয় এবং এই প্রকারে পরস্পরের সমাগমে আমাদের ভাব অধিকাধিক বর্দ্ধিত হয়—ইহা প্রত্যক্ষ পরীক্ষার কথা। এইরূপ সাধুদিগের সহবাসে ঈশ্বরসম্বন্ধে আমাদের নিষ্ঠা দৃঢ় হয়।

এইরূপ স্মরণ, ধ্যান ও প্রীতিপূর্ব্বক ভজন—ইহাই ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায়; কিন্তু স্মরণ, ধ্যান, মনন সতত অপ্রতিহত হইবার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বর মনুষ্যকে সংসারে আনিয়াছেন। সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, অনেক বিষয়ে চিত্ত আসক্ত হয়। কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, সেই কর্ম্ম করিবার সময় তাহার ফলসম্বন্ধে আসক্তি হয়। তাহা প্রাপ্ত না হইলে, মন উদ্বিগ্ন হয়, ফলবিষয়ে চিন্তা অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগিতে থাকে, ভাল বিষয়ে মন দিব মনে করিলেও মন দেওয়া যায় না; যে বিষয়ে মনুষ্যের কার্য্য সফল হয় না সেই বিষয়ে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে, অহঙ্কার, কামক্রোধাদি ভাব জাগৃত হইয়া আর এক নূতন সঞ্চিত সেই কর্ম্মের যোগে উৎপন্ন হয়, তাহার পর ঈশ্বরের প্রতি মন কি করিয়া দিবে? অতএব, কোন কর্ম্ম হইতে যাহাতে এইরূপ পরিণাম না ঘটে তজ্জন্য নিম্নলিখিত বচনটি ধ্যানে আনিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

কেবল কর্ম্ম করাই আমাদের অধিকার, তাহা হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ নাই, এইরূপ আমাদের যেন মনের ধারণা হয়। কর্ম্ম হইতে ফল লাভ করিব এই হেতুটি মনে যেন না থাকে এবং কর্ম্ম করিব না এইরূপ আগ্রহও যেন না হয়"। অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠান খাড়া করিয়া তোলা, লোককল্যাণের জন্য বড় বড় উদ্যোগ করা, ইহার মধ্যে আমাদের যত্নজনিত যে ফল হইবে সেই বিষয়ে আসক্তি না থাকে; ফল পাইলেও ভাল, না পাইলেও ভাল, এইরূপ মনের অবস্থা করিয়া, কেবল ইহা আমাদের কর্ত্তব্য এই মনে করিয়া তাহা করিবে। এই অর্থ পরের বচনটিতে আছে:—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

"যোগেতে থাকিয়া, হে ধনঞ্জয়, আসক্ত না হইয়া কর্ম্ম কর; সেই যোগ কি?—না, কর্ম্মের সিদ্ধিতেও অত্যন্ত হর্ষ নাই, কিংবা অসিদ্ধিতেও খিন্নতা নাই এই প্রকারের সমতা-বুদ্ধি।" অতএব, কর্ম্মের দ্বারা সঞ্চিতের ভার বাড়াইয়া ঈশ্বরের প্রাপ্তির পথে যেন আমরা অন্তরায় না হই; এই জন্য, যে কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা আপন কর্ত্তব্য বলিয়াই করিবে, তার পর সিদ্ধি হোক বা না হোক্। এই বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম আমাদের বাধা না হইয়া ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় হইবে। কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কাজ করিতে হইবে—ইহার মধ্যে কর্ত্তব্যত্ব কোথা হইতে আসিল? আমি তাহা কেন করিব? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, যিনি অনাদি অনন্ত পরমাত্মা, যিনি আমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন, যিনি আমার পিতামাতা, যিনি আমার সখা, যিনি আমার হৃদয়নিবাসী, যিনি আমার উন্নতির কারণ, তাঁহার ইচ্ছা আমি এই কাজ করি, তাই কর্ত্তব্যত্ব সেই কাজে আসে। অতএব, এই বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাই ঈশ্বরের সন্তোষার্থে করা, তাঁহার আদেশ বলিয়াই করা। এবং এই ভাবে কর্ম্ম করিলে ঈশ্বরের প্রতি মন যায়, ঈশ্বরের পরিচয় বিশেষরূপে হয় এবং সেই জন্য আমরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হই।

অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।
৩।১৯।

"ফলেতে আসক্তি না রাখিয়া যে কর্ম্ম করে সেই ব্যক্তি যাহা পরম অর্থ অর্থাৎ পরমাত্মা অথবা শাশ্বত সুখ তাহা প্রাপ্ত হয়"। সেইরূপ আবার

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্;
১২।৬—৭।

"যাহারা সমস্ত কর্ম্মের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া, আমা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কর্ত্তব্য মনে করিয়া ঐ সকল কর্ম্ম করে এবং আমাতে তৎপর হইয়া

একনিষ্ঠার সহিত আমাকেই ধ্যান করিয়া উপাসনা করে আমি তাহাদিগকে মৃত্যুগ্রস্ত সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করি।" অর্থাৎ যে সকল কর্ম্ম করিতেছি, তাহা ঈশ্বরের জন্যই করিতেছি এইরূপ মনে করিয়া যাহারা সংসারের কাজ করে তাহারা উন্নত পদে গমন করে। এবং ভগবদ্‌গীতার শেষেও এই অভিপ্রায়েরই বচন আছে যথা :—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ং॥

১৮।৫৬

"যে সর্ব্বদা আমাকেই আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করে সে আমার প্রসাদে শাশ্বত ধ্রুব ও নিত্য স্থান প্রাপ্ত হয়"। এই শ্লোকের উপর "জ্ঞানোবা"র এক "ওবী" আছে—তাহা এই :—

মগ ক্ষণে গা সুভটা। তো কর্ম্মযোগিয়া নিষ্ঠা।
মী হোউনী হোয় পৈঠা। মাঝ্যা স্বরূপীঁ।
স্বকর্ম্মিঁয়া চোখবলীঁ। মজ পূজা করোনী ভলী।
তেণেঁ প্রসাদেঁ আকলী। জ্ঞান নিষ্ঠেতে॥
তে জ্ঞাননিষ্ঠা জেথ হাতবসে। তেথে ভক্তি মাঝী উল্লাসে।
তিয়া মজসীঁ সমরসেঁ। সুখিয়া হোয়॥

ইহার অর্থ :—"কর্ম্মযোগী যে, অর্থাৎ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার সন্তোষার্থে কর্ম্ম করে যে, এই প্রকারে আমিই তার নিষ্ঠা অর্থাৎ দৃঢ় আশ্রয়, কিংবা মনের বিষয় হওয়ায় সে আমার স্বরূপে প্রবিষ্ট হয়। সংসারের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক আপন কর্ম্মরূপ পুষ্পের দ্বারা আমার উত্তম পূজা করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে পরমেশ্বরকে দর্শন করে।— এই প্রকারের জ্ঞাননিষ্ঠা আয়ত্ত হইলে, পরমেশ্বরের স্বরূপ স্পষ্টরূপে দেখিতে পায়, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ—অর্থাৎ ভক্তি উল্লসিত হইয়া উঠে, এবং এই প্রকারে ভক্তির বন্যা অন্তঃকরণে আসিলে আমাতে তাহাতে একরস হইলে সে সুখী হয়"। সারাংশ, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে পরমেশ্বরের দিকেই দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, সংসারে ডুবিয়া না গিয়া সংসারের কাজ যে করে তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে ঈশ্বরের স্বরূপ সর্ব্বদা প্রকাশমান থাকে, তাঁহার সম্বন্ধে তাহার হৃদয়ে নিরতিশয় প্রেম জাগৃত হয় এবং ঈশ্বরেতে সতত লীন হইয়া সে সুখী হয়। কারণ উক্ত হইয়াছে,—

লীনতা হরিপাদাব্জে মুক্তিরিত্যভিধীয়তে।

অর্থাৎ—"হরির পদকমলে লীন হওয়ার নামই মুক্তি।" সারাংশ, অন্তঃকরণের দোষ পরীক্ষা করিয়া তদ্রূপ যে সঞ্চিত, ঈশ্বরের শরণ লইয়া সেই সঞ্চিতের নাশ করিবে। তাহাতেই ঈশ্বরের স্মরণ ধ্যান ও ভজন যথার্থ হয়। এরূপে চলিবে যাহাতে সংসার হইতে বাধা না আসে; এবং সংসারই যাহাতে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবার মুখ্য মার্গ হয় সেই উদ্দেশে কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিবে; কর্ম্ম যাহা করিবে তাহা কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য করিবে; এই ভাবে চলিলেই এই সংসারের মধ্যেই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং মনুষ্য সুখী হয়।

ইঙ্গিত।

ইমন-কল্যাণ—একতালা।

(কথক শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

ইঙ্গিত তব, লভিয়াছি নাথ
কত-না এমন মধুর প্রাতে;
সঙ্কেত বেণু বাজিয়াছে তব
কত-না সন্ধ্যা কত-না রাতে!
তরুণ অরুণ কিরণ প্রবাহে নামিয়া
নিদ্রা-লুলিত অধর গিয়াছ চুমিয়া
মধুর মলয় অনিলে পরশ করিয়া
পরাণ স্নিগ্ধ শিশির পাতে।
এ মোর দীর্ঘ জীবনের পথ বাহিয়া
মোহ-অর্গল-রুদ্ধ-দুয়ারে আসিয়া
কত বার তুমি গিয়াছ আমারে ডাকিয়া
স্নেহ-কম্পিত কর আঘাতে!

উদ্বোধন।

(নবসঙ্ঘ হইতে উদ্ধৃত)

যদি সত্যই তোমরা দেশকে ভাল বাসিয়া থাক, তবে আরও গভীরে অবতরণ কর, দেশাত্মার সহিত অভেদ হইয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া বল "বন্দেমাতরম্"। দেশ যদি তোমাদের পাইয়া থাকে, দেশের চরণে যদি তোমাদের মাথা নত হইয়া থাকে, তবে আজ ভায়ে ভায়ে এমন হৃদয়ভেদী দুর্ব্যবহার কেন? মুখে

মিষ্টি হাসিটুকু রাখিয়া সমকর্ম্মীর মর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া বিষের ছুরী বসাইবার প্রয়াস কেন? নিন্দা-কুৎসা, অকথ্য ভাষায় পরস্পর পরস্পরকে গালি দিয়া—বিদ্বেষসৃষ্টির দিন কি আর আছে? দেশ যেমন বিপুল বৃহৎ, কাজও তদ্রূপ সীমাহীন অনন্ত, আমরা কয়জন দেশসেবার ব্রত লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছি, কাজের তুলনায় ইহা কি একেবারেই নগণ্য নহে? দেশ-প্রীতি বুকে ধরিয়া কর্ম্মবীরের দল, সত্যই যদি জননী জন্মভূমির মঙ্গলকামনায় বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাক, অনন্ত কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়, কে কাহার কর্ম্মভূমি অতিক্রম করিল ইহা লইয়া ভাবিতে বসিবার প্রয়োজন নাই—সিদ্ধিই আমাদের লক্ষ্য, ঐক্যই আমাদের শক্তি; দেশসেবার পুণ্যব্রত লইয়া—দেশের প্রতীক ভায়ে ভায়ে যেন বিরোধ করিয়া না বসি।

চাই শিক্ষা—চাই অন্ন—চাই সঙ্ঘ। শিক্ষার মূলেই সঙ্ঘের অমরবীর্য্য সংরক্ষিত আছে—জননীর স্তন্যধারায় শিশুর জীবন যেমন রক্ষা হয়, তদ্রূপ শিক্ষার প্রভাবেই সঙ্ঘের অটল ভিত্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। যে যেখানে আছ যেমন করিয়া পার আত্মসংস্থানের একটা সুষ্ঠু উপায় করিয়া কাজে লাগিয়া যাও—আমরা ছয়মাসের স্বরাজ বুঝি না, নন্ কো-অপারেশন বুঝি না, আমরা বুঝি জাতিকে বাঁচাইবার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে—জীবনে যে অন্ধতার বীজ ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা কুড়াইয়া দূরে ফেলিয়া দেওয়া, মৃত্যুর উৎকট হলাহলে জীবন জর্জ্জরিত—সে উগ্রবিষ প্রশমিত করিয়া জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা, কেবল অন্নের সংস্থান করিলেই বাঁচিব না, অজ্ঞানতা হইতে জাতিকে মুক্ত করিতে হইবে, মানুষ খাইতে পাইলেই বাঁচিতে সমর্থ হয় না, বাঁচিবার মন্ত্র তাহাকে শিক্ষা করিতে হয়; জ্ঞানের বিমল কিরণে—সারা দেশ উজ্জ্বল করিয়া তোল।

৩

দল আমাদের লক্ষ্য নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলার সতর্কতায় আমাদের মন পড়িয়া নাই, আমরা চাই জগতে যখন জীবনের বান ডাকিয়াছে, আমার বাংলা, আমার সোণার বাংলা, আমার জীবন-মরণের লীলাভূমি বাংলা—কেন মরণের পথে ছুটিবে? যে যেখানে আছ ভাই, অনন্যমনে মরণের রঙ্গভূমে দাঁড়াইয়া অসংখ্য নরনারীর কর্ণে—কেবল শুনাইয়া দাও—মরণনিবারণ মহাশক্তি জাগিয়াছে; নিরাশ প্রাণে আশার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়াছে; কেবল তাহাদের একবার ফিরিতে বল, একবার স্বভাবগতি হইতে বিমুখ হইয়া উজান পথে ছুটিতে বল, আজ যে পথ সহজ সরল বলিয়া তাহারা বুঝিয়াছে এই উজানপথে দুইদিন চলিলে তাহারা বুঝিবে—পূর্ব্বপথ ছিল মৃত্যুর—নূতন পথ জীবনের আনন্দের অমৃতের।

আজ আর আমাদের ধর্ম্ম নাই, সমাজ নাই, জাতি নাই, কৃমিকীটের মত যে মানুষের পদভরে প্রতিদিন পিশিয়া মরিতেছে তাহার আবার জাতি-মর্য্যাদা! বংশের গৌরব!! সমাজের আদর্শ!!! সব আজ গুড়া করিয়া দাও। এস হিন্দু, এস মুসলমান, এস পণ্ডিত, পারিয়া, মূর্খ ধনী দরিদ্র, যে যেখানে আছ—আত্মার বন্ধনে এক নূতন জাতি সৃষ্টি করি—মানুষের ধর্ম্মই প্রবল হইয়া উঠুক, সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আর আমরা ভেদের দুঃখ সহিতে চাহি না—নূতন সমাজ নির্ম্মাণ করিয়া মানবজীবনেই স্বর্গের পুলক ফুটাইয়া তুলি।

এস পুরুষ, এস নারী—কোন বন্ধনে তুমি আর আবদ্ধ নও, এই মহাবিপ্লবের দিনে, আমরা আজ পাইয়াছি যে নূতন জীবন, সকল অন্তরায় তাহার বলে টুটাইয়া বিশ্বব্যাপী নূতনের স্থান করিয়া দিব।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

ললিত—আড়াঠেকা।

অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব যেই করিল রচনা।
কি ভুলে ভুলিয়া মন বারেক তাঁরে ভাবনা।
জলে স্থলে শূন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি,
যাঁ হতে হতেছে এই সংসার কল্পনা।

কথা—রাজা রামমোহন রায়। স্বরলিপি—৺কাঙ্গালীচরণ সেন।

৩ ১´ ২ ০
সা II { ঋা মা -া মা I মা মা -া -গা | -মা -গদা দা পা | -া -া -দমা মা |
অ চি ন্ত্য ০ র চ না ০ ০ ০ ০০ বি শ্ব ০ ০ ০০ যেই

৩ ১´ ২ ০
| মগা মা পা -া I দা -া -দপা -মা | -া -গা ঋমা ঋগা | (-ঋা -সা -া সা) } |
ক০ রি ল ০ র ০ ০০ ০ ০ ০ চ০ না০ ০ ০ ০ অ

০ ৩ ১´ ২
| -ঋা -সা -া পা | দা দা -র্ঋর্সা র্সা I না র্সা -া -ণা | -দা -ণদা দপা পা |
০ ০ ০ কি ভু লে ০০ ভু লি য়া ০ ০ ০ ০০ ম০ ন

০ ৩ ১´ ২
| -া -া -দমা মগা | মগা মা মণদা -পা I পা পা -া দমা | -া -গা ঋমা -ঋগা |
০ ০ ০০ বা০ রে০ ক, তাঁ০ ০ রে, ভা ০০ ০ ০ ব০ না০

০
| -ঋা -সা -া সা II
০ ০ ০ "অ"

৩ ১´ ২ ০
পা II { পা পা -মা পা I দা র্সা -া -া | -নর্সা -ঋর্সা র্সা র্সা | -া -া -া র্সা |
জ লে, স্থ ০ লে শূ ন্যে ০ ০ ০০ ০০ যি নি ০ ০ ০ আ

৩ ১´ ২ ০
| র্সা র্সা র্সা -া I র্সা ঋা -া -া | -র্সঋা -র্গঋা ঋর্সা র্সা | (-ণা -দা -পা পা) } |
ছে ন, ব্যা ০ প্ত, আ ০ ০ ০০ ০০ প০ নি ০ ০ ০ জ

০ ৩ ১´ ২
| -ণা -দা পা পা | দা দা -র্ঋর্সা র্সা I না র্সা -া -ণা | -দা -ণদা দা পা |
০ ০ ০ যাঁ হ তে ০০ হ তে ছে ০ ০ ০ ০০ এ ই

০ ৩ ১´ ২
| -া -া -দমা মা | মগা মা মণদাঃ -পঃ I পা -া -া -দমা | -মগা -ঋমা ঋগা -ঋা |
০ ০ ০০ সং সা০ র, ক০ ০ ল্প ০ ০ ০০ ০০ ০০ না০ ০

০
| -সা -া -া সা II II
০ ০ ০ "অ"

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

ত্রয়োদশ প্রকরণ।

ভক্তিমার্গ।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভক্তিমার্গের ও জ্ঞানমার্গের চরম সাধ্য একই; এবং "পরমেশ্বরের অনুভবাত্মক জ্ঞানের দ্বারাই শেষে মোক্ষলাভ হয়" এই সিদ্ধান্ত দুই মার্গে বজায় থাকে শুধু নহে—বরঞ্চ অধ্যাত্মপ্রকরণে এবং কর্ম্মবিপাকপ্রকরণে প্রথমে অন্য যে-যে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে, সে সমস্তও গীতার ভক্তিমার্গে বজায় রাখা হইয়াছে। উদাহরণ যথা—ভাগবতধর্ম্মে বাসুদেবরূপ পরমেশ্বর হইতে সংকর্ষণরূপ জীব উৎপন্ন হয় এবং পরে সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন অর্থাৎ মন এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ অর্থাৎ অহঙ্কার হইয়াছে, এইরূপ চতুর্ব্যূহরূপ জগতের উৎপত্তি কেহ প্রতিপাদন করিয়াছেন, আবার কেহ বা এই চারি ব্যূহের মধ্যে তিন, দুই কিংবা একটীকে মাত্র স্বীকার করেন। কিন্তু জীবের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় এই মতটি সত্য নহে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জীব সনাতন পরব্রহ্মেরই সনাতন অংশ, এইরূপ উপনিষদের আধারে বেদান্তসূত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে (বেসূ. ২. ৩. ১৭; ও ২. ২. ৪২-৪৫ দেখ)। তাই শুধু ভক্তিমার্গের উক্ত চতুর্ব্যূহের কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া জীবসম্বন্ধে বেদান্তসূত্রকারদিগেরই উপর্য্যুক্ত সিদ্ধান্তই ভগবদ্‌গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ২. ২৪; ৮. ২০; ১৩. ২২; ও ১৫. ৭ দেখ)। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বাসুদেবভক্তি ও কর্ম্মযোগ এই দুই তত্ত্ব গীতায় ভাগবতধর্ম্ম হইতেই গৃহীত হইলেও, ক্ষেত্রজ্ঞরূপ জীব ও পরমেশ্বর ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অধ্যাত্মজ্ঞান হইতে ভিন্ন কোনও অন্ধ ও মূঢ় কল্পনাকে গীতায় স্থান দেওয়া হয় নাই। এক্ষণে গীতায় ভক্তি ও অধ্যাত্ম, কিংবা শ্রদ্ধা ও জ্ঞান, ইহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল রাখিবার প্রযত্ন থাকিলেও, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ভক্তিমার্গে গ্রহণ করিলে ন্যূনাধিক শব্দভেদ করা আবশ্যক হয়ই এবং গীতাতেও তাহা করা হইয়াছে। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের এই শব্দভেদ প্রযুক্ত কাহারও কাহারও এই ভুল ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, গীতায় একবার নীতিদৃষ্টিতে ও একবার জ্ঞানদৃষ্টিতে কথিত সিদ্ধান্তের মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকায়, সেই পরিমাণে গীতা অসম্বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মতে এই বিরোধ বস্তুত সত্য নহে; অধ্যাত্ম ও ভক্তি, ইহাদের মধ্যে আমাদের শাস্ত্রকারেরা যে সমন্বয় করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি না করাতেই এইরূপ বিরোধ প্রতীয়মান হয়। তাই, এই সম্বন্ধে এখানে কিছু খুলিয়া বলা আবশ্যক। পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে একই আত্মা নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে এইরূপ অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হওয়ায় "যে আত্মা আমাতে তাহাই সর্ব্বভূতে"—"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি (গী. ৬. ২৯), কিংবা "এই সকলই আত্মা"—"ইদং সর্ব্বমাত্মৈব" এইরূপ অধ্যাত্মশাস্ত্রদৃষ্টিতে আমরা বলিয়া থাকি; এবং ইহাকে অনুসরণ করিয়াই "তুকা ম্হণে যেঁ যেঁ ভেটে। তেঁ তেঁ বাটেমী ঐসে॥" অর্থাৎ—তুকা ভণে, যাহা কিছু দেখি, তাহা আমিই—এইরূপ মনে করি—(গা. ৪৪৪৪. ৪) এইরূপ তুকারাম বাবা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিমার্গে অব্যক্ত পরমেশ্বরকেই ব্যক্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ দেওয়া যায়। তাই, উক্ত সিদ্ধান্তের স্থানে এক্ষণে "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি"—আমি (ভগবান্) সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত ভূত আমাতে আছে (৬. ২৯), কিংবা "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি"—যাহা কিছু সমস্তই বাসুদেবময় (৭. ১৯), কিংবা "সর্ব্বভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথোময়ি"—জ্ঞান হইলে পর, সমস্ত ভূত তুমি আমার মধ্যে এবং তোমার আপনার মধ্যেও দেখিবে (গী. ৪. ৩৫), এইরূপ গীতায় বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণেই ভাগবত পুরাণেও—

> সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্‌ভগবদ্‌ভাবমাত্মনঃ।
> ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

"আমি ভিন্ন, ভগবান্ ভিন্ন ও লোকেরা ভিন্ন এইরূপ ভেদ-বুদ্ধি মনে না রাখিয়া, আমি ও ভগবান্ একই, এই ভাবনা যে ব্যক্তি সমস্ত ভূতে রাখে এবং সমস্ত ভূত ভগবানের মধ্যে ও আপনার মধ্যেও আছে এইরূপ বুঝে, সে ভাগবতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ"—এইরূপ ভগবদ্‌ভক্তদিগের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে (ভাগ. ১১. ২.৪৫ ও ৩. ২৪. ৪৬)। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রের 'অব্যক্ত পরমাত্মা' শব্দের স্থানে 'ব্যক্ত পরমেশ্বর' এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এইটুকুই যাহা কিছু প্রভেদ। অধ্যাত্মশাস্ত্রে ইহা যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে যে, পরমাত্মা অব্যক্ত হইবার কারণে সমস্ত জগৎ আত্মময়। কিন্তু ভক্তিমার্গ প্রত্যক্ষাবগম্য হওয়ায়, পরমেশ্বরের অনেক ব্যক্ত বিভূতির বর্ণনা করিয়া এবং অর্জ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিয়া প্রত্যক্ষ বিশ্বরূপ দেখাইয়া, সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরময় (আত্মময়) এই বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রত্যয় জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে (গী. অ. ১০ ও ১১)। অধ্যাত্মশাস্ত্রে কর্ম্মের ক্ষয় জ্ঞানের দ্বারা হইয়া থাকে এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু সগুণ পরমেশ্বর ব্যতীত জগতে অন্য কিছু নাই; তিনিই জ্ঞান,

তিনিই কর্ম্ম, তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই কর্ত্তা, কর্ম্মসম্পাদক এবং কল্পনাতাও তিনি; এইরূপ ভক্তিমার্গের তত্ত্ব হওয়ায় সঞ্চিত, প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ ইত্যাদি কর্ম্মভেদের গোলযোগের মধ্যে না পড়িয়া ভক্তিমার্গ অনুসারে ইহা প্রতিপাদন করা যাইতেছে যে, কর্ম্ম করিবার বুদ্ধি দিতে, কর্ম্মফল বিধান করিতে এবং কর্ম্মের ক্ষয়সাধন করিতে একমাত্র পরমেশ্বরই আছেন। উদাহরণ যথা—তুকারাম দেবতাকে একান্তে প্রার্থনা করিয়া স্পষ্টভাবে কিন্তু প্রেমের সহিত বলিতেছেন—

ঐক পাণ্ডুরঙ্গা এক মতে।
কাহী বোলণে আছে একান্ত।
আর্ম্বা জরী তারাল সঞ্চিত।
তরী উচিত কায় তুঝে॥ (গা. ৪৯৯)

ঐ ভাবই ভিন্ন শব্দে অন্যস্থানে (গা. ১০২৩) এইরূপ বলা হইয়াছে যে—

প্রারব্ধ ক্রিয়মাণ। ভক্তাঁ সঞ্চিত নাহীঁ জাণ।
অবঘা দেবচী জালা পাহীঁ। ভরোনিয়াঁ অন্তর্বাহীঁ॥

"প্রারব্ধ, ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিতের ঝগড়া ভক্তের জন্য নহে; দেখ, যাহা কিছু সকলই ঈশ্বর, তিনিই সর্ব্বব্যাপী।" ভগবদ্‌গীতাতে ভগবান ইহাই বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" (১৮. ৬১) ঈশ্বরই সমস্ত লোকের হৃদয়ে বাস করিয়া তাহাদের দ্বারা যন্ত্রের ন্যায় সমস্ত কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। কর্ম্মবিপাক-প্রক্রিয়ায় এইরূপ সিদ্ধ করা হইয়াছে যে, জ্ঞানার্জ্জনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আত্মার আছে। কিন্তু তাহার বদলে ভক্তিমার্গে ইহা বলা হয় যে, এই বুদ্ধিও পরমেশ্বরই বিধান করেন—তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামামম্" (গী. ৭. ২১); কিংবা "দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে" (গী. ১০. ১০) এই প্রকার সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরেরই সত্তা বলে হইতেছে, তাই ভক্তিমার্গে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তাঁহারই ভয়ে বায়ু বহিতেছে, এবং তাঁহারই শক্তিতে সূর্য্যচন্দ্র চলিতেছে (কঠ. ৬. ৩; বৃ. ৩. ৮. ৬); এমন কি, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত বৃক্ষের একটী পত্র পর্য্যন্ত নড়ে না। সেইজন্যই ভক্তিমার্গে উক্ত হয় যে, মনুষ্য কেবল নিমিত্তমাত্র হইয়াই সম্মুখে থাকে (গী. ১১. ৩৩) এবং তাহার সমস্ত ব্যবহার পরমেশ্বরই তাহার হৃদয়ে থাকিয়া যন্ত্রের ন্যায় তাহার দ্বারা করাইয়া থাকেন। সাধু তুকারাম বাবা বলেন (গা, ২৩১০. ৪)—

নিমিত্তাচা ধনী কেলা আসে প্রাণী।
মাঝে মাঝে ক্ষণোনী ব্যর্থ গেলা॥

"এই প্রাণী কেবল নিমিত্তেরই কারণে স্বাধীন; 'আমার আমার' বলিয়া বৃথাই ইহা নিজের সর্ব্বনাশ করে।" এই জগতের ব্যবহার ও সুব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্য সকলেরই কর্ম্ম করা আবশ্যক; কিন্তু অজ্ঞানী লোক যে প্রকার এই কর্ম্ম আমার' বলিয়া করিয়া থাকে সেরূপ না করিয়া জ্ঞানীপুরুষ ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিতে আমরণ সমস্ত কর্ম্ম করিবেক—এইরূপ ঈশাবাস্যোপনিষদের যে তত্ত্ব তাহাই উক্ত উপদেশের সার। এই উপদেশই এই শ্লোকে ভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥

"তুমি যাহা কিছু করিবে, খাইবে, হবন করিবে, দিবে কিংবা তপস্যা করিবে সে সমস্ত আমাকে 'অর্পণ কর" (গী. ৯. ২৭)—তাহা হইলে কর্ম্ম তোমার বন্ধন হইবে না, ভগবদ্‌গীতার এই শ্লোক শিবগীতায় (১৪. ৪৫) গৃহীত হইয়াছে; ভাগবতের এই শ্লোকেও ঐ অর্থই বর্ণিত হইয়াছে—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বাঽনুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥

"কায় মন বাক্য ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা আত্মা ইহাদের প্রবৃত্তি বশত কিংবা স্বভাবানুসারে যাহা কিছু আমরা করি তৎসমস্ত পরাৎপর নারায়ণকে সমর্পণ করিবে" (ভাগ. ১১. ২. ৩৬) সার কথা—অধ্যাত্মশাস্ত্রে যাহাকে জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় পক্ষ, ফলাশা ত্যাগ, কিংবা ব্রহ্মার্পণপূর্ব্বক কর্ম্ম বলে (গী. ৪. ২৪; ৫. ১০; ১২. ১২) তাহাই ভক্তিমার্গে 'কৃষ্ণার্পণ-পূর্ব্বক কর্ম্ম' এই নূতন নাম প্রাপ্ত হয়। ভক্তিমার্গের লোকেরা ভোজনের সময় গ্রাস লইবার পূর্ব্বে, 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' এইরূপ যে বলে, কৃষ্ণার্পণবুদ্ধিই তাহার বীজ। আমার সমস্ত ব্যবহার লোকোপযোগের জন্য নিষ্কামবুদ্ধিতে নির্ব্বাহ হয়—এইরূপ জ্ঞানী জনক বলিয়াছেন; ভগবদ্‌ভক্তও নিজের আহারপানাদি সমস্ত ব্যবহার কৃষ্ণার্পণবুদ্ধিতেই করিয়া থাকেন। ব্রত-উদ্‌যাপন, ব্রাহ্মণ-ভোজন অথবা অন্য ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম করিলে শেষে "ইদং কৃষ্ণার্পণমস্তু" কিংবা "হরির্দাতা হরির্ভোক্তা" এইরূপ বলিয়া জলত্যাগ করিবার যে রীতি আছে তাহার মূলতত্ত্ব ভগবদ্‌গীতার উক্ত শ্লোকে আছে। কানের গহনা নষ্ট হইলে যেমন কানের ছিদ্রই অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ আজকাল ব্যবহারে উক্ত সঙ্কল্পের অবস্থা হইয়াছে; কারণ পুরোহিত তাহার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া কেবল তোতাপাখীর মত তাহা আওড়ায় এবং যজমান বধিরের ন্যায় জলত্যাগ করিবার কাওয়াজ করে! কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে ইহার মূলে কর্ম্মফলের আশা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবার তত্ত্ব আছে; এবং ইহাকে উপহাস করিলে, শাস্ত্রের কোন বৈগুণ্য হয় না, উপহাসকারীর অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। জীব-

লের সমস্ত কর্ম—এমন কি জীবন-ধারণ পর্যন্ত—এইরূপ কৃষ্ণার্পণ বুদ্ধিতে অথবা ফলাশা ত্যাগ করিয়া করিলে পর, পাপ বাসনা কোথায় থাকিবে এবং কুকর্মই বা কিরূপে ঘটিবে? কিংবা লোকোপযোগার্থ কর্ম কর, লোকহিতার্থ আত্মসমর্পণ কর, এইরূপ উপদেশেরও দরকার আর কেন হইবে? তখন তো 'আমি' ও 'লোক' এই দুয়েরই সমাবেশ পরমেশ্বরেতে এবং এই দুয়েতে পরমেশ্বরের সমাবেশ হওয়ায় স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই-ই কৃষ্ণার্পণরূপ পরমার্থের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং "জগাচ্যা কল্যাণা সন্তাচ্যা বিভূতি। দেহ কষ্টবিতী উপকারে" তুকারামের এই অভঙ্গ সার্থক হয়। কৃষ্ণার্পণবুদ্ধির দ্বারা সমস্ত কর্ম যে করে তাহার নিজের যোগক্ষেমে বাধা পড়ে না, ইহা যুক্তিবাদের দ্বারা পূর্ব্ব প্রকরণে সিদ্ধ করা হইয়াছে; এবং ভক্তিমার্গের পথিককে "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" (গী. ৯. ২২) এইরূপ স্বয়ং ভগবান্ গীতাতে আশ্বাস দিয়াছেন। যিনি শ্রেষ্ঠ পৈঠায় পৌঁছিয়াছেন সেই জ্ঞানী পুরুষের যেমন সাধারণ লোকের বুদ্ধিভেদ না করিয়া তাহাদিগকে সৎমার্গে আনয়ন করাই কর্ত্তব্য (গী. ৩. ২৬) সেইরূপ পরমশ্রেষ্ঠ ভক্তেরও নিম্ন পৈঠার ভক্তদিগের শ্রদ্ধাকে লণ্ডভণ্ড না করিয়া তাহাদের অধিকার অনুসারে তাহাদিগকে উচ্চতর পৈঠায় উঠাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। সার কথা, উক্ত বিচার হইতে প্রকাশ পাইবে যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রে এবং কর্মবিপাকে যে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে সে সমস্তই এই প্রকারে অল্প শব্দভেদে ভক্তিমার্গেও বজায় রাখা হইয়াছে; এবং জ্ঞান ও ভক্তির:মধ্যে মিলন স্থাপন করিবার এই পদ্ধতি আমাদের এখানে খুব প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে।

কিন্তু যে স্থলে শব্দভেদের দ্বারা অর্থের অনর্থ ঘটিবার ভয় থাকে, সেখানে উপরি-উক্ত শব্দভেদও করা হয় না, কারণ অর্থই প্রধান বিষয়। উদাহরণ যথা—জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকের প্রযত্ন করিয়া আপনাকে উদ্ধার করিতে হইবে, ইহা কর্মবিপাকক্রিয়ার সিদ্ধান্ত। যদি ইহাতে শব্দের কোন ভেদ করিয়া বলা যায় যে, এই কাজও পরমেশ্বরই করেন, তবে মূঢ় লোকেরা অলস হইয়া যাইবে। এই জন্য "আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"—নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজেই নিজের বন্ধু (গী. ৬. ৫)—এই তত্ত্ব ভক্তিমার্গে প্রায় যেমনটি-তেমনি অর্থাৎ শব্দভেদ না করিয়া বলা হয়। "যে যে-ক্যোণাচে কায বা গেলে। জ্যাচে ত্যানে অনহিত ফেলে" (গা• ৪৪৪৮), এই তুকারামের অভঙ্গ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহা অপেক্ষাও বেশী স্পষ্ট করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

> নাহিঁ দেবা পাশীঁ মোক্ষাচে গাঠোলে।
>
> আণুনি নিবালে দ্যাবে হাতীঁ।
>
> ইন্দ্রিয়াঁচা জয় সাধুনিয়া মন।
>
> নির্ব্বিষয় কারণ অসে তেথে॥ (গা. ৪২৯৭)।

অর্থাৎ "দেবতার কাছে মোক্ষের গাঁট্‌রী নাই যে তিনি তাহা তোমার হাতে আনিয়া দিবেন। এখানে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া মনকে নির্ব্বিষয় করাই মোক্ষলাভের মুখ্য উপায়।" ইহা কি "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ" এই উপনিষদের মন্ত্রেরই সহিত একার্থক নহে? পরমেশ্বরই জগতের সমস্ত ভাঙ্গাগড়ার কর্তা ও কারয়িতা সত্য; তথাপি তাঁহার প্রতি নির্দয়তা ও পক্ষপাতিতার দোষ না আসে, এই জন্য কর্মবিপাকক্রিয়ার এই সিদ্ধান্ত যে যাহার যেরূপ কর্ম তাহাকে সেইরূপ তিনি ফল প্রদান করেন; এই কারণেই এই সিদ্ধান্তও শব্দভেদ না করিয়াই ভক্তিমার্গেই গৃহীত হয়। সেইরূপ আবার, উপাসনার জন্য ঈশ্বরকে ব্যক্ত বলিয়া মানিলেও, যাহা কিছু ব্যক্ত সে সমস্ত মায়া এবং সত্য পরমেশ্বর তাহার অতীত—অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তও আমাদের এখানকার ভক্তিমার্গে কখনও পরিত্যক্ত হয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই জন্যই গীতায় বেদান্তসূত্রপ্রতিপাদিত জীবের স্বরূপকেই বজায় রাখা হইয়াছে। প্রত্যক্ষের দিকে কিংবা ব্যক্তের দিকে মানবমনের যে স্বাভাবিক প্রবণতা, তাহার সহিত তত্ত্বজ্ঞানের গহন সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধনে বৈদিক ধর্মের এই নিপুণতা, অন্য কোন দেশের ভক্তিমার্গে দেখা যায় না। অন্য দেশবাসীদিগের এই রীতি দেখা যায় যে, তাহারা একবার পরমেশ্বরের কোন সগুণ বিভূতি স্বীকার করিয়া ব্যক্তের পক্ষ গ্রহণ করিলে তাহাতেই আসক্ত হইয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা ছাড়া আর কিছুই তাহারা দেখিতেই পায় না এবং তাহাদের অন্তরে নিজ নিজ সগুণ প্রতীক সম্বন্ধে বৃথাভিমান উৎপন্ন হয়। এইরূপ হইলে, তাহারা তত্ত্বজ্ঞানের মার্গ ভিন্ন এবং শ্রদ্ধার ভক্তিমার্গ ভিন্ন, এইরূপ মিথ্যা ভেদ করিবার যত্ন করে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীন কালেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায়, গীতাধর্ম্মে শ্রদ্ধা:ও জ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ না আসিয়া, বৈদিক জ্ঞানমার্গ শ্রদ্ধাপূত এবং বৈদিক ভক্তিমার্গ জ্ঞানপূত হইয়াছে; এবং সেই জন্য মনুষ্য যে-কোন মার্গই অনুসরণ করুক, শেষে সে একই সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত জ্ঞান ও ব্যক্ত ভক্তি, ইহাদের মিলনের এই মহত্ত্ব, নিছক্ ব্যক্ত খৃষ্টেই জড়িত ধর্মের পণ্ডিতদিগের উপলব্ধিতে আসে না, এবং তাই তাঁহাদিগের একদেশদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞানের ভাবে অপূর্ণ দৃষ্টিতে গীতাধর্ম্মে উঁহাদের মধ্যে

বিরোধ প্রতিভাত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা ইহাই যে, বৈদিক ধর্ম্মের এই গুণ গ্রহণ না করিয়া, আমাদেরই দেশের কতকগুলি অনুকরণপ্রিয় লোক আজকাল তাহাকেই মন্দ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়! মাঘকাব্যের (১৬. ৪৩) এই বচন এই বিষয়েরই এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ—"অথবাভিনিবিষ্টবুদ্ধিষু। ব্রজতি ব্যর্থকতাং সুভাষিতম্!" মিথ্যা ধারণার মন একবার অধিকৃত হইলে, ভালো কথাও ব্যর্থ হইয়া যায়।

স্মার্ত্তমার্গে চতুর্থাশ্রমের যে মহত্ব, তাহা ভক্তিমার্গে কিংবা ভাগবতধর্ম্মে নাই। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বর্ণনা ভাগবতধর্ম্মেও করা হইয়া থাকে; কিন্তু সেই ধর্ম্মের মুখ্য কটাক্ষ ভক্তির উপরেই হওয়ায়, যাহার ভক্তি উৎকট, সে-ই সকলের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত হয়—সে গৃহস্থই হউক, বা বানপ্রস্থই হউক বা বৈরাগীই হউক; এই সম্বন্ধে ভাগবতধর্ম্মে কোন বিধিনিষেধ মানা হয় না (ভাগ. ১১. ১৮. ১৩, ১৪ দেখ)। সন্ন্যাসাশ্রম স্মার্ত্তধর্ম্মের এক আবশ্যকীয় ভাগ, ভাগবত ধর্ম্মের নহে। কিন্তু ভাগবতধর্ম্মী কখনই বিরক্ত হইবেক না এরূপ কোন নিয়ম নাই; গীতাতেই সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই-ই মোক্ষদৃষ্টিতে একই যোগ্যতার, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। তাই, চতুর্থাশ্রম স্বীকার না করিলেও সাংসারিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে বৈরাগী হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি ভক্তিমার্গেও পাওয়া যায়। এই কথা পূর্ব্বকাল হইতেই কিছু কিছু চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তখন এই লোকদিগের প্রাধান্য ছিল না; এবং একাদশ প্রকরণে—আমি স্পষ্ট এই বিষয় দেখাইয়াছি যে, ভগবদ্‌গীতায়, কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগেরই অধিক মহত্ব দেওয়া হইয়াছে। কালান্তর হইতে কর্ম্মযোগের এই মহত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানকালে ভগবদ্‌ভক্ত ব্যক্তি সাংসারিক কর্ম্ম ছাড়িয়া বিরক্ত হইয়া কেবল ভক্তিতেই নিমগ্ন থাকিবে ভাগবতধর্ম্মীয় লোকদিগেরও এইরূপ ধারণা হইয়াছে। তাই এই বিষয়ে গীতার মুখ্য সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত উপদেশ কি, ভক্তিদৃষ্টিতে এইখানে তাহার একটু ব্যাখ্যা পুনর্ব্বার করা আবশ্যক। ভক্তিমার্গের কিংবা ভাগবতমার্গের ব্রহ্ম স্বয়ং সগুণ ভগবান্‌ই। এই ভগবান নিজেই যদি সমস্ত জগতের কর্ত্তা ও ধারণকর্ত্তা হয়েন এবং সাধুদিগের রক্ষণার্থ ও দুষ্টের নিগ্রহার্থ সময়ে সময়ে অবতার গ্রহণ করিয়া জগতের ধারণ-পোষণ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তবে ভগবদ্‌ভক্তকেও লোকসংগ্রহার্থ তাঁহারই অনুকরণ করা আবশ্যক ইহা পৃথক করিয়া বলিতে হইবে না। হনুমান রামচন্দ্রের মহাভক্ত ছিলেন; কিন্তু তিনি নিজ পরাক্রমে রাবণাদি দুষ্টের শাসন করিবার কাজ ছাড়িয়া দেন নাই। পরম ভগবদ্‌ভক্তদিগের মধ্যে ভীষ্মকেও গণনা করা হইয়া থাকে; কিন্তু তিনি নিজে আমরণ ব্রহ্মচারী হইলেও স্বধর্ম্মানুসারে আত্মীয় লোকের এবং রাজ্যের সংরক্ষণ কার্য্য মৃত্যু পর্য্যন্ত চালাইয়াছিলেন। ভক্তিযোগে পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ হইলে ভক্তের নিজের হিতের জন্য কোন কিছু লাভ করা অবশিষ্ট থাকে না সত্য; কিন্তু প্রেমমূলক ভক্তিমার্গের দ্বারা দয়া কারুণ্য কর্ত্তব্যপ্রীতি প্রভৃতি উচ্চ মনোবৃত্তি বিলুপ্ত হইতে পারে না; বরং সেগুলি অধিকতর শুদ্ধ হইয়া উঠে। এই অবস্থায় এই প্রশ্নই উঠিতে পারে না যে কর্ম্ম করিবে কি করিবে না। বরং তাঁহাকেই ভগবদ্ভক্ত বলিব, যাঁহার মনে এই প্রকার অভেদভাব উৎপন্ন হয়—

> জ্যাসি আপঙ্গিতা নাহীঁ।
> ত্যাসি ধরী জো হৃদয়ীঁ।
> দয়া করণে জে পুত্রাসী।
> তেচি দাসা আণি দাসী॥

অর্থাৎ—"যে অনাথ, তাহাকে যে হৃদয়ে ধরে, তাহার প্রতি পুত্রের ন্যায় যে দয়া করে,—সে-ই দাস ও দাসী" (গা. ৯৬০), এই অবস্থাতেই সহজভাবেই ঐ লোকদিগের বৃত্তি লোকসংগ্রহের অনুকূল হইয়া উঠে। ইহা একাদশ প্রকরণে বলিয়া আসিয়াছি—"সাধুদিগের বিভূতি জগতের কল্যাণের জন্যই হয়; তাঁহারা পরোপকারের জন্য নিজের শরীরকে কষ্ট দেন।" পরমেশ্বরই জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতের সমস্ত ব্যবহার নির্ব্বাহ করেন এইরূপ বলিলে, জগতের ব্যবহার সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য চাতুর্ব্বর্ণ্যাদি যে ব্যবস্থা আছে তাহা তাঁহারই ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। গীতাতেও "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" (গী. ৪. ১৩) এইরূপ ভগবান্ স্পষ্ট বলিয়াছেন। অর্থাৎ ইহা পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা যে, প্রত্যেকে নিজ অধিকারানুসারে সমাজের এই কাজ লোকসংগ্রহার্থ করিবে। ইহার পরে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, জগতের যে ব্যবহার পরমেশ্বরের ইচ্ছায় চলিতেছে তাহার কোন বিশিষ্ট অংশ কোন মনুষ্যের দ্বারা সম্পূর্ণ করাইবার জন্যই পরমেশ্বর তাহাকে জন্ম দেওয়ান; এবং পরমেশ্বর কর্ত্তৃক তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট কাজ মনুষ্য যদি না করে তাহা হইলে তাহার পরমেশ্বরকেই অবজ্ঞা করিবার পাপ হইবে। এই কর্ম্ম 'আমার' কিংবা 'আমি' আপন স্বার্থের জন্য উহা করিতেছি এইরূপ অহঙ্কারবুদ্ধি যদি তোমার মনে থাকে, তবে এই কর্ম্মের ভালমন্দ ফল তোমার অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু 'পরমেশ্বরের যাহা অভিপ্রায় তাহার জন্য আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাকে দিয়াই কার্য্য করাইতেছেন' (গী. ১১. ৩৩) এইরূপ ভাবনা মনে পোষণ করিয়া পরমেশ্বরার্পণ পূর্ব্বক কেবল স্বধর্ম্ম জানিয়া এই কর্ম্ম যদি তুমি কর, তাহা

হইলে ইহাতে অসঙ্গত বা অযোগ্য কিছুই থাকে না; বরং এই প্রকার স্বধর্ম্মাচরণ হইতেই সর্ব্বভূতান্তর্গত পরমেশ্বরের প্রতি একপ্রকার সাত্ত্বিক ভক্তি উদয় হয়, এইরূপ গীতার উক্তি। "সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে থাকিয়া পরমেশ্বরই তাহাদিগকে যন্ত্রের ন্যায় চালাইতেছেন; তাই আমি অমুক কর্ম্ম ছাড়িতেছি কিংবা অমুক কর্ম্ম করিতেছি, এই দুই ভাবনাই মিথ্যা; ফলাশা ছাড়িয়া সমস্ত কর্ম্ম কৃষ্ণার্পণবুদ্ধিতে করিতে থাক; এই কর্ম্ম আমি করিব না এইরূপ তুমি জেদ করিলেও প্রকৃতিধর্ম্মানুসারে তোমাকে তাহা করিতেই হইবে, এইজন্য সমস্ত স্বার্থ পরমেশ্বরে বিলীন করিয়া পরমার্থবুদ্ধিতে ও বৈরাগ্যযোগে স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত ব্যবহার লোকসংগ্রহার্থ তোমাকে করিতেই হইবে; আমিও তাহাই করিতেছি; আমার দৃষ্টান্ত দেখ এবং তদনুরূপ কার্য্য কর"—আপনার সমস্ত উপদেশের এই তাৎপর্য্যার্থ ভগবান গীতার শেষ অধ্যায়ে উপসংহাররূপে বলিয়াছেন। জ্ঞানের এবং নিষ্কাম কর্ম্মের যেরূপ বিরোধ নাই, সেইরূপই ভক্তি ও কৃষ্ণার্পণবুদ্ধিতে কৃত কর্ম্মের মধ্যেও বিরোধ উৎপন্ন হয় না। মহারাষ্ট্রের ভগবদ্ভক্তশিরোমণি তুকারাম বাবাও ভক্তিমূলে "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" (কঠ. ২. ২০; গী. ৮. ৯)—পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ হইতেও বৃহৎ—এই পরমেশ্বরস্বরূপের সহিত নিজের তাদাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

অণুরণীয়াঁ থোকড়া। তুকা আকাশা এবঢা।
গিলুনি সাঁডিলেঁ কলিবর। ভবভ্রমাচা আকার॥
সাঁডিলী ত্রিপুটী। দীপ উজললা ঘটীঁ।
তুকা ম্হণে আতাঁ। উরলোঁ উপকার পুরতা॥

(গা. ৩৫৮৭)

"এক্ষণে আমি পরোপকারের জন্যই রহিয়াছি"। সন্ন্যাসমার্গীয়দিগের ন্যায় আমার এক্ষণে কোন কাজই বাকী নাই, এরূপ বলেন নাই বরং তিনি বলিয়াছেন—

ভিক্ষাপাত্র অবলম্বণেঁ।
জলো জিণেঁ লাজির বাণেঁ।
ঐসিয়াসী নারায়ণে।
উপেক্ষিজে সর্ব্বথা। (গা. ২৫৯৫)

"ভিক্ষাপাত্র অবলম্বন লজ্জাস্পদ—উহা নষ্ট হউক; নারায়ণ এইপ্রকার মনুষ্যকে সর্ব্বথা উপেক্ষাই করেন।" কিংবা—

সত্যবাদী করী সংসার সকল।
অলিপ্ত জলীঁ জৈসেঁ।
যতে জ্যা উপকার ভূতাঁচি তে দয়া।
আত্মস্থিতি তয়া অঙ্গীঁ বসে॥

(গা. ৩৭৮০. ২, ৩),

"সত্যবাদী মনুষ্য সংসারের সমস্ত কার্য্য করে এবং জলে কমলপত্রের ন্যায় অলিপ্ত থাকে; যে উপকার করে এবং প্রাণীদিগের উপর দয়া করে, তাহারই অন্তরে আত্মস্থিতির নিবাস জানিবে।" এই অভঙ্গের মধ্যে তুকারাম বাবার এই বিষয়ে অভিপ্রায় কি তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে। তুকারাম বাবা সংসারী হইলেও তাঁহার মনের গতি একটু কর্ম্মত্যাগেরই দিকে ছিল। কিন্তু উৎকট ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমরণ ঈশ্বরার্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেই হইবে ইহাই প্রবৃত্তিমূলক ভাগবত ধর্ম্মের লক্ষণ কিংবা গীতার সিদ্ধান্ত; তাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কেহ দেখিতে চাহিলে তুকারাম বাবাই শিবাজী মহারাজকে যে "সদ্গুরুর শরণ" লইতে বলিয়াছিলেন সেই শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীর দাসবোধ গ্রন্থের নিকটেই তাহাকে যাইতে হইবে। রামদাস স্বামী অনেকবার বলিয়াছেন যে, ভক্তির দ্বারা কিংবা জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যে সিদ্ধপুরুষ কৃতকৃত্য হইয়াছেন তিনি "শহাণে করুণ সোডাবে। বহুত জন" (দাস. ১১. ১০ ১৪) "সকল লোককে শিক্ষাদিবার জন্য" নিস্পৃহভাবে আপনার কার্য্য যথাধিকার কিরূপ বরাবর করিয়া যান, তাহা দেখিয়া সাধারণ লোক নিজ নিজ ব্যবহার করিতে শিখিবে; কারণ "কেল্যাবিণে কাঁহীঁচ হোত নাহীঁ"—না করিলে কিছুই হয় না—(দাস. ১৯. ১০. ২৫; ১২. ৯. ৬; ১৮. ৭. ৩); এইরূপ অনেকবার বলিয়া শেষের দশকে রামদাস স্বামী ভক্তির তারকমের সহিত কর্ম্মসামর্থ্যের সম্পূর্ণ মিল এইপ্রকারে করিয়া দিয়াছেন—

সামর্থ্য আহে চলবলেচে।
জো জো করীল ত্যাচে।
পরন্তু যেথে ভগবন্তাচেঁ।
অধিষ্ঠান পাহিজে॥

(দাস. ২০. ৪ ২৬)। গীতায় "মামনুস্মর যুধ্য চ" (গী. ৮. ৭), আমাকে নিত্য স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর—অর্জ্জুনকে ৮ম অধ্যায়ে এই যে উপদেশ করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য, এবং কর্ম্মযোগীদিগের মধ্যেও ভক্তিমান শ্রেষ্ঠ (গী. ৬. ৪. ৩) ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে এই যাহা বলা হইয়াছে যে, তাহারও তাৎপর্য্য একই। গীতার ১৮শ অধ্যায়েও ভগবান ইহাই বলিয়াছেন—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

"যিনি এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিজের স্বধর্ম্মানুরূপ নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ দ্বারা (কেবল পঠন কিংবা পুষ্পের দ্বারা নহে) পূজা করিয়া মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করে" (গী. ১৮. ৪৬)। অধিক কি, এই শ্লোকের এবং সমস্ত গীতারও ইহাই ভাবার্থ যে, স্বধর্ম্মানুরূপ নিষ্কাম

কর্ম্ম করিলে সর্ব্বভূতান্তর্গত বিরাটরূপী পরমেশ্বরের এক-প্রকার ভক্তি, পূজা কিংবা উপাসনাই হয়। "নিজের ধর্ম্মানুরূপ কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার অর্থাৎ পরমেশ্বরের পূজা কর" এইরূপ বলিলে, "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি নববিধ ভক্তি গীতায় মান্য নহে এরূপ বুঝিবে না। তবে গীতার উক্তি এই যে, কর্ম্মকে গৌণ ভাবিয়া ছাড়িয়া দিয়া নববিধ ভক্তির মধ্যেই কেবল নিমগ্ন থাকা যুক্তিসিদ্ধ নহে; শাস্ত্রত প্রাপ্ত নিজের সমস্ত কর্ম্ম যথারীতি করিতেই হইবে; উহা 'নিজের' বলিয়া না ভাবিয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া "তাঁহার সৃষ্ট জগতের সংগ্রহার্থ তাঁহারই এই কর্ম্ম" এইরূপ নির্ম্মম-বুদ্ধিতে করিবে; তাহা হইলে কর্ম্মের লোপ না হইয়া বরং এই কর্ম্মের দ্বারাই পরমেশ্বরের সেবা ভক্তি কিংবা উপাসনা সম্পন্ন হইবে, এই কর্ম্মজনিত পাপপুণ্য আমাকে স্পর্শ করিবে না এবং শেষে সদ্‌গতিও লাভ হইবে। গীতার এই সিদ্ধান্তের প্রতি উপেক্ষা করিয়া গীতার ভক্তিপর টীকাকার গীতায় ভক্তিকেই প্রধান এবং কর্ম্মকে গৌণ বলিয়া মানা হই-য়াছে, এইরূপ ভাবার্থ নিজ গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু সন্ন্যাসমার্গীয় টীকাকারদিগের ন্যায় ভক্তি-পর টীকাকারদিগের এই তাৎপর্য্যার্থও একদেশদর্শী। গীতার ভক্তিমার্গ কর্ম্মপ্রধান; কেবল পুষ্পের দ্বারা কিংবা পাঠের দ্বারা নহে, স্বধর্ম্মোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারাও পরমেশ্বরের পূজা হইয়া থাকে এবং এইরূপ পূজা প্রত্যে-কের অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই তাহার মুখ্য তত্ত্ব। কর্ম্মময় ভক্তির এই তত্ত্ব গীতার ন্যায় যখন অন্য কোথাও প্রতিপাদিত হয় নাই, তখন ইহাকে গীতার ভক্তিমার্গের বিশেষ লক্ষণ বলিতে হইবে।

এইপ্রকার কর্ম্মযোগের দৃষ্টিতে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তি-মার্গের এইরূপ সম্পূর্ণ সমন্বয় হইলেও জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গে যে এক বড়রকম বিশিষ্টতা আছে তাহাও এক্ষণে শেষে স্পষ্টরূপে বলা আবশ্যক। জ্ঞানমার্গ সকলের কেবল বুদ্ধিগম্য হওয়ায় অল্পবুদ্ধির সাধারণ লোকদিগের পক্ষে ক্লেশময়; এবং ভক্তিমার্গ শ্রদ্ধামূলক, প্রেমগম্য ও প্রত্যক্ষ হওয়া প্রযুক্ত তদনুসারে আচরণ করা সকলের পক্ষে সহজ হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হই-য়াছে। কিন্তু ক্লেশ ছাড়া জ্ঞানমার্গে আর এক বাধা আছে। জৈমিনীয় মীমাংসা কিংবা উপনিষৎ বা বেদান্তসূত্র দেখিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল শ্রৌত যাগযজ্ঞাদির অথবা কর্ম্মসন্যাসপূর্ব্বক "নেতি নেতি"স্বরূপ পরব্রহ্মেরই বিচার-আলোচনায় পূর্ণ; এবং শেষে ইহাই নির্ণয় করা হইয়াছে যে, স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনীভূত শ্রৌতযাগাদি কর্ম্ম করিবার অথবা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আবশ্যক উপনিষদাদি বেদা-ধ্যয়ন করিবার অধিকারও প্রথম তিন বর্ণেরই অন্তর্ভূত পুরুষদিগেরই আছে, (বেসূ. ১. ৩. ৩৪-৩৮)। এই তিন বর্ণের অন্তর্গত স্ত্রীলোক কিংবা চাতুর্ব্বর্ণ্যানুসারে সমস্ত সমাজের হিতকারী কৃষক, কিংবা অন্য ব্যবসায়া-বলম্বী সাধারণ স্ত্রীপুরুষের মোক্ষলাভ কিরূপে হইবে ঐ সকল গ্রন্থে তাহার বিচার করা হয় নাই। ভাল; বেদ এইরূপে স্ত্রীশূদ্রাদির অশ্রোতব্য হওয়ায় তাহারা কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না এইরূপ যদি বল, তবে উপনিষদে এবং পুরাণেই তো বর্ণনা পাওয়া যায় যে, গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোক এবং বিদুর প্রভৃতি শূদ্র জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন (বেসূ. ৩. ৪, ৩৬-৩৯)। এই অবস্থায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, প্রথম তিন বর্ণের পুরুষেরাই মুক্তি লাভ করিবে; এবং স্ত্রী-শূদ্র সকলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে এইরূপ মানিলে, তাহাদের জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধন কি তাহা এক্ষণে বলা আবশ্যক। বাদরায়ণাচার্য্য বলেন যে, 'বিশেষানুগ্রহশ্চ' (বেসূ. ৩. ৪. ৩৮) অর্থাৎ পরমেশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহই উহার এক সাধন এবং ভাগবতে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্ম-মূলক ভক্তিমার্গে এই বিশেষানুগ্রহাত্মক সাধন "স্ত্রীশূদ্র কিংবা (কলিযুগের) নামধারী ব্রাহ্মণদিগের বেদাদি শ্রুতি শ্রুতিগোচর না হওয়ায়, মহাভারতে সুতরাং গীতাতেও নিরূপিত হইয়াছে" (ভাগ. ১. ৪. ২৫)। এই মার্গে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান এক হইলেও, এখন স্ত্রীপুরুষ কিংবা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র এই ভেদ অবশিষ্ট থাকে না এবং এই মার্গের বিশেষ গুণ গীতায় বর্ণিত হইয়াছে—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

"হে পার্থ! আমাকে আশ্রয় করিলে স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র কিংবা অন্ত্যজাদি যে সকল পাপযোনি তাহারা পর্য্যন্ত পরম সিদ্ধি লাভ করে" (গী. ৯. ৩২); এই শ্লোকই মহাভারতের অনুগীতা পর্ব্বেও প্রদত্ত হইয়াছে; (মভা. অশ্ব. ১৯. ৬১); এবং এরূপ কথাও আছে যে, বনপর্ব্বের অন্তর্গত ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে মাংস-বিক্রেতা ব্যাধ কোন ব্রাহ্মণের নিকট, এবং শান্তিপর্ব্বে তুলাধারী অর্থাৎ বণিক, জাজলি নামক ব্রাহ্মণ তপস্বীর নিকট স্বধর্ম্মানুসারে নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়াই মোক্ষ কিরূপে লাভ করা যায় তাহার নিরূপণ শুনাইয়াছিল (মভা. বন. ২০৬-২১৪; শাং. ২৬০-২৬৩)। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, যাহার বুদ্ধি সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে সে-ই শ্রেষ্ঠ; তা সে ব্যবসায়ে স্বর্ণকারই হউক, ছুতারই হউক, বেণেই হউক বা মাংসবিক্রেতাই হউক। কোন মনুষ্যেরই যোগ্যতা তাহার ব্যবসায় কিংবা জাতির উপর নির্ভর করে না—সমস্তই তাহার অন্তঃ-

করণের শুদ্ধতার উপর নির্ভর করে, এবং এইরূপই ভাগবতের উক্তি স্পষ্টই দেখা যায়। সমাজের সমস্ত লোকের নিকট এইরূপে মোক্ষের দ্বার খুলিয়া দিলে, সমাজে যে এক বিশেষ প্রকার জাগৃতি উৎপন্ন হয় তাহার স্বরূপ মহারাষ্ট্রীয় ভাগবতধর্ম্মের ইতিহাসে বিশেষভাবে দেখা যায়। কি স্ত্রী, কি চণ্ডাল, কি ব্রাহ্মণ পরমেশ্বরের নিকট সকলেই সমান, "দেবতা ভাবের জন্য ক্ষুধিত", প্রতীকের জন্য নহে, কালো সাদা বর্ণের জন্য নহে এবং স্ত্রীপুরুষাদি কিংবা ব্রাহ্মণচণ্ডালাদি ভেদাদির জন্যও নহে। তুকারাম বলেন (গা. ২৩৮২·৫, ৬)—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ শূদ্র। চাণ্ডালাঁ আহে অধিকার।
বালে নারীনর। আদিকরোনি বেশ্যাহী॥
তুকা হ্মণে অনুভবেঁ। আহ্মী পাডিয়লেঁ ঠাবেঁ।
আণিকহী দৈবেঁ। সুখ ঘেতী ভাবিকেঁ॥

আর অধিক কি বলিব? গীতাশাস্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, "মনুষ্য যতই দুরাচারী হউক না, নিদেন অন্তকালেও অনন্যমনে সে যদি ভগবানের শরণ লয় তাহা হইলে পরমেশ্বর তাহাকে ত্যাগ করেন না" (গী. ৯. ৩০; ও ৮. ৫-৮ দেখ)। 'বেশ্যা' এই শব্দ উপরি-উক্ত অভঙ্গে দেখিয়া, পবিত্রতার ভাণকারী অনেক বিদ্বান লোকের বোধ হয় খারাপ লাগিবে। কিন্তু এই সব লোক প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা জানেন না, এইরূপ বলিতে হয়। শুধু হিন্দুধর্ম্মে নহে, বৌদ্ধ ধর্ম্মেও এই সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হইয়াছে (মিলিন্দ প্রশ্ন. ৩. ৭. ২)। বুদ্ধ আম্রপালী নামক বেশ্যাকে এবং অঙ্গুলীমাল নামক চোরকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থে এইরূপ কথা আছে। খৃষ্টের সহিত এক সঙ্গে বধস্তম্ভের উপর আরূঢ় দুই চোরের মধ্যে এক চোর মরণকালে খৃষ্টের শরণ লওয়ায় খৃষ্ট তাহাকে সদ্গতি দিয়াছিলেন এইরূপ খৃষ্টান ধর্ম্মপুস্তকেও বর্ণনা আছে (ল্যুক. ২৩. ৪২ ও ৪৩)। আমার ধর্ম্মের উপর যাহার শ্রদ্ধা আছে সেই বেশ্যাও মুক্তিলাভ করে, খৃষ্টই এইরূপ একস্থানে বলিয়াছেন (মেথ্যু. ২১. ৩১; ল্যুক. ৭. ৫০)। অধ্যাত্মশাস্ত্রদৃষ্টিতেও এই সিদ্ধান্তই নিষ্পন্ন হয় এইরূপ আমি পূর্ব্বে ১০ম প্রকরণে দেখাইয়াছি। কিন্তু এই ধর্ম্মতত্ত্ব শাস্ত্রতঃ নির্ব্বিবাদ হইলেও যাহার সমস্ত জীবন দুরাচারেই কাটিয়াছে তাহার শুধু অন্তকালেই অনন্যভাবে ভগবানের শরণ লইবার বুদ্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে। এই অবস্থায় অন্তকালের যাতনার মধ্যে, কেবল যান্ত্রিকভাবে 'রা' বলিয়া পরে বিলম্বে 'ম' বলিয়া মুখ খুলিবার এবং বন্ধ করিবার পরিশ্রম ব্যতীত বেশী আর কিছুই লাভ হয় না। এই জন্য, কেবল মরণসময়েই নহে, সমস্ত জীবন সর্ব্বদা আমার স্মরণ মনোমধ্যে স্থির রাখিয়া, স্বধর্ম্মানুসারে আপনার সমস্ত ব্যবহার পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিতে করিয়া যাও, তাহার পর তুমি যে-জাতিই হওনা কেন, কর্ম্ম করিয়াও তুমি মুক্ত হইবে, এইরূপ ভগবান সকলকে নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিয়াছেন (গী. ৯. ২৬-২৮ ও ৩০-৩৪ দেখ)।

এইপ্রকারে বর্ণের, আশ্রমের, জাতির কিংবা স্ত্রীপুরুষাদিরও ভেদ না রাখিয়া, ব্যবহার লোপ না করিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান, আবালবৃদ্ধের সুলভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গীতোক্ত ভক্তিমার্গের এই সামর্থ্য ও সমতার প্রতি লক্ষ্য করিলে, "সকল ধর্ম্ম ছাড়িয়া তুমি একান্তভাবে আমারই শরণ লও, আমি সর্ব্ব পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব, ভীত হইও না" এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক গীতার শেষ অধ্যায়ে ভগবান গীতাশাস্ত্রের যে উপসংহার করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম সুস্পষ্ট হয়। সমস্ত ব্যবহার করিতে থাকিয়াও পাপপুণ্যে অলিপ্ত থাকিয়া পরমেশ্বরপ্রাপ্তিরূপ আত্মশ্রেয় সম্পাদন করিবার যে প্রত্যক্ষ মার্গ কিংবা উপায় তাহাই ধর্ম্ম, এইরূপ ব্যাপক অর্থে ধর্ম্মশব্দের এইস্থানে উপযোগ করা হইয়াছে। অনুগীতায় গুরুশিষ্যসংবাদে, অহিংসাধর্ম্ম, সত্যধর্ম্ম, ব্রত ও উপবাস, জ্ঞান, যাগযজ্ঞ, দান, কর্ম্ম, সন্ন্যাস ইত্যাদি যে সকল অনেক প্রকার মুক্তির উপায় অনেক লোক প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে প্রকৃত সাধন কোন্‌টি তাহা আমাদিগকে বল, এইরূপ ঋষিরা ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন (অশ্ব ৪৯); এবং শান্তিপর্ব্বে (শাং. ৩৫৪) গার্হস্থ্যধর্ম্ম বানপ্রস্থধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মাতৃপিতৃসেবাধর্ম্ম, রণক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের মরণ, ব্রাহ্মণের স্বাধ্যায় ইত্যাদি যে সকল অনেক ধর্ম্ম কিংবা স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গ্রাহ্য ধর্ম্ম কোন্‌টি এইরূপ প্রশ্ন উঞ্ছবৃত্তি উপাখ্যানে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমার্গ কিংবা ধর্ম্ম পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু সর্ব্বভূতে সাম্যবুদ্ধি এই যে চরম সাধ্য তাহা উপরি-উক্ত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে কোনও এক ধর্ম্মের উপর প্রীতি স্থাপন করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা মন একাগ্র না করিলে পাওয়া যায় বলিয়া না এই সমস্ত প্রত্যক্ষ মার্গের যোগ্যতা শাস্ত্রকার সমান বলিয়াই মনে করেন। তথাপি এই নানা মার্গের অথবা প্রতীকোপাসনার গোলযোগের মধ্যে পড়িলে মন হতবুদ্ধি হইতে পারে বলিয়া এই অনেক ধর্ম্মমার্গ ছাড়িয়া "তুমি শুধু একমাত্র আমারই শরণ লও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, ভীত হইও না" এইরূপ শুধু অর্জ্জুনকেই নহে, অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলকেই ভগবান এই নিশ্চিত আশ্বাস দিতেছেন। তুকারাম বাবাও সর্ব্বধর্ম্ম নিরসন করিয়া শেষে দেবতার নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছেন—

জলোঁ তে জীব জলোঁ তে শাহানীব।
রাহো মাঝা ভাব বিঠ্ঠল পাশীঁ।

জলোঁ তো আচার জলোঁ তো বিচার।
বাহোমন স্থির বিঠ্ঠল পায়ীঁ॥

(গা. ৩৪৬৪) এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক উপদেশ বা প্রার্থনা এই চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রূপ সুবর্ণপাত্রস্থিত উপাদেয় অন্নের মধ্যে 'ভক্তি'রূপ এই অন্তিম গ্রাসটি বড়ই মধুর। ইহাই প্রেমগ্রাস। এক্ষণে জলগণ্ডূষ করিয়া উঠিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক্।

ইতি ত্রয়োদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

ব্যাকুলতা।

(শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত)

দয়াল! আমার তোমার তরে ব্যাকুলতা কই ?
নিশিদিন ত মনটা নিয়ে স্বার্থে ডুবে রই ;
আমার ব্যাকুলতা কই ?
সংসারের এ চক্র মাঝে ঘুরি ফিরি নানান্ সাজে,
ঊর্দ্ধপানে চেয়ে কভু তোমার নাম না লই,
আমার ব্যাকুলতা কই ?
তোমার নামের মধুর কূপে বাসনা মোর থাকব ডুবে
জানব না আর আর্ত্তিহর তোমার নামটি বই।
(কিন্তু) বদ্ধ হ'য়ে দেহের মায়ায়
বেড়াই ছুটে কামের জ্বালায়,
তোমায় ভুলে তাইত এত মর্ম্ম ব্যথা সই ;
আমার ব্যাকুলতা কই ?
ভোগ ছাড়ি কি তোমায় ছাড়ি,
কোন্ সাগরে ধরব পাড়ি—
বুঝতে নারি দোটানাতে বড়ই ফাঁফর হই ;
প্রেমের তুফান লাগিয়ে প্রাণে
ছুটব ঐ প্রেমসিন্ধু পানে
ব্যাকুল হ'য়ে সকল ছেড়ে (আমিত) এমন ভক্ত নই ;
আমার ব্যাকুলতা কই ?

Brahma Dharma.

CH. III.

1. Tatvignanartham etc.

It is incumbent upon all to seek out a religious preceptor who knows Brahma, in order to obtain knowledge of Parabrahma, after having controlled one's self and secured peace of mind; and it is the duty of that preceptor to instruct duly and whole-heartedly any calm-minded person of whatsoever caste who may come to him as a seeker after Brahma.

2. Aparà Rigvedo etc.

It is the noblest mission of man to obtain the knowledge of the real nature and purpose of God. Those branches of knowledge the study of which helps to secure that eminently desirable treasure of wisdom,—that is the true knowledge, that is the highest knowledge; all other knowledge is inferior. Therefore it is that Rik, Yajur, Sam, Atharva, Phonetics, Mensuration, Grammar, Etymology, Prosody and Astronomy;—all these have been designated as Apara vidya, lower knowledge. Those portions of Rig, Yajur, Sam etc. and all other branches of knowledge that teach the truth about Brahma—that is the Para vidya, highest knowledge, and should be studied by all men.

3. Yat-tadadreshyam agrahyam etc.

He is something beyond creation, He is invisible to the eye, He is untouchable by the hand, He comes not within the sphere of any of our senses; yet the saintly devotees of Brahma perfectly realise that primal cause of all being within this created universe.

4. Etadvai tadaksharam Gargi etc.

He is not heavy, neither is He light, He is not small, neither is he big; no measure can be applied to Him. He is not red, redness or any other colour cannot be ascribed to Him. He is not liquid, He is not gaseous, He has neither taste nor smell. All these are attributes of outward material things. He is certainly not matter, therefore He possesses none of these qualities. As He is not matter, so also does He not possess a material body like ours; He has no

bodily life, neither has He face or limbs. Our body and mind are related to each other, and it is owing to this relation that we see, and hear and speak; the Supreme Spirit is no such being composed of mind and matter therefore does He not, like us, see with His eyes and speak with His mouth; He is eyeless, earless, mouthless. He has no mind, neither is He a mind without a body; no mental faculties are His. He is aloof, He is not touched by the joys and sorrows of this world. Since He is neither mind nor matter, is He then something immaterial like a shadow, or like darkness, or like the sky?—No He is not; He is something real and eternal, He is immortality and wisdom itself, none can be compared to Him. As mind is superior to matter, so that all-wise Supreme Soul is infinitely superior to mind. His wisdom is not like our created mental wisdom; with Him wisdom is innate. That all-knowing Being does not require any senses in order to know a thing; neither does He need a memory in order to know past events. He knows all things at one and the same time. He has not anger, nor hatred, nor scorn, nor grief like we have; nor is His compassion, His affection, His love or His gladness like ours. He is goodness itself, and the tenderness and pity and love contained in that spirit of good, flow out from Him and moisten the universe; He infinitely exceeds our mental powers of justice, mercy tenderness and love; our love is but a particle of that infinite love.

5. Etasya va aksharasya etc.

In obedience to His laws the sun, remaining in the centre of the solar system, lightens with its own radiance, like a lamp, the earth and other planets contained therein; by its own force attracts and keeps them to their appointed paths, and by scattering its heat sustains the life of all birds and beasts and trees comprised in the animal and vegetable kingdoms. The cool-rayed moon, pleasing to all eyes, also wanders in the skies according to his behests, gladdens all hearts by appearing in a new garb every evening, and keeps all plants alive and fresh by its benign light.

6. Etasya va aksharasya etc.

All shining bodies other than the Earth, such as the sun, moon and stars etc. are known by the general name of *dyuloka*. This earth beneath our feet, and these shining worlds above our heads, all exist at all times under the sway of that beneficent lord of the universe. Not even a single atom can break loose from His laws.

7. Etasya va aksharasya etc.

All things that happen in time take place according to His laws; the least thing cannot happen outside His immutable laws.

8. Etasya va aksharasya etc.

At the command of that supremely beneficent Lord, the swift rivers spring from the high snow-covered hills, and flow forth for the benefit and welfare of countless creatures. The mass of water that collects at some unrecognizable spot in some unknown hill beyond our sight, is obtained with ease by us hundreds and hundreds of miles away.

9. Yova etadaksharam etc.

That Supreme Lord of goodness must be directly known in our hearts, we must enter into loving relations with Him, and deliberately join in His work; then alone shall we be enabled to reap the eternal fruits of His companionship. Without seeking to know Him, even if we pray to Him day and night with outward show, in a worldly and absent-minded manner; or if we mortify our flesh and spirit in vain sacrifices and ceremonial rites in order to please men; or

if we give away all we have in hopes of earning honour, dignity, fame and glory,—even then we cannot establish the slightest connection with God, nor can we secure its fruit everlasting. He who first knows God, and loves Him, and follows His commandments with the object of doing His will—in him are manifested all the signs of a religious man, and he enjoys the supremely desirable, everlasting bliss of Brahma for all eternity.

10. Yova etadaksharam etc.

Of all creatures that inhabit this earth, man alone has the privilege of attaining the knowledge of Brahma. It is because he has the right of knowing that Supreme Lord of lords and the righteousness established by Him, that the name of man is so glorious. Who so unfortunate as he that is unable to know Him, even after having received this inestimable birthright? Who so poor as he who fails to taste the unspeakable bliss of realising that infinitely loveable Supreme Spirit? He is indeed poor and deserving of the utmost pity. His birth is that of a beast of burden. And he who leaves this world, knowing Him; he indeed is highly fortunate, he is the noblest among men, he is a Brahman.

11. Tadva etadaksharam etc.

All things that we know by the faculties of seeing, hearing thinking etc., He knows them all; and all that we cannot know, He knows that too. But He is not the object of anybody's sight, hearing, thought or knowledge. Nobody can know Him as He knows Himself; our mind cannot grasp that Infinitude completely. That infinite immortal being permeates the sky; there is no place where this all-pervading Supreme Spirit is not.

12. Bhishasmadvatah etc.

At the behest of that all-good immortal Being,—sun, air, fire, clouds and death are all constantly engaged in working together for the welfare of the universe.

13. Yadindan kincha etc.

That Supreme Lord is the life of this universe; everything has sprung from Him, and everything exists in and through Him. None can go against His will, each one is occupied with his own appointed task by His command. He who is enamoured of sin and thinks to transgress His divine laws,—to him He appears greatly fierce, like a thunderbolt about to fall; they who know this Supreme Spirit, become immortal and enjoy everlasting bliss in Brahma.

তাই ভালো।

(গান)

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

দুখের মাঝে এমনি করে
যদি গো তুমি নাথ,
সুখের আলো জ্বালো,
আঁধার-ঘেরা নিশীথ-রাতে
যদি অকস্মাৎ
ফুটে ভোরের আলো,
তাই ভালো গো তাই ভালো!

মরম দাহে এমনি করে
যদি তোমার নাথ,
সুধার ধারা ঢালো,
নিদাঘ-দাহ শীতল করি
বাদল অকস্মাৎ
মুছে বিষাদ-কালো,
তাই ভালো গো তাই ভালো!

বাঙ্গালা ও অসমীয়া ভাষা।*

(আসামপর্য্যটক—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

বেদের ভাষা আর্য্যগণের প্রথম ভাষা, তাহার পর রামায়ণাদির সংস্কৃত ভাষা। পালি ও প্রাকৃত ভাষা

* ইংরাজি ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত আসামের আদালত ও বিদ্যালয়সমূহে বাঙ্গালা ভাষাই প্রচলিত ছিল। তখন পর্য্যন্ত অসমীয়ারা

পরবর্ত্তী কালে ঐ ভাষা হইতে উৎপত্তি লাভ করে। জন-সমাজে দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সাধারণতঃ লোকে যে ভাষা ব্যবহার করিত তাহার নাম "প্রাকৃত" ভাষা। দেশভেদে এই ভাষা নানা আকৃতি ধারণ করিয়াছিল। এই প্রাকৃত ভাষা হইতে হিন্দি, উড়িয়া, বাঙ্গালা, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি—বর্ত্তমানে এই মত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

আসাম প্রদেশ অহম (Ahom) রাজাদিগের অধিকারভুক্ত হইলে অহমী ও অন্যান্য অসংস্কৃত শব্দ এখানকার তৎকালীন প্রচলিত ভাষায় পুঞ্জে পুঞ্জে প্রবেশ করিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শব্দ অতি বিকৃত হইল। এইরূপ বিকৃতশব্দবহুল ভাষা বর্ত্তমানে "আসমীয়া ভাষা" নাম পাইয়াছে। অসমীয়া ভাষা খাসিয়া গারো, কাছাড়ী, কোচ, নাগা, মিসমি, ডাফলা প্রভৃতি বিভিন্ন অনার্য্য জাতির ভাষার সংমিশ্রণে পরবর্ত্তী কালে পরিপুষ্টি লাভ করে।

কুচবিহারাধিপতি নরনারায়ণের আনুকূল্যে অসমীয়া ভাষার উন্নতির সূত্রপাত হয়। বাদসাহ আরঙ্গজেবের সময় হইতে আসামের বহুস্থানে অসমীয়া ভাষায় কথোপকথন সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত হয়। তৎপূর্ব্বে উক্ত ভাষা আসাম খণ্ডে তেমন সজীবতা প্রাপ্ত হয় নাই। আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় ও সুরমা উপত্যকায় অর্থাৎ শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলায় আবহমান কাল বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত ছিল। এখনকার পার্ব্বত্য প্রদেশে অসমীয়া এবং বাঙ্গালাভাষী লোক থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। এতাবৎকাল খাসিয়া, গারো, মণিপুরী প্রভৃতি জাতিরা বাঙ্গালা শিখিত; তখন বাঙ্গালা অক্ষরের ব্যবহার হইত। কিন্তু এক্ষণে উহাদের বর্ণমালাও বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে ইংরাজি হইয়াছে এবং উহাদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য ইংরাজ অক্ষরে (Roman Character) পুস্তকাদি মুদ্রিতও হইয়াছে।

আপার আসামে বিশেষতঃ শিবসাগর জেলায় বিশুদ্ধ অসমীয়া ভাষার প্রচলন দৃষ্ট হয়। ডাক্তার গ্রীয়ার্সন সাহেব শিবসাগরী ও কামরূপী নামে দুইটী ভাষা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শঙ্করদেবের লিখিত ভাষা আদি কামরূপী ভাষা বলিয়া পরিগণিত। বর্ত্তমানে পুস্তকাদিতে এই ভাষা পরিগৃহীত হয় না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের ভাষার সহিত শঙ্কর দেবের ভাষার অনেকটা সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বাঙ্গালা ও অসমীয়া উভয় ভাষারই মূলভিত্তি সংস্কৃত। মহামতি গেইট সাহেবের মতে (census report 1881) অসমীয়া ভাষা বাঙ্গালারই প্রাদেশিক ভাষা বা উপভাষা মাত্র। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, এক ভাষার ক্রিয়াপদ অন্য ভাষার ক্রিয়াপদের সহিত মিল থাকিলে উভয় ভাষার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

বাঙ্গালা ও অসমীয়া এতদুভয়ের নৈকট্য সম্বন্ধে আসাম গভর্ণমেণ্ট স্কুলের ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত রবিনসন (W. Robinson) সাহেব ১৮৪৯ সালে Journal of the A. S. B. নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় অসমীয়া ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:—After a careful comparison of Bengali and Assamese dialects we make no hesitation in asserting that except with slight variations of pronunciation, upwords of eight-tenths of the most common words are identical.

লিখন প্রণালী।

বাঙ্গালা ও অসমীয়া ভাষার লিখিবার প্রণালী সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। অসমীয়া অক্ষর বঙ্গাক্ষরের প্রকারভেদ মাত্র—ইহাতে কয়েকটী পুরাতন বাঙ্গালা ও মৈথিলী অক্ষর রহিয়াছে। একলিপির ভাষা বিভিন্ন হইলেও উহা শিক্ষা করা সহজ। এই সুবিধা একমাত্র ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকাবাসীরা উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন বাঙ্গালা লিপিতে "অ"এর পরিবর্ত্তে "র", "এ" এর পরিবর্ত্তে "য়ে" এবং "য" য়ের পরিবর্ত্তে "ষ" লিখিত হইত। তদ্ভিন্ন "স" ও "ন" এর প্রভেদ নাই, "ব" অনেক স্থলে "র" এর ন্যায়; "র" "ব" এর ন্যায় এবং "ভু" "ও" এর ন্যায় ব্যবহৃত হইত।

১। অসমীয়াতে অ, আ স্থানে "এ" হয়, যথা=অঙ্গার—এঙ্গার; আদা—এদা ইত্যাদি।

২। কোথায়ও "অ, আ" স্থানে "ও" হয়, যথা= যাওয়া—যোবা; গাওয়া (to sing)—গোবা ইত্যাদি।

৩। কোথায়ও বা "আ" কার লোপ হয়, যথা= টাকা—টকা; বাঙ্গালী—বঙ্গালী ইত্যাদি।

৪। "শ" স্থলে কোথায়ও "চ" হয়, যথা=রেশম—রেচম; ব্রিটিশ—ব্রিটিচ ইত্যাদি।

৫। শ, ষ, স স্থলে কোথায়ও বা "হ" হয় যথা—পশু—পহু; মানুষ—মানুহ; গোঁসাই—গোঁহাই; রাজস্ব—রাজহ ইত্যাদি।

৬। অনেক স্থানে "ড়" স্থলে পেট কাটা ব (ৰ) লিখিত হয়, যথা=পড়িতেছে—পৰিছে।

৭। "র" অক্ষর অসমীয়া ভাষার পেট কাটা "ব" (ৰ) রূপে ব্যবহৃত হয়, যথা=ঘর—ঘৰ; রাখ—ৰাখ

(The Assamese) মাতৃভাষানির্ব্বিশেষে বাঙ্গালা ভাষার পরিচর্য্যা করিতেন। একই দেশে বিভিন্ন ভাষার প্রচলন দেশবাসীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধন-পথে অন্যতম অন্তরায়।

ইত্যাদি এই প্রকারের "পেট কাটা ব" প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথিতে পাওয়া যায়।

৮। অন্তস্থ "ব" কারের (ব়) তলদেশে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, যথা=খাওয়া—খোৱা ; চাওয়া (to see) চোৱা ইত্যাদি এই হসন্ত ব (ৱ) এর উচ্চারণ ইংরাজী "w"র মত ; ইহা "য়" মত উচ্চারণ করিলেও অনেকটা হইতে পারে।

৯। ক্রিয়াসকল সংক্ষিপ্ত চলিত কথায় ব্যবহৃত হয় ; আবার বানানের প্রভেদে অনেক শব্দ হটাৎ বুঝিতে পারা যায় না, যথা=দিয়া—দি ; গিয়াছে—গৈছে ; আসিতেছে—আহিছে ; হইয়াছিল—হৈছিল ইত্যাদি।

যে দেশে ভ্রমণ করিতে যাইতে হইবে সে দেশের ভাষা না জানিয়া যাওয়াই দুর্ভাগ্যের বিষয়। এ সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত লর্ড বেকন বলিয়াছেন :—"He that travelleth into a country before he hath some entrance into the language, goeth to school and not to travell." অর্থাৎ যিনি দেশীয় ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার লাভ না করিয়াই কোন দেশ ভ্রমণ করিতে যান, তাঁহার পক্ষে ঐ ভ্রমণ ভ্রমণই নয়, বিদ্যালয়ে (ভাষা শিক্ষার জন্য) শিক্ষার্থ গমন করার ন্যায়। সে যাহা হউক, আসাম-যাত্রী বাঙ্গালীগণের শিক্ষার জন্য বারান্তরে অসমীয়া ভাষার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

কুক্কুট প্রসঙ্গ।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, আর্য্যদিগের নানা প্রয়োজনে কুক্কুটের সম্পর্ক ছিল। ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতের উচ্চারণভেদ কুক্কুটের ধ্বনি হইতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। এবিষয়ের প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কুক্কুট ক্রমে যে তিনটি শব্দ করিয়া থাকে, যাহাকে স্থানবিশেষে সাধারণ লোকে মোরগের বাঁক্ বলে সেই শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই পাণিনি মুনি "উকারোঽজ্-হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুতঃ" এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, টীকাকারগণ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন (১)।

মহাভাষ্য পাঠে জানা যায় যে, বন্যকুক্কুট আর্য্যাদিগের ভক্ষ্যরূপে ব্যবহৃত হইত, এবং গ্রাম্য কুক্কুট অভক্ষ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল (২)। মহর্ষি পরাশর উপদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, কুক্কুট-ডিম্বের পরিমাণানুসারে চান্দ্রায়ণপ্রায়শ্চিত্তের গ্রাসব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ চান্দ্রায়ণপ্রায়শ্চিত্তে যতগুলি গ্রাস খাইবার নিয়ম আছে, সেই গুলি মোরগের ডিমের মত করিতে হইবে, তাহা না হইলে পুণ্য হইবে না, এবং পাপও বিদূরিত হইবে না (৩)।

হেমাদ্রিধৃত লক্ষণকাণ্ডের বচন হইতে জানা যায় যে, কুক্কুটডিম্বের পরিমাণানুসারে বাণলিঙ্গের লক্ষণ অবধারিত হইয়াছিল (৪)। প্রাচীন যুগে কুক্কুটের লড়াই একটা বিশেষ আমোদের বিষয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে উদাহরণের অভাব নাই। উহা সজীব দ্যূতের অন্তর্গত। কাদম্বরী কাব্যের নায়ক চন্দ্রাপীড় বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময়ে পথিমধ্যে কুক্কুট প্রভৃতির লড়াই দেখিয়াছিলেন (৫)।

বৃহৎসংহিতা পাঠে জানা যায় যে, সেকালে রাজবাড়ীতে কুক্কুট পোষা হইত, এবং তন্ন-তন্ন করিয়া তাহার দোষ-গুণের বিচার করা হইত। বরাহমিহির বলিয়াছেন যে, যে কুক্কুটের লোম এবং অঙ্গুলি সরল, মুখ নখ ও মাথার চূড়া তাম্রবর্ণ এবং শরীরের বর্ণ শুভ্র, রাত্রির অবসানে যে মধুর শব্দ করে, সেই কুক্কুট রাজার রাজ্যের এবং রাজার অশ্বের বৃদ্ধি করিয়া থাকে (৬)।

টীকাকার ভট্টোৎপল গর্গের যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই বচনগুলির অর্থ হইতে জানা যায়, যে কুক্কুট শ্বেতবর্ণ, যাহার নখ ও চঞ্চু তাম্রবর্ণ, যাহার ঘাড়ের লোম সরল, যাহার অঙ্গুলি আবৃত নহে, এবং যাহার অঙ্গ সুঠাম ও মাথার চূড়া তাম্রবর্ণ, সেই কুক্কুট প্রশস্ত। যে

১। উবর্ণে কুক্কুটরুতে৷ প্রসিদ্ধবান্নুবর্ণতাক্।

২। অভক্ষ্যপ্রতিষেধেন বা ভক্ষ্যপ্রতিষেধঃ। তদ্যথা অভক্ষ্যো গ্রাম্যকুক্কুটঃ, অভক্ষ্যো গ্রাম্যশূকরঃ, ইত্যুক্তে গম্যত এতৎ আরণ্যো ভক্ষ্য ইতি।

৩। কুক্কুটাণ্ডপ্রমাণন্তু গ্রাসং বৈ পরিকল্পয়েৎ।
অন্যথা ভাবদোষেণ ন ধর্ম্মো নচ নিষ্কৃতিঃ॥ ১-অ। ২।

৪। পক্বজম্বুফলাকারং কুক্কুটাণ্ডসমাকৃতিং।

৫। আবদ্ধ মেষ-কুক্কুট-কুরর-কপিঞ্জল-লাবক-বর্ত্তিকাযুদ্ধম্।

৬। কুক্কুটস্ত্বৃজুতনুরুহাঙ্গুলিস্তাম্রবক্ত্র নখ-চূলিকঃ সিতঃ।
রৌতি সুস্বরমুষাত্যয়ে চ যো বৃদ্ধিদঃ স নৃপরাষ্ট্র-বাজিনাম্।
৬২। অ ১

কুক্কুট অত্যালাপী অর্থাৎ অধিকভাষী, যাহার ঘাড় যবের মত, যাহার মুখ সুন্দর, বর্ণ দধির মত, মুখ প্রশস্ত, মাথা বড় এবং চরণ হরিদ্রাবর্ণ, সেই কুক্কুট প্রশস্ত। মোটামুটি বলা হইয়াছে যে,—যে সকল কুক্কুটের চরণ খঞ্জ নহে, মুখ তাম্রবর্ণ এবং বর্ণ তৈলাক্তের মত, সেই সকল কুক্কুট প্রশস্ত। পক্ষান্তরে যে সকল কুক্কুট উৎসাহহীন, বিবর্ণ এবং বিকৃতস্বর, সেইগুলি নিন্দিত (৭)।

বরাহমিহির অপর একটি লক্ষণে বলিয়াছেন, যে বিহগ (কুক্কুট পাখী) যবগ্রীব অর্থাৎ যব-সদৃশগ্রীবাযুক্ত (টীকাকার ভট্টোৎপল বলেন যে, লোকে যাহা "যবগিয়া" নামে প্রসিদ্ধ তাহাই "যবগ্রীব"), অথবা যে পাখী বদরসদৃশ অর্থাৎ সুপক্ব বদর ফলের মত রক্তবর্ণ, যে পাখীর মস্তক বৃহৎ এবং শ্বেত রক্ত নীল প্রভৃতি নানা বর্ণ যুক্ত এবং নির্ম্মল, সেই কুক্কুট যুদ্ধে প্রশস্ত, অথবা যে পাখী মধুর মত বর্ণযুক্ত অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ অথবা ভ্রমরের মত কৃষ্ণবর্ণ, সেই কুক্কুটও যুদ্ধে জয়প্রদ। বর্ণিত লক্ষণ-রহিত কুক্কুট প্রশস্ত নহে। যে কুক্কুটের শরীর এবং স্বর ক্ষীণ, অথবা চরণ খঞ্জ, সেই কুক্কুটও মঙ্গলকর নহে (৮)।

কুক্কুটীর লক্ষণ বলা হইয়াছে, যে কুক্কুটী মৃদু-মধুর শব্দ করে, যাহার শরীর স্নিগ্ধ অর্থাৎ তৈলাক্তের মত মোলায়েম, যাহার মুখ ও চক্ষু সুন্দর, সেই কুক্কুটী রাজাদিগের সম্পৎ, যশ, যুদ্ধে জয় এবং বীর্য্যোৎকর্ষ প্রদান করে (৯)।

বরাহমিহিরের অপর একটি বচন পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন যুগে রাজছত্রে কুক্কুট পক্ষ নিহিত হইয়া ছত্রের শোভাসম্পাদন এবং রাজার সৌভাগ্য-বর্দ্ধন করিত (১০)।

প্রদর্শিত বচনাবলী হইতে রাজবাড়ীতে কুক্কুটপোষণের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "প্রায়শ্চিত্তবিবেকে" পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, মার্জ্জার কুক্কুট ছাগ কুকুর শূকর এবং অন্যান্য পাখী পোষণ করিলে "রোম-পূয়বহ" নামক নরক-গামী হইতে হয়। এইরূপ যে বচন আছে, উহা জীবিকার জন্য মার্জারাদি পোষণে দোষজ্ঞাপক, এমত বুঝিতে হইবে (১১)। সুতরাং শাস্ত্রমতে আমোদের জন্য কুক্কুট প্রভৃতি পোষা গৃহস্থ মাত্রের পক্ষেই দোষাবহ নহে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

চড়ক-পূজা।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

কতদিন হইতে চড়কপূজা আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত, তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। তবে এদেশে যে যে পূজাপদ্ধতি বিরাজমান, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহার অন্তরালে বৌদ্ধপ্রভাব যে সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হোম, যাগ, তপস্যা প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ-দিগের অনন্যসাধারণ অধিকার ছিল, এখনও আছে। বর্ত্তমান সময়ে যেমন ব্রাহ্মণদিগকে এই সমস্ত অধি-কার হইতে বিচ্যুত করিবার অল্পাধিক চেষ্টা চলি-তেছে, এবং অপর জাতিও যেমন আজকাল বিবাহাদিতে পৌরোহিত্য করিবার চেষ্টা করি-তেছেন ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন, অতি প্রাচীন সময়েও ঐরূপ ব্রাহ্মণবিদ্বেষ মধ্যে মধ্যে প্রধূমিত হইত। বুদ্ধদেব নিজে ক্ষত্রিয় হইয়াও ধর্ম্মব্যাখ্যাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, নিজের আদর্শ জীবন ও শিক্ষার প্রভাবে ভারতে যুগান্তর আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ-সম্রাট অশোক ব্রাহ্মণ না হইলেও অপর অপর জাতির অন্তর্গত

৭। শ্বেতস্তাম্রনখঃ শুক্লস্তাম্রাক্ষকৃ জু বালধিঃ।
অনাবৃতাঙ্গুলিঃ খঙ্গস্তাম্রচূড়ঃ প্রশস্যতে॥
অত্যালাপী যবগ্রীবো দধিবর্ণঃ শুভাননঃ।
প্রশস্তাস্যঃ স্থূলশিরা হারিদ্রচরণো দ্বিজঃ॥
অখঞ্জাস্তাম্রবক্ত্রাশ্চ স্নিগ্ধবর্ণাশ্চ পূজিতাঃ।
দীনাশ্চৈব বিবর্ণাশ্চ বিস্বরাশ্চ বিগর্হিতাঃ॥

৮। যবগ্রীবো যো বা বদরসদৃশো যস্ত বিহগো
বৃহন্মূর্দ্ধা বর্ণৈর্ভবতি বহুভির্যস্ত রুচিরঃ।
স শস্ত সংগ্রামে মধু-মধুপ-বর্ণশ্চ জয়কৃন্
শস্তো যোঽন্যোঽতাহন্যঃ কৃশতনুরবঃ খঞ্জচরণঃ॥ ২।

৯। কুক্কুটী চ মৃদুচারুভাষিণী, স্নিগ্ধমূর্ত্তি-রুচিরাননেক্ষণা।
সা দদাতি সুচিরং মহীক্ষিতাং শ্রী-যশো-বিজয়-বীর্য্যসম্পদঃ।

১০। শিচিতং তু হংসপক্ষৈঃ কৃকবাকু-ময়ূর-সারসানাং বা।
দৌকূল্যেন নবেন তু সমন্ততশ্ছাদিতং শুক্লদেহম্। ১
মুক্তাফলৈরুপচিতং প্রলম্বমালাবিলং স্ফটিকমূলম্।
ষড়্‌হস্তস্তম্ভহৈমং নবপর্ব্বনৈকদণ্ডন্তু। ২
দণ্ডার্দ্ধবিস্তৃতং তৎ সমাবৃতং রত্নভূষিতমূর্দ্ধাগ্রম্।
নৃপতেস্তদাতপত্রং কল্যাণপরং বিজয়দঞ্চ। ৭২অ। বৃসং।

১১। মার্জ্জার-কক্কুট-ছাগ-শ্ব-বরাহ-বিহঙ্গমান্।
পোষয়ন্নরকং যাতি তমেব নৃপসত্তম॥
এতত্তু জীবিকার্থপোষণে বোধ্যম্।

শক্তিসম্পন্ন নরনারীকে প্রচারকার্য্যে দীক্ষিত করিয়া দেশদেশান্তরে পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তৎসত্বেও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বৌদ্ধগণের অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল।

কেমন করিয়া ভারতের বিভিন্ন বর্ণ ও ধর্ম্মাবলম্বী নরনারীর ভিতরে ধর্ম্মসম্বন্ধে ঐক্য স্থাপিত হয়, তাহার জন্য অনেকে আপনার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াছিলেন। আমাদের ধারণা যে, উহার ফলে সমগ্র ভারতে শিবপূজার প্রবর্ত্তন। কেহ কেহ বলিতে চান যে, মহাদেবমূর্ত্তি ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি। আমরা এস্থানে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিব না। ক্রমে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তির পূজা এদেশে ছাইয়া পড়িল। লিঙ্গমূর্ত্তি আর কিছুই নহে, পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ। ঐ সংযোগেই এই বিরাট বিশ্ব বিকশিত। এই লিঙ্গমূর্ত্তির কল্পনা বাহিরের চক্ষে সাধারণের নিকটে নিতান্ত বিসদৃশ ও বর্ব্বরোচিত হইলেও উহা অর্থপূর্ণ। এই পূজায় নরনারী শূদ্র-অশূদ্র সকলেরই সমান অধিকার। এই লিঙ্গপূজা হইতে কোন জাতিকে বঞ্চিত করিয়া রাখা হয় নাই। এইরূপে এক সময়ে ভারতে সম্প্রদায়বিদ্বেষের উপর শান্তিজল সিঞ্চিত হইয়াছিল।

ওঙ্কার উচ্চারণে ব্রাহ্মণদিগেরই একমাত্র অধিকার ছিল *। অন্যান্য জাতির সমক্ষে বা নারীর নিকটে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবার নিষেধ শাস্ত্রে আছে †। অ,উ এবং ম এই তিন অক্ষরের সমাবেশে "ওম্" শব্দের উৎপত্তি। উহার অর্থ সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। শাস্ত্রের ঐ নিষেধ বজায় রাখিয়া প্রকারান্তরে এই ওম্ শব্দ যাহাতে অপর জাতি উচ্চারণ করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। অ+উ+ম হইতে যেমন ওম্, তেমনি ঐ অক্ষরগুলির সামান্য পরিচালনে অর্থাৎ উ+অ+ম হইতে বম্ শব্দের উৎপত্তি। অ এবং উ হইতে সন্ধি অনুসারে ও, তাহার পরে ম যোগ করিলে যেমন ওম্ শব্দ সিদ্ধ হয়, তেমনি উ এবং অ যুক্ত হইয়া ব, পরে ম যোগ হইয়া বং বা বম্ শব্দের উৎপত্তি। ওম্ শব্দ ব্রাহ্মণগণ উচ্চারণ করিতে চান করুন, কিন্তু স্ত্রী-শূদ্র ব্রাহ্মণ-নির্ব্বিশেষে বম্ শব্দ সকলেই উচ্চারণ করিতে পারিবে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইল। ঐ ধারা আজিও চলিয়া আসিতেছে। বম্ শব্দ যাহাতে ঘন ঘন মুখ হইতে উচ্চারণ হইতে পারে তাহারই জন্য উহা উচ্চারণ করিবার সময়ে গালে অঙ্গুলির ঈষৎ আঘাত দ্রুতভাবে প্রদত্ত হয়। শিবপূজার সময় 'হর হর বম্ বম্' এই শব্দ সাধকের মুখ হইতে অনবরত ধ্বনিত হইতে থাকে। অনেকের মতে বাণরাজার সময় এই শিবপূজা দেশময় বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল।

এইখানেই বৌদ্ধদের ব্রাহ্মণদিগের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা পর্য্যবসিত হয় নাই। অতি প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিতেন। বুদ্ধদেবের উপদেশানুসারে জাতিমাত্রেরই সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার হইল, এমন কি স্ত্রীলোকেরাও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন। তাঁহার দেহাবসানে অসংখ্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বৌদ্ধগণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চড়কপূজার সময় যে সমস্ত সন্ন্যাসী আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে স্ত্রী সন্ন্যাসিনীও বিরল নহে। আর একটু মনোযোগ সহকারে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, অপর অপর জাতির অন্তর্গত লোকেরা স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে উপবীত ধারণ করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যেমন অনেকে উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন, সে সময়ে তেমনি অপর অপর জাতি উপবীত গ্রহণ করিবার জন্যই সমধিক ইচ্ছুক হইয়া পড়িয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের আদর্শ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহারা লালায়িত হইয়াছিলেন।

এখানেও আমরা দেখিতে পাই যে তখনকার জনসমাজ উহাদের আবদারকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। আংশিক পূর্ণ করিবার বিধান শাস্ত্রকারগণও প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসগ্রহণ সহজ ব্যাপার নহে; বড় কঠোরতাসাপেক্ষ। সন্ন্যাসী হইতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য চাই, শিক্ষা চাই, কঠোর তপস্যা চাই—তাহা না হইলে সন্ন্যাস দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু ব্যাপক কাল ধরিয়া ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রহ্মচর্য্য বা সংযম রক্ষা করিয়া চালিতে পারিবে না। প্রকৃতিবশে তাহারা আবার নামিয়া পড়িবে। অথচ তাহাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। এই কারণে আমাদের মনে হয়, যখন ধরণী প্রখর রবিকিরণে সুতপ্ত সেই

* ইহা ভারতের অবনতিকালের কথা। তং সং
† প্রাচীন প্রামাণ্য শাস্ত্রে এই নিষেধ আছে কি না সন্দেহ। তং সং

সময়ে তাহাদের জন্য সন্ন্যাসের ব্যবস্থা হইল। চৈত্রের শেষভাগে তাহাদিগের সমস্ত দিনের জন্য অনশন-ব্রত অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা হইল। দিবাশেষে শিবপূজা-অন্তে তাহাদিগকে নিরামিষ হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে হইবে। তাহারা কয়েক-দিনের জন্য উপবীত ধারণ করিতে পারিবে এবং ব্রাহ্মণের সম্মানও পাইবে; কিন্তু তাহাদিগকে নিষ্ঠার উপরে পবিত্রতার উপরে দাঁড়াইতে হইবে।

যাহারা এইরূপ সন্ন্যাস চায় তাহাদিগকে চৈত্র মাসের প্রথম হইতে, বিকল্পে চড়ক সংক্রান্তির পাঁচ দিন পূর্ব্ব হইতে, সংযম লইতে হয়; অনুকল্পে তিন দিন পূর্ব্ব হইতেও চলিতে পারে। যাঁহারা সন্ন্যাসকামী তাঁহাদিগকে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সংকল্প করিতে হইবে—"আত্মগোত্রং পরিত্যজ্য শিবগোত্রং প্রবিশামি" আমি নিজ গোত্র পরি-ত্যাগ করিয়া শিবগোত্র গ্রহণ করিতেছি। একটি পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত করা হয়। যেখানে পূর্ব্ব হইতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে স্বতন্ত্র শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিতে হয় না। ঐ শিবলিঙ্গের সম্মুখে ৪টি তীর পুতিয়া তাহার চারিদিকে সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিতে হয়। সংক্রান্তির ঠিক পূর্ব্ব দিনে লীলাবতী ও কলাবতীর পূজার ব্যবস্থা আছে। ঐ দিন সায়াহ্নে বাতি দিতে হয়। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা ঐ দিন উপবাস করে; উহাকে চলিত কথায় নীলের উপবাস, বাতিদানকে নীলের বাতি বলে। কোথা হইতে লীলাবতী ও কলাবতীর পূজা চড়কের সহিত সংশ্লিষ্ট হইল তাহা বলা বড় সুকঠিন। ঐ লীলাবতীর পূজার দিন অষ্টমূর্ত্তির পূজা ও হোম হইয়া থাকে। চড়ক-সংক্রান্তির পর দিন উপবীত পরিত্যাগ করিতে হয় এবং বলিতে হয় "শিবগোত্রং পরিত্যজ্য আত্মগোত্রং প্রবিশামি" শিবগোত্র পরিত্যাগ করিয়া নিজগোত্রে প্রবিষ্ট হইলাম।

অনেকে এইরূপে সন্ন্যাসী হয়। আবার যাহারা চিররুগ্ন তাহারা আরোগ্যকামী হইয়া সন্ন্যাস লয়। যাহারা রোগমুক্ত হইয়াছে এবং রোগমুক্ত হইলে সন্ন্যাস লইব পূর্ব্ব হইতে যাহারা এরূপ মানস করিয়া রাখে তাহারাও সন্ন্যাস লয়। সন্ন্যাসী-গণের অধিকাংশই নীচজাতিভুক্ত। সন্ন্যাসীগণ প্রখর রৌদ্রে নর্ত্তনাদি করিতে থাকে। এবং শিবের উদ্দেশে ছড়া কাটায় এবং ঐভাবে শিবের বন্দনা করে। শাস্ত্রের উক্তি এই—

আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ
ধনমিচ্ছেৎ হুতাশনাৎ
জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ
মুক্তিমিচ্ছেৎ জনার্দ্দনাৎ।

অর্থাৎ সূর্য্য হইতে আরোগ্য, অগ্নি হইতে ধন, শঙ্কর হইতে জ্ঞান এবং জনার্দ্দন হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিবে।

সন্ন্যাসীগণের কঠোর সাধনার মধ্যে বঁটি বা আগুনের উপর ঝাঁপ, বাণফোঁড়া এবং পৃষ্ঠ ফুঁড়িয়া তাহার ভিতর দিয়া দড়ি চালাইয়া চড়কে ঘুরিবার ব্যবস্থাও আছে। ইংরাজশাসনে বাণফোঁড়া ও পিটফোঁড়া প্রায় উঠিয়া গেলেও অন্যান্য কঠোর সাধনা এখনও প্রচলিত আছে। খেজুর গাছে উঠিয়া কণ্টকের ভিতর দিয়া খেজুরের গাছের মাথার কচি পাতা কাটিয়া আনিবার প্রথা আজিও বিদ্যমান। এরূপ সাবধানে ও অক্ষতদেহে তাহারা ঐ কচিপাতা কাটিয়া আনে যে তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

যেখানে সন্ন্যাসীগণের আখড়া হয় তাহার নিকটে একটি মাটীর প্রকাণ্ড কুম্ভীর নির্ম্মিত হয় এবং তাহার গাত্রে ঝিনুক পুতিয়া উহাকে বীভৎস করিয়া তুলে। নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া কুম্ভীরকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাহার মুখে প্রতিদিন জল দেয়।

টঙ্কারধ্বনিমাত্রেণ সর্ব্ববীরঃ পলায়তে।
দ্রোণাচার্য্যসমো বীরো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥

সম্ভবতঃ কুম্ভীর ভয়াবহ জীবের প্রতিমূর্ত্তি মাত্র। সন্ন্যাস করিলে যে লোকে সর্ব্ববিধ ভয়শূন্য হইয়া অভয় প্রাপ্ত হয়, ইহাই উহার মূল তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়। সন্ন্যাসীকে প্রতিদিন শিবপূজা করিতে হয়; এবং এই মন্ত্রে তাঁহার ধ্যান করে।

ধ্যায়েৎ নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং
চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকরোজ্জ্বলাঙ্গং
পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈঃ ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং।

চড়কের দিন ভূতের জন্য ভাত রন্ধন করিয়া দিতে হয়। শিবের উপরেই দুর্গাপূজা হইয়া থাকে; এবং নিম্নলিখিত ধ্যানের মন্ত্র পাঠ করিয়া পুরোহিত পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, দীপ, নৈবেদ্য, পানার্থ জল, আচমনীয় ও তাম্বূল এই দশোপচার প্রদান করে এবং অষ্টমূর্ত্তির পূজাও করিয়া থাকে। দুর্গার ধ্যান—

অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে নমো নয়তু বন্ধনম্॥

তৎভদ্রকালৌ এতৎ পাদ্যং ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।

কেহ কেহ বলেন লীলাবতী ও কলাবতী শক্তিরই রূপভেদ মাত্র। কুম্ভীরমূর্ত্তি গঠন ও তাহার পূজা সকল দেশে হয় না। কোন কোন স্থানে হয়;

অনেকে বলেন উহা দেশাচার মাত্র। জবাকুসুম-সঙ্কাশং মন্ত্রে সূর্য্যপ্রণামেরও ব্যবস্থা আছে।

এক্ষণে দেখা যাউক চড়কগাছ কেন খাড়া করা হয়। তৎসম্বন্ধে নানা মত গবেষণার প্রভাবে উদ্ভাবিত। কেহ বলেন যে একটি বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল, তাই চড়ক গাছের উপরিতন অংশ ঘুরাইয়া দেখান হইল যে, বিশ্বচক্রও এই ভাবেই ঘুরিতেছে। চড়ক গাছ উহারই দ্যোতক মাত্র। কেহ বলেন যে বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রার্থনাচক্রের প্রচলন আছে। মুখে মুখে মন্ত্র জপ করিলে যেমন তাহা হইতে সাধক ফললাভ করেন, তেমনি প্রার্থনাচক্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যগত যষ্টি ভূমিতে বা পর্ব্বত-শিখরে প্রোথিত করিয়া তাহার উপরের অংশ ঘুরিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে তাহা হইতেও সাধকের ফললাভ হয়। যখন বায়ুবেগে ঐ চক্র ঘুরিতে থাকে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুণ্য লাভ হয়। কেহ বা বলেন পিঠ ফুঁড়িয়া চড়ক গাছে ঘুরিয়া জড়দেহের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন আত্মোৎসর্গের চরম দৃষ্টান্ত। ক্রুশ কাষ্ঠের সহিত চড়ক গাছের কতটা সৌসাদৃশ্য আছে তাহা ভাবিবার বিষয়।

গো-রক্ষার প্রয়োজন।

(১৭ বৎসরের বালকের রচনা)

গো-রক্ষা লইয়া চারিদিকে আন্দোলন-আলোচনা হইতেছে দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দিত হইলাম। গোধনই বলিতে গেলে ভারতের একমাত্র সম্বল, কিন্তু ভারতবর্ষ আসলে গোধনবিষয়ে কত দরিদ্র তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতেই বুঝা যাইবে—

প্রত্যেক একশত লোকের জন্য—

ব্রিটিশ ভারতে—মাত্র	৫৯
ডেনমার্কে „	৮৬
ক্যানাডায় „	১৪২
আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে	৭৫
নিউজিল্যাণ্ডে „	২৪০
অষ্ট্রেলিয়ায় „	২০০
আর্জেণ্টাইনে „	৩৩৮ *

সাত বৎসর পূর্ব্বেও (১৩২১ সালে) দেখিতে পাই যে তখন ব্রিটিশ ভারতে গড়ে প্রতি ১০০জনের জন্য ৬১টি করিয়া গরু ছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সাত বৎসরে প্রতি একশত লোকের জন্য দুইটি করিয়া গরু কমিয়া গিয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ৩৫,০০০০০০০ ; সুতরাং বলিতে হইবে সাত বৎসরে ৭০,০০০০ গরু কমিয়া গিয়াছে অর্থাৎ বৎসরে প্রায় গড়ে ১০,০০,০০ করিয়া গরু ভারত হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে গো-জাতি ক্রমশঃ কিরূপ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

উপরিউক্ত তালিকা দেখিলেই বেশ বুঝা যায় যে ভারতবর্ষকে গো-ধনে ধনী মনে করা মহাভুল। গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সংখ্যা হইতে জানা যায় যে, কর্ষণযোগ্য ভূমির মাত্র সিকি অংশ চাষ করিবার মত গরুও আমাদের দেশে নাই। ভারতবর্ষে কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ ২২৮০ লক্ষ একর। (এক একর=তিন বিঘা আধ কাঠা) এই দেশে গো-জাতির মোট সংখ্যা ১৪,৫৯,২২০০০। এখন অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য কারণে কতক জমি বাদ দিলেও ভারতবর্ষে প্রতি একজোড়া গরুকে অন্যূনপক্ষে ৫৭৷৷০ বিঘা জমি চাষ করিতে হয়। কিন্তু আসলে একজোড়া গরুর পক্ষে সওয়া চার বা পাঁচ বিঘার অধিক জমি চাষ করা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। কাজেই অনেক সারবান জমিও পড়িয়া থাকে।

ভারতবর্ষের মাত্র সিকির সিকি অংশ পরিমিত লোককে দুগ্ধ যোগাইবারও উপযুক্তসংখ্যক ধেনু এদেশে নাই।

এইরূপে সকল ক্ষেত্রেই গরুর সংখ্যা অনেক অল্প থাকা সত্ত্বেও প্রতিবৎসর এই ভারতবর্ষ হইতেই ৩২০০টি করিয়া গরু বিদেশে চালান দেওয়া হয়। সত্য বটে, ভারতের গোগণের সংখ্যা ১৪,৫৯,২২০০০ ; উহার নিকটে ৩২০০টি গরুকে সামান্য—সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ মনে হয়। কিন্তু আমাদের এখন যে অবস্থা, তাহাতে একটি মাত্র গরুকেও বিদেশে চালান দেওয়া যায় না। তাহার উপর মনে রাখিতে হইবে যে, যে গরুগুলিকে বিদেশে পাঠান হয় সেগুলি নিতান্ত 'পেলো' নহে। সমগ্র ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল গরু বাছাই করিয়াই বিদেশে চালান দেওয়া হয়।

কেবল ৩২০০টি গরুকে বিদেশে চালান দিয়া ক্ষান্ত থাকিলেও বা হইত, কিন্তু তাহা নহে। ইহার উপর আবার গোমাংসের জন্য লক্ষ লক্ষ গরু হত্যা করা হয়। কেবল দুইটীমাত্র প্রদেশের গোবধ উল্লেখ করিলেই ইহার ভীষণতা উপলব্ধি হইবে। এক বঙ্গদেশেই দুই লক্ষেরও উপর এবং যুক্তপ্রদেশে প্রায় দেড় লক্ষ গরু প্রতি বৎসর নিহত হয়। শুনিতে পাই, একা খিদিরপুরের অন্তর্গত মমিনপুর অঞ্চলে যে নূতন কসাইখানা (slaughter house) খোলা হইবে, সেখানে নাকি প্রত্যহ ৫০০ করিয়া গোহত্যা হইবে। তাহা হইলে তো এক কলিকাতাতেই প্রতিবৎসর এক লক্ষ আশী হাজার গরু নিহত হইবে। আশা করি

---

* Servant- ২১ ফাল্গুন ও ২৫ চৈত্র ১৩২৭।

এই গুজরটী সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে কি ভয়ানক ব্যাপার!

এইরূপ গোহত্যার ফলে আমাদের দেশের যে কি ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয় তাহা বলা যায় না। সকলেই জানেন আমাদের দেশে গোময় হইতে ঘুঁটে প্রস্তুত করিয়া তাহা জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। এই লক্ষ লক্ষ নিহত গরু জীবিত থাকিলে কত ঘুঁটে হইতে পারিত এবং তাহার ফলে কাঠ ও কয়লা কিনিতে আমাদের দেশের এখন যত ব্যয় হইতেছে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও তাহা লাঘব হইতে পারিত, ইহা বলা বাহুল্য। ঘুঁটে না করিলেও সেই গোময় যে সাররূপে ব্যবহৃত হইতে পারিত, এবং তাহার সাহায্যে যে সহস্র সহস্র বিঘা পতিত জমি—যাহা সারের অভাবে পড়িয়া আছে—'উঠিত' হইতে পারিত এবং বহুপরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়া আমাদের বর্ত্তমান অন্নসমস্যার যে অনেক পরিমাণে সমাধান করিতে পারিত তাহা কয়জন লোকে ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ডেনমার্ক জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশে গরু হইতে উৎপন্ন প্রত্যেক জিনিসটী সযত্নে ব্যবহৃত হয় বলিয়া সেই সকল দেশে সমস্ত দেশের প্রাণধারণের উপযোগী শস্য হইয়াও এত অধিক বাঁচে যে সেগুলি বিদেশে রপ্তানি হয়, আর দেশগুলি স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া পড়ে। ফলে নিহত লক্ষ লক্ষ গরু বাঁচিয়া থাকিলে সামান্য গোময় হইতেই কত লাভ হইতে পারিত। তাহার উপর ঐ লক্ষ লক্ষ গোবধ না করিলে দুগ্ধাদিলাভও যে না হইত এমন নহে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, গোহত্যার ফলেই ঘৃত দুগ্ধ প্রভৃতি উত্তরোত্তর দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার ফলে আমরা জাতিহিসাবে ধ্বংসের মুখে চলিয়াছি। ১৩২২ সালে দুগ্ধের সের তিন আনা ছিল, ইহার তিন বৎসর পরে দুগ্ধের সের পাঁচ আনা হয়, গত বৎসর উহা ৮ আনা সেরে বিক্রয় হইয়াছে; কিন্তু এখন দশ আনা দিলেও এক সের খাঁটি দুগ্ধ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে টাকায় সাড়ে তিন সের গব্য ঘৃত পাওয়া যাইত কিন্তু এখন টাকায় ছয় ছটাক মাত্র পাওয়া যায়।

গোহত্যার ফলে চাষোপযোগী বলীবর্দ্দেরও অভাব পড়িয়াছে; সুতরাং ভালরূপ চাষ না হওয়ায় শস্যাদিও ভাল হইতে পারিতেছে না। কাজেই অন্নাদির অভাবে আমরা জাতিহিসাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। এই ভাবে চলিতে থাকিলে আমরা দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইতে থাকিব; ফলে জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে না পারিয়া আমাদিগকে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইতে হইবে ইহাই আশঙ্কা হয়।

কিন্তু লোপ পাইলে চলিবে না—আমাদিগকে বাঁচিতেই হইবে, জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতেই হইবে; অতএব যাহা আমাদিগকে ধ্বংস করিতে উদ্যত তাহাকেই ধ্বংস করিতে হইবে। আমরা দেখিতেছি গোহত্যা প্রভৃতিই আমাদিগের ধ্বংসের প্রধান কারণ, অতএব সেইগুলিকেই প্রতিরুদ্ধ করিতেই হইবে। বিদেশে গরু চালান দেওয়াও একরূপ গোহত্যার তুল্য, কারণ তাহার ফলেও আমাদের দেশ অনেকগুলি গরুর সাহায্যলাভে বঞ্চিত হয়। সুতরাং তাহাও বন্ধ করিতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধী চরকার উপর ভারত উদ্ধারের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছেন দেখা যায়। দেশের কাপড় দেশে প্রস্তুত হওয়া অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে? কিন্তু একটি বিষম সমস্যা এই যে, সুতা পাই কোথা হইতে? কার্পাসের ভাল চাষ না হইলে সুতা প্রস্তুত করা অসম্ভব। সেই কার্পাসচাষের জন্য গরু দরকার। এই প্রকার যে দিকে চাই—অন্নের জন্যই হৌক্ বা বস্ত্রের জন্য হৌক্—সেইদিকেই মূলে গোধন রক্ষা আবশ্যক দেখি—গোধনের উন্নতি বা অবনতির সহিত ভারতবর্ষের উন্নতি বা অবনতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখি। ভারতবাসীকে বাঁচিতে হইলে গোধনকেও বাঁচাইতে হইবে।

এই গোধন রক্ষা কেবল ভারতীয় হিন্দুর কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে, কিন্তু জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীরই ইহা একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।* আমরা চাহি যে, সকল ধর্ম্মের সকল লোক সমবেত হইয়া প্রতিজ্ঞা করুন যে হত্যার জন্য কিছুতেই গরু বিক্রয় করিব না; গাভী বা বৃষ প্রাণপণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। আমাদের দারিদ্র্যের একটি প্রধান কারণ হইল গোধন রক্ষায় অবহেলা। মজা এই যে, আমরা দরিদ্র হইতেছি বলিয়া ব্যয়বাহুল্যের ভয়ে গোধন রক্ষায় মনোযোগ দিতেছি না, আবার গোধনরক্ষায় মনোযোগ না দেওয়াতেই দিন দিন আরও দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি—নানা দিকে ব্যয়বাহুল্য অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িতেছে।

গোরক্ষা যে জীবনসংগ্রামে জয়ী করিবার

---

* সে দিন মহাকালী গোরক্ষণী সভার উদ্যোগে কলিকাতা বাগবাজারে একটী বিরাট গোরক্ষণী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভাপতি সার আশুতোষ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার গৃহীত প্রস্তাব এই—বর্ত্তমান সময়ে সামরিক বিভাগের ও অন্যান্য লোকের ভোজনার্থ যেরূপ অবাধে গাভী, বৃষ ও গোবৎস হত্যা করা হইতেছে এই সভা তাহা সংযত করিবার প্রার্থনা করিতেছে; কারণ ইহা হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী এবং ইহাতে দেশের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইতেছে।" আমরা এরূপ ভাবের প্রস্তাবের তত পক্ষপাতী নহি। হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিলে খৃষ্টান বা মুসলমান তাহাতে সমস্ত হৃদয়ের সহিত যোগ দিবে কিরূপে?

একটি প্রধান প্রয়োজনীয় উপকরণ তাহা পৃথিবীর অন্য অন্য দেশও এখন বুঝিতে পারিতেছে। এই সেদিন বিজ্ঞানে অত্যুন্নত জার্ম্মানিও স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছে যে, জার্ম্মানিতে গোধনের রক্ষা-সাধন না করিলে জার্ম্মাণি ধ্বংস হইয়া যাইবে—বিজ্ঞানও উহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সকল দেশই ইহা বুঝিয়া গোধন রক্ষায় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে; কেবল আমরাই—যাহাদের গোধনই একমাত্র নির্ভর ও সম্পত্তি—আমরাই পিছাইয়া পড়িয়া আছি। কিন্তু পিছাইলে আর চলিবে না—গোধন রক্ষা করিতেই হইবে। গবর্ণমেণ্টের দ্বারা উহা হউক বা না হউক আমাদিগকে গোরক্ষা-বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেই হইবে।

প্রায় সকলস্থলেই গোয়ালারা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উপায়ে গরুর সমস্ত দুগ্ধ দুহিয়া লইয়া গরুটিকে কসাইএর নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। কসাইও মাংসের জন্য উহাকে হত্যা করে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে এই দেশ হইতে গোজাতি লুপ্ত হইতেছে। মহাত্মা গান্ধি যদি কসাইদিগকে এই গোবধ হইতে নিরস্ত করিতে পারেন, তবে সমস্ত দেশবাসী জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিবে।

দেশে অনেক গোশালা আছে বটে কিন্তু সেই সব গোশালার ব্যবস্থাদোষে অধিকাংশ স্থলেই উপকার অপেক্ষা অপকার অধিক হয়। এই সকল গোশালার অধিকাংশই গোগণকে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত। তাহাদের অধিকাংশ পরিচালকই বিশেষ আয়ের অভাবের কারণে গোশালার উপর অধিক ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন। কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে ঐ সকল গোশালা হইতে যথেষ্ট আয় নিশ্চয়ই হইতে পারে। যে কোনও বুদ্ধিমান্ পরিচালক স্বীয় গোশালায় রক্ষিত গোগণের দ্বারা বেশ লাভজনক ব্যবসা চালাইতে পারেন—চাই কেবল গোধন রক্ষার বিষয়ে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়া একান্ত চেষ্টা। আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে---গোজাতির উন্নতিতেই ভারতের উন্নতি এবং গোরক্ষার অভাবেই ভারতের মহাসর্বনাশ।

উন্নতি-প্রসঙ্গ।

মদ্যপান নিবারণ। আমরা চিরকালই মদ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার মাদকদ্রব্য সেবনের বিরুদ্ধে বলিয়া [illegible] বড়ই আনন্দের বিষয় যে মহাত্মা গান্ধীর ইণ্ডিয়ার অনেক স্থান হইতে সুরাপান বন্ধ হইবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু বেহার-উড়িষ্যার গবর্ণমেণ্ট যেন আবকারীর আয় বন্ধ হইবে বলিয়া একটু সন্ত্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা চক্ষের উপর আমেরিকা প্রভৃতি দেশে সুরাপান বন্ধ হইবার সুফল দেখিয়াও কেন যে ভয় পাইতেছেন বুঝি না। সুরা পান না করিলে পয়সার অপব্যয় করিতেও ইচ্ছা হইবে না এবং কাজেই পয়সা ঘরে থাকিলে গৃহেও স্বাচ্ছন্দ্য আসিবে এবং তখন অন্য পাঁচ দিকে খাটিয়া রোজগারের একটা প্রবৃত্তি আসিবে। তখন আবকারী ছাড়িয়া অন্যান্য প্রকারে তাহারা রাজকোষ পূর্ণ করিতে প্রস্তুত থাকিবে—সেটা যে একটা পরম লাভ। এই সহজ কথাটা গবর্ণমেণ্ট বুঝিলে তাঁহাদেরও লাভ, আমাদেরও লাভ। নতুবা মদমাতাল হইয়া লোক ধ্বংস হইয়া গেলে গবর্ণমেণ্টের কি সুসার হইবে?

অস্পৃশ্য জাতি—ঈশ্বরের ন্যায়ের রাজ্যে কোনও জাতি বা মনুষ্য চিরজীবনের জন্য পদদলিত থাকিতে পারে না। মনুষ্য নিজকর্ম্ম দ্বারাই স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য হয়। জন্মমাত্রেই কেহ অস্পৃশ্য হইতে পারে না। গুজরাট অঞ্চলে পারিয়া প্রভৃতি জাতি আছে, তাহাদিগকে এতদিন কোনও উচ্চশ্রেণীর হিন্দু স্পর্শও করিত না। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সম্পাদিত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যে, গুজরাট পরিভ্রমণের সময়ে তিনি পারিয়া প্রভৃতির প্রতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের সুব্যবহার দেখিয়া যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিয়াছে না। কালোল নামক স্থানে 'অস্পৃশ্যগণের' নিকট বক্তৃতাকালে তিনি দেখেন যে, অনেক গোঁড়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুও তথাকথিত অস্পৃশ্যগণের সহিত মিশিয়াছিলেন। শিশোদরা গ্রামে ইহা অপেক্ষাও উচ্চ অঙ্গের মিলন হইয়াছিল। সেখানে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। 'অস্পৃশ্য'-গণ দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ ঐ অস্পৃশ্যগণকে আপনাদের মধ্যে সাদরে আহ্বান করিয়া লইলেন। যখন তাঁহারা উচ্চহিন্দুগণের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন একজনও হিন্দু ঘৃণায় অল্পমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই। চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের প্রায় সকল ব্যক্তিই সেই বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু কেহই সামান্যমাত্রও ঘৃণা প্রকাশ করেন নাই। শ্রীবল্লভ ভাই প্যাটেল ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া—'অস্পৃশ্য'গণ যে সকলেরই স্পৃশ্য ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিবার জন্য, যাঁহাদের ইহাতে মত আছে তাঁহাদিগকে স্বীয় স্বীয় হস্তোত্তলন করিতে বলেন। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য হস্ত উঠিল—সকলেই 'অস্পৃশ্য'গণকে স্পর্শ করিতে স্বীকার করিলেন।

বাদোলীতেও ঠিক এই ভাবেই অস্পৃশ্য জাতির অস্পৃশ্যত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন অস্পৃশ্যজাতির লোপ হইয়াছে—এখন 'অস্পৃশ্য' বলিয়া কোনও জাতিই নাই, সকলেই স্পৃশ্য। ইহাই ভারতে সত্যযুগের সূচনা করিয়া দিবে বলিয়া আশা করা যায়।
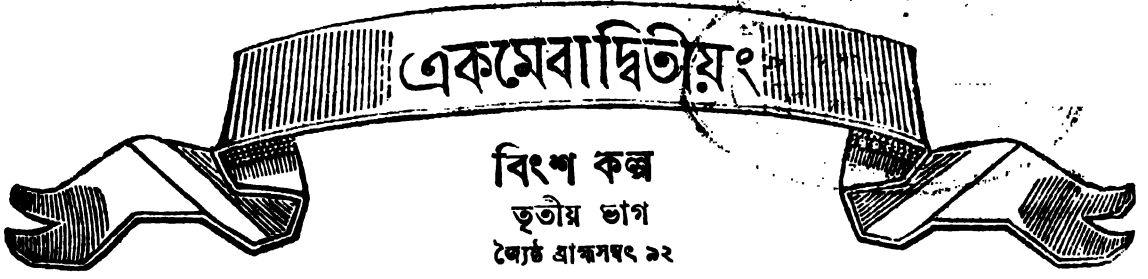
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেদিন আবার।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সেদিন আবার—আবার সেদিন
আসিবে—আবার আসিবে।
জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে মাথা উঁচু ক'রে
ভারতের বীর—
আবার জাগিবে।
স্বাধীনতা সাম্য ভারতের প্রাণে
আবার—আবার—
ফুটিয়া উঠিবে॥
সরলতা যাহা আছিল ভারতে—
কি সুখের আহা!—
পুন দিবে দেখা।
আপন গৌরবে দাঁড়াইব মোরা—
কে দিবে রে বাধা—
ধরিব জয়পত্রলেখা॥
কোথা হিমাচল কুমারিকা কোথা—
পরাণে পরাণে
ভারত আবার মিলিবে।
হিন্দু মুসলমান কেবা রে খৃষ্টান—
সবাই সন্তান
একই যে মায়ের বুঝিবে॥
এ মিলন ভাল জমাট বাঁধিবে—
কোন দেশ আর
পারিবে না দাঁড়াতে কাছে।
চলিবে এগিয়ে বিদ্যুতের বেগে
ধরমে করমে—
চিত্ত তাই নাচে রে নাচে॥
বিচ্ছেদের পর মিলিবে ভায়েরা
খুলে যাবে প্রাণ—
প্রেমের রবে নাকো সীমা।
হইবে দেবতা পরতে পরতে—
রবে নাকো ভেদ—
জাগিবে আপন মহিমা॥
জাগিবে ভারতে নূতন মানুষ—
নিজ বলে বলী নূতন পুরুষ
নূতন ভাবের নূতন মহিলা—
ভারতের যিনি চির ভগবান
দেখাবেন তিনি নব নব লীলা॥
দেহে বজ্রসম প্রাণে ঢলঢল।
প্রবল সাহসে চরিত্রে অটল॥
সুনম্র বিনয়ে আকারে সুন্দর।
যুবক যুবতী হাজার হাজার
জাগিয়া উঠিবে ধরমে সবল।

স্বর্ণযুগ লয়ে সোণার ভারত
দেখিও—আবার জাগিবে।
ভারতে সেদিন দেবঋষি যত
এক প্রাণে মিলি' খেলিবে॥

ভক্ত-সহবাস।

(ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ জি ভাণ্ডারকর লিখিত প্রবন্ধের শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদ)

পরমেশ্বরে আপন শ্রদ্ধা দৃঢ় করিয়া, তাঁহার উন্নত, মঙ্গল ও আনন্দময় স্বরূপের সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহাতে নিমগ্ন হইবে এবং সংসার-ভীতি হইতে উত্তীর্ণ হইবে। ইহা বিনা উপায়ে মনুষ্যের সাধ্য হয় না। অনেক কারণে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস হইলেও সেই জ্ঞান কেবল শাব্দিক কিংবা আনুমানিক হইয়া অবস্থিতি করে। অন্তঃকরণে তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হওয়া উহা হইতে ভিন্ন। এবং এইরূপ উপলব্ধি না হইলে মনুষ্যের অন্তর্বৃত্তি ও আচরণ পবিত্র হয় না। যে পরিমাণে উপলব্ধি অধিকাধিক স্পষ্টরূপে হয় সেই পরিমাণে মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্তঃকরণ উন্নত হয়।

এই শাব্দিক জ্ঞান যাহাতে উপলব্ধিমূলক জ্ঞান হয় তাহার উপায় কি? নিয়মিতরূপে পুনঃ পুনঃ তাঁহার আরাধনা করা, তাঁহার নাম ও প্রভাব কীর্ত্তন করা, একান্তে বসিয়া তাঁহার স্বরূপের ধ্যান করা, বারবার আপন অন্তঃকরণের পরীক্ষা করা, এবং দোষ দেখিলে তাহার নিবারণকল্পে অকপটভাবে যত্ন করা, আপন ঐহিক অনিষ্ট হইলেও সত্যকেই অনুসরণ করিয়াই কার্য্য করিবার চেষ্টা করা, ইত্যাদি অনেক উপায় আছে। কিন্তু ধ্যান করিবার সময়, অন্তঃকরণের সম্মুখে পরমেশ্বরের উন্নত স্বরূপ খাড়া রাখিতে হইবে; তাহা না থাকিলে আমাদের ঐহিক বিষয়ই সম্মুখে স্ফুর্ত্তি পায় এবং যত্নপূর্ব্বক তাহা মন হইতে দূর করিলে কেবল শূন্য দেখা যায়—ভজন ও প্রার্থনা করিবার সময়েও মুখস্থ কতকগুলা শব্দ বাহির হয় মাত্র কিন্তু তাঁহার স্বরূপ হৃদয়ে আবির্ভূত হয় না। তবে সেই সময় যাহাতে তাহা আবির্ভূত হয় এবং সর্ব্বত্র পরমেশ্বরকে দেখিয়া মন তন্ময় হয়, ধ্যান করিবার সময় যাহাতে তাহা হৃদয়ের সম্মুখে স্ফুর্ত্তি পায়, এই সম্বন্ধে বারংবার অন্তঃকরণকে পরীক্ষা করা ও সত্যকে অনুসরণ করিয়া কাজ করা—এই দুই উপায় খুব উপযোগী।

আরও এক প্রকৃষ্ট উপায় আছে যাহাতে আমাদের চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া পরমেশ্বরে তাহা দৃঢ় সংলগ্ন করা যাইতে পারে। সে উপায় সাধুসঙ্গ। সাধুব্যক্তি অর্থাৎ যাহার মন পরমেশ্বরে স্থির হইয়াছে এইরূপ যে পরমেশ্বরের ভক্ত তাঁহার সঙ্গ লাভ করিবে, আপনার ওঠা-বসা তাঁহার সহিত করিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহার সহিত পরমেশ্বর সম্বন্ধে সম্ভাষণ করিবে। নারদপঞ্চরাত্র নামক প্রকরণের কোন এক সংহিতা আছে, তাহাতে জ্ঞানামৃতসার নামে এক প্রকরণ আছে। তাহাতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

> যথা বৃক্ষলতানাং চ নবীনঃ কোমলাঙ্কুরঃ॥
> বর্দ্ধতে মেঘবর্ষেণ শুষ্কঃ সূর্য্যকরেণ চ।
> তথৈব ভক্তালাপেন ভক্তিবৃক্ষনবাঙ্কুরঃ।
> বর্দ্ধতে শুষ্কতাং যাতি চাভক্তালাপমাত্রতঃ।
> তস্মাদ্ ভক্তসহালাপং কুরুতে পণ্ডিতঃ সদা॥

"যথা মেঘবর্ষণে বৃক্ষলতাদিগের নবীন কোমল অঙ্কুর বর্দ্ধিত হয় এবং সূর্য্যকরের দ্বারা তাহা শুষ্ক হয়, সেইরূপ ভক্তের সহিত আলাপে ভক্তি-বৃক্ষের নবাঙ্কুর বর্দ্ধিত হয় এবং অ-ভক্তদিগের সহিত আলাপে তাহা শুষ্ক হয়। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি ভক্তের সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিবেক।" তাহা হইলে, ভক্তি বিবর্দ্ধিত হইয়া পরমেশ্বরের সহিত পরিচয় যাহাতে অধিক হয়—এই ইচ্ছা থাকিলে, ভক্তের সহিত সহবাস করা আবশ্যক। পরমেশ্বরের যাহারা ভক্ত তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরের সহিত পরমেশ্বর সম্বন্ধে আলাপ করিবেন, পরস্পরের সংশয় নিরাকরণ করিবেন, একত্র মিলিয়া তাঁহার ভজনা করিবেন, প্রার্থনা করিবেন। এইরূপে সকলের ভাব, সকলের ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রকার হইলে, কোন কোন পথ-চলতি মানুষেরও ঐখানে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হইবে। তাহার পর, যাঁহারা ঐরূপ করেন তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া পরমেশ্বরে দৃঢ় হইবে, এই বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে?

ভাগবতে পরমেশ্বর নারদকে বলিতেছেন এই প্রকারের এক উক্তি আছে; তাহা এই—

> নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ।
> মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

"হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগী-

দিগের হৃদয়েও নহে, আমার ভক্ত যেখানে আমার গান করে সেইখানেই আমি বাস করি।” ইহার তাৎপর্য্য, ভক্তেরা একত্র মিলিয়া একনিষ্ঠায় পরমেশ্বরের ভজন করিবার সময় যেরূপ তাঁহাদের মন পরমেশ্বরে লগ্ন হয় এবং প্রত্যেকের অন্তঃকরণে তাঁহার স্বরূপের আবির্ভাব হয়, সেরূপ কেবল একাকী ধ্যান করিয়া হয় না; এবং পরমেশ্বর নিরবয়ব ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তিনি বৈকুণ্ঠের ন্যায় অমুক কোন স্থলের সহিত বদ্ধ নহেন। ভগবদ্গীতাতেই উক্ত হইয়াছে :—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

১০-৮-৯-১০

“আমি সকলের উৎপাদক, আমা হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—ইহা মানিয়া ভাবসমন্বিত বুধেরা আমাকে ভজনা করেন; আমাতে চিত্ত লগ্ন করিয়া, আমাতে প্রাণ অর্পণ করিয়া পরস্পরকে উপদেশ করেন এবং এইরূপে সন্তোষ লাভ করেন, আনন্দ লাভ করেন; এইরূপে যাহারা একনিষ্ঠাসহকারে প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে সতত ভজনা করেন আমি তাঁহাদিগকে এরূপ বুদ্ধি দিই যে সেই বুদ্ধিযোগে তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।” এইরূপে পরমেশ্বরে চিত্ত প্রয়োগ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত আলাপ করা, তাঁহার ভজনা করা—ইহারই যোগে তাঁহাকে পাওয়া যায়—এই কথাই গীতাকার উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহার লেখা অনুসারে আমরা যদি কাজ করি তাহা হইলে আমাদেরও ঐরূপ উপলব্ধি হইবে।

কিন্তু পরমেশ্বরের উপর আমাদের শ্রদ্ধা স্থাপন করা এবং উত্তরোত্তর তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য—এইরূপ যাঁহারা স্বীকারও করেন, তাঁহারাও এই বিষয়ের উপেক্ষা করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা কেবল ঐহিক ঐশ্বর্য্যই ঐ বিষয়ের সাধনীভূত হইবে ইহা ঠিক্ নহে—উহা অংশতঃ সম্পাদন করিতে হইবে, উহা মুখ্য পুরুষার্থ নহে—এই কথার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাঁহাদের অন্তঃকরণে ভক্তির অঙ্কুর অল্প বাহির হইয়াছে, উহার বিস্তার করিয়া উহাকে বৃক্ষে পরিণত করিবার চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। এবং ইহা করিবার যে মুখ্য উপায় আমি বলিয়াছি তাহা অবলম্বন করিলে এরূপ এক ভক্তসমাজ গঠিত হইবে যে, তাহার অন্তর্ভূত সকল ব্যক্তিই পরস্পরের সহিত প্রেমভাবে বদ্ধ হইয়া পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে এবং তাহার পর বড় বড় কাজ করিতে তাহারা সমর্থ হইবে। এইরূপ না করিয়া সর্ব্বপ্রকারে অবহেলা করিলে, ঐ অঙ্কুর শুকাইয়া যাইবে এবং সেই সমাজের আদৌ বল থাকিবে না। তার পর, সেই সমাজ শুদ্ধ বাহ্যতঃ সমাজ বলিয়া আখ্যাত হইবে মাত্র, প্রকৃত সমাজ হইবে না। ভক্তের সহবাস না করিয়া অভক্তের সহবাস করিলে নানা প্রকার দোষ আমাদের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইবে। যিনি পণ্ডিত তিনি—

যাত্যেবাভক্তসংসর্গাদ্দুষ্টসর্পাদ্ যথা নরঃ।

“দুষ্ট সর্প হইতে যেরূপ কোন মনুষ্য দূরে থাকে সেইরূপ অ-ভক্তের সহবাস হইতে দূরে থাকেন।” কারণ—

সংচরন্তি চ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসা।
সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্ত্যেব হি জীবিনাম্॥

“অ-ভক্তের সহিত সহবাস করিলে, তৈলবিন্দু যেরূপ জলের মধ্যে বিস্তার লাভ করে সেইরূপ পাপ আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া বিস্তার লাভ করে। প্রাণীদিগের গুণ ও দোষ সংসর্গ হইতে উৎপন্ন হয়।”

তস্মাৎ সতাং হি সংসর্গং সন্তো বাঞ্ছন্তি সততং।

“তাই, সাধু যে, সে সাধুর সংসর্গই ইচ্ছা করে” এই কথার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, যাহাদের অন্তঃকরণে ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাব একটুও নাই তাহাদের সহিত সহবাস না করিয়া, যাহাদের মনে ঐ ভাব আছে তাহাদের সহিত সংসর্গ করিয়া, তাহাদের সহিত একভাবে পরমেশ্বরের চিন্তন ভজন ও নামগান করিবেক; এইরূপ করিলে আমাদের ভাবের বৃদ্ধি হইবে এবং অন্তঃকরণও পরিশুদ্ধ হইবে; এবং এই বিষয়ে উপেক্ষা করিলে, কেবল সাংসারিক যে মনুষ্য, তাহার সহিত, কিংবা নাস্তিক যে, তাহার সহিত অবস্থিতি করিলে, জীবনের যে মুখ্য ফল তাহা হইতে আমরা বিচ্যুত হইব।

গান।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

মানুষ ছাড়লে কি হবে মা,
তুমি যদি নাইক ছাড়!
মানুষ মারলে কি হবে মা,
তুমি যদি নাইক মার!
মানুষ থাক্ মানুষ নিয়ে,
থাকব মোরা মায়ে-ছেলে!
সবার হেলা হেলাই করি,
তোমার স্নেহ শুধু পেলে!

কারও মুখ চাইনে আর
ও মুখ যদি বুকে হাসে!
সকল আলো নিভলে, ভাল
তোমার আলো প্রাণে ভাসে!
আজকে তাই চুকিয়ে যত
লেনা দেনা ধরার ধার,
ঘরের ছেলে ফিরল ঘরে,
নে মা, কোলে একটীবার!

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

একাদশ বা ব্রহ্মের প্রাণশব্দবাচ্যত্ব অধিকরণ।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিএ)

সূত্র। প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥ ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্ ॥২৯॥ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥ ৩০ ॥ জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ ॥ ৩১ ॥

টীকা। একাদশাধিকরণমারচয়তি—
প্রাণোঽস্মীত্যত্র বায়্বিন্দ্রজীবব্রহ্মসু সংশয়ঃ।
চতুর্ণাং লিঙ্গসদ্ভাবাৎ পূর্বপক্ষস্ত্বনির্ণয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
ব্রহ্মণোঽনেকলিঙ্গানি তানি সিদ্ধান্যনন্যথা।
অন্যেষামন্যথাসিদ্ধের্ব্যুৎপাদ্যং ব্রহ্ম নেতরৎ ॥৩৮॥

কৌষীতকীনামুপনিষদীন্দ্রপ্রতর্দনাখ্যায়িকায়াং প্রতর্দনং প্রতীন্দ্রো বক্তি—"প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মাং আয়ুরমৃতং ইত্যুপাস্ব" ইতি। তত্র চতুর্বিধলিঙ্গবলাচ্চতুর্ধা সংশয়ঃ। "ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" ইতি প্রাণবায়োর্লিঙ্গং। 'অস্মি' ইতিবক্তুরিন্দ্রস্যাহংকারবাদ ইন্দ্রলিঙ্গং। "বক্তারং বিদ্যাৎ" ইতি বক্তৃত্বং জীবলিঙ্গং। "আনন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইতি ব্রহ্মলিঙ্গং। তত্র প্রাবল্যদৌর্বল্যবিবেকাভাবাদনির্ণয়ঃ ইতি পূর্বপক্ষঃ।

সিদ্ধান্তস্তু সন্ত্যত্র ব্রহ্মণোঽনেকলিঙ্গানি। তদ্‌যথা—"ত্বমেব মে বৃণীষ যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে" ইতি হিততমত্বমেকং লিঙ্গং। "যো মাং বিজানীয়াৎ নাস্য কেনচন কর্মণা লোকো মীয়তে ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ইতি জ্ঞানমাত্রেণ মহাপাতকাদ্যলেপোঽপরং লিঙ্গং। এবমন্যান্যপি লিঙ্গান্যুদাহর্তব্যাণি। ন চৈতানি প্রাণেন্দ্রজীবপক্ষেষু কথঞ্চিদপ্যুপপাদয়িতুং শক্যন্তে প্রাণাদিলিঙ্গানি তু ব্রহ্মণ্যুপপদ্যন্তে প্রাণাদীনাং ব্রহ্মবোধদ্বারত্বাৎ। তথা সতি ব্রহ্মলিঙ্গানামনেকত্বাদনন্যথাসিদ্ধত্বাচ্চ প্রাবল্যং। তস্মাৎ ব্রহ্মৈবাত্র ব্যুৎপাদ্যং ন প্রাণাদি ইতি সিদ্ধং।

ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীভারতীতীর্থমুনিপ্রণীতায়াং বৈয়াসিকন্যায়মালায়াং
প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥ ১ ॥

সূত্রের অনুবাদ। প্রাণ (ব্রহ্ম) ব্রহ্মপরস্বরূপে অনুগম (বা অবগতি) হেতু ॥ ২৮ ॥ বক্তার আত্মোপদেশ হেতু নহে, ইহা যদি বল, (তাহা নহে কারণ) ইহাতে (এই অধ্যায়ে) অধ্যাত্মসম্বন্ধের বাহুল্য আছে ॥ ২৯ ॥ শাস্ত্রদৃষ্টিতে কিন্তু উপদেশ (দেওয়া হইয়াছে) বামদেবের ন্যায় ॥৩০॥ জীব এবং মুখ্যপ্রাণের পরিচায়ক চিহ্ন হেতু নহে ইহা যদি বল, তাহা নহে, ত্রিবিধ উপাসনা (সম্ভব হওয়া) হেতু, আশ্রিত হওয়া হেতু, এস্থলে তাহার (ব্রহ্মলিঙ্গের) যোগ হেতু ॥ ৩১ ॥

টীকার অনুবাদ। একাদশ অধিকরণ রচিত হইতেছে—

"আমি প্রাণ" এই শ্রুতিতে বায়ু, ইন্দ্র, জীব অথবা ব্রহ্ম (উদ্দিষ্ট, ইহাই হইল) সংশয়। চারিটীতেই পরিচায়ক চিহ্নের অস্তিত্ব আছে বলিয়া পূর্ব্বপক্ষ নির্ণয় করিতে অক্ষম। ব্রহ্মের অনেক পরিচায়ক চিহ্ন, সেগুলি অন্যথা সিদ্ধ হয় না। অপর

চিহ্নগুলির অন্যপ্রকারে সিদ্ধিহেতু ব্রহ্মই বিবক্ষিত, অপর কিছু নহে ॥

কৌষীতকীদিগের উপনিষদে ইন্দ্র-প্রতর্দন-বিষয়ক আখ্যায়িকাতে ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিতেছেন—"আমি প্রাণ, প্রজ্ঞানস্বরূপ, সেই আমাকে আয়ু, অমৃত, এইভাবে উপাসনা কর।" সেই (আখ্যায়িকাতে) চারিপ্রকার পরিচায়ক চিহ্ন থাকিবার কারণে চারিপ্রকার সংশয় (উঠিতেছে)। "এই শরীর পরিগ্রহণ করিয়া উত্থাপিত করিতেছে" এই শ্রুতিতে প্রাণবায়ুর লিঙ্গ বা পরিচায়ক চিহ্ন (পাওয়া যাইতেছে)। "আমি", বক্তা ইন্দ্রের এই অহংকারসূচক উক্তিতে ইন্দ্রের লিঙ্গ (পাওয়া যাইতেছে)। "বক্তাকে জানিবে" এই শ্রুতিতে বক্তার ভাব জীবের লিঙ্গ। "আনন্দস্বরূপ, অজর, অমৃত" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের লিঙ্গ (পাওয়া যায়)। সে-স্থলে (উপরোক্ত শ্রুতিসমূহে) প্রাবল্য ও দৌর্ব্বল্য-বিষয়ক বিচারের অভাবহেতু কিছুরই নির্ণয় হইতেছে না—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ (বলিতেছেন)।

সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন—এস্থলে ব্রহ্মের অনেক লিঙ্গ বা পরিচায়ক চিহ্ন আছে। উদাহরণ যথা—"তুমিই আমার জন্য বর প্রার্থনা কর, যাহা তুমি মনুষ্যের পক্ষে হিততম বোধ কর,"—এস্থলে হিততমত্ব একটী লিঙ্গ হইল। "যে আমাকে জানিবে, তাহার কোন কর্ম্মের দ্বারা লোক (সুকৃতি) বিনষ্ট হয় না, মাতৃবধের দ্বারা নহে, পিতৃবধের দ্বারা নহে", এই জ্ঞানমাত্রের দ্বারা মহাপাতকাদির সংস্পর্শ-রাহিত্য হইল আর একটী লিঙ্গ। এই প্রকার আরও অনেক লিঙ্গের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল লিঙ্গ প্রাণ, ইন্দ্র ও জীবপক্ষে কোন প্রকারেই উপপন্ন হইতে পারে না, কিন্তু প্রাণাদি লিঙ্গ ব্রহ্মেতে উপপন্ন হয়, কারণ প্রাণ প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বার। কাজেই ব্রহ্মলিঙ্গ অনেক হওয়াতে এবং অন্য কোন প্রকারে সিদ্ধ হইতে না পারায় (ব্রহ্মলিঙ্গসমূহের) আধিক্য। অতএব এস্থলে ব্রহ্মই বিবক্ষিত, প্রাণাদি নহে, ইহাই সিদ্ধ হইল।

তাৎপর্য্য। কৌষীতকী উপনিষদে এই একটী আখ্যায়িকা আছে যে, দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দ্দন পৌরুষ সহকারে যুদ্ধ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। স্বর্গরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে বর দিতে উদ্যত হইলে প্রতর্দ্দন বলিলেন যে তিনি বর চাহেন না; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ইন্দ্রকে বলিলেন—"তুমিই আমার জন্য এমন বর প্রার্থনা কর যাহা তুমি মনুষ্যের পক্ষে হিততম বোধ কর।" তদুত্তরে ইন্দ্র তাঁহাকে এই ভাবের অনেক কথা বলিলেন—"আমাকেই জান, আমাকে জানাই মনুষ্যের পক্ষে হিততম; আমিই প্রাণ, প্রজ্ঞানস্বরূপ" ইত্যাদি। পূর্ব্বপক্ষ এস্থলে এই সন্দেহ উঠাইলেন যে, এই শ্রুত্যুক্ত "প্রাণ" শব্দে কাহাকে বুঝাইতেছে? প্রাণশব্দের অর্থে পূর্ব্বপক্ষের মতে এই প্রকরণে প্রাণবায়ু, ইন্দ্র, জীব ও ব্রহ্ম, চারিটী বিষয়ই বুঝাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপে তিনি বলেন—এই আখ্যায়িকাতেই একটী শ্রুতি আছে—"প্রজ্ঞানস্বরূপ প্রাণই এই শরীর পরিগ্রহ করিয়া (ইহাকে) উত্থাপিত করে।" এস্থলে শরীর উত্থাপনের কথা আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে প্রাণবায়ু দ্বারাই শরীরের ক্রিয়াসকল নিষ্পাদিত হয়। তাই পূর্ব্বপক্ষ বলেন যে এই শ্রুতিতে প্রাণশব্দে প্রাণবায়ুই উপলক্ষিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

যে শ্রুতির উপর এই অধিকরণ অবলম্বিত হইয়াছে, সেই শ্রুতিতে আছে "আমিই প্রাণ (প্রাণোঽস্মি)। এই শ্রুতির বক্তা হইতেছেন ইন্দ্র। কাজেই বলিতে হয় যে ইন্দ্র নিজেকেই এখানে প্রাণ বলিয়া জানাইতেছেন।

এই আখ্যায়িকারই একস্থলে আছে যে "বাগিন্দ্রিয়কে জানিতে ইচ্ছা করিও না, বক্তাকে জানিবে।" উভয় পক্ষেরই মতে এস্থলে বক্তা অর্থে প্রাণকেই বুঝাইতেছে, কেননা এই আখ্যায়িকাতেই আর একটী শ্রুতি আছে—"এই ভূতমাত্রা বা বিষয় প্রজ্ঞামাত্রা বা ইন্দ্রিয়ে অর্পিত এবং ঐ প্রজ্ঞামাত্রা বা ইন্দ্রিয়সকল প্রাণে অর্পিত।" ইন্দ্রিয়সকল প্রাণে অর্পিত, ইহার অর্থে প্রাণই ইন্দ্রিয়ের প্রেরক বুঝাইতেছে। উপরোক্ত "বাগিন্দ্রিয়কে জানিতে ইচ্ছা করিও না, বক্তাকে জানিবে" এই শ্রুতিতেও বক্তা অর্থে বাগিন্দ্রিয়ের প্রেরকই বুঝা যাইতেছে। কাজেই এই বক্তা ও প্রাণ যে এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। এখন, পূর্ব্বপক্ষের কথা হইতেছে এই যে, ব্রহ্মের কোন প্রকার

ইন্দ্রিয় নাই, জীবেরই ইন্দ্রিয় আছে; কাজেই অনুমান হয় যে, এস্থলে বক্তা বা প্রাণ অর্থে জীবই বুঝাইতেছে।

আবার, যে শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে ইন্দ্রিয়সকল প্রাণে অর্পিত, সেই শ্রুতিতেই সেই প্রাণকেই "আনন্দ, অজর, অমৃত" বলিয়া বলা হইয়াছে। এখন, এই আনন্দ-অজর-অমৃত স্বরূপ যে ব্রহ্মের পরিচায়ক লিঙ্গ তাহা সর্ব্ববাদসম্মত।

পূর্ব্বপক্ষ তাই মহাসংশয়ে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে প্রাণ অর্থে প্রাণবায়ু, ইন্দ্র, জীব অথবা ব্রহ্ম, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী? পূর্ব্বপক্ষের মতে প্রাণশব্দের অর্থে ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী বুঝাইবার পক্ষে শ্রুতিমূলক যুক্তির বল একই প্রকার। তিনি সেই কারণে ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছেন না যে প্রাণ শব্দ ঐ চারিটীর মধ্যে কোন্‌টীর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে আলোচ্য প্রকরণে ব্রহ্মের একাধিক পরিচায়ক লিঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা—ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বর দিতে চাহিলে প্রতর্দ্দন বলিলেন "তুমিই আমার জন্য এমন বর চাও যাহা তুমি মনুষ্যের পক্ষে হিততম বিবেচনা কর।" ইহার উত্তরে ইন্দ্র বলিলেন যে, অন্যের জন্য কেহ বর প্রার্থনা করে না। প্রতর্দ্দন তদুত্তরে বলিলেন যে তিনি নিজে কোন বর চাহিতে পারিবেন না। এই সূত্রে বাদানুবাদের পর ইন্দ্র বলিলেন "আমাকেই জান; আমাকে জানাই মনুষ্যের পক্ষে হিততম।" ব্রহ্মকে জানাই যে মনুষ্যের পক্ষে হিততম, তাহা উভয় পক্ষেরই সম্মত। এখন, ইন্দ্র যখন বলিতেছেন যে তাঁহাকে জানাই মনুষ্যের পক্ষে হিততম, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইন্দ্র ব্রহ্মবুদ্ধিতে বা আপনাকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া ঐরূপ বলিতেছেন।

ব্রহ্মের আর একটী পরিচায়ক চিহ্ন এই যে, তাঁহাকে জানিলে পাপ স্পর্শ করে না—ইহাও সর্ব্ববাদসম্মত। ইন্দ্র নিজেকে জানিবার জন্য যখন প্রতর্দ্দনকে উপদেশ দিলেন, সেই সূত্রে তিনি ইহাও বলিলেন যে "যে আমাকে জানে, কোন কর্ম্মের দ্বারা, এমন কি মাতৃবধ পিতৃবধ প্রভৃতি পাপের দ্বারাও তাঁহার প্রকৃতি বিনষ্ট হয় না।" কাজেই স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এস্থলেও ইন্দ্র ব্রহ্মবুদ্ধিতে বা নিজের ব্রহ্মত্ব জানিয়া ব্রহ্মের অন্যতর লিঙ্গ প্রকাশ করাইলেন। এইরূপ ব্রহ্মলিঙ্গসূচক অন্যান্য যে সকল উক্তি এই আখ্যায়িকাতেই আছে সেগুলি প্রাণবায়ু, ইন্দ্র বা জীব ইহাদের কোনটীরই পক্ষে প্রযুক্ত হওয়া কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

অপরদিকে পূর্ব্বপক্ষ যে সকল শ্রুতির উল্লেখ করিয়া তাহাদের ব্রহ্মবাচিত্ব বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে সেই সকল শ্রুতিতে ব্যক্ত চিহ্নসকল ব্রহ্মপক্ষেও সঙ্গত হইবার পক্ষে কোনই বাধা নাই। দৃষ্টান্ত যথা—"এই শরীর পরিগ্রহণ করিয়া উত্থাপিত করিতেছে" এই শ্রুতি অবলম্বনে পূর্ব্বপক্ষ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে এস্থলে প্রাণবায়ুই ঐ শ্রুতিতে সূচিত হইতেছে, কারণ শরীর উত্থাপিত করিবার কার্য্য যে প্রাণবায়ুরই কার্য্য, অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সাহায্যেই যে আমাদের শরীরের উঠাবসা সমস্ত কার্য্যই হইতেছে তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ। কিন্তু সিদ্ধান্তপক্ষের মতে এই যে শরীরকে উত্থাপিত করা-রূপ কার্য্য, ইহা আপাতত প্রাণবায়ুর কার্য্য বলিয়া মনে হইলেও সেই প্রাণবায়ু যাঁহার শক্তিতে শক্তিলাভ করিয়াছে, যাঁহার আয়ত্তাধীন থাকিয়া প্রাণবায়ু কার্য্য করিতেছে, শরীরকে উত্থাপিত করা মূলে সেই ব্রহ্মের কার্য্য বলিতে কোনই বাধা নাই।

পূর্ব্বপক্ষ যে সকল শ্রুতি ধরিয়া প্রাণ অর্থে ইন্দ্রদেবতা সূচিত হইতেছেন বলিয়া সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে সেই সকল শ্রুতিতে ইন্দ্রদেবতা বাহিরে বাহিরে সূচিত হইতেছেন বটে, কিন্তু সেগুলিতে ইন্দ্রও নিজেকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া, ব্রহ্মতে নিজের লয়সাধন করিয়া তবে "আমাকে জান" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত বাক্য সকল বলিয়াছিলেন। আর, যে শ্রুতির কারণে পূর্ব্বপক্ষ জীব অর্থে প্রাণ ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা, এই সংশয়ে পড়িয়াছেন, সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে ঐ শ্রুতিতে প্রাণ অর্থে জীব ধরিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, কারণ জীব ও ব্রহ্মে স্বরূপগত কোন ভেদ নাই।

এইরূপে দেখা যায় যে, প্রাণবায়ু, ইন্দ্র ও জীব, ব্রহ্মকে জানিবারই এক একটী দ্বাররূপে এই প্রকরণে উক্ত হইয়াছে—ইহাই সিদ্ধান্তপক্ষের মত। কাজেই যখন দেখা যাই-

তেছে যে ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্ন অনেকগুলি এবং সেগুলি কেবলমাত্র অন্য কোন বস্তুর প্রতি প্রয়োগ করিলে দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু ব্রহ্মের প্রতি প্রয়োগ করিলেই সুসঙ্গত হয়, তখন বলিতে হয় যে এই প্রকরণে ব্রহ্মেরই পরিচায়ক চিহ্নসকলের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। সুতরাং প্রাণবায়ু প্রভৃতি এই প্রকরণের ব্যুৎপাদ্য বিষয় নহে, ব্রহ্মই ব্যুৎপাদ্য বিষয়, ইহাই সিদ্ধ হইল।

উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে ইন্দ্র নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া "আমাকে জান" ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছিলেন। সূত্রকার বলিতেছেন যে, এস্থলে ইন্দ্র নিজেকে উপাসনা করিবার জন্যই প্রতর্দনকে উপদেশ করিয়াছিলেন এরূপ মনে করা ভুল, কারণ এই আখ্যায়িকাতে প্রাণের অধ্যাত্মসম্বন্ধের বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার অধ্যাত্ম শব্দের অর্থে শরীরবিষয়ক ধরিয়া বলেন যে, এই আখ্যায়িকাতে শরীরের সহিত প্রাণের সম্বন্ধের কথাই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে এই শ্রুতি দিয়াছেন—"যতকাল এই শরীরে প্রাণ অবস্থিতি করেন, ততকালই আয়ু"। এখন ভাষ্যকার বলেন এই যে, ইন্দ্রাদি দেবতার একটা স্বাতন্ত্র্য বা পৃথক ব্যক্তিত্ব আছে; ইহা সম্ভব নহে যে তিনি এই দেহের ভিতরে প্রাণরূপে থাকিয়া কখনো বা আয়ু প্রদান করিবেন, আর কখনো বা আয়ু সংহরণ করিবেন। কাজেই বলিতে হয় যে এস্থলে প্রাণ শব্দের অর্থে ইন্দ্রদেবতা বুঝাইতে পারে না।

তবে যদি এই প্রশ্ন উঠে যে, ইন্দ্র প্রাণ না হইলে "আমিই প্রাণ" ইত্যাদি শ্রুতিতে নিজেকে প্রাণরূপে উল্লেখ করিলেন কেন? তাহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে শাস্ত্রে এরূপ দেখা যায় যে বামদেব ঋষি নিজেকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বাত্মবোধে "আমিই মনু, আমিই সূর্য্য" ইত্যাদিরূপ বলিয়াছিলেন; এস্থলে ইন্দ্রও সেইরূপ নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপের সহিত অভিন্নভাবে "আমিই প্রাণ" ইত্যাদি বলিয়াছেন। কাজেই এখানে প্রাণ শব্দ মূলে ব্রহ্মবাচক ভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হয়।

প্রাণ অর্থে যে ইন্দ্র দেবতা হইতে পারে না তাহা উপরে দেখানো হইয়াছে; কিন্তু তাহার অর্থে জীব অথবা মুখ্যপ্রাণ কেন হইবে না তাহা সূত্রকার পূর্ব্বে দেখান নাই। তাই তিনি এখন বলিতেছেন যে, এই আখ্যায়িকাতে প্রাণশব্দের অর্থে জীব ও মুখ্যপ্রাণ বা প্রাণবায়ুবোধক শ্রুতি আছে বলিয়া যদি বল যে, প্রাণশব্দ কেবল ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহা সঙ্গত হইবে না; কারণ তাহাতে ব্রহ্ম, জীব ও প্রাণবায়ু এই তিন বস্তুর উপাসনাপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। একটী সর্ব্ববাদসম্মত ন্যায় আছে এই যে, "শ্রুতিসমূহের একবাক্যতা বা সমন্বয় সাধন সম্ভব হইলে বাক্যভেদ করিবে না, অর্থাৎ পৃথক পৃথক বাক্যের পৃথক পৃথক তাৎপর্য্য ধরিবে না"। এখন, এই ন্যায় অনুসারে এই আখ্যায়িকাতে উক্ত শ্রুতিসমূহকে যদি ব্রহ্মেতেই পর্য্যবসিত দেখানো যাইতে পারে, তাহা হইলে সেই সকল শ্রুতিতে উক্ত জীব বা প্রাণ শব্দের অর্থে মুখ্যভাবে জীব বা প্রাণবায়ু ধরিয়া বাক্যগুলির পৃথক পৃথক তাৎপর্য্য স্থাপন করা উচিত নহে। এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই ইন্দ্র নিজেকে ব্রহ্মবোধে প্রাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি। এই আখ্যায়িকার উপসংহারে স্পষ্টভাবেই ব্রহ্মকেই প্রাণরূপে বলা হইয়াছে—"সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, অমৃত ও জরাবিহীন।" কাজেই উপক্রমে ও উপসংহারে প্রাণশব্দের অর্থে ব্রহ্ম হওয়াতে এই প্রকরণের তাৎপর্য্যই ব্রহ্ম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এবং ইহাও দেখানো হইয়াছে যে, এই প্রকরণের যে সকল শ্রুতিতে জীব ও মুখ্যপ্রাণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া সংশয় হইতে পারে, সেই সকল শ্রুতিও ব্রহ্মার্থকরূপে ব্যাখ্যা করিলে অসঙ্গতি হয় না। সুতরাং সেই সকল শ্রুতি অবলম্বনে তিনটী উপাস্য ধরিবার প্রয়োজন নাই।

নবম অধিকরণের ২৩শ সূত্রে দেখানো হইয়াছে যে, ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্নের কারণে ব্রহ্ম অর্থে প্রাণ শব্দ আশ্রিত বা প্রাণশব্দের অর্থে ব্রহ্মই ধরা হইয়াছে। এস্থলেও ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্নের কারণেই পূর্ব্ব নিয়মের অনুসরণ করিয়াই প্রাণশব্দকে ব্রহ্ম অর্থেই আশ্রিত বলিয়া ধরা হইয়াছে।

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীভারতীতীর্থমুনিপ্রণীত বৈয়াসিক ন্যায়মালার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের তাৎপর্য্য লিখিত হইল।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

রাগিণী গান্ধারী—তেতালা।

বিমল প্রভাতে বিমল আলোকে
বিমল হৃদয়ে জাগো।
প্রীতি-কুসুম অঞ্জলি ঢালি'
চরণে আশীষ মাগো।

বিমল প্রাতে বিহগ গাহে
নিখিল ফুল্ল-নয়ানে চাহে—
আজি লুটায়ে হৃদয় তাঁহারি পায়ে
তাঁহারি শরণ মাগো॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

১ ২´ ৩ ০
II সা রা মা মা । পা -া -া পা । পা দা র্সা র্সা । ণদা -া -া পা I
বি ম ল প্র ভা ০ ০ তে বি ম ল আ লো০ ০ ০ কে

১ ২´ ৩ ০
I পা পা পা পা । পা -া পা -মা । পা -ণা দা -পা । -মা -জ্ঞা -রা -সা I
বি ম ল হৃ দ ০ য়ে ০ জা ০ গো ০ ০ ০ ০ ০

১ ২´ ৩ ০
I পা -দা -র্সা র্সা । র্সা র্সা র্রা -ণা । ণা -া দা দা । ণদা -া -া পা I
প্রী ০ ০ তি কু সু ম ০ অন্ ০ জ লি ঢা০ ০ ০ লি

১ ২´ ৩ ০
I পা পা পা পা । পা -া পা -মা । পা -ণা দা -পা । -মা -জ্ঞা -রা -সা II
চ র ণে আ শী ০ ষ ০ মা ০ গো ০ ০ ০ ০ ০

১ ২´ ৩ ০
II { পা পা -া মা । ণদা -া ণা -া । র্সা র্সা -া র্সা । ণা -র্সা র্সা -া I
বি ম ০ ল প্রা০ ০ তে ০ বি হ ০ গ গা ০ হে ০

১ ২´ ৩ ০
I (র্স)ণা র্সর্রা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা -া র্মর্জ্ঞা -র্রর্সা । র্সা র্রা -া ণা । (ণ)দা -া পা -া } I
নি খি০ ০ ল ফুল্ ০ ন০ ০০ ন য়া ০ নে চা ০ হে আজি

১ ২´ ৩ ০
I পা দা -র্রা র্সা । র্সা -া র্সা র্রা । ণা ণা -া দা । ণদা -া -া পা I
লু টা ০ য়ে হৃ ০ দ য় তাঁ হা ০ রি পা০ ০ ০ য়ে

১ ২´ ৩ ০
I পা পা -া পা । পা -া পা মা । পা -ণা দা -পা । -মা -জ্ঞা -রা -সা II II
তাঁ হা ০ রি শ ০ র ণ মা ০ গো ০ ০ ০ ০ ০

মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র।*

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উপক্রমণিকা।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি মহান যুগপরিবর্ত্তনের কাল বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে আমাদের দেশের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। নারায়ণ ও বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য ও চৈতন্য যে দেশ প্রেম ও করুণার, জ্ঞান ও ভক্তির স্রোতে এককালে প্লাবিত করিয়াছিলেন, কর্ণ ও দ্রোণ, ভীম ও অর্জ্জুনের বীরত্বগাথায় যে দেশ এককালে উত্তেজিত হইত, দেবব্রতের দৃঢ়তা, হরিশ্চন্দ্রের দান, দধীচির আত্মোৎসর্গ স্মরণ করিয়া যে দেশ এককালে গৌরবান্বিত বোধ করিত, কপিল ও গৌতম, জৈমিনি ও পতঞ্জলি, ব্যাস ও কণাদের অপূর্ব্ব জ্ঞান-সাধনা যে দেশকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছিল, বাল্মীকি ও বেদব্যাস, কালিদাস ও ভবভূতি যে দেশকে বীণাপাণির বীণাধ্বনি শুনাইয়াছিলেন, সেই তুষারমণ্ডিত হিমাচল হইতে বীচিবিক্ষুব্ধ ভারত-মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আমাদের এই সোনার দেশ তখন অরাজকতায় বিধ্বস্ত, অত্যাচারে পীড়িত, লাঞ্ছিত ও শক্তিহীন। তখন অধর্ম্ম ও অবিশ্বাস জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে। যে দেশে জ্ঞানের সূর্য্য প্রথম উদিত হইয়া জগতের অজ্ঞান-তিমির বিনষ্ট করিয়াছিল সেই দেশ তখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আপনি সুপ্ত। সমাজ কুসংস্কারের দৃঢ়নিগড়ে আবদ্ধ। আর সে নিষ্কাম সাধনা নাই, আর সে আত্মোৎসর্গ নাই। নারায়ণ অথবা বুদ্ধের উপদেশ, ভীমার্জ্জুনের বীরত্ব-গাথা, দেবব্রতের দৃঢ়তা, কর্ণ অথবা দধীচির আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর স্বার্থান্ধ দেশবাসীর হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না, বিপ্লবের তাণ্ডবে বাণীর ক্ষীণ বীণাধ্বনি নীরব।

দেশ তখন প্রাচ্য আদর্শ হারাইতেছে। প্রতীচ্য জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে তখনও দেশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই।

এই সময়ে বঙ্গের অন্ধকার আকাশে আলোক দেখা দিল। অতি অল্প লোকই প্রথমে সে আলোক দেখিতে পাইল। রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারবিষয়ক চেষ্টা তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে যে অতি অল্প লোকেরই সহানুভূতি আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি তাঁহার সময়ের বহুপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের উপকারিতা ও মহত্ত্ব বঙ্গবাসীগণের হৃদয়ে আজ যেরূপ উপলব্ধ হইতেছে তখন সেরূপ হয় নাই। দেশ তখনও তাঁহার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। রাজা রাধাকান্ত দেবের ন্যায় ব্যক্তিও সতীদাহনিবারণবিষয়ক বিধির বিরুদ্ধে এবং বহুবিবাহের সমর্থনে আন্দোলন করিয়াছিলেন। "বিধর্ম্মী" রামমোহন প্রস্তাবিত হিন্দু কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে কোনও হিন্দু সন্তানকে সে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন না, ইহা তৎকালীন হিন্দু-নেতৃগণ স্যর হাইড্ ঈষ্টকে প্রকাশ্যে বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তখন কুসংস্কার আপনার প্রভাব এতদূর বিস্তৃত করিয়াছিল যে, রামকমল সেনের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিও "আদর্শ শিক্ষক" ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ হইতে অপসারিত করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যের আলোক কতদিন অসত্যের অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিতে পারে? জ্ঞানের জ্যোতিঃ কতদিন অজ্ঞান-তিমিরে নিষ্প্রভ থাকে? কুসংস্কার কতদিন ন্যায় ও যুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে? দেশে বিপ্লব সূচিত হইল। এই বিপ্লবে পাশ্চাত্য শিক্ষার নূতন আলোকপ্রাপ্ত রামগোপাল ঘোষপ্রমুখ হিন্দু-কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রগণ প্রধান অভিনেতা।

যদি এই ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য বঙ্গীয় যুবকগণ শান্তভাবে দেশের কুসংস্কার ও কদাচার দূরীকরণের চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে হয়ত আমাদের দেশ আরও দ্রুত গতিতে উন্নতির সোপানে উঠিতে পারিত। কিন্তু যেমন রাষ্ট্রবিপ্লবে তেমনই ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লবে। *বিপ্লব বুঝি অমিতাচার,* উচ্ছৃঙ্খলতা ও বাহুল্যের নামান্তর। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী

* ছয় সাত বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "আর্য্যাবর্ত্ত" নামক মাসিকপত্রে এই জীবনচরিত ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু কোনও অনিবার্য্য কারণ বশতঃ উক্ত সুসম্পাদিত পত্রিকাখানি বিলুপ্ত হওয়ায় কিয়দংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' সম্পূর্ণ জীবনচরিত প্রকাশিত হইবে।

রাজ্যে অরাজকতা ও অত্যাচার নিবারণের জন্য যে রাষ্ট্রবিপ্লব উত্থিত হইয়াছিল তাহা যেরূপ অধিকতর অরাজকতা ও অত্যাচারের সৃষ্টি করিয়াছিল, আমাদের দেশেও তেমনই এই নব্য ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণ সংস্কারের নামে নানাপ্রকার অমিতাচার ও বাহুল্যের অবতারণা করিলেন। প্রাচীতে যাহা আছে সকলই কুসংস্কারদুষ্ট, প্রতীচ্যে যাহা আছে তাহাই সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলময় এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই নব্য সংস্কারকগণ প্রাচ্য আচারব্যবহার পদদলিত করিয়া প্রতীচ্য আচার-ব্যবহারের অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। "ইঁহারা শূকর ও গোমাংসের দ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া মদ্যপাত্রের মধ্য দিয়া মুক্তির দিকে অগ্রসর হইলে লাগিলেন" (Were "cutting their way through ham and beef and wading to liberalism through tumblers of beer")। কৃষ্ণমোহন প্রকাশ্যে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। একজন ছাত্র প্রকাশ্য সভায় বলিলেন, "যদি আমার হৃদয়ে অন্তস্তল হইতে কিছু ঘৃণা করি তাহা হইলে সে হিন্দুধর্ম্ম।" প্রকাশ্যে অখাদ্য আহার করিয়া হিন্দুগণ "সংস্কারকের" গৌরব অনুভব করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র গোমাংস ভিন্ন অন্য কোনও মাংস আহার করিতেন না! মদ্যপান এতদূর প্রচলিত হইয়াছিল যে রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় ব্যক্তিও এই সময়ে আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়াছিলেন। বিপ্লবের প্রভাবসম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা আর অধিক কি প্রমাণ আবশ্যক ?

কিন্তু এই নব্য "সংস্কারকগণের" কয়েকটি অসাধারণ গুণ ছিল। এস্থলে সে সকলের উল্লেখ না করিলে তাঁহাদিগের প্রতি অন্যায় করা হয়। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁহাদিগের সেই অনুপম উদ্যম, স্ত্রীশিক্ষাপ্রবর্ত্তনে তাঁহাদের সেই আন্তরিক চেষ্টা, বহুবিবাহ প্রভৃতি আচারের সংস্কারের জন্য তাঁহাদের প্রযত্ন, এতদ্দেশবাসিগণের জন্য রাজনৈতিক অধিকারলাভের নিমিত্ত তাঁহাদের প্রয়াস, যাহা সত্য ও কল্যাণকর বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহা প্রচারের জন্য তাঁহাদের প্রাণপণ চেষ্টা ও আত্মত্যাগ, তাঁহাদিগের অসামান্য মানসিক বল ও স্বদেশহিতৈষণা প্রভৃতি সদ্গুণাবলী আমাদিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

আমরা বলিতেছিলাম, যেরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে দেশে নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতাচারের আবির্ভাব হয় আমাদিগের এই ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবের সময়ও চতুর্দ্দিকে সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা অমিতধারের দৃষ্টান্ত দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু যেরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবগুলি নিতান্ত নিষ্ফল হয় না, ক্রমে ক্রমে উভয় পক্ষ আপনাদের ভ্রম দেখিতে পান, উভয়পক্ষ ত্যাগস্বীকার করেন এবং সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করেন এস্থলেও ঠিক সেইরূপ হইল। অতি-মাত্রায় রক্ষণশীল সমাজনেতৃগণ ক্রমে ইংরাজীশিক্ষিত নব্যদিগের গুণগুলি প্রত্যক্ষ করিলেন; বুঝিতে পারিলেন, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি নব্যদিগের মধ্যে কত শক্তি নিহিত আছে এবং তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিলে সমাজের কত ক্ষতি। অপর পক্ষে নব্য "সংস্কারকগণ" অমিতাচার ও অত্যাচারের বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিলেন যে, সর্ব্ব বিষয়ে প্রতীচীর অনুকরণই বাঞ্ছনীয় নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্মিলনের চেষ্টা হইতে লাগিল।

উভয় পক্ষ পরস্পরকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিতেছিলেন তাহা একটি দৃষ্টান্তদ্বারা আমরা দেখাইতে চাহি। রাজা রাধাকান্ত দেব ও রামগোপাল ঘোষকে যথাক্রমে রক্ষণশীল ও সংস্কারপ্রার্থী পক্ষের নেতা বলিলেও চলে। ইঁহারা পরস্পরকে কিরূপ ভাবে দেখিতেন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রামগোপাল স্মৃতিসভায় ৺ কৈলাসচন্দ্র বসুর বক্তৃতা হইতে প্রতীয়মান হইবে—

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতা টাউন হলে চার্টার সভায় রামগোপালের বক্তৃতা সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইয়াছিল। বক্তৃতা শেষ করিয়া রামগোপাল যে আসনে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেই আসন হইতে নামিয়া আসিলে রাজা রাধাকান্ত দেব স্নেহপূর্ণভাবে তাঁহাকে বলিলেন— "ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, যাহাতে তুমি দীর্ঘকাল স্বদেশের সেবায় আত্মশক্তি নিযুক্ত

করিতে পার। তুমি আমাদের সমাজের মুখপাত্র—আমাদের জাতির অলঙ্কার।" রামগোপাল নতমস্তকে বলিলেন, "আমি যে আপনাকে আশায় হতাশ করি নাই ইহা শুনিয়া আমি পরম গৌরবান্বিত হইলাম। কিন্তু আপনি দেশের আশা, আপনি দেশের যে স্থায়ী হিত করিবেন সে হিতসাধন আমার সাধ্যাতীত।"

আর একটি দৃষ্টান্ত—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটী নিমতলার বর্ত্তমান শ্মশান ঘাটটী স্থানান্তরিত করিবার সংকল্প করেন, সেই সময়ে রক্ষণশীল হিন্দুগণের প্রতিনিধিস্বরূপ দণ্ডায়মান রামগোপালের তীব্র প্রতিবাদ ও অগ্নিময় বক্তৃতা।

এই জন্যই বলিতেছিলাম, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি যুগপরিবর্ত্তনের সময়—একটি মহা সঙ্কটকাল (critical period) বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। যাঁহারা অন্ধভাবে দেশের কুসংস্কার-কদাচারগুলি পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন এবং যাঁহারা প্রাচ্য আদর্শ ত্যাগ করিয়া অন্ধভাবে প্রতীচ্যপদ্ধতি প্রচলনের প্রয়াস পাইতেছিলেন তাঁহারা উভয় পক্ষই যেন চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; প্রাচ্যে যাহা সুন্দর তাহার রক্ষণে, প্রতীচ্যে যাহা মঙ্গলময় তাহার গ্রহণে, প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে যাহা কুৎসিত তাহার পরিবর্জ্জনে দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ দেখিতে পাইলেন। এই সময়ে যেন আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও সমাজ কিরূপ আকৃতি ধারণ করিবে তাহাই নিরূপিত হইতেছিল। যাঁহারা মৃতধর্ম্মকে পুনরায় সঞ্জীবিত ও কুসংস্কারান্ধ সমাজকে উন্নত করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের প্রতিভা ও শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, যাঁহারা আমাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রস্তুত ও সুগম করিয়া দিয়া গিয়াছেন সেই সকল মহাপুরুষ চিরকাল আমাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। রামমোহন রায় কর্ত্তৃক পুনঃপ্রচারিত উপনিষদ ধর্ম্মের অন্যতম প্রচারক, বহুবিবাহনিবারণ-বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম আন্দোলনকারী, অন্যান্য সামাজিক সংস্কারের জন্য প্রযত্নবান, দেশের শিল্পোন্নতি ও স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের অন্যতম উদ্যোগী কিশোরীচাঁদ মিত্র এই সকল ব্যক্তির মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিলেন।

কেবল ধর্ম্মে ও সমাজে নহে, রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রেও এই একই সময়ে এক নূতন আলোক দেখা দিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মহাত্মা জর্জ্জ টম্‌সনের উপদেশে, নব্য ভারতের ডিমস্থিনিস্ রামগোপালের নেতৃত্বে, প্যারিচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল ও দিগম্বর, রাধাকান্ত ও রমানাথ প্রভৃতি মহাত্মাগণের সম্মিলিত চেষ্টায় তাহা এক অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। এই সময় দেশব্রত হরিশ্চন্দ্র ও দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদনে রাজনীতিক আন্দোলনের এক নূতন পথ দেখাইলেন; তাঁহাদের গভীর পাণ্ডিত্য দূরদর্শিতা ও কৃতিত্ব দেখিয়া দেশবাসী মুগ্ধ হইল। ড্যালহৌসীর অন্যায় উপায়ে রাজ্যবিস্তার, সিপাহীযুদ্ধের সময়ে অদূরদর্শী ইংরাজগণের জাতিবিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা গ্রহণচেষ্টা, এবং দরিদ্র প্রজাগণের প্রতি নীলকরগণের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুইটি শক্তিশালী লেখনী নিয়োজিত হইল। মনীষী কিশোরীচাঁদও ইঁহাদের সহিত রাজনীতিক ক্ষেত্রে মিলিত হইলেন। সভায় যাঁহার নির্ভীক বক্তৃতা সাধারণের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আশা উৎপাদন করিত, 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ডে' যাঁহার প্রতিভা-প্রদীপ্ত রাজনীতি ও দেশোন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধাবলী জনসাধারণকে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিত, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে সেই কিশোরীচাঁদের লোকমত গঠনে ও লোকশিক্ষা-প্রদানে কিরূপ অসামান্য প্রভাব ছিল এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করা অসম্ভব।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, প্যারীচাঁদ, মধুসূদন প্রতি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবাপন্ন সাহিত্যসংস্কারকগণ এই সময়ে এক যুগান্তর প্রবর্ত্তন করেন। কিশোরীচাঁদ আজীবন ইংরাজী সাহিত্যেরই চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় কখনও কোনও রচনা লিখেন নাই। কিন্তু এই নূতন ভাষাসংস্কারে তাঁহার বিলক্ষণ সহানুভূতি ছিল। এবং এই সহানুভূতি তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতা

ও প্রবন্ধাবলীর মধ্যে অতি উজ্জ্বলভাবে পরিদৃশ্যমান। দেহ ক্ষণবিধ্বংসী, গুণ কল্পান্তস্থায়ী—আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের দেশের নীতিশাস্ত্র ইহাই শিক্ষা দেয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশের সেই মহাসঙ্কট সময়ে যখন দেশ অবনতির সোপানে অতি দ্রুতগতিতে অবতরণ করিতেছিল, তখন যে সকল মহাপুরুষ শত অত্যাচার শত নিগ্রহ সহ্য করিয়া ধর্ম্মের জন্য, নীতির জন্য, রাজনীতিক অধিকারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন অপূর্ব্ব মানসিক বল, অদ্ভুত দেশহিতৈষণা, নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা, বিশ্বব্যাপী সহানুভূতি ও সবল মনুষ্যত্বের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদিগের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেহত্যাগ করিলেও জীবিত আছেন। আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মবিশ্বাস, আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহার, আমাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, যে সকল বিষয় দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের বিভিন্ন বিভাগে আমরা সকলে ক্ষুদ্র অথবা মহৎ শক্তি লইয়া নিরাশ অথবা আশাপূর্ণ হৃদয়ে বিচরণ করিতেছি, বিফলকাম অথবা সফলকাম হইতেছি, সেই সকলের মধ্যে তাঁহাদিগের শক্তি নিহিত আছে। আমাদিগের মধ্যে সে ভাব অদৃশ্য, সে শক্তি অজ্ঞাত রহিলেও ইহা নিশ্চয় যে আমরা তাঁহাদেরই পুণ্য-পদাঙ্কের অনুসরণ করিতেছি, তাঁহাদিগেরই সৃষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদেরই রোপিত বৃক্ষের ফল আহরণ করিতেছি। আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ, সেইজন্য এই সকল মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতির পূজা করি না; তাঁহাদিগের প্রদর্শিত মহৎ আদর্শের অনুসরণ করি না; তাঁহাদিগের গুণাবলীর অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি না।

আমাদের দেশে এক নূতন আলোক দেখা দিয়াছে—এক নূতন ভাব প্রবেশ করিয়াছে, এক নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতেছে। এই চাঞ্চল্য জীবনের লক্ষণ; কিন্তু তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় মানুষকে পাগল করে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে। ইহা হইতে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। তাই জ্ঞানীরা এই সময়ে মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন। সেইজন্য এই সময়ে আমাদের দেশের যথার্থ কর্ম্মবীরগণের মহৎ জীবনের আলোচনার উপকারিতা বিশেষরূপে মনে উদিত হয়। তাঁহাদিগের কার্য্যাবলী স্মরণে চিত্তে উন্নত ভাবের উদয় হয়, নিরাশ হৃদয়ে আশার আলোক প্রবেশ করে, আত্মত্যাগস্পৃহা জন্মে, পরোপকার প্রভৃতি মনের উচ্চ বৃত্তিসমূহ অসাধারণ স্ফূর্ত্তি লাভ করে। এই সকল কারণে আমাদের বহু অক্ষমতা সত্ত্বেও আমরা কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনকথার আলোচনা করিতে সাহস করিতেছি।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইতে চলিল তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সমকালীন ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের বিস্তৃত বিবরণ এক্ষণে প্রদান করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছে। পুরাতন কাগজপত্রাদি হইতে আমরা তাঁহার বিষয় যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি তাহাই এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইবে। যোগ্যতর ব্যক্তি কিশোরীচাঁদের কথা লিখিবার ভার গ্রহণ করিলে ভাল হইত। কিন্তু হয়ত যে সকল কাগজপত্রাদি এখনও পাওয়া যায় সে সকলও পরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এবং আমাদের দেশের একজন কর্ম্মবীরের কীর্ত্তিকাহিনী চিরকালের জন্য বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হইবে, এই আশঙ্কায় আমরা আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহার জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

তর্কে বহুদূর।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই এই ভাবের কোন না কোন কথা চলিত আছে দেখা যায়—ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। এর ভাবার্থ এই যে, ভক্তি করে ভগবানকে ডাকলে তাঁকে পাওয়া যায়, কিন্তু কেবল তর্ক করে তাঁকে পাওয়া যায় না। শুষ্ক তর্ক থেকে ভগবান অনেক দূরে থাকেন। এখানে যে তর্কের কথা বলা হয়েছে, সে তর্ক ভক্তির সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার আলোচনা করে ভগবানকে পাবার ইচ্ছাতে, তাঁকে জানবার

ইচ্ছাতে তর্ক নয়; কিন্তু নিজের বিদ্যা প্রকাশ করবার জন্য তর্কের খাতিরেই তর্ক করা—যাকে শুষ্ক তর্ক বলা হয়। যে প্রবাদটী বলে এলুম, তাতে আছে যে ভক্তিতে ভগবানকে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় ভক্তিকেই ভগবানকে পাবার একমাত্র উপায় বলে ধরে আছেন। তাঁদের মত এই যে, ভগবানকে পাবার জন্য জ্ঞান কর্ম্ম, এ সমস্ত কিছুই দরকার নেই, কেবল ভক্তি হলেই তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁরা এই যে ভক্তির কথা বলেন, আমাদের মনে হয় যে সেটা অন্ধ ভক্তি। ভগবানের উপর এরকম অন্ধ ভক্তি কতদূর সম্ভব, তা বলতে পারি নে। তাঁর সম্বন্ধে কোন কিছু জানলুম না শুনলুম না, কাজেই তাঁর অনুগত হয়ে তাঁর প্রিয় কার্য্য বলে কোন কাজই করলুম না, আর মুখে খুবই বলতে লাগলুম যে আমি ঈশ্বরকে খুব ভক্তি করি—এর কি কোন অর্থ আছে? এই রকম ঈশ্বরের বিষয় না জেনে না শুনে ভক্তি করি বলবার ফলে আমাদের দেশে পূর্ণ অবতারের কথা, জড় বস্তুকে ভগবান বলে পূজার কথা, আর এই রকম অনেক অন্যায় কথা অন্ধ ভক্তির দোহাই দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই রকম অন্ধ ভক্তির ফলেই আমাদের দেশে একটী কথা চলে গেছে যে ঢেঁকিকেও মনের সঙ্গে ঈশ্বর বলে পূজা করলে মুক্তি লাভ হতে পারে। এর চেয়ে ভুল কথা আর কি হতে পারে?

জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনার ফলে স্বভাবত যে ভক্তিশ্রদ্ধা মনের ভিতর জেগে ওঠে, সেই ভক্তি-শ্রদ্ধারই ফলে ভগবানকে জানা যায়, পাওয়া যায়। শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই হোক, বা যুক্তির দোহাই দিয়েই হোক, নীরস শুষ্ক তর্কের ভিতর দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। তর্কের ফলে যদিই বা এই সিদ্ধান্তে আসি যে, ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে, তাতেই বা লাভ কি? সে কেবল আমরা একটা কথার কথা জানলুম যে ঈশ্বর আছেন; কিন্তু ঈশ্বরকে কি আমরা সত্যি-সত্যি জানতে পারলুম? নাস্তিকেরা যে বলেন যে, খাঁটি তর্কের ভিতর দিয়েও তাঁরা ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতির বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নি—সেটা তো খুব সত্যি কথা; আস্তিকেরাও এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কেবল কি আজই আমরা এ কথা বুঝছি? তা নয়। ঋষিদের সময়েও তাঁরা একথা খুব স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন, আর স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের বেদান্ত-সূত্রে, আমাদের উপনিষদে খুব স্পষ্ট করে বলা আছে যে তর্কের দ্বারা আস্তিক্য বুদ্ধিও হয় না, আর ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতিকে তর্কের দ্বারা জানাও যায় না।

তর্ক জিনিসটা কি, তর্কের নিয়ম কি, এই সমস্ত একটু ভাল করে বুঝে দেখলেই বেশ বোঝা যাবে যে, তর্কের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি কেন জানা যায় না। প্রথমেই দেখা যায় যে, তর্ক করতে গেলেই একটা কিছু ধরে তর্ক করা চাই। অবলম্বন না পেলে তর্ক দাঁড়াতেই পারে না; শূন্যে শূন্যে তর্ক চলতেই পারে না। তারপর দেখি যে, তর্কের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে, একটা বড়-গোছের মূলসূত্র, যার ভিতর অনেক ছোট ছোট ঘটনা খাপ খাইয়ে বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সেই মূলসূত্রের পর ঐ ছোট রকমের ঘটনা হোল তর্কের আর একটা অবলম্বন। মূলসূত্র আর এই রকম একটা ছোটখাটো ঘটনা পেলে তবে আমরা তর্ক করতে পারি, আর একটা পাকাপাকি সিদ্ধান্তেও আসতে পারি। দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাই। ধোঁয়া দেখলেই আমরা মনে করে নিই যে ধোঁয়ার জায়গায় আগুন আছে। তাই ধোঁয়া থাকলেই আগুন আছে, এই একটা বড় গোছের মূলসূত্র ধরে নিলুম। তারপর একটা ছোট ঘটনা দেখলুম যে একটা পর্ব্বত থেকে ধোঁয়া উঠছে। তখন দেখলুম যে, এই ছোট ঘটনাকে ঐ বড় মূলসূত্রের ভিতর বেশ খাপ খাইয়ে বসানো যেতে পারে। তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে এলুম যে, ঐ পর্ব্বতে আগুন আছে।

এই দৃষ্টান্ত থেকে দেখছি যে, মূলসূত্রে যে বিষয়ের উল্লেখ থাকবে, সিদ্ধান্তেও সেই বিষয়েরই উল্লেখ থাকে। মূলসূত্রে আগুন আর ধোঁয়ার উল্লেখ ছিল, সিদ্ধান্তেও তাই সেই ভাবেরই কথা রইল। মূলসূত্রের বাহিরে, মূলসূত্রের সম্পর্ক ছেড়ে কোন সিদ্ধান্ত দাঁড়াতে পারে না। মূলসূত্রে তুমি ধোঁয়া আর আগুন একসঙ্গে থাকবার কথা বল্লে। এই মূলসূত্র নিয়ে তুমি যে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হও না কেন, সে সিদ্ধান্তে এমন কথা উঠতে পারে না যে, অমুক স্থানে ধোঁয়া আছে অতএব

সেখানে জল আছে। তর্কের নিয়ম দেখা যাচ্ছে যে সিদ্ধান্তটা কোন-না-কোন আকারে মূলসূত্রেরই কোন বিশেষ ঘটনায় প্রয়োগ মাত্র। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, যে কোন তর্কের সিদ্ধান্ত তার মূলসূত্রের সঙ্গে সমধর্ম্মী হবে, অর্থাৎ মূলসূত্রের মূলভাব সিদ্ধান্তেও থাকতে হবে। যদি জ্যামিতি বিষয়ের মূলসূত্র ধরা যায়, তবে সিদ্ধান্তও জ্যামিতি বিষয়েরই হবে, তার বাহিরে যেতে পারবে না; ধর্ম্মসম্বন্ধে মূলসূত্র ধরলে সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানসম্বন্ধে হতে পারবে না। ইন্দ্রিয়ের অতীত কোন বিষয় মূলসূত্র ধরলে ইন্দ্রিয়গোচর কোন বিষয় সিদ্ধান্ত হতে পারে না।

এই যেমন দেখলুম যে, এই এক রকম তর্কে কোন বিশেষ ঘটনায় একটা মূলসূত্রের প্রয়োগ হয়, আর সেই প্রয়োগটা সিদ্ধান্তের আকারে বিশেষভাবে প্রকাশ করলুম; সেই রকম আর এক রকম তর্কে বিশেষ বিশেষ ঘটনা থেকে উঠে মূলসূত্র ধরতে হয়। দৃষ্টান্ত দিই। আগুনে কাপড় পোড়ে; আগুনে কাগজ পোড়ে; দেখা যায় যে, আগুনে যে জিনিস দেওয়া যায় তাই পোড়ে। এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনা থেকে এই একটা মূলসূত্র স্থির করলুম যে আগুনের পোড়াবার শক্তি আছে। এই রকম তর্কের ফলেও বাহিরের জিনিস ধরে চল্লে বাহিরেরই বিষয়ের মূলসূত্র পাব, বাহিরের অতীত আমাদের মনের ভিতরকার কোন মূলসূত্রে আসতে পারব না।

এখন কথা এই যে, ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে, এই সমস্ত বিষয় যদি, যে কোন রকমের হোক, একটা তর্কের ফল বা সিদ্ধান্ত করে দাঁড় করাই, তাতেই বা বিশেষ লাভ কি? তাহলে ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি আছে, এটা একটা কথার কথা মাত্র হোল। তাতে দাঁড়াবে এই যে, যে ভাবের উপর তর্ক দাঁড় করিয়ে ঐ সিদ্ধান্তে আসব, সেই ভাবের তর্কের সিদ্ধান্ত বলে ঈশ্বর আত্মা সমস্তই স্বীকার করা যেতে পারবে; কিন্তু তাই বলে সত্যি সত্যি যে ঈশ্বর আছেন বা আত্মা আছে, তার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। যদি ঈশ্বর থাকেন বা আত্মা থাকে, তবে সেটা যেমন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও জানতে পারা যায় না, তেমনি শুষ্ক তর্কের সাহায্যেও জানতে পারা যায় না। আর যদি ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতিকে কেবল তর্কের সিদ্ধান্ত বলে পাওয়া যায়, তবে সে ঈশ্বর সে আত্মা আস্তিকদের ঈশ্বর বা আত্মা নয়।

আস্তিকেরা এই জগতচরাচরের কাজ দেখিয়ে ঈশ্বরকে এর কারণ বলে বলেন; আর বলেন যে, তিনি এই জগতের শিল্পী অর্থাৎ এই জগতে যে সমস্ত রচনাকৌশল দেখা যায়, ঈশ্বরই সে সমস্ত কৌশল এই জগতসংসারে দিয়ে রেখেছেন; তিনিই এই জগতের নিয়ন্তা, অর্থাৎ তিনিই কতকগুলো নিয়ম করে দিয়েছেন, সেই নিয়মগুলো ধরেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে। কিন্তু সেটা তাঁরা কেবল তর্কের নিয়মে পান না। তর্কের নিয়ম ধরে চল্লে জগতের যে কোন কাজ দেখব, তার কারণ জগতেই পেতে হবে, জগতের অতীত কোন কারণ পেতে পারি নে। জগত থেকে জগতের অতীত কারণের কথা বলা খাঁটি তর্কের ফলে আসতে পারে না। জগতের কোন কাজের কি আমরা জগতের অতীত কোন কারণ প্রত্যক্ষ করেছি যে বলব, জগতের স্রষ্টা একজন পূর্ণ পুরুষ আছেন? জগতের স্রষ্টা পূর্ণ পুরুষের কথা আমরা আমাদের ভিতর থেকে বুঝতে পারলেও তর্কের সিদ্ধান্তরূপে পাইনে।

আসল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের অতীত, তর্কের অতীত, জন্ম থেকেই মনের ভিতরে পাওয়া সত্য অবলম্বন করে যদি শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে আলোচনা করি, তবেই ঈশ্বরের কথা, আত্মার কথা প্রাণের ভিতর এক আশ্চর্য্য জ্যোতিঃনিয়ে খুলে যাবে। আস্তিকেরা বলেন যে, তাঁরা যে আত্মার কথা বলেন, সে আত্মা শূন্য আত্মা নয়, কথার কথা নয়; আর তাঁরা যে পরমেশ্বরের কথা বলেন, সে পরমেশ্বর মিথ্যা কথার কথা নন, তিনি প্রাণের মধ্যে সর্ব্বদাই জেগে আছেন। আস্তিকেরা বলেন যে আত্মাই সেই পরমেশ্বরের "সোনার সিংহাসন"; আর তাঁরা যে ঈশ্বরের চরণে ভক্তিশ্রদ্ধা দেন, তিনি যেমন ইন্দ্রিয়ের অতীত, তেমনি তর্কেরও অতীত; আমাদের কোন রকম অপূর্ণভাব তাঁর সীমা বেঁধে দিতে পারে না। তাঁকে একমাত্র আত্মার ভিতর দিয়েই জানতে পারা যায়; তাঁর কোন অবয়ব নেই; তিনি আপ্ত-

নাতেই আপনি স্থির, এবং আপনাতেই আপনি পরিপূর্ণ।

হে প্রাণের দেবতা, আমাদের প্রাণ থেকে তোমার বিষয়ে সমুদয় সংশয় দূর করে দাও। আমাদের প্রাণ শীতল হোক, হৃদয় শান্তিলাভ করুক।

ললিত বিস্তর।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ)

ভো ভিক্ষুগণ! ললিত বিস্তর নামক ধর্ম্ম-পর্য্যায়ভুক্ত সূত্রান্তস্থানীয় মহাবৈপুল্য গ্রন্থ কি?

যখন (বৌদ্ধ) ধর্ম্মমহাসভা আহূত হয় (মহা-ধর্ম্মসাঙ্কথ্য * প্রবৃত্ত হইলে), সেই সময়ে তুষিত-বর-ভবনস্থিত সর্ব্বদেবপূজিত বোধিসত্ত্বের শুভ-চরিত্র বিষয়ে এই চতুরশীতি সহস্র চেতনাদায়িনী গাথা চতুরশীতি সহস্র তূর্য্যনাদের সহিত সঙ্গীত হইয়াছিল †। ‡ তুষিতস্থিত বরভবনে তাঁহার বাস। তিনি পূজ্যগণ কর্ত্তৃক অভিপূজিত এবং (বোধিসত্ত্বপদে) অভিষিক্ত। শতসহস্রসংখ্যক দেবগণ তাঁহার স্তব, অর্চ্চনা, স্বরূপবর্ণনা ও প্রশংসা-পূর্ব্বক অভিষেক করিয়াছিলেন। তিনি ধ্যানে একাগ্রচিত্ত এবং পূর্ব্ববুদ্ধগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত ধর্ম্মের আলোচনায় প্রাজ্ঞ ও বিপুল জ্ঞান-নয়ন-সম্পন্ন। তাঁহার বিপুল বুদ্ধি স্মরণ ও মনন-বৃত্তির গ্রাহ্য এবং ধারণা সন্দীপিত। দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞারূপ মহোপায়সমূহের কৌশলে তিনি পারমিতাসমূহ অধিগত হইয়াছেন। তিনি মহামিলন ও বিপুল আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মমার্গের প্রদর্শক। তিনি মহতী অভিজ্ঞতার অতীত পরম তত্ত্বজ্ঞানের অভিমুখী। স্মৃতি, উপস্থান, তাদাত্ম্য, ঋদ্ধি, চরণাদি ইন্দ্রিয়ের বল, দেহ, মন ও চরিত্র প্রভাবে তিনি বুদ্ধধর্ম্মের চরম কোটিতে (সোপানে) সমারূঢ়। অপরিমিত পুণ্যসম্ভার প্রভাবে তাঁহার দেহকান্তি সমুজ্জ্বল এবং দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী(১)। প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্যশীলতার জন্য তিনি স্থির-প্রতিজ্ঞতা ও কৃতকার্য্যতার উদাহরণ স্থল (২)। তাঁহার অবিচলিত সরল মনে কুটিলতা ও বক্রতার স্থান নাই (৩)। কোনও প্রকার অভিমান, মাৎ-সর্য্য, দর্প, ভয় বা বিষাদ তাঁহার মনে নাই। তিনি সর্ব্বজীবে সমদর্শী, কোটিশঃ বুদ্ধগণ কর্ত্তৃক উপাস্যমান ও কোটি-নিযুত-শত-সহস্র বোধিসত্ত্ব কর্ত্তৃক নিরীক্ষিতবদন (৪)। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, লোক-পাল, দেব, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, গরুড়, কিন্নর, মহোরগ ও রাক্ষসগণ তাঁহার গৌরব-কীর্ত্তন করেন। তিনি সকল বিষয়ের প্রভেদনির্ণয়ে অহেতুকী বুদ্ধির অবতারণায় পারদর্শী। তিনি পূর্ব্ববুদ্ধগণের উপদেশগ্রহণে অনন্যমনস্কতাবিহীন-ধারণাসম্পন্ন। মহাধর্ম্মতরণী, স্মৃতি, উপস্থান, তাদাত্ম্য, ঋদ্ধি, চরণাদি ইন্দ্রিয়ের বল, দেহ, বুদ্ধি ও পারমিতা-রূপ উপায়ে অর্জ্জিত ধর্ম্মরত্ন ও

---

* মূলে আছে—মহাধর্ম্মসাঙ্কথ্যে প্রবৃত্তে। সাঙ্কথ্য শব্দ বর্ত্তমানে অপ্রচলিত। ইহার অনুরূপ আধুনিক শব্দ 'সম্মেলন'। সম্মেলনে বহুলোকের মধ্যে কথোপকথন হয় বলিয়া ইহার নাম 'সাঙ্কথ্য' (সম্+কথ্+ক্য)। চারিটী বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-মহাসভা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। অজাতশত্রু রাজার তত্ত্বাবধানে মগধে ৫৪৩ পূঃ খ্রীঃ প্রথম সম্মেলন, একশতাব্দী পরে কালাশোকের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় সম্মেলন, অশোকের তত্ত্বাবধানে ২৫৭ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সম্মেলন ও কণিষ্কের তত্ত্বাবধানে কাশ্মীরে ১৪০ পূঃ খ্রীঃ চতুর্থ সম্মেলন। এই সকল সম্মেলনে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসমূহ সঙ্কলিত ও সংগৃহীত হয়। এখানে কোন্ সম্মেলনের কথা বলা হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ প্রথম সম্মেলন।

† এই বাক্যটি এই অধ্যায়ের গদ্যাংশের শেষে আছে। বোধসৌকর্য্যার্থ অনুবাদে এই বাক্যটী প্রথম স্থানে দেওয়া হইল।

‡ রাজেন্দ্রলাল এ অংশ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—The word Bodhisattwa is preceded by upwards of a hundred epithets only remarkable for their extreme imaginativeness, but in no way important as elucidatory of any notable deed of the party to whom they are applied, or of his doctrines. We take the liberty to expunge them from the Eng. version, আমরা এস্থলে বিশেষণবাচক সমস্ত পদগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ বাক্য করিয়া অনুবাদ করিলাম। কারণ এত বড় (পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী) বাক্য ভাষার স্বভাববিরুদ্ধ।

(১) মূলে আছে—দীর্ঘানুপরিবর্ত্তিনঃ।

(২) মূলে—যথাবাদিতথাকার্য্যবিত্তরবাকর্ম্মসমুদাহারকস্য।

(৩) ঋজ্বকুটিলাবক্রাপ্রতিহতমানসস্য। এখানে ঋজু, অকুটিল ও অবক্র সমার্থক শব্দ। সংস্কৃত বক্র শব্দ ও পালি বঙ্ক শব্দ অভিন্ন। ইহা হইতেই বাঙ্গালা 'বাঁকা' হইয়াছে। প্রাকৃতে এই শব্দ 'বক্রাদি'-গণীয়।

(৪) বহুবোধিসত্ত্বকোটি-নিযুত-শত-সহস্রাবলোকিতবদনস্য। এই 'কোটি নিযুত শত সহস্র' সংখ্যা পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হইয়াছে।

পুণ্যপুঞ্জরূপ পণ্যের তিনি সার্থবাহতুল্য (৫)। তিনি চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মমার্গের পারগমনে কৃতপ্রতিজ্ঞ, অভিমানীর দর্পচূর্ণকারী ও পরপ্রবাদিগণের নিগ্রহীতা। তিনি বিচার-যুদ্ধে সর্ব্বপ্রথমস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত, ক্লেশদায়ক রিপুগণের নিসূদনকারী ও জ্ঞানরূপ দৃঢ় বজ্রপ্রহরণধারী। তিনি বোধিজ্ঞানের মূলাধার মহাকরুণারূপ দণ্ডে আস্থিত, গাম্ভীর্য্যসলিলে অভিষিক্ত, উপায়কুশলতারূপ বীজকোশসম্পন্ন, বোধিমার্গনিদিধ্যাসনে তৎপর, সমাধিরূপ কিঞ্জল্কবিশিষ্ট, সদ্‌গুণাবলীরূপ বিমল সরোবরে জাত, মদমাৎসর্য্যবিহীন উৎফুল্লতারূপ পরিবাহে শশিতুল্য বিমল ও বিস্তীর্ণ পত্রযুক্ত, শীলবিদ্যা-প্রসন্নতা-রূপ সৌরভে দশদিক আমোদকারী, জ্ঞান (-রূপ বারি) দ্বারা পরিপুষ্ট, অষ্ট লোকধর্ম্ম (-রূপ পঙ্ক-সলিলে) অনুপলিপ্ত মহাপুরুষ-পদ্ম (৬)। (সেই মহাপুরুষ-পদ্মের) পুণ্য ও জ্ঞানের সৌরভ বিস্তৃত, প্রজ্ঞাজ্ঞানরূপ দিনকরের কিরণে বিকশিত শতদল পদ্ম প্রস্ফুটিত। তিনি চতুর্ব্বিধ ঋদ্ধিসম্পন্ন পরম জাপকারী, চতুর্ব্বিধ আর্য্যসত্যস্বরূপ নখ-দন্তশালী, চতুর্বিধ ব্রহ্মবিহারদর্শনে উন্মীলিতনেত্র, চতুর্ব্বিধ সংগ্রহবস্তুরূপ শিরঃসম্পন্ন, দ্বাদশাঙ্গ-প্রতীতিরূপ উন্নত কায়সম্পন্ন, সপ্তত্রিংশৎ বোধিপক্ষরূপ অঙ্গসমন্বিত, নানা বিদ্যা ও জ্ঞানরূপ উদ্‌গত কেশর যুক্ত, ত্রিবিধ মোক্ষরূপ বিজৃম্ভিত মুখ বিশিষ্ট, সমর্থদর্শনরূপ উজ্জ্বল চক্ষুঃ সমন্বিত, ধ্যান-মোক্ষ-সমাধিরূপ গিরিগুহায় কৃতনিবাস, চতুর্ব্বিধ ঈর্য্যাপথবিনয়নরূপ উপবনে বর্দ্ধিত, দশ-বলবৈশারদ্যরূপ শক্তিসম্পন্ন, ভব-বিভব-ভয়-বিহীনতারূপ অসঙ্কুচিত পরাক্রমে জাত-লোম-হর্ষ, তীর্থসমূহরূপ শশক ও মৃগকুল-বিনাশী, পরমাত্মার অনস্তিত্ববিষয়ে কৃত-সিংহ-নাদ পুরুষ-সিংহ (১)। তিনি মুক্তি ও সমাধিরূপ মণ্ডলে প্রজ্ঞারূপ রশ্মি দ্বারা পরতীর্থিক খদ্যোতপ্রভা-বিনাশী, অবিদ্যারূপ অন্ধতমসের উচ্ছেদকারী উদ্দীপিত বলবীর্য্যরূপ তাপসম্পন্ন, দেব ও মনুষ্যগণের মধ্যে পুণ্যতেজোরূপ তেজঃসম্পন্ন, মহাপুরুষসূর্য্য (২)। তিনি (দুর্জ্জনসংসর্গরূপ) কৃষ্ণপক্ষবিহীন, (সৎসঙ্গরূপ) শুক্লপক্ষে পরিপূর্ণ, (কলঙ্কশূন্যতাহেতু) সর্ব্বতোভাবে প্রিয়দর্শন, (স্নিগ্ধতাহেতু) দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিদায়ক, শতসহস্র দেবগণরূপ জ্যোতিষ্কমণ্ডল (তারকা) পরিবেষ্টিত, ধ্যান-মোক্ষ-জ্ঞানরূপ মণ্ডলে সংস্থিত, বোধিমার্গরূপ স্নিগ্ধ চন্দ্রিকা বিশিষ্ট, বুদ্ধধর্ম্মীমানবরূপ কুমুদকুসুমের বিকাশকারী মহাপুরুষ-চন্দ্র (৩)। তিনি চতুঃসত্যরূপ দীপালোকে উদ্ভাসিত, সপ্তবোধ্যঙ্গরত্নসমন্বিত, সর্ব্বসত্ত্বে সমচিত্ততারূপ প্রয়োগসম্পন্ন, অপ্রতিহতবুদ্ধি, দশবিধ কুশল কর্ম্মপথের তাপস (১) সমৃদ্ধিসম্পন্ন অলৌকিক গতিলাভে সমুৎসুক (২), সর্ব্বোত্তম ধর্ম্মরূপ রত্নচক্রের অপ্রতিহত প্রবর্ত্তক, চক্রবর্ত্তী উপাধি-বিশিষ্ট কুলীনবংশে জাত (৩), দুর্ব্বোধ ও দুরবগাহ্য সর্ব্ববিধ ধর্ম্মজ্ঞানরত্নে পরিপূর্ণ, অতৃপ্ত বিদ্যাগাম্ভীর্য্যের অনুরূপ কার্য্যজ্ঞান ও শীলাচরণ রূপ বেলা মধ্যে আবদ্ধ (৪), মহাপদ্মগর্ভরূপ লোচনসম্পন্ন বিপুল বুদ্ধির গাম্ভীর্য্যে মহাসাগর-সদৃশ (৫)। তিনি পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়ুরূপ চিত্তসম্পন্ন, দৃঢ়তা ও অবিচলতায় মেরুকল্প (৬), অনুনয়াদি অন্তরায় বর্জ্জিত, গগনতলের ন্যায় বিমল ও বিপুল বহুবিষয়ব্যাপী নিঃসঙ্গ বুদ্ধিশালী,

(৫) মহাধর্ম্মনৌস্মৃত্যুপস্থানসম্যক্‌প্রহাণর্দ্ধিপাদেন্দ্রিয়বলবোধ্যঙ্গ-মার্গপারমিতোপায়কৌশল্যধর্ম্মরত্নপুণ্যসমুদানীতমহাসার্থবাহস্য।

(৬) এখানে বুদ্ধধর্ম্মের অঙ্গসমূহ লইয়া একটী পদ্ম পরিকল্পিত হইয়াছে।

(১) এখানে বুদ্ধদেবের গুণাবলী লইয়া একটী সিংহ পরিকল্পিত হইয়াছে। কল্পনায় কবিত্ব আছে, মাধুর্য্য আছে।

(২) এখানে বুদ্ধদেবকে সূর্য্যের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। এখানেও কবিত্ব ও মাধুর্য্য আছে।

(৩) এখানে বুদ্ধদেব চন্দ্রের সহিত উপমিত হইয়াছেন। এখানেও কবিত্ব ও মাধুর্য্য আছে। তবে এস্থলে উপমা পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া স্থানে স্থানে ব্র্যাকেট দ্বারা অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়া লওয়া হইয়াছে।

(১) মূলে—দশকুশলকর্ম্মপথব্রততপসঃ।

(২) সুসমৃদ্ধপ্রাতিপূর্ণবিশেষগমনাভিপ্রায়স্য। 'পরিপূর্ণ' স্থানে ললিত বিস্তরে পায় সর্ব্বত্র 'প্রতিপূর্ণ' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

(৩) চক্রবর্ত্তিবংশকুলকুলোদিতস্য। এখানে তিনটী সমার্থক শব্দ একত্র।

(৪) অতৃপ্তশ্রুতবিপুলবিস্তীর্ণারত্নজ্ঞানশীলবেলানতিক্রমণস্য। সমুদ্রের সহিত তুলনা বলিয়া জ্ঞান-শীলাদিরূপ বেলা কল্পিত হইয়াছে। সমুদ্র যেমন গম্ভীর ও দুরবগাহ্য, সেইরূপ বেলা মধ্যে আবদ্ধ আছে। বুদ্ধসমুদ্রও তেমনি বেলা মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন।

(৫) এখানে বুদ্ধদেবের মহাসাগরের সহিত তুলনা। এই তুলনাসমূহ কষ্টকল্পিত হইলেও বেশ কবিত্ব মাখা।

(৬) এখানে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত বুদ্ধদেবের আংশিক তুলনা।

অনবদ্য ও বিশুদ্ধ আশয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত, সৎপাত্রে দানশীল, যথাবিধি পূর্ব্বযোগ অভ্যাসকারী, (ধর্ম্মে) যথাবিধি লব্ধাধিকার, সত্যধর্ম্মপ্রচারী ও সকলের অভিলষিত। তিনি সর্ব্বপ্রকার কুশলের মূলস্বরূপ, নির্ব্বাণের ন্যায় অধিগতসিদ্ধি তিনি সপ্তসংখ্যক কল্পে সর্ব্ববিধ কুশলের মূল উদ্ধার করিয়াছেন, সৎপাত্রে সপ্তবিধ দান করিয়াছেন, পঞ্চবিধ পুণ্য, পঞ্চবিধ ক্রিয়া, পঞ্চবিধ বস্তু লাভ করিয়াছেন, ত্রিবিধ দেহ, চতুর্ব্বিধ বাক্য ও ত্রিবিধ মনের দ্বারা সুচরিত্র, দশকুশল কর্ম্মপথাদি এবং চত্বারিংশৎ অঙ্গের অনুরূপ অনুষ্ঠানে কৃতাভ্যাস। তিনি চত্বারিংশৎ অঙ্গের অনুরূপ সমুচিত সমাধিতে দত্তচিত্ত, * চত্বারিংশৎ অঙ্গের অনুরূপ অধ্যাশয়ে লব্ধপ্রতিপত্তি, চত্বারিংশৎ অঙ্গের অনুরূপ মোক্ষ-লাভে কৃতকার্য্য, চত্বারিংশৎ অঙ্গের অনুরূপ অধি-মুক্তিলাভের সরলতাসম্পাদনকারী, চত্বারিংশৎ নিযুত-শত-সহস্রসংখ্যক বুদ্ধকোটিতে (মার্গে) কৃতবিচরণ। পঞ্চপঞ্চাশৎ নিযুত-শত-সহস্র বুদ্ধকোটিতে তিনি বহু দান করিয়াছেন, প্রত্যেকবুদ্ধগণের প্রাপ্য সিদ্ধির চারি শত কোটি-গুণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি যত জীবকে স্বর্গ ও মোক্ষমার্গে উন্নীত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করাও যায় না সংখ্যা করাও যায় না। অনুত্তর সম্যক্ সম্বোধিলাভে কৃতপ্রতিজ্ঞ, বিশুদ্ধজন্মা, ইহলোক হইতে উন্নীত হইয়া তুষিতস্থিত বরভবনে কৃতনিবাস, শ্বেতকেতু নামক দেবপুত্রোত্তম সর্ব্ব-বিধ দেবসঙ্ঘের অভিপূজিত। তিনি সেখান হইতে উন্নীত হইয়া অচিরাৎ অনুত্তর সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিবেন। দ্বাত্রিংশৎ সহস্র ভূমিগৌরবে সংস্থিত, অলিন্দ-তোরণ-গবাক্ষ-হর্ম্ম্য-কূটাগার-প্রাসাদ-সমলঙ্কৃত, উন্নমিতছত্র-ধ্বজাদি ও রত্ন-কিঙ্কিনীবিতানে সমাচ্ছন্ন, কোটি-নিযুত-শত-সহস্র অপ্সরোগণের(১)সঙ্গীতিমুখরিত, অতিমুক্তক-চম্পক-পাটল-কোবিদার-মুচুকুন্দ-মহামুচুকুন্দ-অশোকন্যগ্রোধ কিংশুক-শতকর্ণিকার-কেশর-রসাল প্রভৃতি (২) বৃক্ষে উপশোভিত, সুবর্ণজালে সমাচ্ছন্ন, পূর্ণকুম্ভাদি দ্বারা সুশোভিত, বহুজনসমাকীর্ণ, (৩) কোটি-নিযুত-শত-সহস্র দেবগণ কর্ত্তৃক অবলোকিত ও রক্ষিত, সর্ব্ববিধ কামনা রতি ও ক্লেশবিনাশী ধর্ম্মসঙ্গীতিমুখরিত, সর্ব্ববিধ কাম-ক্রোধ-মান মদ-মাৎসর্য্যবর্জ্জিত, বিলুপ্ত স্মৃতির উদ্দীপনাকারী প্রীতি, প্রসন্নতা (৪) ও আমোদে পরিপূর্ণ সেই মহাবিমানে * সুখোপবিষ্ট বোধিসত্ত্ব সন্নিধানে ধর্ম্ম-মহাসম্মেলন প্রবৃত্ত হইলে চতুরশীতি সহস্র তূর্য্য-নাদ সহ বোধিসত্ত্বের পূর্ব্বচরিতবিষয়ক এই চতুরশীতি সহস্র গাথা উচ্চারিত হইয়াছিল (৫)

সেই বিপুল পুণ্যের আধার, স্মরণ-মননের লক্ষ্য অনন্ত প্রজ্ঞা-প্রভাকরের ধ্যান কর। তিনি দীপঙ্কর (১) অপেক্ষাও অতুল বলবিক্রম সম্পন্ন।

---

* এখানে চত্বারিংশৎ শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হইয়াছে। ইহা কি কোনও প্রকার সংখ্যাপ্রিয়তা? এই প্রকার দ্বাত্রিংশৎ, পঞ্চপঞ্চাশৎ ও চতুরশীতি শব্দেরও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। আমাদের বঙ্গভাষাতেও এই প্রকার সংখ্যাবিশেষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন 'সাত পাঁচ ভাবা,' 'নয়-ছয় হইয়া পড়িয়া থাকা', 'সাত সমুদ্র তের নদী', 'চিঁড়ের বাইশ ফের', 'ঊনপঞ্চাশ পবন', 'সাত রাজার ধন এক মাণিক', 'সাত-সতের', 'সাত চোরের মার', 'সাপের পাঁচ পা দেখা', 'পাঁচজনের বা দশ জনের কথা', 'দশ চক্রে ভগবান ভূত', 'দশে মিলে (পাঁচে মিলে) করি কাজ—হারি জিতি নাহি লাজ'। অন্যান্য ভাষাতেও এইরূপ পক্ষপাত দৃষ্ট হয়। ইংরাজীতে Thirteen is a mysterous number.

* বিমান শব্দের অর্থ প্রাসাদ ও আকাশ। উভয়বিধ অর্থেরই ধ্বনি আছে।

(১) ললিত বিস্তর জন্মিবার পূর্ব্বেই অপ্সরোগণ সঙ্গীতের আসরে নামিয়াছেন।

(২) অধিকাংশই পুষ্প বৃক্ষ; কিন্তু ইহাদের সবগুলির বর্ত্তমান পরিচয় জানি না।

(৩) মূলে 'জ্যোতির্মালিকাসুমনোবাতে', অর্থ পরিস্ফুট হয় নাই।

(৪) প্রীতিপ্রাসাদপ্রামোদোত্তপ্তবিলুপ্তস্মৃতিসঞ্জননে।

(৫) এই শেষের অংশটী অনুবাদে দুইবার দেওয়া হইল। এখানে গদ্যাংশের সমাপ্তি। এই সমস্ত গদ্যাংশ লইয়া দুইটী মাত্র বাক্য; তাহাতে কেবল কতকগুলি দীর্ঘ সমাস পাশাপাশি বিন্যস্ত এবং অতি দুর্ব্বোধ ভাষা। রাজেন্দ্রলাল এ অংশ ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছেন; কিন্তু এখানে যে কবিত্ব আছে তাহাও তিনি বাদ দিয়া ফেলিয়াছেন। আমারাও সঠিক অনুবাদ করিয়াছি এ কথা বলিতে পারিনা—Fools rush in where agels fear to tread, এখানকার শব্দগুলিও অদ্ভুত রকমের। এককথায় ভাষাটাকে পোষ মানন দায়।

(১) দীপঙ্কর—"The last Buddha of the twelfth preceding, or "Saramanda" kalpa, in which four Buddhas appeared. He was born at Ramyavati nagara. His parents were Sudeva Raja and Sumedhya Devi. He as well as all other buddha of this kalpa attained Buddhahood at Uruvelâya, now called Buddha-Gaya. His 'bo' tree was the 'pippala'. Goutama was then a member of an illustrious Brahmin family in Amaravati nagara.

যাঁহার মন বিপুল ও নির্ম্মল, যিনি ত্রিবিধ মালিন্যমুক্ত * ও মদ-দোষ-বর্জ্জিত, যাঁহার চিত্ত মঙ্গল ও বিশুদ্ধতার আধার এবং যিনি দানচর্য্যা(২) প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ (সেই অনন্ত প্রজ্ঞা-প্রভাকরের ধ্যান কর)।

ভোঃ কুলীনবংশসম্ভূত ভিক্ষুবর্গ! যিনি বৈরাগ্য ও শীলানুশীলনে গৃহীতব্রত, ক্ষমা ও আত্মসংযমে কৃতাভ্যাস, কোটি কল্প ব্যাপিয়া বীর্য্য-বল-ধ্যান-প্রজ্ঞাদিসম্পন্ন (সেই অনন্ত প্রজ্ঞা-প্রভাকরের ধ্যান কর)।

হে অনন্তকীর্ত্তি ভিক্ষুগণ! তোমরা কোটি কোটি অতীত বুদ্ধগণের অর্চ্চনা করিয়াছ। তাঁহারা সর্ব্বজীবে করুণা প্রদর্শন করিতেন। অনুকূল সময় সমাগত;—উপেক্ষা করিও না। (৩)

হে জরামরণক্লেশনিসূদন! হে বিধিজ্ঞ! হে রজোবিমুক্ত! (অনন্ত ধাম হইতে) অবতরণ করুন। আপনার দর্শন আশায় বহু দেব, অসুর, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন (৪)।

সহস্র কল্প যাবৎ সমুদ্র অগাধ বারির ন্যায় অপরিমেয় উপভোগ সামগ্রীজাতের উপভোগ করিয়াও ইঁহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। হে প্রজ্ঞাতৃপ্ত! আপনি এই তৃষার্ত্ত জনসংঘের তৃষ্ণানিবারণ করুন। (১)

আপনি অনবদ্যকীর্ত্তি, ধর্ম্মানুশীলননিরত এবং বাসনা-বিমুক্ত, অনুকম্পার বিমলদৃষ্টিদানে দেবলোক ও মর্ত্ত্যলোককে (২) [পরিতৃপ্ত করুন]।

যেহেতু ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া অসংখ্য দেবগণ (৩) পরিতৃপ্ত হয়েন না, সুতরাং যাহারা আপনার রক্ষণাশ্রিত ও অপায়সংস্থিত তাহাদিগের উপর আপনি (করুণা-) দৃষ্টিপাত করুন।

যেহেতু আপনি বিমলদৃষ্টি এবং দশদিকে বুদ্ধগণকে দর্শন ও ধর্ম্মকথা শ্রবণ করেন, সেই হেতু আপনি ইহলোকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের প্রচার করুন।

হে শ্রীমন্! যেহেতু পুণ্যশ্রীপ্রভাবে আপনার তুষিতভবন সুশোভিত, সেইহেতু আপনি জম্বুবর্ষে (৪) করুণাবৃষ্টি বর্ষণ করুন।

কামধাতু দেবগণের অবস্থা হইতে সমুন্নীত হইয়া যাঁহারা রূপধাতু লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলে সিদ্ধব্রত বোধিলাভের অভিনন্দন করেন।

হে মারনিসূদনকর্ম্মা! হে নাথ! আপনি অন্যান্য বহু কুতীর্থিকগণকেও পরাজিত করিয়াছেন। সেই জন্য সর্ব্বসত্ত্বগত ত্রিবিধ বুদ্ধিলাভের এই সময় সমাগত; আর উপেক্ষা চলে না।

হে বীর! এই লোকে ক্লেশাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে আপনি মেঘবৎ ব্যাপ্ত হইয়া নর-রূপ মরুভূমিতে অমৃত (নির্ব্বাণ) (১) রূপ বারিবর্ষণ করিয়া ক্লেশাগ্নির প্রশমন করেন। (২)

আপনি বৈদ্যবিদ্যাকুশল, সত্যবান্ ও সত্য-বিষয়ে চিকিৎসক। সুতরাং শীঘ্রই চিরাতুরগণকে ত্রিবিধ ব্যাধি নিবারণসমর্থ মোক্ষযোগরূপ ঔষধের সাহায্যে নির্ব্বাণসুখ দান করুন।

সিংহনাদ না শুনিলে নির্ভীকহৃদয়ে ফেরুপাল রব করিতে থাকে। [সুতরাং] আপনি বুদ্ধ সিংহনাদপূর্ব্বক পামরমতাবলম্বীরূপ শৃগালপালকে সন্ত্রাসিত করুন। (৩)

---

(২) মূলে—শুভবিমলবিশুদ্ধচিত্তা দানচরীয়া প্রজ্ঞাহতিপূরে।

(৩) কালোঽয়ম্ মা উপেক্ষস্ব।

* ত্রিমল-মল-প্রহীণ—কায়-মনো-বাক্যের দ্বারা কৃত ত্রিবিধ মালিন্য বা পাপ রহিত।

(৪) রাজেন্দ্রলালের অনুরূপ অনুবাদ।

(১) মূলে—কল্পসহস্রং রমিত্বা তৃপ্তা নাসন্নস্তসীব সমুদ্রে।
সাধুভব প্রজ্ঞাতৃপ্ত তর্পয় জনতাং চিরতৃষার্ত্তাম্॥

রাজেন্দ্র নাথের অনুবাদ - Enjoyment with thee for even a thousand kalpas produces not satiaty, as pouring their contents into the occan satisfies not rivers; come thou, therefore, O contented in wisdom, and allay the desire of this longing world.

(২) মূলে—সদেবকং লোকং। রাজেন্দ্রলাল on men and gods,

(৩) মূলে—দেব-নযুতাঃ। রাজেন্দ্রলাল—the godly. আমরা "নযুতাঃ=অযুতাঃ" অর্থ করিয়াছি। এখানে 'অযুত' শব্দ দিয়া সন্ধি করিলে অর্থবোধে ব্যাঘাত হয়। এই জন্যই বোধ হয় পালি সন্ধিতে স্থানে স্থানে 'নকারের' আগম হয়।

(৪) পুরাণে জম্বুদ্বীপ শব্দে সমস্ত এসিয়াখণ্ড বুঝায়। কিন্তু এখানে ভারতবর্ষ মাত্র।

(১) পালিতে অমৃতপদ=অমতং পদং, অর্থ নির্ব্বাণ। ধম্মপদে—"যো চ বস্সসতং জীবে অপস্সং অমতং পদং। একাহং জীবিতং সেয্যো পস্সতো অমতং পদং।"

(২) উপমা।

(৩) এখানে 'পরতীর্থিক শৃগালান্' শব্দের অনুবাদ রাজেন্দ্রলাল করিয়াছেন "vulpine heretics;" পরবর্ত্তী শ্লোকে কেবল জৈনধর্ম্মের উপর কটাক্ষ থাকিলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মিগণও এই 'শৃগাল' শব্দের ব্যুৎপত্তির অন্তর্ভুক্ত।

হে বলবীর্য্যশালিন্! প্রজ্ঞাপ্রদীপ হস্তে ধরণী-মণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া করতলপ্রহারে জিন ও মারকে নিহত করিয়া ধরণীর হিতসাধন করুন।

চতুঃসংখ্যক দিক্‌পালগণ আপনাকে পানপাত্র(৪) দান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিয়াছেন। শক্রগণ ও অসংখ্য ব্রহ্মগণ আপনি জন্মগ্রহণ করিবা মাত্র আপনার অভিনন্দন করিবেন।

হে সুমতি! প্রথিতনামা কুশলযুক্ত উৎকৃষ্ট কুলে উদিত কুলীন পুরুষগণকে অবলোকন করুন। সেখানে যাইয়া আপনি বিগ্রহযুক্ত বোধি দর্শন করিবেন। (১)

হে শ্রীমন্! আপনার এই যে পাত্রে মণিরত্ন সংগৃহীত আছে, হে বিমলবুদ্ধে! জম্বুদ্বীপে সেই মণিরত্ন বর্ষণ করুন।

এইরূপ তূর্য্যনির্ঘোষ সহ সঙ্গীতস্বরে উচ্চারিত বহুবিধ গাথায় সেই করুণাময়ের সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই সেই শুভক্ষণ সমাগত—উপেক্ষা করিও না।

ললিত বিস্তরে সমুৎসাহন পরিবর্ত্ত নামক
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতাধ্যায় সঙ্গতি।

(গীতারহস্য—চতুর্দ্দশ প্রকরণ)

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[গীতাধ্যায় সঙ্গতির প্রথম অংশ ১৮৪০ শকের চৈত্র এবং ১৮৪১শকের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে]

গীতার ১৮শ অধ্যায়ের যে সঙ্গতি উপরে বলা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, গীতা কিছু কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন স্বতন্ত্র নিষ্ঠার খিচুড়ী নহে; কিংবা উহা তুলা রেশম ও জরির সেলাই করা কাঁথা নহে; বরং দেখা যাইবে যে, তুলা, রেশম ও জরির বিভিন্ন সূত্র যথাস্থানে যোগ্যরূপে বসাইয়া দিবার পর, কর্ম্মযোগ নামক মূল্যবান ও মনোহর গীতারূপ বস্ত্রখণ্ড প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত 'অত্যন্ত যোগযুক্ত চিত্তের দ্বারা' ঠাসবুনানি হইয়াছে। নিরূপণের পদ্ধতি কথোপকথনমূলক হওয়ায় শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অপেক্ষা উহা একটু শিথিল হইয়াছে সত্য; কিন্তু কথোপকথনমূলক নিরূপণের দ্বারা শাস্ত্রীয় পদ্ধতির রুক্ষতা গিয়া তাহার বদলে যে সুলভতা ও প্রেমিকতায় উহা পূর্ণ হইয়াছে, তাহা মনে করিলে, শাস্ত্রীয়পদ্ধতির হেতু—অনুমানের কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য নীরস কথা না থাকা তিলমাত্র কাহারও খারাপ লাগিবে না। সেইরূপ আবার, গীতানিরূপণের পদ্ধতি পৌরাণিক কিংবা সংবাদাত্মক হইলেও মীমাংসকদিগের গ্রন্থবিচারের সমস্ত কষ্টিপাথর তাহাতে প্রয়োগ করিয়া গীতার তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে কোন বাধা হয় না, ইহা এই গ্রন্থের সমস্ত বিচার আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে। গীতার প্রারম্ভ দেখিলে, ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত অর্জ্জুন ধর্ম্মাধর্ম্মবিচিকিৎসার চক্রের মধ্যে পড়িলে পর, বেদান্ত-শাস্ত্র অনুসারে তাঁহাকে প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মযোগধর্ম্মের উপদেশ দিবার জন্য গীতা প্রবৃত্ত হইয়াছেন :এইরূপ স্পষ্ট দেখা যায়; এবং গীতার উপসংহার ও ফল এই দুই উভয়েরই প্রকারান্তর অর্থাৎ প্রবৃত্তিমূলক ইহা প্রথম প্রকরণেই আমি দেখাইয়াছি। তাহার পর, আমি বলিয়াছি যে, গীতায় অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে "তুমি যুদ্ধ অর্থাৎ কর্ম্মই কর" এইরূপ স্পষ্টরূপে দশবারোবার ও পর্য্যায়ক্রমে অনেকবার (অভ্যাস) বলা হইয়াছে; এবং আমি ইহাও বলিয়াছি যে, সংস্কৃত সাহিত্যে কর্ম্মযোগের উপপত্তি আছে এরূপ গীতা ছাড়া দ্বিতীয় না থাকায় অভ্যাস ও অপূর্ব্বতা এই দুই প্রমাণের দ্বারা গীতার কর্ম্মযোগের প্রাধান্যই অধিক ব্যক্ত হয়। মীমাংসকদিগের গ্রন্থতাৎপর্য্য নির্ণয়ার্থ যে সকল কষ্টিপাথরের কথা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে অর্থবাদ ও উপপত্তি এই দুই অবশিষ্ট থাকিয়া গিয়াছে। ইহাদের সম্বন্ধে প্রথমে পৃথক্ পৃথক্ প্রকরণে এবং এক্ষণে গীতার অধ্যায়ক্রম অনুসারে এই প্রকরণে যে বিচার করা হইয়াছে তাহা হইতে 'কর্ম্মযোগ'ই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় এইরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব, মীমাংসকদিগের গ্রন্থতাৎপর্য্যনির্ণয়ের সমস্ত নিয়ম প্রয়োগ করিয়া দেখিলেও গীতাগ্রন্থে জ্ঞানমূলক ও ভক্তিপ্রধান কর্ম্মযোগই প্রতিপাদ্য হইয়াছে, ইহাই নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয়। এখন সন্দেহ নাই যে, ইহার অতিরিক্ত বাকী সমস্ত গীতা-তাৎপর্য্য সাম্প্রদায়িক। এই সকল তাৎপর্য্য সাম্প্রদায়িক হইলেও এই প্রশ্ন করা যায় যে, গীতার এই সাম্প্রদায়িক অর্থ—বিশেষতঃ সন্ন্যাসমূলক অর্থ—সন্ধান করিবার কৌশল কেমন করিয়া কতক লোক পাইল? এই প্রশ্নেরও বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত এই সাম্প্রদায়িক অর্থের আলোচনা সম্পূর্ণ হইল, বলা যায় না। তাই এই সাম্প্রদায়িক টীকাকারেরা গীতার সন্ন্যাসমূলক অর্থ কিরূপে করেন, এক্ষণে তাহার একটু বিচার করিয়া এই প্রকরণ শেষ করিব।

---

(৪) পানপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

(১) মূলে—দর্শিষ্যসি বোধি সচরিতম্। রাজেন্দ্রলাল—abididing among whom thou shalt reveal the duties of Bodhisattva,

মনুষ্য বুদ্ধিমান্ প্রাণী হওয়ায় পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব উপলব্ধি করাই তাহার মুখ্য কার্য্য কিংবা পুরুষার্থ, এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাকেই 'মোক্ষ' বলে। তথাপি দৃশ্যজগতের ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি করিয়া শাস্ত্রে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পুরুষার্থ চারি প্রকার—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। 'ধর্ম্ম' শব্দে এইস্থানে ব্যবহারিক সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পুরুষার্থ এইরূপ চতুর্ব্বিধ স্বীকার করিলে পর, তাহার চারি অঙ্গ পরস্পরের পোষক কিংবা পোষক নহে এই প্রশ্ন স্বতই উৎপন্ন হয়। ইহার জন্য যেন মনে থাকে যে, পিণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে যে তত্ত্ব আছে তাহার জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় না; ফের সেই জ্ঞান যে-কোন মার্গের দ্বারাই পাওয়া যাক্ না কেন। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শাব্দিক মতভেদ থাকিলেও তত্ত্বতঃ মতভেদ নাই। অন্ততঃ গীতাশাস্ত্রে এই সিদ্ধান্তই সর্ব্বথা গ্রাহ্য। সেইরূপ আবার, অর্থ ও কাম এই দুই পুরুষার্থ সম্পাদন করিতে হইলে উহাও নীতিধর্ম্মের দ্বারাই করিতে হইবে এই তত্ত্বও গীতার সম্পূর্ণ মান্য। এক্ষণে কেবল ধর্ম্ম (অর্থাৎ ব্যবহারিক চাতুর্ব্বর্ণ্য-ধর্ম্ম) ও মোক্ষের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বাকী আছে। তন্মধ্যে, ধর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না হইলে মোক্ষের কথাই উত্থাপন ব্যর্থ—এই সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদসম্মত। কিন্তু এই চিত্তশুদ্ধি করিতে অনেক সময় লাগে। তাই, মোক্ষ-দৃষ্টিতে বিচার করিলেও, তৎপূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথম 'ধর্ম্মের দ্বারা' সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে এইরূপই সিদ্ধান্ত হয় (মনু, ৬. ৩৫-৩৭)। সন্ন্যাস অর্থে ত্যাগ করা; এবং ধর্ম্মের দ্বারা যাহার এই সংসারে কিছুই সিদ্ধ হয় নাই, সে ত্যাগ করিবেই বা কি? অথবা যে ব্যক্তি 'প্রপঞ্চ'ই (সাংসারিক কর্ম্ম) ঠিক-ঠিক সাধন করিতে পারে না, "সেই হতভাগ্য" পরমার্থ কি প্রকারে ঠিক সাধন করিবে (দাস. ১২. ১. ১-১০ এবং ১২. ৮. ২১-৩১ দেখ)? কাহারও চরম উদ্দেশ্য বা সাধ্য সাংসারিকই হউক বা পারমার্থিকই হউক, ইহা সুস্পষ্ট যে, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য দীর্ঘ প্রযত্ন, মনোনিগ্রহ ও সামর্থ্য ইত্যাদি গুণের সমান অপেক্ষা থাকে; এবং এই সকল গুণ যাহার নাই, সে কোন সাধ্যই প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহা স্বীকার করিয়াও কেহ কেহ পরে এইরূপ বলেন যে, দীর্ঘপ্রযত্ন ও মনোনিগ্রহের দ্বারা আত্মজ্ঞান হইলে পর, শেষে জগতের বিষয়োপভোগরূপ সমস্ত ব্যবহার অসার বলিয়া মনে হয়; এবং সর্প যেরূপ আপন অব্যবহার্য্য চুর্ম্ম ফেলিয়া দেয় সেইরূপ জ্ঞানীপুরুষও সমস্ত ঐহিক বিষয় ত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরস্বরূপেই লীন হইয়া থাকেন (বৃ. ৪. ৪. ৭)। জীবনযাত্রায় এই মার্গে সমস্ত ব্যবহার ত্যাগ করিয়া শেষে কেবল জ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়ায়, ইহাকে জ্ঞাননিষ্ঠা সাংখ্যনিষ্ঠা কিংবা সমস্ত ব্যবহার ত্যাগ করিলে সন্ন্যাসনিষ্ঠাও বলা হয়। কিন্তু ইহার উল্টা গীতাশাস্ত্র বলেন যে, প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্য 'ধর্ম্ম' আবশ্যক তো বটেই কিন্তু পরে চিত্তশুদ্ধি হইলে পর নিজের জন্য বিষয়োপভোগরূপ ব্যবহার তুচ্ছ হইলেও লোকসংগ্রহার্থ ঐ ব্যবহারই কেবল স্বধর্ম্ম কিংবা কর্ত্তব্য বলিয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে করা আবশ্যক। জ্ঞানীপুরুষ এইরূপ না করিলে, দৃষ্টান্ত দেখাইবার কেহই থাকিবে না এবং জগৎ বিনষ্ট হইবে। এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্ম কাহাকেও ছাড়ে না; এবং বুদ্ধি নিষ্কাম হইলে কোন কর্ম্মই মোক্ষের অন্তরায় হইতে পারে না। তাই সংসারের কর্ম্ম ত্যাগ না করিয়া অন্য লোকের ন্যায় জগতের সমস্ত ব্যবহার বিরক্তবুদ্ধিতে আচরণ করাই জ্ঞানীপুরুষেরও কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। গীতায় উপদিষ্ট জীবনযাত্রায় এই মার্গকেই কর্ম্মনিষ্ঠা কিংবা কর্ম্মযোগ বলে। কিন্তু কর্ম্মযোগ এইরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাহার জন্য গীতাতে কোথাও সন্ন্যাসমার্গের নিন্দা করা হয় নাই। বরং উহাও মোক্ষপ্রদ এইরূপ বলা হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যায় যে, জগতের আরম্ভে সনৎকুমারাদি এবং পরে শুকযাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষি যে মার্গ স্বীকার করিয়াছেন তাহাকে ভগবানও সর্ব্বথৈব ত্যাজ্য কিরূপে বলিবেন? সাংসারিক ব্যবহার কাহারও নিকট নীরস কিংবা মিষ্ট লাগা উহার কিয়দংশে প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত জন্মস্বভাবের উপর নির্ভর করে। এবং জ্ঞান হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ না হইলে নিষ্কৃতি নাই ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাই এই প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত জন্মস্বভাব হেতু কোন জ্ঞানী পুরুষের মনে সংসারে বিরক্তি উৎপন্ন হওয়ায় তিনি যদি সংসার ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কোন ফল নাই। আত্মজ্ঞানের দ্বারা যে সিদ্ধ-পুরুষের বুদ্ধি নিঃসঙ্গ ও পবিত্র হইয়াছে তিনি অন্য কিছু করুন বা না করুন; কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে তিনি মানববুদ্ধির শুদ্ধতার পরম সীমা এবং স্বভাবতই বিষয়লুব্ধ দুর্দ্ধর মনোবৃত্তিকে আপনার অধীনে আনিবার সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা সকল লোকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া দেন। তাঁহার এই কাজ লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতেও ছোট নহে। সন্ন্যাস ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের মধ্যে যে আদর-বুদ্ধি আছে, ইহাই তাহার প্রকৃত কারণ; এবং মোক্ষ-দৃষ্টিতে গীতারও ইহাই অভিমত। কিন্তু শুধু জন্মস্বভাবের প্রতি অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মেরই প্রতি লক্ষ্য না করিয়া যিনি পূর্ণ আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই জ্ঞানীপুরুষ এই কর্ম্মভূমিতে কিরূপ ব্যবহার করিবেন এই বিষয়ের শাস্ত্রীয় পদ্ধতিক্রমে বিচার করিলে কর্ম্মত্যাগ পক্ষ

গৌণ এবং জগতের আরম্ভে মরীচি প্রভৃতি এবং পরে জনকাদির আচরিত কর্ম্মযোগই জ্ঞানীপুরুষ লোকসংগ্রহার্থ স্বীকার করেন, গীতার অনুসরণে এই সিদ্ধান্তই করিতে হয়। কারণ, পরমেশ্বরের সৃষ্ট জগতের পরিচালন কার্য্যও জ্ঞানীপুরুষেরই করিতে হইবে, এক্ষণে এইরূপ স্বতই উপলব্ধি হয়; এবং এই মার্গে জ্ঞানসামর্থ্যের সঙ্গেই কর্ম্মসামর্থ্যেরও অবিরোধে মিলিত থাকিবার কারণে, এই কর্ম্মযোগ শুধু সাংখ্যমার্গ অপেক্ষা কোথাও অধিক যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ এই দুই নিষ্ঠার মধ্যে যে মুখ্য ভেদ তাহার উক্ত রীতি অনুসারে বিচার করিলে সাংখ্য + নিষ্কামকর্ম্ম = কর্ম্মযোগ, এই সমীকরণ নিষ্পন্ন হয়; এবং বৈশম্পায়নের উক্তি অনুসারে গীতার প্রবৃত্তি-মূলক কর্ম্মযোগের প্রতিপাদনের মধ্যেই সাংখ্যনিষ্ঠার নিরূপণেরও সমাবেশ স্বাভাবিক ভাবে হইয়া যায় (মভা. শাং. ৩৪৮. ৫৩)। এবং সেই জন্যই গীতার সন্ন্যাসমার্গীয় টীকাকারদিগের নিজেদের সাংখ্য কিংবা সন্ন্যাসমার্গই গীতার প্রতিপাদ্য এইরূপ দেখাইবার বেশ সুবিধা হইয়াছে। গীতার যে শ্লোকে কর্ম্ম শ্রেয়স্কর নির্দ্ধারণ করিয়া কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াচে, সেই শ্লোকের প্রতি উপেক্ষা করিলে, অথবা সে সমস্ত অর্থবাদাত্মক অর্থাৎ আনুসঙ্গিক প্রশংসাত্মক এইরূপ নিজের ইচ্ছামত টিপ্পনী কাটিলে কিংবা অন্য কোন যুক্তি অবলম্বন করিয়া উক্ত সমীকরণের 'নিষ্কাম কর্ম্ম'কে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে ঐ সমীকরণের সাংখ্য = কর্ম্মযোগ এই রূপান্তর হইয়া যায়; এবং গীতার সাংখ্য মার্গই প্রতিপাদ্য এইরূপ বলিবার সুযোগ হয়। কিন্তু এই রীতিতে গীতার যে অর্থ করা হয় তাহা গীতার উপক্রমোপসংহারের অত্যন্ত বিরুদ্ধ; এবং আমি এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে স্পষ্টরূপে করিয়া দেখাইয়াছি যে, গীতায় কর্ম্মযোগকে গৌণ এবং সন্ন্যাসকে মুখ্য এই মনে করা কিরূপ অনুচিত? যেমন গৃহকর্ত্তার গৃহে গৃহকর্ত্তাকে অতিথি এবং অতিথিকে গৃহকর্ত্তা মনে করা যেরূপ অসঙ্গত ইহাও সেইরূপ। যাঁহাদের মত এই যে, গীতাতে নিছক্ বেদান্ত, কেবল ভক্তি কিংবা শুধু পাতঞ্জল যোগই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাঁহাদের এই মতের খণ্ডন আমি করিয়াই আসিয়াছি। গীতায় কোন্ বিষয় নাই? বৈদিক ধর্ম্মে মোক্ষপ্রাপ্তির যে সকল সাধন বা মার্গ আছে তন্মধ্যে প্রত্যেক মার্গের কোন-না-কোন অংশ গীতায় গৃহীত হইয়াছে; এবং ইহার পরেও "ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো" (গী. ৯. ৫) এই নীতি অনুসারে গীতার প্রকৃত রহস্য এই সমস্ত মার্গ হইতে পৃথকই হইয়াছে। জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় না সন্ন্যাসমার্গের অর্থাৎ উপনিষদের এই তত্ত্ব গীতার গ্রাহ্য; কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মের সহিত তাহা জুড়িয়া দেওয়ায় গীতার ভাগবত ধর্ম্মের মধ্যেই যতি-ধর্ম্মেরও সমাবেশ সহজে হইয়াছে। তথাপি গীতায় সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের অর্থ কর্ম্মত্যাগ না করিয়া, ফলাশা ত্যাগ করাই প্রকৃত বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস এইরূপ বলিয়া শেষে উপনিষৎকারদিগের কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অধিক শ্রেয়স্কর এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম কেবল যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠান করিলে বন্ধন হয় না, কর্ম্মকাণ্ডী মীমাংসকদিগের এই মতও গীতার মান্য। কিন্তু গীতা 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ বিস্তৃত করিয়া উক্ত মতে এই এক সিদ্ধান্ত জুড়িয়া দিয়াছেন যে, ফলাশা ত্যাগ করিয়া সম্পাদিত সমস্ত কর্ম্মই এক বৃহৎ যজ্ঞ হওয়ায় বর্ণাশ্রমবিহিত সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে সতত করাই মনুষ্য মাত্রের কর্ত্তব্য। জগদুৎপত্তি-ক্রমবিষয়ে উপনিষৎকারদিগের অপেক্ষা সাংখ্যদিগের মতকে গীতা প্রাধান্য দিয়াছেন; তথাপি প্রকৃতি ও পুরুষেতেই না থামিয়া জগদুৎপত্তিক্রমের পরম্পরাকে উপনিষদের নিত্য পরমাত্মা পর্য্যন্ত আনিয়া পৌছাইয়া দিয়াছেন। অধ্যাত্ম জ্ঞান কেবল বুদ্ধির দ্বারা অর্জ্জন করা ক্লেশকর হওয়ায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা দ্বারা উহা অর্জ্জন করিবার যে বিধি ভাগবত বা নারায়ণীয় ধর্ম্মে আছে বাসুদেব ভক্তির সেই বিধিই গীতাতেও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়েও সর্ব্বাংশে ভাগবতধর্ম্মের নকল না করিয়া, বরঞ্চ বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ বা জীব উৎপন্ন হইয়াছে ভাগবতধর্ম্মের জীবের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় এই মত বেদান্তসূত্রের ন্যায় গীতাও ত্যাজ্য স্থির করিয়া, ভাগবতধর্ম্মের ভক্তির এবং উপনিষদের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ মিল স্থাপন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত মোক্ষপ্রাপ্তির অন্য সাধন বলিতে গেলে—পাতঞ্জল। কিন্তু পাতঞ্জল যোগই জীবনের মুখ্য কর্ত্তব্য এইরূপ গীতার উক্তি না হইলেও বুদ্ধিকে সম করিবার জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ আবশ্যক হওয়ায় ততটাই পাতঞ্জল যোগের যমনিয়মাসনাদির উপযোগ করিয়া লও এইরূপ গীতা বলিয়াছেন। সার-কথা, বৈদিক ধর্ম্মে মোক্ষপ্রাপ্তির যে যে সাধন কথিত হইয়াছে সে সমস্তই কর্ম্মযোগের সাঙ্গোপাঙ্গ আলোচনা করিবার সময় প্রসঙ্গানুসারে ন্যূনাধিক অংশে বর্ণনা করিতে হইয়াছে। এই সমস্ত বর্ণনা স্বতন্ত্ররূপে করিলে অসঙ্গতি উৎপন্ন হইয়া গীতার সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী এইরূপ প্রতীয়মান হয়; এবং এই বিশ্বাস বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীকা হইতে আরও দৃঢ় হইয়া থাকে। কিন্তু আমার উপরি-কথিত অনুসারে যদি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তির মিলন করাইয়া শেষে তদ্দ্বারা কর্ম্মযোগের সমর্থন করাই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা হইলে এই সমস্ত বিরোধ বিলুপ্ত হয়; এবং গীতাতে যে অলৌকিক কৌশলে পূর্ণ ব্যাপক দৃষ্টিতে তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভক্তি ও কর্ম্মযোগের যথোচিত মিল করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া অবাক না হইয়া থাকা যায় না। গঙ্গায় গিয়া অন্য যত নদী মিলুক না কেন তথাপি গঙ্গার স্বরূপের যেরূপ বদল হয় না, সেই প্রকার গীতারও কথা। তাহাতে যাহা কিছু সমস্ত থাকিলেও কর্ম্মযোগই তাহার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কর্ম্মযোগই এইরূপ মুখ্য বিষয় হইলেও কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই মোক্ষধর্ম্মের মর্ম্মও উহাতে সুন্দররূপে নিরূপিত হওয়ায় কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়ার্থ কথিত এই গীতাধর্ম্মই—'স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে' (মভা. অশ্ব. ১৬. ১২)—ব্রহ্মপ্রাপ্তি করাইয়া দিতেও পূর্ণ সমর্থ; এবং অনুগীতার আরম্ভে ভগবান্ অর্জ্জুনকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই মার্গের অনুসরণকারীকে মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য অন্য কোন অনুষ্ঠানেরই আবশ্যকতা নাই। ব্যবহারিক সমস্ত কর্ম্মের ত্যাগ না করিলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না এইরূপ প্রতিপাদন যাহারা করে সেই সন্ন্যাসমার্গের লোকদিগের আমার এই উক্তি ভাল লাগিবে না,

তাহা আমি জানি; কিন্তু তাহার উপায় নাই। গীতাগ্রন্থ সন্ন্যাসমার্গেরও নহে কিংবা অন্য কোন নিবৃত্তিমূলক পন্থারও নহে। জ্ঞানপ্রাপ্তির পরেও কর্ম্মসন্ন্যাস কেন করিবে না তাহার ব্রহ্মজ্ঞানদৃষ্টিতে সযুক্তিক উত্তর দিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রবৃত্তি। তাই, সন্ন্যাসমার্গাবলম্বী-দিগের উচিত যে, তাহারা গীতাকেও 'সন্ন্যাস দিবার' গোলযোগে না ফেলিয়া সন্ন্যাসপ্রতিপাদক অন্য যে সব বৈদিক গ্রন্থ আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকুক। অথবা গীতায় সন্ন্যাসমার্গকেও ভগবান্ যে নিরভিমান বুদ্ধিতে নিঃশ্রেয়স্কর বলিয়াছেন সেই সমবুদ্ধিতে সাংখ্যমার্গীদিগেরও ইহাই বলা উচিত যে, "শুধু যাহাতে জগতের কাজ চলে এই জন্যই যেহেতু তিনি সময়ে সময়ে অবতার ধারণ করেন, সেই কারণে জ্ঞানোত্তর নিষ্কামবুদ্ধিতে ব্যবহারিক কর্ম্ম বরাবর প্রচলিত রাখিবার জন্য ভগবান গীতায় যে মার্গের উপদেশ করিয়াছেন সেই মার্গই কলিকালে যুক্তি-সঙ্গত" এবং এইরূপ উক্তিই উহাদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

ইতি চতুর্দ্দশ প্রকরণ সমাপ্ত।

পঞ্চদশ প্রকরণ।

উপসংহার।

"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ।" *

গীতা. ৮. ৭।

গীতার অধ্যায়গুলির সঙ্গতিই দেখ, কিংবা তদন্তর্গত বিষয়গুলির মীমাংসকদিগের পদ্ধতি অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিচারই কর, যে দিক্ দিয়াই দেখনা কেন,—শেষে গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য ইহাই বুঝা যাইবে যে, "জ্ঞানভক্তিযুক্ত কর্ম্মযোগই" গীতার সার; অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক টীকাকারগণ কর্ম্মযোগকে গৌণ স্থির করিয়া গীতার অনেক প্রকার যে সকল তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যথার্থ নহে; কিন্তু উপনিষদান্তর্গত অদ্বৈত বেদান্তকে ভক্তির সহিত যুড়িয়া দিয়া তদ্দ্বারা বড় বড় কর্ম্মবীর পুরুষদিগের চরিত্রের রহস্য—বা তাঁহাদের জীবনক্রমের উপপত্তি ব্যাখ্যা করাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। মীমাংসকদিগের উক্তি অনুসারে শুধু শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্ম সর্ব্বদা করিতে থাকা শাস্ত্রোক্ত হইলেও, জ্ঞান ব্যতীত অনুষ্ঠিত কেবল তান্ত্রিক ক্রিয়ার দ্বারা বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের সন্তোষ হয় না; এবং উপনিষদের ধর্ম্ম যদি দেখ ত দেখিতে পাইবে, উহা কেবল জ্ঞানময় হওয়ায় অল্পবুদ্ধি লোকের তাহার ধারণা করা কঠিন। তাছাড়া আর এক কথা এই যে, উপনিষদের সন্ন্যাসধর্ম্ম লোকসংগ্রহের বাধাও বটে। তাই, বুদ্ধি (জ্ঞান) প্রেম (ভক্তি) ও কর্ত্তব্যের সমুচিত মিলন হইয়া, এবং মোক্ষের বাধা না ঘটিয়া, যাহার দ্বারা লোকব্যবহারও সুচারুরূপে চলিতে পারে এইরূপ জ্ঞানমূলক ভক্তিপ্রধান ও নিষ্কাম কর্ম্মমূলক ধর্ম্ম, যাহা আমরণ পালন করিতে হইবে, সেই ধর্ম্মবিষয়ে ভগবান্ গীতায় উপদেশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যেই কর্ম্মাকর্ম্মশাস্ত্রের সমস্ত তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে। অধিক কি, এই ধর্ম্ম অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার কর্ম্মা-কর্ম্মের বিচারই মূল কারণ, ইহা গীতার উপক্রমোপ-সংহার হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কোন্ কর্ম্ম ধর্ম্ম্য পুণ্যপ্রদ ন্যায্য বা শ্রেয়স্কর, এবং কোন্ কর্ম্ম তাহার বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্ম্য পাপপ্রদ অন্যায্য বা গর্হিত, এই বিষয়ের বিচার দুই প্রকারে করা যাইতে পারে। প্রথম প্রকারটি কি? না, কর্ম্মের উপপত্তি কিংবা মর্ম্ম না বলিয়া, অমুক কাজ অমুক প্রকারে করিলে শুদ্ধ এবং অমুক প্রকারে করিলে অশুদ্ধ—এইরূপ শুধু বিধান করা। হিংসা করিও না, চুরি করিও না, সত্য বল, ধর্ম্মাচরণ কর, এই সমস্ত বিধান এই প্রথম শ্রেণীর। মন্বাদি স্মৃতিতে ও উপনিষদে এই সকল বিধি, আজ্ঞা কিংবা আচার স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্য জ্ঞানবান প্রাণী, তাই উপরি-কথিত শুধু বিধি-বিধানের দ্বারা তাহার সন্তোষ জন্মে না; এই সকল নিয়ম স্থাপনের কারণ কি, তাহা বুঝিবার জন্য স্বভাবতই তাহার ইচ্ছা হয়; এবং তাহার পর, বিচার করিয়া সে এই সকল নিয়মের নিত্য ও মূলতত্ত্ব কি, তাহার সন্ধানে করিয়া থাকে—বস্, ইহাই কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্যপাপ প্রভৃতির বিচার করিবার দ্বিতীয় রীতি। ব্যবহারিক ধর্ম্মের অঙ্গ এই রীতিতে দেখিয়া তদন্তর্গত মূলতত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির করা—ইহাই শাস্ত্রের কাজ; উক্ত বিষয়ের শুধু নিয়ম একত্র করিয়া বলা—ইহাকে আচারসংগ্রহ বলে; কর্ম্মমার্গের আচার-সংগ্রহ স্মৃতিগ্রন্থাদিতে আছে; এবং ভগবদ্গীতায় সেই সকল আচারের মূলতত্ত্ব কি, তাহার সংবাদাত্মক বা পৌরাণিক পদ্ধতিতে শাস্ত্রীয় অর্থাৎ তাত্ত্বিক বিচার আলোচনা করা হইয়াছে। তাই, ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়কে শুধু কর্ম্মযোগ বলা অপেক্ষা কর্ম্মযোগ-শাস্ত্র বলাই অধিক প্রশস্ত; এবং এই যোগশাস্ত্র শব্দই ভগবদ্গীতার অধ্যায়-পরিসমাপ্তিসূচক সঙ্কল্পের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। পারলৌকিক দৃষ্টিকে যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত ত্যাগ করিয়াছেন, কিংবা যাঁহারা গৌণ বলিয়া মানেন, তাঁহারা গীতার প্রতিপাদিত কর্ম্মযোগ-শাস্ত্রকেই সদ্ব্যবহারশাস্ত্র, সদাচারশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নীতিমীমাংসা, নীতিশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব, কর্ত্তব্যশাস্ত্র, কার্য্যা-কার্য্যব্যবস্থিতি, সমাজধারণশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন লৌকিক নামে অভিহিত করিয়া থাকেন; এবং তাঁহাদের নীতি-মীমাংসার পদ্ধতিও লৌকিক ধরণের। এই জন্য এই প্রকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তন্মধ্যে অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে, সংস্কৃত সাহিত্যে সদাচরণের কিংবা নীতির মূলতত্ত্বের কোন বিচার-আলোচনাই হয় নাই। তাঁহারা বলেন যে, আমাদের দেশের গহন তত্ত্বজ্ঞান হইতেছে বেদান্তই। ভাল; আমাদের এখনকার বেদান্তগ্রন্থ দেখিলে দেখা যায় যে উহা সাংসারিক কার্য্য সম্বন্ধে প্রায় উদাসীন। এই অবস্থায় কর্ম্মযোগশাস্ত্রের কিংবা নীতির বিচার কোথায় পাওয়া যাইবে? ব্যাকরণ কিংবা ন্যায় সংক্রান্ত গ্রন্থে তো এই বিচার আসিতেই পারে না; এবং স্মৃতিগ্রন্থাদিতে ধর্ম্ম-

* "অতএব সর্ব্বকালে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর" যুদ্ধ কর—এই কথা প্রসঙ্গক্রমে প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহার অর্থ, শুধুই 'যুদ্ধ কর' নহে, 'যথাধিকার কর্ম্ম কর' এইরূপ বুঝিতে হইবে।

শাস্ত্র সংগ্রহের বাহিরে আর কিছুই পাওয়া যায় না। তাই আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকার মোক্ষেরই গহন বিচারের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাওয়ায়, সদাচরণের কিংবা নীতি-ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের বিচার আলোচনা করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন! কিন্তু মহাভারতের এবং গীতার মনোযোগপূর্ব্বক অনুশীলন করিলে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইতে পারে। ইহার পরেও কেহ কেহ বলেন যে, মহাভারত অতি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ হওয়ায় তাহা সমস্ত পাঠ করিয়া তদন্তর্গত বিষয়সকল সম্পূর্ণ মনে রাখা কঠিন; এবং গীতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইলেও সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের অভিপ্রায় অনুসারে তাহার মধ্যে কেবল মোক্ষপ্রাপ্তির জ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু কেহ ভাবিয়া দেখেন না যে, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গ আমাদের দেশে বৈদিক কাল হইতেই প্রচলিত আছে; কোনও সময়ে সমাজে সন্ন্যাসমার্গীয় লোক অপেক্ষা কর্ম্মযোগেরই অনুযায়ীদিগের সংখ্যা সহস্রগুণ অধিক হয়; এবং পুরাণ-ইতিহাসে যে সকল কর্ম্মশীল মহাপুরুষদিগের অর্থাৎ কর্ম্মবীরদিগের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই কর্ম্মযোগমার্গেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। যদি এই সমস্ত কথা সত্য হয়, তবে তন্মধ্যে কি একজনেরও কর্ম্মযোগমার্গ সমর্থন করিবার বুদ্ধি হইল না? সেই সময়ে সমস্ত জ্ঞান ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে থাকায় এবং বেদান্তী ব্রাহ্মণ কর্ম্মসম্বন্ধে উদাসীন হওয়ায় কর্ম্মযোগসংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিত হয় নাই, এইরূপ কারণ যদি কেহ দেখায়, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, উপনিষদের কালে, এবং তদনন্তর ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও জনক-শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় জ্ঞানী পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন; এবং ব্যাসের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণেরা বড় বড় ক্ষত্রিয়ের ইতিহাসও লিখিয়াছেন। এই ইতিহাস লিখিবার সময়, যে সকল মহাপুরুষদিগের ইতিহাস আমরা লিখিতেছি তাঁহাদের চরিত্রের মর্ম্ম বা রহস্যও ব্যক্ত করিতে হয় তাহাও কি কাহাদের বিবেচনায় আসে নাই? এই মর্ম্মের অর্থই কর্ম্মযোগ কিংবা ব্যবহারশাস্ত্র; এবং তাহা বলিবার জন্যই মহাভারতের স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিয়া শেষে জগতের ধারণ-পোষণের কারণীভূত সদাচারের অর্থাৎ ধর্ম্মের মূলতত্ত্বসমূহের বিচার মোক্ষদৃষ্টিকে ত্যাগ না করিয়া গীতায় করা হইয়াছে। অন্য পুরাণেও এইরূপ অনেক প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু গীতার তেজের সম্মুখে অন্য সমস্ত বিচার-আলোচনা ফিকা হওয়ায় ভগবদ্‌গীতা কর্ম্মযোগশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছে। কর্ম্মযোগের প্রকৃত স্বরূপ কি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে আমি তাহার সবিস্তার বিচার করিয়াছি। তথাপি গীতায় বর্ণিত কর্ম্মাকর্ম্মের আধ্যাত্মিক মূলতত্ত্বের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ-প্রতিপাদিত নীতির মূলতত্ত্বের কতটা মিল হয় তাহার তুলনা যতক্ষণ না করি ততক্ষণ গীতাধর্ম্মের নিরূপণ সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না। এই তুলনা করিবার সময় দুইপক্ষের অধ্যাত্মজ্ঞানের তুলনা করিতে হইবে। কিন্তু এই কথা সর্ব্বমান্য যে, পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দৌড়, এখন পর্য্যন্ত আমাদের বেদান্তকে ছাড়াইয়া বেশীদূর যায় নাই। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অধ্যাত্মশাস্ত্রের তুলনা করিবার বিশেষ কোনই আবশ্যকতা থাকে না*। এই অবস্থায় এখন কেবল সেই নীতিশাস্ত্রের কিংবা কর্ম্মযোগের তুলনারই বিষয় অবশিষ্ট থাকে, যাহার সম্বন্ধে এইরূপ কাহারো কাহারো ধারণা আছে যে, এই বিষয়ের উপপত্তি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেন নাই। কিন্তু এই একটা বিষয়েরই বিচার এত বিস্তৃত যে, তাহার পূর্ণরূপে প্রতিপাদন করিতে হইলে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থই লিখিতে হয়। তথাপি এই গ্রন্থে এই বিষয় একেবারে ছাড়িয়া দেওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে মনে করিয়া, একটু আভাস দিবার জন্য তদন্তর্গত উল্লেখযোগ্য কোন কোন কথা এই উপসংহারে আলোচনা করিতেছি।

* বেদান্ত ও পাশ্চাত্য তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে তুলনা প্রোফেসর ডায়সনের *The Elements of Metaphysics* নামক গ্রন্থের স্থানে স্থানে করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের শেষে "On The Philosophy of Vedanta" এই বিষয়ের উপর এক ব্যাখ্যানও মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৯৩ অব্দে প্রো. ডায়সন যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন তিনি বোম্বায়ের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে এই ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন। তাছাড়া, *The Religion and phelosophy of the Upanishads* নামক ডায়সন সাহেবের গ্রন্থও এই বিষয়সম্বন্ধে পাঠ করিবার যোগ্য।

জেলখানা।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ সান্যাল)

সেদিন কয়েকজন বন্ধুকে কথায় কথায় বলেছিলুম "জেলখানা রাখবার কোনই দরকার নাই"—তারা হেসে উঠ্‌ল; বললে "তাহলে বদ্‌মাইসদের জ্বালায় বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠবে, সমাজ ভেঙ্গে যাবে"। ভিতর থেকে কোন সাড়াই পেলুম না। সেই থেকে মাঝে মাঝেই মনে হয় "জেলখানা তুলে দেওয়া যায় না কি?"

আমাদের দেশের, শুধু আমাদের কেন সকল দেশেরই জেলখানা মানুষের ভিতরের দেবতার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে একটা তীব্র প্রতিবাদ। যাঁরা জেলখানার সৃজনকর্ত্তা তাঁরা এইখানেই মানুষকে ছোট করে দেখে মস্ত ভুল করেছিলেন, স্বার্থান্ধ হৃদয় ক্ষতির ভয়ে শিউরে উঠেছিল; মানুষকে বড় করে ভগবানের অংশ বলে দেখবার ক্ষমতা তাঁদের হোল না।

মানুষের দুটো দিক্—পশু ও দেবতার। একদিকে ক্ষুদ্রতা; আর একদিকে তার হৃদয়ের বিশাল বিস্তার, নিজেকে অন্যের ভিতরে উপলব্ধি করবার তীব্র পবিত্র সাধনা। মনুষ্যত্বকে বিকশিত করে তোল্‌বার ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষেরই আছে—তবে সেটা কোথাও সুপ্ত, কোথাও বা জাগ্রত। এ কথা আজ আমাকে স্বীকার করতেই হবে—অধিকাংশ মানুষই সুপ্ত। এই সুপ্ত শক্তি আজাদের কাছে অপ্রকাশিত, তাই আমরা রিপুর ক্ষণিক চঞ্চলতাকেই বড় বলে ধরে নিই। কিন্তু মানুষকে একদিন জাগতেই হবে, তাকে বুঝতেই হবে যে, সে অমৃতের পুত্র, অনুভব করতেই হবে তাকে যে, ভগ-

বানের লীলা তার ভিতর দিয়ে প্রতিদিনই নূতন নূতন ভাবে সুন্দর হয়ে উঠ্‌চে। তা না হলে সৃষ্টির উৎসমুখ শুকিয়ে উঠ্‌ত; ভগবানও কাঙ্গাল হয়ে যেতেন। শুধু একটুখানি সুযোগ ও অবসরের অভাব।

মানুষ তখনই রিপুর পায়ে সমস্ত বিলিয়ে দাসখৎ লিখে দেয় যখন তার দ্বিতীয় কোঠার সিংহদ্বারে চাবি পড়ে যায়—রাজা থেকে একেবারে ভিখারী। প্রথম দিনের দীপশিখার উজ্জ্বলতা তেলের অভাবে মলিন হয়ে যায়, জমাট আঁধার নেমে আসে। মানুষের অনুচিত কোন কার্য্যই তখন তাকে সঙ্কুচিত করে তোলে না, নির্লজ্জতা তার অঙ্গের ভূষণে পরিণত হয়। তবে একথাও অস্বীকার করবার উপায় নাই যে, ক্ষণেকের তরে সেই স্তিমিত দীপের ম্লান আলো অসত্যের কালো আঁধারের বুকে বিদ্যুৎ শিখার মতই মাঝে মাঝে খেলে যায়। দেবতাকে অপমান করবার ব্যথা তার জেগে উঠে, কিন্তু সুযোগ ও সহানুভূতির অভাবে তা আবার পূর্ব্বের মতই অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। দেবতার ভাব যদি মানুষের ভিতর না থাকত, তাহলে অনুশোচনার এই দহন জ্বালা তার প্রাণে আসে কোথা থেকে? পৃথিবীতে অনেক ঘৃণ্য পতিত তথাকথিত বদ্‌মাইসদের জীবনে এমন একটা পরিবর্ত্তন এসেছে যা সকলেরই গর্ব্ব করবার মত। যাঁরা মানুষের প্রাণের দেবতাকে অস্বীকার করেন, তাঁদের আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এই কল্পনাতীত ব্যাপার কেমন করে সম্ভবপর হয়, কোন্ পরশমানিকের স্পর্শে তাহাদের সমস্ত কালো কলঙ্ক সোনা হয়ে ওঠে?

জ্ঞানের আলোকে যখন আঁধার কেটে যায়, চেতনার মোহন পরশে তার মণিকোঠার রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায় তখন সে আশ্চর্য্য হয়ে যায় তার হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যের বিস্তার দেখে; মনে মনে সে উপলব্ধি করতে শেখে, কি তার কাজ, কি তার জীবনের আদর্শ। তাই ফ্রান্সের কবিসম্রাট ভিক্টর হিউগো বলেছিলেন "He who openes a school closes a prison"—(যিনি একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন তিনি জেলখানার দরজা বন্ধ করেন)। জেল দেবার কর্ত্তা যাঁরা তাঁদের কি *সর্ব্বপ্রথম* কর্ত্তব্য নয় মানুষকে মানুষের মত গড়ে তোলা? ক্ষয় রোগ যাকে মরণের পথে টেনে নিয়ে যাচ্চে তাকে কি বাহ্যিক প্রলেপ দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা যায়? ভ্রান্ত মানবের অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা যাঁরা করেচেন তাঁরা কি তাঁদের কর্ত্তব্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পেরেছেন? এই কর্ত্তব্য অবহেলার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি তাঁদের করতে হবে না?

আমাদের দেশে একটী লোক অপরাধ করলে তাকে বিচারালয়ের দণ্ডে জেলে পাঠান হল। তার জেলের সেই দুর্ব্বিষহ জীবন—সে যে কি তা বোধ হয় সকলেই জানেন। সকাল থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পশুর মত খাটুনি, নীরস কঠোর একঘেঁয়ে জীবন শুধু যে তার জীবনের আনন্দকে নষ্ট করে দেয় তা নয়, তার ভিতরের উচ্চবৃত্তিকে চিরদিনের মত নষ্ট করে দেয়; তাকে পশু করে তোলে। সেখানে তার জীবনকে নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে সরস করে তোলবার ব্যবস্থা কিংবা তার সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলবার কোনই আয়োজন নাই। জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসেও তার নিস্তার নাই—তার আপন জন তাকে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দেয়, সমাজ তাকে আর পূর্ব্বের মত আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে না; তার উপর পুলিসের সন্দেহদৃষ্টি তার নূতন করে সংসার বেঁধে স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখে শান্তিতে নিশ্চিন্তে বাস করবার আশাকে চিরদিনের মত বিলুপ্ত করে দেয়। জেলখানার চিহ্ন তাকে এমনি ভাবেই ঘরে বাইরে প্রতিদিনই অপমানিত করে। সুযোগ ও সহানুভূতির অভাবে তাকে কলঙ্কপথের পথিকই হতে হয়। এর জন্য দায়ী কে?

আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত যত চুরি ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধ হয়েচে তার প্রধান কারণ খাদ্যের অভাব। যে দেশের অধিকাংশ লোক খাওয়া কাকে বলে জানে না, অর্দ্ধাশনে অনশনে যাদের বৎসরের অধিকাংশ দিনই কেটে যায়, স্ত্রী পুত্রের অনাহারক্লিষ্ট কাতর আর্ত্তনাদ সকল সময়েই যাদের শুনতে হয়; তাদের পক্ষে পেটের বিনিময়ে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেওয়া খুব আশ্চর্য্য নয়। এই সব দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদের অপরাধের জন্য শাস্তি দেবার পূর্ব্বে তাদের অভাব মোচন করবার চেষ্টা করাটাই কি সব চেয়ে বড় কাজ নয়? সকল বাধা দূর করে দিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশের পথকে সহজ করে তোলাই কি প্রকৃত ধর্ম্ম নয়?

তাই আমার মনে হয় জেলখানা তুলে দেওয়া একটা খুব কঠিন কাজ নয়। দরকার শুধু মানুষকে ভগবানের অংশ বলে সম্মান করা ও তার সম্মুখে অবাধ উন্নতির পথ মুক্ত করে দেওয়া। জ্ঞানের আলো প্রতি ঘরে ঘরে জ্বেলে দিতে হবে; তাহলে আর কোন ভাবনা থাকবে না।

এটা কি এতই কঠিন?

১৮৪৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সংকটমোচন।*

আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া রাজনৈতিক মহাসংকটের ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ক মহাসংকটের ভিতর দিয়াও আমাদের দেশ যে চলিয়াছে তাহা আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে। বলিতে কি, ধর্ম্মবিষয়ক মহাসঙ্কটের কারণেই রাজনৈতিক প্রভৃতি মহাসংকটও আসিয়াছে। রাজনীতিই বল, সমাজনীতিই বল, সকল নীতিই যে ধর্ম্মেতেই অবলম্বিত হইয়া আছে। ধর্ম্মের নিকট যদি আমরা খাঁটি থাকি, তবে তো সকল ক্ষেত্রেই আমরা খাঁটি থাকিব; তখন কাজেই কোন বিষয়েই সংকটের অবস্থা আসিবার অবসরই আসিবে না। ধর্ম্মেতে যদি আমরা খাঁটি থাকিতাম, তবে আমরা কোন বিষয়েই অন্যায় ব্যবহারের প্রশ্রয় দিতে পারিতাম না, এবং দেশে এক অবিচ্ছিন্ন মঙ্গলের ধারা প্রবাহিত হইত নিঃসন্দেহ। ধর্ম্মের নিকট আমরা খাঁটি নহি বলিয়াই আজ দেশে ধর্ম্মবিষয়ক মহাসঙ্কটের সঙ্গে সমাজ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই মহাসঙ্কট দেখা দিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে বলিতে গেলে আমরা রাজনৈতিক সঙ্কটের উপরেই আমাদের সমুদয় শক্তি সমুদয় বল প্রয়োগ করিতেছি—ধর্ম্মসঙ্কটের দিকে খুবই কম দৃষ্টি দিতেছি। চক্ষের সম্মুখে ক্ষুদ্র একটী কাষ্ঠের আকৃতি ধরিলেও যেমন আমরা এই এত বড় আকাশও দেখিতে পাই না, সেইরূপ রাজনৈতিক সঙ্কট ধর্ম্মসঙ্কটের তুলনায় খুবই ক্ষুদ্র হইলেও আমাদের চক্ষের বড় বেশী নিকটে থাকে বলিয়াই আমরা তাহাকেই খুব বড় করিয়া দেখি—এত বড় দেখি যে, উহা ধর্ম্মসঙ্কটকে অনেক সময়ে আমাদের চক্ষের অন্তরালে ফেলিয়া দেয়, আমাদিগকে তাহা দেখিতে দেয় না।

কিন্তু যাঁহারা ভারতের ধর্ম্মবিষয়ক মহাসংকটের বিষয়ে সন্ধান রাখেন, তাঁহারাই ভাবিয়া আকুল হয়েন যে, যে ধর্ম্ম ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা আদরের বস্তু, গৌরব করিবার বস্তু, বুঝি বা ভারতবাসী সেই ধর্ম্ম হারাইয়া দারিদ্র্যের অতল গর্ভে ডুবিয়া যায়। যে জাতির আহারে বিহারে স্বপনে জাগরণে প্রত্যেক কার্য্য ভগবানকে নিবেদন করিবার বিধি আছে, আজ সেই জাতির নিকট ভগবানের নাম ক্রমে অতীতের স্বপ্নের ন্যায় হইতে চলিয়াছে। শত সহস্রবার ইহা পুনরুক্ত হইলেও আরও একবার পুনরুক্তি করিলে বোধ হয় দোষ হইবে না যে, ভারতের অরণ্যবাসী তেজস্বী ঋষিমুনিদের নিকটে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বেদউপনিষদে নিহিত সত্যধর্ম্মকে একবার যদি আমরা হারাইয়া বসি, তবে বলিতে গেলে আমাদের প্রকৃত গৌরবের বস্তু আর একটীও থাকে না। আজ শত শত বৎসর ধরিয়া বলিতে গেলে আমরা আমাদের সমস্ত জীবনের বিনিময়ে দাসত্বের খতে স্বাক্ষর করিয়া বসিয়াছি,

---

* ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে ১ই আষাঢ় [illegible] শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

নিজের বলিয়া কিছুই রাখি নাই। স্বার্থ সাধনের জন্য বিদেশীয়দিগকে ডাকিয়া তাহাদেরই চরণে শারীরিক স্বাধীনতা বারবার ঢালিয়া দিয়াছি; অথবা পৌরোহিত্য প্রভৃতির চরণে মানসিক স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াছি; এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে উপধর্ম্মের চরণে বলিদান করিয়াছি। তথাপি ভারতের প্রাণে প্রাণে সত্যধর্ম্মের একটী ধারা সূক্ষ্মধারে প্রবাহিত হইতেছে। আমরা জীবনের সকল বিষয়ের স্বাধীনতা প্রাণপণে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকিলেও ভগবানের ইহা অভিপ্রায় নহে যে, আমরা ততদূর পরাধীন হইয়া একেবারে মৃত্যু-মুখে পতিত হই। তাই তিনি আমাদের শত চেষ্টার উপরেও স্বাধীনতার মূল সত্যধর্ম্মের ধারাকে নানা উপায়ে ভারতের প্রাণে সজীব রাখিয়াছেন। সেই সত্যধর্ম্মের ধারা যদি আমরা বন্ধ করিয়া দিই, তবে আমাদের রহিল কি? আমরা যদি মরণকেই স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লই, তবে জগতের মহাসভায় আমরা কিসের বলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব? বিশ্বজগত তো তোমার আমার কথায় স্থিরভাবে জড়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিবে না—সেখানে যে প্রাণ নিত্যই তড়িৎশক্তিতে খেলা করিতেছে; শত বিপদ আপদ মাথায় করিয়াও বিশ্বজগত সেই মহা-প্রাণের মহাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া গর্ব্বোন্নত মস্তকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেই;—আর আমরা?—আমরা আমাদের নিজস্ব সত্যধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া সেই বিশ্বসভায় স্বাধীনভাবে চলিবার ফিরিবার একমাত্র সম্বলকেও হারাইতে বসিব? সেই বিশ্বসভার এক কোণে বসিবার অধিকার লাভের জন্য নিঃসম্বল ভিখারীর মত কৃপাপ্রার্থী হইয়া বিচরণ করিব? ভারতের ভাগ্যে ভগবান তাহা লিখেন নাই। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, যে, অন্ততঃ ধর্ম্মবিষয়ে আমরা যে ক্রীতদাসের মত দারিদ্র্যের অতলগর্ভে ডুবিয়া গিয়া মরণকে আলিঙ্গন করিব, ভগবান তাহা কিছুতেই চাহেন না। সেইটী চাহেন না বলিয়াই ভগবান তাঁহার মহাশক্তিতে শক্তিমান করিয়া আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজের এমন এক উপাসকমণ্ডলীকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম প্রাচ্যভূমি হইতে সুদূর প্রতীচ্যভূমিতে গিয়া মুক্তির আশাবাণী শুনাইতে পারিলেন। সেই আশাবাণীর মহাশক্তি আজও প্রতীচ্য ভূখণ্ডের প্রাণে চিন্তাতরঙ্গ উঠাইয়া চলিয়াছে।

আমাদের এই উপাসকমণ্ডলী সংখ্যায় অল্প—তাহাতে আসে যায় কি? আমরা যদি এই কথা মনে রাখি যে, আমরা সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, বিশ্বপিতা অখিলমাতা অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেরই উপাসক; আমরা যদি মনে রাখি যে, আমাদের প্রত্যেকেই সেই সূর্য্যের সূর্য্য মহান্ অগ্নি হইতে নিঃসৃত এক একটী শক্তিময় অগ্নিকণা; আমরা যদি এইটুকু উপলব্ধি করি যে, আমাদের প্রত্যেকেই তাঁহার শক্তিতে মহাশক্তি হইবার ক্ষমতা ধারণ করি, তাহা হইলে সংখ্যায় অল্প বলিয়া আমাদের মুহ্যমান হইবার কোনই কারণ দেখি না। আমাদের উপাস্য দেবতা পরব্রহ্মের শক্তিমত্তা যদি সত্যসত্যই উপলব্ধি করি, হৃদগত করিতে পারি, তবে মুহ্যমান হওয়া দূরে থাক্, আমরা আশান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিব না। আমাদের উপাস্য দেবতা, যিনি নিজ শক্তিতে এই সমুদয় বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন, যিনি এক ইঙ্গিতে এই সমুদয় বিশ্ব পরিচালিত করিতেছেন; যিনি এই কোটী কোটী মানবের হৃদয়ে জ্ঞানের শক্তি, ভক্তি, মুক্তি সকলই দান করিতেছেন, সেই পরমেশ্বর কয়জন? তিনি যেমন একমাত্র হইয়াও নিজের অতুলনীয় শক্তিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক বিরাট শক্তিকুণ্ড করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনই আমার এই স্থির বিশ্বাস যে, আমাদের মধ্যে একজনও যদি তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠি, তখন সেই একজনই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আগুন জ্বালাইয়া দিতে পারিবেন। তখন আমাদের কিসের ভয়, আর কিসের ভাবনা! তবে একটা কথা এই যে, আমরা নির্ভয় হইতে চাহিলে, সেই অন্তর্দেবতা ভগবানের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধাকে সবল করিয়া তুলিতে হইবে; তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ ডুবাইয়া দিতে হইবে; অগ্নিহোত্রী যেমন তাঁহার পূজার অগ্নিকে অবিচ্ছেদে জ্বালাইয়া রাখেন, সেইরূপ আমাদের অন্তরে ভগবানকে বিশ্বপিতা অখিলমাতা বলিয়া উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপাসনাকে একনিষ্ঠভাবে অগ্নিময় মুর্ত্তিতে জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে।

ভগবানকে বিশ্বপিতা অখিলমাতা বলিয়া প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিলেই মানুষের প্রতি প্রেম, মানুষকে ভালবাসাও স্বভাবতই আমাদের অন্তরে প্রবাহিত হইবে। কেন ?—ভগবানকে ভালবাসিলে মানুষকেও ভাল বাসিব কেন ? মানুষ যে তাঁহারই সন্তান। মানুষকে ভাল না বাসিয়া তাঁহাকে ভালবাসা !—সেটা মিথ্যা কথা ! তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিলে, তাঁহাকে সত্যসত্য ভাল বাসিলে কেবল মানুষ কেন, তাঁহার সৃষ্ট সকল জীবেরই প্রতি তোমার স্নেহ-প্রীতি সম্প্রসারণ করিতে হইবে, কারণ এই প্রকার জীবে দয়া এবং মানবপ্রীতি, ইহা যে তোমার সেই প্রাণপ্রিয় ইষ্টদেবতারই প্রিয় কার্য্য। এই মহোচ্চ ভাব তোমার হৃদয় অধিকার করিলে, মানুষের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ করিয়া তুমি কি একটী মানুষকেও ঘৃণা করিতে পারিবে ? কখনই নয়। তখন স্বভাবতই মানুষকে মানুষ বলিয়াই ভাল বাসিতে পারিবে। ভগবানকে এই রকম প্রাণের সঙ্গে ভালবাসা এবং তাঁহারই প্রিয়কার্য্য বলিয়া মানুষকে ভাই বলিয়া বুকের ভিতর ডাকিয়া লওয়া—ইহাই হইল বর্ত্তমান ধর্ম্মবিষয়ক, কেবল ধর্ম্মবিষয়ক কেন, সর্ব্ববিষয়ক মহাসংকট হইতে মুক্তি দিবার একমাত্র তারক মন্ত্র ; ইহাই আমাদের সঙ্কটমোচন মহামন্ত্র। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজই এই মহামন্ত্র আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে তাহা দান করিয়াছেন।

ধর্ম্মজগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এক একটী ধর্ম্মসমাজ নিজের কেন্দ্র-স্বরূপে এক একটী মহাসত্য আবিষ্কার করিয়া মানবজাতিকে ধনী করিয়া তুলেন, উন্নতির পথে অনেক দূর আগাইয়া দেন। ব্রাহ্মসমাজও সেই-রূপ এই একটী মহাসত্য—এই সঙ্কটমোচন মহামন্ত্র জগতকে দান করিয়াছেন—ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা ; আর সেই উপাসনা দ্বারাই মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় বা কেবল ভক্তির উপরেই সম্পূর্ণ ঝোঁক দিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় বা ক্রিয়াকাণ্ডেরই উপর সমস্ত ঝোঁক দিয়াছেন, আর কোন সম্প্রদায় বা কেবল দর্শনশাস্ত্রের উপর আপনাকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বে সরল ও সবল ভাষায় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্যসাধক কোন সম্পূর্ণ মন্ত্র প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল কথা এই যে, একদিকে পরমাত্মাকে আত্মার আত্মা বলিয়া জান ; তাঁহাকে বিশ্বপিতা অখিলমাতা বলিয়া অন্তরে উপলব্ধি কর ; উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চরণে হৃদয়ের সমুদয় ভক্তিশ্রদ্ধা অর্পণ কর ; অপরদিকে, সেই অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধাকে ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ বহিরাকারে প্রকাশ কর এবং তাঁহারই সন্তান মানুষকে ভালবাসাও তাঁহারই প্রিয়কার্য্য জানিয়াই মানুষকে ভালবাস এবং তাহার কল্যাণ সাধনে যত্ন কর। ঈশ্বরকে প্রীতি করা—ইহাই হইল প্রকৃত সত্যধর্ম্মের শেষ কথা, ইহা ছাড়িয়া সত্যধর্ম্মের দ্বিতীয় কথা নাই। আবার জীবে দয়া ও মানবের হিতসাধনের দ্বারা ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধনই হইল সমস্ত নীতিশাস্ত্রের চরম লক্ষ্য, শেষ কথা। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঐ সংকটমোচন মহামন্ত্র প্রচার করিয়া সেই সত্যধর্ম্ম ও চরম নীতিকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন ; ব্রাহ্মধর্ম্মই খুব স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, প্রকৃত সত্যধর্ম্ম ও সকল নীতির সার পরস্পরের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে ওতপ্রোত হইয়া আছে। আমরা খুব জোরের সঙ্গে বলিতে পারি যে, ঐ মহামন্ত্র আবিষ্কারের কারণেই ব্রাহ্মধর্ম্ম ধর্ম্মজগতে এক মহোচ্চ আসন পাইবার অধিকারী।

যে সঙ্কটমোচন মহামন্ত্রে প্রকৃত সত্যধর্ম্ম এবং চরম নীতি উভয়েরই সুন্দর সমাবেশ হইয়াছে, আজ দেশের মহাসংকটের দিনে সেই মহামন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণ করিয়া কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। দেশের সকল প্রকার সংকট যদি কাটাইতে চাও, তবে স্বার্থের চরণে, অথবা পৌরোহিত্যের চরণে, উপধর্ম্মের চরণে আজ বহুকাল ধরিয়া যে দাসত্বের খত লিখিয়া দিয়া বসিয়া আছ, সেই দাসত্বের খত ফিরাইয়া লইয়া ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ কর। তাহাদের নিকট আমরা যেটুকু উপকার পাইয়াছি, আজ শত শত বৎসর তাহাদের চরণে আত্মবিক্রয় করিয়া সেই উপকারের সুদের সুদ পর্য্যন্ত আদায়

দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আর নয়—এখন আমাদের মুক্তিলাভের সময় আসিয়াছে। আর যেন আমরা স্বাধীন মানবাত্মাকে সর্ব্বপ্রকার দাসত্বের নিম্নে ফেলিয়া তাহাকে নির্জীব করিয়া না তুলি। অযথা বন্ধন যাহা কিছু, সমস্তই ভাঙ্গিয়া ফেল; স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিয়া ক্ষয়রোগের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অন্ততঃ একবার উদ্যোগ ও চেষ্টা কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে মহামন্ত্র আমাদিগকে আনিয়া দিয়াছেন, বেশ করিয়া আলোচনা করিয়া অন্তরে উপলব্ধি কর যে, সেই মহামন্ত্রের এক একটী অক্ষর এক একটী জ্বলন্ত ও সংহত অগ্নিকণা! আমার এই সত্যবাক্য গ্রহণ কর যে, এই মহামন্ত্র প্রাণের ভিতর ধরিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই আমাদের সর্ব্বপ্রকার দাসত্বের জঞ্জাল, সকল প্রকার সংকট অবিলম্বে পুড়িয়া একেবারে ছাই হইয়া যাইবে।

এই মুক্তির কথা, এই মহামন্ত্রের মহিমা কেবল মুখে প্রচার করিলে চলিবে না; সেই অনুসারে আমাদের কাজও করিতে হইবে। অনেক সময়ে আমরা আমাদের মুখের কথায় ও কাজে মিল রাখিতে পারি না বলিয়াই আমরা এত মুহ্যমান, এত চিন্তাজীর্ণ ও এত নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি। ভগবান যে নিখুঁত নিক্তি ধরিয়া আছেন—আমরা নিজেকে ঠকাইতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে তো ঠকাইতে পারিব না! আমাদের মুখের কথায় ও কাজে যখনই মিল হইবে, তখনই তিনি আমাদের প্রাণের ভিতর এমন এক শক্তি প্রেরণ করিবেন যে, আমরা সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে আগুন ছড়াইতে ছড়াইতে চলিতে পারিব। এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকেরা নিজেদের স্বার্থ ভুলিয়া, নিজেদের সুখের আশা ত্যাগ করিয়া প্রাণের উৎসাহে কথায় ও কাজে এক হইয়া ঐ মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই আগুন ছড়াইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের কর্ম্মের কথা তাই আজ কেবল ব্রাহ্মসমাজের নহে, কেবল ভারতের নহে, জগতের ইতিহাসে অতীতের কাহিনীরূপে স্থান লাভ করিয়াছে। আজও যে আমরা ব্রাহ্মসমাজের এতটা প্রভাব অক্ষুন্ন দেখিতেছি, তাহা তাঁহাদেরই সেই স্বার্থত্যাগের ফল। সেই সকল মহাত্মাদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আবার যেদিন আমরা কথায় ও কাজে এক হইয়া ভগবানকে সমুদয় হৃদয় মন দিয়া ভালবাসিতে পারিব এবং তাঁহারই প্রিয়কার্য্য বলিয়া যেদিন মানুষকে ভাই বলিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইতে পারিব, সেইদিন, যে শক্তি ভগবান ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে নিহিত রাখিয়াছেন সেই শক্তি আবার সুপ্ত সিংহের মত জাগিয়া উঠিয়া নিশ্চয়ই আত্মপ্রকাশ করিবে—কিন্তু তাহার পূর্ব্বে নহে।

আমাদের মুখের কথায় ও কাজে মিল করিতে গেলে ভগবানের স্থলে ঐহিক সুখসমৃদ্ধিকে মানসম্ভ্রমকে দেবতা বলিয়া বরণ করিয়া লইলে চলিবে না। ঐহিক মানসম্ভ্রম সুখসম্পদকে প্রকৃত মঙ্গলের সঙ্গে এক করিয়া দেখিলে এবং তাহাতে আসক্ত হইয়া তাহারই পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইলে অনেক সময়ে ধর্ম্মের সহিত তাহার বিরোধ উপস্থিত হইবেই; এবং তখন সেই আসক্তির কারণেই তোমাকে সত্যধর্ম্মের পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেই হইবে। ঐহিক সুখসম্পদকেই আজকাল আমরা আমাদের সর্ব্বস্ব করিয়া লইয়াছি বলিয়াই যাঁহারা ঐহিক মানসম্ভ্রম ও সুখসম্পদে পরিবৃত, তাঁহাদেরই পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতে আমরা এতই ব্যস্ত থাকি যে, যাহারা সত্যসত্য পাপে তাপে জর্জ্জরিত হইয়া শান্তি পাইবার উদ্দেশ্যে আমাদের নিকটে আসে, কঠোর দুঃখদৈন্যে প্রপীড়িত হইয়া যাহারা আশ্রয় পাইতে চাহে, তাহাদের দিকে আমরা ফিরিয়া দেখিবার অবসরও পাই না। ঐহিক সুখসম্পদ মানসম্ভ্রমকে সর্ব্বস্ব করিয়া লইলে পুরাতন দাসখত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় নূতন আর একটী দাসখত লিখিয়া দিতে হইবে; পরাধীনতা হইতে কিছুতেই মুক্তিলাভের আশা থাকিবে না। ইহাই আমাদের একটা মহাসঙ্কট।

এই মহাসঙ্কট হইতে যদি রক্ষা পাইতে চাও, তবে নূতন জন্ম গ্রহণ কর; নূতন ভাবের, নূতন আশাভরসার, নূতন প্রাণের স্পর্শ লাভ কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সঙ্কটমোচন মহামন্ত্র আনিয়া দিয়াছেন, সেই মহামন্ত্রের অগ্নিতে দীক্ষা লইয়া নিজের কর্ত্তব্য কাজ করিয়া চলিতে থাক। ভগবানের

করুণা যে অনুভব করে না, ভগবান হইতে যে দূরে থাকে, তাহার মত কেবল নিজের সুখকেই সমস্ত জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিও না। অতুল সম্পদের যদি অধিকারী হও, তবে সেই সম্পদ জগতের মঙ্গলের জন্য তোমার নিকট ভগবান গচ্ছিত রাখিয়াছেন জানিয়া তাহা সযত্নে রক্ষা করিবে; গর্ব্বে অহঙ্কারে মত্ত হইয়া তাহা অন্যায়-রূপে নষ্ট করিবার অধিকার তোমার নাই। দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেই যদি বা তুমি পতিত হও, তবে তাহাও তোমার মঙ্গলেরই জন্য ভগবানের দান বলিয়া মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবে। সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও তৃষ্ণা দূর হয় না; বরঞ্চ সেই জল পান করিলে তৃষ্ণা বাড়িয়া যায়, মরণ ঘনাইয়া আসে। কিন্তু এক ঘটি মিষ্ট জল পান করিলেই সমুদয় তৃষ্ণা দূর হইয়া প্রাণমন শীতল হয়। সেইরূপ ভগবানকে ছাড়িয়া শান্তির আশায় ঐহিক সুখের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও যে প্রকৃত সুখ পাইবে শান্তি পাইবে তাহা কথ-নই মনে করিও না।

বহুকালের দাসত্বের পর আজ মুক্তির আশাবাণী শোনা গিয়াছে; আর নূতন করিয়া দাসত্বের শৃঙ্খল নির্ম্মাল্য বলিয়া গলায় তুলিও না। ভগবৎপ্রদত্ত ঐ সঙ্কটমোচন মহামন্ত্র নির্ভীক-হৃদয়ে মুখেও প্রচার করিবে, আবার তাহা কার্য্যেও পরিণত করিয়া মহাশক্তি অর্জ্জন করিবে। ভগবানের মাভৈ রব শুনিতে থাক, আর তাঁহার হস্তে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া, ঐহিক সুখের অতি-মাত্র আকাঙ্ক্ষা এবং বিলাসের প্রতি আসক্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়া, নিজেদের কথায় ও কাজে মিল করিয়া কর্ত্তব্য কাজ করিয়া চলিয়া যাও; সেই কর্ম্মের শক্তি ও ফল দেখিয়া তুমি নিজেই অবাক হইবে। আমাদের প্রত্যেকের ভগবানকে খুঁজিয়া পাইবার উপর এবং সেই পাইবার চেষ্টা করার উপর আমাদের প্রত্যেকের, আমাদের পরিবারের, আমাদের দেশের এবং সমস্ত জগতের সমূহ মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, ইহা সত্য জানিয়া তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব, একস্য তস্যৈবোপাসনয়া ঐহিকং পারত্রিকঞ্চ শুভ-ম্ভবতি—এই সঙ্কটমোচন মহামন্ত্রকে কৌস্তুভমণির ন্যায় হৃদয়ে অহর্নিশি ধারণ করিয়া রাখ। ভগবান আমাদিগকে সকল প্রকার সঙ্কট হইতে মুক্তি প্রদান করুন।

দুঃখ-রাতি।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল)

দুঃখ-রাতি আস্‌চে প্রাণে
সুখের কমল ফুটবে ব'লে;
আনন্দে তুই কাটা রে রাত
ফুলের মত গানের ছলে।
ভয় কি রে তোর? শঙ্কা কিসের?
দুখের রাতি প্রভাত হবে,
ফুটবে আলো—ছুটবে কালো
উঠবে রবি পাখীর রবে।
দুঃখ-রূপে কতই যে সুখ
হানা দে' যায় প্রাণের দ্বারে
হৃদয়-দুয়ার বন্ধ দেখে'
ফিরিয়া যায় বারে বারে!
দুঃখ ও সুখ পথিক এরা
খেল্‌তে আসে ক্ষণেক তরে—
ফিরিয়ে দিবি দ্বার হতে তুই?
লাগ্‌বে ভাল একা ঘরে?
দেবতারি আশীষ এরা—
বরণ করে ডেকে নে ভাই;
মৃত্যুও যে বন্ধু মোদের
সেই কথাটি ভুলিস নে ভাই॥

পরমহংস শ্রীসিদ্ধারূঢ় স্বামী।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

বম্বের অধীন ধারবার জেলার অন্তর্গত হুবলী নামক স্থানে সিদ্ধারূঢ় স্বামী নামক জনৈক প্রসিদ্ধ পরমহংস আছেন। ইনি একজন প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া সকলের বিশ্বাস। হুবলী, গদগ, ধারবাড় প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে সিদ্ধারূঢ় স্বামীর নাম জানে না এমন লোক নাই। প্রতিবৎসর মেলার

সময় নানা দেশ হইতে প্রায় লক্ষাধিক নরনারী স্বামীজীর মঠে আসিয়া উৎসবে যোগদান করে। হিন্দু, লিঙ্গায়ত, মুসলমান, পার্সি, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতীয় শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নরনারী তাঁহার নিকট অবাধে আসিতে পারে। ভক্তিভাবে লোকে যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য আনয়ন করে, তিনি জাতি-বিচার বা কোন দ্বিধা না করিয়া তাহা আনন্দের সহিত ভক্ষণ করেন। তাঁহার মঠে মূর্ত্তিপূজা নাই, জাতিভেদ নাই, ধনীদরিদ্র ভেদ নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই। তিনি সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখেন। সকলকেই একমনে পরম ব্রহ্মের উপাসনা, ধ্যান ও ধারণা করিতে উপদেশ দেন। মঠে প্রতিদিন পৌত্তলিকতাশূন্য বেদান্তাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পঠিত হয়। আমি ভারতবর্ষের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়াও পূর্ব্বে কখনও এমন নিরভিমান সাধুর দর্শন পাই নাই। এমন কি, অনেক ইংরাজও ইঁহার যশ কীর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

শ্রীমৎ পরমহংস সিদ্ধারূঢ় স্বামী খ্রীঃ ১৮৩৬ অব্দে নিজাম রাজ্যে বিদরকোটী নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত লিঙ্গায়তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শান্তপ্পা এবং মাতার নাম মাল্লবা ছিল। এই দম্পতী মহা শিবভক্ত ছিলেন। নন্দিকেশ্বর তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা ছিল। ইহাঁরা বীরভদ্র নামক জনৈক শিবযোগীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেই গুরুকে আপনার আলয়ে রাখিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। তাঁহাদের গৃহে প্রাতঃসন্ধ্যা আগম ও ভাগবত পাঠ হইত।

এই দম্পতীর সন্তান না হওয়ায় তাঁহারা বড়ই দুঃখিত ছিলেন। মাল্লবা সন্তানাকাঙ্ক্ষী হইয়া গুরুর নিকট প্রার্থনা করেন। গুরু "তোমার পুত্র হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে প্রসাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে মল্লবার দুই দুই বৎসর অন্তর তিনটী পুত্র সন্তান হইল। প্রথম পুত্রের নাম বৃদ্ধপ্পা, দ্বিতীয় পুত্রের নাম মধ্যপ্পা এবং তৃতীয় পুত্রের নাম সিদ্ধপ্পা রাখিলেন। এই সিদ্ধপ্পাই পরে সিদ্ধারূঢ় স্বামী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

অতিবাল্যকাল হইতেই সিদ্ধপ্পার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার শরীরে বৈরাগ্যের চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি অঙ্গে বস্ত্র না রাখিয়া বিভূতি মাখিতেন, অলঙ্কার ফেলিয়া দিয়া গলদেশে ও হস্তে লিঙ্গ বাঁধিতেন। তিন চারি বৎসর বয়ঃক্রম কাল হইতে মাতা-পিতার নিকট বসিয়া একাগ্রচিত্তে শাস্ত্রপাঠ শুনিতেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্যালয়ে গমন করিতে লাগিলেন। সিদ্ধপ্পা ছয় বৎসর অতিক্রম করিলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তিনি জননীকে বলিলেন, "হে মাতঃ বিদ্যালয়ে যাইয়া কি হইবে? গুরু বীরভদ্র প্রতিদিন যে সৎশিক্ষা প্রদান করেন, সেই মত করা কর্ত্তব্য। মাতা বিদ্যালয়ে পাঠাইবার নাম করিলেই তিনি তাঁহাকে এইরূপ উত্তর দিতেন। কিন্তু যদিও বিদ্যালয়ে যাইতেন না, তথাপি যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরগণ বাটীতে বিদ্যাভ্যাস করিতে ও লিখিতে বসিতেন, তিনিও তাঁহাদের সহিত বসিয়া পড়িতে ও লিখিতে শিখিতেন।

এক দিবস গুরু বীরভদ্র শান্তাপ্পা এবং মাল্লাবাকে মহাবাক্যের উপদেশ করণান্তর সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, সর্ব্বভূতে দয়া, দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা প্রভৃতি নীতি অনুযায়ী সংসারে বিচরণ করিলে শিবপ্রসাদ লাভ হইবে এইরূপ কহিলেন। এই সময় সিদ্ধপ্পাও তথায় বসিয়াছিলেন। গুরুর এই উপদেশমত তিনি সমদৃষ্টি হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এক দিবস সিদ্ধপ্পা অপরাপর বালকগণের সহিত খেলিতে খেলিতে বাটী ফিরিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বলিল "সিদ্ধপ্পা আমাদিগকে তিলদানা খাইতে দাও।" তখন সিদ্ধপ্পার মাতা বাটীতে ছিলেন না। ঘরের মধ্যে শিকায় হাঁড়ীতে তিলদানা ছিল। সিদ্ধপ্পা তাহা পাড়িতে না পারিয়া কাঠির দ্বারা ভূমিতে ফেলিলেন। বালকগণ প্রাণ ভরিয়া তিলদানা ভক্ষণ করিল এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া আপন আপন গৃহে গমন করিল। কিছুক্ষণ পরে সিদ্ধপ্পার জননী গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে ঘরময় তিলদানা ছড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি সিদ্ধপ্পাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন "একার্য্য কে করিল?" সিদ্ধপ্পা মাতার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। মাতা বলিলেন, এরূপ করিলে কিরূপে সংসার করিব? সিদ্ধপ্পা বলিলেন "মা, সে দিবস গুরুদেব বলিয়াছিলেন যে সকলকে সমদৃষ্টি করিলে শিবপ্রসাদ লাভ হয়। সংসার হইতে কি শিবপ্রসাদ অধিক প্রয়োজনীয় নহে?" মাতা এই দুগ্ধপোষ্য বালকের মুখে এইরূপ জ্ঞানের কথা শুনিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন এবং বাহ্যিক বলিলেন "বৎস, এরূপ আর করিও না।"

গৃহে অবস্থানকালে সিদ্ধপ্পা সর্ব্বদা শিবনাম উচ্চারণ করিতেন, এবং শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ করিতেন। বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেন না বা কোন কার্য্যই করিতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতারা পৈত্রিক বিষয়কর্ম্মাদি করিতেন। তাঁহারা কর্ম্মপ্রসঙ্গে বাহিরে যাইতেন; সিদ্ধপ্পা গৃহে পিতার নিকট থাকিতেন।

এক দিবস গুরু বীরভদ্র কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, পঞ্চ-মহাভূত এবং পঞ্চকোষ বিচার করিয়া সত্য বস্তুর অনুসন্ধান করিবে। সত্য বস্তু লাভ হইলে কৃতকৃতার্থ হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া সিদ্ধপ্পা সত্য অন্বেষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু গৃহে বসিয়া সত্য অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার পক্ষে অনেক প্রতিবন্ধক দেখিয়া অবশেষে সংসার পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তৎপরে এক দিবস ঘোর নিশাকালে সকলের অজ্ঞাতসারে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। ইহার পর তিনি আর কখনও গৃহে প্রত্যাগমন করেন নাই। গৃহ পরিত্যাগ কালে সিদ্ধপ্পার বয়ঃক্রম ১৪। ১৫ বৎসর ছিল।

গৃহত্যাগকালে সোম এবং ভীম নামক তাঁহার দুই বন্ধু তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে সোম ও ভীম ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। কিন্তু সিদ্ধপ্পা সর্ব্বদা শিবনাম করিয়া শারীরিক কষ্ট নিবারণ করিতেন। কখনও ক্ষুৎপিপাসায় অস্থির হইতেন না।

এইরূপে তিনজনে মিলিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে শিবপেট নামক গ্রামে গমন করিয়া গ্রামের বহির্ভাগে একটি ভগ্ন শিবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সোম এবং ভীম মন্দিরের একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কিন্তু সিদ্ধপ্পা ভূমিতে না বসিয়া তত্রত্য পাষাণময় (নন্দী-) বৃষভের উপর বসিলেন। প্রাতঃকালে নিয়মমত উক্ত দেবালয়ের পূজারী পূজা করিতে আসিয়া সিদ্ধপ্পাকে নন্দীর উপর উপবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং তাঁহাকে বিস্তর গালি দিয়া নন্দীর উপর হইতে অবতরণ করিতে বলিল। সিদ্ধপ্পা নন্দীর উপর বসিয়াই শান্তভাবে পূজারীকে বলিলেন "তুমি প্রস্তরখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া আছ, আমিও প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া আছি, ইহাতে আমার দোষ কি হইল?" নন্দীকে প্রস্তরখণ্ড বলায় পূজারী অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া গ্রামমধ্যে গমন করত কয়েকজন লোককে ডাকিয়া আনিল। তাহারা আসিয়া সিদ্ধপ্পাকে নন্দীর পৃষ্ঠ হইতে নামিতে বলিল। সিদ্ধপ্পা কিছুতেই সম্মত হইলেন না এবং পূর্ব্ববৎ প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তৎপরে সেই সমবেত গ্রামবাসীর মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে লাঠি দ্বারা মারিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সিদ্ধপ্পা অটল-অচল-ভাবে শিবধ্যানে মগ্ন রহিলেন। কেহ তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে সাহস করিল না।

গ্রামবাসীর মধ্যে একজন বৃদ্ধ আচার্য্য ছিলেন। তিনি সম্মুখে আসিয়া সিদ্ধপ্পাকে বলিলেন—"সিদ্ধপ্পা নন্দী হইতে নামিয়া আইস।" এই কথা শুনিয়া সিদ্ধপ্পা বলিলেন, "তোমরা ক্রুদ্ধ হইয়াছ সত্য; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমরা নন্দিকেশ্বর কাহাকে বল? প্রস্তরনির্ম্মিত নির্জ্জীব বৃষমূর্ত্তিকে না চৈতন্যকে? তুমি আমার ন্যায় যে প্রস্তরের উপর দাঁড়াইয়া আছ তাহা নন্দিকেশ্বর নহে প্রস্তরমাত্র। সুতরাং নন্দীকেশ্বর চৈতন্যস্বরূপ এইরূপ জানিবে। এই চৈতন্য একদেশী অথবা ব্যাপক? যাহা একদেশী তাহা কখনও চৈতন্য হইতে পারে না। সুতরাং চৈতন্য সর্ব্বব্যাপক। যিনি সর্ব্বব্যাপক তিনি একমেব অদ্বিতীয়ম্। এক্ষণে সেই সর্ব্বব্যাপী একমেব অদ্বিতীয়ম্‌কে কোথায় বসাইবে? এক মনুষ্য তাহার আপনার স্কন্ধের উপর কেমন করিয়া বসিবে? চৈতন্য পরমেশ্বর,—সে কারণ তিনি যথাতথা, তোমার মধ্যে, আমার মধ্যে, এই নন্দীতে, ঐ

গহ্বরে, সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান আছেন। মনুষ্য যেখানেই চলুক না কেন, তথাপি এই পৃথিবীর উপরেই রহিবে। তুমি প্রস্তরের উপর দাঁড়াইয়া আছ, আমিও প্রস্তরের উপর বসিয়া আছি। এক্ষণে তুমি যেখানে বলিবে সেইখানেই বসিব অথবা দাঁড়াইয়া রহিব।" এই কথা বলিয়া সিদ্ধপ্পা শিব-নাম জপ করিতে লাগিলেন।

একটি বালকের মুখে এবংবিধ গভীর তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া গ্রামবাসী সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইল এবং সিদ্ধপ্পার সহিত একযোগে মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শিবনাম ঘোষণা করিতে লাগিল। তৎপরে সিদ্ধপ্পা নন্দীর উপর হইতে অবতরণ করিলেন। গ্রামবাসী-গণ তাঁহাদিগকে খাদ্যদ্রব্যাদি প্রদান পূর্ব্বক অতিথি-সৎকার করিল।

পরদিবস অতিপ্রত্যূষে তিন বন্ধু মিলিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া সোম এবং ভীম অতিশয় শ্রান্ত হইয়া বলিল আমরা আর চলিতে পারিতেছি না। ক্ষুধায় পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। সিদ্ধপ্পা তাহাদিগকে বলিলেন, এরূপ কাতর হইলে লাভ কি? শিব-ধ্যান কর; যে শিব ক্ষুধা ও পিপাসা দিয়াছেন তিনিই তাহা নিবারণ করিয়া দিবেন।

তৎপরে তাঁহারা নিকটে একটি গ্রাম দেখিতে পাইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক গ্রামের বহির্ভাগে একটি শিবমন্দিরে আশ্রয় লইলেন। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। তথায় আসিবার পূর্ব্বে বৃষ্টিতে তাঁহা-দের বস্ত্র ভিজিয়া গিয়াছিল। তথাপি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া সোম ও ভীম সিদ্ধপ্পার নিষেধ সত্ত্বেও সেই রাত্রিকালে গ্রামমধ্যে ভিক্ষার্থ গমন করিল। সিদ্ধপ্পা মন্দিরমধ্যেই শয়ন করিয়া রহিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। গ্রামবাসী সকলে নিদ্রিত। কে বা ভিক্ষা দিবে? কাহারও সাড়া শব্দ নাই। সোম ও ভীম এক গৃহস্থের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। এত রাত্রে দুই জন অপরিচিত ব্যক্তিকে বাটীর মধ্যে আসিতে দেখিয়া গৃহস্বামী তাহাদিগকে চোর বলিয়া অনুমান করিয়া পুলিস চৌকিদারের হস্তে সমর্পণ করিল। চৌকিদার তাঁহাদিগকে ফাঁড়ীতে লইয়া উপস্থিত করিল। ফাঁড়ীর অধি-কারী অতি বিচক্ষণ ছিল। সে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে?" তাঁহারা বলিলেন "আমরা চোর নয়, পথিক; ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ভিক্ষার্থ গ্রামমধ্যে আসিয়াছি।" অধিকারী বলিল, "তোমরা বালক, এতরাত্রি কি ভিক্ষা মিলে? যথায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছ তথায় ফিরিয়া যাও। রাত্রি প্রভাত হইলে ভিক্ষা মিলিবে।" এই বলিয়া তাঁহাদিগকে চৌকিদার সমভিব্যাহারে শিবমন্দিরে পাঠাইয়া দিল।

এদিকে মন্দিরমধ্যে সিদ্ধপ্পা নিদ্রিত হইলে পর জনৈক শিবভক্ত গ্রামবাসী নৈবেদ্য লইয়া শিবপূজা করিতে আসিল। পূজা সমাপন করিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় সিদ্ধপ্পার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে সিদ্ধপ্পাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" সিদ্ধপ্পা বলিলেন "আমি পথিক। বনমধ্যে পথভ্রান্ত হইয়া এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি।" সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "তোমার আহার হইয়াছে কি?" সিদ্ধপ্পা বলিলেন "না।" এই কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি সেই নৈবেদ্য সামগ্রী সিদ্ধপ্পাকে প্রদান করিয়া বলিল "তবে এই নৈবেদ্য ভক্ষণ কর।" এই বলিয়া সে ব্যক্তি চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

রাজনীতি ও ধর্ম্মসমাজ।

বর্ত্তমানে রাশি রাশি রাজনৈতিক সমস্যা দেশকে যে প্রকার ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সেই সমস্যা-গুলির মীমাংসার একটা ব্যবস্থা না করিলে দেশের কল্যাণ নাই। এক এক দলের লোক এক এক সময়ে প্রভাবে ও ক্ষমতায় বাড়িয়া উঠিতেছে, আর সমুদয় দেশকে নিজের দিকে টানিয়া নিজের দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার ফলে দেশটা বায়ুতাড়িত মাঝিহীন নৌকার মত একবার এদিকে একবার ওদিকে চলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—নিজের গন্তব্যস্থান হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িতেছে।

কিন্তু এই সকল সমস্যার মীমাংসা করে কে? সকলেই সমস্যা সমাধান করিতে হইবে বলিয়া চীৎকার করিতেছেন বটে, কিন্তু কেহই স্থির করিতে পারিতেছেন না যে কাহার উপর মীমাংসার ভার অর্পণ করিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। রাজনৈতিক নেতা বলিয়া যাঁহারা আজ

সকলের নিকট সম্মান লাভ করিতেছেন, এবং সম্মানের উপযুক্ত অনেক স্বার্থত্যাগও করিতেছেন, আমাদের খুব সন্দেহ যে তাঁহাদের উপর মীমাংসার ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কি না। যাঁহারা সংযতেন্দ্রিয়, নিরপেক্ষ এবং সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি, তাঁহারাই বর্ত্তমান কালের গুরুতর সমস্যাগুলির মীমাংসা করিবার বিশেষ—বিশেষ কেন, সময়ে সময়ে মনে হয় একমাত্র—অধিকারী বলিয়া মনে হয়। যাঁহাদের চিত্ত রাজনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা দ্বারা বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হইতেছে, তাঁহাদের প্রাণগত চেষ্টা ও ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত কিছুতেই বর্ত্তমান সমস্যাগুলির মীমাংসা সাধনে সক্ষম বলিয়া মনে হয় না।

একটা চলিত কথাই তো আছে যে, যাহারা দাবাবড়ে খেলে, তাহারা অনেক সময়ে ঠিক চাল দেখিতে পায় না; যাহারা উপর-চাল চালে, তাহারাই অনেক সময়ে ঠিক চাল বলিতে পারে। কথাটা অনেক অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার ফল। যাহারা দাবাবড়ে খেলে, তাহাদের নিজেদের মাথায় যে চাল একবার আসিয়া গিয়াছে, সেই চালটাই তাহারা এত বেশী বড় করিয়া ভাবে ও এত বেশী মনোযোগের সঙ্গে দেখে যে, সেই চাল ছাড়া অন্য কোন ভাল চাল থাকিলেও সেটা সহজে তাহাদের নজরে পড়ে না। কিন্তু যাহারা খেলা দেখে, আর উপর-চাল চালিতে চাহে, তাহারা তো আর নিজের হারজিতের জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে না—তাহারা কেবল খেলার খেলাত্বটুকু উপভোগ করিতে চায়; তাই তাহারা নিজেদের বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে যতগুলি চাল হওয়া সম্ভব, সমস্ত চালগুলিরই উপরে নজর রাখিতে চায়, আর কাজেই তাহারা খেলোয়াড়দিগের অপেক্ষা চালগুলির ভালমন্দ অনেক সময়ে স্পষ্ট দেখিতে পায়।

সেই প্রকার যাহারা নিরপেক্ষ লোক, রাজনীতিক্ষেত্রের বাহিরের লোক, তাহারাই, সমস্যাগুলির ভালরূপ সমাধান করিতে সক্ষম বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। রাজনীতির ভিতরকার লোক হইলেই তো একপ্রকার স্থির যে, যিনি যে দলের লোক তিনি সেইদলেই আমাদের মতিগতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিবেন। যাঁহারা রাজনীতির বাহিরের লোক, তাঁহাদের এ ভাবনা নাই যে, কোন্ দলের পরাজয় হইবে অথবা কোন্ দল জয়লাভ করিবে। তাঁহারা দুই দলেরই মতামত পরীক্ষা করিয়া লইবেন যে কোন্ দলের কোন্ মতের কতটুকু গ্রহণ করিলে লোকের জীবনযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হইবে। তাঁহারাও যখন সাধারণ লোকের অন্তর্ভুক্ত, তখন তাঁহাদেরও সুখেস্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই নিরপেক্ষভাবে সকল সম্প্রদায়েরই মত ও কার্য্যের সমালোচনা করিয়া মীমাংসার চেষ্টা করিতেই হইবে। তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে মীমাংসার চেষ্টা করিলে কোন সম্প্রদায়ই তাঁহাদের উপর পক্ষপাতদোষ দিতে সাহসী হইবে না, বরঞ্চ তাঁহাদের মীমাংসা সকল সম্প্রদায়ই অবনতমস্তকে শিরোধার্য্য করিয়া লইতে বাধ্য হইবে। তবে, তাঁহাদের যেমন সত্য-সত্য নিরপেক্ষ ও সমবুদ্ধি হইয়া কার্য্য করিতে হইবে, সেইরূপ তাঁহাদের কার্য্যের প্রণালীও এমনভাবে গঠিত করিতে হইবে যে, অন্য লোকের কথা দূরে থাক, রাজনীতিক্ষেত্রের লোকদিগেরও মনে যেন তাঁহাদের উপর সন্দেহ করিবার লেশমাত্র কারণ উপস্থিত না হয়। কার্য্যের দ্বারা, কথা দ্বারা, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের সকলকে দেখানো উচিত যে, তাঁহারা সত্য-সত্যই নিরপেক্ষ এবং নিরপেক্ষভাবেই বর্ত্তমানের সর্ব্ববিধ সমস্যারই নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিবেন।

এই সূত্রে আমরা একটী কথা বলিতে চাই—মনে না করিলে সেটী খুবই ছোট কথা, আর মনে করিলে সেটী খুবই বড় কথা। আমাদের মনে হয় যে, বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজগুলি সম্মিলিতভাবে সাধারণ ভারতবাসীর প্রতিনিধিস্বরূপে এবং প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে জনসাধারণের মতামত অবগত হইয়া সমস্যাগুলির মীমাংসা বিষয়ে অগ্রসর হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে। নিরপেক্ষভাবে সকল ধর্ম্মসমাজ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া একটী ধর্ম্মাধিকরণ সংগঠিত করিতে হয়। এইভাবে সংগঠিত ধর্ম্মাধিকরণ প্রকৃতই ধর্ম্মাধিকরণ হইয়া দাঁড়াইবে এবং এই ধর্ম্মাধিকরণ নিরপেক্ষভাবে

সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান করিতে থাকিলে জনসাধারণ নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যাও মীমাংসিত করিবার জন্য উহার নিকট উপস্থিত হইবে। ইহার ফলে উহার প্রতাপ কি প্রকার বিস্তৃত ও গভীর হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের মতে, ভারতের সকল বিষয়ের, এমন কি, রাজনীতিক্ষেত্রেরও গুরুতর সমস্যা মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইবার অধিকার ধর্ম্মসমাজসংশ্লিষ্ট লোকদিগেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তবে যাঁহাদের হস্তে এই প্রকার সমস্যা সমাধানের ভার ন্যস্ত হইবে, তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই এক-একজন মহাত্মা গান্ধি হইতে হইবে—সম্ভব হইলে তাঁহা অপেক্ষাও নিরপেক্ষ ও সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি হইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধি কেবল ধর্ম্মানুবর্ত্তিতা, নিরপেক্ষতা এবং সকল মনুষ্যেরই প্রতি সমবুদ্ধিরই কারণে আজ ভারতে মারামারি কাটাকাটির সাহায্য ব্যতীতও এক আশ্চর্য্য বিপ্লব সাধনে সক্ষম হইতেছেন।

এরূপ বিপ্লব একমাত্র ভারতভূমিতেই সম্ভব; অন্য কোন দেশে বিনা রক্তপাতে রাজনৈতিক বিপ্লব কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ভারতের ইতিহাস যাঁহারা একটু মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বেশী করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই যে, ভারতের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধানে ধর্ম্মসমাজের বিশেষ অধিকারের কথা কেন উল্লেখ করিলাম। ভারতভূমি সত্যই পুণ্যভূমি। পুরাকালে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ধর্ম্মের সঙ্গে মানবজীবনের প্রত্যেক বিষয়টীর এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করা হইত যে, রাজনীতিই বল, সমাজনীতিই বল, অথবা অন্য যে কোন বিষয়ই বল, কোন বিষয়েরই আন্দোলন আলোচনা হইতে ধর্ম্মসমাজের দূরে সরিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। বরঞ্চ মনে হয় যে, কালক্রমে ধর্ম্মের সঙ্গে সকল বিষয়ের এই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ লইয়া এতই বাড়াবাড়ি করা হইয়াছিল যে, ক্রমে এদেশের প্রত্যেক বিবাদবিসম্বাদেই শেষে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দলাদলিরই ছড়াছড়ি হইতে লাগিল, এবং তাহার ফলে ধর্ম্মের সঙ্গে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের যোগ রক্ষা করাই ধর্ম্মের উপর একটা অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছিল্যের ভাব আসিবার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এই কারণেই ক্রমে আমাদের দেশের ধর্ম্মটাই 'হাঁচি-টিকটিকির-ধর্ম্ম' প্রভৃতি নামে উপহাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রকার উপহাস উপভোগ করিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকিলেও আমরা অন্তরের সহিত বলিব যে, আমাদের দেশে জীবনের সকল ক্ষেত্রই ধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, এবং সেই সম্বন্ধ থাকাও আমাদের মতে মন্দ তো নিশ্চয়ই নহে, বরঞ্চ খুবই ভাল। আমাদের ইহা দৃঢ় ধারণা বলিয়াই আমরা বর্ত্তমান কালের রাজনৈতিক সমস্যারও মীমাংসাকরণে ধর্ম্মসমাজসংশ্লিষ্ট সমবুদ্ধি ও নিরপেক্ষ লোকদিগকেই সাদরে আহ্বান করিতেছি এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ অধিকার আছে বলিয়া মনে করি।

কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের দেশের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে এই অধিকার যে কি ভাবে, কি প্রণালীতে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা গুরুতর চিন্তার বিষয়। গবর্ণমেণ্ট বেশ জানেন যে, এখনও ভারতবাসী ধর্ম্মের নামে কিরূপ সহজেই উন্মত্ত হইয়া উঠে। তাই কোন ধর্ম্মসমাজের বা ধর্ম্মসমাজসংশ্লিষ্ট লোকের প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতরণ করা গবর্ণমেণ্টের বড় একটা পছন্দসই বলিয়া মনে হয় না।

আমরা যখন পরাধীন জাতি, তখন গবর্ণমেণ্ট যাহা পছন্দ করেন না, সে প্রকার কার্য্য করিতে গেলে সাত-পাঁচ ভাবিয়া করিতে হয়—নচেৎ অনিষ্টের যে বিশেষ সম্ভাবনা তাহা বলা বাহুল্য। পরাধীন জাতির রাজনীতি-চর্চ্চার অর্থে প্রধানতঃ শাসক সম্প্রদায়কে অধিকাংশে সময়ে অপ্রিয় সত্য কথা শুনাইয়া দেওয়া—হয়, গোপাল ভাঁড় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে যেভাবে সময়ে সময়ে অপ্রিয় সত্য কথা শুনাইয়া দিত, সেইভাবে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া অপ্রিয় সত্য কথা বলা; অথবা মহাত্মা গান্ধি প্রভৃতির ন্যায় নির্ভীকভাবে স্পষ্ট ভাষায় প্রাণের জ্বালা শুনাইয়া দেওয়া।

শাসক সম্প্রদায় যতক্ষণ পরাধীন জাতির মর্ম্মভেদী অপ্রিয় কোন কার্য্য না করেন, ততক্ষণ পরাধীন জাতি তাঁহাদের কার্য্যের আবশ্যকমত প্রতিবাদ শান্তভাবে মিষ্টভাষায় করিতে প্রস্তুত থাকে, ততক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়া শিষ্ট প্রণালীতে সেই সমস্ত কার্য্যের আন্দোলন আলোচনা করিতে পারে।

কিন্তু যখন শাসক সম্প্রদায় স্বার্থে অন্ধ হইয়া জ্ঞানত বা অজ্ঞানত পরাধীন জাতির মর্ম্মভেদী কোন কার্য্য করিয়া বসেন, তখন পরাধীন জাতির ক্ষমতা থাক বা নাই থাক, পরাধীন জাতি অনেক সময়েই ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিয়া কঠোরভাবে স্পষ্টভাষায় সত্য-কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না—তখন প্রাণটা ফাটিয়া নাকি সত্যকথা বাহির হইতে চায়! আর ঠিক সেইটাই শাসকসম্প্রদায় সহ্য করিতে পারেন না। তখন শাসকগণও আত্মহারা হইয়া ধৈর্য্য হারাইয়া প্রচণ্ড দলনদণ্ডের সাহায্যে পরাধীন জাতিকে আরও বেশী পদানত রাখিবার চেষ্টায় ভীষণ তাড়না করিতে থাকেন। তাহার ফলে অনেক স্থলে পরাধীন জাতি অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিয়াও আত্মরক্ষা করিতে চাহে, কৃতকার্য্য যতটা হউক আর না হউক ; আবার অনেক স্থলে পরাধীন জাতি আত্মশক্তি প্রকাশে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহের প্রচণ্ড দাবানল জ্বালাইয়া দেয়।

রাজনীতিক্ষেত্রে একবার নামিয়া পড়িলে অনেক সময়েই পরাধীন জাতির পক্ষেও শাসক-গণকে কঠোরভাবে সত্যকথা শুনাইয়া দিবার লোভ সম্বরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তাই, পাছে কোন সূত্রে দৈবাৎ শান্তভাবে শাসক সম্প্রদায়ের কার্য্য সমালোচনা করিবার সীমা অতিক্রম করিবার ফলে গবর্ণমেণ্টের তীব্র দলননীতির নিষ্পেষণযন্ত্রের নিম্নে পড়িয়া অন্যান্য অনেক ভাল কাজ করিবার অবসর হারাইয়া ফেলিতে হয়, সেই কারণে সাধারণত বর্ত্তমানে আমরা ধর্ম্মসমাজের পক্ষে রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা বিপজ্জনক, সুতরাং অযুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। সরল ভাষায়, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণত রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিয়া নিজেকে বিপন্ন করা কোন ধর্ম্মসমাজের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি না।

সাধারণত অকর্ত্তব্য হইলেও প্রসঙ্গবিশেষে ধর্ম্মসমাজের রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হওয়া কেবল অসম্ভব নহে, বরঞ্চ নিতান্ত অন্যায়। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে বর্ত্তমানে ধর্ম্মসমাজগুলি নানা কারণে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার খুবই চেষ্টা করেন—পারত পক্ষে রাজনীতির ভিতরে আপনা-দিগকে নামাইতে চাহেন না। কিন্তু চেষ্টা করিলেই কি সকল সময়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় ? সে বিষয়ে আমাদের খুবই সন্দেহ আছে। পাঁচজন মানুষ লইয়াই তো ধর্ম্মসমাজ ? কাজেই রাজ-নৈতিকভাবেই হউক বা অন্য যে কোন ভাবেই হউক, যে সকল বিষয়ের আন্দোলন আলোচনা দেশকে একবারে মন্থন করিয়া ফেলিবে, দেশের প্রাণকে একেবারে আলোড়িত করিয়া তুলিবে, সে সকল বিষয়ের আন্দোলন আলোচনার তরঙ্গ ধর্ম্মসমাজেরও দেহে আসিয়া না লাগা অসম্ভব—লাগিতেই হইবে। তবে, সেই আন্দোলনে প্রকাশ্যে যোগ দেওয়া বা না দেওয়া পৃথক্ কথা।

কিন্তু ইহাই বা কেমন কথা—যে বিষয়ের আলোচনা দেশকে একেবারে ওলটপালট করিয়া ফেলিতেছে, সে বিষয়ের আলোচনা হইতে ধর্ম্ম-সমাজ "একলষেঁড়ের" ন্যায় সরিয়া থাকিবে এবং দর্শকের ন্যায় দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতে থাকিবে ? আমাদের মতে সাধারণত ছোটখাটো বিষয়ের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ না দেওয়া ধর্ম্মসমাজের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইলেও, যখন কোন বিষয়ের আন্দোলন সমস্ত দেশের প্রাণকে আলোড়িত করিয়া তুলিবে, যখন কোন বিষয়ের সু-সিদ্ধান্তের উপর দেশের গুরুতর মঙ্গল-অমঙ্গল সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য নির্ভর করিবে, তখন সে বিষয়ের আলোচনায় যোগ না দিয়া সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দূরে দাঁড়াইয়া থাকা কোন ধর্ম্মসমাজেরই পক্ষে সম্ভব তো নহে-ই, বরঞ্চ অসঙ্গত ও অন্যায়। একথা অবশ্য মানি যে, রাজনৈতিক নেতাগণ যেমন কথায় কথায় প্রত্যেক রাজনৈতিক বিষয়ই আকাশফাটানো সুরে আলোচনা করিতে ছুটেন, ধর্ম্মসমাজের পক্ষে সেপ্রকার বৃথা মহাকলরবের সঙ্গে কোন বিষয়েরই আলোচনায় যোগ দেওয়া সুশোভন নহে। তাহার পরিবর্ত্তে গুরুতর বিষয়গুলি মূলত ধর্ম্মের দৃষ্টিতে আলোচনা করিয়া তাহাদের সকল দিক স্থির ও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিয়া যথার্থ যাহা কল্যাণকর, যাহা শুভ, তাহাই গ্রহণ করিবার পরামর্শ গম্ভীর ও উপযুক্ত ভাষায় দেওয়াই ধর্ম্মসমাজের একটা

সুমহান্ অধিকার এবং তাহাই ধর্ম্মসমাজের উপযুক্ত কার্য্যও বটে। ভারতবর্ষের পক্ষে এই কথা বিশেষভাবে খাটে। তাহার কারণ আমি ইতিপূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি—রাজনীতিই বল, সমাজনীতিই বল, আমরা কোন কিছুকেই ধর্ম্মের বহির্ভূত করিয়া দেখিতে চাহি না; ধর্ম্মের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়াইয়া সকল বিষয় দেখাই ভারতবাসীর, বিশেষতঃ হিন্দুদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মজ্জাগত সংস্কার ও স্বভাব।

বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ অন্যতম-কলা-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। পুরাণশাস্ত্রে নীতিশাস্ত্রে এবং কাব্যাদিতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদঃ বিদ্যার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ঋষিযুগেও যে এই বিদ্যার সমাদর ছিল, তাহারও নিদর্শন বিলুপ্ত হয় নাই। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় "বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ" নামক একটি প্রকরণের সন্নিবেশ করিয়াছেন। টীকাকার ভট্টোৎপল মূলবচনের বিশদীকরণাভিপ্রায়ে কশ্যপের অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে কশ্যপের একটি গ্রন্থ ছিল। সর্ব্ববিজ্ঞানের অধিষ্ঠান তন্ত্রশাস্ত্রও এতদ্বিষয়ে উদাসীন নহে। ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামী কলাপ্রসঙ্গে শৈবাগমোক্ত "বৃক্ষায়ুর্বেবদ যোগের" উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন মূলগ্রন্থ আছে কিনা, তাহার এ পর্য্যন্ত কোনও বিশেষ অনুসন্ধানের সুযোগ হয় নাই। তবে কলামাত্র বলিয়া নানা গ্রন্থপ্রাপ্তসূত্র হইতে এতদ্বিষয়ের যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তদ্বিষয়েই যত্ন করা যাউক।

বরাহমিহির প্রথমেই বৃক্ষরোপণের উপযুক্ত ভূমির নির্দ্দেশ এবং তাহাকে রোপণীয় বৃক্ষের উপযোগী করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মৃদু ভূমিই সমস্ত বৃক্ষের হিতকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উক্ত ভূমিতে প্রথমতঃ তিল বপন্ করিবে, অনন্তর সেই তিলের গাছ পুষ্পিত হইলে সেই গুলিকে ভূমিতে মর্দ্দিত করিবে, ইহাই প্রথম কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে (১)। কিন্তু টীকাকার ভট্টোৎপল কশ্যপের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ হইতে জানা যায়, দুর্ব্বা এবং বিরা (বেণা) এই উভয় সংযুক্ত জলভূয়িষ্ঠ মৃদু মৃত্তিকাই সুগন্ধি বৃক্ষ রোপণের উপযুক্ত (২)

বরাহমিহির বৃক্ষের শাখা রোপণের রীতি লিখিয়াছেন। এই প্রণালী আধুনিক কলম করার রীতি হইতে কতকাংশে ভিন্ন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে পনস অশোক কদলী জম্বু লকুচ (ডেউয়া) দাড়িম, দ্রাক্ষা, পালীবত, বীজপূর ও অতিমুক্তক, এই সকল বৃক্ষ কাণ্ডরোপ্য অর্থাৎ ইহাদের শাখা রোপণ করিতে হয়। প্রথমতঃ উল্লিখিত বৃক্ষের শাখা গোময়ের দ্বারা লেপন করিয়া সেই শাখা মৃত্তিকাতে রোপণ করিবে, অনন্তর অন্য বৃক্ষের মূল ছেদন করিয়া সেই ছিন্ন মূলের উপরে, অথবা বৃক্ষের যেস্থান হইতে ডাল দেখা দেয়, সেইস্থানে বৃক্ষকে ছিন্ন করিয়া, তাহার উপরে বিজাতীয় বৃক্ষের শাখা রোপণ করিবে। (৩) অনন্তর তাহাতে মৃত্তিকার লেপ দিবে।

অধুনা কিন্তু কথিত রীতিতে কলম করা দেখা যায় না, অধিকন্তু বিজাতীয় বৃক্ষের সহিতও মিল করা হয় না।

বরাহমিহিরের বচনে কেবল রোপণের ব্যবস্থাই দেখা যায়। কিন্তু ভট্টোৎপল কাশ্যপের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে রোপণ এবং বপন এই উভয় পদ্ধতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

"দ্রাক্ষাতিমুক্তকো জম্বু-বীজপূরক-দাড়িমাঃ।
কদলী-বকুলাশোকাঃ কাণ্ড-রোপ্যাশ্চ বাপয়েৎ ॥

---

(১) মৃদ্বী ভূঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং হিতা তস্যাং তিলান্ বপেৎ।
পুষ্পিতাংস্তাংশ্চ মৃদ্নীয়াৎ কর্ম্মৈতৎ প্রথমং ভুবঃ।

(২) দূর্ব্বা-বীরণ-সংযুক্তাঃ সানূপা মৃদুমৃত্তিকাঃ।
তত্র বাপ্যাঃ শুভা বৃক্ষাঃ সুগন্ধিফলশালিনঃ ॥

(৩) অধুনা কাণ্ড-রোপ্যাণাং বিধানমাহ :—
পনসাশোককদলী-জম্বুলকুচদাড়িমাঃ।
দ্রাক্ষা-পালীবতশ্চৈব বীজপূরাতিমুক্তকাঃ ॥
এতে দ্রুমাঃ কাণ্ডরোপ্যা গোময়েন প্রলেপিতাঃ।
মূলোচ্ছেদেঽথবা স্কন্ধে রোপণীয়াঃ পরং ততঃ ॥ ৫৪ অ। ৪-৫।

টীকা—কাণ্ডরোপ্যাঃ কাণ্ডাঃ শাখা তান্ গোময়েন প্রলিপ্য রোপয়েৎ। ততোঽনন্তরং পরং প্রকৃষ্টং মূলোচ্ছেদে অথবা স্কন্ধে রোপণীয়াঃ। অন্যবৃক্ষস্য মূলোচ্ছেদং কৃত্বা তস্য ছিন্নমূলস্যোপরি বিজাতীয়ো বৃক্ষো রোপণীয়ঃ। অথবা স্কন্ধাদূর্দ্ধ্বমন্যবৃক্ষং ছিত্বা তস্য স্কন্ধমুৎকীর্য্য বিজাতীয়ো বৃক্ষো রোপণীয়ঃ। তত্র মৃত্তিকালেপং দাপয়েদিতি। ৫।

বরাহমিহির বৃক্ষরোপণের বিধান বলিয়াছেন,—(৪) "গোঘৃত ও গোদুগ্ধ, বেনারমূল, তিল, মধু, বিড়ঙ্গ ও গোময়, এই সমস্ত জিনিস একত্র মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা বৃক্ষের মূল হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত লিপ্ত করিয়া বৃক্ষকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া রোপণ করিবে।

বৃক্ষরোপণের কর্ত্তা শুচি হইয়া স্নান ও অনুলেপনের দ্বারা বৃক্ষের পূজা করিয়া তাহাকে রোপণ করিবে। এইভাবে রোপণ করিলে যে সকল পত্রের সহিত বৃক্ষ রোপিত হয়, তাহার সেই পত্রগুলি আর শুকায় না, সেই পত্রের সহিতই তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে (৫)। বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহাতে জলসেক করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে অপরাহ্নে এবং পূর্ব্বাহ্নে দুইবেলাই জলসেক কর্ত্তব্য। হেমন্তকালে এবং শীতকালে এক-একদিন অন্তর জল সেক করিতে হয়, এবং বর্ষাকালে ভূমি শুকাইলেই জল দিতে হয়। (৬)

বরাহমিহির ষোড়শ প্রকার বৃক্ষকে অনূপজ অর্থাৎ জলবহুল ভূমিজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তিতে জম্বু, বেতস, বানীর, কদম্ব, উডুম্বর, অর্জুন, বীজপূরক, মৃদ্বিকা, লকুচ, দাড়িম, বঞ্জুল নক্তমাল, তিলক, পনস, তিমির ও অম্রাতক, এই ষোড়শ প্রকার বৃক্ষ অনূপজ। (৭)

অতঃপর তিনি রোপণীয় বৃক্ষের অন্তর অর্থাৎ ফাঁক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিংশতি হস্ত অন্তর উত্তম, ষোড়শহস্ত মধ্যম, এবং দ্বাদশ হস্ত অধম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অর্থাৎ একটি বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার বিশহাত ব্যবধানে অপর একটি রোপণ করিলে সেই বৃক্ষ উত্তমরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, ষোড়শ হস্ত ব্যবধানে রোপণ করিলে মাঝামাঝি হইবে, আর বারহাত ব্যবধানে সামান্য বৃদ্ধি পাইবে। (৮)

কেবল পাশাপাশি বৃক্ষ রোপণ করিলে যে দোষ হয় তাহাও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথা—"সমীপজাত বৃক্ষসকল পরস্পর মিলিত হয়, এবং পরস্পর মূলের সংলগ্নতা নিবন্ধন তাহারা পীড়িত হয়, সুতরাং তাহারা উপযুক্ত ফলদানে সমর্থ হয় না। (৯)

কাণ্ডরোপণ প্রভৃতির প্রণালী কথনের পর, বরাহমিহির বীজবপনের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—যে কোন বৃক্ষের বীজ দশ দিন পর্য্যন্ত দুগ্ধে ভাবিত করিতে হইবে। ভাবনার নিয়ম—হস্তে ঘৃত মাখিয়া সেই হস্তে বীজ লইয়া সেই বীজ দুগ্ধ মধ্যে ক্ষেপণ করিতে হইবে. অনন্তর ঘৃতাভ্যক্ত হস্তের দ্বারা দুগ্ধ-ভাবিত বীজগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাখিতে হইবে। এই ভাবে দশ দিন পর্য্যন্ত বীজগুলিকে শোধন করিতে হইবে। অনন্তর গোময়ের দ্বারা বীজগুলিকে অনেকবার মর্দ্দন করিতে হইবে; তৎপর সেই বীজগুলিকে একটি ভাণ্ডের মধ্যে রাখিয়া শূকরমাংসের ও মৃগমাংসের ধূম বীজে লাগাইতে হইবে। অনন্তর বীজসকল মাংস ও শূকরের বসা (চর্বি) এই উভয় পদার্থ যুক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত তিলবপন প্রভৃতির দ্বারা পরিকর্ম্মিত অর্থাৎ সংস্কৃত ভূমিতে বপন করিবে, তৎপর তাহাতে দুগ্ধযুক্ত জল সেচন করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে উপ্ত বীজ পুষ্পসংযুক্ত হইয়াই সঞ্জাত হয়, অর্থাৎ গাছ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তাহাতে ফুল দেখা দেয়। (১০)

বীজপ্রসঙ্গে তিন্তিড়ীবিধান অর্থাৎ তেঁতুল বীজ বপনের নিয়ম কথিত হইয়াছে। ব্রীহিচূর্ণ শালিচূর্ণ, মাসচূর্ণ, তিলচূর্ণ, ও ছাতু এই সমস্ত বস্তু পচা মাংসের সহিত একত্র মিশাইয়া ইহার দ্বারা

---

(৪) ঘৃতাশীর-তিলক্ষৌদ্র-বিড়ঙ্গ-ক্ষীর গোময়ৈঃ।
আমূলস্কন্ধ-লিপ্তানাং সংক্রামণবিরোপণম্ ॥ ৭।

(৫) শুচির্ভূত্বা তরোঃ পূজাং কৃত্বা স্নানানুলেপনৈঃ।
রোপয়েদ্রোপিতশ্চৈব পত্রৈস্তৈরেব জায়তে ॥ ৮।

টীকা। শুচিঃ সমাহিতো ভূত্বা তরোর্বৃক্ষস্য স্নানানুলেপনৈঃ স্নানেন অনুলেপনেন চ পূজামর্চ্চাং বিধায় রোপয়েৎ। এবমনেন প্রকারেণ রোপিতশ্চ তৈরেব পত্রৈরেব রোপিতঃ তৈঃ সহ জায়তে ন শুষ্যতে। ৮।

(৬) সায়ং প্রাতশ্চ ঘর্ম্মর্ত্তৌ শীতকালে দিনান্তরে।
বর্ষা সুচ ভুবঃ শোষে সেক্তব্যা রোপিতা দ্রুমাঃ ॥

(৭) জম্বু-বেতসবানীর কদম্বোডুম্বরার্জুনাঃ।
বীজপূরকমৃদ্বীকালকুচাশ্চ সদাড়িমাঃ ॥
বঞ্জুলোনক্তমালশ্চ তিলকঃ পনসস্তথা।
তিমিরোঽম্রাতকশ্চেতি ষোড়শানূপজাঃ স্মৃতাঃ ॥

(৮) উত্তমং বিংশতিহস্তং মধ্যমং ষোড়শান্তরম্।
স্থানাৎ স্থানান্তরং কার্য্যং বৃক্ষাণাং দ্বাদশাবরম্ ॥ ১২।

(৯) অভ্যাস-জাতাস্তরবঃ সংস্পৃশন্তঃ পরস্পরম্।
মিশ্রৈর্মূলৈশ্চ ন ফলং সম্যগ্ যচ্ছন্তি পীড়িতাঃ ॥ ১৩।

(১০) প্রসৃতানি দশ দুগ্ধভাবিতং বীজমাজ্য-যুত-হস্ত-যোজিতম্।
গোময়েন বহুশো বিরূক্ষিতং ক্রৌড়মার্গ-পিশিতৈশ্চ ধূপিতম্।
মাংসশূকরবসাসমন্বিতং রোপিতঞ্চ পরিকর্ম্মিতাবনৌ।
ক্ষীর-সংযুত-জলাবসেচিতং জায়তে কুসুম-যুক্তমেব তৎ ॥২০॥

তেঁতুল বীজে সেক করিতে হইবে, অর্থাৎ বীজ গুলিকে ভিজাইতে হইবে, অনন্তর ইহাতে অনেক সময় হরিদ্রার ধূম লাগাইতে হইবে। এই প্রণালীতে শোধিত বীজ ভূমিতে বপন করিলে অতি কঠিন তিন্তিড়ী বীজ হইতেও অঙ্কুরোদ্‌গম হয়; সুতরাং অন্য বীজ হইতে যে অঙ্কুর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? (১১)

অনন্তর কপিত্থ—(কদবেল) রোপণের প্রণালী কথিত হইয়াছে। অনন্তমূল, আমলকী, ধব (বৃক্ষবিশেষ) বাসিকা এই চারিপ্রকার উদ্ভিদের মূল, এবং মূলপত্র-যুক্ত বেতস-বল্লী সূর্য্যবল্লী শ্যামলতা ও অতিমুক্ত, মিলিত এই অষ্টমূলীর সহিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত পরিভাষানুসারে দুগ্ধ পাক করিবে। অনন্তর সেই দুগ্ধ সুশীতল অর্থাৎ খুব ঠাণ্ডা হইলে, তাহাতে কপিত্থবীজ তালশতকাল অর্থাৎ একবার হাতে তালিদিলে যে সময় হয়, তাহার শতগুণ সময় পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে, তৎপর সূর্য্যকিরণে বীজগুলি শুকাইতে হইবে। এই ভাবে একমাস পর্য্যন্ত বীজ শোধন করিবে, অনন্তর রোপণ করিবে। রোপণ বিধি—একহস্ত বিস্তৃত একটি গর্ত্ত করিতে হইবে, ঐ গর্ত্তের খাত দুই হস্ত পরিমিত হইবে, অনন্তর পূর্ব্বোক্ত আমলকী প্রভৃতির সহিত কথিত দুগ্ধের দ্বারা গর্ত্তটিকে পূর্ণ করিতে হইবে, তৎপর গর্ত্তটিকে রৌদ্রে শুকাইতে হইবে। তৎপর শুষ্ক গর্ত্তটিকে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিয়া ভস্মের সহিত মিলিত মধু ও ঘৃতের দ্বারা লিপ্ত করিবে। অতঃপর চারি অঙ্গুলি উন্নত গর্ত্তের মধ্যভাগ মৃত্তিকার দ্বারা পূর্ণ করিয়া মৃত্তিকার উপর চারি অঙ্গুলি স্থান মিলিত মাষ-তিল-যবচূর্ণের দ্বারা পূর্ণ করিবে, এই ক্রমে পুনরায় মৃত্তিকা ও তদুপরি মাষাদি চূর্ণ দিয়া গর্ত্তটিকে পরিপূর্ণ করিবে। তৎপর মাছধোয়া জলের দ্বারা গর্ত্তের মধ্য বেশ করিয়া ঘুঁটিবে। ঘুঁটিতে ঘুঁটিতে গর্ত্তের মধ্যস্থ মৃত্তিকা ও মাষাদিচূর্ণ বেশ ঘন হইলে, তন্মধ্যে চারি অঙ্গুল নীচে পূর্ব্বশোধিত বীজ রোপণ করিয়া তাহাতে মাছের জল এবং মাংসের জল সেচন করিবে। এই প্রণালীতে উক্ত বীজ হইতে অতি অল্পকাল মধ্যে বিস্ময়জনক শাখাপল্লব সঞ্জাত হইয়া আধারস্থানকে আবৃত করে। (১২)

অন্যান্য বীজেরও আশ্চর্য্যকর রোপণপ্রণালী কথিত হইয়াছে। অঙ্কোল ফলসম্ভূত বিজ্জলের দ্বারা অথবা ইহার তৈলের দ্বারা শতবার ভাবিত অথবা শ্লেষ্মাতক ফলের বিজ্জলের দ্বারা কিংবা ইহার তৈলের দ্বারা শতবার ভাবিত যে কোন বৃক্ষের বীজ করকাযুক্ত মৃত্তিকায় রোপণ করিলে সেই বীজ হইতে তৎক্ষণাৎ উদ্ভিদের জন্ম হয়, এবং তাহার শাখা ফলভারে পূর্ণ হয়, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি ? অর্থাৎ অবশ্যই এরূপ হইয়া থাকে। (১৩)

শ্লেষ্মাতক বৃক্ষের বীজ পরিষ্কার করিয়া সেই বীজগুলিকে অঙ্কোল ফলের বিজ্জলের দ্বারা ছায়াতে সাতবার ভাবিত করিয়া সেইগুলিকে মহিষের গোময়ের দ্বারা ঘর্ষণ করিবে, তৎপর সেই বীজগুলিকে ভাণ্ডের ভিতর রাখিয়া গোময়ের কারীতে স্থাপন করিবে। ভূমিতে করকাপাত হইলে সেই করকাযুক্ত মৃত্তিকায় উক্ত বীজ রোপণ করিবে। এই প্রণালীতে উপ্ত বীজ একদিবসেই ফলকর হয়। (১৪)

সন্ধ্যায়।

সাগরের পরপারে
দখিণ পশ্চিম ধারে
ভানু গেল অস্তাচল
সুন্দর রঙ্গিন বেশে
কে জানে কাহার দেশে—
অজানা অ-নাম-ধাম !
মনে হয় চলে যাই—
সশরীরে উড়ে যাই
নিস্তব্ধ মেলিয়া পাখা
কারেও না দিয়ে দেখা—
নিজের আনন্দ নিজে
ভোগ করি অবিরাম !

---

(১১) তিন্তিড়ীত্যপি করোতি বল্লরীং ব্রীহিমাসতিলচূর্ণশক্তুভিঃ।
পূতি-মাংসসহিতৈশ্চ সূচিতা ধূপিতা চ সততং হরিদ্রয়া ।২১।

(১২) কপিত্থবল্লীকরণায় মূলান্যাস্ফোত-ধাত্রী-ধব-বাসিকানাম্।
পলাসিনী-বেতস-সূর্যবল্লী-শ্যামাতিমুক্তৈঃ সহিতাষ্টমূলী ॥ ২২ ॥
ক্ষীরে সৃতে চাপ্যনয়া সুশীতে তালাশতং স্থাপ্য কপিত্থবীজম্।
দিনে দিনে শোষিতমর্কপাদৈর্মাসং বিধিস্ত্বেষ ততোঽধিরোপ্যম্ ॥২৩
হস্তায়তং তদ্দ্বিগুণং গভীরং খাত্বাঽবটং প্রোক্তজলাবপূর্ণম্।
শুষ্কং প্রদগ্ধং মধু-সর্পিষা তৎ প্রলেপয়েদ্ভস্মসমন্বিতেন ॥ ২৪ ॥
চূর্ণীকৃতৈর্মাষতিলৈর্যবৈশ্চ প্রপূরয়েন্মৃত্তিকয়াঽন্তরস্থৈঃ।
মৎস্যামিষাম্ভঃসহিতং চ হন্যাদ্‌যাবদ্‌ঘনত্বং সমুপাগতং তৎ ॥ ২৫ ॥
উপ্তং চ বীজং চতুরঙ্গুলাধো মৎস্যাম্ভসা মাংসজলৈশ্চ সিক্তম্।
বল্লীভবত্যাশু শুভপ্রবালা বিস্ময়করী মণ্ডপমাবৃণোতি ॥

(১৩) শতশোঽঙ্কোলসম্ভূত-ফলকল্কেন ভাবিতম্।
এতত্তৈলেন বা বীজং শ্লেষ্মাতকফলেন বা ॥ ২৭ ॥
বাপিতং করকোন্মিশ্রমৃদি তৎক্ষণজন্মকম্।
ফলভারান্বিতা শাখা ভবতীতি কিমদ্ভুতম্ ॥ ২৮ ॥

(১৪) শ্লেষ্মাতকস্য বীজানি নিষ্কুলীকৃত্য ভাবয়েৎ প্রাজ্ঞঃ।
অঙ্কোলবিজ্জলাদ্ভিশ্ছায়ায়াং সপ্তকৃত্বৈবম্ ॥
মাহিষগোময়ঘৃষ্টান্যস্য করীষে চ তানি নিক্ষিপ্য।
করকাজলমৃদ্‌যোগে ন্যুপ্তান্যহ্না ফলকরাণি ॥ ৩০ ॥

যেও না যেও না তুমি—
খানেক দাঁড়াও হোথা !
তোমার বাতাস খেয়ে
প্রাণের স্পন্দন পেয়ে
তড়িত খেলিছে বুকে—
করে দেয় মাতোয়ারা।
জোয়ার খেলিছে প্রাণে।

প্রতি গাছ প্রতি পাতা
তোমারি আকাশতলে
তোমারি বাতাস সাথে
খেলে যবে নু'য়ে মাথে ;
সাগরের ঢেউ যবে
জননী ধরণী-কোলে
আছাড়ি পাছাড়ি পড়ে,
তোমারি মহিমা তবে
জাগিয়া হৃদয়-পরে
নির্বাক করে গো মোরে।

কোন্—কোন্ আদিকালে
তোমারি খসিয়া বিন্দু
আশ্চর্য্য জনম দিল
এ বিশ্বভুবনে সারা ;
যত কিছু গান প্রাণে
আনন্দ দিতেছে আজি,
সকলি ত' আসিয়াছে
তোমারি হতে সে বিন্দু—
নির্বাক হইনু আমি !—
নত শিরে সিন্ধুতীরে
নীরবে প্রণমি তোমা—
ভকতি কুসুমগুলি
স্নেহকরে লহ তুলি।

মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যম্।

(স্বাস্থ্য-সমাচার বৈশাখ ১৩২৮)

অর্থাৎ, মদ্য পান করা উচিত নয় ; মদ্য কাহাকেও পান করিতে দেওয়া অকর্ত্তব্য ; এবং পানার্থ কাহারও নিকট হইতে মদ্য গ্রহণ করিতে নাই। ইহাই আমাদের শাস্ত্রের আদেশ।

আজকাল সমগ্র ভারতবর্ষে একটা আন্দোলন উঠিয়াছে—মদ্য এবং সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য বর্জ্জন করিতে হইবে। এই আন্দোলন আপাততঃ নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই চলিতেছে ; ভদ্র লোকেরা এখনও অনেকটা নির্ব্বিকার, নিশ্চেষ্ট, নিস্ক্রিয় আছেন। তাঁহারা ভদ্রলোক, শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ, সম্ভ্রান্ত ; কাজেই গোলা লোকের আন্দোলনে তাঁহারা সহসা যোগ দিতে পারিতেছেন না। মদ্য বর্জ্জন করিতে হইলে কত ভাবিতে হইবে, কত বিবেচনা করিতে হইবে ! মুখের কথা খসাইলেই কি মদ ছাড়া যায় ? মদে কত মজা, কত স্ফূর্ত্তি ! তাঁহাদের ত মদ খাইবার পয়সার অভাব নাই। তবে কেন তাঁহারা হঠাৎ একটা কাজ করিয়া ফেলিয়া, পরকালের পথ প্রশস্ত করিবেন ? তাই তাঁহারা এখনও ভাবিতেছেন, কি করি ! মদ ছাড়ি, কি না ছাড়ি ! এতটা স্ফূর্ত্তি, এতটা আয়েসের লোভ সংবরণ করি, কি না করি !

এদিকে তথা-কথিত 'ছোটলোকে'রা মূর্খ, নিরক্ষর, দরিদ্র—তাই তাহারা দুই একজন নেতার বক্তৃতা শুনিয়া এক কথায় মদ ছাড়িয়া দিতেছে ; সকল প্রকার নেশার জিনিস—গাঁজা, গুলি, চরস, আফিম সমস্তই বর্জ্জন করিতেছে। এই আন্দোলন ক্রমশঃ সমগ্র দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এজন্য সরকার বাহাদুর পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। হইবারই কথা। কারণ মাদক দ্রব্যের শুল্ক হইতে সরকারের অনেক টাকা—প্রায় এক কোটী টাকা আয় হয়। দেশের লোকে মদ ছাড়িয়া দিলে সে আয় বন্ধ হইবে—মহা মুস্কিল।

* * *

মদ্যপানের অনিষ্টকারিতার সম্বন্ধে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মত খুব স্পষ্ট ও প্রবল। চিকিৎসকগণ এ বিষয়ে এক-মত। অবশ্য, মদ্যব্যবসায়ের সহিত যাঁহাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে স্বার্থ বিজড়িত, অথবা, যাঁহারা মদ্যব্যবসায়ীদের বৃত্তিভোগী এমন দুই একজন চিকিৎসক মদ্য-পানের পক্ষপাতী থাকিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যাও যেমন নগণ্য, তাঁহাদের মতামতও সেইরূপ অগ্রাহ্য। তাঁহাদিগকে authority বলিয়া কেহ গণ্য ও মান্য করেন না।

গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইয়োরোপের অনেক দেশের, এবং আমেরিকার, মদ্যপানের অনিষ্টকারিতার সম্বন্ধে মতামত খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে অর্দ্ধসভ্য রুষিয়া দেশ মদ্য বর্জ্জন করে। আমাদের দেশের 'ছোটলোকে'রা যেমন সর্ব্বাগ্রে মদ্যপানের কু-ফলের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া উহা ত্যাগ করিতেছে, রুষিয়ার অর্দ্ধসভ্য অধিবাসীরাও সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে পারে যে, মদ্য পান করিলে সেনাগণের যুদ্ধ করিবার শক্তি

কমিয়া যায়। তাই তাহারা সর্ব্বাগ্রে মদ্য বর্জ্জন করে। পরে অন্য কোন কোন দেশেও মদ্য বর্জ্জিত হয়। অবশেষে বর্ত্তমান সভ্য জগতের শীর্ষস্থানীয় আমেরিকার যুক্তরাজ্য আইন করিয়া মদ্য বর্জ্জন করে। তাহাদের এই কার্য্যে সমগ্র জগতে ধন্য ধন্য রব উঠে। আমরাও সে সময়ে মার্কিন জাতির মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিতে ত্রুটি করি নাই। বস্তুতঃ স্বাস্থ্য-সমাচারের জন্মাবধিই আমরা সুযোগ পাইলেই জনসাধারণকে মদ্যপানের অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছি; মদ্যপান নিবারণে অপর কাহাকেও চেষ্টা বা উদ্যোগ করিতে দেখিলেই অন্তরের সহিত তাঁহার প্রশংসা ও সমর্থন করিয়াছি। বর্ত্তমান আন্দোলনেরও আমরা বরাবরই সমর্থন করিয়া আসিতেছি। টেম্পারেন্স মুভমেণ্ট বা মদ্যপান সংযত করিবার জন্য আন্দোলনের আমরা চির অনুরাগী। টেম্পারেন্স সোসাইটী সকলের আমরা পরম ভক্ত।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে মদ্য সাক্ষাৎ বিষ—মানব শরীরে উহা বিষের কাজ করে। বড় বড় পাশ্চাত্য ডাক্তারেরা উহাকে হলাহল ছাড়া আর কিছুই বলেন না, বলিতে পারেনও না; কারণ, চিকিৎসাবিজ্ঞান মদ্যকে স্পষ্টাক্ষরে বিষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে দুই একজন চিকিৎসকের উক্তিও আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। Alcohol and the Human Body নামক গ্রন্থে Sir Victor Horsley, F. R. S., F. R. C. S, M. B., B. S., Lond., Hon. M. D. Halle, etc. ও Mary D. Sturge M. D. Lond., এবং Arthur Newsholme M. D., F. R. C. P., D. P. H. Alcohol (সুরাসার)কে বিষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সকল দেশেই ঔষধের শ্রেণী বিভাগ কালে Alcoholকে বিষের সমশ্রেণীভুক্ত করা হয়। জার্ম্মাণ ডাক্তার Von Ziemssenও Alcoholকে বিষ বলিয়াছেন। প্রোফেসর Fick বলিয়াছেন alcohol বিষ। Alcohol, chloroform ও ether একই শ্রেণীর বিষ এবং উহাদের ক্রিয়াও একই প্রকার।

বহুকাল পূর্ব্বে চিকিৎসকগণের বিশ্বাস ছিল, Alcohol পুষ্টিকর পদার্থ; উহাতে রোগীদের স্বাস্থ্য-লাভের সহায়তা হয়। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রান্ত ধারণা ক্রমশঃ দূর হইতেছে। বিলাতের St. Bartholomew's, Guy's, Middlesex, St. George's st. Mary's, University College, Westminister প্রভৃতি হাসপাতালে ১৮৬২ সালে মদ্যের ব্যয় ছিল ৭৭১২ পাউণ্ড এবং দুগ্ধের ব্যয় ছিল ৩০২৬ পাউণ্ড। পরে ক্রমে ক্রমে মদ্যের ব্যয় কমাইয়া ও দুগ্ধের ব্যয় বাড়াইয়া ১৯০২ সালে ২৩০৯ পাউণ্ড মদ্যের জন্য ও ৯০৩৫ পাউণ্ড দুগ্ধের জন্য ব্যয় করা হয়। অন্যান্য স্থলেও এইভাবে মদ্যের ব্যবহার কমিয়া আসিতেছে। চিকিৎসকেরা আরও বলিয়া থাকেন, মদ্যপানের প্রবৃত্তি একটা রোগ। মানুষের শরীরের অবস্থা স্বাভাবিক থাকিলে মদ খাইবার ইচ্ছা করে না। সুতরাং মদ্যপদিগের চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে প্রাণীদেহ ও উদ্ভিদ্‌দেহ বহুসংখ্যক অণুপরিমাণ কোষের সমষ্টি। এই কোষগুলিকে ইংরেজীতে cell বলে। একটী মাত্র কোষ হইতে জৈব ও উদ্ভিজ্জ দেহের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। উপযুক্ত খাদ্য, জল ও অন্যান্য পদার্থের সাহায্যে এক একটী কোষ ক্রমে বহুসংখ্যক কোষে পরিণত হয়। এই কোষের সৃষ্টির উপর alcoholএর প্রভাব কিরূপ, তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অতি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে। তাহার ফলে স্থির হইয়াছে, alcohol কোষের সৃষ্টি ও পরিণতির ব্যাঘাত করে। মানবদেহের স্নায়ুমণ্ডলীর (nervous system) উপরও alcoholএর প্রভাব পরীক্ষা করা হইয়াছে। ফলে জানা গিয়াছে, alcoholএর প্রভাবে স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্যক্ষমতা কমিয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা বহু পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও ভূয়োদর্শনের ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মদ্যপদিগের উদ্যম (energy), কার্য্য করিবার ক্ষমতা, এবং দীর্ঘকাল কোন বিষয়ে একাগ্রভাবে মনোনিবেশের ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তাহাদের মস্তিষ্কের এমন বিকৃতি জন্মে যে সময়ে সময়ে তাহারা বোকার মত ব্যবহার করে। অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্য পান করিয়া মাতাল হইয়া পড়িলে তাহার অবস্থা কিরূপ হয় তাহা ত সকলেই নিত্যই দেখিতে পাইতেছেন। সহজ (sober) অবস্থায় যে কাজ করিতে লোকে ঘৃণা, লজ্জা বা ভয় করিয়া থাকে, এমন অনেক কাজ মাতাল অবস্থায় তাহারা সহজেই করিয়া থাকে; তাহাতে তাহাদের মনে কিছুমাত্র ঘৃণা, লজ্জা বা ভয় হয় না। আর habitual drunkardদের ত কথাই নাই—তাহারা না পারে এমন কাজই নাই। মদ্যপানের ফলে স্মরণ-শক্তি কমিয়া আসে, বিচারবুদ্ধি বিকৃত হয়। কম্পোজিটরদের দ্বারা সহজ অবস্থায় কাজ করাইয়া এবং মদ খাওয়াইবার পর কাজ করাইয়া উভয় কাজের তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে, সহজ অবস্থায় তাহারা যে সময়ে যে পরিমাণ কাজ করিতে পারে, এবং তাহাতে যতগুলি ভুল থাকে, মদ্যপানের পর কৃত কাজের পরিমাণ তদপেক্ষা কম এবং তাহাতে ভুলও বেশী। এইরূপ ভাবে আরও অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। ফল প্রায় একই রূপ। মদ্যপানের ফলে আত্মসংযমের ক্ষমতাও হ্রাস পাইয়া থাকে। মদ্যপেরা সময়ে সময়ে জীবনে এমন বীতরাগ হইয়া উঠে যে, আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। পৃথিবীতে যত অপরাধ ঘটিয়া থাকে, তাহার জন্য অধিকাংশ স্থলেই মদ্যই দায়ী। কেবল মানুষ নয়—অবলা জীবজন্তুর উপরও মদ্যপানের কুফল পরীক্ষার দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। মদ্যপানে অভ্যস্ত হইলে শারীর যন্ত্রের নানারূপ পীড়া হইয়া থাকে। তন্মধ্যে লিভারের পীড়ার কথা সর্ব্বসাধারণে অবগত আছেন।

(ক্রমশঃ)

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

পঞ্চদশ প্রকরণ—উপসংহার।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

(পূর্বানুবৃত্তি)

সদাচরণ ও দুরাচরণ কিংবা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—এই শব্দ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান মনুষ্যের কর্ম্মসম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যায় বলিয়া, নীতিমত্তা শুধু জড় কর্ম্মের মধ্যে নহে, কিন্তু বুদ্ধির মধ্যে আছে, তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে। "ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষঃ"—ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান মনুষ্যের অর্থাৎ বুদ্ধিমান প্রাণীদিগেরই বিশিষ্ট গুণ—এই বচনের তাৎপর্য্য কিংবা ভাবার্থও এইরূপ। কোন ষাঁড় কিংবা নদী দুষ্ট কিংবা ভয়ঙ্কর,—আমাদের উপর তাহাদের কার্য্য দেখিয়াই আমরা উহা বলি সত্য; কিন্তু ষাঁড় ধাক্কা দিলেও তাহার নামে কেহ নালিস করে না, এবং নদীতে বাণ আসিয়া ফসল ভাসাইয়া লইয়া গেলেও, "অধিক লোকের অধিক ক্ষতি" হইল বলিয়া কেহ নদীকে দুরাচার কিংবা দস্যু বলে না। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্ন করেন যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়ম মনুষ্যের ব্যবহারেই প্রয়োগ হয় ইহা একবার স্বীকার করিলে, মনুষ্যের কর্ম্মের ভালমন্দ বিচারও কেবল তাহার কর্ম্ম অনুসারেই করিতে বাধা কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কিছু কঠিন নহে। অচেতন বস্তু ও পশুপক্ষী প্রভৃতি মূঢ় যোনিসম্ভূত প্রাণীদের কথা ছাড়িয়া মনুষ্যেরই কার্য্যের বিচার করিলেও দেখা যায় যে, যখন কেহ মূঢ়তা কিংবা অজ্ঞানবশতঃ কোন অপরাধ করে, তখন সে সংসারে এবং আইনের দ্বারা ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, মনুষ্যেরও কর্ম্মাকর্ম্মের ভালমন্দ স্থির করিবার জন্য, সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তার বুদ্ধির, অর্থাৎ সে কিহেতু সেই কর্ম্ম করিয়াছিল এবং উক্ত কর্ম্মের পরিণামের জ্ঞান তাহার হইয়াছিল কি না, তাহারই প্রথমে অবশ্যই বিচার করিতে হয়। কোন ধনী গৃহস্থের পক্ষে আপন ইচ্ছা অনুসারে অনেক দানধর্ম্ম করা কিছুই কঠিন নহে। কিন্তু এই বিষয়টি 'ভালো' হইলেও তাহার প্রকৃত নৈতিক মূল্য উহার স্বাভাবিক ক্রিয়া হইতেই নির্দ্ধারণ করা যায় না। ইহার জন্য, সেই ধনশালী গৃহস্থের বুদ্ধি সত্যসত্যই শ্রদ্ধাযুক্ত কিনা তাহাও দেখিতে হয়। এবং ইহার নির্ণয় করিবার জন্য, সহজ ভাবে কৃত এই দান ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ যদি না থাকে, তবে এই দানের যোগ্যতা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃত দানের সমান মনে করা যায় না; অন্ততঃ সন্দেহ করিবার যোগ্য কারণ থাকে। সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার হইলে পর মহাভারতে শেষে এক উপাখ্যানে এই বিষয়ই সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির রাজ্যারূঢ় হইলে পর তিনি যে বৃহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে অন্নসন্তর্পণ ও দান-কর্ম্মের দ্বারা লক্ষ লোক তৃপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন সেখানে এক দিব্য নকুল আসিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিল যে, "তোমার প্রশংসা কোন কাজের নয়। পূর্ব্বে এই কুরুক্ষেত্রেই উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা অর্থাৎ ক্ষেতে পতিত শস্যের দানা খুঁটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এইরূপ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, নিজে ও তাহার স্ত্রীপুত্র কয়েক দিন যাবৎ উপবাসী থাকিলেও, ঠিক ভোজনের সময় অকস্মাৎ গৃহে আগত ক্ষুধিত অতিথিকে নিজের ও স্ত্রীপুত্রদের সম্মুখস্থ সমস্ত ছাতু সমর্পণ করিয়া যে আতিথ্য করিয়াছিল,—তুমি যতই বৃহৎ যজ্ঞ কর না কেন—তাহার কাছেও যাইতে পারে না।" (মভা. অশ্ব. ৯০)। এই নকুলের মুখ ও অর্দ্ধাঙ্গ সোনার ছিল। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের যোগ্যতা ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রদত্ত একসের ছাতুর সমানও নহে, এইরূপ বলিবার কারণ সে ইহা বলিল যে, "ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথির উচ্ছিষ্টের উপর গড়াগড়ি দিয়া আমার মুখ ও অর্দ্ধাঙ্গ সোনার হইয়াছে; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞমণ্ডপের উচ্ছিষ্টের উপর গড়াগড়ি দিয়া আমার বাকী অঙ্গ সোনার হয় নাই!" এস্থলে কর্ম্মের বাহ্য পরিণামের দিকেই নজর দিয়া, অধিক লোকের অধিক হিত কিরূপে হয় তাহার বিচার যদি আমরা করি তাহা হইলে, এক অতিথিকে তৃপ্ত করা অপেক্ষা লক্ষ লোকের তৃপ্তিসাধনের যোগ্যতা লক্ষগুণে অধিক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু কেবল ধর্ম্ম-দৃষ্টিতেই নহে, নীতিদৃষ্টিতেও এই সিদ্ধান্ত ঠিক হইবে কি? কাহারও বহু ধনসম্পত্তি লাভ করা, কিংবা পরোপকারের জন্য বড় বড় কাজ করিবার সুযোগ পাওয়া, শুধু তাহার সদাচারের উপর নির্ভরই করে না। সেই গরীব ব্রাহ্মণ অর্থাভাবে বড় যজ্ঞ করিতে পারে নাই বলিয়া তাহার যথাসাধ্য স্বল্পকার্য্যের নৈতিক কিংবা ধর্ম্মমূলক মূল্য কি কম মনে করা যাইবে? কখনও নহে। কম মনে করিলে, দরিদ্র ব্যক্তি ধনবানের ন্যায় নীতিমান্ ও ধার্ম্মিক হইবার কখনই আশা করিতে পারে না—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। আত্মস্বাতন্ত্র্য অনুসারে আপনার বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখা ঐ ব্রাহ্মণের আয়ত্তাধীন ছিল; এবং তাহার স্বল্প আচরণ হইতে, তাহার পরোপকারবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরেরই ন্যায় শুদ্ধ ছিল এই সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় না থাকে তাহা হইলে তাহার ও তাহার স্বল্প কার্য্যের নৈতিক মূল্য, যুধিষ্ঠির ও তাঁহার আড়ম্বরময় যজ্ঞের সমতুল্যই মনে করিতে হইবে। অধিক কি, দরিদ্র ও কয়েকদিন যাবৎ উপবাসী হইলেও, অন্নসন্তর্পণের দ্বারা অতিথির প্রাণ বাঁচাইবার জন্য ব্রাহ্মণ যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছিল তাহাতে তাহার শুদ্ধ বুদ্ধি অধিকতর ব্যক্ত হয়, একথাও বলা যাইতে পারে। কারণ, ধৈর্য্যাদি গুণের ন্যায় বুদ্ধির প্রকৃত পরীক্ষা সঙ্কটকালেই হইয়া থাকে, এই কথা সর্ব্বজনবিদিত; সঙ্কটের সময়েও যাহার শুদ্ধ বুদ্ধি (নৈতিক সত্ত্ব) টলে না সে-ই প্রকৃত নীতিমান্ ইহা কাণ্ট আপন নীতিগ্রন্থের আরম্ভে প্রতিপাদন করিয়াছেন। উক্ত নকুলের অভিপ্রায়ও এইরূপ ছিল। কিন্তু রাজ্যারূঢ় হইলে পর সম্পৎকালে অনুষ্ঠিত শুধু এক অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের শুদ্ধ বুদ্ধির পরীক্ষা হইতে পারিত না; তাহার পূর্ব্বেই অর্থাৎ আপৎকালে অনেক বাধাবিঘ্নের প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণেরই ন্যায় যুধিষ্ঠিরের শুদ্ধ বুদ্ধির পূর্ণ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল; তাই, ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণয়ের সূক্ষ্ম নীতি অনুসারেও যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক বলিয়া বিবেচিত হন, এইরূপ মহাভারত-কারের সিদ্ধান্ত। বলা বাহুল্য যে, তিনি নকুলকে নিন্দুক বলিয়াছেন। এস্থলে আর এক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া

আবশ্যক যে, মহাভারতে ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, অশ্বমেধযজ্ঞকারী যে গতি প্রাপ্ত হয়, সেই গতি ব্রাহ্মণও পাইয়াছিল। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, ব্রাহ্মণের কর্ম্মের যোগ্যতা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ অপেক্ষা অধিক না হইলেও, নিদানপক্ষে উভয়ের নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মূল্য মহাভারতকার একইরূপ মনে করেন নিঃসন্দেহ। ব্যবহারক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, যখন কোন লক্ষপতি কোন ধর্ম্মকার্য্যে হাজার টাকা চাঁদা দেন এবং কোন গরীব লোক একটাকা চাঁদা দেয় তখন আমরা ঐ উভয়ের নৈতিক মূল্য একই মনে করি। 'চাঁদা' শব্দ প্রয়োগে এই দৃষ্টান্ত দেওয়ায় কেহ কেহ আশ্চর্য্য হইতে পারেন; কিন্তু বস্তুত আশ্চর্য্য হইবার কথা নাই, কারণ নকুলের কথা যখন চলিতেছিল সেই সময়েই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে বলা হইয়াছে :—

সহস্রশক্তিশ্চ শতং শতশক্তির্দশাপি চ।
দদ্যাদপশ্চ শক্ত্যা সর্ব্বে তুল্যফলাঃ স্মৃতাঃ॥

হাজার-ওয়ালা শত মুদ্রা, একশো-ওয়ালা দশ মুদ্রা, কিংবা কেহ যথাশক্তি একটু জল দিলেও তুল্য ফল হয়"—(মভা. অশ্ব. ৯০. ৯৭); এবং "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" (গী. ৯. ২৯) এই গীতাবাক্যের তাৎপর্য্যও ইহাই। আমাদের ধর্ম্মেই কেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মেও এই তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। "যাহাকে অনেক দেওয়া হইয়াছে তাহার নিকট অনেক প্রত্যাশা করা যায়" (ল্যুক. ১২. ৪৮) এইরূপ খৃষ্ট একস্থানে বলিয়াছেন। একদিন যখন তিনি দেবালয়ে গমন করিয়াছিলেন, তখন সেখানে ধর্ম্মার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার কাজ সুরু হইলে পর, এক অত্যন্ত গরীব বিধবা যে দুইটি পয়সা তাহার কাছে ছিল তাহা ধর্ম্মার্থে দিল দেখিয়া "এই স্ত্রীলোক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দান করিয়াছে" এইরূপ উক্তি খৃষ্টের মুখ হইতে বাহির হইল—এই কথা বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে (মার্ক. ১২.৪৩ ও ৪৪)। ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, কর্ম্মের যোগ্যতা কর্ত্তার বুদ্ধি হইতেই নির্দ্ধারণ করিতে হয়; এবং কর্ত্তার বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে, অনেক ক্ষুদ্র কর্ম্মও অনেক সময় বড় বড় কর্ম্মের নৈতিক যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, এই কথা খৃষ্টেরও মান্য ছিল। উল্টাপক্ষে অর্থাৎ বুদ্ধি শুদ্ধ না হইলে কোন কর্ম্মের নৈতিক যোগ্যতার বিচার করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, হত্যা করা কর্ম্মটা একই হইলেও আমাকে আক্রমণ করিলে, আত্মরক্ষার্থ মারা এবং কোন ধনী পথচলতি লোককে ধনের জন্য পথে হত্যা করা, এই দুই ব্যাপার নীতিদৃষ্টিতে অত্যন্ত ভিন্ন। জর্ম্মন কবি শিলর এই ধরণের এক প্রসঙ্গ স্বকীয় "উইলিয়ম টেল্" নামক নাটকের শেষে বর্ণনা করিয়াছেন; এবং সেখানে বাহ্যত দেখিতে সমান দুই কার্য্যের মধ্যে তিনি বুদ্ধির শুদ্ধতা-অশুদ্ধতামূলক যে ভেদ দেখাইয়াছেন তাহাই স্বার্থত্যাগ ও স্বার্থের কারণে হত্যা এই দুয়ের মধ্যেও আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, কর্ম্ম ছোট হউক বড় হউক বা সমান হউক, তাহার মধ্যে নৈতিক দৃষ্টিতে যে ভেদ হয় সেই ভেদ কর্ত্তার হেতুমূলেই হইয়া থাকে। এই হেতুকেই উদ্দেশ্য, বাসনা কিংবা বুদ্ধি বলে। কারণ, 'বুদ্ধি' শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ ব্যবসায়াত্মক ইন্দ্রিয় হইলেও, জ্ঞান, বাসনা, উদ্দেশ্য ও হেতু, এই সমস্ত বুদ্ধীন্দ্রিয়-ব্যাপারেরই ফল, অতএব উহাদিগকেও সাধারণত বুদ্ধি নামে অভিহিত করিবার রীতি আছে; এবং স্থিতপ্রজ্ঞের সাম্যবুদ্ধির মধ্যে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির স্থিরতা ও বাসনাত্মক বুদ্ধির শুদ্ধতা এই দুয়েরই সমাবেশ হয় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যুদ্ধ করিলে কত মনুষ্যের কত কল্যাণ হইবে এবং কত লোকের কত ক্ষতি হইবে তাহা দেখ, এরূপ অর্জ্জুনকে ভগবান বলেন নাই; বরং ভগবান্ ইহাই বলিয়াছেন যে, তুমি যুদ্ধ করিলে ভীষ্ম মরিবে কি দ্রোণ মরিবে, এসময়ে এই বিচার গৌণ; তুমি কোন্ বুদ্ধিতে (হেতুতে বা উদ্দেশ্যে) যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহাই হইল মুখ্য প্রশ্ন। তোমার বুদ্ধি যদি স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় শুদ্ধ হয় এবং যদি সেই শুদ্ধ ও পবিত্র বুদ্ধি অনুসারে তুমি আপন কর্ত্তব্য করিতে থাক, তবে ভীষ্ম কিংবা দ্রোণ মরিলেও তাহার পাপ তোমাতে বর্ত্তিবে না। ভীষ্মকে মারিবার ফলাশায় তো তুমি যুদ্ধ করিতেছ না। তোমার জন্মগত অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত রাজ্যের ভাগ তুমি চাহিয়াছ এবং যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টায় কিছুমাত্র ত্রুটি না করিয়া সামোপচারের মধ্যস্থতাও করিয়াছ (শাং. অ. ৩২ ও ৩৩), কিন্তু যখন চেষ্টা দ্বারা এবং সাধুতা দ্বারা মিলন ঘটিল না, তখন নিরুপায় হইয়া তুমি যুদ্ধ করিবে স্থির করিলে। ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই। কারণ, স্বধর্ম্ম অনুসারে প্রাপ্ত অধিকার হইলেও যেমন কোন ব্রাহ্মণের পক্ষে দুষ্ট লোকের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা না করাই কর্ত্তব্য সেইরূপ প্রসঙ্গ আসিলে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অনুসারে লোকসংগ্রহের জন্য উহার প্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করাই তোমার কর্ত্তব্য (মভা. উ. ২৮ ও ৪২; বন. ৩৩. ৪৮ ও ৫০)। ভগবানের উক্ত যুক্তিবাদ ব্যাসদেবও স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি ইহা দ্বারাই পরে শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন (শাং অ.৩২ ও ৩৩)। কিন্তু কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয়ার্থ বুদ্ধিকে এইরূপ শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও শুদ্ধ বুদ্ধি কি তাহা এক্ষণে বলা আবশ্যক। কারণ, মন ও বুদ্ধি এই দুই প্রকৃতির বিকার; তাই উহা স্বভাবত সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার হইতে পারে। তাই বুদ্ধিরও অতীত যে নিত্য আত্মা তাহা সর্ব্বভূতে একই ইহা উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে কার্য্যাকার্য্যের নির্ণয় করে যে বুদ্ধি তাহাকেই গীতাশাস্ত্রে শুদ্ধ কিংবা সাত্ত্বিক বুদ্ধি বলা হইয়াছে। এই সাত্ত্বিক বুদ্ধিকেই সাম্যবুদ্ধিও বলে; এবং তাহার মধ্যে 'সাম্য' শব্দের অর্থ—সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মার একত্ব কিংবা সাম্য উপলব্ধি করা। যে বুদ্ধি এই সাম্যকে উপলব্ধি করে না তাহা শুদ্ধও নহে, সাত্ত্বিকও নহে। নীতি-নির্ণয়ের কাজে সাম্যবুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিলে, বুদ্ধির এই সমতা কিংবা সাম্য কিরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে, এই প্রশ্ন স্বতই উৎপন্ন হয়; কারণ, বুদ্ধি অন্তরিন্দ্রিয় হওয়ায়, তাহার ভাল-মন্দ চোখে দেখা যায় না। এই জন্য, বুদ্ধি সম ও শুদ্ধ কি না, তাহার পরীক্ষার জন্য প্রথমে মনুষ্যের বাহ্য আচরণের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক; নতুবা, আমার বুদ্ধি ভাল এইরূপ মুখে বলিয়া যে কোন মনুষ্য যাহা খুসি তাহা করিতে থাকিবে। তাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষকে তাহার স্বভাবের দ্বারাই চেনা যায়, শুধু বাকপটু হইলেই তাহাকে প্রকৃত সাধু বলা যায় না; এইরূপ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। স্থিতপ্রজ্ঞ ও

ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ বলিবার সময় উক্ত পুরুষ জগতে অন্য লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহাই মুখ্যরূপে ভগবদ্গীতাতেও বর্ণিত হইয়াছে; এবং ১৩শ অধ্যায়ে জ্ঞানের ব্যাখ্যাও এইরূপই—অর্থাৎ স্বভাবের উপর জ্ঞানের কি পরিণাম ঘটে—করা হইয়াছে। ইহা হইতে বাহ্য কর্ম্মের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করিবে না, গীতা ইহা কখনও যে বলেন নাই তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কাহারও,—বিশেষতঃ অজ্ঞান মনুষ্যের—বুদ্ধি সম কি না পরীক্ষা করিবার জন্য যদিও তাহার বাহ্য কর্ম বা আচরণই—এবং তন্মধ্যেও সংকট সময়ের আচরণই—মুখ্য সাধন, তথাপি কেবল এই বাহ্য আচরণের দ্বারাই নীতিমত্তার অভ্রান্ত পরীক্ষা সর্ব্বদা হইতে পারে না। কারণ, প্রসঙ্গবিশেষে বাহ্য কর্ম্ম ক্ষুদ্র হইলেও তাহার নৈতিক মূল্য বড় কর্ম্মেরই তুল্য হইয়া থাকে, ইহা নকুলোপাখ্যান হইতে সিদ্ধ হয়। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাহ্য কর্ম্ম ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, এবং তাহাতে একেরই সুখ হউক বা অনেকের হউক, তাহাকে কেবল শুদ্ধ বুদ্ধির এক প্রমাণ মানিতে হইবে—ইহা অপেক্ষা তাহাকে অধিক মহত্ত্ব না দিয়া, এই বাহ্য কর্ম্মানুসারে কর্ত্তার বুদ্ধি কতটা শুদ্ধ তাহা প্রথমে দেখিতে হইবে; এবং শেষে এই প্রকারে ব্যক্ত শুদ্ধ বুদ্ধি অনুসারেই উক্ত কর্ম্মের নীতিমত্তার নির্ণয় করিতে হইবে; শুধু বাহ্য কর্ম্ম অনুসারে নীতিমত্তার যোগ্য নির্ণয় হয় না। কারণ এই যে, 'কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ' (গী. ২. ৪৯). এইরূপ বলিয়া গীতার কর্ম্মযোগে সম ও শুদ্ধ বুদ্ধিকে অর্থাৎ বাসনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। নারদপঞ্চরাত্র নামক ভাগবত ধর্ম্মের গীতা অপেক্ষাও অর্ব্বাচীন এক গ্রন্থ আছে; তন্মধ্যে মার্কণ্ডেয় নারদকে বলিতেছেন যে—

মানসং প্রাণিনামেব সর্ব্বকর্মৈককারণম্।
মনোনুরূপং বাক্যং চ বাক্যেন প্রস্ফুটং মনঃ॥

"প্রাণীদিগের মনই সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র (মূল) কারণ; মনের অনুরূপই বাক্য নির্গত হয়, বাক্যের দ্বারা মন প্রকাশ পায়" (না. পং. ১. ৭. ১৮)। সার কথা, সর্ব্বপ্রথম মন (অর্থাৎ মনের নিশ্চয়) তাহার পর সমস্ত কর্ম্ম ঘটিতে থাকে। তাই কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয়ার্থ গীতার শুদ্ধ বুদ্ধির সিদ্ধান্তই বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরাও স্বীকার করিয়াছে। উদাহরণ যথা—ধম্মপদ নামক বৌদ্ধধর্ম্মীদিগের প্রসিদ্ধ নীতিগ্রন্থের আরম্ভেই উক্ত হইয়াছে—

মনো পুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা (শ্রেষ্ঠা) মনোময়া।
মনসা চে পদুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং দুক্খমন্বেতি চক্কং বহতো পদং॥

—"মন অর্থাৎ মনের ব্যাপার প্রথম, তাহার পর ধর্ম্মাধর্ম্মের আচরণ; এইরূপ ক্রম হওয়ায় এই কাজে মনই মুখ্য ও শ্রেষ্ঠ; তাই এই সমস্ত ধর্ম্মকে মনোময়ই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ কর্ত্তার মন যে প্রকার শুদ্ধ বা দুষ্ট থাকে, সেই প্রকার তাহার বাক্য ও কর্ম্মও ভাল বা মন্দ হয় এবং তদনুসারে পরে তাহার সুখদুঃখ ভোগ হয়।" * এই প্রকারে উপনিষদ ও গীতার এই অনুমানও (কৌষী. ৩. ১ এবং গীতা ১৮. ১৭) বৌদ্ধদিগের মান্য হইয়াছে যে, যাহার মন একেবারে শুদ্ধ ও নিষ্কাম হইয়াছে সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের দ্বারা আবার কোন পাপই ঘটিতে পারে না, সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও তিনি পাপপুণ্যে অলিপ্ত থাকেন। এই জন্য 'অর্হৎ' অর্থাৎ পূর্ণাবস্থায় উপনীত ব্যক্তি সর্ব্বদাই শুদ্ধ ও নিষ্পাপ থাকেন, এইরূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের অনেক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে (ধম্মপদ ২৯৪ ও ২৯৫; মিলিন্দ-প্র. ৪. ৫. ৭)।

পাশ্চাত্যদেশে নীতিনির্ণয়ের জন্য দুই পন্থা আছেঃ—প্রথম আধিদৈবত পন্থা, যাহাতে সদসদ্বিবেক দেবতার শরণ লইতে হয়; এবং দ্বিতীয় আধিভৌতিক পন্থা, যাহাতে "অধিক লোকের অধিক হিত কিসে হয়" এই বাহ্য কষ্টিপাথর অনুসারেই নীতিনির্ণয় করিতে বলা হয়। কিন্তু এই দুই-ই শাস্ত্রদৃষ্টিতে অপূর্ণ ও একদেশদর্শী এইরূপ উপরি-উক্ত বিচার আলোচনা হইতে সহজে উপলব্ধি হইবে। কারণ, সদসদ্বিবেকশক্তি বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু কিংবা দেবতা নাই; উহা ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিরই অন্তর্ভূত, সেই কারণে প্রত্যেকের প্রকৃতি ও স্বভাবানুসারে উহার সদসদ্বিবেকবুদ্ধিও সাত্ত্বিক, রাজসিক কিংবা তামসিক হয়। এই অবস্থায় উহার কার্য্যাকার্য্যনির্ণয় অভ্রান্ত হইতে পারে না; এবং কেবল "অধিক লোকের অধিক সুখ" কিসে হয় এই বাহ্য আধিভৌতিক কষ্টিপাথরের দিকেই লক্ষ্য করিয়া নীতিমত্তার সিদ্ধান্ত করিতে গেলে, কর্ম্মকারী ব্যক্তির বুদ্ধির কোন বিচার হইতে পারিবে না। তখন কোন ব্যক্তি যদি চুরি কিংবা ব্যভিচার করে এবং তাহার বাহ্য অনিষ্টকর পরিণাম কমাইবার বা লুকাইবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়া কুটিল সতর্কতা অবলম্বন করে, তবে ইহাই বলিতে হয় যে তাহার দুষ্কর্ম্ম আধিভৌতিক দৃষ্টিতে সেই পরিমাণে গর্হিত নহে। তাই কেবল বৈদিক ধর্ম্মেই কায়িক বাচিক ও মানসিক শুদ্ধতার আবশ্যকতা বর্ণিত হইয়াছে (মনু. ১২. ৩-৮; ৯. ২৯) এরূপ নহে;—বাইবেলেও ব্যভিচার পাপকে কেবল কায়িক মনে না করিয়া, পরস্ত্রীর প্রতি পুরুষের কিংবা পরপুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের কুদৃষ্টিপাতকেও ব্যভিচারের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে (মাথ্যু. ৫. ২৮); এবং বৌদ্ধধর্ম্মে কায়িক অর্থাৎ বাহ্যিক শুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে বাচিক ও মানসিক শুদ্ধতারও আবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে (ধম্ম. ৯৬ এবং ৩৯১ দেখ)। তাছাড়া গ্রীণ আরও বলেন যে, বাহ্য সুখই পরম সাধ্য মনে করিলে তাহা অর্জ্জন করিবার জন্য মনুষ্যে-মনুষ্যে ও রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে রেষারিষি হইয়া ঝগড়া বাধিবার সম্ভাবনা থাকে; কারণ বাহ্যসুখার্জ্জনের জন্য যে যে বাহ্য সাধন আবশ্যক, সে সমস্তই প্রায় অন্যের সুখজনক কর্ম্ম না করিলে নিজের লাভ হয় না। কিন্তু সাম্য বুদ্ধির কথা সেরূপ নহে। এই অন্তঃসুখ আত্মবশ, অর্থাৎ অন্য কোন মনুষ্যের সুখের অন্তরায় না হইয়া প্রত্যেকেই তাহা অর্জ্জন করিতে পারে। শুধু তাহা নহে, আত্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া সমস্ত ভূতের সহিত সমভাবে ব্যবহার করা যাহার দেহস্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার দ্বারা কি গুপ্ত, কি প্রকাশ্য কোন উপায়েই কোন দুষ্ট কর্ম্ম ঘটিবার সম্ভাবনাই থাকে না; এবং

* এই পালী শ্লোকের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অর্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার মতে, এই শ্লোক কর্ম্মাকর্ম্মের নির্ণয়ার্থ মন কিরূপ তাহা দেখিতে হয়, এই তত্ত্বের উপরেই রচিত হইয়াছে। মোক্ষমূলর সাহেবের ধম্মপদের ইংরেজী ভাষান্তরে এই শ্লোকের উপর টিপ্পনী দেখ। S. B. E. Vol. X, pp. 3, 4.

"অধিক লোকের অধিক সুখ কিসে হয় সর্ব্বদা তাহাই দেখিয়া চল" একথা তাহাকে বলা আবশ্যকই হয় না। কারণ, যে মনুষ্য নামের যোগ্য সে যে-কোন কাজই করুক না, তাহা সারাসার বিচার করিয়াই করিবে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। কেবল নৈতিক কর্ম্মের নির্ণয়ার্থই সারাসার বিচার করিতে হইবে এরূপ নহে। সারাসার বিচার করিবার সময় অন্তঃকরণ কিরূপ হওয়া উচিত ইহাই গুরুতর প্রশ্ন। কারণ, সকলের অন্তঃকরণ এক রকম হয় না। তাই "অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই সাম্যবুদ্ধি জাগৃত রাখা উচিত" এই কথা বলিলে, অধিকাংশ লোকের কিংবা সমস্ত ভূতের হিতসম্বন্ধে সারাসার বিচার কর, ইহা আর পৃথক্ করিয়া বলিতে হয় না। প্রাণীগণের সম্বন্ধে মানবজাতির যাহা কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহা তো আছেই, কিন্তু মূক পশুদিগের সম্বন্ধেও মনুষ্যের কিছু কর্ত্তব্য আছে;—কার্য্যাকার্য্যশাস্ত্রের মধ্যে তাহারও সমাবেশ করা উচিত—পাশ্চাত্য পণ্ডিতও এখন এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং এই ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে "অধিক লোকের অধিক হিত" অপেক্ষা "সর্ব্বভূতহিত" শব্দই অধিক ব্যাপক উপযুক্ত, এবং 'সাম্যবুদ্ধি'র মধ্যে এই সমস্তেরই সমাবেশ হয়, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। উল্টাপক্ষে, কাহারও বুদ্ধি শুদ্ধ ও সম নহে এইরূপ মনে করিলে, "অধিক লোকের অধিক সুখ" কিসে হয় তাহার স্থির করিবার হিসাব অভ্রান্ত হইলেও, নীতিধর্ম্মের দিকে তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ কোন সৎকার্য্যের দিকে প্রবৃত্তি হওয়া শুদ্ধ মনেরই গুণ, হিসাবী মনের নহে। হিসাবী মনুষ্যের স্বভাব কিংবা মন তোমার দেখিবার দরকার নাই, তোমার কেবল দেখিতে হইবে যে তাহার হিসাব ঠিক কিনা, অর্থাৎ সেই হিসাবে কেবল এইটী দেখিতে হইবে যে, তাহার দ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্ণয় হইয়া তোমার কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে কি না—এই কথা যদি কেহ বলে, তাহাও সত্য হইতে পারে না। কারণ, সুখ ও দুঃখ কি, তাহা সাধারণতঃ সকলেরই জানা থাকিলেও; সর্ব্বপ্রকার সুখদুঃখের তারতম্যের হিসাব করিবার সময় কোন্ সুখদুঃখের কত মূল্য, তাহার পরিমাণ ঠিক করা প্রথমে আবশ্যক হয়; কিন্তু এই গণনা করিবার জন্য, উষ্ণতামাপক যন্ত্রের মত কোন নিশ্চিত বাহ্য সাধনই এখনও নাই, এবং ভবিষ্যতেও তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাই সুখদুঃখের উচিত মূল্য স্থির করিবার অর্থাৎ উহার গুরুত্ব বা যোগ্যতা নির্ণয় করিবার কাজ শেষে প্রত্যেকের নিজের মনের দ্বারাই করিতে হয়। কিন্তু 'আমারই মতো অন্য লোক' এই আত্মৌপম্য বুদ্ধি যাহার মনে পূর্ণরূপে জাগৃত হয় নাই, সে পরের সুখদুঃখের তীব্রতা কখনই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না; এইজন্য এই সুখদুঃখের প্রকৃত মূল্যও সে কখনও স্থিরই করিতে পারে না; এবং তারপর, তারতম্য নির্ণয়ার্থ তাহার অনুমিত সুখদুঃখের মূল্যের মোট অঙ্কের মধ্যেও স্বভাবতই ফেরফার হয় এবং শেষে তাহার সমস্ত হিসাবেও ভুল হইবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। তাই বলিতে হয় যে, 'অধিক লোকের অধিক সুখ দেখা' এই বাক্যের মধ্যে 'দেখা' কেবল হিসাব করিবার বাহ্য ক্রিয়া, উহাতে কোন গুরুত্ব না দিয়া, যে আত্মৌপম্য ও নির্লোভ বুদ্ধির দ্বারা (অনেক) অপর লোকের সুখদুঃখের যথার্থ মূল্য প্রথমে স্থির করা যায় সেই সর্ব্বভূতে সম শুদ্ধবুদ্ধিই নীতিমত্তার প্রকৃত বীজ। মনে রেখো, নীতিমত্তা নির্ম্মম, শুদ্ধ, প্রেমিক, সম, বা (সংক্ষেপে বলিতে হইলে) সাত্ত্বিক অন্তঃকরণের ধর্ম্মও শুধু সারাসার বিচারের ফল নহে। এইজন্য মহাভারতীয় যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির রাজ্যারূঢ় হইলে যখন পুত্রদিগের পর্য্যায়ক্রমে কৃতার্থ কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্রের সহিত, বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবার জন্য বনে যাত্রা করিলেন, তখন 'অধিক লোকের কল্যাণ কর'—এইরূপ লম্বা লম্বা কথা না বলিয়া "মনস্তে মহদস্ত চ" (মভা. অশ্ব. ১৭. ২১)—তোমার মন মহৎ হোক্—ইহাই শেষে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন। অধিক লোকের অধিক সুখ কিসে হয় তাহা দেখাই নীতিমত্তার প্রকৃত, শাস্ত্রীয় ও সহজ কষ্টিপাথর এইরূপ যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাঁহারা আপনারই মতো অন্য সমস্ত লোক শুদ্ধ মনবিশিষ্ট—এইরূপ প্রথমে ধরিয়া লইয়া তাহার পর নীতির নির্ণয় তাঁহারা কিপ্রকারে করিবেন তাহা তাহাদিগকে বলিয়াছেন, এইরূপ দেখা যায়। কিন্তু এই পণ্ডিতগণের মানিয়া লওয়া কথাটি সত্য না হওয়ায়, তাঁহাদের নীতিনির্ণয়ের তত্ত্ব একদেশদর্শী ও অপূর্ণ হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের লেখার দরুণ এরূপ ভ্রমও উৎপন্ন হয় যে,—মন, স্বভাব বা শীল যথার্থত অধিকাধিক শুদ্ধ ও পাপভীরু কিরূপে হইবে, সেই চেষ্টা-উদ্যোগের পরিবর্ত্তে, যদি কেহ নীতিমান হইবার জন্য নিজকৃত কর্ম্মের বাহ্য পরিণামের হিসাব করিতে শিখে তবেই যথেষ্ট হইবে, এবং তাঁহার পর, যাহার স্বার্থবুদ্ধি তিরোহিত হয় নাই, সেই সব লোক চক্রী, কু-মৎলবী কিংবা ভণ্ড (গী. ৩. ৬) হইয়া সমস্ত সমাজেরই ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। তাই কেবল নীতিমত্তার কষ্টিপাথরের দৃষ্টিতে দেখিলেও, কর্ম্মের শুধু বাহ্য পরিণাম দেখা-রূপ মার্গ অপূর্ণ ও হীন প্রতীত হয়। অতএব আমার মতে 'বাহ্য কর্ম্মের দ্বারা পরিব্যক্ত এবং সঙ্কটকালেও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ সাম্যবুদ্ধিরই এই কাজে অর্থাৎ কর্ম্মযোগে শরণ লইতে হইবে, এবং জ্ঞানযুক্ত পূর্ণ শুদ্ধবুদ্ধি কিংবা শীলই সদাচরণের প্রকৃত কষ্টিপাথর', গীতায় এই সিদ্ধান্তই পাশ্চাত্য আধিভৌতিকপক্ষীয় মতাপেক্ষা অধিক মার্ম্মিক, ব্যাপক, শুভোদ্দিষ্ট ও নির্দ্দোষ।

নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক গ্রন্থ ছাড়িয়া অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যাঁহারা নীতির বিচার করেন সেই সব পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তাহাতেও নীতিমত্তার নির্ণয়কার্য্যে গীতার ন্যায় কর্ম্মাপেক্ষা শুদ্ধবুদ্ধিরই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণ যথা—প্রসিদ্ধ জর্ম্মন তত্ত্ববেত্তা কাণ্টের 'নীতির আধ্যাত্মিক মূলতত্ত্ব' এবং অন্য নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখ। কাণ্ট * সর্ব্বভূতাত্মৈক্যের সিদ্ধান্তটি না দিলেও, ব্যবসায়াত্মক ও বাসনাত্মক বুদ্ধিরই সূক্ষ্ম বিচার করিয়া তিনি এই স্থির করিয়াছেন যে, (১) কোন কর্ম্মের নৈতিক মূল্য উক্ত কর্ম্ম হইতে কত লোকের কত সুখ হইবে এইরূপ বাহ্য ফল হইতে স্থির না করিয়া, কর্ম্মকারক পুরুষের 'বাসনা' কতটা শুদ্ধ তাহা দেখিয়াই স্থির

* Kant's *Theory of Ethics*, trans. by Abbot. 6th Ed. এই পুস্তকে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হইয়াছে। প্রথম সিদ্ধান্ত ১০. ১২. ১৬ এবং ২৪ পৃষ্ঠায়; পরে ১১২ এবং ১১৭ পৃষ্ঠায়; তৃতীয় ৩১, ৫৮, ১২১ ও ২৯০ পৃষ্ঠায়; চতুর্থ ১৮. ৩৮, ৫৫ ও ১১৯ পৃষ্ঠায়; এবং পঞ্চম ৭০-৭৩ পৃষ্ঠায় পাঠক দেখিতে পাইবেন।

করিতে হইবে ; (২) মনুষ্যের এই বাসনা (অর্থাৎ বাসনাত্মক বুদ্ধি) ইন্দ্রিয়সুখে লিপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা শুদ্ধ (ব্যবসায়াত্মক) বুদ্ধির আদেশে (অর্থাৎ এই বুদ্ধির দ্বারা নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিয়মানুসারে) চলিলে, উহাকে শুদ্ধ পবিত্র ও স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিবে ; (৩) ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া এইরূপ যাহার বাসনা শুদ্ধ হইয়াছে সেই ব্যক্তির সম্মুখে কোন নীতিনিয়মই স্থাপন করা আবশ্যক হয় না—এই নিয়ম তো সাধারণ মনুষ্যের জন্যই হইয়া থাকে ; (৪) বাসনা এইরূপে শুদ্ধ হইলে, উহা যে কর্ম্ম করিতে বলে তাহা "আমার নিজের মতোই যদি অন্যেরাও করে তাহা হইলে কি হইবে" এইরূপ বিচার করিয়া বলিয়া থাকে ; এবং (৫) বাসনার এই শুদ্ধতা ও স্বতন্ত্রতার উপপত্তি কর্ম্মজগত ছাড়িয়া ব্রহ্মজগতের মধ্যে প্রবেশ না করিলে উপলব্ধি হয় না। কিন্তু আত্মা ও ব্রহ্মজগৎ ইহাদের সম্বন্ধে কাণ্টের বিচার কিছু অপূর্ণ ; এবং গ্রীন্ সাহেব কাণ্টেরই অনুযায়ী হইলেও স্বকীয় "নীতিশাস্ত্রের উপোদ্‌ঘাতে" বাহ্যজগতের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে অগম্য তত্ত্ব আছে তাহাই আত্মারূপে পিণ্ডে অর্থাৎ মনুষ্যের দেহে অংশত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এইরূপ প্রথমে সিদ্ধ করিয়া তাহার পর মানব-দেহের যে এক নিত্য ও স্বতন্ত্র তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মা আছে তাহাকে সর্ব্বভূতান্তর্গত সামাজিক পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করাইবার আমাদের যে দুর্দ্ধর ইচ্ছা তাহাই মনুষ্যকে সদাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে, এবং তাহাতেই মনুষ্যের নিত্য ও চিরস্থায়ী কল্যাণ, এবং বিষয়সুখ অনিত্য, এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন।* সারকথা, কাণ্ট ও গ্রীন এই দুইজনেরই দৃষ্টি আধ্যাত্মিক হইলেও, গ্রীন ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির ব্যাপারের মধ্যেই জড়িত না থাকিয়া, কর্ম্মাকর্ম্মবিবেচনার ও বাসনাস্বাতন্ত্র্যের উপপত্তিকে পিণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে একত্বের দ্বারা ব্যক্ত শুদ্ধ আত্মস্বরূপ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন এইরূপ উপলব্ধি হইবে। কাণ্ট ও গ্রীন এই দুই আধ্যাত্মিক পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞের এই সিদ্ধান্ত, এবং নিম্নোক্ত গীতাপ্রতিপাদিত কোন সিদ্ধান্তের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই দুই অক্ষরে অক্ষরে এক না হইলেও উহাদের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সমতা আছেই। দেখ, গীতার সিদ্ধান্ত এই—(১) বাহ্য কর্ম্মাপেক্ষা কর্ত্তার (বাসনাত্মক) বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ ; (২) বাসনাত্মক বুদ্ধি আত্মনিষ্ঠ হইয়া নিঃসংশয় ও সম হইলে, তাহার পর বাসনাত্মক বুদ্ধি স্বতই শুদ্ধ ও পবিত্র হয় ; (৩) এই প্রকারে যাহার বুদ্ধি সম ও স্থির হইয়াছে সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বদাই বিধিনিয়মাদির অতীত হইয়া থাকেন ; (৪) এবং তাঁহার আচরণ কিংবা তাঁহার আত্মৈক্যবুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধ নীতিনিয়ম সাধারণ মনুষ্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রমাণ হইয়া থাকে ; এবং (৫) পিণ্ডে অর্থাৎ দেহে এবং ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ সৃষ্টিতে একই আত্মস্বরূপী তত্ত্ব আছে, দেহান্তর্ভূত আত্মা স্বকীয় শুদ্ধ ও পূর্ণস্বরূপ (মোক্ষ) প্রাপ্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক হইয়া থাকে এবং এই শুদ্ধ স্বরূপের জ্ঞান হইলে পর, সর্ব্বভূতে আত্মৌপম্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহা চিন্তার যোগ্য যে, ব্রহ্ম, আত্মা, মায়া, আত্মস্বাতন্ত্র্য, ব্রহ্মাত্মৈক্য, কর্ম্মবিপাক ইত্যাদি বিষয়ে বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, কাণ্ট ও গ্রীনকেও ছাড়াইয়া যাওয়ার ও অধিকতর নিশ্চিত হওয়া প্রযুক্ত উপনিষদের বেদান্ত অনুসারে গীতায় যে কর্ম্মযোগের বিচার করা হইয়াছে তাহা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে অসন্দিগ্ধ, পূর্ণ ও দোষরহিত হইয়াছে ; এবং এখনকার বেদান্তী জর্ম্মন পণ্ডিত প্রোফেসার ডায়সন নীতিবিচারের এই পদ্ধতিকেই স্বকীয় "অধ্যাত্মশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব" গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। ডায়সন শোপেনহৌয়েরের অনুগামী ; "সংসারের মূল কারণ বাসনা হওয়ায় তাহার ক্ষয় না করিলে দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না ; অতএব বাসনা ক্ষয় করাই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য" শোপেনহৌয়েরের এই সিদ্ধান্ত তাঁহার পূর্ণরূপে গ্রাহ্য ; এবং এই আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত অনুসারেই নীতির উপপত্তির বিচার তিনি স্বকীয় উপরি-উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। তিনি প্রথমে ইহা সিদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাসনা ক্ষয় হইবার জন্য বা হইলে পরও কর্ম্মত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই ; বরঞ্চ 'বাসনার পূর্ণ ক্ষয় হইয়াছে কি না' তাহা পরোপকারার্থ কৃত নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা যেরূপ ব্যক্ত হয় সেরূপ অন্য কিছুতেই ব্যক্ত হয় না বলিয়া, নিষ্কাম কর্ম্ম বাসনাক্ষয়েরই লক্ষণ ও ফল। এইরূপ দেখাইবার পর তিনি বাসনার নিষ্কামতাই সদাচারের ও নীতিমত্তারও মূল এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন ; এবং তাহার শেষে "তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর" (গী. ৩. ১৯) গীতার এই শ্লোকটি প্রদত্ত হইয়াছে।* ইহা হইতে দেখা যায়, গীতা পাঠেই এই উপপত্তির জ্ঞান তাঁহার মনে আসিয়াছে। যাই হোক্ ; ইহা কম গৌরবের কথা নহে যে, ডায়সন, গ্রীন, শোপেনহৌয়ের, কাণ্ট—ইঁহাদের পূর্ব্বে, এমন কি, অ্যারিষ্টটলেরও শত শত বর্ষ পূর্ব্বেই এই বিচার আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। বেদান্ত কেবল সংসার ত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভ করিবার শুষ্ক চেষ্টার উপদেশ দেয়, এইরূপ আজকাল কতকগুলি লোকের ধারণা হইয়াছে ; কিন্তু এই কল্পনা ঠিক নহে। জগতে যাহা চোখে দেখা যায় তাহার বাহিরে যাইয়া বিচার করিলে এই প্রশ্ন উঠে যে, 'আমি কে, সৃষ্টির গোড়ায় কি তত্ত্ব আছে, এই তত্ত্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি, এই সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমার এই জগতে পরমারাধ্য বা চরম ধ্যেয় কি, এবং এই সাধ্য বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্য জীবনের কোন্ মার্গ স্বীকার করা আবশ্যক, কিংবা কোন্ মার্গ অনুসারে কোন্ সাধ্য বিষয় পাওয়া যাইবে ?" এবং এই গহন প্রশ্নসমূহের যথাশক্তি শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিবার জন্যই বেদান্তশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে ; এবং বাস্তবিক দেখিতে গেলে, সমস্ত নীতিশাস্ত্র অর্থাৎ মনুষ্যদিগের পরস্পরের সহিত ব্যবহারসংক্রান্ত বিচার ঐ গহন শাস্ত্রেরই এক অঙ্গ, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। সারকথা, কর্ম্মযোগের উপপত্তি বেদান্তশাস্ত্রের উপরেই করা যাইতে পারে ; এবং এক্ষণে সাংখ্যমার্গীয় লোকেরা যাহাই বলুন, গণিতশাস্ত্রের যেরূপ শুদ্ধ গণিত ও ব্যবহারিক গণিত এইরূপ দুই ভেদ আছে, সেইরূপ বেদান্তশাস্ত্রেরও শুদ্ধ বেদান্ত ও নৈতিক কিংবা

* Green's *Prolegomena to Ethics* § § 99, 174-179 and 223 232.

* See Deussen's *Elements of Metaphysics*, Eng Trans, 1909 p. 304.

ব্যবহারিক বেদান্ত এই দুই ভেদ আছে, ইহা নির্ব্বিবাদ। কাণ্ট এইরূপ বলেন যে, "আমি জগতে কিরূপ ব্যবহার করিব? কিংবা আমার এই জগতে প্রকৃত কর্ত্তব্য কি" এই নীতিশাস্ত্রের বিচার করিতে করিতেই 'পরমেশ্বর' (পরমাত্মা) 'অমৃতত্ব' এবং (ইচ্ছা-) স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে গূঢ় প্রশ্ন মনুষ্যের মনে উদ্ভূত হইয়াছে; এবং এই প্রশ্নসমূহের উত্তর না দিয়া নীতির উপপত্তি শুধু কোন বাহ্য সুখের হিসাবে করিলে, মনুষ্যের মনকে যে পশুবৃত্তি স্বভাবত বিষয়সুখেই লিপ্ত রাখে সেই পশুবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া প্রকৃত নীতিমত্তার মূল ভিত্তির উপরেই কুড়াল আঘাত করিবার মতো হয়। * কর্ম্মযোগই গীতার প্রতিপাদ্য হইলেও তাহাতে শুদ্ধ বেদান্ত কেমন করিয়া আসিল ও কেন আসিল তাহা এক্ষণে পৃথক করিয়া বলা আবশ্যক নাই। কাণ্ট এই বিষয়ের উপর "শুদ্ধ (ব্যবসায়াত্মক) বুদ্ধির মীমাংসা" এবং "ব্যবহারিক (বাসনাত্মক) বুদ্ধির মীমাংসা" নামক দুই পৃথক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের ঔপনিষদিক তত্ত্বজ্ঞানানুসারে ভগবদ্গীতাতেই, এই দুই বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। শুধু তাহা নহে, শ্রদ্ধামূলক ভক্তিমার্গেরও বিচার-আলোচনা তাহার মধ্যেই করা হইয়াছে বলিয়া, গীতা সর্ব্বোপরি গ্রাহ্য ও প্রমাণভূত হইয়াছে।

মোক্ষধর্ম্মকে ক্ষণকালের জন্য একপাশে রাখিয়া কেবল কর্ম্মাকর্ম্মের পরীক্ষার নৈতিক তত্ত্বের দৃষ্টিতেও যখন "সাম্যবুদ্ধিই" শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইতেছে, তখন গীতার আধ্যাত্মিক পক্ষ ব্যতীত নীতিশাস্ত্রে অন্য পথ কি করিয়া ও কেন প্রস্তুত হইয়াছে তাহারও কিছু বিচার করা আবশ্যক। ডা, পল, কেরস্ † নামক এক প্রসিদ্ধ আমেরিকন্ গ্রন্থকার স্বকীয় নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে এই প্রশ্নের এই উত্তর দিয়াছেন যে, "পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে মনুষ্যের যে মত হইয়া থাকে তদনুসারে নীতিশাস্ত্রের মূলতত্ত্বসম্বন্ধীয় বিচারের রং বদলায়। সত্য বলিতে কি, পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে কোন একটা নিশ্চিত মত না থাকিলে, নৈতিক প্রশ্নই উপস্থিত হইতে পারে না। পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের রচনা বিষয়ে পাকা কোন মত না থাকিলেও আমাদের নৈতিক আচরণ সম্ভবতঃ চলিতে পারে; কিন্তু এই আচরণ স্বপ্নাবস্থাব্যাপারের মতো হওয়ায় ইহাকে নৈতিক না বলিয়া দেহধর্ম্মানুসারে সংঘটিত কেবল কায়িক চেষ্টা বলা উচিত।" উদাহরণ যথা—বাঘিনী আপনার বাচ্ছাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়; কিন্তু বাঘিনীর এই আচরণকে নৈতিক না বলিয়া, উহা জন্মসিদ্ধ স্বভাব এইরূপ আমরা বলিয়া থাকি। নীতিশাস্ত্রের উপপাদনে অনেক পথ কেন বাহির হইয়াছে, এই উদাহরণ হইতে তাহা স্পষ্ট জানা যায়। কারণ, "আমি কে, জগৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, আমার এই জগতে কি উপযোগ হইতে পারে" ইত্যাদি গূঢ় প্রশ্নের সিদ্ধান্ত যে তত্ত্বের দ্বারা হইবে তাহার দ্বারাই, আমি আপন জীবনকালে অন্য লোকদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি শেষে তাহারও সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সব গূঢ় প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দেশে একই প্রকার হইতে পারে না। মনুষ্যের ও জগতের কর্ত্তা বাইবেলের সগুণ পরমেশ্বর এবং তিনিই প্রথমে জগৎ উৎপন্ন করিয়া সদাচরণের নিয়ম কিংবা আদেশ মনুষ্যকে দিয়াছেন, য়ুরোপখণ্ডে প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্মে, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে; এবং বাইবেলে বর্ণিত পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের, এই কল্পনা অনুসারে বাইবেলে উক্ত নীতিনিয়মই নীতিশাস্ত্রের মূল, পূর্ব্বে খৃষ্টপণ্ডিতদিগের এইরূপই অভিপ্রায় ছিল। পরে এই নিয়ম ব্যবহারে অপূর্ণ হয় এইরূপ দৃষ্টিগোচর হইলে, এই নিয়মের পূর্ণতার জন্য কিংবা স্পষ্টীকরণার্থ পরমেশ্বরই সদসদ্বিবেকশক্তি মনুষ্যকে দিয়াছেন এইরূপ প্রতিপাদিত হইতে লাগিল। কিন্তু চোরের ও সাধুর সদসদ্বিবেকশক্তি এক হয় না, ইহা পরে লক্ষ্য হওয়ায়, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি হইলেও, এই ঐশ্বরিক ইচ্ছার স্বরূপ জানিবার জন্য অধিক লোকের অধিক কল্যাণ কিসে হয় তাহারই বিচার করিতে হইবে—ইহা ব্যতীত সেই ইচ্ছার স্বরূপ অবগত হইবার দ্বিতীয় সাধন নাই, এই মত প্রচারিত হইল। বায়বেলের সগুণ পরমেশ্বরই জগতের কর্ত্তা এবং মনুষ্য নীতি অনুসারে ব্যবহার করিবে ইহা তাঁহারই ইচ্ছা কিংবা আজ্ঞা,—পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের রচনাসম্বন্ধে খৃষ্টানদিগের যে ধারণা সেই ধারণাকে অবলম্বন করিয়াই এই সমস্ত মত অবস্থিত। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মপুস্তকের জড়ব্রহ্মাণ্ডের রচনাসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, আধিভৌতিকশাস্ত্রীদিগের ইহা নজরে আসায় পরমেশ্বরের সমান জগতের কোন কর্ত্তা আছেন কি নাই এই বিচার পাশে রাখিয়া, নীতিশাস্ত্রের ইমারৎ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর ভিত্তির উপর কি প্রকারে খাড়া করা যাইতে পারে এই বিচার সুরু হইল। সেই অবধি অধিক লোকের অধিক সুখ বা কল্যাণ, কিংবা মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি এই প্রত্যক্ষ তত্ত্বই নীতিশাস্ত্রের মূল

* Empiricism, on the contrary, cuts up at the roots the morality of intentions (in which, and not in actions only, consists the high worth that men can and ought to give themselves)···Empiricism, moreover, being on this account allied with all the inclinations which (no matter what fashion they put on) degrade humanity when they are raised to the dignity of a supreme practical principle...is for that reason much more dangerous." Kant's *Theory of Ethics*, pp. 163, and 236-238. See also Kant's *Critique of Pure Reason* (trans. by Max-Muller) 2nd Ed. pp. 640, 657-

† See *The Ethical Problem*, by Dr. Carus, 2nd Ed. P. 111 "Our proposition is that the leading principle *in* Ethics must be derived from the philosophical view back of it. The world conception a man has, can alone give character to the principle *in* his ethics. without any world-conception we can have no ethics (i. e ethics in the highest sense of the word). We may act morally like dreamers or somnambulists, but our ethics would in that case be a mere moral instinct without any rational insight into its *raison d'etre*"

এইরূপ প্রতিপাদিত হইতে লাগিল। এই প্রতিপাদনে অধিক লোকের অধিক হিত মনুষ্য কেন করিবে তাহার উপপত্তি না দিয়া; ইহা মনুষ্যের এক বর্দ্ধনশীল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, ইহাই বলা হইল। কিন্তু মানব-স্বভাবে স্বার্থের ন্যায় অন্য প্রবৃত্তিও থাকিতে দেখা যায়, তাই এই পন্থায়ও পুনর্ব্বার ভেদ হইতে আরম্ভ হইল। নীতিমত্তার এই উপপত্তিগুলি সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ নহে। কারণ "জগতের অতীত দৃশ্য পদার্থের অতীত জগতের গোড়ায় কোনরূপ অব্যক্ত তত্ত্ব আছেই এই সিদ্ধান্তের উপর এই পন্থার সমস্ত পণ্ডিতদিগের সমানই অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা আছে, এই কারণে উঁহাদের বিষয়-প্রতিপাদনে যতই দুরূহ বাধা উপস্থিত হউক না, তাঁহারা কেবল বাহ্য ও দৃশ্য তত্ত্বের দ্বারাই কিরূপে কার্য্য-নির্ব্বাহ হইতে পারে সর্ব্বদা তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। নীতি সকলেরই দরকার হইলেও জড়ব্রহ্মাণ্ডের রচনাসম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকায়, তাঁহাদের নীতিশাস্ত্রের উপপত্তির মধ্যে সর্ব্বদাই কিরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে, ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে। এই কারণে জড়-ব্রহ্মাণ্ডের রচনাসম্বন্ধীয় আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিকমতের অনুসারে আমি নীতিশাস্ত্রের প্রতি-পাদনের (তৃতীয় প্রকরণে) তিন ভেদ করিয়া পরে প্রত্যেক পন্থার মুখ্য সিদ্ধান্তগুলির পৃথক পৃথক বিচার করিয়াছি। সমস্ত দৃশ্য জগৎ সগুণ পরমেশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন এইরূপ যাহাদের মত তাহারা আপন-আপন ধর্ম্মপুস্তকে পরমেশ্বরের আজ্ঞা কিংবা তাঁহারই শক্তিতে উৎপন্ন সদসদ্‌বিবেচনশক্তিরূপ দেবতার বাহিরে নীতি-শাস্ত্রের কোন বিচার করে না। এই পন্থাকে আমি 'আধি-দৈবিক' পন্থা নাম দিয়াছি; কারণ, সগুণ পরমেশ্বরও তো এক দেবতাই। এখন, দৃশ্য জগতের গোড়ায় কোন অদৃশ্যতত্ত্ব নাই, কিংবা থাকিলেও তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য, এইরূপ যাহাদিগের মত তাহারা, 'অধিক লোকের অধিক কল্যাণ' কিংবা 'মনুষ্যত্বের পরমউৎকর্ষ' এই দৃশ্য তত্ত্বের উপরেই নীতিশাস্ত্রের ইমারৎ খাড়া করিয়া থাকে, এবং এই বাহ্য ও দৃশ্য তত্ত্বের বাহিরে যাইবার কোন অর্থ নাই এইরূপ মনে করে। এই পন্থায় আমি 'আধি-ভৌতিক' নাম দিয়াছি। নামরূপাত্মক দৃশ্য জগতের মূলে আত্মার মতো নিত্য ও অব্যক্ত কোন তত্ত্ব অবশ্যই আছে এইরূপ যাহাদের সিদ্ধান্ত, তাহারা স্বকীয় নীতিশাস্ত্রের উপপত্তিকে আধিভৌতিক উপপত্তিরও বাহিরে লইয়া যায়; এবং আত্মজ্ঞান ও নীতি কিংবা ধর্ম্ম ইহাদের মধ্যে মিল স্থাপন করিয়া মনুষ্যের জগতে প্রকৃত কর্ত্তব্য কি তাহার নির্ণয় করে। এই পন্থাকে আমি "আধ্যাত্মিক" সংজ্ঞা দিয়াছি। তিন পন্থারই আচার-নীতি একই; কিন্তু জড়ব্রহ্মাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে প্রত্যেক পন্থার মত বিভিন্ন হওয়ায়, নীতিশাস্ত্রের মূলতত্ত্বের স্বরূপ প্রত্যেক পন্থায় অল্পস্বল্প পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্যাকরণ শাস্ত্র যেরূপ নূতন ভাষা গঠন না করিয়া ব্যবহারে যে ভাষা প্রচলিত তাহারই নিয়ম বাহির করিয়া ভাষার অভিবৃদ্ধিকল্পে সাহায্য করে, সেইরূপ নীতিশাস্ত্রেরও পদ্ধতি। যে দিন মনুষ্য এই জগতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই দিন হইতে নিজের বুদ্ধি অনুসারেই সে আপন আচরণকে দেশ-কালানুসারে শুদ্ধ রাখিবার চেষ্টাও করিয়া আসিয়াছে; এবং সময়ে সময়ে যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহারা নিজ নিজ ধারণা অনুসারে আচারশুদ্ধির জন্য প্রেরণারূপ অনেক নিয়মও স্থাপন করিয়াছেন। নীতিশাস্ত্র এই নিয়ম ভাঙিয়া নূতন নিয়ম স্থাপনের জন্য উৎপন্ন হয় নাই। হিংসা করিও না, সত্য কহ, পরোপকার কর, ইত্যাদি নীতির নিয়ম প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু নীতির উন্নতির সুবিধা করিবার জন্য এই নীতির নিয়মান্তর্ভূক্ত মূলতত্ত্ব কি, ইহাই দেখা নীতি-শাস্ত্রের কার্য্য। এবং সেই জন্য নীতিশাস্ত্রের যে-কোন পন্থা গ্রহণ করিলেও নীতির বর্ত্তমান-প্রচলিত প্রায় সমস্ত নিয়ম সকল পন্থায় একইরূপ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে যে ভেদ উপস্থিত হয় সেই ভেদ উপপত্তির স্বরূপসম্বন্ধীয়; এবং প্রত্যেক পন্থায় জড়ব্রহ্মাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতই এই ভেদ ঘটিবার মুখ্য কারণ, ডা. পল্ কেরস্ এই যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য বলিয়া মনে হয়।

এখন ইহা সিদ্ধ হইল যে, মিল্, স্পেন্সর, কোঁৎ প্রভৃতি আধিভৌতিক পন্থার আধুনিক পাশ্চাত্য নীতি-শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থকারেরা আত্মৌপম্যদৃষ্টির সুলভ ও ব্যাপক তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া "সর্ব্বভূতহিত" কিংবা "অধিক লোকের অধিক হিত" এই আধিভৌতিক ও বাহ্য তত্ত্বের উপরেই নীতির ইমারৎ খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, জড়-ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধে তাঁহাদের মত প্রাচীন মত হইতে ভিন্ন হওয়ায় ঐরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় এই নূতন মত স্বীকার না করিয়া, 'আমি কে; জগৎ কি; আমার এই জগতের জ্ঞান কি করিয়া হয়; আমা হইতে বাহ্য জগৎ স্বতন্ত্র কি না; স্বতন্ত্র হইলেও তাহার মূলে কোন্ তত্ত্ব আছে, এই তত্ত্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি; এক মনুষ্য অন্য মনুষ্যের সুখের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন কেন করিবে; "যার জন্ম তারই মৃত্যু" এই নীতি অনুসারে যে পৃথিবীর উপরে আমরা আছি, সমস্ত প্রাণী-সমেত তাহারও কোন-না-কোন সময়ে নাশ হইবে ইহা যদি নিশ্চিত হয়, তবে নশ্বর পরবর্ত্তী বংশের জন্য আমরা আমাদের সুখ বিসর্জ্জন কেন করিব', ইত্যাদি প্রশ্ন যাহারা স্পষ্ট গভীরভাবে বিচার করিতে চায়—কিংবা "পরোপ-কার প্রভৃতি মনোবৃত্তি এই কর্ম্মময় অনিত্য দৃশ্যজগতের নৈসর্গিক প্রবৃত্তিই"—এই উত্তরে যাহাদের পূর্ণ সন্তোষ হয় না; এবং এই প্রবৃত্তির মূল কি, ইহা যাহারা জানিতে চায়, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের নিত্য-তত্ত্বজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর নাই। এবং এই কারণেই গ্রীন স্বকীয় নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে যে আত্মার জড়জগতের জ্ঞান হয় সেই আত্মা জড়-জগৎ হইতে অবশ্য ভিন্ন হইবে—এখান হইতেই সুরু করিয়াছেন; এবং কাণ্ট প্রথমে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির বিচার করিয়া তাহার পর বাসনাত্মক বুদ্ধির ও নীতি-শাস্ত্রের মীমাংসা করিয়াছেন। 'মনুষ্য নিজের কিংবা অধিক লোকের সুখের জন্যই জন্মিয়াছে' এই কথাটা বাহ্যতঃ বেশ মনোমুগ্ধকর হইলেও বস্তুতঃ সত্য নহে। কেবল সত্যের জন্য প্রাণ দিতে যে মহাত্মা প্রস্তুত থাকেন, ভবিষ্যৎবংশের অধিকাধিক বিষয়সুখই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় কিনা, ইহা যদি একটু বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে, নিজের কিংবা অন্য লোকের অনিত্য, আধি-ভৌতিক সুখাপেক্ষা আরও কিছু বড় এই জগতে মনুষ্যের

পরম সাধ্য আছে—ইহা বলিতেই হয়। এই সাধ্য বিষয়টি কি? জড়ব্রহ্মাণ্ডের নামরূপাত্মক (সুতরাং) নশ্বর (কিন্তু) দৃশ্যস্বরূপের দ্বারা সমাচ্ছাদিত আত্মস্বরূপী নিত্য তত্ত্ব যাহারা আত্মপ্রতীতির দ্বারা অবগত হইয়াছে; তাহারা এই প্রশ্নের এই উত্তর দেয় যে, আমাদের আত্মায় অমর শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহার মধ্যেই বিরাম লাভ করা—ইহাই এই নশ্বর জগতে জ্ঞানবান মনুষ্যের প্রথম কর্ত্তব্য। এইরূপ সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মৈক্যের উপলব্ধি হইয়া এই জ্ঞান যাঁহার দেহেন্দ্রিয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে সেই ব্যক্তি এই জগৎ নশ্বর বা নিত্য তাহার বিচার করিতে না বসিয়া, সর্ব্বভূতহিতের চেষ্টায় স্বতই প্রবৃত্ত হয়েন, এবং সত্যমার্গের প্রবর্ত্তক হন। কারণ অবিনাশী ও ত্রিকালাবাধিত সত্যটি কি, তাহা সম্পূর্ণরূপে তিনি জানেন। মনুষ্যের এই আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থাই সমস্ত নীতিনিয়মের মূল উৎস; ইহাকেই বেদান্তে মোক্ষ বলা হইয়া থাকে। যে কোন নীতিই গ্রহণ কর না কেন, তাহা এই চরমসাধ্য বিষয় হইকে পৃথক থাকিতে পারেনা; তাই নীতিশাস্ত্রের কিংবা কর্ম্মযোগের আলোচনা করিবার সময় শেষে এই তত্ত্বেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। সর্ব্বাত্মৈক্যরূপ অব্যক্ত মূলতত্ত্বেরই এক ব্যক্ত স্বরূপ সর্ব্বভূতহিতেচ্ছা; এবং সগুণ পরমেশ্বর ও দৃশ্যজগৎ উভয়ই সর্ব্বভূতান্তর্গত সর্ব্বব্যাপী ও অব্যক্ত আত্মারই ব্যক্ত রূপ। এই ব্যক্ত স্বরূপের বাহিরে গিয়া অব্যক্ত আত্মার জ্ঞানলাভ না করিলে জ্ঞানের পূর্ণতা তো হয়ই না; কিন্তু, দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মাকে পূর্ণাবস্থায় উপনীত করিবার প্রত্যেকের এই জগতে যে কর্ত্তব্য আছে, এই জ্ঞান ব্যতীত তাহাও সিদ্ধ হয় না। নীতি বল, ব্যবহার বল, ধর্ম্ম বল, কিংবা অন্য কোন শাস্ত্রই বল, "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"—অধ্যাত্মজ্ঞানই সকলের চরম গতি। আমাদের ভক্তিমার্গও এই তত্ত্বজ্ঞানেরই অনুসরণ করায় তাহাতেও জ্ঞানদৃষ্টিতে নিষ্পন্ন সাম্যবুদ্ধিরূপী তত্ত্বই মোক্ষের ও সদাচরণের মূল, এই সিদ্ধান্তই বজায় থাকে। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত, কোন কোন বেদান্তীর এই যে ধারণা আছে, ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা সিদ্ধ উক্ত তত্ত্বসম্বন্ধে একমাত্র গুরুতর আপত্তি। তাই, জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে বিরোধ নাই এইরূপ দেখাইয়া, বাসনাক্ষয় হইলেও, পরমেশ্বরার্পণপূর্ব্বক বুদ্ধিতে লোকসংগ্রহার্থ কেবল কর্ত্তব্য বলিয়াই জ্ঞানীপুরুষের সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে, এই কর্ম্মযোগের সিদ্ধান্ত গীতায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া যুদ্ধ কর, এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু সেই উপদেশ কেবল তৎকালীন প্রসঙ্গক্রমেই করা হইয়াছিল (গী. ৮. ৭)। উক্ত উপদেশের ইহাই ভাবার্থ জানা যায় যে, অর্জ্জুনের ন্যায় কৃষক, স্বর্ণকার, সূত্রধর, কর্ম্মকার, ব্যবসাদার, ব্যাপারী, ব্রাহ্মণ, কেরাণী, উদ্যোগী প্রভৃতি সকলেরই স্ব স্ব অধিকারানুরূপ আপন ব্যবহার পরমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে চালাইয়া জগতের ধারণ-পোষণ করা আবশ্যক; যে ব্যক্তি যে ব্যবসায় নিসর্গত প্রাপ্ত হইয়াছে সে তাহা নিষ্কাম বুদ্ধিতে নির্ব্বাহ করিলে, কর্ত্তাকে তাহার কোন পাপ স্পর্শ করিবে না; সমস্ত কর্ম্ম একই সমান; দোষ কর্ত্তার বুদ্ধিতে, কর্ম্মে নহে; তাই বুদ্ধিকে সম করিয়া কর্ম্ম করিলে তাহাই পরমেশ্বরের উপাসনা হইয়া থাকে, পাপ স্পর্শ করে না এবং শেষে সিদ্ধি লাভও হয়। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, এই নশ্বর দৃশ্য জগতের বাহিরে যাইয়া আত্মানাত্মবিচারের গভীর জলে প্রবেশ করা উচিত নহে, এইরূপ (বিশেষতঃ আধুনিক কালে) যাহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে, তাহারা ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ চরম সাধ্য বিষয়ের উচ্চ পৈঠা ছাড়িয়া দিয়া মানবজাতির কল্যাণ কিংবা সর্ব্বভূতহিত ইত্যাদি নিম্ন পৈঠার আধিভৌতিক দৃশ্য (কিন্তু অনিত্য) তত্ত্ব হইতেই স্বকীয় নীতিশাস্ত্রের আলোচনা সুরু করিয়া থাকে। মনে রেখো যে, কোন গাছের ডগা ভাঙিয়া দিলে সেই গাছকে যেরূপ নূতন বলিতে পারা যায় না, সেইরূপ আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের গঠিত নীতিশাস্ত্র অঙ্গহীন বা অপূর্ণ হইলেও নূতন হইতে পারে না। আমাদের দেশে, ব্রহ্মাত্মৈক্য স্বীকার না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য যাঁহারা মানেন সেই সাংখ্যশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরাও দৃশ্য জগতের ধারণপোষণ ও বিনাশ কোন্ কোন্ গুণের দ্বারা হয় তাহা দেখিয়া, সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণের লক্ষণ স্থির করিয়াছেন; এবং তন্মধ্যে সাত্ত্বিক সদ্‌গুণের পরম উৎকর্ষ করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য এবং তাহা দ্বারাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভ হয় এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার ১৭ ও ১৮ অধ্যায়ে কিছু হেরফের করিয়া এই অর্থই বর্ণিত হইয়াছে।* সাত্ত্বিক সদ্‌গুণের পরম উৎকর্ষই বল, কিংবা (আধিভৌতিক মতবাদ অনুসারে) পরোপকার-বুদ্ধির ও মনুষ্যত্বের বৃদ্ধিই বল, অর্থ একই। মহাভারতে ও গীতায় এই সমস্ত আধিভৌতিক তত্ত্বের স্পষ্ট উল্লেখ তো আছেই এমন কি, মহাভারতে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, ধর্ম্মাধর্ম্মনিয়মের লৌকিক কিংবা বাহ্য উপযোগ কি, তাহার বিচার করিলে জানা যায় যে, এই নীতিধর্ম্ম সর্ব্বভূতহিতার্থ অর্থাৎ লোকের কল্যাণার্থই হয়। কিন্তু অব্যক্তের উপর অবিশ্বাস থাকায়, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে কার্য্যাকার্য্যনির্ণয় পক্ষে আধিভৌতিক তত্ত্ব অপূর্ণ ইহা জানিয়াই নিরর্থক শব্দজাল বাড়াইয়া পাশ্চাত্য আধিভৌতিক পণ্ডিতগণ ব্যক্তের দ্বারাই কোনপ্রকারে কাজ চালাইয়া লয়েন। গীতাতে সেরূপ না করিয়া, এই তত্ত্বপরম্পরাকে পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডের মূল অব্যক্ত ও নিত্য তত্ত্ব পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া মোক্ষ, নীতিধর্ম্ম ও ব্যবহারেরও (এই তিনেরও) তত্ত্বজ্ঞান অনুসারে ভগবান্ পূর্ণ সমন্বয় সাধন করিয়া গিয়াছেন; এবং তৎপ্রযুক্ত গীতায় আরম্ভে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, কার্য্যাকার্য্যনির্ণয়ার্থ যে ধর্ম্মের কথা উক্ত হইয়াছে তাহাই মোক্ষপ্রদানেও সমর্থ (মভা. অশ্ব. ১৬. ১২)। মোক্ষধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র, কিংবা অধ্যাত্মজ্ঞান ও নীতি—ইহাদের জোড় বাঁধিয়া দিবার কোন কারণ নাই, এইরূপ যাহাদিগের মত তাহারা এই উপপাদনের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যাহারা এই সম্বন্ধে উদাসীন নহে এরূপ সকল লোকই গীতার কর্ম্মযোগের প্রতিপাদনকে আধিভৌতিক বিচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও গ্রাহ্য বলিয়া মনে করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের ন্যায়

* বাবু কিশোরীলাল সরকার এম-এ, বি-এল্—The Hindu System of Moral Science নামক যে এক ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা এই প্রকার অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছে।

অধ্যাত্মজ্ঞানের বৃদ্ধি প্রাচীন কালে অন্য কোথাও হয় নাই বলিয়া, সর্ব্ব প্রথম অন্য কোন দেশেই কর্ম্মযোগের এইপ্রকার আধ্যাত্মিক উপপাদন হইতে পারে নাই এবং ইহা জানাই আছে যে, এইরূপ উপপাদন কোথাও পাওয়াও যায় না।

এই সংসার অশাশ্বত হওয়ায় তাহাতে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক, ইহা স্বীকার করিলেও (গী. ৯. ৩৩) গীতাতে এই যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে "কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ"—সাংসারিক সমস্ত কর্ম্ম কোন এক সময়ে ত্যাগ করা অপেক্ষা, সেই কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে লোক-কল্যাণার্থ করাই অধিক শ্রেয়স্কর (গী. ৩. ৮; ৫. ২),—তাহার সাধক-বাধক কারণের বিচার পূর্ব্বে ১১ প্রকরণে করা হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য কর্ম্মযোগের সহিত গীতার এই কর্ম্মযোগের কিংবা পাশ্চাত্য কর্ম্মত্যাগ পক্ষের সহিত আমাদের প্রাচ্য সন্ন্যাসমার্গের তুলনা করিবার সময় ঠিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটু বেশী খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক মনে হয়। দুঃখময় ও অসার সংসার হইতে নিবৃত্ত না হইলে মোক্ষলাভ হয় না, এই মত বৈদিক ধর্ম্মে প্রথমে উপনিষৎকারেরা ও সাংখ্যেরা প্রচলিত করেন। তৎপূর্ব্বের বৈদিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডাত্মকই ছিল। কিন্তু বৈদিকেতর ধর্ম্মের বিচার করিলে, তাহাদের অনেকের মধ্যেই প্রথম হইতেই সন্ন্যাসমার্গ স্বীকৃত হইয়াছে এইরূপ দেখা যায়। উদাহরণ যথা—জৈন ও বৌদ্ধ এই দুই ধর্ম্ম মূলতঃ নিবৃত্তিমূলক; খৃষ্টের উপদেশও তাহাই। "সংসার ত্যাগ করিয়া যতিধর্ম্মানুসারে অবস্থিতি করিবে এবং স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, এবং তাহাদের সহিত কথাও কহিবে না" বুদ্ধের নিজ শিষ্যদের প্রতি এই যে উপদেশ আছে (মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত ৫. ২৩), মূল খৃষ্টধর্ম্মেরও উক্তি ঠিক সেইরূপ। "তুমি আপন প্রতিবেশীকে নিজের মতই প্রীতি করিবে" এইরূপ খৃষ্ট (মাথ্যু. ১৯. ১৯) বলিয়াছেন সত্য; আবার "তুমি যাহা আহার কর, যাহা পান কর, যাহা কিছু কর, সমস্ত ঈশ্বরের জন্য কর" এইরূপ পল্ বলিয়াছেন সত্য (১ কোরিন্ ১০. ৩১); এবং এই দুই উপদেশ আত্মৌপম্য-বুদ্ধিতে ঈশ্বরার্পণপূর্ব্বক কর্ম্ম করিবার যে উপদেশ গীতায় আছে, তাহারই সদৃশ (গী. ৬. ২৯ এবং ৯. ২৭)। কিন্তু ইহারই দ্বারা গীতাধর্ম্মের ন্যায় খৃষ্টধর্ম্ম যে প্রবৃত্তিমূলক, তাহা সিদ্ধ হয় না; কারণ, অমৃতত্ব লাভ করিয়া মনুষ্য মুক্ত হউক—ইহা খৃষ্টধর্ম্মেরও চরম সাধ্য; এবং এই সাধ্য, ঘরদ্বার না ছাড়িলে প্রাপ্ত হওয়া যায় না এইরূপ প্রতিপাদন করায় খৃষ্টের মূল ধর্ম্ম সন্ন্যাসমূলকই বলিতে হইবে। খৃষ্ট নিজে শেষপর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। এক সময়ে এক গৃহস্থ তাঁহাকে প্রশ্ন করিল যে, "পিতামাতাকে কিংবা প্রতিবেশীকে প্রীতি করিবার ধর্ম্ম যাবজ্জীবন আমি পালন করিয়া আসিতেছি; এক্ষণে অমৃতত্ব লাভের কি উপায় আছে তাহা আমাকে বল", তখন "ঘরদ্বার বেচিয়া ফেলিয়া কিংবা গরীবদিগকে দান করিয়া তুমি আমার ভক্ত হও" এইরূপ খৃষ্ট তাহাকে স্পষ্ট জবাব দিয়াছিলেন (মাথ্যু. ১৯. ১৬-৩০ এবং মার্ক. ১৯. ২১-৩১); এবং তাহার পর তখনই নিজ শিষ্যদের দিকে ফিরিয়া তাহাদিগকে এইরূপ বলিলেন যে "উট ছুঁচের ছিদ্রের মধ্য দিয়াও গলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে ধনীদের প্রবেশ লাভ করা কঠিন।" "অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেন" (বৃ. ২. ৪. ২)—অর্থের দ্বারা অমৃতত্ব মিলিবার আশা নাই—এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা তাহারই নকল এইরূপ বলিতে বাধা নাই। অমৃতত্ব লাভের পক্ষে সাংসারিক কর্ম্ম ত্যাগের আবশ্যকতা নাই, তাহা নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিলেই হইল, গীতার ন্যায় খৃষ্ট কোথাও এইরূপ উপদেশ করেন নাই। বরং ইহার বিপরীতে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে, ঐহিক সম্পত্তি ও পরমেশ্বর এই দুয়ের মধ্যে স্থায়ী বিরোধ আছে (মাথ্যু. ৬. ২৪) বলিয়া "পিতামাতা, ঘরদ্বার, স্ত্রীপুত্র, ভাইবোন এমন কি নিজের জীবনেরও প্রতি দ্বেষ করিয়া যে ব্যক্তি আমার অনুগামী হয় না, সে আমার ভক্ত কখনই হইতে পারে না (লুক. ১৪. ২৬-৩৩)। আবার "স্ত্রীলোককে স্পর্শ পর্য্যন্ত না করাই উত্তমকল্প" (১ কারিং ৭. ১) এইরূপ খৃষ্টের শিষ্য পলের স্পষ্ট উপদেশ আছে। সেইরূপ আবার "আমার জননী * মাতা আমার কে? আমার চতুঃপার্শ্বস্থ ঈশ্বরভক্ত লোকেরাই আমার পিতা মাতা ও বন্ধু" (মাথ্যু. ১২. ৪৬-৫০) খৃষ্টের মুখ হইতে নির্গত এই বাক্য এবং "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ" এই বৃহদারণ্যকোপনিষদের সন্ন্যাসবিষয়ক বচন (বৃ. ৪. ৪. ২২) এই দুয়ের মধ্যে খুব সাদৃশ্য আছে, তাহা আমি দেখাইয়াছি। স্বয়ং বাইবেলেরই এই বাক্যসমূহ হইতে, সিদ্ধ হইতেছে যে, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় খৃষ্টধর্ম্মও আরম্ভে সংসারত্যাগবাদী অর্থাৎ সন্ন্যাসমূলক; এবং খৃষ্টধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাস দেখিলেও এইরূপ দেখা যায় যে, "খৃষ্টভক্তেরা পয়সাকড়ি না রাখিয়া অবস্থিতি করিবে" (মাথ্যু. ১০. ৯-১৫) খৃষ্টের এই উপদেশ অনুসারেই প্রথমে খৃষ্টধর্ম্মোপদেশক বৈরাগ্য অবলম্বনে জীবন যাপন করিতেন। †

* সন্ন্যাসমার্গীদিগের ইহাই নিত্য উপদেশ। "কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ" শঙ্করাচার্য্যের এই শ্লোক প্রসিদ্ধ; এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে (৬. ৪৫) বুদ্ধের মুখ দিয়া কাহং মাতুঃ ক সা মম" এইরূপ উক্তি বাহির হইবার বর্ণনা আছে।

† See Paulsen's *System of Ethics*, (Eng. trans.) Book I. Chap. 2-3. esp. pp. 89-97. "The new (Christian) converts seemed to renounce their family and country.. their gloomy and austere aspect, their abhorrence of the common business and pleasures of life and their frequent predictions of impending calamities inspired the pagans with the apprehension of some danger which would arise from the new sect." *Historian's History of the World*, Vol. VI, P. 318. জর্ম্মন কবি গ্যটের Faust (ফৌষ্ট) নামক কাব্যে "Thou shalt renounce! That is the eternal song which rings in every ones ears; which, our whole life long every hour is hoarsely singing to us" এই উচ্চ্ গোক্তি বাহির হইয়াছে। (Faust, part I, II. 1195-1198). মূল খৃষ্টধর্ম্ম সন্ন্যাসমূলক ছিল এই সম্বন্ধে আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

খৃষ্টধর্ম্মোপদেশকদিগের এবং খৃষ্টভক্তদিগের মধ্যে সংসারে থাকিবার যে রীতি দেখা যায়, তাহা পরবর্ত্তী সমাজ-সংস্কারের ফল, মূল খৃষ্টধর্ম্মের স্বরূপ নহে। অদ্যাপিও শোপেনহৌয়েরের ন্যায় বিধান সংসার দুঃখময় অতএব ত্যাজ্য এইরূপ প্রতিপাদন করেন; এবং গ্রীসদেশে প্রাচীনকালে তত্ত্ববিচারেই নিজের জীবন অতিবাহিত করা, কিংবা লোককল্যাণার্থ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন করা শ্রেষ্ঠ—এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সারকথা—পাশ্চাত্যদিগের এই কর্ম্মত্যাগ-মতবাদ এবং আমাদিগের সন্ন্যাসমার্গ কোন কোন অংশে একই; এবং এই মার্গের সমর্থন করিবার পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পদ্ধতিও একই।

ভারতীয়
গুপ্ত পাণ্ডুলিপির পুনরুদ্ধার।

উপাদানের অভাববশতঃ ভারত ইতিহাসের পাঠকবর্গ স্বতঃই হতাশ হইয়া আসিতেছেন। ফলতঃ ভাবের প্রসারতা এবং চরিত্রের নিকর্ষতা সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইতে পারে, এরূপ জাতীয় উপকরণের বিপুল আয়োজন তাহাদের নাই। তাহাদের সম্বল যে একেবারে ক্ষুদ্র সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পাণ্ডুলিপিত দূরের কথা, মুদ্রিত কোন গ্রন্থ সংগ্রহও নিতান্ত কষ্টসাধ্য। সুতরাং ভারত ইতিহাসের উন্নতি-কল্পে উপকরণ সংগ্রহের বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল এবং বাঁকীপুরের খোদাবক্স লাইব্রেরী এই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্ব্বেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারা যে সুযোগটুকু সম্মুখে ধরিতেছেন গবেষণাকারীগণ সেই সুবিধার সম্যক সদ্ব্যবহারের ক্রটী করিতেছেন না। আধুনিক যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি লিখিত হইতেছে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশই এই সকল লাইব্রেরী এবং কতিপয় বে সরকারী লাইব্রেরীর শুভ অনুষ্ঠানের ফল প্রসূত। আমি ভরসা করি, যিনি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বে-সরকারী লাইব্রেরীর তিমির গর্ভ হইতে লুপ্ত রত্নরাজি সংগ্রহ করিতে পারিবেন তিনিই শ্রেষ্ঠতর পুরস্কারের প্রকৃত অধিকারী হইবেন। যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বিহারের প্রায় অধিকাংশ জেলাই উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর আদি-স্থান। আমাদের সহিত এখনও এরূপ অনেক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হয় যাহাদের নিকট এইরূপ অমূল্য পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত গ্রন্থরাজি পাওয়া যাইতেছে। বড়ই সমস্যার বিষয় এই যে, এই লাইব্রেরীগুলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত এবং এই সকলের স্বত্বাধিকারীর সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকৃত প্রমাণ সংগ্রহ করা সুদূরপরাহত। যদি আপনার কোন পাঠক ভারত ইতিহাসের যে কোন অধ্যায়ের হিন্দুস্থানী, হিন্দী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, ইংরাজী অথবা পারস্য ভাষায় লিখিত কোন পুরাতন পাণ্ডুলিপির স্বত্বাধিকারী হন, অথবা এরূপ স্বত্বাধিকারীর সহিত পরিচিত থাকেন, তাহা হইলে আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব। আমরা সেই মুদ্রিত পুস্তক অথবা পাণ্ডুলিপির জন্য উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি। যদি তাহারা উহা হস্তান্তর করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সেই পাণ্ডুলিপির অনুলিপি প্রস্তুত করিবার অনুমতির জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত ভাতা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। দয়া করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় চিঠিপত্রাদি প্রেরণকরিবেন।

ডক্টর্ এস, এ, খাঁ; এম্-এ, ইউনিভারসিটির ইতিহাসের অধ্যাপক, এলাহাবাদ, ইউ, পি।

ধারবারের মেডিক্যাল মিশন।

ধারবারের মেডিক্যাল মিশনের কার্য্য কি প্রকার চলিতেছে তাহা অনেকেই জানিতে ইচ্ছা করেন। সেই নিমিত্ত স্থানীয় এসিষ্টান্ট জজ্ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন আই, সি, এস মহাশয় মিশন সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Mr. K. P. Biswas founded the Brahmo Medical Mission at Dharwar nearly 2 years ago, one object of which was the supply of Homoeopathic medicines to the public free. In this object he has been eminently successful, as within a short time the cures effected by him procured him such a reputation that he began to get patients daily from all parts of the district and some from even longer distance. The number of patients he has treated up to date is about 11,000 and among these have been some who had been given up by the local practitioners. Mr. Biswas has carried on this work singlehanded as a labour of love, largely with his own funds, and only partially helped with public subscriptions.

শোক-সংবাদ।

৺প্রসন্নকুমার বিশ্বাস। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস বিগত ২৯শে চৈত্র প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে বিসূচিকা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। শেষ বয়স পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে উপাসনায় যোগ দিতেন। তাঁহার নিষ্ঠা ও চরিত্রের বল জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করিত। তিনি খ্যাতনামা ৺ব্রজসুন্দর মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং ঐ বিবাহ আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়; তাহা প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বের কথা। আজ কয়েক মাস হইল তাঁহার একমাত্র পুত্র ও একটী পৌত্রের অকাল মৃত্যুতে অন্তরে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহারই ফলে শরীর ভগ্ন হইয়া যায়। এক্ষণে তাঁহার দুইটী নাবালক পৌত্র তাহাদের মাতা ও পিতামহীর আশ্রয়ে রহিয়াছে। প্রসন্নবাবু বহুকাল ধরিয়া মহর্ষির সংসারে কার্য্য করিয়াছেন, এবং বৈষয়িক গুরুভার তাঁহারই উপরে বহুল পরিমাণে ন্যস্ত ছিল। তিনি একদিনের জন্যও কর্ত্তব্যচ্যুত হন নাই। মহর্ষিদেব এ কারণে তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। আমরা পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি।
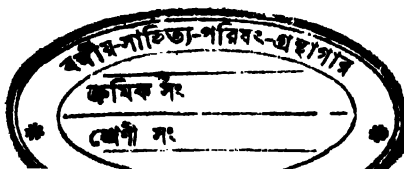
বিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৯২

৯৩৬ সংখ্যা ১৮৪৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঈশ্বরী প্রেরণা।

(ডাক্তার সার রামকৃষ্ণ জি ভাণ্ডারকর লিখিত প্রবন্ধের
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদ)

ভক্ত ভগবন্তীঁ অনন্য। ত্যাগী বুদ্ধি দে তো আপণ॥
যদর্থী ভগবদ্‌বচন। সাধব ঐকা॥ ১॥

দাসবোধ।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১॥

ভগবদ্‌গীতা।

"সতত একচিত্ত হইয়া, প্রেমপুরঃসর আমাকে যাহারা ভজনা করে তাহাদিগকে আমি এইরূপ বুদ্ধি দেই যে, তাহার যোগে তাহারা আমার নিকট আগমন করে।"

পরমেশ্বর মনুষ্যের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া, অন্তঃকরণের অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার নিরস্ত করিয়া জ্ঞানরূপ জ্যোতি প্রকাশ করেন। পাপ ও ক্ষুদ্র চিন্তা বিনষ্ট করিয়া মঙ্গলভাব ও উন্নত চিন্তা উৎপন্ন করেন। দুঃখের পরিমার্জ্জন করিয়া আনন্দ-বৃত্তি আবির্ভূত করেন। কোন মনুষ্যের এইরূপ অবস্থা হইলে, অন্য মনুষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে ঠিক্ পথে আনিবার অধিকার তাঁহারা প্রাপ্ত হন। পরমেশ্বর যাহাতে আমাদের অন্তঃকরণে এইরূপে প্রবেশ করিতে পারেন, তজ্জন্য কি করা আবশ্যক? ভজন করা আবশ্যক—এইরূপ উপরি-উক্ত শ্লোকের অভিপ্রায়। ভজন অর্থাৎ পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তন করা, তাঁহার স্বরূপের প্রতি লক্ষ্য করা এবং আমাদের নিজের দোষ দেখিয়া অনুতপ্ত হইয়া উহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা। এই ব্যাপার উচিত-মত সাধন করিয়া যাহাতে ইষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তজ্জন্য ঐ ভজন নিষ্কপট হওয়া আবশ্যক। প্রথমত আমাদের অন্তঃকরণে বিনম্র-ভাব উদিত হওয়া আবশ্যক। যাহার হৃদয়ে এত-টুকুও অহঙ্কার অবস্থিতি করে; আমার ভিতরে অমুক গুণ আছে যাহা অন্যের নাই, এই জন্য আমার যোগ্যতা বেশী এইরূপ যে মনে করে, এবং এই ধারণা স্পষ্টরূপে না থাকিলেও, অস্পষ্ট ভাবেও যদি কাহারও অন্তঃকরণে থাকে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অন্তঃকরণের মধ্যে পরমেশ্বর প্রবেশ করেন না। আমার ভিতর অন্য অপেক্ষা অধিক গুণ থাকিলেও আমার ভিতর এত দোষও আছে যে, সেই গুণসমূহ হইতে আমার মহত্ত্ব হয় না। পরমেশ্বরে যে অনন্ত গুণ অধিষ্ঠিত, তাহার সহিত তুলনা করিলে, এই যে আমার ও অপরের মধ্যে প্রভেদ তাহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অদৃশ্য অণুরেণু সদৃশ; এবং আমার ন্যায় পাপী, অনন্ত দোষসমন্বিত, অজ্ঞানী, যে আপনার ভ্রান্তিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, যে অত্যন্ত দুর্ব্বল জীব, সেই আমার অন্তঃ-করণে এইরূপ অভিমান পোষণ করা সর্ব্বথা অযোগ্য ও উপহাসাস্পদ—এইরূপ যাহার মনো-

ভাব সেই মনুষ্য বিনম্র। এই বিনম্রভাব আবির্ভূত হইলে; এবং পরমেশ্বরের মহিমা অবর্ণনীয় ও অত্যন্ত রমণীয়—এই বিশাল অসীম বিশ্ব তাহার সাক্ষ্য দিতেছে,—পূর্ণ মঙ্গলনিদান তিনি, আনন্দময় পরমাত্মা তিনি, আমার বৎসল পিতামাতা তিনিই, তাঁহার সন্নিহিত হওয়া, তাঁহার দর্শনলাভ করাই আমার সুখ,—এইরূপ অন্তঃকরণের ভাব হইলে, সেই মনুষ্যের ভজন অকপট ভজন ও প্রীতিপূর্ণ ভজন হইয়াছে বলা যাইতে পারে। তাঁহাকে পাওয়া ছাড়া আমার অন্য কর্ত্তব্য নাই, তাঁহার উপরেই আমার সমস্ত আশাভরসা, তিনি যাহা করেন তাহাই শুভ, তিনিই আমার সুখদাতা; আমার পরম মাতা;—আমার উপর স্নেহ অজস্র ধারে বর্ষণ করিতেছেন, তাঁহা হইতে আমার কণামাত্রও অনিষ্ট হইতে পারে না; পরমেশ্বরের ইচ্ছাই প্রমাণরূপে আমার শিরোধার্য্য, এইরূপ ভাবনা যাহার অন্তঃকরণে দৃঢ় হইয়াছে, এবং যে ব্যক্তি সেই অনুসারে চলে, সে-ই পরমেশ্বরে অনন্যচিত্ত হইয়াছে, সে অনন্যভাবে তাঁহার শরণ লইয়াছে, —এইরূপ বলা যাইতে পারে। এইরূপ মনুষ্যের অন্তঃকরণে সেই সত্যস্বরূপ, পরম সুন্দর, অনাদ্যনন্ত, মঙ্গলময় পরমাত্মা আবির্ভূত হন। কিন্তু যাহার অন্তঃকরণ এইরূপ বিনম্র হয় নাই, যাহার ভজন প্রীতিপূর্ণ নহে, যে ভগবানে অনন্যচিত্ত হয় নাই, সে যতই উপাসনা করুক, যতই ভজন করুক, যতই প্রার্থনা করুক, তথাপি তাহা বাহ্যোপচার মাত্র, তাহার যোগে হৃদয়-ভাবের পরিবর্ত্তন হয় না, অন্তঃকরণে পরমেশ্বর ও সত্যের প্রবেশ হয় না;—

"সপ্রেম সদ্ভাবে সংপূর্ণ। নিত্য করিতাঁ নামস্মরণ ॥
বৃত্তি পালটতি আপন। তেঁহী বচন ঐক ৱায়া ॥
নায়া সরিসাচ হরী। ৱিদ্যে হৃদয় মাঝারী ॥
তেনেঁ থাকে অভ্যন্তরী। হোঁ লাগে পূর্ণ হৃদয় শুদ্ধী ॥"

একনাথী ভাগবত।

অতএব, আপন মতের জয় হইবে বলিয়া কোন মনুষ্যকে হত্যা করা, কিংবা কোন অশুভ কাজ করা, অথবা আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য অসঙ্গত অন্যায় আচরণ করা এবং তাহার পর বলা যে, এই সমস্ত ঈশ্বর আমাকে করিতে বলিয়াছেন—এ কথা সর্ব্বথা মিথ্যা। এই প্রকার মনুষ্য, আপন কাম ক্রোধ ও দুরভিমান-প্রণোদিত কার্য্যকে ঈশ্বর-আদিষ্ট মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয় এবং কাম ক্রোধ ও দুরভিমানই তাহার ঈশ্বর হইয়া দাঁড়ায়। হত্যা কিংবা অন্য অশুভ ও অন্যায় কাজ করিতে ঈশ্বর কখনই প্রেরণা করেন না। মনুষ্যের বুদ্ধিতে ঈশ্বরের প্রেরণা আসিবার জন্য যে বিনম্রতা, প্রীতিপূর্ণ ভজন ও অনন্যচিত্ততা আবশ্যক তাহা তাহার চিত্তে নাই, সুতরাং তাহার বুদ্ধির উপর ঈশ্বরী প্রেরণা হয় না। এইরূপ মন্দ কাজ করিয়া যে মনে করে তাহার উপর পরমেশ্বরের প্রেরণা হইয়াছে, এ যেরূপ অগ্রাহ্য, সেইরূপ, পরমেশ্বরের কোন প্রকার প্রেরণাই মনুষ্যের বুদ্ধির উপর হয় না যাহারা মনে করে তাহাদেরও কথা অগ্রাহ্য। পরমেশ্বর অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধিযোগ দেন সত্য; কিন্তু এই ব্যাপার ঘটিবার জন্য, যে বচন উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার কথা-মত আমাদের অন্তঃকরণের ভাব প্রথমত হওয়া চাই।

দুঃখ-বরণ।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

রাগিণী পিলু বারোয়াঁ—একতালা।

তুমি যদি দাও দুখ্
দুখ নাই তায় দুখ নাই!
হরি' যদি লও সুখ
দুখ নাই তায় দুখ নাই!
তুমি যদি ফেল আঁধারে
বিপদ-কুটিল পাথারে,
নাম যদি নয়নাসারে
দুখ নাই তায় দুখ নাই!
যদি না মুছাও আঁখিজল
দুখ নাই তায় দুখ নাই!
হান বিষবাণ অবিরল
দুখ নাই তায় দুখ নাই!
যদি মৃত্যুরে আন দ্বারে
নাম বজ্র-বেদন-ধারে
পার তোমা বারে বারে
দুখ নাই তায় দুখ নাই ॥

ঐক্য-সাধন।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বিশ্বের মহাবাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজার উপকরণ কেবলমাত্র শ্বেত পুষ্পচন্দনে নহে; কিন্তু সুকুমার কলাবিদ্যার উপরে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিকাশে। তাই তাঁহার পূজাক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সকল জাতির শুভ সম্মিলন সম্ভবপর। মুসলমানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরৎ মহম্মদ একস্থানে বলিয়াছেন যে, লেখকের লেখনীর প্রান্তস্থিত মসীবিন্দু জীবন উৎসর্গকারী ধর্ম্মবীরের রক্তকণা অপেক্ষাও সমধিক মূল্যবান। এক মহামিলনের সুর চারিদিক হইতে বিনির্গত হইতেছে। সেই আহ্বানের ডাক শুনিয়া আমাদের হৃদয়ের ভাবকে বিরাট হইতে বিরাটতর করিয়া তুলিতে হইবে, আমাদের আচরণকে সুমিষ্টতর করিয়া লইতে হইবে। আমাদের দেশে যে সমস্ত পর্ব্বাহ প্রচলিত, তাহার কোন কোন অংশে সকল জাতির মিলনের যে একটী স্থান আছে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে, পরস্পরকে চিনিয়া লইতে হইবে। আমরা নানা সম্প্রদায়ে খণ্ডিত, এ কথা সত্য হইলেও, একদিকে হিমাচল, অন্যদিকে পূর্ব্বঘাট, পশ্চিম ঘাট, দক্ষিণে ও বামে বিশাল বারিধি, পাষাণপ্রাচীরে অম্বুধির বেষ্টনীতে আমাদিগকে চারিভিত হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। একই রাজার বিজয়-নিশান মস্তকের উপরে উড্ডীন হইয়া মিলনের মন্ত্রে আমাদিগকে দীক্ষাদান করিতেছে। বহুশতাব্দীর প্রাচীন স্মৃতি বহন করিয়া একই স্বার্থের পশ্চাতে অনেক বিষয়ে আমরা প্রধাবিত। তাই মিলনের ভাব অজ্ঞাতসারে অনেক দিন হইতে আমাদের মধ্যে কার্য্য করিতেছে।

মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে বাদসাহগণ আমাদের দেশীয় কলাবিদ্যাকে উপেক্ষার চক্ষে অবলোকন করেন নাই। তাঁহারা হিন্দুর স্থাপত্যবিদ্যার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে আপনাদের নিপুণতাকে চরম সার্থকতা দান করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর সঙ্গীতকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারা তাহাকে এতই স্ফূর্ত্তিদান করিয়া গিয়াছেন যে তাহা আলোচনা করিতে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাই। কি রণে কি রাজ্যশাসনে হিন্দুর মন্ত্রীত্ব ও অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া আপনাদের রাজ্যের পরিধিকে হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দুর বিনয় ও ঔদার্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া নিজজাতিসুলভ কঠোরতা পরিহার করিয়া আপনাদের নবার্জ্জিত শীলতাকে ভাষায় ও আচরণে এমনই শোভনভাবে মুক্তিদান করিয়াছিলেন যে বিজয়ী-বিজেতার ব্যক্তিগত সঙ্কোচের ভাব তিরোহিত হইয়াছিল।

আমরা এ কথা বলিতে চাহি না যে বিভিন্ন জাতি এক জাতিতে পরিণত হইয়া এক বিরাট সম্প্রদায়ের গণ্ডীর ভিতরে স্থান লাভ করিবে। জ্ঞান, সাধন ও বিবিধ বৈচিত্র্যজনিত পার্থক্য ও মতদ্বৈধ সংসারে চিরকালই রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে। এই বৈচিত্র্যময় সংসারে মিলনের সুর যতটুকু বাহির করিতে পারি, তাহাতেই আমাদের জীবনকে ধন্য করিতে হইবে। অমিলের হলাহল বাহির হইয়া পরস্পরের সর্ব্বনাশ সাধন না করে, কণ্টকের আঘাতে পরস্পরকে বিদ্ধ না করে। চিন্তায়, ভাবে, কলাবিদ্যার আলোচনায়, সাহিত্য-বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাহাতে সাম্যের বন্ধন পরস্পরকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে, আমরা সেই সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য লালায়িত।

আমাদের দেশে নানা সম্প্রদায় বিদ্যমান। ভাগ্যবলে বিভিন্ন জাতির প্রতিবেশী লইয়া আমাদের সামাজিক জীবন কখনও সে ভাবে বিপন্ন হয় না। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন স্থানে ধর্ম্মোন্মাদের প্রাবল্যে প্রতিবেশীর রক্তে ধরাগাত্র কলঙ্কিত হইলেও তাহার অন্তরালে অন্য কারণ বিদ্যমান। সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া, জ্ঞানের আলোকে গন্তব্য পথ ভাস্বর করিয়া মিলনের সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এখানে যদি পরস্পর হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইতে পারি, তবেই পরিণামে ভগবানের সঙ্গে মিলনের আশা রাখিতে পারিব। অনৈক্যের অমিলের সাধনে সে আশা সুদূরপরাহত।

আজকাল মিলনের সুতান চারিদিক হইতে বাহির হইয়া সকলকে বিমোহিত করিয়া তুলিতেছে। ফলতঃ যাঁহারা মিলনের ভাব আমাদের মধ্যে সত্য

সত্যই জাগাইয়া তোলেন, তাঁহাদের মধ্যে কবির স্থান অতি উচ্চে। তাঁহারা প্রেরণা লাভ করিয়া কাব্যে যাহা নিস্যন্দিত করিয়া যান, তাহার হিল্লোলে জাতীয় চরিত্র মিলনের দিকে বিকশিত হইবার শুভ সুযোগ প্রাপ্ত হয়। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে রঙ্গলালের কণ্ঠ হইতে যে উচ্ছ্বাস বাহির হইয়াছিল, বর্ত্তমান দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিতরে তাহারই প্রতিধ্বনি বিরাজমান! মাইকেলের গুরুগম্ভীর মন্ত্রধ্বনি ও ভাবের প্রবাহ দূর-দূরান্তরে অবস্থিত শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের ভিতরে অনুরূপ চেতনার উদ্রেক করে। হেমচন্দ্রের দীপক রাগিণী জাতিনির্ব্বিশেষে জড়তাকে ক্ষণিকের জন্য অপসারিত করিয়া দেয়। কাব্যজগতে রবীন্দ্রনাথের নব নব মাধুরী অন্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারগুচ্ছকে ঝঙ্কৃত করিয়া যে অপূর্ব্ব নিনাদ বাহির করিয়াছে, তাহাতে কেবল বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র জগত বিভোর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া বঙ্গের উপরে সমগ্র জগতের প্রসন্ন দৃষ্টি সমাকৃষ্ট করিয়াছে।

এই সকল কবিতা যাহার ছায়া, সেইই বিশ্বকাব্যের যিনি দেবতা, তাঁহারই নামে আমরা সকলকে ডাকিয়া আনির। তাঁহার পূজা কেবল একদিনের জন্য নহে; ইহা যে উদ্‌যাপনহীন ব্রত। চিরজীবন ধরিয়া ইঁহার আরাধনা করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন একটি দিন কখনও কি সমুদিত হইবে না, যেদিন আমরা ইঁহার চরণে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া চিরকৃতার্থ হইতে পারিব? ইঁহারই সাধনে আমাদের মধ্যে জাতীয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, হৃদয় মধুময় হইবে, শোক-সন্তাপের জ্বালা নির্ব্বাপিত হইবে, ঐক্য ও মিলন জাগিয়া উঠিবে, শিল্পকলার বিকাশে ধনধান্যে চির দরিদ্র ভারতের অঙ্গন ভরিয়া উঠিবে, সুশোভন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় দিক্-বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইবে, প্রাণের লক্ষণ চারিদিকে সুব্যক্ত হইয়া উঠিবে।

মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যম্।

(স্বাস্থ্য-সমাচার বৈশাখ ১৩২৮)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুবিখ্যাত ডাক্তার জে, এইচ, কেলগ (J. H. Kellogg, M. D,) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ Man the Masterpiece নামক গ্রন্থের The Rum Family নামক প্রস্তাবটি এইভাবে আরম্ভ করিয়াছেন—

"No calamity can befall a quiet, peacefull community than to have a bad family move into it. But no neighbourhood ever suffered more from the bad influence of a family of wicked persons than from the effects invariably produced in any city or village by the advent of the rum family, with its numerous progeny of vices, irregularities, and crimes. We propose to devote this chapter to a consideration of the leading traits and characteristics of the rum family, and to make our readers sufficiently well acquainted with the various members of the family to convince them that they are all unsafe associates for young men, or indeed for any one who wishes to maintain his self-respect and his standing as a useful member of society."

অর্থাৎ, কোন একটী শান্তিপ্রিয় নিরীহ সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কোন অসৎ পরিবার আসিয়া প্রবেশ করে, তাহা হইলে, ইহার অপেক্ষা অধিকতর বিপদ ঐ সম্প্রদায়ের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু দুষ্ট লোকদের দ্বারা গঠিত পরিবার হইতে কোন পল্লীর যতই অনিষ্ট হউক,—কোন নগরে বা গ্রামে রম মদ্য ও তৎপরিবারের উদয়ের দরুণ যে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহার তুলনায় উহা কিছুই নয়। এই রম পরিবার,—যত কিছু পাপ, অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা আছে—তাহাদের সকলের উৎপত্তির মূল। আমরা এই পরিচ্ছেদে রম পরিবারের নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় গ্রহণ করিব, এবং আমাদের পাঠকগণকে দেখাইব, যে, এই পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা করা যুবকগণের পক্ষে, শুধু যুবক কেন, আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই নিরাপদ নহে।

এরূপ certificate পাইবার জন্য কাহারও হিংসা হয় কি? Dr. Kellogg বলেন, "Each member of the alcohol family is capable of producing poisonous or intoxicating effects." অর্থাৎ সুরাসার-পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই বিষক্রিয়া বা উন্মত্ততা উৎপাদনে সমর্থ। "In fact, they are all poisons, the effects of which have been termed *intoxication*, although the word "intoxication," when strictly

used, means simple poisoning, and is properly applied to the condition of the system when laboring under the influence of any poison whatever." অর্থাৎ, আসল কথা, তাহারা সকলেই বিষ। এই বিষকে উন্মত্ততা বলা হয়। এই কথাটির প্রকৃত অর্থও বিষাক্ত হওয়া; এবং যখন মানব-শরীরে কোনরূপ বিষের ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তখন সেই অবস্থাকে উন্মত্ততা বলিলে অর্থের বিশেষ ব্যতিক্রম হয় না। কেন না, বিষের তেজে লোকে উন্মত্তের ন্যায়ই আচরণ করিয়া থাকে।

মদে যে কত পরিবারের কত ক্ষতি হইয়াছে, কত পরিবারের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কত ধনী ও দরিদ্র গৃহস্থ যে উৎসন্ন গিয়াছে, মানবসমাজের ইতিহাসে তাহার সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কত অপরিণত-বুদ্ধি ধনীসন্তান মদ খাইতে শিখিয়া সমস্ত ধন-সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফকিরী লইতে বাধ্য হইয়াছে। পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি মদ খাইতে শিখিয়া পুত্রকলত্রাদিকে দুঃখ-দারিদ্র্য-সাগরে নিমজ্জিত করিতেছে। কত দরিদ্র শ্রমজীবী তাহাদের সমস্ত উপার্জ্জন মদে খরচ করিয়া ফেলায়, তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন অনাহারে থাকিয়া মাতাল স্বামী, মাতাল পিতার হাতে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইতে হয়। স্বাস্থ্যের ক্ষতি ছাড়া, মদে সমাজেরও যে কত ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব।

সমাজ রক্ষা করা দেশের গবরমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সমাজরক্ষার্থ—চুরি-ডাকাতি নিবারণ কল্পে আইন রচনা করিতে হয়; অপরাধ নিবারণ ও লোক-রক্ষার জন্য পুলিশের বন্দোবস্ত করিতে হয়। সমাজ-রক্ষার্থ অপরাধীদের উপযুক্ত দণ্ডবিধান কল্পে আদালত স্থাপন করিতে হয়। দেশে সংক্রামক ব্যাধি বিস্তৃতি লাভ করিয়া যাহাতে লোকক্ষয় না করে তজ্জন্য আইন রচনা করিয়া বসন্তরোগে বাধ্যতামূলক টীকা লওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়, প্লেগ রোগে সেগ্রিগেশনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

এই সকলের তুলনায় মদে সমাজের সর্ব্বনাশ ও লোকক্ষয়ের পরিমাণ কখনই কম নহে। কিন্তু মদের বেলাতেই কি সরকারের অর্থলোভ এত বেশী হওয়া উচিত, যাহাতে মদের এই সকল অনিষ্টকারিতার কথা চাপা দিয়া রাখিয়া, লোককে মদ্যপানের সুযোগ দিতে হইবে? কেবল ইহাই নয়—প্রজারা যাহাতে মদ্যপানে বিরত না হয় সে পক্ষে বিশেষ রকমের চেষ্টা-চরিত্র, এমন কি উৎপীড়নও হইতেছে বলিয়া শুনিতে পাই। ইহা অতি দুঃখের কথা। এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গরজে পড়িয়া আজকাল শত-সহস্র কণ্ঠে মদের গুণগান আরম্ভ হইয়াছে। এতদিন দেখিতাম, মদ্যব্যবসায়ীরা তাহাদের বিজ্ঞাপনে মদের অজস্র গুণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকে। কিন্তু কালধর্ম্মে আজ ইহাও শুনিতে হইল যে, মদের শুল্ক হ্রাসের আশঙ্কায় সরকারের তরফ হইতেও মদের গুণগান আরম্ভ হইয়াছে! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্। গরজ বড় বালাই!

আশ্চর্য্যের শেষ নাই। মদের গুণকীর্ত্তন উপলক্ষে কত হাস্যকর যুক্তির যে অবতারণা করা হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। হিন্দুর বেদ ও শাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া লোককে মদ্যপানে উৎসাহিত করাও না-কি হইতেছে! বেদের কথার পরে আলোচনা করিতেছি। কিন্তু যদি শাস্ত্রের দোহাই দিতে হয়, তবে মুসলমানের ধর্ম্মশাস্ত্রে মদ্যপান স্পষ্টাক্ষরে নিষিদ্ধ হইয়াছে—সে কথার উল্লেখ করা হইতেছে না কেন? ইহা কি নিরপেক্ষ বিচার? এইবার বেদের কথার আলোচনা করিতেছি। বেদে সোমরস দেবতা ও মনুষ্যের পানীয় ছিল। এই সোমরসকে মদ্য বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। কিন্তু সোমরসে যদিও মত্ততা আনয়ন করে, তথাপি তাহা যে আধুনিক কালের চোলাই করা মদ্যের সমতুল্য তাহার প্রমাণ কোথায়? বেদে কি লেখা আছে যে বৈদিক যুগে দেবতারা ও মনুষ্যগণ আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে distil করা মদ্য সোমরস নামে পান করিতেন? যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, সোমরস সোম নামক একপ্রকার লতা হইতে জাত পানীয় বিশেষ। হয় ত তাহা পান করিলে কিছু মত্ততা জন্মিতে পারিত। কিন্তু তাহা যে চোলাই করা মদ তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। যদি বেদের মতে চলিতে হয়, তাহা হইলে সেই সোমলতা হইতে রস নিষ্কাশন করিয়া পান করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের বৈদিক আমলের সোমলতা যে কি জিনিস তাহা বর্ত্তমান যুগে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাহা ছাড়া, বেদে ব্যবহৃত শব্দ, শ্লোক প্রভৃতির প্রকৃত অর্থ এখন কেহ নির্ভুলরূপে করিতে পারেন না। বেদ-সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা হয়, তাহা অধিকাংশ-স্থলেই আন্দাজি। কারণ, বৈদিক সাহিত্যের অর্থ নির্ণয়ে বড় বড় পণ্ডিতগণের মধ্যেও মতভেদ ঘটিয়া থাকে। সকলেই নিজ নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, উদ্দেশ্য, ও স্বার্থ অনুসারে বৈদিক সাহিত্যের অর্থনির্ণয় করেন, এবং কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল হয় না। এরূপ অবস্থায় বেদোক্ত সোমরসকে মদ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ,

করিলে, সে সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল, একথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

আরও কথা আছে। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগে সমাজের অবস্থা কেমন ছিল, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তখনকার কালে পরদার নিন্দনীয় ছিল না। তাই বলিয়া কি এখনও পরদার সমর্থন করিতে হইবে? তখনকার কালে এখনকার মত জাতিভেদ ছিল না। তাই বলিয়া কি হিন্দুর বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থা উন্টাইয়া দিতে হইবে? তখন যে কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীলোককে গ্রহণ করিতে পারিত; প্রথম প্রথম বিবাহপ্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল না; পরে বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইলেও কিছু দিন একের বিবাহিতা স্ত্রীকে অপর পুরুষ উপভোগ করিতে পারিত; তাহাতে ঐ তিন জনের কেহই সমাজে নিন্দনীয় হইত না। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সেই সকল ব্যবস্থা বর্ত্তমান সমাজে আবার চালাইতে হইবে না কি? তখনকার কালে এক পুরুষের একাধিক পত্নী এবং এক স্ত্রীর একাধিক পতি থাকিত;—তাহাতে কোনই দোষ ছিল না—সমাজে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিত না। সেই নজিরে সেই প্রথা এখন চালাইতে গেলে চলিবে কি? ধর্ম্মশাস্ত্রের খাতিরে বর্ত্তমান সমাজ তাহা মানিতে প্রস্তুত আছে কি? অতএব, যদিই স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, সেকালে মদ্যপানের প্রথা প্রচলিত ছিল, তথাপি, সে ব্যবস্থা যখন বর্ত্তমান কালের সমাজানুমোদিত নহে, তখন ধর্ম্মের ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া লোককে মদ্যপানে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা অন্যায়—অতি অন্যায়।

তার পর, শাস্ত্রের দোহাই যদি দিতেই হয়, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে সব আসবের কথা আছে যাহা চোলাই করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, এবং যাহা কবিরাজেরা ঔষধার্থ মাত্র ব্যবহার করিতেন, এবং যাহা প্রস্তুত করা বর্ত্তমান কালের আবগারি আইন অনুসারে নিষিদ্ধ, সেই সকল আসবকে আবগারি আইনের আমল হইতে নিষ্কৃতি দান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা সম্ভব কি?

আর পুঁথি বাড়াইব না। ধর্ম্মশাস্ত্রে যদি মদ্যপানের বিধি থাকে, তথাপি, আমরা দেখাইব, ধর্ম্মশাস্ত্রে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এবং লোক-ব্যবহারে মদ্যপান স্পষ্টাক্ষরে নিষিদ্ধও হইয়াছে। যে শ্লোকার্দ্ধ লইয়া আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাব আরম্ভ করিয়াছি, তাহা একণে প্রবচনরূপে গণ্য। নিম্নে আমরা শাস্ত্র হইতে ও অন্যান্য স্থল হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে মদ্যপান ধর্ম্মসঙ্গত কি না, তাহা জনসাধারণ এবং আবগারি বিভাগের কর্ত্তারা বিবেচনা করিয়া দেখুন—

ব্রাহ্মণের মদ্যপান করিতে নাই। মদ্যপানে সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়। মহাত্মক শুক্রাচার্য্য সুরার প্রতি এই অভিশাপ-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন,—

"যো ব্রাহ্মণোহদ্য প্রভৃতীহ কশ্চিৎ
মোহাৎ সুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ।
অপেতধর্ম্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যা-
দস্মিঁল্লোকে গর্হিতঃ স্যাৎ পরে চ॥
ময়া চেমাং বিপ্রধর্ম্মোক্তসীমাং
মর্য্যাদাং বৈ স্থাপিতাং সর্ব্বলোকে।
সন্তো বিপ্রাঃ শুশ্রুবাংসো গুরূণাং
দেবা লোকাশ্চোপশৃণ্বন্তু সর্ব্বে॥"

(মহাভারত ১৩৩ অঃ)

আজ হইতে যে ব্রাহ্মণ মোহ হেতু সুরাপান করিবে, সেই মন্দবুদ্ধি ধর্ম্মচ্যুত, ব্রহ্মহত্যা পাতকে লিপ্ত এবং ইহ ও পরলোকে গর্হিত হইবে আমি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বিষয়ে এই সীমা ও মর্য্যাদা জগতে স্থাপন করিলাম। ইহা সাধুগণ, ব্রাহ্মণগণ, দেবগণ, প্রভৃতি শ্রবণ করুন।

রাজনির্ঘণ্টে লিখিত আছে, দ্বিজ ঔষধার্থেও মদ্যপান করিবেন না। এই স্থলে দ্বিজ শব্দ দ্বারা কেবল ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে। এই শ্রেষ্ঠ বর্ণেরই মদ্যপান নিষিদ্ধ। মৃত ব্যক্তি যদি জীবন পায়, তাহা হইলেও ব্রাহ্মণকে মদ্যপান করাইবেন না।

"মদ্যপ্রয়োগং কুর্ব্বন্তি শূদ্রাদিষু মহাভিষক্।
দ্বিজৈস্ত্রিভিস্তু ন গ্রাহ্যং মদ্যমুজ্জীবয়েন্মৃতম্॥

(রাজনিঃ)

পুরাণাদিতেও ব্রাহ্মণের মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"অদেয়মপেয়ঞ্চ তথৈবাস্পৃশ্যমেবচ।
দ্বিজাতীনামনালোচ্যং নিত্যং মদ্যমিতি স্থিতম্॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মদ্যং নিত্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
পীত্বা পততি কর্ম্মভ্যস্ত্বসম্ভাষ্যো দ্বিজোত্তমঃ"

"কূর্ম্ম পুঃ ১৬ অঃ"

দ্বিজাতিদিগের মদ্য অদেয়, অপেয়, অস্পৃশ্য, অতএব দ্বিজাতিগণ অতিশয় যত্ন সহকারে মদ্য পরিত্যাগ করিবেন, যদি কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও মদ্যপান করেন, তবে তিনিও কর্ম্ম হইতে পতিত হন এবং তাঁহার সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করিতে নাই।

গরুড় পুরাণের ২২ অধ্যায়েও দ্বিজাতির মদ্যপানের বিষয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তৎপ্রমাণাদি প্রদর্শিত হইল না।

তন্ত্রমতেও মদ্যপান নিষিদ্ধ—

নারিকেলঞ্চ খার্জ্জুরং পানসঞ্চ তথৈবচ।
ঐক্ষবং মধুকং টাকং তালদৈব চ মাক্ষিকম্॥

ব্রাহ্মন্ত দ্রাক্ষং জ্ঞেয়ং গৌড়ং চৈকাদশং স্মৃতম্।
পৈষ্টঞ্চ দ্বাদশং প্রোক্তং সর্ব্বেষামধমং স্মৃতম্॥
মধ্যমং মধুজং গৌড়ং শেষকোত্তমমিষ্যতে।
এতদ্বাদশকং মদ্যং ন পাতব্যং দ্বিজৈঃ কচিৎ।
ক্ষত্রিয়াদি পিবেৎ সর্ব্বং পৈষ্টীমেকান্ত বর্জ্জয়েৎ॥
সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাৎ কামাৎ তক্রাদি-
মিশ্রিতাম্।
ত্রৈবার্ষিক ব্রতং কুর্য্যাদীষন্মিশ্রে তু বার্ষিকম্॥
তক্রাদিমিশ্রিতাং কিঞ্চিৎ সুরাং পীত্বা হকামতঃ।
কৃচ্ছ্রাব্দপাদমুচ্চার্য্য পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥
মুখপ্রবেশমাত্রন্ত প্রায়শ্চিত্তার্দ্ধমাচরেৎ।
অনুপনীতো সেবেৎ ব্রতং ত্রৈবার্ষিকঞ্চরেৎ॥
(শ্রীমৎস্যসূক্তমহাতন্ত্র চতুর্বিংশতিসাহস্রে ৩৭ পটল)

নারিকেল, খর্জ্জুর, পানস, ঐক্ষব, মধুক, টাঙ্ক, তাল, মাক্ষিক, দ্রাক্ষ, গৌড়, পৈষ্ট ও মধুজ এই দ্বাদশ প্রকার মদ্য। এই দ্বাদশ প্রকার মদ্যই ব্রাহ্মণের অপেয়। এই সকল মদ্যের মধ্যে পৈষ্ট মদ্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, মধুজ ও গৌড় মদ্য মধ্যম। ইহা ভিন্ন আর সকল প্রকার মদ্য উৎকৃষ্ট। ক্ষত্রিয়াদি পৈষ্ট মদ্য ভিন্ন অপর একাদশবিধ মদ্য পান করিতে পারিবে। অনুপনীত ব্যক্তি মদ্য পান করিলে, ত্রৈবার্ষিক ব্রত আচরণ করিবে।

"পৈষ্টীপানে ব্রাহ্মণস্য মরণান্তিকমুচ্যতে।
মাধ্বী-গৌড়ী-সুরাপানে দ্বাদশাব্দং বিধীয়তে॥
ইতরেষান্ত পানেন শুদ্ধিশ্চান্দ্রায়ণেন তু।
রাজন্যবৈশ্যয়োশ্চাপি গৌড়ী মাধ্বী ন শস্যতে॥
মোহাৎ ক্ষত্রশ্চ বৈশ্যশ্চ পীত্বা কৃচ্ছ্রদ্বয়ং চরেৎ।
শূদ্রোহপি গৌড়ীং পৈষ্টীঞ্চ ন পীবেদ্দীনসংস্কৃতাম্॥
কামাৎ পীত্বা সুরাং বিপ্রো মরণান্তিকমাচরেৎ।
চরেচ্চান্দ্রায়ণং জ্ঞানাৎ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব চ॥
পৈষ্টীপানে তু শূদ্রস্য প্রাজাপত্যং বিনির্দ্দিশেৎ।
জ্ঞানাদভ্যাসযোগে তু চান্দ্রায়ণত্রয়ং স্মৃতম্॥"
(মৎস্যসূক্তমহাতন্ত্র চতুর্বিংশতিসহস্রে ৩৬ পটল)

ব্রাহ্মণ পৈষ্টী মদ্য পান করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। মাধ্বী বা গৌড়ী সুরা পানে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত ও অন্য মদ্য সেবনে চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গৌড়ী ও মাধ্বী মদ্য পান করিলে কৃচ্ছ্রব্রতাচরণে শুদ্ধিলাভ করিবে।

মদ্য পান শূদ্রেরও নিষিদ্ধ। শূদ্র পৈষ্টী মদ্য পানে প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিবে। এই সকল প্রায়শ্চিত্ত অজ্ঞানতঃ ও একবার পানে জানিতে হইবে। জ্ঞানপূর্ব্বক সেবনে এবং অভ্যাসে চান্দ্রায়ণত্রয় আচরণ করিতে হয়।

উৎপত্তি তন্ত্রে লিখিত আছে—

"সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্বীরো ন বীরো মদ্যপানতঃ।
কলৌ তু ভারতে বর্ষে লোকা ভারতবাসিনঃ।
গৃহে গৃহে সুরাং পীত্বা বর্ণভ্রষ্টা ভবন্তি হি॥"
(উৎপত্তি তন্ত্র ৬৪ পটল)

যাহাদের মন্ত্রসিদ্ধ হয়, তাহারাই বীর, কেবল মদ্য-পানে বীর হয় না। কলিকালে ভারতবর্ষে মদ্যপান করিলে বর্ণভ্রষ্ট হইতে হয়। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে—

"দিব্যবীরময়ো ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।
কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্॥"
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

কলিকালে দিব্য ও বীরভাব নিষিদ্ধ হইয়াছে। কেবল পশুভাবেই মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। ভৈরব তন্ত্রে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণ মহাদেবীকে মদ্য নিবেদন অথবা নিজে মদ্য এবং মাংস ভক্ষণও করিবেন না।

"ন দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন।
ক্ষেমকামো ব্রাহ্মণো হি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ॥"
(ভৈরব তন্ত্র)

"নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রে গব্যং তথা মধু।
রাজন্যবৈশ্যয়োর্দেয়ং ন দ্বিজস্য কদাচন॥
এবং প্রদানমাত্রেণ হীনাদ্ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥"
(আগমতত্ত্ববিলাস)

মদ্যের বিনিময়ে কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক; গব্য ও মধু তাম্রপাত্রে এই সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে দেয়। কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে নহে। স্মৃতি তন্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়াছে। মনুতে লিখিত আছে—

"সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দ্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাৎ ততঃ॥
সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে।
তস্মাদ্ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥
গৌড়ী পৈষ্টী চ মাধ্বী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধাঃ সুরাঃ।
যথৈবৈকা তথা সর্ব্বা ন পাতব্যা দ্বিজোত্তমৈঃ॥
যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসবম্।
তদ্ ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ॥
(মনু ১১ অঃ)

ব্রাহ্মণ মোহপ্রযুক্ত সুরাপান করিলে অগ্নিবর্ণ সুরা-পানে দেহত্যাগ করিয়া পাপমুক্ত হইবেন। সুরা অন্নের মল, এইজন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণেরই মদ্য অপেয়। গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধ্বী এই তিন প্রকার সুরা। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন সুরাই পান করা বিধেয় নহে।

"মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্ (উশনাঃ)
মদ্য দান, পান ও গ্রহণ করিতে নাই।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—দেবতার উদ্দেশে মদ্য নিবেদন করিলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হন।

"স্বগাত্ররুধিরং দত্বা আত্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ।
মদ্যং দত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।"
(কালিকাপুঃ)

সকল শাস্ত্রেই মদ্যপান নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের মদ্যপান বিশেষ নিন্দিত।

* * * *

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

পঞ্চমাঙ্ক।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী)

শকুন্তলা নাটকের পঞ্চমাঙ্কটী বিশেষ আলোচনার বিষয়। কালিদাস এই অঙ্কে তাঁহার অদ্ভুত রচনাকৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক কথাটী মূল্যবান ও চিন্তাশক্তির পরিচায়ক। ইহার একটী কথা যদি বাদ দেও নাটকের আর সে সৌন্দর্য্য থাকিবে না। কোন একটী শব্দের বদলে অপর একটী শব্দ বসান অসম্ভব—শত চিন্তা করিয়াও তদুপযোগী অপর একটী কথা খুঁজিয়া পাইবে না। কি অদ্ভুত রচনাকৌশল ইহাতে রহিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যেন বোধ হয় এক-একটী কথা নিক্তির ওজনে ওজন করিয়া কবিবর এই অঙ্কে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কালিদাসের রচনা কখনও পুরাণো হয় না। যতই পড়া যায় ততই উহার অভিনব সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়; এই প্রবাদ নিতান্তই সত্য সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা বিশেষরূপে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় যখন শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ ও পঞ্চমাঙ্ক পড়া যায়। চতুর্থাঙ্কের প্রতিপাদ্য বিষয় অধিক নহে—দুটী একটী মাত্র। তাহা অতি সুন্দর ও অতুলনীয়ভাবে দেখান হইয়াছে। অপত্যস্নেহ, পিতৃবৎসলতা, ঋষি ও ঋষিকন্যাদের প্রাণিমাত্রের প্রতি তরুলতাদের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বজনীন প্রেমিকতা, তাঁহাদের অমানুষিক সরলতা প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে ঐ অঙ্কে প্রকটিত হইয়াছে। সে রচনার তুলনা নাই। তাহা পড়িবার সময়ে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না, যেন প্রত্যেক শব্দটী প্রত্যেক ভাবটী হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে যাইয়া আঘাত করে।

পঞ্চমাঙ্কের প্রতিপাদ্য বিষয় চতুর্থাঙ্কের মত দুটী একটী নহে—অনেক। চতুর্থাঙ্কে দৃশ্য ঋষিদের আশ্রম। বিজনবাসী ঋষিগণ সেখানে বাস করেন। আশ্রমের তরুলতা, আশ্রমবাসী ময়ূর-ময়ূরী, হরিণ-হরিণী তাঁহাদের সঙ্গী। তাহারাই কেহ তাঁহাদের সখী, কেহ সখা, কেহ ভ্রাতা, কেহ ভগিনী ইত্যাদি। যেন শান্তরসের একটী মৃদুমন্দগামিনী কলকলনিনাদিনী, পবিত্র সলিলবাহিনী তটিনী প্রবাহিত হইতেছে। পঞ্চমাঙ্কের দৃশ্য তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা রাজভবন—রাজদরবার! এখানে নানা জাতীয় লোকের সমাগম। নানাপ্রকার ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ এবং নানাপ্রকার ভাবের সংঘর্ষণ। সৎ, অসৎ, সাধু, অসাধু, ধনী, দরিদ্র, দয়ালু, নিষ্ঠুর, পণ্ডিত, মূর্খ সকল শ্রেণীর লোকেরই এই স্থানে সমাগম হয়। এখানে বিচার হয়, অসতের দণ্ড হয়, সতের পুরস্কার হয়, বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা সৎ হইতে অসৎকে পৃথক করা হয়। মনুষ্য চরিত্রের ভালমন্দ সমস্তই এই স্থানে নিয়ত দেখা যায়। রাজা এই মনুষ্য চরিত্ররূপ অগাধ সমুদ্র বিচারাসনে বসিয়া নিয়ত মন্থন করেন। এখানে আশ্রমসুলভ সরলতা নাই। ইহা রাজনৈতিকগণের স্থান, এখানে কথাবার্ত্তা অতি সাবধানে কহিতে হয়, প্রত্যেক কথাটী কহিবার অগ্রে অতি সূক্ষ্ম ওজনদণ্ডে ওজন করিয়া লইতে হয়। আদবকায়দা, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাব, ব্যবহার, আচার, সম্মান প্রভৃতি সমস্তই বজায় রাখিয়া এখানে বাক্যালাপ করা আবশ্যক। আশ্রমে সাত্ত্বিকভাবের মৃদুমন্দ মলয় হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে, আর এই রাজভবনে রাজসিকভাবের তুমুল তুফান ও ঝঞ্ঝাবাত বহিতেছে। সেখানে নিবৃত্তি, আর এখানে প্রবৃত্তি। সেখানে কার্য্যের বিরাগ, আর এখানে নানাজাতীয় কার্য্যের প্রবল সংঘর্ষণ। রাজাকে অতি গুরুতর কার্য্যভার নিয়ত বহন করিতে হইতেছে; তাঁহার ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম নাই অথচ তাহাতে তাঁহার বিরক্তিও নাই। তিনি ঐ ভার অকাতরে বহন করিতেছেন। নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটীতে অতি

সংক্ষেপে ও সহজে তাঁহার অবস্থাটী বর্ণিত হইয়াছে।

"ঔৎসুক্যমাত্রমবসায়য়তি প্রতিষ্ঠা
ক্লিশ্নাতি লব্ধপরিপালনবৃত্তিরেব।
নাতিশ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায়
রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্॥

রাজ্য লাভ করিবার জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা হয়; কিন্তু এই উৎকণ্ঠায় ইহার শেষ—রাজ্যলাভ করিয়া কোন সুখ হয় না; পক্ষান্তরে রাজ্যশাসন সংরক্ষণের জন্য আরও কষ্টই পাইতে হয়। স্বহস্তধৃত দণ্ড ছত্র ছত্রধারী পুরুষের শ্রম নিবারণ না করিয়া শ্রমেরই কারণ হয়; রাজার রাজ্যও সেইরূপ।

এইমাত্র তিনি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্মাসন হইতে উত্থিত হইয়া প্রিয়বয়স্য মাধব্যসহ নিভৃতে ক্ষণকাল বিশ্রম্ভালাপে অতিবাহিত করিবার জন্য সঙ্গীতশালা সন্নিহিত একটী বিজন স্থানে আসিয়াছেন। সঙ্গীতশালা হইতে একটী সুমধুর স্বরলহরী আসিতেছে, রাণী হংসপদিকা গাহিতেছেন—

"অহিণবমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তণির্ব্বুদো মহুঅর বিম্হরিদো সি ণং কহং॥"

হে মধুকর! তুমি সর্ব্বদা নূতন নূতন মধু ভালবাস। নূতন পাইলে পুরাণ ভুলিয়া যাও। আম্রমঞ্জরীর সহিত এতটা ভাব করিয়া অল্প সময়ের জন্য কমলের মধ্যে বাস লাভ করিয়া সেই তোমার ভাবের আম্রমুকুলকে কি করিয়া ভুলিলে? এই গীতটী এই অঙ্কের সূত্রকথা (keynote)। রাজা বিস্মরণশীল। তিনি হংসপদিকাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। কেন ভুলিয়া গিয়াছেন? সঙ্গীতে যাহা বলিতেছে তাহা নহে। উহা মানিনীর উক্তি। আসল কথা রাজকার্য্যই রাজার একমাত্র ধ্যানের বিষয়; অপরাপর কার্য্য আনুষঙ্গিক মাত্র। রাজকার্য্য উপস্থিত হইলে রাজা আর সমস্তই ভুলিয়া যান, সমস্ত নাটকটিতে রাজার এই চরিত্রটি ভালরূপে দেখান হইয়াছে। এই অঙ্কের আর এক স্থানে দেখিতে পাইবেন—তিনি শকুন্তলার জন্য কাঁদিতেছিলেন, হঠাৎ বিদূষকের অবিহা! অবিহা! (হায়! হায়!) শব্দ শুনিতে পাইলেন। আর্ত্তের ত্রাণের প্রয়োজন হইল। তিনি শোকরাশি ভুলিয়া গেলেন। মাতলির আগমন হইল। গুরুতর রাজকার্য্য উপস্থিত হইল। আর তাঁহার শকুন্তলার কথা মনে রহিল না। তিনি সেই দুর্জ্জয় শোক বিস্মৃত হইয়া ভুবনবিজয়ী বীরের মতন কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি সাংসারিক অনেক কার্য্য অনেক সময় ভুলিয়া যান। এই অঙ্কে যে একটী বৃহৎ বিস্মৃতির কথা আছে উপরোক্ত সংগীতটী তাহাই সূচিত করিতেছে। অবশ্য ঐরূপ বিস্মৃতি রাজকার্য্যের ঝঞ্চাটে ঘটা সাধারণতঃ সম্ভবপর নয় বলিয়াই উহা সম্ভবপর করিবার জন্য দুর্ব্বাসার শাপরূপ একটী অলৌকিক শক্তির আশ্রয় আবশ্যক হইয়াছিল।

এই প্রকারের ভ্রান্তি সাধারণতঃ সম্ভব না হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে। ইহা কোন বিষয়ে তীব্র মনোযোগের উপর নির্ভর করে। সেরূপ মনোযোগ সাধারণতঃ লোকের হয় না, কাজেই এরূপ ভ্রান্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ যাহা ঘটে না তাহা ঘটিলে কোন একটা অলৌকিক শক্তির বলে ঘটিয়াছে এরূপ কল্পনা জনসমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। কবিও সেই পথ অনুসরণ করিয়াছেন।

ফলকথা মানুষ সর্ব্বগুণসম্পন্ন হয় না। অশেষ গুণরাশিসম্পন্ন লোকেরও এক-একটা বৃহৎ দোষ থাকে। ঐ গুণরাশিই একটা দোষের উৎপাদক হয়। রাজা দুষ্মন্তেরও তাহাই হইয়াছে। তিনি প্রজাবৎসল নরপতি। প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গল তাঁহার নিয়ত চিন্তার বিষয়। এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া তিনি আর সমস্তই ভুলিয়া যান।

রাজা হংসপদিকার গান শুনিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য প্রিয়বয়স্য মাধব্যকে প্রেরণ করিলেন। এইখানেই তাঁহার বিশ্রামের শেষ হইয়া গেল। আর একটা কি প্রবল ঝড় আসিতেছে, তাহার পূর্ব্বসূচনা হইতেছে। তিনি হঠাৎ পর্য্যাকুলচিত্ত হইলেন। এই পর্য্যাকুলতার কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। তাই মনে মনে বলিতেছিলেন "আমার কোন ইষ্টজনের বিরহ উপস্থিত হয় নাই অথচ এই গানটী শুনিয়া মন এতটা উৎকণ্ঠিত হইল কেন? অথবা এরূপ হওয়া

অসম্ভব নহে; অনেক সময় দেখা যায় যে, জীব সুখে ও স্বচ্ছন্দে আছে, অথচ একটা মনোহর দৃশ্য দর্শন করিয়া কি একটা মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া হঠাৎ উন্মনা হয়। কেন হয়? কবির মতে তাহা আর কিছুই নহে পূর্ব্ব জন্মের অস্ফুট স্মৃতি। জীব তখন অজ্ঞাতভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল পূর্ব্ব জন্মের প্রিয়বস্তুগুলি স্মরণ করে।”

“রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকোভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥

এখানে বলা আবশ্যক যে যদিও ইহা বৈজ্ঞানিক যুক্তির বহির্ভূত, তবুও মনোরাজ্যে এরূপ একটা ব্যাপার অনেকে অনেক সময় অনুভব করিয়া থাকিবেন।

রাজা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে কঞ্চুকী উপস্থিত। রাজা এইমাত্র ধর্ম্মাসন হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন। প্রজাপালন কার্য্যে পরিক্লান্তমনা হইয়া রবিপ্রতপ্ত যূথপতি দ্বিপেন্দ্র যেরূপ সুশীতল স্থানে বিশ্রাম করে সেইরূপ তিনি এই বিবিক্ত স্থানে বিশ্রাম করিতেছেন। কঞ্চুকী এই সময়ে রাজাকে মুনিকন্যা ও মুনিশিষ্যের আগমন সংবাদ দিতে ভীত হইতেছে—পাছে রাজার বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়। কিন্তু ধর্ম্মকার্য্য অনতিপাত্য। রাজার আবার বিশ্রাম কোথায়?

“অবিশ্রমোঽয়ং লোকতন্ত্রাধিকারঃ”।

“ভানুঃ সকৃদ্যুক্ততুরঙ্গ এব
রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রযাতি।
শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ
ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম্ম এষঃ॥

সূর্য্য তাঁহার রথে একবারই অশ্বযোজনা করিয়াছেন; সেই অশ্ব আর খুলেন নাই। রথ চিরকাল চলিতেছে। পবন দিবারাত্র বহিতেছে। ইহাদের কাহারই বিশ্রাম নাই। রাজারও ঐরূপ বিশ্রাম নাই। এরূপ সর্ব্বদা লোকব্যাপারে নিযুক্ত থাকাই রাজার ধর্ম্ম।

কঞ্চুকী ধীরে ধীরে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া মুনিশিষ্য ও মুনিকন্যার আগমন সংবাদ গোচর করিল।

রাজা শুনিবামাত্র কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা ও সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিয়া তপস্বিদর্শনোচিত প্রদেশে অগ্নি শরণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অগ্নিশরণে যাইতে যাইতে অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করিয়া রাজপদ যে কেবল মাত্র দুঃখ-বহুল ইহাই চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময়ে দুই বৈতালিক নিম্নলিখিত দুইটী স্তববাক্য পাঠ করিল।

স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবং বিধৈব।
অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পারিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্॥

নিজ সুখের জন্য অভিলাষ নাই। লোকের হিতের জন্য নিয়ত কঠোর পরিশ্রম কর। তোমার কার্য্যই ঐ প্রকারের। পাদপ মস্তক দ্বারা সূর্য্যকিরণের উত্তাপ সহ্য করে; আর তাহার ছায়াকে যাহারা আশ্রয় করিয়াছে তাহাদের উত্তাপ নিবারণ করে।

নিয়ময়সি বিমার্গপ্রস্থিতানাত্তদণ্ডঃ
প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায়।
অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম
ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাম্॥

যাহারা বিপথগামী হয়, দণ্ডবিধান করিয়া তাহাদিগকে সৎপথে লইয়া আইস। পরস্পরের মধ্যে যে সকল বিবাদ-বিসম্বাদ হয় তাহা মীমাংসা করিয়া দেও। তুমি সকলের রক্ষাকর্ত্তা। লোকের যখন সম্পদ্ হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপজীবী জ্ঞাতি-বন্ধু অনেক জুটিয়া থাকে; তাহারা বিপদকালের কেহ নয়। সম্পদে বিপদে তুমিই একমাত্র সকলের বন্ধু।

রাজা ঐ দুইটী স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া উৎসাহিত হইলেন। বলিলেন,—‘এতে ক্লান্তমনসঃ পুনর্নবীকৃতাঃ স্মঃ’।

বৈতালিকদের এই কার্য্য। এইজন্যই তাহারা রাজদ্বারে নিযুক্ত থাকে। রাজা যখন ক্লান্ত হইয়া পড়েন তখন তাহারা এই সকল স্তববাক্যের দ্বারা তাঁহাকে উৎসাহিত করে। সেকালে রাজদরবারের এই সুন্দর ব্যবস্থা ছিল।

রাজা অগ্নিশরণ গৃহে ঋষিদের আগমন-প্রতী-

ক্ষায় অবস্থান করিতেছেন এবং মনে মনে ঋষিদের হঠাৎ আগমন কেন হইল, কোন আশ্রম পীড়া উপস্থিত হইয়াছে কিনা, ইত্যাদি বিষয় ভাবিতে-ছেন; এমন সময় অনুপম রূপলাবণ্যবতী ক্ষৌম-বসনা শকুন্তলা; তৎপশ্চাৎ বল্কলবসনা গৌতমী এবং তৎপশ্চাৎ ব্রহ্মচারী বেশধারী জটাজূটমণ্ডিত শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামক দুই মুনিশিষ্য প্রবেশ করিলেন।

কঞ্চুকী ও পুরোহিত সোমরাত ইহাঁদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিতেছেন। ঋষিকুমারদ্বয় তপোবলে ও ব্রহ্মতেজে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের শরীর হইতে যেন ব্রহ্মতেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অন্তঃকরণের সরলতা ও পবিত্রতা যেন বাহিরে প্রকটিত হইয়া চারিদিক পবিত্র করিতেছে। মুখে আনন্দের হাসি, শরীরে আনন্দের পুলক, বদন-মণ্ডলে অকুতোভয়তা; তাঁহাদের এই শান্ত ও সৌম্য মূর্ত্তি দেখিলে মনে আপনা হইতে পবিত্রভাব আশ্রয় করে। তাঁহারা আশ্রম হইতে আসিয়াছেন। সেখানকার শান্তির সুবাতাসে তাঁহাদের শরীর ও মন গঠিত। রাজভবনের নানা প্রকারের দূষিত হাওয়া তাঁহাদের গায়ে লাগিতেছে আর তাঁহারা শিহরিয়া উঠিতেছেন। সহ্য করিতে পারিতেছেন না। ইহা তাঁহাদের অভ্যস্ত নহে। যদিও রাজা দুষ্মন্তের প্রবল শাসনে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সুচারুরূপে রক্ষিত, যদিও প্রজাবর্গের মধ্যে নিতান্ত অপকৃষ্ট ব্যক্তিও বিপথগামী নহে; তথাপি এস্থল জনাকীর্ণ। ঋষিগণ বিবিক্তদেশসেবী; জনসঙ্ঘ তাঁহাদের প্রিয় নহে। শার্ঙ্গরব ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া শারদ্বতকে বলিয়া ফেলিলেন—

"হুতবহপরীতং গৃহমিব"

"বাড়ীটাতে যেন আগুন জ্বলিতেছে"। জ্বলন্ত অগ্নি-শিখার উত্তাপ যেন তাঁহার গায়ে লাগিতেছে! শারদ্বত বলিলেন 'ঠিক কথা, পুরে প্রবেশ করিয়া আপনি ঐরূপ অনুভব করিতেছেন। আমারও এই ভোগাসক্ত লোকগুলাকে দেখিয়া একটা ঘৃণার ভাব আসিয়াছে। স্নাত ব্যক্তি তৈলাক্ত অস্নাত ব্যক্তিকে, জাগ্রত সুপ্তকে, শুচি অশুচিকে, মুক্ত বদ্ধকে যে চক্ষে দেখে আমিও ইহাদিগকে সেই চক্ষে দেখিতেছি'।

এই ভাবটী ধারণা করা আমাদের পক্ষে সহজ নহে। কারণ আমরা সকলে ইহার মধ্যে ডুবিয়া আছি। বিষকুম্ভের কীট কখনও বিষকে অশ্রদ্ধেয় মনে করিতে পারে না। যাঁহারা অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য ভোগলিপ্সা ত্যাগ করিয়া বিজন ও পবিত্র স্থানে বাস করিয়াছেন তাঁহারাই এই ঋষিকুমারদের মনোগত ভাব কতকটা ধারণা করিতে পারিবেন। স্নাত অভ্যক্ত, শুচি অশুচি, প্রবুদ্ধ নিদ্রিত, মুক্ত বদ্ধ এই উপমাগুলির তুলনা নাই। কালিদাস ভিন্ন এরূপ উপমা অন্য কোন কবির নিকট আশা করা যায় না।

রাজা ঋষিদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য আসন হইতে উত্থিত হইয়াছেন। শকুন্তলাকে দেখিয়া বলিতেছেন

"অথাত্রভবতী
কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাং" ॥

তপোধনদের মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী ইনি কে? অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত থাকাতে ইঁহার লাবণ্য সম্যগ্‌রূপে পরিস্ফুট হইতেছে না। পাণ্ডুবর্ণ পত্র-মধ্যে নূতন পাতা যেরূপ শোভা পায় জটিল তাপসদের মধ্যে ইনিও তদ্রূপ শোভা পাইতেছেন।

কথাটা প্রতীহারীর সঙ্গে হইতেছে। শকুন্তলা একটু দূরে আছেন। তাঁহার কর্ণে "অথাত্রভবতী কেয়ং" এই বাক্যটী প্রবেশ করিলে এইখানেই পালা আরম্ভ হইত। প্রতীহারী যখন বলিল ইঁহার আকৃতি দেখিয়া বোধ হয় ইনি অতি সুন্দরী, রাজা প্রতিহারীর ঐ বাক্যটী শিষ্টাচারবিরুদ্ধ মনে করিয়া বলিলেন "ভবতু, অনির্ব্বর্ণনীয়ম্ পরকলত্রম্" পরদার সম্বন্ধে ভালমন্দ আলোচনা করা অনুচিত। প্রবৃত্তি স্বাভাবিক; প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিচার ও তাহার নিবারণই জ্ঞানের কার্য্য।

এরূপ অসাধারণ রূপলাবণ্য দর্শনে মনুষ্য মাত্রেরই কৌতূহল উদ্রেক হইয়া থাকে। রাজা ও প্রতিহারীরও হইয়াছিল; কিন্তু রাজার এই কৌতু-হলের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্টাচারিতারূপ কর্ত্তব্যবোধও উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি কৌতূহলকে আর প্রশ্রয় দিলেন না। তিনি প্রজাপুঞ্জের কেবল মাত্র শাসন-কর্ত্তা নহেন—তাহাদের শিক্ষাদাতাও; তিনি যাহা

করিবেন প্রজাপুঞ্জ তাহার অনুকরণ করিবে। কাজেই শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কার্য্য তিনি করিতে পারেন না; করিলে প্রজাপুঞ্জও তাহা অনুকরণ করিবে। রাজাকে সর্ব্বদা সদাচারসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। দুষ্মন্ত যে ঐরূপ একজন সদাচারসম্পন্ন আদর্শ নরপতি ছিলেন, তাহা এই নাটকের অনেক স্থলেই অতি সুন্দর রূপে দেখান হইয়াছে—বিশেষতঃ এই পঞ্চমাঙ্কে উহা অতি বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাজা দুষ্মন্ত অদ্য এক বিষম পরীক্ষায় পতিত হইয়াছেন। একদিকে এই অতুলনীয় রূপলাবণ্যবতী রমণী তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন—আমি তোমার ধর্ম্মতঃ পরিণীতা পত্নী—তদুপরি মহামুনি কণ্বের আদেশ। সম্মুখে দুই মহাতেজা মহর্ষি কণ্বের নিয়োগ জ্ঞাপন করিতেছেন; অন্যদিকে রাজার সর্ব্বজনপূজনীয় পদ, তাঁহার অলৌকিক ধর্ম্মপরায়ণতা; পাঠক আসুন আমরা দেখি রাজা দুষ্মন্ত এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন কি না।

শকুন্তলা ধীরে ধীরে রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হৃদয় কাঁপিতেছে; কাঁপিবার অনেক কারণ আছে। রাজদরবারে এমন একটা গৌরব ও মহত্বের ভাব থাকে যে, সেখানে উপস্থিত হইলে তোমার-আমার হৃদয় কম্পিত হয়; শকুন্তলা ঋষিকুললালিতা, আশ্রমে প্রতিপালিতা; রাজভবনের এই অলৌকিক ঐশ্বর্য্য, জনসঙ্কুলতা, জাঁক-জমক তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই, তাহার উপর তিনি রাজার ধর্ম্মপত্নী হইতে আসিয়াছেন; রাজা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন, কিরূপ ভাবে কথা কহিবেন, কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, ইত্যাদি নানা জাতীয় চিন্তা তাঁহার মনের মাঝে উদয় হইতেছে। অনেক দিন পরে দর্শন হইল,—দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দের স্রোতও বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। এই সমস্ত নানা জাতীয় ভাব একত্র হইয়া শকুন্তলার হৃদয়কে কম্পিত করিতেছে। শকুন্তলা হৃদয়কে থামাইয়া বলিতেছেন—

হৃদয় কেন এরূপ কাঁপিতেছ? আর্য্যপুত্রের প্রেম অবধারণ করিয়া স্থির হও।

অধীরতাই ভয়ের কারণ অনেক সময় হইয়া থাকে। কি হবে কি হবে এইরূপ একটা কৌতুহলই অনেক সময়ে আশঙ্কা উৎপাদন করে। এস্থলে শকুন্তলারও তাহাই হইয়াছিল।

ঋষিরা হস্ত উত্তোলন করিয়া বিজয়ী হও বলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—রাজা প্রণাম করিলেন। ঋষিরা ইষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হও বলিয়া পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। দুইবার আশীর্ব্বাদ করার তাৎপর্য্য আছে। প্রথম আশীর্ব্বাদ—রাজকীয় ঐশ্বর্য্যের জন্য বিজয়ী হও। জয়লাভ কর। ইহা সাধারণ আশীর্ব্বাদ। রাজাকে এই আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই সাধারণতঃ করিতে হয়। দ্বিতীয় আশীর্ব্বাদ বিশেষ আশীর্ব্বাদ, সময়োপযোগী আশীর্ব্বাদ। বর্ত্তমান ব্যাপারের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ আছে। ইষ্ট বস্তু তাঁহাদের সঙ্গেই আছে। সেই শকুন্তলারূপ ইষ্ট বস্তু রাজা লাভ করুন, ঋষিরা এই আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

আশীর্ব্বাদের পরেই রাজা ঋষিদের তপস্যা নির্ব্বিঘ্নে চলিতেছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহা রাজার কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

কন্যার পরলোকগমনে।

(শ্রীহিরণ্ময়ী চৌধুরাণী)

আজি মোর হৃদাকাশে ওহে বিশ্বরূপ।
বেদনার অশ্রুজলে দেখালে স্বরূপ॥
সুখ-অহমিকা-কোলে থাকি' অচেতন।
তোমারে চিনিতে আমি পারি নি কখন॥
তাই বুঝি আঘাতিয়া করিলে চেতন॥
আঘাতের চিহ্ন রেখা—অনন্ত বেদন।
অনন্ত জীবন ভরি' করিব বহন॥
ধরুক শতেক ব্যথা আঁকাড়িয়া বুকে।
চলিব তোমার কাজ করি' মহাসুখে॥
ক্ষুণ্ণ হতে দিব নাকো দুঃখভারে প্রাণ।
আমার জীবনে সে যে তব শ্রেষ্ঠ দান॥
তোমার মঙ্গল হস্ত প্রসারিত করি'।
দুখের ভিতর দিয়ে রেখেছিলে হরি॥

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

বাহার—কাওয়ালি।

কি আমি বলিব তোমারে ;
ক্ষুদ্র কীট আমি ; তুমি পুরাণ অনাদি, অবিনাশী সারাৎসার।
আকাশের উচ্চ তুমি, দেখ তবু কৃপা-চখে মলিন মানবে।
বর্ম্ম দুর্গ তুমি ভয়বিপদ-মাঝে, ভব-জলধি-সেতু তুমি,
থেক না থেক না হে দূর।

কথা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—৺কাঙ্গালীচরণ সেন।

৩ ॥ ১´ ২
ণণা পা মা II {পধপা -মপা মজ্ঞা -মজ্ঞমা I ণা -া -ধা -ণা। -পধা -নর্সনা না -র্সা।
কিআ মি, ব লি• • • • ব • • •তো মা • • • • • • • • রে •

• • ৩ ১´
। (-ণধা ণণা পা মা) }। -ণধা নাঃ নঃ র্সা। -াঃ র্সঃ র্রর্সা -া I -া ণা -ণা পমপা।
• • কিআ মি, ব • • ক্ষু দ্র, কী • ট আমি • • তু • মি • পু

২ • ৩ ১´
। মজ্ঞা -া -া মমা। রাঃ -সঃ সা -া। • -া ননা না র্সা I -া ণপা র্সা -া।
রা • • ণ,অ না • দি • • অবি না শী • সা• রা ৎ

২ •
। -া ণধা -ণা পা। -া ণণা পা মা II
• সা• • র • "কিআ মি, ব"

১´ ২ • ৩
II মা -া মা -া। ণা -ধা -না না। না র্সা র্সা র্সা। -া -া র্সা র্সা I
আ • কা • শে • • র উ চ্চ তু মি • • দে খ

১´ ২ • ৩
I র্সা র্সা র্সা র্সা। -না র্রা র্সা -া। -ণধা -া ধঃ ধধা। ণপা -ধমা পা পা I
ত বু কৃ পা • চো খে • • • • ম লিন মা• • • ন বে

১´ ২ • ৩
I র্সা -া র্সা ণা। -া পা মা পা। মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা। মা রা -া সা I
ব • র্ম্ম, দু • র্গ তু মি ভ য় বি প দ মা • ঝে

১´ ২ • ৩
I -া সসা মমা মা। -া পা -ণপা ননা। র্সা -া -া র্সর্সা। র্মা -াঃ র্রঃ র্সা I
• ভব জল ধি • সে • • তুতু মি • • থেক না • থে ক

১´ ২ •
I ণপা -া -া র্সা। -া -া ণধা -ণপা। -া ণণা পা মা II II
না• • • হে • • দূ• • • র্"কিআ মি ব"

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

কুকুভ—তেওট।

তাঁহারি শরণ লয়ে রহিও—
শরণ লয়ে রহিও।
যাঁহারি কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন
তাঁরে আগে দেখিও॥

কথা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩ ০ ১ ॥
পা পা II -মা -ধধা -ণপা -মপা। -মমা -গা -মগা। -রগা -রসা -ন্‌া সা I
তাঁ হা ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ রি

২´ ৩ ০ ১
I রা রা -া। রা -া -গা -মরা। -গা -মা পা। মা -া -গা -গা I
শ র ০ ণ ০ ০ ০০ ০ ০ ল য়ে ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I গা মা -গমা। -রা -া সা -া। সা সা মা। -গা -পা পা পা I
র হি ০০ ০ ০ য়ো ০ শ র ণ ০ ০ ল য়ে

২´ ৩ ০ ১
I -না -ধা -র্সা। -া -া র্সা র্সা। র্সা -া -নর্রা। -র্সঃর্সা -র্সঃ -ধা -ণপা I
০ ০ ০ ০ ০ র হি য়ো ০ ০০ ০০ ০ ০ ০০

২´
I -মপা -া পপা II
০০ ০ "তাঁহা"

২´ ৩ ০ ১ ২´
II পা পা -া। না -ধা -র্সা -া। র্সা র্সা -া। -া র্রা র্সা -া I -া -া -া।
যাঁ হা ০ রি ০ ০ ০ কৃ পা ০ য় তু মি ০ ০ ০ ০

৩ ০ ১ ২´
। র্সা -া র্রা র্সা। -া -া -নর্সা। -নর্সা -ধণা ধণা -পা I পা না -র্সনা।
খু ০ লি লে ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ন য় ০০

৩ ০ ১ ২´
। -ধনা -ধনা -র্সা -া। মা মা -া। মা -গপা পা -া I -না -া -র্সা।
০০ ০০ ০ ন্ তাঁ রে ০ আ ০০ গে ০ ০ ০ ০

৩ ০ ১ ২´
। -া -া র্সা র্সা। র্সা -া -নর্রা। -র্সঃর্সা -র্সঃ -ধা -ণপা I -মপা -া পপা II II
০ ০ দে খি য়ো ০ ০০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০ "তাঁহা"

বালগঙ্গাধর টিলক প্রণীত

গীতা-রহস্য।

পঞ্চদশ প্রকরণ—উপসংহার।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিন্তু কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মমার্গ শ্রেষ্ঠ কেন,—আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহার যে কারণ দেখাইয়া থাকেন তাহা গীতার প্রবৃত্তিমার্গের প্রতিপাদন হইতে ভিন্ন হওয়ায়, এখন উহাদের ভেদও এখানে বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য আধিভৌতিক কর্ম্মমার্গীদিগের বক্তব্য এই যে, জগতের সমস্ত মনুষ্যের কিংবা অধিকাংশ লোকের অধিক সুখ—অর্থাৎ ঐহিক সুখ—ইহাই এই জগতে পরম সাধ্য; অতএব সকলের সুখের জন্য চেষ্টা করিতে থাকিয়া নিজেরও সেই সুখেই মগ্ন হওয়াই প্রত্যেকের কর্ত্তব্য; এবং ইহার পুষ্টির জন্য উহাদের মধ্যে অধিকাংশ পণ্ডিত প্রতিপাদনও করেন যে, সংসারে দুঃখ অপেক্ষা সাকল্যে সুখই অধিক। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, পাশ্চাত্য কর্ম্মমার্গের লোক, "সুখপ্রাপ্তির আশায় সাংসারিক কর্ম্ম করিতে চাহে" এবং পাশ্চাত্য কর্ম্মত্যাগমার্গের লোক, "সংসারে বিরক্তি অনুভব করিয়া থাকে," এইরূপ বলিতে হয়; এবং কদাচিৎ এই কারণেই তাহাদিগকে যথাক্রমে 'আশাবাদী' ও 'নিরাশাবাদী' নামে অভিহিত করা হয়। * কিন্তু ভগবদ্গীতায় যে দুই নিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে তাহা ইহা হইতে ভিন্ন। নিজেরই জন্য হউক, বা পরোপকারেরই জন্য হউক, যাহাই হউক না কেন, ঐহিক বিষয় সুখের লালসায় সংসারে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার সাম্যবুদ্ধিরূপ সাত্ত্বিকবৃত্তির একটু হ্রাস না হইয়া যায় না। তাই গীতায় এইরূপ বলা হইয়াছে যে, সংসার দুঃখময় হউক বা সুখময় হউক, সাংসারিক কর্ম্ম যখন ছাড়েই না, তখন সে সুখদুঃখের বিচার করিতে থাকিলে কোন লাভ হইবে না। সুখই হউক আর দুঃখই হউক, মানবদেহ লাভ করাই একটা মহদ্ভাগ্য মনে করিয়া, কর্ম্মজগতের এই অপরিহার্য্য কাজের মধ্যে যাহা কিছু প্রসঙ্গানুসারে প্রাপ্ত হইবে তাহা, অন্তঃকরণে নৈরাশ্য আসিতে না দিয়া, "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" (গী. ২. ৫৬) এই নীতি অনুসারে, সাম্যবুদ্ধি সহকারে সহ্য করা এবং (অপর কাহারও জন্য নহে, কিন্তু জগতের ধারণ-পোষণার্থ) আপন অধিকারানুসারে যে কোন কর্ম্ম শাস্ত্রতঃ আমার ভাগে পড়িয়াছে, তাহা নিষ্কামবুদ্ধিতে আচরণ করিতে থাকাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। গীতার কালে চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা আমলে আসিয়াছিল এই কারণেই এই সামাজিক কর্ম্ম চাতুর্ব্বর্ণ্যবিভাগানুসারে প্রত্যেকের ভাগে আসে এইরূপ বলা হইয়াছে; এবং ১৮শ অধ্যায়ে গুণকর্ম্মবিভাগতঃ এই ভেদ নিষ্পন্ন হয় তাহাও বলা হইয়াছে (গী. ১৮. ৪১-৪৪)। কিন্তু ইহা হইতে গীতার নীতিতত্ত্ব যে চাতুর্ব্বর্ণ্যরূপ সমাজব্যবস্থার উপরেই অবলম্বন করিয়া আছে, এরূপ যেন মনে করা না হয়। অহিংসাদি নীতিধর্ম্মের ব্যাপ্তি কেবল চাতুর্ব্বর্ণ্যের জন্যই নহে; এই ধর্ম্ম মনুষ্যমাত্রেরই জন্য একসমান, এই কথা মহাভারতকারও পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই মহাভারতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে (শাং. ৬৫. ১২-২২ দেখ) যে, চাতুর্ব্বর্ণ্যের বহির্ভূত যে অনার্য্য লোকের মধ্যে এই সমস্ত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহাদিগকেও এই সকল সাধারণ ধর্ম্মের অনুসারেই রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য। অর্থাৎ গীতোক্ত নীতির উপপত্তি চাতুর্ব্বর্ণ্যাদি কোন এক বিশিষ্ট সমাজব্যবস্থার উপর নির্ভর না করিয়া, সর্ব্বজনমান্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বনিয়াদেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শাস্ত্রত প্রাপ্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মমাত্রই নিষ্কাম ও আত্মৌপম্য-দৃষ্টিতে সম্পাদন করা উচিত ইহাই গীতার নীতিধর্ম্মের মুখ্য তাৎপর্য্য; এবং সর্ব্বদেশে লোকের জন্য ইহা একই প্রকার উপযোগী। কিন্তু আত্মৌপম্যদৃষ্টির ও নিষ্কাম-কর্ম্মাচরণের এই সাধারণ নীতিতত্ত্ব সিদ্ধ হইলেও ইহা যে কর্ম্মের উপযোগী সেই কর্ম্ম এই জগতে প্রত্যেকে কি করিয়া প্রাপ্ত হয়, তাহারও স্পষ্ট বিচার করা আবশ্যক হইয়াছিল। এই কথা বলিবার জন্যই, তৎকালের উপযোগী সহজ উদাহরণের হিসাবে, গীতায় চাতুর্ব্বর্ণ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং সেই সঙ্গে গুণকর্ম্মবিভাগের দ্বারা সমাজব্যবস্থার উপপত্তিও সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থাই কিছু গীতার মুখ্য ভাগ নহে ইহা মনে রাখা উচিত। চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা যদি কোথাও প্রচলিত নাও থাকে কিংবা পঙ্গুভাবে অবস্থিতি করে তাহা হইলে সেস্থলেও তৎকালপ্রচলিত সমাজব্যবস্থানুসারে সমাজের ধারণপোষণের যে যে কর্ম্ম আমরা প্রাপ্ত হইব তাহা লোকসংগ্রহার্থ ধৈর্য্য ও উৎসাহসহকারে এবং নিষ্কামবুদ্ধিতে কর্ত্তব্য বলিয়া করা উচিত, কারণ এই কার্য্যই সম্পাদন করিবার জন্য মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে—কেবল সুখভোগার্থ নহে—ইহাই সমস্ত গীতাশাস্ত্রের ব্যাপক সিদ্ধান্ত। গীতার নীতিধর্ম্ম কেবল চাতুর্ব্বর্ণ্য-

* জেম্‌স্ সলি (James Sully) স্বকীয় *Pessimism* নামক পুস্তকে Optimist ও Pessimist এই দুই পন্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে Optimist অর্থে "উৎসাহী, আনন্দিত" এবং Pessimist অর্থে 'সংসার হইতে ভীত' এবং ইহা আমি পূর্ব্বে এক টিপ্পনীতে (পৃ. ৩০৭ দেখ) বলিয়াছি যে, এই দুই শব্দ গীতার 'যোগ' ও 'সাংখ্য' শব্দের সর্ব্বাংশে সমানার্থক নহে। 'দুঃখ-নিবারণেচ্ছু' বলিয়া যে এক তৃতীয় পন্থা পরে বর্ণিত হইয়াছে—সলি তাহার নাম দিয়াছেন—Meliorism।

মূলক, এইরূপ কেহ কেহ যে বলেন তাহা ঠিক নহে। সমাজ হিন্দুরই হউক বা ম্লেচ্ছেরই হউক, প্রাচীন হউক বা অর্ব্বাচীন হউক, প্রাচ্য হউক বা পাশ্চাত্য হউক, সেই সমাজের মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থা আমলে আসিলে তদনুসারে, কিংবা অন্য সমাজব্যবস্থা আমলে আসিলে তদনুসারে, যে কর্ম্ম নিজের ভাগে প্রাপ্ত হই, অথবা যাহা আমি নিজের রুচি অনুসারে কর্ত্তব্য বলিয়া একবার গ্রহণ করি তাহাই আমার স্বধর্ম্ম হইয়া যায়। এবং কোনও কারণে এই ধর্ম্মকে ছাড়িয়া সুবিধামত অন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মদৃষ্টিতে ও সর্ব্বভূতহিতদৃষ্টিতে নিন্দনীয় এইরূপ গীতা বলেন। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" (গী. ৩. ৩৫)—স্বধর্ম্ম পালনে মরণও শ্রেয়স্কর কিন্তু পরের ধর্ম্ম ভয়াবহ, এই গীতাবচনের ইহাই তাৎপর্য্য। এই নীতি অনুসারেই জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও যিনি তৎকালীন দেশকালের অনুরূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়াছিলেন সেই মহাত্মা মাধবরাও পেশোয়াকে রামশাস্ত্রী বাবা "স্নান-সন্ধ্যা ও পূজাপাঠে সমস্ত সময় নষ্ট না করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে প্রজার সংরক্ষণে সমস্ত সময় অতিবাহিত করাতেই তোমার উভয়ত্র কল্যাণ" এই উপদেশ করিয়াছিলেন—এই কথা মহারাষ্ট্র ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। সমাজধারণের জন্য কোন্ ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহা বলা গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সমাজব্যবস্থা যাহাই হউক না কেন, সেই ব্যবস্থার মধ্যে যথাধিকার প্রাপ্ত কর্ম্ম উৎসাহের সহিত সম্পাদন করিয়া সর্ব্বভূতহিতরূপ আত্মশ্রেয় সাধন কর ইহাই গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এই প্রকারে কর্ত্তব্য বলিয়া গীতা-বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে তাহা স্বভাবতই লোককল্যাণকর হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য আধিভৌতিক কর্ম্মমার্গ ও গীতার কর্ম্মযোগের মধ্যে এক গুরুতর প্রভেদ এই যে, গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের মনে, আমার কর্ম্মের দ্বারা আমি লোককল্যাণ করিতেছি এই অভিমান-বুদ্ধি থাকেই না, বরং সাম্যবুদ্ধি তাঁহার দেহস্বভাবই হইয়া পড়ায়, তৎকালীন সমাজব্যবস্থানুসারে কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ যে যে কাজ করেন সে সমস্ত স্বভাবত লোককল্যাণকর হইয়া থাকে। এবং আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞ সংসারকে সুখময় মনে করিয়া এই সংসার-সুখ প্রাপ্তির জন্য সমস্ত লোককে লোককল্যাণকর কর্ম্ম করিতে বলেন।

তথাপি, সমস্ত পাশ্চাত্য আধিভৌতিক কর্ম্মযোগী সংসারকে সুখময় মনে করেন না। সোপেনহোয়েরের মত সংসারকে দুঃখপ্রধান স্বীকার করিবার পণ্ডিতও সেখানে আছেন, যাঁহারা প্রতিপাদন করেন যে, যথাশক্তি লোকের দুঃখ নিবারণ করাই জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য হওয়ায়, সংসার ত্যাগ না করিয়া লোকের দুঃখ হ্রাস করিবার জন্য প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এখন তো পাশ্চাত্য দেশে দুঃখনিবারণেচ্ছু কর্ম্মযোগীদিগের এক পৃথক পন্থাই বাহির হইয়াছে। গীতার কর্ম্মযোগের সহিত তাহার খুবই সাম্য আছে। "সুখাদ্‌বহুতরং দুঃখং জীবিতে নাত্র সংশয়ঃ"—সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক—এইরূপ মহাভারতে যেখানে উক্ত হইয়াছে সেইখানেই মনু বৃহস্পতিকে এবং নারদ শুককে বলিয়াছেন (শাং. ২০৫. ৫ এবং ৩৩০. ১৫)

> ন জানপদিকং দুঃখমেকঃ শোচিতুমর্হতি।
> অশোচন্ প্রতিকুর্ব্বীত যদি পশ্যেদুপক্রমম্॥

'যে দুঃখ সার্ব্বজনিক তাহার জন্য শোক করিতে বসা উচিত নহে; তাহার জন্য কাঁদিতে না বসিয়া তাহার প্রতীকারার্থ (জ্ঞানীপুরুষের) কোন উপায় করা উচিত'। ইহা হইতে স্পষ্ট হইতেছে—সংসার দুঃখময় হইলেও সমস্ত লোকের দুঃখ কমাইবার জন্য জ্ঞানী-পুরুষের উদ্যোগ করা উচিত, এই তত্ত্ব মহাভারত-কারেরও গ্রাহ্য। কিন্তু ইহা কিছু আমাদের সিদ্ধান্তপক্ষ নহে। ঐহিক সুখাপেক্ষাও আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ-সম্ভূত সুখকে অধিক মহত্ত্ব দিয়া, এই আত্মবুদ্ধিপ্রসাদের সুখকে পূর্ণ-রূপে অনুভব করিয়া, কেবল কর্ত্তব্য বুঝিয়াই (অর্থাৎ লোকের দুঃখ আমি হ্রাস করিব এইরূপ রাজসিক অভি-মান-বুদ্ধি মনে না রাখিয়া) সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্ম করিতে উপদেশকর্ত্তা গীতার কর্ম্মযোগের সমান করিবার জন্য দুঃখনিবারণেচ্ছু পাশ্চাত্য কর্ম্মযোগেও এখনও অনেক সংস্কার সাধন করা আবশ্যক। প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মনে এই কথা জাগিয়া থাকে যে, নিজের কিংবা সকল লোকের ঐহিক সুখই মনুষ্যের এই সংসারে পরম সাধ্য—চাই তাহা সুখের সাধনের বৃদ্ধি করিয়াই পাওয়া যাক্, কিংবা দুঃখের লাঘব করিয়াই পাওয়া যাক্। এই কারণে, সংসার দুঃখময় হইলেও তাহা অপরিহার্য্য মনে করিয়া লোকসংগ্রহার্থই সংসারের কর্ম্ম করিবে, গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগের এই উপদেশ তাঁহাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। উভয়েই কর্ম্মমার্গী সত্য; কিন্তু শুদ্ধ নীতিদৃষ্টিতে দেখিলে পার্থক্য উঁহাদের মধ্যে এই উপলব্ধি হইবেই যে, পাশ্চাত্য কর্ম্মযোগী সুখেচ্ছু অথবা দুঃখনিবারণেচ্ছু—যাহাই বল না কেন—সে 'ইচ্ছু' অর্থাৎ 'সকাম' নিশ্চয়ই এবং গীতার কর্ম্মযোগী সর্ব্বদা ফলসম্বন্ধে নিষ্কাম হইয়া থাকেন। এই অর্থই অন্য শব্দে ব্যক্ত করিতে হইলে বলা যায় যে, গীতার কর্ম্মযোগ সাত্ত্বিক এবং পাশ্চাত্য কর্ম্মযোগ রাজসিক—(গীতা. ১৮. ২৩, ২৪ দেখ)।

কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া পরমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে সমস্ত সাংসারিক কাজ করিতে থাকিয়া তদ্দ্বারা পরমেশ্বরের যজন কিংবা উপাসনা আমরণান্ত করিবার যে এই গীতার জ্ঞানযুক্ত প্রবৃত্তিমার্গ কিংবা কর্ম্মযোগ, ইহাকেই 'ভাগবত ধর্ম্ম' বলে। "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ" (গী. ১৮. ৪৫) ইহাই এই মার্গের রহস্য। মহাভারতের বনপর্ব্বে, ব্রাহ্মণ-ব্যাধ-কথার মধ্যে (বন. ২০৮) এবং শান্তিপর্ব্বে তুলাধার-জাজলি-সংবাদের মধ্যে (শাং ২৬১) এই ধর্ম্মেরই নিরূপণ করা হইয়াছে, এবং মনুস্মৃতিতেও (মনু ৬. ৯৬. ৯৭) যতিধর্ম্মের নিরূপণান্তর এই মার্গকেই বেদসন্ন্যাসীদিগের কর্ম্মযোগ বলিয়া বিহিত ও মোক্ষপ্রদ বলা হইয়াছে। 'বেদসন্ন্যাসিক' পদ হইতে এবং বেদের সংহিতাসমূহ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে যে বর্ণনা আছে তাহা হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, এই মার্গ আমাদের দেশে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। নতুবা এই দেশ কখনই এত বৈভবশালী হইত না; কারণ ইহা সুস্পষ্ট যে, যে-কোন দেশ বৈভবপূর্ণ হইতে গেলে কর্ত্তা বা বীর পুরুষ সে দেশে কর্ম্মমার্গেরই প্রবর্ত্তক হয়েন। কিন্তু কর্ত্তা বা বীর পুরুষ হইলেও ব্রহ্মজ্ঞান না ছাড়িয়া উহার সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তব্য স্থির রাখাই আমাদের কর্ম্মযোগের মুখ্য তত্ত্ব; এবং এই বীজভূত তত্ত্বেরই সুব্যবস্থিত আলোচনা করিয়া শ্রীভগবান এই মার্গের পুষ্টীকরণ ও প্রসার করা প্রযুক্ত এই প্রাচীনমার্গই পরে 'ভাগবত ধর্ম্ম' এই নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে, এইরূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উল্টাপক্ষে, উপনিষৎসমূহ হইতে প্রকাশ পায় যে, কখন-না-কখনও কতকগুলি জ্ঞানী পুরুষের মনের গতি প্রথম হইতেই স্বভাবতঃ সন্ন্যাসমার্গের দিকেই থাকিত; কিংবা নিদানপক্ষে প্রথমে গৃহস্থাশ্রম করিয়া শেষে সন্ন্যাসগ্রহণের বুদ্ধি মনে জাগৃত হইত—চাই তাঁহারা সত্যসত্যই সন্ন্যাসগ্রহণ করুন বা নাই করুন। তাই, সন্ন্যাসমার্গকেও নূতন বলা যাইতে পারে না। কিন্তু স্বভাববৈচিত্র্যাদি কারণপ্রযুক্ত এই দুই মার্গ আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত হইলেও ইহা নিঃসন্দেহ যে, বৈদিককালে মীমাংসকদিগের কর্ম্মমার্গেরই বিশেষ প্রাবল্য লোকের মধ্যে হইয়াছিল, এবং কৌরবপাণ্ডবদিগের কালে আবার, কর্ম্মযোগ সন্ন্যাসমার্গকে অনেকটা পশ্চাতে হটাইয়া দিয়াছিল। কারণ এই যে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কুরুপাণ্ডবদিগের কালের পর অর্থাৎ কলিযুগে সন্ন্যাসধর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে; এবং "আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ" (মভা. অনু. ১৪৯ ১৩৭; মনু. ১. ১০৮) এই বচনানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্র যখন প্রায় আচারকেই অনুসরণ করিয়া থাকে, তখন ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এই নিষেধ স্থাপন করিবার পূর্ব্বেই লোকাচারে গৌণত্ব আসিয়াছিল ইহা সহজে সিদ্ধ হয়।* কিন্তু কর্ম্মযোগের এইরূপ প্রথমে প্রাবল্য হইয়া শেষে কলিযুগে সন্ন্যাসধর্ম্ম যদি নিষিদ্ধের মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তবে এইরূপ প্রশ্ন এইস্থানে স্বভাবতই উত্থিত হয় যে, যাহা একবার সবলে প্রচলিত হইতে শুরু হইয়াছিল, সেই জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযোগের অবনতি হইয়া এখনকার ভক্তিমার্গেও, সন্ন্যাসপক্ষই একমাত্র শ্রেষ্ঠ এই মত কি করিয়া প্রবেশ করিল। কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যই এই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই উপপত্তি ঠিক্ নহে এইরূপ উপলব্ধি হইবে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ের (১) মায়াবাদাত্মক অদ্বৈতজ্ঞান এবং (২) কর্ম্মসন্ন্যাসধর্ম্ম এইরূপ দুই বিভাগ আছে ইহা আমি প্রথম প্রকরণে বলিয়াছি। এখন অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষদে সন্ন্যাসধর্ম্মও প্রতিপাদিত হইলেও, এই দুয়ের মধ্যে কোন নিত্য সম্বন্ধ না থাকায় অদ্বৈতবেদান্তমত স্বীকার করিলে সন্ন্যাসমার্গও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এরূপ নহে। উদাহরণ যথা—যাজ্ঞবল্ক্যাদি হইতে অদ্বৈতবেদান্তে পূর্ণরূপে শিক্ষিত জনকাদি নিজে কর্ম্মযোগী ছিলেন শুধু নহে, উপনিষদের অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও গীতাতে এই জ্ঞান অনুসারেই সন্ন্যাসের পরিবর্ত্তে কর্ম্মযোগেরই সমর্থন করা হইয়াছে। তাই, প্রথমে মনে রাখা আবশ্যক যে, সন্ন্যাসধর্ম্মে উত্তেজন দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শাঙ্কর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে আপত্তি আনা হয় তাহা সেই সম্প্রদায়ের অদ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, শুধু তদন্তর্গত সন্ন্যাসধর্ম্ম সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হওয়া সম্ভব। এই সন্ন্যাসমার্গ শ্রীশঙ্করাচার্য্য নূতন বাহির না করিলেও, উহা কলিবর্জ্জনীয়ের মধ্যে পড়ায়, উহাতে যে গৌণত্ব আসিয়াছিল তাহা তিনি অবশ্য দূর করিয়াছিলেন। কিন্তু যদি ইহারও পূর্ব্বে অন্য কোন কারণে সন্ন্যাসমার্গের প্রতি লোকের অনুরাগ উৎপন্ন না হইয়া থাকিত, তবে আচার্য্যের সন্ন্যাসমূলক মত এতটা প্রসার লাভ করিত কিনা সন্দেহ। 'এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল বাড়াইয়া দিবে' (ল্যুক. ৬. ২৯) ইহা খৃষ্ট বলিয়াছেন ধরা গেল। কিন্তু এই মতানুযায়ী লোক য়ুরোপীয় খৃষ্টান রাষ্ট্রে কত আছে তাহার বিচার করিলে দেখা যায় যে, কোন্ ধর্ম্মোপদেষ্টা কোন বিষয় ভালো বলিলেই তাহা প্রচলিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে, লোকের মন সেইদিকে যাইবার জন্য সেই উপদেশের পূর্ব্বেই কোন প্রবল কারণ ঘটিয়া থাকে, এবং তখন আবার লোকাচারের মধ্যে আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়া তদনুরূপই পরিবর্ত্তন ধর্ম্মনিয়মের মধ্যেও ঘটিয়া থাকে। আচার ধর্ম্মের মূল—এই স্মৃতি-

* পূর্ব্বে ৬০৩ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে প্রদত্ত বচন দেখ।

বচনের তাৎপর্য্যও ইহাই। শোপেনহোয়েরের গত শতাব্দীতে জর্মনিতে সন্ন্যাসধর্ম্মের সমর্থন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার রোপিত বীজ অদ্যাপিও সেখানে ভালরূপ জন্মিতে পায় নাই এবং শোপেনহোয়েরের অপেক্ষা নিৎসেরই মত এক্ষণে অধিক বিস্তার লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশেরও প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়,—সন্ন্যাসমার্গ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈদিককালেই বাহির হইলেও, তাহা সে সময়ে কর্ম্মযোগকে পশ্চাতে রাখিতে পারে নাই। স্মৃতি-গ্রন্থাদি শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বলিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাতেও পূর্ব্ব আশ্রমগুলির কর্ত্তব্যপালনের উপদেশ দেওয়াই হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থে কর্ম্ম-সন্ন্যাসপক্ষ প্রতিপাদিত হইলেও, তাঁহার নিজের জীবন হইতেই ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, জ্ঞানীব্যক্তির এবং সন্ন্যাসীর ও ধর্ম্মসংস্থাপনের মত লোকসংগ্রহের কাজ যথাধিকার করিতে তাঁহার দিক হইতে কোন মানা ছিল না (বেসূ. শাং. ভা. ৩, ৩০, ৩২)। সন্ন্যাসমার্গের প্রাবল্যের কারণ যদি শঙ্করাচার্য্যের স্মার্তসম্প্রদায়ই হইত, তবে আধুনিক ভাগবত সম্প্রদায়ের রামানুজাচার্য্য স্বকীয় গীতাভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যেরই মত কর্ম্মযোগকে গৌণ বলিয়া মানিতেন না। কিন্তু যে কর্ম্মযোগ একবার বহুল প্রচলিত ছিল তাহা যখন ভাগবত সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিবৃত্তিমূলক ভক্তিকে পিছনে হটাইয়া দিয়াছে, তখন তো ইহাই বলিতে হয় পশ্চাতে পড়িবার পক্ষে এমন কোন কারণ অবশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, যাহা সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি কিংবা সমস্ত দেশের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য। আমাদের মতে ইহাদের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের উদয় ও প্রসার প্রথম ও মুখ্য কারণ; এই দুই ধর্ম্মই চারি বর্ণের সম্মুখে সন্ন্যাসমার্গের দ্বার খুলিয়া দেওয়ায়, ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যেও সন্ন্যাসধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল। কিন্তু বুদ্ধ প্রথমে কর্ম্মশূন্য সন্ন্যাসমার্গেরই উপদেশ করিলেও বৌদ্ধ যতিরা, গণ্ডারের মত বনের মধ্যে এককোণে থাকিয়া তাঁহার ধর্ম্ম-প্রচার ও পরোপকার-চেষ্টায় নিরত থাকিবে, গীতার কর্ম্মযোগানুসারে বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে পরে শীঘ্রই এই সংস্কার সাধিত হইয়াছিল (পরিশিষ্ট প্রকরণ দেখ)। ইতিহাস হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, এই সংস্কার সাধন প্রযুক্তই উদ্যোগী বৌদ্ধ যতিদিগের সংঘ উত্তরে তিব্বৎ, পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপান, দক্ষিণে লঙ্কা এবং পশ্চিমে তুর্কিস্থান এবং তাহার সংলগ্ন গ্রীস প্রভৃতি য়ুরোপের প্রান্ত দেশেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শালিবাহন শকের ন্যূনাধিক ছয়সাতশত বৎসর পূর্ব্বে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জন্মগ্রহণ করেন। এবং শালিবাহন শকের ছয় শত বৎসর পরে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয়। এই কালের মধ্যে, বৌদ্ধ যতিদিগের সংঘের অপূর্ব্ব বৈভব সমস্ত লোকের চক্ষের সম্মুখে থাকায় যতিধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের একপ্রকার অনুরাগ ও আদরবুদ্ধি শঙ্করাচার্য্য জন্মিবার পূর্ব্বেই উৎপন্ন হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের খণ্ডন করিলেও যতিধর্ম্মসম্বন্ধে লোকের মধ্যে যে আদর-বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার তিনি নাশসাধন না করিয়া তাহাকেই বৈদিক রূপ দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বৈদিকধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অনেক উদ্যোগী বৈদিক সন্ন্যাসীর সৃষ্টি করিলেন। এই সকল সন্ন্যাসী ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসীর দণ্ড ও গেরুয়া বস্ত্রও গ্রহণ করিত সত্য; কিন্তু নিজেদের গুরুর মত ইহারাও বৈদিকধর্ম্ম সংস্থাপনের কাজ পরে চালাইয়াছিল। যতি-সংঘের এই নূতন প্রতিরূপ (বৈদিক সন্ন্যাসীদের সংঘ) দেখিয়া, সে সময়ে অনেক লোকের মনে সন্দেহ হইতে লাগিল যে, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মত ও বৌদ্ধমতের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য থাকে, তবে তাহা কি? এবং প্রতীতি হয় যে, প্রায় সেই সন্দেহই দূর করিবার জন্যই ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষ্যে আচার্য্য লিখিয়াছেন যে, "বৌদ্ধ-যতিধর্ম্ম ও সাংখ্য-যতিধর্ম্ম উভয়ই বেদবহির্ভূত ও মিথ্যা; এবং আমাদের সন্ন্যাসধর্ম্ম বেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহাই সত্য" (ছাং, শাং ভা, ২, ২৩, ১)। যাহাই হউক; ইহা নির্ব্বিবাদ যে, কলিযুগে প্রথম প্রথম যতিধর্ম্মের প্রচার বৌদ্ধ ও জৈনেরাই করিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধযতিরাও ধর্ম্মপ্রচারার্থ এবং লোক-সংগ্রহার্থ যে কর্ম্ম করিবার ছিল তাহা পরে করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ইহাদিগকে পরাভূত করিবার জন্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য যে বৈদিক যতিসংঘ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহারাও কর্ম্ম একেবারে ছাড়িয়া না দিয়া আপন উদ্যোগেই বৈদিক-ধর্ম্মের পুনঃস্থাপনা করিয়াছিল। অনন্তর শীঘ্রই এই দেশের উপর মুসলমানদিগের অভিযান আরম্ভ হইল; এবং যখন এই পরচক্র হইতে পরাক্রমসহকারে রক্ষা করিয়া দেশের ধারণপোষণকারী ক্ষত্রিয় রাজাদিগের কর্ত্তৃত্বশক্তির মুসলমানদিগের সময় হ্রাস হইতে লাগিল, তখন সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই মার্গের মধ্যে সন্ন্যাস-মার্গই সাংসারিক লোকদিগের অধিকাধিক গ্রাহ্য হইয়া থাকিবে, কারণ "হরি হরি" বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিবার একদেশীয় মার্গ প্রাচীন কাল হইতেই কাহারও কাহারও দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ মনে হইত এবং এখন তো তৎকালীন বাহ্য পরিস্থিতির জন্যও ঐ মার্গই বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে এই অবস্থা ছিল না; কারণ শূদ্র কমলাকরের মধ্যে গৃহীত বিষ্ণুপুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোক হইতেও ইহাই স্পষ্ট প্রকাশ পায়—

অপহায় নিজং কর্ম কৃষ্ণকৃষ্ণেতিবাদিনঃ।
তে হরেৰ্দ্বেষিণঃ পাপাঃ ধর্মার্থং জন্ম যদ্ধরেঃ॥ *

অর্থাৎ "নিজের (স্বধর্মোক্ত) কর্ম ছাড়িয়া (কেবল) যাহারা 'হরি হরি' বলে সেই সব লোক হরির দ্বেষ্টা ও পাপী, কারণ, স্বয়ং হরির জন্মও তো ধর্মরক্ষণার্থই হইয়াছে"। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, এই সমস্ত লোক সন্ন্যাসনিষ্ঠও নহে, কর্মযোগীও নহে। কারণ, ইহারা সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় জ্ঞান বা তীব্র বৈরাগ্যযোগে সাংসারিক কর্ম ছাড়ে না; এবং সংসারে থাকিয়াও কর্মযোগানুসারে শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত আপন কর্তব্য নিষ্কামবুদ্ধিতে করে না। তাই, এই বাচিক সন্ন্যাসীদের গণনা এক স্বতন্ত্র তৃতীয় নিষ্ঠার মধ্যে করিতে হইবে—তাহা গীতায় বর্ণিত হয় নাই। যে কারণেই হউক না কেন, লোকেরা এই প্রকারে তৃতীয় প্রকৃতিগ্রস্ত হইলে শেষে ধর্মেরও নাশ না হইয়া যায় না। ইরাণের পার্শীধর্ম পশ্চাতে পড়িবার জন্যও এই প্রকার অবস্থাই কারণ হইয়াছি; এবং ইহা হইতেই ভারতেরও বৈদিক-ধর্মের "সমূলংচ বিনশ্যতি" হইবার সময় আসিয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের হ্রাসের পর, বেদান্তের সঙ্গে সঙ্গেই গীতার ভাগবতধর্মের যে পুনরুজ্জীবন হইতেছিল, তাহার দরুণ আমাদের দেশে এই দুষ্পরিণাম ঘটে নাই। দৌলতাবাদের হিন্দুরাজ্য মুসলমান কর্তৃক বিধ্বস্ত হইবার কয়েক বৎসর পূর্বেই আমাদের সৌভাগ্যক্রমে শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ ভগবদ্গীতাকে দেশীয় ভাষাতে পরিণত করিয়া ব্রহ্মবিদ্যাকে মহারাষ্ট্রপ্রান্তে অতি সুগম করিয়া দিয়াছিলেন; এবং ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশেও এই সময়েই অনেক সাধুসন্তেরা গীতার ভক্তিমার্গের উপদেশ প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। যবন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডালাদিকে সমানভাবে প্রদত্ত জ্ঞানমূলক গীতাধর্মের জাজ্বল্যমান উপদেশ (চাই তাহা বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরূপেই হৌক না কেন) চতুর্দিকে একই সময়ে প্রচলিত থাকায়, হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ হ্রাস হইবার কোন ভয় ছিল না। শুধু তাহাই নহে; তাহার অল্পস্বল্প প্রভাব মুসলমানধর্মের উপরেও পড়িতেছিল, যাহার ফলে কবীরের মত সাধু এই দেশের সন্তমণ্ডলীর মধ্যে মান্য হইয়াছিলেন এবং ঔরংজেবের বড় ভাই শাহাজাদা দারা উপনিষদের ফার্সি ভাষান্তর এই সময়েই আপন তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বৈদিক ভক্তিধর্ম অধ্যাত্মজ্ঞানকে ছাড়িয়া যদি শুধু তান্ত্রিক শ্রদ্ধার ভিত্তির উপরেই খাড়া হইত, তবে উহাতে এই বিশেষ সামর্থ্য থাকিতে পারে কিনা তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু ভাগবতধর্মের এই আধুনিক পুনরুজ্জীবন মুসলমানদিগের সময়ে হওয়ায় তাহাও অনেকাংশে কেবল ভক্তিপর অর্থাৎ একদেশদর্শী হইয়া, মূল ভাগবতধর্মোক্ত কর্মযোগের যে স্বতন্ত্র মহত্ত্ব একবার হ্রাস হইয়াছিল, তাহা আর সেই মহত্ত্ব ফিরিয়া পাইল না। ফলত এই সময়কার ভাগবতধর্মীয় সন্তমণ্ডলী, পণ্ডিত ও আচার্য্যেরাও কর্মযোগ সন্ন্যাসমার্গের অঙ্গ কিংবা সাধন এইরূপ না বলিয়া উহা ভক্তিমার্গের অঙ্গ এইরূপ বলিতে লাগিলেন। তৎকালে প্রচলিত এই ধারণার বিরুদ্ধে কেবল শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী নিজের 'দাসবোধ' গ্রন্থে আমি যতদূর জানি—বিচার করিয়াছেন। কর্মমার্গের প্রকৃত মহত্ত্ব শুদ্ধ ও সরল মারাঠা ভাষায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা যদি কেহ দেখিতে চান তবে সমর্থের দাসবোধ এবং বিশেষতঃ তাহারই উত্তরার্দ্ধ তাঁহার পাঠ করা উচিত। শ্রীসমর্থের উপদেশই শিবাজী মহারাজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং মারাঠী রাজত্বের সময়ে যখন কর্মযোগের তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাহার প্রচার করা আবশ্যক বিবেচিত হইতে লাগিল, তখন শাণ্ডিল্যসূত্র কিংবা ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের বদলে মহাভারতের গদ্যাত্মক ভাষান্তর হইয়া 'বখর' নামক ইতিহাসের আকারে তাহার অনুশীলন সুরু হইল। এই ভাষান্তর তঞ্জোরের পুস্তকালয়ে অদ্যাপি সংরক্ষিত হইয়াছে। এই ক্রমই যদি পরে বহুকাল অবাধিতভাবে চলিত তাহা হইলে গীতার একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণ সমস্ত টীকা পিছনে পড়িয়া মহাভারতীয় সমস্ত নীতির সার গীতোক্ত কর্মযোগে হইয়াছে এই কথা কালক্রমে পুনর্বার সকলের গোচরে না আসিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু কর্মযোগের এই পুনরুজ্জীবন আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বেশী দিন টিঁকে নাই।

যাক্। ভারতের ধর্মসম্বন্ধীয় ইতিহাস আলোচনা করিবার এস্থান নহে। উপরি-উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে যে, গীতাধর্মের যে এক-প্রকার সজীবতা, তেজ বা সামর্থ্য আছে, তাহা সন্ন্যাস-ধর্মের সেই প্রাদুর্ভাব হইতেও সম্পূর্ণ নষ্ট হইতে পায় নাই যাহা মধ্যকালে দৈববলে হইয়াছিল। ধর্মশব্দের ধাত্বর্থ "ধারণাদ্ধর্মঃ" এবং সাধারণতঃ উহার এই দুই ভেদ হইয়া থাকে 'পারলৌকিক' ও 'ব্যবহারিক', কিংবা 'মোক্ষ-ধর্ম' ও 'নীতিধর্ম', ইহা আমি তৃতীয় প্রকরণে বলিয়াছি। বৈদিক ধর্মই বল, বৌদ্ধধর্মই বল কিংবা খৃষ্টধর্মই বল, জগতের ধারণপোষণ হইয়া শেষে মনুষ্য যাহাতে সদ্গতি পায় ইহাই সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায়, মোক্ষ-ধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই, ঐ প্রত্যেক ধর্মে, ন্যূনাধিক পরিমাণে ব্যবহারিক ধর্মাধর্মেরও আলোচনা আসিয়াছে। অধিক কি, প্রাচীনকালেই মোক্ষধর্ম স্বতন্ত্র ও ব্যবহারিকধর্ম

* বোম্বায়ে মুদ্রিত বিষ্ণুপুরাণের সংস্করণে এই শ্লোক আমি পাই নাই; তথাপি কমলাকর ভট্টের ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থকারের গৃহীত হওয়ায় তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করা যায় না।

স্বতন্ত্র এই ভেদই করা হইত না এইরূপ বলিলেও চলে; কারণ, সে সময়ে পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে হইলে, ইহলোকেও আচরণকে শুদ্ধই রাখা চাই সকলেরই এই ধারণাই ছিল। গীতার কথিত অনুসারে পারলৌকিক ও ঐহিক কল্যাণের ভিত্তিও একই, এইরূপ তাহারা মনে করিত। কিন্তু আধিভৌতিক জ্ঞানের প্রসার হইলে পর আজকাল পাশ্চাত্যদেশে এই ধারণা বজায় না থাকিয়া, মোক্ষধর্ম্মবর্জ্জিত নীতির অর্থাৎ যে সকল নিয়মের দ্বারা জগতের ধারণপোষণ হয় সেই সকল নিয়মের উপপত্তি বলিতে পারা যায় কিনা এই বিচার সুরু হইয়া কেবল আধিভৌতিক অর্থাৎ দৃশ্য কিংবা ব্যক্ত ভিত্তির উপরেই সমাজধারণশাস্ত্রের রচনা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার উপর এই প্রশ্ন আসে যে, শুধু ব্যক্তের দ্বারা মনুষ্যের কাজ চলিবে কি করিয়া? গাছ, মানুষ এই সকল জাতিবাচক শব্দ পর্য্যন্ত অব্যক্ত অর্থই প্রকাশ করে। আমগাছ, গোলাপগাছ এই সকল বিশিষ্ট বস্তু দৃশ্য পদার্থ বটে, কিন্তু 'গাছ' এই সাধারণ শব্দ, কোন দৃশ্যবস্তুকে কিংবা ব্যক্ত বস্তুকে দেখাইতে পারে না। এইরূপেই আমাদের সমস্ত ব্যবহার চলিতেছে। অব্যক্তের কল্পনা মনে জাগৃত হইবার জন্য প্রথমে কোন ব্যক্ত বস্তু চোখের সম্মুখে থাকা চাই—এই কথা ইহা হইতে স্পষ্ট হইতেছে; কিন্তু ইহাও তেমনি নিশ্চিত যে, ব্যক্তই শেষের পৈঠা নহে; এবং অব্যক্তের আশ্রয় ব্যতীত একপদও আমরা অগ্রসর হইতে পারি না এবং কোন বাক্যই সম্পূর্ণ করিতে পারি না। তাই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, সর্ব্বভূতাত্মৈক্যরূপ পরব্রহ্মের অব্যক্ত কল্পনাকে নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি যদি না স্বীকার কর, তথাপি উহার স্থলে "সমস্ত মানবজাতি"কে অর্থাৎ এই চক্ষুর অগোচর অতএব অব্যক্ত বস্তুকেই শেষে দেবতার মত পূজা করিতে হয়। আধিভৌতিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, "সমস্ত মানবজাতি"তে পূর্ব্ববংশের ও পরবংশেরও সমাবেশ করিলে অমৃতত্ব সম্বন্ধে মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তৃপ্ত হওয়া উচিত; এবং এক্ষণে প্রায় তাঁহারা সকলেই খুব আগ্রহের সহিত উপদেশ করিতে সুরু করিয়াছেন যে, প্রীতির সহিত অনন্যভাবে এই (মানবজাতিরূপ) বড় দেবতার উপাসনা করা, তাহার সেবায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করা, এবং তাহার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বলিদান করাই এই জগতে প্রত্যেক মনুষ্যের পরম কর্ত্তব্য। ফরাসী পণ্ডিত কোঁৎ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মের ইহাই সার, এবং এই ধর্ম্মকেই স্বকীয় গ্রন্থে তিনি "সমস্ত-মানবজাতিধর্ম্ম" কিংবা সংক্ষেপে বলিতে হইলে "মানব-ধর্ম্ম" নামে অভিহিত করিয়াছেন। * আধুনিক জর্ম্মন পণ্ডিত নিৎসেরও এই কথা। ঊনবিংশতি শতাব্দীতে "পরমেশ্বর গতাসু হইয়াছেন" এবং অধ্যাত্মশাস্ত্র সমস্তই মিথ্যা বলিয়া ইনি স্পষ্ট বিধান দিয়াছেন। তথাপি তিনি আধিভৌতিক দৃষ্টিতে কর্ম্ম-বিপাক ও পুনর্জ্জন্মের চক্র স্বীকার করিয়া স্বকীয় সমস্ত গ্রন্থেই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কাজ এমন করা উচিত যে পুনঃ পুনঃ প্রতিজন্মে করিতে পারা যায় এই প্রকার কার্য্য করা এবং যাহার সর্ব্বত্র মনোবৃত্তি অত্যন্ত বিকশিত হইয়া পূর্ণাবস্থায় পৌঁছিয়াছে এইরূপ মানবীয় জীব যাহাতে করিয়া পরে গঠিত হইতে পারে সেইপ্রকার সমাজব্যবস্থা স্থাপন করা—ইহাই এই জগতে মনুষ্যমাত্রের কর্ত্তব্য ও পরমসাধ্য। ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রকে যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকেও কর্ম্মাকর্ম্মের আলোচনা করিবার সময় কোন-না-কোন পরমসাধ্য আছে বলিয়া মানিতে হয়—এবং তাহাও একপ্রকার অব্যক্তই। কারণ, সমস্ত মানবজাতিরূপ মহাদেবতার উপাসনা করিয়া সমস্ত মনুষ্যের হিতসাধন করাই বল, কিংবা ভবিষ্যতে কোন-না-কোন সময়ে অত্যন্ত পূর্ণাবস্থায় উপনীত মনুষ্য যাহা দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে এইরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করাই বল—আধিভৌতিক নীতিশাস্ত্রজ্ঞদিগের এই দুই ধ্যেয় থাকিলেও যাহাদিগকে এই দুই ধ্যেয় সম্বন্ধে উপদেশ করিবার কথা,—তাহাদিগের দৃষ্টিতে উহা অগোচর বা অব্যক্তই থাকিয়া যায়। কোঁৎ কিংবা নিৎসের এই উপদেশ খৃষ্ট-ধর্ম্মের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানরহিত শুধু আধিদৈবত ভক্তিমার্গের বিরোধী হইলেও, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সর্ব্বভূতাত্মৈক্যজ্ঞানরূপ সাধ্যের বা কর্ম্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞের পূর্ণাবস্থার ভিত্তির উপর রচিত ধর্ম্মাধর্ম্মশাস্ত্রের কিংবা নীতিশাস্ত্রের ধ্যেয়-বিষয়ের মধ্যে সমস্ত আধিভৌতিক সাধ্যের সমাবেশ অবিরোধে ও সহজেই হইয়া থাকে। সেইজন্য অধ্যাত্মজ্ঞানের দ্বারা পরিপূত বৈদিকধর্ম্ম উক্ত উপদেশ হইতে কখন পিছাইয়া পড়িবে এরূপ ভীতি মনোমধ্যে পোষণ করিবার কোনই কারণ নাই। এখন প্রশ্ন এই যে, যদি অব্যক্তকেই পরমসাধ্য মানা আবশ্যক হয় তবে কেবল মানবজাতির জন্যই উহা মানিবে কেন? অর্থাৎ উহাকে সংকুচিত করা হয় কেন? পূর্ণাবস্থাকেই যদি পরম সাধ্য মনে করিতে হয় তবে পশু ও মনুষ্য এই দুয়ের পক্ষেই যাহা সাধারণ এরূপ আধিভৌতিক সাধ্য অপেক্ষা অধিক উহার মধ্যে আর কি আছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় শেষে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নিষ্পন্ন

* কোঁৎ স্বকীয় ধর্ম্মের নাম দিয়াছেন—Religion of Humanity; এবং "*A System of Positive Polity*" (Eng. trans in four Vols) নামক তাঁহার গ্রন্থে ইহার সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। কেবল আধিভৌতিক দৃষ্টিতেও সমাজধারণ কিরূপে করা যাইতে পারে এই গ্রন্থে তাহার উত্তম আলোচনা করা হইয়াছে।

সমস্ত চরাচর জগতের এক অনির্বাচ্য প্রথমতত্ত্বেরই পরিণাম হইতে হয়। আধুনিককালে আধিভৌতিক শাস্ত্রের অশ্রুতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে, এবং দৃশ্যজগৎ-সম্বন্ধে মনুষ্যের জ্ঞান পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে; এবং 'যার যেমন, তার তেমন' এই নীতি অনুসারে যে প্রাচীন রাষ্ট্র এই আধিভৌতিক জ্ঞান অর্জন করিবে না, তাহার সুসংস্কৃত নূতন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের সম্মুখে টিকিয়া থাকা অসম্ভব, ইহা নির্ব্বিবাদ। কিন্তু আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, জগতে মূলতত্ত্ব জানিবার জন্য মনুষ্যমাত্রের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, শুধু আধিভৌতিকবাদে তাহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি কখনই হইতে পারে না। কেবল ব্যক্তজগতের জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, এই কারণে স্পেনসরের মত উৎক্রান্তিবাদীও স্পষ্টরূপে স্বীকার করেন যে, নামরূপাত্মক দৃশ্যজগতের মূলে কোনরূপ অব্যক্ত তত্ত্ব অবশ্যই আছে। কিন্তু তিনি এইরূপ বলেন যে, এই নিত্য তত্ত্বের স্বরূপ জানা অসম্ভব বলিয়া তাহার ভিত্তিতে কোন শাস্ত্রের উপপত্তি করা যাইতে পারে না। জর্ম্মনতত্ত্ববেত্তা কান্টও অব্যক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের অজ্ঞেয়ত্ব স্বীকার করেন। তথাপি নীতিশাস্ত্রের উপপত্তি এই অগম্য তত্ত্বের দ্বারাই করিতে হইবে এইরূপ তাঁহার মত। শোপেনহৌয়ের ইহাও ছাড়াইয়া গিয়া, এই অগম্য তত্ত্ব বাসনারূপী এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন; এবং নীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় ইংরেজ গ্রন্থকার গ্রীনের মতে এই সৃষ্টিতত্ত্বই আত্মারূপে অংশত মনুষ্যের দেহে আবির্ভূত হইয়াছে। গীতা তো স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"। আমাদের উপনিষৎকারদিগের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, জগতের মূলে অবস্থিত এই অব্যক্ত তত্ত্ব নিত্য, একমাত্র, অমৃত, স্বতন্ত্র ও আত্মরূপ—বস্; এই সম্বন্ধে ইহা হইতে অধিক কিছু বলা যাইতে পারে না। এবং এ বিষয়ে সন্দেহ আছে যে, এই সিদ্ধান্তেরও পরে মানব-জ্ঞানের গতি কখনও যাইবে কিনা। কারণ, জগতের মূল অব্যক্ত তত্ত্ব ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ নির্গুণ হওয়ায় উহার বর্ণন গুণ, বস্তু বা ক্রিয়াপ্রদর্শক কোন শব্দের দ্বারাই হইতে পারে না; এবং সেইজন্যই উহাকে অজ্ঞেয় বলা হয়। কিন্তু অব্যক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তাহা শব্দের দ্বারা অধিক বলিতে না পারিলেও, এবং সেই জন্য দেখিতে উহা অল্প মনে হইলেও, উহাই মানবীয় জ্ঞানের সর্ব্বস্ব হওয়ায় লৌকিক নীতিমত্তারও উপপত্তি সেই অনুসারেই বলিতে হয়; এবং এইরূপ উপপত্তিই উচিত পদ্ধতিক্রমে বলিবার পক্ষে কোন বাধাই হয় না, ইহা গীতার আলোচনা হইতে সহজেই উপলব্ধি হইবে। দৃশ্যজগতের সহস্র সহস্র ব্যবহার কোন্ পদ্ধতিতে চালাইবে—যেমন মনে কর—বাণিজ্য ব্যাপার কি প্রকারে করিবে, কিরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করিবে, রোগীকে কোন্ ঔষধ কখন দিবে, সূর্য্যচন্দ্রাদির ব্যবধান কিরূপে গণনা করিবে—এই সমস্ত ঠিক জানিবার জন্য নামরূপাত্মক দৃশ্য জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানেরই নিত্য প্রয়োজন হইবে; এবং এই সমস্ত লৌকিক ব্যবহার অধিকাধিক নৈপুণ্যসহকারে করিবার সামর্থ্যলাভের জন্য নামরূপাত্মক আধিভৌতিক শাস্ত্রেরও যে বেশী বেশী অধ্যয়ন করা আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা গীতার বিষয় নহে। গীতার মুখ্য বিষয় তো ইহাই—অধ্যাত্মদৃষ্টিতে মনুষ্যের পরম শ্রেষ্ঠ অবস্থাটি কি তাহা বলিয়া, তাহারই ভিত্তিতে কর্ম্মাকর্ম্মরূপ নীতিধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কি তাহাই স্থির করা। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পরমসাধ্য (মোক্ষ) সম্বন্ধে আধিভৌতিক পন্থা উদাসীন হইলেও, অপর বিষয়ের অর্থাৎ কেবল নীতিধর্ম্মের মূলতত্ত্বনির্ণয়েও আধিভৌতিক পক্ষ অসমর্থ। এবং ইহা আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, প্রবৃত্তিস্বাতন্ত্র্য, নীতিধর্ম্মের নিত্যত্ব, এবং অমৃতত্ব অর্জ্জন করিবার জন্য মানবমনের স্বাভাবিক ইচ্ছা, ইত্যাদি গূঢ় বিষয়ের সিদ্ধান্ত আধিভৌতিক পথে নিষ্পন্ন হয় না; সেইজন্য শেষে আত্মানাত্মবিচারের মধ্যে অগত্যা প্রবেশ করিতেই হয়। কিন্তু অধ্যাত্মশাস্ত্রের কাজ এইখানেই শেষ হয় এরূপ নহে। জগতের মূলভূত অমৃতত্ত্বের নিত্য উপাসনার দ্বারা এবং অপরোক্ষ অনুভবের দ্বারা মানবাত্মা এক-প্রকার বিশিষ্ট শান্তিলাভ করিলে তাহার শীল-স্বভাবে যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহাই সদাচরণের মূল; তাই ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, মানব-জাতির পূর্ণাবস্থা বিষয়েও অধ্যাত্মশাস্ত্রের সহায়তায় যেরূপ উত্তম নির্ণয় হইয়া থাকে, সেরূপ কেবল আধিভৌতিক সুখবাদের দ্বারা হয় না। কারণ, কেবল বিষয়সুখ তো পশুদিগের সাধ্য; ইহা দ্বারা জ্ঞানবান মনুষ্যের বুদ্ধির কখনও পূর্ণ তৃপ্তি হইতে পারে না; সুখদুঃখ অনিত্য এবং ধর্ম্মই নিত্য—ইহা পূর্ব্বেই সবিস্তারে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, গীতার পারলৌকিক ধর্ম্ম ও নীতিধর্ম্ম উভয়ই জগতের মূল নিত্য ও অমৃত তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিপাদিত হওয়ায় এই পরম অবস্থার গীতাধর্ম্ম, মনুষ্য কেবল এক উচ্চ শ্রেণীর জীব, এইরূপ দৃষ্টিতে মানবীয় সমস্ত কার্য্যের বিচার যে আধিভৌতিক শাস্ত্র করে, সেই নিছক্ আধিভৌতিক শাস্ত্রের নিকট কখনও হার মানিতে পারে না। কারণ আমাদের গীতাধর্ম্ম নিত্য ও অভয় হইয়া গিয়াছে এবং স্বয়ং ভগবানই উহাতে এমন সুনিবদ্ধ

করিয়া রাখিয়াছেন যে, হিন্দুদিগকে এই বিষয়ে অন্য কোন গ্রন্থের, ধর্ম্মের বা মতের দিকে চাহিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। সমস্ত ব্রহ্মজ্ঞানের নিরূপণ করিবার পর "অভয়ং বৈ প্রাপ্তোহসি"—এখন তুমি অভয় হইলে—(বৃ. ৪. ২. ৪) এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্য যাহা জনকরাজাকে বলিয়াছেন, তাহাই এই গীতাধর্ম্মের জ্ঞানসম্বন্ধেও অনেকার্থে অক্ষরশঃ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

গীতাধর্ম কিরূপ? উহা সর্ব্বোপরি নির্ভয় ও ব্যাপক; উহা সম অর্থাৎ বর্ণ, জাতি, দেশ প্রভৃতির কোন ভেদ না রাখিয়া সকলকেই একই দাঁড়িপাল্লার দ্বারা সমান সদ্গতি দেয়; উহা অন্য সমস্ত ধর্ম্মসম্বন্ধে সমুচিত সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে; উহা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযুক্ত; অধিক কি, উহা সনাতন বৈদিক ধর্ম্মবৃক্ষের অত্যন্ত মধুর ও অমৃত ফল। বৈদিকধর্ম্মে গোড়ায় দ্রব্যময় বা পশুময় যজ্ঞের অর্থাৎ নিছক্ কর্ম্মকাণ্ডেরই অধিক মাহাত্ম্য ছিল; কিন্তু পরে উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা এই নিছক্ কর্ম্মকাণ্ডমূলক শ্রৌতধর্ম্ম গৌণ বিবেচিত হইলে পর সাংখ্যশাস্ত্রেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু এই জ্ঞান সাধারণ লোকের অগম্য ছিল এবং ইহার টানও কর্ম্মসন্ন্যাসের দিকেই বিশেষরূপে ছিল, তাই কেবল ঔপনিষদিক ধর্ম্মের দ্বারা কিংবা দুয়ের স্মার্ত্ত-সমন্বয়ের দ্বারাও সাধারণ লোকের পূর্ণ সন্তোষ হইতে পারে নাই। এই জন্য উপনিষদের নিছক বুদ্ধিগম্য ব্রহ্মজ্ঞানকে প্রেমগম্য ব্যক্ত উপাসনার রাজগুহ্যের সহিত জুড়িয়া দিয়া, কর্ম্মকাণ্ডের প্রাচীন পরম্পরা-অনুসারে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া গীতাধর্ম্ম সকলকে মুক্তকণ্ঠে ইহাই বলিতেছেন যে, "তুমি নিজ যোগ্যতানুরূপ নিজ সাংসারিক কর্ত্তব্য লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কাম বুদ্ধিতে, আত্মৌপম্যদৃষ্টিতে ও উৎসাহ সহকারে যাবজ্জীবন করিতে থাকিয়া তদ্দ্বারা জড় ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বভূতে একভাবে ব্যাপ্ত নিত্য পরমাত্মদেবতার সর্ব্বদা উপাসনা কর, তাহাতেই তোমার পারলৌকিক ও ঐহিক কল্যাণ"। ইহা দ্বারা কর্ম্ম, বুদ্ধি (জ্ঞান) ও প্রেম (ভক্তি) এই তিনের মধ্য হইতে বিরোধ অন্তর্হিত হইয়া সমস্ত জীবনই যজ্ঞময় করিবার জন্য যিনি বলিতেছেন সেই একমাত্র গীতাধর্ম্মে সমস্ত বৈদিক ধর্ম্মের সার আসিয়াছে। এই নিত্যধর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া, কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া, সর্ব্বভূতহিতার্থ যত্নবান শত শত মহাত্মা ও কর্ত্তা বা বীরপুরুষ যখন এই পবিত্র ভারতভূমিকে অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, তখন এই দেশ পরমেশ্বরের কৃপার পাত্র হইয়া শুধু জ্ঞানের নহে, ঐশ্বর্য্যেরও শিখরে পৌঁছিয়াছিল; এবং ইহা কাহাকেও আর বলিতে হইবে না যে, যখন অবধি উভয় লোকের সাধক এই শ্রেয়স্কর ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইল সেই অবধিই এই দেশের নিকৃষ্ট অবস্থা শুরু হইল। এইজন্য ভগবানের নিকট আশাপূর্ণ শেষ প্রার্থনা এই যে, ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ত্তৃত্বের যথোচিত মিলনকারী এই সম ও তেজস্বী গীতাধর্ম্মের অনুসারে পরমেশ্বরের ভজনপূজন-সাধক সৎপুরুষ এই দেশে আবারও উৎপন্ন হউন এবং শেষে উদার পাঠকগণের নিকটে নিম্নোক্ত মন্ত্র (ঋ. ১০. ১৯১. ৪) দ্বারা এই বিনতি করিয়া গীতার এই রহস্যালোচনা এইখানেই সমাপ্ত করিতেছি যে, এই গ্রন্থে কোথাও ভ্রমবশত কিছু ন্যূনাধিক কথা থাকিলে তাহা সমদৃষ্টি দ্বারা সংশোধন করিয়া লইবেন—

সমানী ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥
যথা বঃ সুসহাসতি॥ *

* এই মন্ত্র ঋগ্বেদ সংহিতার শেষে প্রদত্ত হইয়াছে। যজ্ঞমণ্ডপে সমবেত লোকদিগের উদ্দেশে এই অভিভাষণ। অর্থ—"তোমাদের অভিপ্রায় সমান হউক, তোমাদের অন্তঃকরণ সমান হউক, এবং তোমাদের মন সমান হউক; যাহাতে তোমাদের সুসহ। অর্থাৎ সংঘশক্তির দৃঢ়তা হইবে"। অসতি—অস্তির বৈদিক রূপ। 'যথা বঃ সুসহাসতি' ইহার দ্বিরুক্তি গ্রন্থের সমাপ্তি দেখাইবার জন্য করা হইয়াছে।

তৎসৎ ব্রহ্মার্পণমস্তু॥

গান।

(কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ)

আমার দাঁড়াবার ঠাঁই কেড়ে নিয়ে
ফেলে দিলে কাঁটার মাঝে—
আমার নড়্‌তে চড়্‌তে উঠ্‌তে বস্‌তে
ব্যথা যে গো বিষম বাজে!
প্রভু হে দয়া করে' পায়ের কাছে
লওনা তুলে—এ দীন যাচে—
আমার রক্ত রাঙ্গা ভাঙ্গা বুক্ যে
যাচ্চে জ্বলে' সকাল সাঁজে!

কিশোরীচাঁদ মিত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(জন্ম ও বংশপরিচয়। প্যারীচাঁদ মিত্র।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৮২২ খৃষ্টাব্দে ২২শে মে নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটস্থ পৈত্রিক ভবনে কিশোরীচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন।

কিশোরীচাঁদের পিতামহ গঙ্গাধর মিত্র সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইহাঁদিগের আদি নিবাস হুগলী

জিলায় পাণিসেহালা গ্রামে। গঙ্গাধর ত্রৈলোক্যপতি রামদুলাল সরকারের আশ্রয়দাতা, হাটখোলার বিখ্যাত ধনী মদনমোহন দত্তের এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং কলিকাতায় ব্যবসায়বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। ইনি রামদুলাল সরকারের কারবারের একজন অংশীদার ছিলেন। ইনি একজন সাধু ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। নিমতলা ষ্ট্রীটে এখনও ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির দৃষ্ট হয়।

গঙ্গাধরের তিন পুত্র—রামনারায়ণ, নিমাইচরণ ও নন্দলাল।

জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ তীক্ষ্ন বুদ্ধি, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা বিলক্ষণ অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি কোম্পানীর কাগজ, হুণ্ডী প্রভৃতির ব্যবসায় দ্বারা আপনার অবস্থার বিশেষ উন্নতিসাধন করেন এবং একটি জমিদারী ক্রয় করেন। তিনি রামমোহন রায়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং ধর্ম্মপুস্তকের ও ধর্ম্মসঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। ইনিই রাধামোহন সেনের সাহায্যে 'সঙ্গীততরঙ্গ' নামক উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকখানি সে কালের সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট সবিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইনি কোন্নগরনিবাসী রামমোহন ঘোষের কন্যা আনন্দময়ীর পাণিগ্রহণ করেন। রামনারায়ণের পাঁচ পুত্র—মধুসূদন, শ্যামচাঁদ, নবীনচাঁদ, প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ। শ্যামচাঁদ ষোড়শ বর্ষ বয়সেই গতাসু হন। মধুসূদন ও নবীনচাঁদ পিতার তত্ত্বাবধানে জমীদারীসংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হন। প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ সাহিত্যসেবা ও দেশসেবা দ্বারা তাঁহাদিগের নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

কিশোরীচাঁদের শৈশবের বিশেষ বিবরণ কিছু অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু প্রকাশ আছে যে, তিনি জনকজননীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া পিতামাতারও অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। কিশোরীচাঁদের জননী আনন্দময়ী এক দিকে যেরূপ বুদ্ধিমতী ছিলেন অন্য দিকে সেইরূপ কোমলপ্রাণা ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। যদিও তাঁহাদিগের সময়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না, তথাপি আনন্দময়ী বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষিতা ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র, 'আধ্যাত্মিকা'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন, যখন তিনি পাঠশালায় প্রথম শিক্ষাগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পিতামহী, মাতাঠাকুরাণী ও পিতৃব্যপত্নীগণকে বাঙ্গালা পুস্তকাদি পাঠ করিতে দেখিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের প্রতিও কিশোরীচাঁদের অসীম অনুরাগ ছিল। বিশেষতঃ প্যারীচাঁদকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন; প্যারীচাঁদেরও কনিষ্ঠের প্রতি অসাধারণ স্নেহ ছিল। প্যারীচাঁদ নিজে একজন কর্ম্মব্রত মহাপুরুষ ছিলেন এবং তিনি বালক কিশোরীচাঁদের হৃদয়ে যে প্রভাব অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা কখনও মুছিয়া যায় নাই। জীবনে দুই ভ্রাতা দুইটি বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই,—কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য এক, লক্ষ এক ছিল। অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে দেশবাসিগণকে জ্ঞানের আলোকে লইয়া যাইবার জন্য, কুসংস্কারের উচ্ছেদসাধন করিবার জন্য, কুৎসিত আচার হইতে সমাজকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, দেশের রাজনীতিক অবস্থাকে উন্নত করিবার জন্য—এক কথায়, দেশের শিক্ষা, নীতি, ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতিসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধনের জন্য তাঁহারা উভয়েই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সাধনা ভিন্ন প্রকারের হইলেও উভয়ের মন্ত্র এক। এই দেশহিতব্রত-মন্ত্রে কিশোরীচাঁদ প্যারীচাঁদ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্যারীচাঁদই তাঁহার জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে প্যারীচাঁদের প্রভাব অসাধারণ। কিশোরীচাঁদের চরিত্র, রুচি ও শিক্ষাবিষয়ে প্যারীচাঁদের কিরূপ প্রভাব ছিল, বুঝিতে হইলে প্যারীচাঁদের জীবনসম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের কথা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১২২১ বঙ্গাব্দে ৮ই শ্রাবণ দিবসে (২২ শে জুলাই, ১৮১৪ খৃঃ অব্দে) প্যারীচাঁদ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যে একজন গুরুমহাশয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় এবং পরে একজন মুন্সী-কর্ত্তৃক পারসিক ভাষায় শিক্ষিত হন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ইনি হিন্দুকালেজে একাদশ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। প্রথম প্রথম উচ্চারণদোষ

ও গ্রাম্যতার জন্য তিনি সহপাঠীদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা, প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও আশ্চর্য্য মেধা শিক্ষক ও সহপাঠীদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় স্যার জন পিটার গ্রাণ্ট একবার একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধরচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্যারীচাঁদ তাঁহার সহপাঠী দিগম্বর মিত্র ও অন্যান্য প্রতিভাশালী ছাত্রগণকে পরাজিত করিয়া উহা লাভ করেন। যখন তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েন, তখন তিনি ১৬৲ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ছাত্রজীবনে এই বৃত্তিলাভ তখন অত্যন্ত সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। প্যারীচাঁদ গণিতশাস্ত্রে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু গণিতাধ্যাপক ডাক্তার টাইট্‌লার তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। প্যারীচাঁদ বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন। এই কারণে ডাক্তার টাইট্‌লার তাঁহাকে "দার্শনিক" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কথিত আছে, একদা স্যার জন গ্রাণ্ট কালেজ পরিদর্শনকালে কোনও ছাত্র দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন কি না, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উক্ত ডাক্তার প্যারীচাঁদকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিয়াছিলেন, "এই যে আমাদের দার্শনিক মহাশয়।" *

প্যারীচাঁদের পঠদ্দশায় হিন্দু কলেজ এক মহাপুরুষের প্রভাবে এক নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এই মহাপুরুষ আর কেহই নহেন—জ্ঞানবীর মহাত্মা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। কলেজের তৎকালীন ছাত্রগণের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল। এই অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক অসাধারণ প্রতিভা ও জ্ঞান লইয়া যখন হিন্দু কলেজের সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, তখন সত্য সত্যই ছাত্রগণের হৃদয়ে এক নবভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। তিনি ছাত্রগণের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে যে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নির্ভীকতা ও স্বাধীনতার সহিত সার সত্যের অনুশীলন করিতে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা বিফল হয় নাই। দেশপ্রাণ বাগ্মী রামগোপাল, ধর্ম্মপ্রাণ সত্যনিষ্ঠ রামতনু, কর্ম্মব্রত সুপণ্ডিত রসিকপ্রসাদ, ব্রহ্মনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ, পরহিতব্রত পুণ্যশ্লোক শিবচন্দ্র, জ্ঞানবীর কৃষ্ণমোহন, আদর্শচরিত্র প্যারীচাঁদ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি এই মহাপুরুষের সংসর্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবন ও কার্য্য সমালোচনা করিলে উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। কিশোরীচাঁদ তাঁহার "হিন্দুকালেজের ইতিহাস" নামক বিখ্যাত সন্দর্ভে এই মহাত্মার শিক্ষাপ্রণালীর সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ—"শিক্ষকরূপে তিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য শিক্ষকদিগের অপেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রবল ছিল। তিনি মনে করিতেন যে, কেবল শব্দমালা নহে, পরন্তু বিষয়শিক্ষাদানও তাঁহার কর্ত্তব্য; কেবল মস্তিষ্কের নহে, পরন্তু হৃদয়ের বিকাশসাধনও তাঁহার কর্ত্তব্য। এই বিশ্বাসে কার্য্য করিয়া তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ভাবিতে শিখাইতেন; এ দেশবাসীরা যে প্রাচীন গোঁড়ামীর শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিলেন, সে শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে শিখাইতেন। মনস্তত্ত্বে ও নীতিদর্শনে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল; তিনি ছাত্রদিগকে সেই সব বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ডিরোজিও তাঁহাদিগকে লক্, রীড, ষ্টুয়ার্ট ও ব্রাউনের মত বুঝাইতেন। তিনি তাঁহার অধ্যাপনায় পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির ও তর্ককৌশলের যে মৌলিকতা দেখাইতেন, তাহা সার উইলিয়ম হ্যামিল্টনের মৌলিকতা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু তিনি কেবল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াই নিরস্ত হইতেন না; পরন্তু নিজ গৃহে, তর্কসভায় ও অন্যান্য স্থানে ছাত্রদিগকে আপনার জ্ঞানসম্পৎসম্ভার দান করিয়া পুলকিত হইতেন।"

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইনি ছাত্রগণের চিত্ত ও চরিত্র বিকাশের জন্য একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামক একটী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্যারীচাঁদ ডিরোজিওর অন্যান্য ছাত্রগণের সহিত এই সভায় আগ্রহের সহিত জ্ঞানানুশীলন করিতে লাগিলেন এবং শিক্ষার চিরবন্ধু ডেভিড্ হেয়ার ও ডিরোজিও

* Lokenath Ghose—Indian Chiefs.

তাঁহাদের সত্যজ্ঞানের পথপ্রদর্শক হইলেন। এই সভায় হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ বক্তৃতা হয়, এই অভিযোগে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষগণ ডিরোজিওকে কর্ম্মচ্যুত করিবার সঙ্কল্প করেন। ইহা শুনিয়া ডিরোজিও স্বয়ং পদত্যাগ করেন (২৫শে এপ্রিল, ১৮৩১)। কিন্তু তাঁহার পদত্যাগে প্রিয়তম ছাত্রগণের সহিত তাঁহার স্নেহসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল না। পুরাতন ছাত্রগণ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন এবং নূতন ছাত্রগণ পুরাতন ছাত্রগণের নিকট হইতে তাঁহারই অভিনব মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে প্যারীচাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত হয়। তাহার কিয়দ্দিন পরে তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান এবং পরে লাইব্রেরিয়ান ও সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি জ্ঞানানুশীলনের অপূর্ব্ব সুযোগ প্রাপ্ত হন। যদিও অধিকাংশ সময় তিনি পুস্তকাদি পাঠে ব্যাপৃত থাকিতেন, তথাপি লাইব্রেরীর কার্য্যে তাঁহার বিন্দুমাত্র অমনোযোগ ছিল না। পক্ষান্তরে তাঁহার যত্নে ও পরিশ্রমে লাইব্রেরীর এতদূর উন্নতি হইয়াছিল যে, ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে তিনি সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ানের পদ ত্যাগ করিলে কিউরেটারগণ তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং পরে প্যারীচাঁদ উক্ত লাইব্রেরীর একজন কিউরেটার নিযুক্ত হয়েন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

যখন তিনি পবলিক লাইব্রেরিয়ান-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে কালাচাঁদ শেঠ ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সহিত মিলিত হইয়া তিনি বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং বিলক্ষণ লাভ করেন। ব্যবসায়ে তাঁহার স্বাভাবিক সাধুতা ইংরাজ বণিক্‌সম্প্রদায়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি গ্রেট্ ইষ্টার্ণ হোটেল কোং, পোর্ট ক্যানিং ল্যাণ্ড ইন্‌ভেষ্ট্‌মেণ্ট কোং, বেঙ্গল টি কোং, ইষ্ট ইণ্ডিয়া টি কোং, ডরং টি কোং প্রভৃতি অনেক কোম্পানির ডিরেক্টর মনোনীত হন। প্যারীচাঁদ অত্যন্ত সরলস্বভাব ছিলেন এবং সকলকেই বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার এই অযথা বিশ্বাসই তাঁহার সম্পত্তির কালস্বরূপ হইল। বিদেশীয় এজেন্টগণের প্রতারণায় অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রভূত সম্পত্তি বিনষ্ট হইল। কিন্তু "প্যারীচাঁদ মিত্র অর্থশালী হইয়াও যেরূপ ছিলেন, অর্থশূন্য অবস্থাতেও তদ্রূপ ছিলেন। তাঁহার শান্ত সমাহিত চিত্তের প্রসন্নতা কখনও নষ্ট হয় নাই; তাঁহার নীতি ও চরিত্র সাংসারিক আলোক ও ছায়ার সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া স্বীয় পুণ্য কর্ত্তব্য পালনে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।" * তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর পরে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে আপনার দুই পুত্রকে অংশীদার করিয়া লন। কিন্তু বাণিজ্যে তাঁহার পূর্ব্বসৌভাগ্য আর ফিরিয়া আইসে নাই।

লর্ড ড্যালহৌসীর শাসনকালে এতদ্দেশীয় পুলিশের নানারূপ কলঙ্ক প্রকাশিত হয় এবং তাহার জন্য যে অনুসন্ধানসভা গঠিত হয়, তাহাতে প্যারীচাঁদ এরূপ নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, সকলেই তাঁহার ব্যবহারে চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

তৎকালে দেশোন্নতিবিধায়িনী যে সকল সভার সৃষ্টি হয়, তাহার সকলগুলিতেই প্যারীচাঁদ আন্তরিকতার সহিত যোগদান করেন এবং বিবিধ দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। বিখ্যাত জর্জ্জ টমসনের উপদেশে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ যে কতিপয় "নব্যবঙ্গ" (Young Bengal) ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামক প্রথম রাজনীতিক সভা এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ইনিই উহার প্রথম সম্পাদক। পরে ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে এই সভা Landholders Association এর (জমীদার সভার) সহিত মিলিত হইয়া British Indian Association নাম ধারণ করে। প্যারীচাঁদ এই সভারও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির একজন সদস্য ছিলেন। তিনি বেথুন সোসাইটী নামক সাহিত্যসভার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। স্কুল বুক্‌সোসাইটী, ভার্ণ্যাকুলার লিটারেচার কমিটীরও তিনি সদস্য ছিলেন এবং এ দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ভারতহিতৈষিণী কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের প্রস্তাবে বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞানসভা প্রতিষ্ঠিত হইলেই ইনিই ইহার প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড কমিটী ও এগ্রি-হর্টিকাল্‌চার্যাল্ সোসাইটী প্রভৃতিতে † তিনি সদস্য ছিলেন। সার সিসিল বীডনের সময়ে বেলভিডিয়ারে যে কৃষিপ্রদর্শনী হইয়াছিল, প্যারীচাঁদ তাহার একজন বিচারক মনোনীত হইয়াছিলেন। প্যারীচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য ছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লেঃ গভর্ণর স্যার উইলিয়ম গ্রে তাঁহাকে বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক

---

* দীনেশচন্দ্র সেন—'প্রদীপ' ৪র্থ বর্ষ।

† এই সভার মুখপত্রে প্যারীচাঁদ অনেকগুলি কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সেগুলির তালিকা এস্থানে প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না;—(1) Bengal Rice (2) Indian wheat (3) Agriculture in Bengal (4) Department of Agriculture (5) Sugarcane (6) Cultivation of flax (7) Silk & paper from the Mulbury-bark (8) Madder plant.

সভার সভ্যপদে মনোনীত করেন। তিনি দুই বৎসর এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং পশুক্লেশনিবারণব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিতে সাহায্য করেন। পরে পশুদিগের প্রতি ক্লেশনিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন এবং উত্তরকালে উহার সরকারী সভাপতি-পদে বৃত হন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেসন ও ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটীর একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও জষ্টিস্ অব দি পিস্ সম্মান ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিরলস জীবন সর্ব্বদাই দেশহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার কার্য্য নীরবে ও বিনা আড়ম্বরে সম্পাদিত হইত। যশোলাভের জন্য তিনি কখনও চেষ্টা করেন নাই; যশ তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইত।

এইবার আমরা সংক্ষেপে প্যারীচাঁদের সাহিত্য-সেবার বিষয় কিছু বলিব। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক কর্ত্তৃক 'জ্ঞানান্বেষণ' নামক একখানি দ্বিভাষী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। প্যারীচাঁদ ইহাতেই প্রথম প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রামগোপাল ঘোষ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক একখানি দ্বিভাষী সাময়িক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন এবং বন্ধু প্যারীচাঁদের হস্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করেন। এই পত্র প্রথমে মাসিক, পরে অক্টোবর (১৮৪২) মাস হইতে পাক্ষিক এবং মার্চ্চ (১৮৪৩) হইতে সাপ্তাহিক পত্ররূপে প্রকাশিত হয়। ইহা নব্য-বঙ্গদিগের মুখপত্র ছিল। এই পত্রিকাপাঠে জানা যায় যে বিখ্যাত জর্জ্জ টমসন এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য আর্থিক সাহায্য করিতেন। তথাপি এই পত্রিকার কর্ম্মকর্ত্তারা দেখিলেন, তাঁহাদের প্রায় সহস্র টাকা ক্ষতি হইয়াছে এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া এই পত্র বন্ধ করিয়া দিলেন।

যৌবনে প্যারীচাঁদ বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরাজী সাহিত্যেরই অধিক সেবা করিয়াছিলেন। ইতিহাস ও রাজনীতিই ইঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে Society for the Acquisition of General Knowledge (সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা) স্থাপিত হইল। তিনি ইহাতে "হিন্দুরাজত্বকালে হিন্দুস্থান" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা ঐ সভার কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় তিনি "জমীদার ও প্রজা" বিষয়ক যে চিন্তাশীল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহা লর্ড আলবিমার্ল কর্ত্তৃক পার্লিয়ামেণ্টের লর্ড-সভায় উল্লিখিত হইয়া আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। তিনি 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় আরও অনেকগুলি চিন্তাশীল ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে সে সকলের একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট হইল।—

The Court Amlahs in Lower Bengal;
Marriage of Hindoo Widows;
Development of female Mind in India;
Agricultural Socuty of India;
Department of revenue, agriculture & commerce;
Indian Wheat;
Culture of Hindu females;
Psychology of the Aryyas;
Commerce in Ancient India;
Social Life of the Aryyas;
The Hindu Bengal;
Notes On Early Commerce in Bengal.

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদের সহধর্ম্মিণী বামাকালী (খড়দহনিবাসী বিখ্যাত তান্ত্রিক ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যা) পরলোক গমন করিলে তাঁহার মন ধর্ম্মের দিকে সমধিক আকৃষ্ট হয়। তিনি বাল্যকাল হইতে হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন; পরে ইংরাজী শিক্ষার সহিত একেশ্বরবাদী হইয়া উঠেন। কিন্তু এই সময় হইতে তিনি প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসবান্ হন এবং প্রেততত্ত্বানুশীলনেই সময় অতিবাহিত করেন। Banner of Light, Spiritualist এবং অন্যান্য ইংরাজী ও আমেরিকান পত্রিকায় তিনি প্রেততত্ত্বসম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখেন এবং তাহার কতকগুলি Spiritual Stray Leaves ও Stray Thoughts on Spiritualism নামক পুস্তকদ্বয়ে পুনর্মুদ্রিত করেন। তিনি On the soul, its Nature & Development নামক একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে যখন কর্ণেল অলকট্ ও মাদাম্ ব্লাভাটস্কি এদেশে আগমন করিয়া থিয়সফিষ্ট সভার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন প্যারীচাঁদ তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ সাহায্য করেন এবং প্রধানতঃ ইঁহারই উদ্যোগে ও পরিশ্রমে বঙ্গদেশে ঐ সভার একটিশাখা স্থাপিত হয়। ইনিই ঐ সভার সভাপতি ছিলেন।*

উপরোক্ত ইংরাজী গ্রন্থ ব্যতীত তিনি ইংরাজী ভাষায় আরও তিনখানি উত্তম চরিতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ডেভিড্ হেয়ার, দেওয়ান রামকমল সেন ও কোল্‌স্ ওয়ার্দি গ্রাণ্টের জীবনচরিত সে কালের বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এবং আমাদিগের নিকট অমূল্য বলিয়া মনে হয়।

আমরা এ পর্য্যন্ত প্যারীচাঁদের বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবাসম্বন্ধে কিছু বলি নাই। যখন এ দেশে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় এবং প্যারীচাঁদের সমসাময়িক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি-

* শেষ বয়সে তিনি যোগসাধনও আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং এই জন্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। বোধ হয়, তিনি সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসরও হইয়াছিলেন।

যখন বাঙ্গালা ভাষাকে নিতান্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন, তখন তিনি কর্ত্তব্যপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া প্যারীচাঁদ বাঙ্গালা ভাষা সংস্কারের জন্য এবং স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহার প্রতিভাশালী লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁহার স্থাননির্দ্দেশকালে সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র এই "বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক"কে "অতি উচ্চ" আসন প্রদান করিয়াছেন, 'কলিকাতা রিভিউয়ের' ইংরাজ সমালোচক যাঁহার 'আলালের ঘরের দুলালে'র হাস্যরস ইংলণ্ডের গোল্ডস্মিথ ও ফিল্ডিংএর হাস্যরসের তুল্য মনে করিয়াছিলেন এবং অপর কয়েকজন বিজ্ঞ সমালোচক যাঁহাকে মলিয়ার এবং ডিকেন্সের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন, 'কপালকুণ্ডলার' অনুবাদক সিভিলিয়ান মিঃ ফিলিপ্‌স্ যাঁহার আলালকে শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন, চিরস্মরণীয় মহাত্মা কাওয়েল যাঁহার আলালের গুণে মুগ্ধ হইয়া সমগ্র পুস্তকখানি অনুবাদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যাঁহার রহস্য-শক্তি-সম্বন্ধে 'আলালের ঘরের দুলালের' ইংরাজী অনুবাদক মিঃ জিঃ ডি অস্‌ওয়েল বলিয়াছেন—"পাশ্চাত্য দেশে থ্যাকারেকে সংযত পরিহাস-রসিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে সম্মান প্রদত্ত হয়, এ দেশে প্যারীচাঁদের সেই সম্মান প্রাপ্য," সেই প্যারীচাঁদের বাঙ্গালা গ্রন্থাদির সমালোচনা করিবার ধৃষ্টতা আমাদের নাই; প্রশংসা করিবার প্রয়োজনও নাই। এই পরিচ্ছেদে আমরা সংক্ষেপে তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের পরিচয় প্রদান করিবার মানস করিয়াছি। তাঁহার পুস্তকাদির বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে প্রদান করা সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহার রচিত পুস্তকাদির তালিকা মাত্র এই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।

প্যারীচাঁদের সাহিত্য-সাধনার প্রথম ফল 'মাসিক পত্রিকা।' ১২৬১ বঙ্গাব্দের (ইংরাজী ১৬ই আগষ্ট, ১৮৫৪) ১লা ভাদ্র ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। রাধানাথ শিকদার মহাশয়ের সহিত একযোগে তিনি এই পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইহার উদ্দেশ্য স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার। সুতরাং অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতিগর্ভ গল্প ও প্রবন্ধাদি ইহাতে প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকার প্রতিসংখ্যায় উপরে লিখা থাকিত—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।"

এই পত্রিকাতেই রামারঞ্জিকা, 'মদ খাওয়া বড় দায়' ও 'আলালের ঘরের দুলালের' কিয়দংশ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। ইহাই বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস। টেকচাঁদ ঠাকুর এই ছদ্মনামে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। হাস্যরস ও স্বাভাবিকতার জন্য ইহা উপযুক্ত সমাদর লাভ করিয়াছিল। এই পুস্তকখানি অনেক কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষার্থী ইংরাজ সিভিলিয়ন ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের পাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। মিষ্টার বীম্‌স তাঁহার Modern Aryan Languages of India নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামধারী লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস রচিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুকরণকারী অনেক; ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁহার আসন অতি উচ্চে অবস্থিত। ব্যঙ্গাদির হিসাবে তাহা অনেক উৎকৃষ্ট হাস্যরসবহুল ইংরাজী উপন্যাসের তুল্য।"

তিনি ইহার পর 'মদ খাওয়া বড় দায়, 'জাত থাকার কি উপায়', 'কৃষিপাঠ', 'রামারঞ্জিকা', 'গীতাঙ্কুর', 'যৎকিঞ্চিৎ', 'অভেদী', 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা', 'ডেভিড্ হেয়ারের জীবনচরিত', 'আধ্যাত্মিকা' নামক পুস্তকগুলি প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার কোনও পুস্তকই বৃহৎ নহে, সকলগুলিই অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত; সকলগুলিই মৌলিক, শিক্ষাপ্রদ এবং জাতীয়ভাবপূর্ণ।

১২৯৯ বঙ্গাব্দে ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীচাঁদের সমস্ত বাঙ্গালা গ্রন্থগুলি একত্রে 'লুপ্তরত্নোদ্ধার' নামে প্রকাশ করেন। ইহার ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছিলেন, "তিনিই (প্যারীচাঁদ) প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে; তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের নিকট ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশ উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'।"

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর উদরী রোগে প্যারীচাঁদের মৃত্যু হয়। দেশের মুখপত্র 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' সেই সময়ে এইরূপ লিখিয়াছিলেন:—"ইঁহার বিয়োগে আমাদের দেশ একজন প্রধান

সাহিত্যসেবী, একজন কর্ম্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ, একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, একজন অদ্বিতীয় পরিহাসরসিক, একজন দেশপ্রাণ মহাত্মা ও একজন তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান উপাসক হারাইল।” ইহার এক বর্ণও অমূলক বা অতিরঞ্জিত নহে।

প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধুগণ একটি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের গভীর শোক প্রকাশ করেন। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ জে সি মারে, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভারেণ্ড কে এস ম্যাকডোন্যাল্ড, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মিঃ রবার্ট টার্ণবুল, ডাক্তার ডি বি স্মিথ, মিঃ এইচ এম রস্তমজী, বাবু বদ্ধলাল মল্লিক, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু শিবচন্দ্র দেব, বাবু রামতনু লাহিড়ী, মিঃ সি, এইচ, এ ডল এবং মিঃ হাজী নুর মহম্মদ জ্যাকেরিয়া এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। প্যারীচাঁদের চরিত্রসম্বন্ধে দুই চারিজন ইংরাজ বক্তার মত ‘হিন্দুপেট্রিয়ট’ হইতে এই স্থলে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার দেশহিতৈষণা ও সততা সম্বন্ধে চেম্বার অব কমার্সের তদানীন্তন সভাপতি কেটলওয়েল বুলেন কোম্পানির মিষ্টার মারে বলেন,—

ভারতবর্ষ দুই জন বিখ্যাত লোকের শোকে কাতর,—কেশবচন্দ্র ও প্যারীচাঁদ। কেশবচন্দ্র সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট নিজমত ব্যক্ত করিতেন, প্যারীচাঁদ দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের জন্য কাজ করিতেন। প্যারীচাঁদ বাঙ্গালা সাহিত্যের ডিকেন্স। তিনি পরিচয়ফলে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিতেন যে, তিনি প্যারীচাঁদের অপেক্ষা সাধু ব্যক্তি আর দেখেন নাই। এই সাধুতা ও ভারতবাসীদিগের হিতচেষ্টার জন্যই তিনি স্মরণীয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী মিঃ টার্ণবুল বলেন—“তিনি সর্ব্বদাই পরের কথা ভাবিতেন—তিনি মুক প্রাণীদিগের সুখসম্বন্ধেও উদাসীন ছিলেন না। এই সহরের পথে যে বহু পশুপানীয় জলাধার দৃষ্ট হয়, সে সব তাঁহার কীর্ত্তি। জীবিত কালে তিনি সকলের ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার নাম লোক স্মরণ রাখিবে; তাঁহার অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে।”

তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে ডাক্তার স্মিথ বলেন, “He had known the deceased for about 20 years and could concur with those gentlemen who had spoken in bearing testimony to the beauty of his character.” তাঁহার সরলতা-সম্বন্ধে রেভারেণ্ড ডল্ বলেন,’ ‘Next June would make 30 years from the happy day when he first took the hand of Peary Chand Mittra and from that moment he found that he had a brother man by his side. The highest development of human character was simplicity, and that Babu Peary Chand Mittra possesed in an eminent degree,”

এই সভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত স্মৃতিসমিতির প্রযত্নে টাউনহলে প্যারীচাঁদের একটি মর্ম্মরময় উত্তমার্দ্ধ এবং মেটকাফহলে একখানি উত্তম তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও ইঁহার নামে একটি রৌপ্যপদক প্রদানের ব্যবস্থা হয়। সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরেও ইঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব প্যারীচাঁদের জীবনের প্রধান প্রধান কার্য্যগুলি বিবৃত হইল। তাঁহার সম্পূর্ণ জীবন-কথা বলিতে গেলে বাঙ্গালা দেশের অর্দ্ধশতাব্দীর উন্নতির ইতিহাস বলিতে হয়; কারণ, এই ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠাতেই তাঁহার নাম আছে। দেশের সকল মঙ্গলকার্য্যে তিনি আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিতেন। প্যারীচাঁদের সম্পূর্ণ জীবন-কথা না বলিলেও পাঠকগণ বোধ হয়, উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে এই মহাপুরুষের অদ্ভুত সাধনা ও অনুপম চরিত্রের আভাস পাইবেন। চরিত্রের নির্ম্মলতায়, নিঃস্বার্থ পরোপকারিতায়, আন্তরিক দেশভক্তিতে, সার্ব্বভৌমিক সহৃদয়তায় তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। তিনি ভাবুক ছিলেন—তিনি বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন; তিনি অসাধারণ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং যাহা সত্য ও কল্যাণকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহা আদর্শ সাহসিকতার সহিত সম্পাদন করিতেন। তিনি চিন্তাশীল ছিলেন; কিন্তু অতিগম্ভীর বা সমাজদ্বেষ্টা ছিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি লোকসমাজে মিশিতে ভালবাসিতেন। তিনি অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তিনি বন্ধুবর্গকে সরস সুমিষ্ট কথোপকথনে হাসাইতেন ও নিজে হাসিতেন। তাঁহার বিশুদ্ধ আমোদপ্রিয়তা ও উচ্চ হাস্য তাঁহার অন্তঃকরণের শিশুসুলভ সরলতা প্রকাশ করিত।

শৈশব হইতে এই মহাপুরুষের সংসর্গে থাকিয়া কিশোরীচাঁদ বিশ্বপ্রেম শিক্ষা করেন। ইঁহারই চরিত্রপ্রভাবে পরদুঃখকাতর কিশোরীচাঁদ—দেশপ্রাণ কিশোরীচাঁদ—সমাজসংস্কারক কিশোরীচাঁদ—কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ গঠিত হয়। কিন্তু কিশোরীচাঁদ তাঁহার অগ্রজ অপেক্ষা আরও সাহসী—আরও নির্ভীক ছিলেন। প্যারীচাঁদ ধীরে ধীরে শাস্ত্র হইতে আদর্শ লইয়া, লোকাচারদূষিত, কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন সমাজকে উন্নতিমার্গে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিবেকাদিষ্ট কিশোরীচাঁদ লোকাচার তুচ্ছ করিয়া অপূর্ব্ব সাহস ও অসাধারণ নির্ভীকতার সহিত বজ্রশক্তিতে কুসংস্কারাবদ্ধ সমাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং অভিনব আদর্শ গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। লোকের মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই, কর্ম্মের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি নাই, সেই কর্ম্মময়ের চরণে কর্ম্মফল নিবেদন করিয়া তিনি বিবেকের আদেশ অনুশীলন করিতেন।
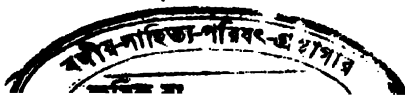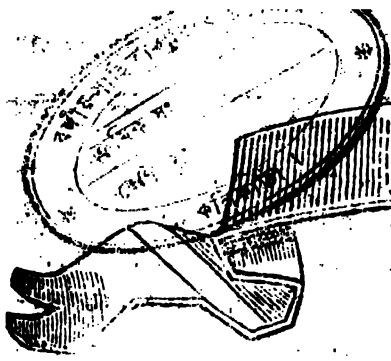
বিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৯২

৯৩৭ সংখ্যা ১৮৪৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিশিষ্ট প্রকরণ।

গীতার বহিরঙ্গ-আলোচনা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

অবিদিত্বা ঋষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ
যোঽধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাঽপি পাপীয়ান্ জায়তে তু সঃ ॥*

স্মৃতি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে ইহা সবিস্তার বলিয়াছি যে, যখন ভারতীয় যুদ্ধ হইতে কুলক্ষয় ও জ্ঞাতিক্ষয়ের প্রত্যক্ষ স্বরূপ সর্ব্বপ্রথম নেত্রসমক্ষে আসিল, তখন অর্জ্জুন স্বকীয় ক্ষাত্রধর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণোদ্যত হইলেন এবং সেই সময়ে ঠিক পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বেদান্তশাস্ত্রের ভিত্তির উপর শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগ প্রতিপাদন করিলেন যে, অধিক শ্রেয়স্কর কর্ম্মযোগে বুদ্ধিরই প্রাধান্য, এইজন্য ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বারা কিংবা পরমেশ্বরভক্তির দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে সাম্যাবস্থায় রাখিয়া সেই বুদ্ধি দ্বারা স্বধর্ম্মানুসারে সকল কর্ম্ম করিতে থাকিলেই মোক্ষলাভ হয়, ইহা ব্যতীত মোক্ষলাভের জন্য আর কিছুরই আবশ্যকতা নাই; এবং এইরূপ উপদেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করিলেন। গীতার ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। গীতাগ্রন্থ কেবল বেদান্তবিষয়ক ও নিবৃত্তি-মূলক, এইরূপ ভ্রান্ত সংস্কারের দরুণ "মহাভারতের ভিতর গীতাকে সন্নিবিষ্ট করিবার কোন কারণ নাই" ইত্যাদি যে সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে তাহারও নিবারণ এক্ষণে সহজে হয়। কারণ, কর্ণপর্ব্বে সত্যানৃতের আলোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠির-বধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতার উপদেশও আবশ্যক হইয়াছিল। এবং কাব্যদৃষ্টিতে দেখিলেও, ইহাই সিদ্ধ হয় যে, মহাভারতে অনেক স্থলে এই প্রকারই অন্য যে সকল প্রসঙ্গ আসিয়াছে সেই সমস্তের মূলতত্ত্ব কোথাও-না-কোথাও বলা আবশ্যক ছিল, তাই উহা ভগবদ্‌গীতাতে বলিয়া ব্যবহারিক ধর্ম্মা-ধর্ম্মের কিংবা কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতির নিরূপণের পূর্ণতা শেষে গীতাতেই সম্পাদিত হইয়াছে। বনপর্ব্বের ব্রাহ্মণ-ব্যাধ-সংবাদে ব্যাধ বেদান্তের ভিত্তিতে "আমি মাংস-বিক্রয়ের ব্যবসায় কেন করিতেছি" তাহার বিচার করিয়াছে; এবং শান্তিপর্ব্বের তুলাধার-জাজলিসংবাদেও ঐ প্রকারেই তুলাধার স্বকীয় বাণিজ্যব্যবসায়ের সমর্থন করিয়াছে (বন. ২০৬-২১৫ ও শাং. ২৬০-২৬৩)। কিন্তু এই উপপত্তি সেই সেই বিশিষ্ট ব্যবসায়ের জন্যই হইয়াছিল। এই প্রকার অহিংসা, সত্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা মহাভারতে কয়েকস্থানে আসিলেও তাহাও একদেশদর্শী অর্থাৎ সেই সেই বিশিষ্ট বিষয়ের জন্যই হইয়াছিল, তাই উহাকে মহাভারতের প্রধান ভাগ ধরা যাইতে পারে না। এইরূপ একদেশদর্শী আলোচনার দ্বারা ইহাও নির্ণয় করা যায় না যে, যে শ্রীকৃষ্ণের এবং পাণ্ডবদিগের মহৎ কার্য্যসমূহের বর্ণনা করিবার জন্য ব্যাস মহাভারত লিখিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা ব্যক্তিদের চরিত্রকে আদর্শ ধরিয়া মনুষ্য সেই প্রকার আচরণ

* "কোন মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দৈবত ও বিনিয়োগ না জানিয়া (উক্ত মন্ত্র) যে শিক্ষা দেয় কিংবা তাহার জপ করে সে পাপী হয়।" ইহা কোন এক স্মৃতিগ্রন্থের বচন; কিন্তু কোন্ গ্রন্থের তাহা জানি না। হাঁ, তাহার মূল আর্ষেয়ব্রাহ্মণ (আর্ষেয়. ১) শ্রুতিগ্রন্থে আছে; তাহা এই—"যো হ বা অবিদিতার্ষেয়চ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রেণ যাজয়তি বাঽধ্যাপয়তি বা স্থাণুং বর্চ্ছতি গর্ত্তং বা প্রতি-পদ্যতে।" কোন মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ প্রভৃতি বহিরঙ্গ; উহা না জানিয়া মন্ত্র বলিবেক না। এই নীতিই গীতার ন্যায় গ্রন্থসম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যায়।

করিবে কি না। সংসার অসার এবং কোন-এক সময়ে সন্ন্যাসগ্রহণই শ্রেষ্ঠ যদি ধরা হয় তবে স্বভাবত এই প্রশ্ন আসে যে, শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডবদিগের এত ঝঞ্ঝাটে পড়িবার কারণ কি ছিল? এবং যদি তাঁহাদের প্রশ্নের কোন কারণ স্বীকারও করা যায়, তবে লোকসংগ্রহার্থ তাঁহাদের গৌরব-কীর্ত্তনের জন্য ব্যাসের তিন বৎসরকাল সমান পরিশ্রম করিয়া (মভা. আ. ৬২. ৫২) এক লাখ শ্লোকের বৃহৎ গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজনই কি ছিল? বর্ণাশ্রমকর্ম্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য করা হয়, কেবল এইটুকু বলিলেই এই প্রশ্নের ঠিক মীমাংসা হয় না; কারণ, যাহাই বল না কেন, স্বধর্ম্মাচরণ কিংবা জগতের অন্য সমস্ত ব্যবহার সন্ন্যাসদৃষ্টিতে গৌণ বলিয়াই মানা হয়। এই জন্য মহাভারতে যে মহাপুরুষদিগের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, সেই মহাপুরুষদিগের আচরণের উপর "মূলে কুঠার" নীতি-অনুযায়ী আপত্তির নিরসন করিয়া কোন-না-কোন স্থানে সবিস্তার ইহা বলা আবশ্যক ছিল যে, সংসারের সমস্ত কাজ করিতে হইবে কি না; এবং করিতে হইবে বলিলেও প্রত্যেক মনুষ্য কিরূপে সংসারে নিজ নিজ কর্ম্ম চালাইলে সেই সব কর্ম্ম মোক্ষলাভের অন্তরায় হইবে না। নলোপাখ্যান, রামোপাখ্যান প্রভৃতি যে সব উপাখ্যান মহাভারতে আছে তাহাতে এই সকল বিষয়ের আলোচনা উচিত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; কারণ, এইরূপ করিলে সেই উপাঙ্গগুলির মত এই আলোচনাও গৌণ বলিয়াই বিবেচিত হইত। সেইরূপ বনপর্ব্ব কিংবা শান্তিপর্ব্বের অনেক বিষয়ের খিচুড়ীর মধ্যে গীতাকেও সন্নিবিষ্ট করিলে উহার মহত্ত্বের লাঘব না হইয়া যাইত না। তাই, উদ্যোগপর্ব্ব শেষ করিয়া মহাভারতের প্রধান কর্ম্ম—ভারতীয় যুদ্ধ—আরম্ভ হইবার ঠিক প্রসঙ্গেই, সেই সম্বন্ধে নীতিধর্ম্মদৃষ্টিতে যাহা অপরিহার্য্য দেখা যায় এইরূপ আপত্তি গ্রহণ করিয়া সেইখানেই এই কর্ম্মাকর্ম্মবিচারের স্বতন্ত্র শাস্ত্র উপপত্তির সহিত কথিত হইয়াছে। সার কথা, পাঠক কিছু বিলম্বের কারণ যদি এই পরম্পরাগত কথা ভুলিয়া যান যে, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধারম্ভেই অর্জ্জুনকে গীতা বিবৃত করিয়াছিলেন এবং যদি তিনি এই বুদ্ধিতেই বিচার করেন যে, মহাভারতে ধর্ম্মাধর্ম্মনিরূপণার্থ বিরচিত এক আর্ষ মহাকাব্য আছে, তথাপি উপলব্ধি হইবে যে, গীতার জন্য মহাভারতে যে স্থান নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহাই গীতার মহত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য কাব্যদৃষ্টিতেও সঙ্গত হইয়াছে। গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় কি এবং মহাভারতে কোন্ স্থানে গীতা বিবৃত হইয়াছে, এই সকল বিষয়ের ঠিক্ ঠিক্ উপপত্তি যখন বুঝা গেল, তখন এই সকল প্রশ্নের কোন গুরুত্ব দেখা যায় না যে, "গীতোক্ত জ্ঞান রণভূমিতে বিবৃত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? কোন সময়ে কেহ এই গ্রন্থ পরে মহাভারতে ঢুকাইয়া দিয়া থাকিবে! অথবা ভগবদ্গীতার দশ শ্লোকই মুখ্য কিংবা শত শ্লোকই মুখ্য" ? কারণ অন্য প্রকরণসমূহ হইতেও উপলব্ধি হইবে যে, যখন একবার ইহা স্থির হইল যে ধর্ম্মনিরূপণার্থ 'ভারত'কে 'মহাভারত' করিবার জন্য অমুক বিষয় মহাভারতে অমুক কারণে অমুক স্থানে সন্নিবেশ করা আবশ্যক, তখন মহাভারতকার সেই বিষয়ের নিরূপণ করিবার জন্য কত স্থান লাগিবে তাহার জন্য কোন চিন্তা করেন না। তথাপি গীতার বহিরঙ্গ পরীক্ষা সম্বন্ধে অন্য যে সকল তর্ক উপস্থিত করা হয় তাহার উপরেও এক্ষণে প্রসঙ্গানুসারে বিচার করিয়া তাহার মধ্যে কতটা তথ্য আছে তাহা দেখা আবশ্যক, তাই তন্মধ্যে (১) গীতা ও মহাভারত, (২) গীতা ও উপনিষৎ, (৩) গীতা ও ব্রহ্মসূত্র, (৪) ভাগবত ধর্ম্মের উদয় ও গীতা, (৫) বর্ত্তমান গীতার কাল, (৬) গীতা ও বৌদ্ধ গ্রন্থ, এবং (৭) গীতা ও খৃষ্টানদিগের বাইবেল,—এই সাত বিষয়ের, আলোচনা এই প্রকরণের সাত ভাগে যথা ক্রমে করা হইয়াছে। স্মরণ থাকে যেন, এই বিচার করিবার সময় কেবল কাব্যের হিসাবে অর্থাৎ ব্যবহারিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেই গীতা, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা বহিরঙ্গসমালোচক করিয়া থাকেন, অতএব আমিও সেই দৃষ্টিতেই এক্ষণে উক্ত প্রশ্ন সকলের বিচার করিব।

ভাগ ১—গীতা ও মহাভারত।

উপরে এই অনুমান করা হইয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষদিগের চরিত্রের নৈতিক সমর্থনার্থ কর্ম্মযোগমূলক গীতা মহাভারতে উপযুক্ত কারণেই উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে; এবং গীতা মহাভারতেরই এক অংশ হওয়া উচিত। সেই অনুমানই সেই দুই গ্রন্থের রচনা তুলনা করিলেই অধিক দৃঢ় হয়। কিন্তু তুলনা করিবার পূর্ব্বে, এই দুই গ্রন্থের বর্ত্তমান স্বরূপ সম্বন্ধে একটু বিচার করা আবশ্যক প্রতীত হয়। গীতাগ্রন্থে ৭০০ শ্লোক আছে এইরূপ শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য স্বকীয় গীতাভাষ্যের আরম্ভে স্পষ্ট বলিয়াছেন, এবং অধুনাপ্রাপ্ত সমস্ত সংস্করণেও অতগুলি শ্লোকই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সাত শত শ্লোকের মধ্যে ১ শ্লোক ধৃতরাষ্ট্রের, ৪০ সঞ্জয়ের, ৮৪ অর্জ্জুনের এবং ৫৭৫ ভগবানের। কিন্তু বোম্বাই নগরে গণপত কৃষ্ণাজীর ছাপাখানায় মুদ্রিত মহাভারতের সংস্করণে, ভীষ্মপর্ব্বে বর্ণিত গীতার আঠারো অধ্যায়ের পর যে অধ্যায় আসে, তাহার (অর্থাৎ ভীষ্মপর্ব্বের ৪৩ তম অধ্যায়ের) আরম্ভে সাড়ে পাঁচ শ্লোকে যে গীতামাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত হইয়াছে—

ষট্‌শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ।
অর্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং তু সঞ্জয়ঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়া মানমুচ্যতে॥

"গীতায় কেশবের ৬২০, অর্জ্জুনের ৫৭, সঞ্জয়ের ৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্রের ১ মিলিয়া সবশুদ্ধ ৭৪৫ শ্লোক আছে"। এই শ্লোক মাদ্রাজ এলাকার প্রচলিত পাঠানুসারে কৃষ্ণাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের সংস্করণে পাওয়া যায়; কিন্তু কলিকাতার মুদ্রিত মহাভারতে ইহা পাওয়া যায় না; এবং ভারতটীকাকার নীলকণ্ঠ এই ৫।।০ শ্লোক "গৌড়ৈঃ ন পঠ্যন্তে" এইরূপ লিখিয়াছেন। তাই, উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রক্ষিপ্ত মনে করিলেও গীতার মধ্যে ৭৪৫ (অর্থাৎ অধুনা-প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের শ্লোক হইতে অতিরিক্ত ৪৫ শ্লোক) কে কখন্ জুড়িয়া দিয়াছে তাহা বলা যায় না। মহাভারত-গ্রন্থ বিস্তীর্ণ হওয়ায় তাহাতে মধ্যে মধ্যে অন্য শ্লোক সন্নিবেশিত হওয়া কিংবা কোন শ্লোক বাহির করিয়া লওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু একথা গীতার সম্বন্ধে বলা যায় না। গীতাগ্রন্থ সর্ব্বদাই পঠিত হওয়ায় বেদের ন্যায় সমস্ত গীতাও কণ্ঠস্থ করিতে পারিত পূর্ব্বে এরূপ অনেক লোক ছিল, এবং আজ পর্য্যন্ত কেহ কেহ আছে! এই কারণে বর্ত্তমান গীতায় বেশী পাঠান্তর দেখা যায় না, এবং অল্প যে-কিছু ভিন্ন পাঠ আছে, তাহা টীকাকারেরা জানেন। তাছাড়া, এরূপ বলিতেও বাধা নাই যে, এই কারণেই গীতাগ্রন্থে বরাবর ৭০০ শ্লোক রক্ষিত হইয়াছে যাহাতে উহার মধ্যে কেহ ফেরফার না করিতে পারে। এখন প্রশ্ন এই যে, বোম্বাই ও মাদ্রাজে মুদ্রিত প্রত্যেক মহাভারতেই ৪৫ শ্লোক—এবং সে সমস্তও ভগবানেরই—বেশী কোথা হইতে আসিল? সঞ্জয় ও অর্জ্জুনের শ্লোকের মোট সংখ্যা বর্ত্তমান প্রত্যেক সংস্করণে এবং এই গণনাতে একই অর্থাৎ ১২৪; এবং একাদশ অধ্যায়ের "পশ্যামি দেবান্" (১১. ১৫-৩১) ইত্যাদি ১৭ শ্লোকের সঙ্গে মতভেদের কারণে অন্য দশ শ্লোকও সঞ্জয়ের বলিয়া বিবেচিত হওয়া সম্ভব, তাই বলা যাইতে পারে যে, সঞ্জয় ও অর্জ্জুনের শ্লোকের মোট সংখ্যা এক হইলেও প্রত্যেকের শ্লোকগুলি পৃথক্ পৃথক্ গণনা করিলে অল্প পার্থক্য হইয়া থাকিবে। কিন্তু বর্ত্তমান হাল সংস্করণে ভগবানের যে ৫৭৫ শ্লোক আছে তাহার বদলে ৬২০ অর্থাৎ ৪৫ অধিক শ্লোক কোথা হইতে আসিল তাহার কোন ঠিকানা পাওয়া যায় না! গীতার 'স্তোত্র' বা 'ধ্যান' বা এই প্রকার অন্য কোন প্রকরণের সমাবেশ উহার মধ্যে করা হইয়া থাকিবে ইহা যদি বল, তবে দেখি যে, বোম্বায়ের মহাভারতের সংস্করণে ঐ প্রকরণ নাই শুধু নহে, ঐ সংস্করণের গীতাতেও ৭০০ শ্লোকই আছে। অতএব বর্ত্তমান সাতশত শ্লোকের গীতাকেই প্রমাণ মানা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। গীতার কথা ত এই হইল। কিন্তু মহাভারতের দিকে দেখিলে বলিতে হয় যে, এই বিরোধ কিছুই নহে। স্বয়ং ভারতেই উক্ত হইয়াছে যে, মহাভারতসংহিতার সংখ্যা এক লক্ষ। কিন্তু রাওবাহাদুর চিন্তামণি রাও বৈদ্য মহাভারতসম্বন্ধীয় স্বকীয় টীকাগ্রন্থে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, হালে-ছাপা সংস্করণের মধ্যে অতগুলি শ্লোক পাওয়া যায় না; এবং বিভিন্ন পর্ব্বের অধ্যায়সংখ্যাও মহাভারতের আরম্ভে প্রদত্ত অনুক্রমণিকা অনুসারে নাই। এই অবস্থায়, গীতা ও মহাভারতের তুলনা করিবার জন্য এই দুই গ্রন্থের কোন এক বিশেষ সংস্করণ অবলম্বন করা ভিন্ন কাজ চলিতে পারে না; তাই, শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রমাণ বলিয়া গৃহীত সপ্তশতশ্লোকী গীতাকে এবং কলিকাতার বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের মুদ্রিত মহাভারতের সংস্করণকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া আমি এই দুই গ্রন্থের তুলনা করিয়াছি; এবং আমার এই গ্রন্থে মহাভারতের শ্লোকসমূহের স্থাননির্দ্দেশও আমি কলিকাতার মুদ্রিত উক্ত মহাভারতের অনুসারেই করিয়াছি। এই শ্লোকগুলিকে বোম্বায়ের কিংবা মাদ্রাজের পাঠক্রম অনুসরণ করিয়া মুদ্রিত কৃষ্ণাচার্য্যের সংস্করণে দেখিতে হইবে, এবং যদি উহা আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে না পাওয়া যায়, তবে একটু অগ্রপশ্চাৎ অনুসন্ধান করিলেই এই শ্লোকগুলি পাওয়া যাইবে।

সাতশো শ্লোকের গীতা এবং কলিকাতার বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের মুদ্রিত মহাভারত তুলনা করিলে প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভগবদ্‌গীতা মহাভারতেরই এক অংশ; এবং স্বয়ং মহাভারতের মধ্যেই কয়েক স্থানে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। প্রথম উল্লেখ আদিপর্ব্বের আরম্ভে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত অনুক্রমণিকায় করা হইয়াছে। "পূর্ব্বোক্তং ভগবদ্‌গীতাপর্ব্ব ভীষ্মবধস্ততঃ" (মভা. আ. ২. ৬৯) এইরূপ পর্ব্ববর্ণনায় প্রথমে বলিয়া তাহার পর আঠারো পর্ব্বের অধ্যায়সমূহের এবং শ্লোকসমূহের সংখ্যা বলিবার সময় ভীষ্মপর্ব্বের বর্ণনার মধ্যে পুনর্ব্বার ভগবদ্গীতার স্পষ্ট উল্লেখ এই প্রকারে করা হইয়াছে—

কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ।
মোহজং নাশয়ামাস হেতুর্ভির্মোক্ষদর্শিভিঃ॥

"যাহাতে মোক্ষগর্ভ কারণ দেখাইয়া বাসুদেব অর্জ্জুনের মনের মোহজ কশ্মল নাশ করিয়াছিলেন" (মভা. আ. ২. ২৪৭)। এই প্রকার আদিপর্ব্বের (১. ১৭৯) প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যেক শ্লোকের আরম্ভে "যদাশ্রৌষং" বলিয়া, যখন ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন যে, দুর্য্যোধনাদির জয়প্রাপ্তি-সম্বন্ধে কোন্ কোন্ প্রকারে আমার নিরাশা হইতেছে,

তখন এই বর্ণনা আছে যে, যখনই শুনিলাম যে, "অর্জ্জুনের মনে মোহ উৎপন্ন হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন তখনই আমি জয়সম্বন্ধে নিরাশ হইলাম"। আদিপর্ব্বের এই তিন উল্লেখের পর শান্তিপর্ব্বের শেষে নারায়ণীয় ধর্ম্ম বলিবার সময় গীতার পুনর্ব্বার নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছে। নারায়ণীয়, সাত্বত, ঐকান্তিক ও ভাগবত, এই চারি নাম সমানার্থক। নারায়ণীয়োপাখ্যানে (শাং ৩৩৪-৩৫১) নারায়ণঋষি কিংবা ভগবান শ্বেতদ্বীপে নারদকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই ভক্তিমূলক প্রবৃত্তিমার্গ বর্ণিত হইয়াছে। বাসুদেবকে একান্তভাবে ভক্তি করিয়া জাগতিক ব্যবহার স্বধর্ম্মানুসারে করিতে থাকিলেই মোক্ষলাভ হয় ভাগবত-ধর্ম্মের এই তত্ত্ব আমি পূর্ব্ব প্রকরণসমূহে বলিয়া আসিয়াছি; এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই প্রকার ভগবদ্গীতাতেও কর্ম্মযোগই সন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই নারায়ণীয় ধর্ম্মের পরম্পরা বর্ণনা করিবার সময় বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে বলিতেছেন যে, এই ধর্ম্ম সাক্ষাৎ নারায়ণ হইতে নারদ প্রাপ্ত হন, এবং এই ধর্ম্মই "কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পতঃ" (মভা. শাং. ৩৪৬. ১০) হরিগীতা কিংবা ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে। সেইরূপ আবার পরে ৩৪৮ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

> সমুপোঢেষ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্মৃধে।
> অর্জ্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ম্॥

ঐকান্তিক কিংবা নারায়ণধর্ম্মের এই বিধি পূর্ব্বে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যুদ্ধের সময় বিমনস্ক অর্জ্জুনকে ভগবান ঐকান্তিক অথবা নারায়ণ-ধর্ম্মের এই বিধিসমূহের উপদেশ করিয়াছিলেন; এবং সর্ব্ব যুগে স্থিত নারায়ণ-ধর্ম্মের পরম্পরা বলিয়া পুনরায় বলিয়াছেন যে, এই ধর্ম্ম এবং যতিদিগের ধর্ম্ম অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্ম্ম দুই-ই হরিগীতায় কথিত হইয়াছে (মভা. শাং. ৩৪৮. ৫৩)। আদিপর্ব্বে ও শান্তিপর্ব্বে প্রদত্ত এই ছয় উল্লেখের অতিরিক্ত অশ্বমেধ পর্ব্বের অন্তর্ভূত অনুগীতাপর্ব্বেও আর একবার ভগবদ্গীতার উল্লেখ আছে। ভারতীয় যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকেরও পরে আর এক দিন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যখন একত্র বসিয়া ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "এখন এখানে আমার থাকিবার কোন আবশ্যকতা নাই; দ্বারকায় যাইবার ইচ্ছা আছে"; ইহার উত্তরে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন যে, পূর্ব্বে যুদ্ধের আরম্ভে তুমি আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলে তাহা আমি বিস্মৃত হইয়াছি, সেই জন্য পুনর্ব্বার সেই উপদেশ আমাকে দাও (অশ্ব. ১৬)। তখন এই অনুরোধ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় যাইবার পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে অনুগীতা বলিয়াছিলেন। এই অনুগীতার প্রথমেই ভগবান বলিয়াছেন যে "যুদ্ধারম্ভে তোমাকে যে উপদেশ করিয়াছিলাম তুমি দুর্ভাগ্যবশত তাহা বিস্মৃত হইয়াছ। সেই উপদেশ পুনর্ব্বার তোমাকে সেইরূপই বলা এখন আমার পক্ষেও অসম্ভব; তাই, তাহার বদলে আর কোন বিষয় তোমাকে বলিতেছি" (মভা. অশ্ব. অনুগীতা. ১৬. ৯—১৩)। ইহা চিন্তার যোগ্য যে, অনুগীতার কোন কোন প্রকরণ গীতার প্রকরণের অনুরূপই। অনুগীতার এই নির্দ্দেশ-সমেত মহাভারতে ভগবদ্গীতার সাতবার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং ভগবদ্গীতা বর্ত্তমান মহাভারতেরই এক অংশ ইহা উহার আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইতে স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে।

কিন্তু সংশয়ের গতি নিরঙ্কুশ হয়, এইজন্য উপযুক্ত সাত নির্দ্দেশ হইতেও কাহারও কাহারও সন্তোষ হয় না। তাঁহারা বলেন যে, এই উল্লেখগুলিও মহাভারতে পরে ঢুকাইয়া দেওয়া হয় নাই তাহা কিরূপে সিদ্ধ হয়? এই প্রকারে উঁহাদিগের মনে এই সংশয় যেমন তেমনই থাকিয়া যায় যে, গীতা মহাভারতের এক অংশ কি না। গীতাগ্রন্থ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানমূলক এই ধারণা হইতেই এই সন্দেহ তো প্রথমে বাহির হয়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে, আমি পূর্ব্বেই তাহা সবিস্তার দেখাইয়াছি; সুতরাং বস্তুত দেখিতে গেলে এই সন্দেহের কোন অবসরই থাকে না। তথাপি এই প্রমাণের উপরই নির্ভর না করিয়া, অন্য প্রমাণের দ্বারাও এই সন্দেহ কিরূপে মিথ্যা বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় তাহা এক্ষণে বলিতেছি। কোন দুই গ্রন্থ একই গ্রন্থকারের কি না এইরূপ সন্দেহ হইলে, কাব্যমীমাংসক প্রথমতঃ শব্দসাদৃশ্য ও অর্থসাদৃশ্য এই দুই বিষয়ের বিচার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে শব্দসাদৃশ্যে শুধু শব্দেরই সমাবেশ হয় না, কিন্তু উহাতে ভাষারীতিরও সমাবেশ করা হয়। এই দৃষ্টিতে বিচার করিবার সময় মহাভারতের ভাষার সহিত গীতার ভাষার মিল কতটা তাহা দেখা আবশ্যক। কিন্তু মহাভারত গ্রন্থ অতি বিস্তৃত হওয়ায়, উহাতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভাষার রচনাও ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে করা হইয়াছে। উদাহরণ যথা—কর্ণপর্ব্বে কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধবর্ণনা দেখিলে, তাহার ভাষার ধরণ অন্য প্রকরণান্তর্গত ভাষা হইতে কিছু ভিন্ন হইবে। তাই, মহাভারতের ভাষার সহিত গীতার ভাষার মিল আছে কিনা, তাহা নিশ্চিত বলা দুষ্কর। তথাপি সাধারণতঃ বিচার করিয়া দেখিলে পরলোকগত কাশীনাথপন্ত তৈলঙ্গ * যেরূপ বলেন, তদনুসারে

* ৺কাশীনাথ ত্র্যম্বক তৈলঙ্গ কৃত ভগবদ্গীতার ইংরাজী ভাষান্তর, মোক্ষমুলর সাহেব সম্পাদিত প্রাচ্যধর্ম্মপুস্তকমালার মধ্যে

গীতার ভাষা ও ছন্দোরচনা আর্ষ কিংবা প্রাচীন বলিতে হয়। উদাহরণ যথা—কাশীনাথ পন্ত দেখাইয়াছেন যে, অন্ত (গী. ২.১৬), ভাষা (গী. ২. ৫৪), ব্রহ্ম (=প্রকৃতি, গী. ১৪. ৩), যোগ (=কর্মযোগ), পাদপূরক অব্যয় 'হ' (গী. ২.৯) প্রভৃতি শব্দ গীতায় যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, সে অর্থে উহা কালিদাসাদির কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। এবং পাঠভেদ বশতই হউক না কেন, কিন্তু গীতার ১১. ৩৫ শ্লোকের 'নমস্কৃত্বা' এই অপাণিনীয় শব্দ রাখা হইয়াছে, সেইরূপ গী. ১১. ৪৮ শ্লোকে 'শক্য অহং' এইরূপ অ-পাণিনীয় সন্ধিও আছে। সেইরূপ আবার "সেনানীনামহং স্কন্দঃ" (গী. ১০. ২৪) ইহাতে 'সেনানীনাং' এই ষষ্ঠীকারকও পাণিনি-অনুসারে শুদ্ধ নহে। আর্ষবৃত্তরচনার উদাহরণ ৺তৈলঙ্গ স্পষ্ট করিয়া বুঝান নাই। কিন্তু আমার মনে হয় যে, একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপ বর্ণনার (গী. ১১. ১৫-৫০) ৩৬ শ্লোককে লক্ষ্য করিয়াই তিনি গীতার ছন্দোরচনাকে আর্ষ বলিয়া থাকিবেন। এই শ্লোকগুলির প্রত্যেক চরণে ১১ অক্ষর আছে; কিন্তু গণনার কোন নিয়ম নাই, এক চরণ ইন্দ্রবজ্র হয় তো দ্বিতীয়টী উপেন্দ্রবজ্র, তৃতীয় শালিনী হয় তো চতুর্থটী অন্য কোন প্রকারের। এইরূপ উক্ত ৩৬ শ্লোকে অর্থাৎ ১৪৪ চরণের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় মোটে ১১ চরণ পাওয়া যায়। তথাপি সেখানে এই নিয়মও দেখা যায় যে, প্রত্যেক চরণে ১১ অক্ষর আছে, এবং উহাদের মধ্যে প্রথম, চতুর্থ, অষ্টম এবং শেষের দুই অক্ষর গুরু; ষষ্ঠ অক্ষর প্রায়ই লঘু। ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে, ঋগ্‌বেদের ও উপনিষদের ত্রিষ্টুপ্‌বৃত্তের ঢং অনুসারেই এই শ্লোক রচিত হইয়াছে। কালিদাসের কাব্যে এইরূপ ১১ অক্ষরের বিষমবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। হাঁ, শকুন্তলা নাটকে "অমী বেদিং পরিতঃ ক্লিপ্তধিষ্ণ্যাঃ" এই শ্লোক এই ছন্দেরই; কিন্তু কালিদাসই উহাকে 'ঋক্‌ছন্দ' অর্থাৎ ঋগ্বেদের ছন্দ বলিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, আর্ষবৃত্ত প্রচলিত থাকা কালেই গীতাগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। মহাভারতের অন্যত্রও এইরূপ আর্ষশব্দ ও বৈদিকবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত এই দুই গ্রন্থের ভাষা-সাদৃশ্যের দ্বিতীয় দৃঢ় প্রমাণ এই যে, মহাভারত ও গীতার মধ্যে একই রকম অনেক শ্লোক পাওয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত শ্লোক অনুসন্ধান করিয়া তন্মধ্যে গীতায় কতগুলি আসিয়াছে, তাহা অভ্রান্তরূপে স্থির করা কঠিন। তথাপি মহাভারত পাঠ করিতে করিতে তাহার মধ্যে যে শ্লোক ন্যূনাধিক পাঠভেদে গীতার শ্লোকের অনুরূপ আমি দেখিতে পাইয়াছি তাহারও সংখ্যা বড় কম নহে; এবং তাহার ভিত্তিতে ভাষাসাদৃশ্যের প্রশ্নের সিদ্ধান্তও সহজেই হইতে পারে। নিম্নপ্রদত্ত শ্লোক ও শ্লোকার্দ্ধ গীতা ও মহাভারতে (কলিকাতা সংস্করণ) শব্দশ কিংবা দুই-এক শব্দের ভেদে এক রকমই পাওয়া যায়—

(Sacred Books of the East Series, Vol. VIII.) ছাপা হইয়াছে। এই গ্রন্থে ইংরাজি ভাষাতেই গীতাসম্বন্ধে এক টীকাত্মক প্রবন্ধ প্রস্তাবনার আকারে সংযোজিত হইয়াছে। এই প্রকরণে ৺তৈলঙ্গের মতানুসারে যে উল্লেখ আছে তাহা (এক জায়গা ছাড়া) এই প্রস্তাবনাকে লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে।

গীতা।	মহাভারত।
১.৯ নানাশস্ত্রপ্রহরণা—শ্লোকার্দ্ধ।	ভীষ্মপর্ব্ব (৫১.৪); গীতার মতই দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট স্বীয় সৈন্যের বর্ণনা করিতেছেন।
১.১০ অপর্য্যাপ্তং—সমস্ত শ্লোক।	ভীষ্ম. ৫১.৬
১.১২-১৯ পর্য্যন্ত ৮ শ্লোক।	ভীষ্ম. ৫১.২২-২৯ অল্প শব্দভেদে গীতার শেষ শ্লোকেরই মত।
১.৪৮ অহোবত মহৎপাপং—শ্লোক।	দ্রোণ. ১৯৭.৫০ অল্প শব্দভেদে গীতার শেষ শ্লোকের মত।
[illegible].১৯ উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ—শ্লোকার্দ্ধ।	শান্তি. ২২৪.১৪ অল্প পাঠভেদে বলিবাসব-সংবাদে ও কঠোপনিষদে (২.১৮) আছে।
[illegible] অব্যক্তাদীনি ভূতানি—শ্লোক।	স্ত্রী. ২.৬; ৯.১১; 'অব্যক্ত' ইহার বদলে 'অভাব', বাকী একই।
[illegible]র্য্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়ঃ—শ্লোকার্দ্ধ।	ভীষ্ম. ১২৪.৩৬ ভীষ্ম কর্ণকে ইহাই বলিতেছেন।
[illegible]চ্ছয়া—শ্লোক;	কর্ণ. ৫৭.২ 'পার্থ'র বদলে 'কর্ণ' পদ রাখিয়া দুর্যোধন কর্ণকে বলিতেছেন।
[illegible] অর্থ উদপানে—শ্লোক।	উদ্যোগ. ৪৫.২৬ সনৎসুজাতীয় প্রকরণে অল্প শব্দভেদে আসিয়াছে।

২.৫৯ বিষয়া বিনিবর্তন্তে—	শান্তি. ২০৪.১৬ মনু-বৃহস্পতি-সংবাদে অক্ষরশ আসিয়াছে।
২.৬৭ ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং—শ্লোক।	বন. ২১৪.২৬ ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে এবং পূর্ব্বে রথের রূপকও প্রদত্ত হইয়াছে।
২.৭০ আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং—শ্লোক।	শান্তি. ২৫০.৯ শুকানুপ্রশ্নের মধ্যে অক্ষরশ আসিয়াছে।
৩.৪২ ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ—শ্লোক।	শান্তি. ২৪৫.৩ ও ২৪৭.২ অল্প পাঠভেদে শুকানুপ্রশ্নে দুইবার আসিয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকের মূল কঠোপনিষদে (কঠ. ৩.১০)।
৪.৭ যদা যদা হি ধর্ম্মস্য—শ্লোক।	বন. ১৮৯.২৭ মার্কণ্ডেয়প্রশ্নে অক্ষরশ আসিয়াছে।
৪.৩১ নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য—শ্লোক।	শান্তি. ২৬৭.৪০ গোকাপিলীয়াখ্যানে আসিয়াছে এবং সমস্ত প্রকরণ যজ্ঞেরই।
৪.৪০ নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো—শ্লোকার্দ্ধ।	বন. ১৯৯,১১০ মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বে অক্ষরশ প্রদত্ত হইয়াছে।
৫.৫ যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং—শ্লোক।	শান্তি. ৩০৫.১৯ ও ৩১৬.৪ এই দুই স্থানে অল্প পাঠভেদে বসিষ্ঠকরাল এবং যাজ্ঞবল্ক্য-জনক সংবাদে আসিয়াছে।
৫.১৮ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে—শ্লোক।	শান্তি. ২৩৮.১৯ শুকানুপ্রশ্নে অক্ষরশ আসিয়াছে।
৬.৫ আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুঃ—শ্লোকার্দ্ধ এবং পরবর্ত্তী শ্লোকের অর্থ।	উদ্যোগ. ৩৩,৬৩-৬৪ বিদুরনীতিতে অক্ষরশ আসিয়াছে।
৬.২৯ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং—শ্লোকার্দ্ধ।	শান্তি. ২৩৮.২১ শুকানুপ্রশ্ন, মনুস্মৃতি (মনু ১২.৯১), ঈশাবাস্যোপনিষদ (৬) ও কৈবল্য উপনিষদে (১.১০) অক্ষরশ আসিয়াছে।
৬.৪৪ জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য—শ্লোকার্দ্ধ।	শান্তি. ২৩৫.৭ শুকানুপ্রশ্নে অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে।
৮.১৭ সহস্রযুগপর্য্যন্তং—এই শ্লোক প্রথমে যুগের অর্থ না বলিয়া গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে।	শান্তি. ২৩১.৩১ শুকানুপ্রশ্নে অক্ষরশ আসিয়াছে এবং যুগের অর্থবোধক তালিকাও প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে। মনুস্মৃতিতেও অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে (মনু. ১.৭৩)।
৮.২০ যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু—শ্লোকার্দ্ধ।	শান্তি. ৩৩৯.১৩ নারায়ণীয় ধর্ম্মে অল্প পাঠভেদে দুইবার আসিয়াছে।
৯.৩২ স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা—এই সমস্ত শ্লোক এবং পরবর্ত্তী শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ।	অশ্ব. ১৯. ৬১ ও ৬২ অনুগীতায় অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে।
১৩.১৩ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং—শ্লোক।	শান্তি. ২৩৮.২৯. অশ্ব. ১৯.৪৯; শুকানুপ্রশ্নে অনুগীতায় এবং অন্যত্রও অক্ষরশ আসিয়াছে। এই শ্লোকের মূল শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (শ্বে. ৩.১৬)।
১৩.৩০ যদা ভূতপৃথগ্ভাবং—শ্লোক।	শান্তি. ১৭.২৩ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে এই শব্দই ব... য়াছেন।
১৪.১৮ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা—শ্লোক।	অশ্ব. ৩৯.১০ অনুগীতায় গুরু-শিষ্যসংবাদে অ... প্রদত্ত হইয়াছে।
১৬.২১ ত্রিবিধং নরকস্যেদং—শ্লোক।	উদ্যোগ. ৩২.৭০ বিদুরনীতিতে অক্ষরশ আ...
১৬.৩ শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষঃ—শ্লোকার্দ্ধ।	শান্তি. ২৬৩.১৭ তুলাধার-জাজলিসংবাদে ... প্রকরণে আসিয়াছে।
১৮.১৪ অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা—শ্লোক।	শান্তি. ৩৪৭.৮৭ নারায়ণীয় ধর্ম্মে অক্ষরশ ...

উক্ত তুলনা হইতে বুঝা যায় যে, ২৭ সমগ্র শ্লোক ১২ শ্লোকার্দ্ধ মহাভারতের বিভিন্ন প্রকরণে কখনও কখনও তো অক্ষরশ এবং কখন বা অল্প পাঠভেদে একই; এবং ভাল করিয়া খুঁজিলে আরও অনেক শ্লোক ও শ্লোকার্দ্ধ পাওয়া সম্ভব। যদি ইহা দেখিতে চাও যে, দুই দুই কিংবা তিন তিন শব্দ অথবা শ্লোকের চতুর্থ চরণ গীতা ও মহাভারতে কত স্থানে একই আছে, তাহা হইলে উপরের তালিকা খুবই বাড়াইতে হয়। * কিন্তু এই শব্দসাম্যের অতিরিক্ত কেবল উপরি-উক্ত তালিকায় শ্লোকসাদৃশ্যই বিচার করিলে মহাভারতের অন্য প্রকরণ ও গীতা এক হাতেরই, ইহা না বলিয়া থাকা যায় না। প্রকরণশ বিচার করিলেও উক্ত ৩৩ শ্লোকের মধ্যে ১ মার্কণ্ডেয়প্রশ্নে, ½ মার্কণ্ডেয়সমস্যাতে, ১ ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে, ২ বিদুরনীতিতে, ১ সনৎসুজাতীয়ে, ১ মনুবৃহস্পতিসংবাদে, ৬½ শুকানুপ্রশ্নে, ১ তুলাধার-জাজলিসংবাদে, ১ বসিষ্ঠকরাল ও যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদে, ১½ নারায়ণীয় ধর্ম্মে, ২ অনুগীতায় এবং বাকী ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও স্ত্রীপর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় সকল স্থানেই এই শ্লোক পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ অনুসারে যথাযোগ্য স্থানেই সন্নিবেশিত হইয়াছে,—প্রক্ষিপ্ত নহে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; এবং ইহাও প্রতীত হয় যে, ইহাদের মধ্যে কোন কোন শ্লোক গীতাতেই সমারোপ-দৃষ্টিতে গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ যথা—"সহস্রযুগ-পর্য্যন্তং" (গী. ৮.১৭) এই শ্লোক স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য, প্রথমে বৎসর ও যুগের ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক ছিল; এবং মহাভারতে (শাং. ২৩১) ও মনুস্মৃতিতে এই শ্লোকের পূর্ব্বে উহাদের লক্ষণও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু গীতায় এই সকল শ্লোক যুগ প্রভৃতির ব্যাখ্যা না দিয়া একেবারেই উক্ত হইয়াছে। এইরূপ দৃষ্টিতে বিচার করিলে মহাভারতের অন্য প্রকরণে এই শ্লোক গীতা হইতেই উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না; [illegible] এত বিভিন্ন প্রকরণ হইতে এই সমস্ত শ্লোক গীতায় [illegible]ত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব গীতা ও মহাভারতের সকল প্রকরণের লেখক একই ব্যক্তি, ইহাই অনুমান করিতে হয়। ইহাও এইস্থানে বলা আবশ্যক যে, মনুস্মৃতির অনেক শ্লোক যেরূপ মহাভারতে পাওয়া যায়, * সেইরূপ গীতায় "সহস্রযুগপর্য্যন্তং" (৮. ১৭) এই পুরা শ্লোকটি অল্প পাঠভেদে এবং "শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ" (গী. ৩. ৩৫ ও গী. ১৮. ৪৭) এই শ্লোকার্দ্ধ—'শ্রেয়ান্'র বদলে 'বরং' এই পাঠ-ভেদে এবং "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং" এই শ্লোকার্দ্ধও (গী. ৬. ২৯) "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং" এই রূপভেদে মনুস্মৃতিতে পাওয়া যায় (মনু. ১. ৭৩; ১০. ৯৭; ১২. ৯১)। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে আবার "মনুনাভিহিতং শাস্ত্রং" (অনু. ৪৭. ৩৫) এইরূপ মনুস্মৃতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

শব্দসাদৃশ্যের বদলে অর্থসাদৃশ্য দেখিলেও এই অনু-মানই দৃঢ় হয়। গীতায় কর্ম্মযোগমার্গ ও প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্ম্ম কিংবা নারায়ণীয় ধর্ম্মের সাম্য আমি পূর্ব্ব প্রকরণসমূহে ইঙ্গিত করিয়াই আসিয়াছি। বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ, সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ এবং অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মদেব, ব্যক্ত সৃষ্টির উপপত্তির এই যে পরম্পরা নারায়ণীয় ধর্ম্মে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা গীতায় গৃহীত হয় নাই। ইহার অতিরিক্ত ইহাও সত্য যে, গীতাধর্ম্ম ও নারায়ণীয় ধর্ম্মে অনেক ভেদ আছে। কিন্তু চতুর্ব্যূহ পরমেশ্বরের কল্পনা গীতায় মান্য না হইলেও গীতায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তের উপর বিচার করিলে প্রতীত হয় যে, গীতাধর্ম্ম ও ভাগবতধর্ম্ম একই প্রকারের। সিদ্ধান্তটী এই—এক ব্যূহ বাসুদেবের প্রতি ভক্তিই রাজমার্গ; অন্য কোন দেবতার প্রতি ভক্তি গেলেও তাহা বাসুদেবেরই প্রতি অর্পিত হয়; ভক্ত চারি প্রকারের হইয়া থাকে; ভগবদ্‌ভক্তকে স্বধর্ম্মানুসারে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞচক্র বজায় রাখিতেই হইবে এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করা উচিত নহে। ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিবস্বান্-মনু-ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি সম্প্রদায়-পরম্পরাও উভয়ের নিকট একই। সেইরূপ আবার সনৎসুজাতীয়, শুকানুপ্রশ্ন, যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদ, অনুগীতা ইত্যাদি প্রকরণ পড়িলে বুঝা যাইবে যে, গীতার বেদান্ত কিংবা অধ্যাত্মজ্ঞানেরও উক্ত প্রকরণসমূহে প্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত মিল আছে। কাপিলসাংখ্যশাস্ত্রের ২৫ তত্ত্ব ও গুণোৎকর্ষের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও ভগবদ্‌গীতা যে প্রকার প্রকৃতি ও পুরুষেরও অতীত কোন নিত্য তত্ত্ব আছে বলিয়া মানিয়া থাকেন, সেইরূপই

* সমস্ত মহভারত এই দৃষ্টিতে দেখিলে, গীতা ও মহাভারতে [illegible]কপাদ অর্থাৎ চরণ একশতেরও অধিক পাওয়া [illegible]। তন্মধ্যে কতকগুলি এখানে দিতেছি—কিং ভোগৈ-[illegible]বা (গী. ১. ৩২), নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে (গী. ২. ৩), [illegible] ভয়াৎ (২. ৪০), অশান্তস্য কুতঃ সুখম্ (২, ৬৬), [illegible]লোকাঃ (৩. ২৪), মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ (৬. ৩৫), [illegible]ঃ (৯. ৫), মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণঃ (৯. ১২), সমঃ [illegible] ২৯), দীপ্তানলার্কদ্যুতিং (১১.১৭), সর্ব্বভূতহিতে [illegible]তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (১২. ১৯), সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ [illegible]শ্মকাঞ্চনঃ (১৪. ২৪), ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা [illegible]দ্ধাস্তঃ (১৮. ৫০), ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (১৮.

* মনুস্মৃতির কোন্ কোন্ শ্লোক মহাভারতে পাওয়া যায় তাহার স্মারক তালিকা, বুহ্লর সাহেব 'প্রাচ্যধর্ম্মপুস্তকমালায়' মুদ্রিত মনুর ইংরাজী ভাষান্তরে যোজিত হইয়াছে তাহা দেখ (S. B. E Vol XXV, pp. 533, §§)।

শান্তিপর্ব্বের বসিষ্ঠকরালসংবাদে ও যাজ্ঞবল্ক্যজনকসংবাদে সবিস্তার ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সাংখ্যদিগের ২৫ তত্ত্বের অতীত আর এক 'ষড়্‌বিংশতিতম' তত্ত্ব আছে, যাহার জ্ঞান না হইলে কৈবল্য লাভ হয় না। এই বিচার-সাম্য কেবল কর্ম্মযোগ বা অধ্যাত্ম এই দুই বিষয়ের সম্বন্ধেই দেখা যায় না; কিন্তু এই দুই মুখ্য বিষয়ের অতিরিক্ত গীতাতে যে অন্যান্য বিষয় আছে তাহাদেরই সদৃশ প্রকরণও মহাভারতে কয়েকস্থানে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা—গীতার প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভেই দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট উভয় সৈন্যের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঠিক সেইরূপ বর্ণনাই পরে ভীষ্মপর্ব্বের ৫১ অধ্যায়ে তিনি পুনর্ব্বার দ্রোণাচার্য্যেরই নিকট করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের উত্তরার্দ্ধে অর্জ্জুনের যেরূপ বিষাদ হইয়াছিল, সেইরূপই শান্তিপর্ব্বের আরম্ভে যুধিষ্ঠিরের হইয়াছিল; এবং যখন ভীষ্ম ও দ্রোণের "যোগবলে" নিহত হইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল, তখন অর্জ্জুনের মুখ হইতে পুনর্ব্বার ঐরূপই বিষাদপূর্ণ কথা বাহির হইয়াছিল (ভীষ্ম. ৯৭, ৪-৭; ১০৮, ৮৮-৯৪)। অর্জ্জুন গীতার আরম্ভে বলিয়াছেন যে, যাঁহাদের জন্য বিষয়োপভোগ করিতে হইবে তাঁহাদিগকে বধ করিয়া জয়লাভ করিলেই বা কি ফল; (গী. ১. ৩২. ৩৩); আবার, যখন যুদ্ধে সমস্ত কৌরবের ক্ষয় হইল তখন ঐ কথাই দুর্য্যোধনের মুখ হইতেও বাহির হইয়াছে (শল্য. ৩১. ৪২-৫১)। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে যেমন সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ এই দুই নিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে সেইরূপই নারায়ণীয়ধর্ম্মে এবং শান্তিপর্ব্বের জাপকোপাখ্যানে ও জনকসুলভাসংবাদেও এই নিষ্ঠার বর্ণনা আছে (শাং. ১৯৬ ও ৩২০); তৃতীয় অধ্যায়ের অকর্ম্মাপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, কর্ম্ম না করিলে পেটও ভরে না, ইত্যাদি বিচার বনপর্ব্বের আরম্ভে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন (বন. ৩২); এবং এই তত্ত্বেরই উল্লেখ অনুগীতাতেও পুনর্ব্বার করা হইয়াছে। শ্রৌতধর্ম্ম কিংবা স্মার্ত্তধর্ম্ম যজ্ঞময়, যজ্ঞ ও প্রজা ব্রহ্মদেব একসঙ্গেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইত্যাদি গীতার প্রবচন নারায়ণীয় ধর্ম্ম ছাড়া শান্তিপর্ব্বের অন্য স্থানে (শাং. ২৬৭) এবং মনুস্মৃতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে (মনু. ৩); এবং স্বধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মসাধনে পাপ নাই এই বিচার তুলাধার-জাজলি-সংবাদে ও ব্রাহ্মণ-ব্যাধ-সংবাদেও প্রদত্ত হইয়াছে (শাং. ২৬০-২৬৩ এবং বন. ২০৬-২১৫)। এতদ্ব্যতীত, গীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে জগদুৎপত্তির যে অল্প কিছু বর্ণনা আছে, তাহারই অনুরূপ বর্ণনা শান্তিপর্ব্বের শুকানুপ্রশ্নেও আছে (শাং. ২৩১); এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগের আসনাদির যে বর্ণনা আছে, তাহাই পুনর্ব্বার শুকানুপ্রশ্নে (শান্তি. ২৩৯) ও পরে শান্তিপর্ব্বের ৩০০ অধ্যায়ে এবং অনুগীতাতেও সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে (অশ্ব. ১৯)। অনুগীতার গুরুশিষ্যসংবাদে কৃত মধ্যম-উত্তম বস্তুসমূহের বর্ণনা (অশ্ব. ৪৩ ও ৪৪) এবং গীতার দশম অধ্যায়ের বিভূতি-বর্ণনা, এই উভয়ের প্রায় একই অর্থ, এরূপ বলিতে বাধা নাই। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, গীতায় ভগবান অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহাই সন্ধিপ্রস্তাবের সময় দুর্যোধনাদি কৌরবদিগকে এবং পরে যুদ্ধ শেষ হইলে দ্বারকায় ফিরিয়া যাইবার পথে উত্তঙ্ককে, এবং নারায়ণ নারদকে এবং দাশরথি রাম পরশুরামকে দেখাইয়াছিলেন (উ. ১৩০; অশ্ব. ৫৫; শাং. ৩৩৯; বন. ৯৯)। ইহা নিঃসন্দেহ যে, গীতার বিশ্বরূপ বর্ণনা এই চারি স্থানের বর্ণনাপেক্ষা সরস ও বিস্তৃত; কিন্তু এই সমস্ত বর্ণনা পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, অর্থসাদৃশ্যের দৃষ্টিতে সেগুলিতে কিছুই নূতনত্ব নাই। গীতার চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে নিরূপণ করা হইয়াছে যে, সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণপ্রযুক্ত জগতের মধ্যে বৈচিত্র্য কিরূপে উৎপন্ন হয়, এই গুণত্রয়ের লক্ষণ কি, এবং সমস্ত কর্ত্তৃত্ব গুণেরই, আত্মার নহে। ঠিক এই প্রকার এই তিন গুণের বর্ণনা অনুগীতায় (অশ্ব. ৩৬-৩৯) এবং শান্তিপর্ব্বেও অনেকস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে (শাং. ২৮৫ ও ৩০০-৩১১)। সার-কথা গীতার প্রসঙ্গ অনুসারে গীতায় কোন কোন বিষয়ের আলোচনা বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে এবং গীতার বিষয়-বিচারপদ্ধতিও কিছু ভিন্ন হইলেও দেখা যায় যে, গীতার সমস্ত বিচারের অনুরূপ বিচার মহাভারতেও পৃথক পৃথক কোথাও-না-কোথাও ন্যূনাধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত হইয়াছে; এবং এই বিচারসাম্যের সঙ্গে সঙ্গেই শব্দেরও ন্যূনাধিক সাম্য স্বতই সংঘটিত হইয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য। মার্গশীর্ষ মাসের সম্বন্ধে সাদৃশ্য তো বিলক্ষণই আছে। গীতায় "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং" (গী. ১০. ৩৫) বলিয়া এই মাসকে যে প্রকার প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপই অনুশাসনপর্ব্বের দানধর্ম্মপ্রকরণে যেখানে উপবাসের জন্য, মাসগুলির নাম বলিবার প্রসঙ্গ দুইবার আসিয়াছে, সেইখানে প্রত্যেকবার মার্গশীর্ষ হইতেই মাসগুলির গণনা সুরু করা হইয়াছে (অনু. ১০ ও ১০৯)। গীতার আত্মৌপম্যের কিংবা সর্ব্বভূতাত্ম দৃষ্টি, অথবা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও [illegible]ত্মিক ভেদ, এবং দেবযান ও পিতৃযান গতির উ[illegible] ভারতের অনেকস্থানে পাওয়া যায়। এই স[illegible] প্রকরণসমূহে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি ব[illegible] তাহার পুনরুক্তি করিলাম না।

ভাষাসাদৃশ্যই ধর, বা অর্থসাদৃশ্যই ধর, কি[illegible]

সম্বন্ধে মহাভারতে যে ছয় সাত বার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার উপরে বিচার কর; এইরূপ অনুমান না করিয়া থাকা যায় না যে, গীতা বর্ত্তমান মহাভারতেরই এক অংশ, এবং যে ব্যক্তি বর্ত্তমান মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তিনিই বর্ত্তমান গীতাও বিবৃত করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কিংবা কোন প্রকারে তাহাদের মনগড়া অর্থ লাগাইয়া কোন কোন ব্যক্তি গীতাকে প্রক্ষিপ্ত দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমি অবগত আছি। কিন্তু যাঁহারা বাহ্য প্রমাণকে অপ্রমাণ স্থির করিয়া নিজেরই সংশয়পিশাচকে অগ্রস্থান দেন, তাঁহাদের বিচারপদ্ধতি নিতান্ত অশাস্ত্রীয় সুতরাং অগ্রাহ্য। মহাভারতের মধ্যে গীতাকে কেন স্থান দেওয়া হইল ইহার কোন উপপত্তি যদি প্রকাশ না পাইত, তাহা হইলে অন্য কথা হইত। কিন্তু (এই প্রকরণের আরম্ভে কথিত অনুসারে) গীতা নিছক্ বেদান্তমূলক কিংবা ভক্তি-মূলক নহে, কিন্তু যে প্রমাণভূত মহাপুরুষদিগের চরিত্র মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের নীতিতত্ত্ব কিংবা মর্ম্ম বলিবার জন্য মহাভারতে কর্ম্মযোগমূলক গীতার নিরূপণ অত্যন্ত আবশ্যক ছিল; এবং উহা বর্ত্তমান সময়ে মহাভারতের যে স্থানে বিবৃত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা কাব্যদৃষ্টিতেও সমস্ত ভারতগ্রন্থে অধিকতর যোগ্য-স্থল দেখা যায় না। ইহা সিদ্ধ হইলে পর, গীতা মহাভারতের মধ্যে যোগ্য কারণে ও যোগ্যস্থানেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, প্রক্ষিপ্ত নহে, এই সিদ্ধান্তই শেষে বজায় থাকে। মহাভারতের ন্যায় রামায়ণও একটি সর্ব্বমান্য ও উৎকৃষ্ট মহাকাব্য; এবং তাহাতেও কথাপ্রসঙ্গানুসারে সত্য, পুত্রধর্ম্ম, মাতৃধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম প্রভৃতির মর্ম্মস্পর্শী আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই যে, নিজের কাব্যকে মহাভারতের ন্যায় "অনেক সময়ান্বিত, সূক্ষ্ম ধর্ম্মাধর্ম্মের অনেক নীতিতত্ত্বে পূর্ণ, এবং সমস্ত লোকের শীল ও সচ্চরিত্র-শিক্ষাবিধানে সর্ব্বপ্রকারে সমর্থ" বাল্মীকি ঋষির মূল উদ্দেশ্য না থাকায়, ধর্ম্মাধর্ম্মের কার্য্যাকার্য্যের অথবা নীতির দৃষ্টিতে, মহাভারতের যোগ্যতা রামায়ণ অপেক্ষা অধিক। মহাভারত শুধু আর্ষ কাব্য বা শুধু ইতিহাস নহে; কিন্তু উহা ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম-প্রসঙ্গের নির্ণয়কারী এক সংহিতা বলিলেও হয়; এবং এই ধর্ম্মসংহিতার মধ্যে যদি কর্ম্মযোগের শাস্ত্রীয় ও তাত্ত্বিক বিচার না করা হয়, তবে তাহা আর কোথায় করা যাইতে পারে? শুধু বেদান্তসম্বন্ধীয় গ্রন্থে এই বিচার-আলোচনা করা যাইতে পারে না। ধর্ম্মসংহিতাই উহার উপযুক্ত স্থান; এবং মহাভারতকার যদি এইরূপ আলোচনা না করিতেন তবে ধর্ম্মাধর্ম্মের এই বৃহৎ সংগ্রহ কিংবা পঞ্চম বেদ সেই পরিমাণেই অপূর্ণই থাকিয়া যাইত। এই ত্রুটী পূর্ণ করিবার জন্যই ভগবদ্গীতা মহাভারতের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা আমাদের সত্যই বড় সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, এই কর্ম্মযোগ শাস্ত্রের সমর্থন করিতে বেদান্ত শাস্ত্রের সমানই ব্যবহারেতেও অত্যন্ত প্রবীণ মহাভারতকারের ন্যায় এক উত্তম সৎপুরুষকে আমরা লাভ করিয়াছি। এইরূপে সিদ্ধ হইল যে, বর্ত্তমান ভগবদ্গীতা প্রচলিত মহাভারতেরই এক অংশ। এখন ইহার অর্থ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। ভারত ও মহাভারত এই দুই শব্দ আমরা সমানার্থক মনে করি; কিন্তু বস্তুত এই দুই শব্দ বিভিন্ন। ব্যাকরণ-দৃষ্টিতে দেখিলে, ভরতবংশীয় রাজাদিগের পরাক্রম যে গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে সেই গ্রন্থই 'ভারত' নাম প্রাপ্ত হইতে পারে। রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপই; এবং এই রীতিতে যে গ্রন্থে ভারতীয় যুদ্ধের বর্ণনা আছে তাহাকে শুধু 'ভারত' বলিলেই যথেষ্ট হয়, তারপর সেই গ্রন্থ যতই বিস্তৃত হোক না কেন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। রামায়ণ গ্রন্থ ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে; কিন্তু তাহাকে কেহ মহা-রামায়ণ বলে না। তবে ভারতেরই নাম 'মহাভারত' কেন হইল? মহত্ত্ব ও গুরুত্ব এই দুই গুণপ্রযুক্ত এই গ্রন্থ 'মহাভারত' নাম পাইয়াছে, ইহা মহাভারতের শেষে উক্ত হইয়াছে (স্বর্গ. ৫. ৪৪)। কিন্তু সরল শব্দার্থ দেখিলে, 'মহাভারত' অর্থে 'বড় ভারত' হয়। এবং এই অর্থ গ্রহণ করিলে, এই প্রশ্ন উঠে যে, 'বড়' ভারতের পূর্ব্বে কোন 'ছোট' ভারতও ছিল কি? এবং তাহার মধ্যে গীতা ছিল কি না? বর্ত্তমান মহাভারতের আদিপর্ব্বে, বর্ণিত হইয়াছে যে, উপাখ্যানসমূহের অতিরিক্ত মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা চব্বিশ হাজার (আ. ১. ১০১); এবং পরে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, ইহার নাম পূর্ব্বে 'জয়' ছিল (আ. ৬২. ২০)। 'জয়' শব্দে ভারতীয় যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের জয় অর্থই বিবক্ষিত বলিয়া মনে হয়; এবং ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে, ভারতীয় যুদ্ধের বর্ণনা প্রথমে 'জয়' নামক গ্রন্থে করা হইয়াছিল, পরে সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যেই অনেক উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়া উহাই ইতিহাস ও ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারেরও নির্ণয়কারী এই এক বড় গ্রন্থ মহাভারতে পরিণত হইয়া থাকিবে এইরূপ মনে হয়। অশ্বালয়নগৃহ্যসূত্রের ঋষিতর্পণের—"সমন্তু-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্র-ভাষ্য-ভারত-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাঃ" (আ. গৃ. ৩. ৪. ৪)—ভারত ও মহাভারত এই দুই বিভিন্ন গ্রন্থের যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে তাহা হইতেও এই অনুমানই দৃঢ় হয়। এই প্রকার বড় ভারতের মধ্যে ক্ষুদ্র ভারতের সমাবেশ হইলে পর, কিছু কাল বাদে ক্ষুদ্র 'ভারত' নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থ না থাকায় স্বভাবত লোকদিগের এই ধারণা হইল যে,

কেবল 'মহাভারত'ই এক ভারতগ্রন্থ। বর্ত্তমান মহাভারতের সংস্করণে বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্যাস প্রথমতঃ আপন পুত্র শুককে, এবং তাহার পর তাঁহার অন্য শিষ্যদিগকে ভারত পড়াইয়াছিলেন (আ. ১. ১০৩); এবং পরে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, সমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শুক ও বৈশম্পায়ন এই পাঁচ শিষ্য বিভিন্ন ভারত-সংহিতা কিংবা মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন (আ. ৬৩. ৯০)। এই বিষয়ে এইরূপ কথা আছে যে, এই পাঁচ মহাভারতের মধ্যে বৈশম্পায়নের মহাভারতকে এবং জৈমিনীর মহাভারতের মধ্যে অশ্বমেধ পর্ব্বমাত্র ব্যাসদেব রাখিয়া লইয়াছিলেন। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে, ঋষিতর্পণে 'ভারত-মহাভারত' শব্দের পূর্ব্বে সমন্ত প্রভৃতি নাম কেন রাখা হইয়াছে। কিন্তু এখানে এই বিষয়ে এত গভীর বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। রা. ব. চিন্তামণি রাও-বৈদ্য মহাভারতের স্বকীয় টীকাগ্রন্থে এই বিষয়ের বিচার করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই আমার মতে সযুক্তিক। তাই এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমরা যে মহাভারত বর্ত্তমানে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা মূলে এরূপ ছিল না; ভারতের কিংবা মহাভারতের অনেক রূপান্তর হইয়া গিয়াছে, এবং শেষে তাহার যে স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাই আমাদের বর্ত্তমান মহাভারত। মূল-ভারতেও গীতা ছিল না এরূপ বলা যায় না। হাঁ, ইহা সুস্পষ্ট যে, সনৎসুজাতীয়, বিদুরনীতি, শুকানুপ্রশ্ন, যাজ্ঞবল্ক্যজনক সংবাদ, বিষ্ণুসহস্রনাম, অনুগীতা, নারায়ণীয় ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রকরণের সমানই বর্ত্তমান গীতাকেও মহাভারতকার প্রথম গ্রন্থসমূহের ভিত্তির উপরেই লিখিয়াছেন,—নূতন রচনা করেন নাই। তথাপি ইহাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে, মহাভারতকার মূল গীতাতে কিছু ফেরফার করেন নাই। উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে যে, বর্ত্তমান সাতশত শ্লোকী গীতা বর্ত্তমান মহাভারতেরই এক ভাগ; উভয়েরই রচনা একই হাতের, এবং বর্ত্তমান মহাভারতে বর্ত্তমান গীতা কেহ পরে ঢুকাইয়া দেয় নাই। বর্ত্তমান মহাভারতের কোন্ কাল, এবং মূল গীতাসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কি তাহাও পরে বলা যাইবে।

প্রাগ্জ্যোতিষপুর ও কামরূপের পুরাতত্ত্ব।

(আসামপর্য্যটক—শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

প্রাগ্জ্যোতিষপুর ও কামরূপ এতদুভয়ের মধ্যে কোন্টী প্রাচীনতম এবং কোন্ সময়ে ইহাদের উক্ত নামকরণ হইয়াছিল তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন। কোন কোন ঐতিহাসিক ও শিক্ষিত অসমীয়াদিগের (The Assamese) মতে ব্রহ্মপুত্র নদের তটবর্ত্তী বর্ত্তমান "গৌহাটী" নগরীর অতি প্রাচীনতম নাম ছিল "প্রাগ্জ্যোতিষপুর"। রাজতরঙ্গিণীতে (১) এই রাজ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু কামরূপের কোন উল্লেখ নাই। প্রাগ্জ্যোতিষপুর নামকরণ সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে ব্রহ্মা এইস্থানে অবস্থান করতঃ নক্ষত্র সৃষ্টি করায় উহা ইন্দ্রপুরীসদৃশ হইয়া উঠিয়াছিল, তজ্জন্য উক্ত নামে আখ্যাত হয়:—

"অস্য মধ্যে স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্ নক্ষত্রং সসর্জ্জ হ।
ততঃ প্রাগ্জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরীসমা॥"

রামায়ণে বর্ণিত আছে যে চন্দ্রবংশীয় রাজা "অমূর্ত্তরজা" পুণ্ড্রভূমি অতিক্রম করতঃ কামরূপের ধর্ম্মারণ্য (২) সমীপে প্রাগ্জ্যোতিষ নামে একটী আর্য্যরাজ্য স্থাপন করেন। এই "ধর্ম্মারণ্য" দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত বিশ্বনাথ নামক স্থান হইতে ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত বলিয়া তত্রস্থ অধিবাসীরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এখন ইহার নাম হইয়াছে "বুঢ়া গোঁহাই জরণী"। Mr. F. A Sachse মৈমনসিংহের Gazzetteer (P. 22) এ লিখিয়াছেন:—At the time of Mahavarat Mymensing formed part of Pragjyotish which 3000 years later in Buddhist times was known as Kamrup. গৌহাটী নগরীই প্রাচীনকালে প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায়—ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের সম-সময়ে নরক নামে জনৈক দানবরাজ প্রাগ্জ্যোতিষপুরে রাজত্ব করিত। দুরাত্মা রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়া অন্তর্হিত হইলে কপিরাজ সুগ্রীব তাঁহার অন্বেষণার্থ নানা-

---

(১) উক্ত পুস্তক পাঠে প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যে সুগন্ধদ্রব্যের (aloes) প্রকাণ্ড অরণ্যের কথা অবগত হওয়া যায়।

(২) পূর্ব্বে বর্ত্তমান আসামখণ্ডের অধিকাংশ স্থান কামরূপ নামে অভিহিত ছিল।

স্থানে বানর প্রেরণান্তর সুষেণ ও মারীচ প্রভৃতি বানরগণকে পশ্চিমাভিমুখে প্রেরণকালে বলিয়াছিলেন :—

যোজনানি চতুঃষষ্টির্বরাহো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে ॥ ৩০
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ ॥ ৩১
কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪২ সর্গ।

খ্রীষ্টের জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনীতে রাজত্বকালে কালিদাস (৩) তাঁহার রঘুবংশের চতুর্থ সর্গের (canto) এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, "রঘু লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়া কামরূপরাজকে পরাস্ত করেন। তিনি রঘুকে করস্বরূপ বহুসংখ্যক হস্তী প্রদান করিয়াছিলেন।" সুতরাং কামরূপ এককালে হস্তীর জন্য বিখ্যাত ছিল।

স্মরণাতীত কাল হইতে এই দেশে আর্য্যসভ্যতার বিস্তৃতি হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ (৪) ও তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু সূত্র কিম্বা সংহিতা শাস্ত্রে ইহার কোন উল্লেখ নাই। মহাভারতের কোন স্থানে "কামরূপ" নামের উল্লেখ নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে মহাভারত রচনা আরব্ধ হয়।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অংশবিশেষের নাম ছিল "কুণ্ডিল" নগরী; উহা মহাভারতোল্লিখিত "বিদর্ভ দেশ" বলিয়া অবগত হওয়া যায়। "কুণ্ডিল" আসামের লখিমপুর জেলাস্থ শদীয়া নগরী হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ১৬ মাইল দূরে দিক্রাং (দিক্করবাসিনী) ও দিবাং নদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। ঐ নগরীর নামানুসারে তথায় অদ্যাবধি প্রবাহিত একটী নদীর নাম "কুণ্ডল পাণী"। দ্বাপর যুগে মহারাজ ভীষ্মক যখন কুণ্ডিল নগরের অধীশ্বর ছিলেন, তখন জরাসন্ধ (৫) মগধে রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমান গয়ার নিকটবর্ত্তী "গিরিব্রজ বা রাজগৃহ" তাঁহার রাজধানী ছিল। এখন সেই রাজগৃহ "রাজগির" নামে অভিহিত। মগধাধিপতি জরাসন্ধের প্রস্তাবানুসারে চেদিরাজ শিশুপালের সহিত কুণ্ডিলাধিপতি ভীষ্মকের অপূর্ব্বরূপবতী কন্যা "রুক্মিণী দেবী"র পরিণয়-সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে শিশুপাল কুণ্ডিল নগরে গমন করেন। যদুকুলপতি শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া সেখান হইতে তাঁহাকে হরণ করত গান্ধর্ব্ব প্রথানুযায়ী পত্নী-স্বরূপে গ্রহণ করেন। এই কুণ্ডিল নগরে রুক্মিণীপিতা মহারাজ ভীষ্মকের "তাম্রেশ্বরী ও গোসাণী"র দেবালয় অদ্যাবধি বিদ্যমান। সেখানে প্রতিদিন নিয়মিত সেবা ও পূজা চলিয়া আসিতেছে।

ভগদত্ত =

মহারাজ ভগদত্তের নাম ও তৎসঙ্গে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নাম মহাভারতের বহুস্থানে উল্লেখ আছে। মহাভারতের পাঠকেরা অবগত আছেন, "দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য ছিল। কুরুকুলপতি মহারাজ দুর্য্যোধন প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের কন্যা "ভানুমতী"কে বিবাহ করিয়াছিলেন। তদীয় এই পত্নীর গর্ভে "লক্ষণ" নামে এক পুত্র এবং "লক্ষণা" নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণের অন্যতম পুত্র "শাম্ব" দুর্য্যোধন-তনয়া লক্ষণার স্বয়ম্বরকালে তাঁহাকে হরণ করিলে কৌরবগণ ইহাঁকে পরাস্ত করত বন্দী করেন। অনন্তর লক্ষণার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়।" উক্ত পুস্তকের অশ্বমেধ পর্ব্বের ৫৭শ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়, "ভগদত্ত নামে এক অসামান্য শৌর্য্যবীর্য্যশালী নরপতি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজত্ব করিতেন। কুরুক্ষেত্র-মহাসমরকালে তিনি কুরুকুলপতি দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিয়া চীন ও কিরাত সৈন্য দ্বারা তাঁহার সহায়তা করেন"। ইহাতে অনুমান হয়— উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত ও চীনদেশ পর্য্যন্ত ভগদত্তের রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানকালে অর্জ্জুনকে তাঁহার সহিত অষ্টাহকাল যে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহাতে তিনি পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কর প্রদান করেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, "ইনি ১৮ দিন অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ

---

(৩) এই আবির্ভাবকাল জন-শ্রুতিমাত্র; ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় নাই।

(৪) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বামণপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি।

(৫) জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমপি, এবং সোমপির পুত্র শ্রুতশ্রবা।

করিয়াছিলেন এবং দ্বৈরথ যুদ্ধকালে তাঁহাকে নিধন করিবার জন্য পিতৃপ্রদত্ত অমোঘ "বৈষ্ণবাস্ত্র" প্রয়োগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা বক্ষে ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রাণরক্ষা করেন। পরিশেষে অর্জ্জুনের হস্তে তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ ঘটে। মহারাজ ভগদত্তের সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে যবনাদি ম্লেচ্ছশ্রেণীর লোকের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। এতদ্‌সম্বন্ধে মহাভারতের সভাপর্ব্বের ৫১ অধ্যায়ের একস্থানে উল্লেখ আছেঃ—

প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপঃ শূরো ম্লেচ্ছানামধিপো বলী।
যবনৈঃ সহিতো রাজা ভগদত্তো মহারথঃ॥ ১৪

কালিকাপুরাণের মতে মহারাজ নরকের "ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবান ও সুমালী" নামে চারি পুত্র ছিল। সেখানে উল্লেখ আছে :—

ঋতুমত্যাস্তু জায়ায়াং কালে স নরকঃ ক্রমাৎ।
ভগদত্তং মহাশীর্ষং মদবন্তং সুমালিনম্॥
চতুরো জনয়ামাস পুত্রানেতান্ ক্ষিতেঃ সুতঃ।
চত্বারিংশদধ্যায়ঃ, ১ শ্লোক।

গোবলে দালবাইয়ে (Goblet d' Alviell) নামক জনৈক ফরাসীদেশীয় ঐতিহাসিক "সে ক লান্দ দোয়াতালা গ্রেস" (Ce que l' Inde doit a' la Grace) নামক পুস্তকের একস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "গ্রীকদিগের এপোলোডোটস (Apollodotos) (৬) ও সংস্কৃতে ভগদত্ত একই ব্যক্তি। তিনি একজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ যবনরাজ ছিলেন।"

এক্ষণে এপোলোডোটসের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃতি আবশ্যক। তিনি একজন ব্যাক্‌ট্রিয়ান গ্রীক ছিলেন, এবং খ্রীঃ পূঃ ১৫৬ সাল হইতে ১৮০ সাল পর্য্যন্ত ভারতের সমুদয় সীমান্ত প্রদেশে রাজত্ব করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল "ইউক্র্যাটিডিস (Eucratides)। এপোলোডোটস যে উক্ত সময়ে ভারতের সমুদয় সীমান্ত প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, তাহা Catalogue of the coins in the India Museum (Vol 1. P. 18) নামক পুস্তকে প্রকাশিত তদীয় মুদ্রাসমূহ হইতে অবগত হওয়া যায়। এই ভগদত্ত ও ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক এপোলোডোটস যে একই ব্যক্তি, অন্যত্র ইহার কিন্তু কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক গোবলে দালবাইয়ে এ বিষয়ে কোন প্রমাণও দেখান নাই—প্রসঙ্গক্রমে তদীয় পুস্তকে উহা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। গ্রীকদিগকে এক সময়ে "যবন" বলা হইত। চীন, কিরাত ও যবন সৈন্য লইয়া কুরুক্ষেত্র-মহাসমরে দুর্য্যোধনকে ভগদত্তের সাহায্য প্রদান করিবার কথা এবং তিনি ম্লেচ্ছজাতির রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ মহাভারতে আছে। পূর্ব্বোক্ত বর্ণনানুসারে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য ভারতসীমান্তে চীনদেশ হইতে অধিক দূরে অবস্থিত নহে। এপোলোডোটসের আবিষ্কৃত মুদ্রা হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, ভারতের প্রত্যন্ত স্থান চীনদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। আর পৃথিবীর ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, চীনেরা পৃথিবীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন জাতি। সুতরাং ভগদত্ত ও এপোলোডোটস কি একই ব্যক্তি ?

বজ্রদত্ত—

ভগদত্তের মৃত্যুর পর কুরুক্ষেত্রসমরান্তে তৎপুত্র বজ্রদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকালে যুধিষ্ঠির সম্রাটপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞীয় অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুনকে নানা দিগ্‌দেশ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। অশ্বমেধের ঘোড়া যে নরপতির রাজ্যে যাইবে, তিনি সেই অশ্ব আটকাইবার জন্য যুদ্ধসজ্জা করিবেন; অশ্বরক্ষীর সহিত তিনিই যুদ্ধ করিবেন। যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাঁহাকে সেই সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপই অশ্বমেধের নিয়ম। যজ্ঞাশ্ব কামচারী। অর্জ্জুনকেও সেই কামচারী অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইল। অশ্ব চারিদিক ঘুরিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিহত রাজা ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্তের সহিত যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে বিজিত হইয়া বজ্রদত্ত অর্জ্জুনের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং অর্জ্জুন কর্তৃক অশ্বমেধে আমন্ত্রিত হইলেন। প্রাগ্‌

(৬) Gk. Apollon and dotos. Apollon প্রাচীন গ্রীকদিগের উপাস্য দেবতা 'সূর্য্য' এবং dotos অর্থে প্রদত্ত Lat. Apollo (Sungod, a representative of youthful manly beauty—ভগ), সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, সম্পূর্ণ বীর্য্য, সম্পূর্ণ শ্রী, সম্পূর্ণ যশঃ, সম্পূর্ণ জ্ঞান, এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্য, এই ছয়টী "ভগ" নামে অভিহিত। Dotos (given)—দত্ত।

জ্যোতিষ হইতে অশ্ব মণিপুরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে অর্জ্জুনের ঔরসজাত চিত্রাঙ্গদা-পুত্র "বভ্রুবাহণ" সপত্নী-মাতা উলূপীর উত্তেজনায় যজ্ঞাশ্ব লইয়া পিতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

মহাভারতের মতে নরকের পুত্র ভগদত্ত এবং তৎপুত্র বজ্রদত্ত। কালিকাপুরাণের যে ইহাই মত পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব তাঁহার আসামের ইতিহাসে (পৃঃ ১৪) লিখিয়াছেন, "ভগদত্তের পরে তদীয় ভ্রাতা বজ্রদত্ত উত্তরাধিকারী সূত্রে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এবং বজ্রদত্তের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বজ্রপাণি সিংহাসনে আরোহণ করেন।" শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বরুয়া উহা আবৃত্তি করত তাঁহার আসামবুরুঞ্জীতে লিখিয়াছেন, "ভগদত্তর মৃত্যুর পাচত ভায়েক বজ্রদত্ত রজা হয়।" শ্রীযুক্ত গেইট মহোদয় ভগদত্তের ভ্রাতা বজ্রদত্ত ও তৎপুত্র বজ্রপাণি কোথা হইতে পাইলেন অবগত হওয়া যায় না †। মহাভারতে উল্লেখ আছে ঃ—

প্রাগ্‌জ্যোতিষম্ অথাভ্যেত্য বাচরৎ স হয়োত্তমঃ।
ভগদত্তাত্মজস্তত্র নির্যযৌ রণকর্কশঃ॥
স হয়ম্ পাণ্ডুপুত্রস্য বিষয়ান্তম্ উপাগতম্।
যুযুধে ভরতশ্রেষ্ঠ বজ্রদত্তো মহীপতিঃ॥
সোঽভিনির্য্যায় নগরাদ্ ভগদত্তসুতো নৃপঃ।
অশ্বম্ আয়ান্তম্ উন্মথ্য নগরাভিমুখো যযৌ॥

অশ্বমেধ পর্ব্ব ৭৫ সর্গ, ১ শ্লোক।

বজ্রপাণির তিরোধানের পর এই বংশের নয়জন নরপতি রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের নাম ঃ—প্রলম্ভ, শালস্তম্ভ, পলকবিজয়, হর্জর, জয়মালদেব, বনমালদেব, বীরবাহু, বলবর্ম্মদেব ও সুবাহু। রত্নপালের তাম্রশাসনে (৯ম ও ১০ম শ্লোকে) লিখিত আছে (রংপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১ম সংখ্যা, ১৩২২ সাল দ্রষ্টব্য) যে শালস্তম্ভ প্রভৃতি ম্লেচ্ছরাজগণ একবিংশতি জন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিবার পর তাঁহাদের সন্তান-সন্ততির অভাবে প্রজারা রত্নপালের পিতা ব্রহ্মপালকে নরকবংশীয় জানিয়া সিংহাসনাভিষিক্ত করে। হাতিমুরা নামক স্থানে মহারাজ বলবর্ম্মদেবের (৭) যে তাম্রফলক * পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উপরোক্ত নাম কয়েকটী পাওয়া যায়। ঐ তাম্রফলকে এই কয়জন রাজার চরিত্র ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে। এই নয়জন নৃপতির মধ্যে প্রলম্ভ অতিশয় প্রভাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ভাস্করবর্ম্মা—

তৎপরে ভগদত্তবংশীয় "ভাস্করবর্ম্মা" কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্গ (প্রকৃত নাম যুয়ন চুয়ঙ) "সি-ইউ-কি" নামক তৎপ্রণীত, ভ্রমণ-বৃত্তান্তবিষয়ক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মগধের অন্তর্গত বিশ্ববিশ্রুত "নালন্দা"র সন্ন্যাসী-মঠে বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন কালে কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা কতিপয় দূত দ্বারা তাঁহাকে আমন্ত্রণ করায় তিনি তদীয় রাজধানী "গৌহাটী" নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। ভাস্করবর্ম্মাকে উক্ত পরিব্রাজকের সম-সাময়িক ধরিয়া লইলে তিনি সার্দ্ধ ষষ্ঠ শতাব্দীতে কামরূপের অধীশ্বর ছিলেন।

ভাস্করবর্ম্মার পরবর্ত্তী ব্রহ্মপাল (স্ত্রী কুলদেবী), রত্নপাল, পুরন্দরপালের পুত্র ইন্দ্রপাল (৮) প্রভৃতি নৃপতি কামরূপের "শ্রীদুর্জ্জয়" নামক স্থানে রাজত্ব করেন। রত্নপালের তাম্রশাসন পাঠে ভাস্করবর্ম্মার লোকান্তরিত হইবার কিছুকাল পরেই কামরূপে রাষ্ট্রবিপ্লবের একটা আভাস পাওয়া যায়। গৌহাটীতে আবিষ্কৃত ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর বলিয়া উল্লিখিত। তাহা হইতে ঐ বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই শাসনের অক্ষরাদি দৃষ্টে প্রগাঢ় প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার হর্ণেলী ইহার জন্মকাল একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধ বলিয়া অনুমান (J. A. S. B. 1898, P. 102.) করিয়াছেন।

মহারাজ ইন্দ্রপালের তিরোধানের বহুকাল পরে সুবিখ্যাত "ধর্ম্মপাল" কামরূপের রাজা হন। তারপর দেবপাল, জয়পাল, বিগ্রহপাল, ১ম নারায়ণপাল প্রভৃতি নৃপতি সেখানে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃঃ ভাগলপুরে প্রাপ্ত মহারাজ নারায়ণ পাল দেবের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, জয়পাল তাঁহার অগ্রজ দেবপালের আদেশে "উৎকল ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর" অধিকার করেনঃ—

যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্বলতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাদুৎকলানামধীশঃ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়ি-পরিবৃতো বিভ্রদুচ্চৈন মূর্দ্ধ্নঃ
রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণামুপশমিত-সমিৎসংকথাং
যস্য চাজ্ঞাম্॥

গৌড়লেখমালা পৃঃ ৫৮।

---

† শ্রীযুক্ত গেইট সম্ভবতঃ বলবর্ম্মাদেবের "নগাঁও তাম্রশাসন" দৃষ্টে এইরূপ উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

(৭) For Nowgong copper plate grant of Balavarman of Pragjoytish *Vide* Jour. A. S. B. Vol. LXI. P. 285.

* ইহা কামরূপ নিবাসী শ্রুতিধর ভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের নিদর্শন স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন।

(৮) J. A. S. B. 1897 P. 113.

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

মাঘোৎসবের গান।

রাগ ভৈরোঁ—ভর্‌তঙ্গা।

এই তো তুমি সূর্য্য-আলোকে, এই তো তুমি অরুণ আকাশে,
এই তো তুমি প্রভাত-পুলকে, এই তো তুমি পুষ্প-বিকাশে।
এই তো তুমি পাখীর কণ্ঠে গেয়ে ওঠ এমন আনন্দে,
ঝর্ণা-ধারার গভীর ছন্দে বেজে ওঠ দখিণ বাতাসে।
এই তো তুমি আমার হৃদয়ে চলেছ আজ বিশ্ব-বিজয়ে,
এই তো তুমি প্রাণের আনন্দে বাজাও আমায় এমন ছন্দে।
এই তো তুমি গানে গানে জেগেছ মোর প্রাণে প্রাণে,
বর্ষা শরৎ কতই বসন্তে লিখে গেছ হৃদয় আকাশে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
II মা -গা গা। দা দা -া I পা -া পা। সা -া ঋা I ঋা -া -া। -া -া -া I
এ ই তো. তু মি ০ সূ র্ য আ ০ লো কে ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I গা -া ঋা। ঋপা পা -া I গা গা -া। ঋা ঋা -া I সা -া -া। -া -া -া I
এই ০ তো তু মি ০ অ রু ণ্ আ কা ০ শে ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I সা -া দ্া। ন্া সা -া I ঋা ঋা -া। ঋসা -ন্া ন্া I সা -া -া। -া -া -া I
এই ০ তো তু মি ০ প্র ভা ত্ পু ০ ০ ল কে ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I মা -া মা। পা পা -া I পা -া দা। র্সা -া র্সা। র্সা -দা -া। -পা -মা -গা II
এই ০ তো তু মি ০ পু ষ্ প বি ০ কা শে ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
II দা -া দা। না র্সা -া I র্ঋা র্ঋা -া। র্ঋর্সা না -া I র্সা -া -া। -া -া -া I
এই ০ তো তু মি ০ পা খী র্ ক ০ ন্ ০ ঠে ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
I র্মর্গা র্গা -া I র্গা র্গা -া। র্মা র্গা -া। র্ঋা র্ঋা -া I র্সা -া -া। -দা -া -া I
গে য়ে ০ ও ঠ ০ এ ম ন্ আ ন ন্ দে ০ ০ ০ ০ ০

১´ • ১´ • ১´ •
I র্সা -া র্সা | র্ঋা র্সা -া I ণা ণা -া | ণদা -া -া I পা -া -া | -া -া -া I
স্ব র্ ণ ধা রা য্ গ ভী র্ ছ• • ন্ দে • • • • •

১´ • ১´ • ১´ •
I সা সা -ঋা | মা মা -া I পা পা -দা | র্সা র্সা -া I র্সা -দা -া | পা -মা -গা II
বে জে • ও ঠে • দ খি ণ্ বা তা • সে • • • • •

১´ • ১´ • ১´ •
II দা -া দা | না সা -া I ঋা ঋা -া | ঋসা -না না I সা -া -া | -া -া -া I
এই • তো তু মি • আ মার্ • হৃ• • দ য়ে • • • • •

১´ • ১´ • ১´ •
I গা গা -া | মা গা -া I ঋা -া ঋা | ঋসা -না না I সা -া -া | -া -া -া I
চ লে • ছ আ জ্ বি • শ্ব বি• • জ য়ে • • • • •

১´ • ১´ • ১´ •
I সা মা মা | পা পা -া I পা পা -দা | র্সা -া -া I র্সা -দা -া | -পা -া -া I
এ ই তো তু মি • প্রা ণে র্ আ ন ন্ দে • • • • •

১´ • ১´ • ১´ •
I ণা ণা -ণা | দা দা দা I পা পা -া | গা -ঋা -া I সা -া -া | -া -া -া II
বা জা ও আ মা র্ এ ব র্ ছ ন্ • দে • • • • •

১´ • ১´ • ১´ •
II দা -া দা | না র্সা -া I র্ঋা র্ঋা -া | র্ঋসা -না -া I র্সা -া -া | -া -া -া I
এ ই তো তু মি • গা নে • গা• • • নে • • • • •

১´ • ১´ • ১´ •
I র্গা র্গা -া | র্মা র্গা -া I র্ঋা র্ঋা -া | র্ঋসা -না -া I র্সা -া -া | -া -া -া I
জে গে • ছ মো র্ প্রা ণে • প্রা• • • ণে • • • • •

১´ • ১´ • ১´ •
I র্সা -া র্সা | র্ঋা র্সা -া I ণা ণা -া | ণদা দা -া I পা -া -া | -া -া -া I
ব র্ ষা শ র ৎ ক ত ই ব স ন্ তে • • • • •

১´ • ১´ • ১´ •
I সা সা -ঋা | মা মা -া I পা পা -দা | র্সা র্সা -া I র্সা -দা -া | -পা -মা -গা II II
দি য়ে • গে ছ • হৃ দ য়্ আ কা • শে • • • • •

য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথ।*

য়ুরোপ যাত্রার কারণ

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর মাঝে মাঝে ঐ প্রাইজের সর্ত্ত অনুসারে নোবেল-বক্তৃতা দিবার জন্য কবির নিমন্ত্রণ আসিত। পরে য়ুরোপের অন্যান্য দেশ হইতেও নিমন্ত্রণ-লিপি আসিতে লাগিল। যতদিন য়ুরোপের মহাযুদ্ধের অবসান না হয়, ততদিন এই সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করা দুরূহ ছিল। তদনন্তর কেবলই যে এই সকল য়ুরোপীয় ভক্তবৃন্দের কামনা পূর্ণ করার সুযোগ আসিল তাহা নহে, কবিবর সমর-শশ্মানভূমি য়ুরোপে নব-নির্ম্মাণ কার্য্য কেমন চলিতেছে তাহা দেখিবারও সুবিধা পাইলেন।

যাত্রারম্ভ

১৯২০ সালের ১৫ই মে তারিখে রবীন্দ্রনাথ বোম্বে হইতে Merca জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। সমুদ্রবক্ষে বাসকালে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই। ঐ জাহাজে আলোয়ারের রাজা, সার করিমভাই ও শ্রীযুক্ত এস, আর, বোমানজি তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। [আলোয়ারের মহারাজা কবির প্রতি বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন, এবং প্রায়ই তাঁহার নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আসিতেন। কবির ঐ সময়ে লিখিত যে পত্রাবলী ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, যে তিনিও মহারাজার সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন।]

বিলাত

বিলাতে পৌঁছিয়ে ১৭ই জুন তারিখে শ্রীযুত এম, এন, ব্যানার্জ্জি মহাশয় Y. M. C. A.-গৃহে একটি অভ্যর্থনাসভার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ উক্ত সভায় জাতীয় পরিচ্ছদে যোগ দিয়াছিলেন, এবং খাটি দেশীয়ধরণে জলযোগের আয়োজন হইয়াছিল৭ ১৯শে জুন তারিখে তিনি অক্সফোর্ড যান ও তথায় ভারতীয় ও ইংরাজ ছাত্রবৃন্দের সম্মিলিত সভায় "তপোবনের স্থাণী" শীর্ষক নিবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সভায় মেসোপটেমিয়ার খ্যাতনামা কর্ণেল লরেন্স উপস্থিত ছিলেন। ২রা জুলাই তারিখে Y. M. C. A.—গৃহে রাইট অনারেবল মিঃ ফিশারের সভাপতিত্বে তিনি "ভারতীয় সাধনার একটি কেন্দ্রস্থান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতাকালে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যানের মত মানসতৃপ্তিকর সামগ্রী সত্যই দুর্লভ।

খ্যাতনামা ইংরাজ মনীষী মিঃ ডিকিন্‌সনের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ ২৮শে জুলাই তারিখে কেম্ব্রিজে যান, সেখানে সুপরিচিত বাঙ্গালাভাষার অধ্যাপক পরলোকগত মিঃ এণ্ডারসন তাঁহার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের একতাসাধন সমিতি'র উদ্যোগে তাঁহার কয়েকখানি নাটকের অভিনয় প্রদর্শনে জুলাইএর শেষ সপ্তাহটা অতিবাহিত হইয়াছিল।

এইখানে অবস্থান কালেই ক্যাক্সটন-হলে যে সম্বর্দ্ধনা-উৎসব হয়, তাহাতে একজন বিখ্যাত অভিনেত্রী কবির উদ্দেশে রচিত লরেন্স বিনিয়নের একটি কবিতা পাঠ করেন। রয়টার এবং 'ইংলিশম্যান'-পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা এই অনুষ্ঠানের বিবরণ এদেশে তারযোগে জানাইয়াছিলেন।

ফ্রান্স।

৭ই আগষ্ট তারিখে কবিবর ফরাসী দেশে আসিয়া পারিসে একমাস যাপন করেন। এই সময়েই কবিবরের সঙ্গে মসিয়ে বের্গসঁ ও মসিয়ে সিলভ্যাঁ লেভির দেখা-সাক্ষাৎ হয়—এ সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে যথাকালে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে পুনরায় জর্ম্মাণী ও হল্যাণ্ড হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসিল। মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রুডলফ্ তাঁহাকে ২০শে আগষ্ট তারিখের পত্রে একস্থানে লিখিতেছেন—

"কয় সপ্তাহ হইল আমি আপনাকে জর্ম্মাণীতে আসিবার নিমন্ত্রণপত্র পাঠাই; বিশেষ করিয়া ইন্সব্রাক নগরীস্থ 'খ্রীষ্টিয়ান সুহৃদ্-সংঘ' নামক সভার ২৯শে ও ৩০শে সেপ্টেম্বর অধিবেশনে আপনাকে আহ্বান করি। ঐ সঙ্গে আমার বন্ধু ডার্মস্টাড্ সহরের ডাঃ ফ্রিকুকে বলিয়া পাঠাই যে 'সর্ব্বধর্ম্ম-মিলন-সংঘ' স্থাপনের জন্য উক্ত সহরে ৬ই ও ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমরা যে সভা করিতেছি, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য আপনাকে যেন আহ্বান করা হয়। আমি পুনরায় আপনাকে আমার সাদরে নিমন্ত্রণ জানাইতেছি। ইন্সব্রাক্ সহরে ঐ তারিখেই ধর্ম্মবিষয়ে উন্নতিশীল একদল বন্ধুর সহিত আপনার মিলন হইবে, তাঁহারা আপনার মুখে আপনার ধর্ম্মমত ও দার্শনিক চিন্তা অবগত হইবার জন্য আপনাকে আদরে বরণ করিয়া লইবেন।"

কবিবরের জর্ম্মাণীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া ঐ সময়কার রয়টারের সংবাদে যে একটু ইঙ্গিত ছিল, তাহা কতখানি অসঙ্গত তাহা দেখাইবার জন্য জর্ম্মাণী হইতে এই আন্তরিকতাপূর্ণ নিমন্ত্রণপত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইল। ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল এই যে, যখন ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে

---

* ইংরাজী 'সার্ভেন্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার ঘোষ-লিখিত বিবরণের অনুবাদ।

রবীন্দ্রনাথ ফ্রান্স হইতে জর্ম্মানি যাত্রা করিবার জন্য টিকিট ক্রয় করিতে পাঠাইলেন, তখন সীমান্তদেশের তদানীন্তন বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে টিকিট লইতে হইলে যে অন্ততঃ এক সপ্তাহকালের নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন ইহাই তাঁহাকে জানান হয়, কারণ তৎপূর্ব্বে নাকি কি কি বিষয়ে খবর লওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কবিবরের হল্যাণ্ড পৌছিবার কথা থাকায় তিনি এক সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিতে পারেন নাই এবং এই মর্ম্মে জর্ম্মাণ-বন্ধুদিগকে তার করিয়া পাঠান। এ দেশের কোন কোনো ন্যাশন্যালিষ্ট সংবাদ-পত্রে যে মন্তব্য বাহির হয়—যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই এ বিষয়ে প্রতিকূলতা করিয়াছেন—তাহাও সত্য নহে; কারণ চাহিবামাত্র বিলাত হইতে তাঁহাকে সকল দেশের পাসপোর্ট দেওয়া হইয়াছিল।

ওলন্দদেশে।

১৮ই ডিসেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ হল্যাণ্ডে আসিলেন। সেখানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটি জাতীয় অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, উহার জন্য দেশের প্রত্যেক বড় বড় কেন্দ্রস্থলে একটি করিয়া কমিটি ছিল। কবি পৌছিয়াই দেখিলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার জন্য একটি প্রোগ্রাম স্থির করিয়া রাখা হইয়াছে, কেবল আয়োজনের ভিতরকার অঙ্গগুলি কিরূপ হইবে তাহাই তাঁহার সহিত পরামর্শের জন্য অপূর্ণ রাখা হইয়াছিল। তিনি আম্‌স্টার্‌ডাম সহরে তিনটি বক্তৃতা করেন, তৎপরে লীডেন্, রটারডাম, হেগ, ইউট্রেক্‌ট্ সহরে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও অন্যান্য স্থানে বক্তৃতা করেন।

রটারডাম সহরে ডাঃ জে, জে, ভ্যান ডার লিউর গৃহে কবিবর অতিথি হইয়াছিলেন। ইনি অন্যত্রও কবিবরের সহগামী ছিলেন ও তাঁহার সম্বর্দ্ধনা সম্বন্ধে আপনার মনোভাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৯২১ সালের মার্চ্চ সংখ্যার 'মডার্ণ-রিভিউ' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলে মন্দ হইবে না।

'এই সর্ব্বদর্শী কবি যখন হল্যাণ্ডে আগমন করিলেন তাহার বহু পূর্ব্বেই সেখানকার জনমণ্ডলী তাঁহার ও তাঁহার গ্রন্থাবলীর পরিচয় পাইয়াছে, তাহারা সকলেই তাঁহার আগমনে উৎফুল্ল, তাঁহার গুণমুগ্ধ শ্রোতৃবর্গ সকলেই তাঁহার ও তাঁহার রচনার একান্ত পক্ষপাতী। হল্যাণ্ডে, রবীন্দ্রনাথ নবযুগের মুখ্য ব্যক্তিগণের অন্যতম বলিয়া সকলের ধারণা; ইংরেজিতে ও ডচ্‌ভাষায় অনূদিত তাঁহার বহুগ্রন্থের বহু ভাবগ্রাহী পাঠক তথায় বিদ্যমান। এখানে "ঠাকুর-কবির ভাব" বলিতে, জগৎ ও জীবনকে দেখিবার একটি বিশেষ ভঙ্গী বুঝায়, এবং এই বাক্যের ব্যবহার ক্রমেই বহুপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে।

অতএব কবিবর যখন "থিওসফিক্যাল সোসায়েটি" ও "স্বাধীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে"র আহ্বানে হল্যাণ্ডে আসিলেন তখন চারিদিকে অনুরক্ত ভক্তমণ্ডলীর দেখা পাইতে লাগিলেন। যেখানেই যান সেখানেই তাঁহাকে গৃহে আনিয়া লোকে ধন্য। এমন কোনো য়ুরোপবাসীর কথা ত' আমার মনে পড়ে না, যিনি ইদানীন্তন কালে হল্যাণ্ডে এই মহাকবির মত সম্মান লাভ করিয়াছেন। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই এ দেশবাসীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। তাঁহার সহিত যে হৃদয়ের সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতেই ছিল, তাহা তাঁহার বক্তৃতায় এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজের একটি মোহিনী শক্তিতে আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। তাঁহার মধ্যে যে জ্ঞানের একটি মাধুরী আছে এবং জীবনযাত্রার একটি সহজ আনন্দময়তা আছে—উহাই আমাদিগকে সমধিক চমৎকৃত করিয়াছে, তাঁহার দর্শনলাভ যেন পুণ্যের মত বোধ হইয়াছে।

যে এক পক্ষকাল এখানে ছিলেন তাহার মধ্যে তিনি আমস্টারডাম, হেগ, রটারডাম প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে, লীডেন, ইউট্রেক্ট, ও আম্‌স্টারডামের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সকল স্থানেই সভাগৃহে তিল ধারণের স্থান ছিল না, সহস্র সহস্র লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল—তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য চারিদিক হইতে লোক সমাগম হইয়াছিল। ইউট্রেক্ট সহরে সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিয়া তাঁহাকে স্বাগত-সম্ভাষণ করা হয়,—হল্যাণ্ডের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃতের পঠন-পাঠন হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বাধিক সম্মান করা হইয়াছিল রটারডাম নগরে,—সেখানে কেবল গীর্জ্জার মধ্যে নয়, একেবারে বেদীর উপরে বসিয়া তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। এদেশে এই প্রথম একজন অ-খৃষ্টানকে এত বড় সম্মান দেওয়া হইল এবং এই সম্মানের অর্থ এই যে, ধর্ম্মোপদেষ্টা হিসাবে কবির প্রতিষ্ঠা এমনি অসাম্প্রদায়িক যে, খ্রীষ্টীয় উপাসনা-মন্দিরের বেদিকার উপর দাঁড়াইবার অধিকার তাঁহার আছে।

সেদিনের দৃশ্য যাহারা দেখিয়াছে তাহারা আর ভুলিবে না। পর্য্যাপ্ত পুষ্পসম্ভারে বেদিটি ভূষিত হইয়াছে, এই পুষ্পচ্ছদের মধ্যেও স্ফুটতর দেহে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি তাঁহার বাণী বিঘোষিত করিলেন—তাহার নাম, "পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন"। অবশেষে যখন অভ্যর্থনাসমিতির অধ্যক্ষ, আমাদের দেশে আসিয়া এ কয়দিন অবস্থানের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন, এবং কবি কয়েকটি কথায় বিদায় জানাইয়া তাহার উত্তর

দিলেন—সেইক্ষণে সকলের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল—তাঁহার কথাগুলি সকলের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল।

বেলজিয়মে।

হল্যাণ্ডে অবস্থানকালে কবিবর বেলজিয়ম হইতে নিমন্ত্রণ পান যে, অ্যাণ্টওয়ার্প ও ব্রসেল্‌স্‌ নগরে তাঁহাকে বক্তৃতা দিতে হইবে। শেষোক্ত নগরে 'প্যালেদ্য-জাষ্টিস'-গৃহে তিনি বক্তৃতা করেন।

বেলজিয়ম হইতে পুনশ্চ প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়া ১৯২০ সালের ২ শে অক্টোবর তারিখে কবিবর 'রটারডাম' নামক জাহাজে আমেরিকা যাত্রা করেন।

আমেরিকা।

আমেরিকায় কয়েকটি প্রধান প্রধান নির্দ্দিষ্ট স্থানে বক্তৃতা করিয়া ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি বিলাত যাত্রা করেন।

আবার বিলাত।

বিলাতে পঁহুছিয়া Y. M. C. A. ছাত্রাবাসের "সেক্‌স্‌পীয়ার কুটীরে" কবিবর দুইটি নিবন্ধ পাঠ করেন, একটি, "পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন", তাহাতে মিঃ নেভিন্‌সন্‌ সভাপতি ছিলেন; অপরটি, "বাঙ্গালার বাউল", সভাপতি হইয়াছিলেন সার ফান্সিস্‌ ইয়ংহস্‌ব্যাণ্ড।

আবার ফ্রান্স।

১৬ই এপ্রিল তারিখে কবিবর আকাশযানে ফ্রান্স যাত্রা করেন। প্যারিসে আসিয়া Autor du Monde-এ বাসা লইলেন। ২১শে এপ্রিল তারিখে "ফরাসী দেশের প্রাচ্যজনসম্মিলন" সভার উদ্যোগে Musee guimetতে "ভারতের লোকধর্ম্ম" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। ২৪শে এপ্রেল তারিখে উক্ত সভা "অন্তরঙ্গ সমাজ"-গৃহে কবির সম্মানার্থ একটি ভোজের অনুষ্ঠান করেন। এই উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। আহারাদির পর ফরাসীদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা মসিয়ে কোপ্যাঁ ফরাসী ভাষায় "ডাকঘর" আবৃত্তি করেন। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের সহিত ফরাসী দেশের পণ্ডিতাচার্য্যগণের আলাপ-আলোচনা হয়; তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে "ভারতে জ্ঞান-প্রীতি" বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করেন। ২৮শে এপ্রিল তিনি সিল্‌ভেঁ লেভি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ষ্ট্রাস্‌বার্গ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যান। "মডার্ণ রিভিউ-এ" পরে সেই বক্তৃতার সংবাদ (তপোবনের বাণী) প্রকাশিত হইয়াছিল।

সুইজারল্যাণ্ড।

৩০শে এপ্রিল কবিবর জেনেভা নগরীতে পৌঁছিলেন। ৪ঠা মে 'লে'থেনী' গৃহে "জোঁ জ্যাক্‌স্‌ রুসো ইন্‌ষ্টিটিউটে'র আকিঞ্চনে আপনার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে কিছু-পাঠ করিয়া শুনান। ইহার পর তিনি সমগ্র সুইজারল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করেন। ১০ই মে বেসেল-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন; ঐদিন সন্ধ্যায় অধ্যাপকেরা মিলিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। ১১ই তারিখে জ্যুরিক সহরের 'ওয়াল্‌ডার হাউস ডল্‌ডার' গৃহে 'সাহিত্য-সভার' উদ্যোগে একটি বক্তৃতা করেন। ১২ই তারিখে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আউলা'তে 'কবির ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ইটালী যাত্রা স্থগিত।

এখান হইতে তাঁহার ইটালি যাইবার কথা ছিল। সেখানে তাঁহার অভ্যর্থনার সকল আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু অবিলম্বে সুইডেনে যাইবার জন্য 'সুইডিশ একাডেমি' হইতে পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ তার আসিতে লাগিল। কাজেই, ইতালী যাত্রা তখন আর হইয়া উঠিল না।

জর্ম্মাণীতে।

১৩ই মে জার্ম্মেণীতে পৌঁছিয়া কবিবর এক দিন কাউণ্ট কেসারলিং-এর গৃহে বাস করেন। ১৫ই তারিখে তিনি হ্যাম্‌বার্গে যান। ১৭ই তারিখে প্রিন্সেস্‌ বিস্‌মার্কের নিমন্ত্রণে Fridrichruhe-সহরে Bismark Castle-এ বেড়াইতে যান। সেখানে অধ্যাপক Meyer-Benfeyর গৃহে স্বরচিত গ্রন্থাবলী হইতে কোনো কোনো স্থান পাঠ করেন। ২০শে তারিখে হামবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আউলা'তে, Hamburges Kunstgesselschaft-এর উদ্যোগে 'তপোবনের বাণী' বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন।

ডেনমার্কে।

১৯২১ সালের ২১শে মে রবীন্দ্রনাথ কোপেনহেগেনে আসেন। রেলষ্টেশনে আনন্দোন্মত্ত জনতার উচ্ছ্বাস এত অধিক হইয়াছিল যে, কবিবর অনেক কষ্টে ট্রেন হইতে নামিতে পারিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে যে জনসমাগম হইয়াছিল, সেরূপ আর কোথাও হয় নাই।

কবিকে কাঁধে করিয়া তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হয়—তাঁহার বসন-প্রান্ত চুম্বন করিবার জন্য অসম্ভব হুড়াহুড়ি হইয়াছিল। ভিড়ে কবির সমভিব্যাহারী মিঃ বোমানজী তাঁহার টুপি হারাইয়া ফেলেন, এবং কবিবরের পুত্র ভিড়ের মধ্যে এতদূর হটিয়া গিয়াছিলেন যে পিতার সহিত আসিয়া জুটিতে তাঁহার বেশ কিছুক্ষণ লাগিয়াছিল। জনসংঘের এই উচ্ছ্বাস ষ্টেশন হইতে কবিবরের বাসস্থান পর্য্যন্ত সারাপথ সমান মাত্রায় চলিয়াছিল।

মশাল-আলোকের শোভাযাত্রা।

২২শে মে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রসম্মিলনীতে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা-শেষে একটি যেমন-জাঁকালো-তেমনি-সুন্দর

উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। ছাত্র ও যুবজনেরা কবিকে তাঁহার বাসায় পৌঁছাইয়া দিবার সময় একটি মশালধারীর মিছিল বাহির করে—ও-দেশে এইরূপ মিছিল বড় সুন্দর হয়—প্রত্যেক ছাত্রের হাতে একটি করিয়া প্রজ্জ্বলিত মশাল! কবি বাসায় ফিরিলে পরও জনতার হ্রাস হয় নাই, জনমণ্ডলী তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী রাজপথসমূহে ও সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে তাহাদের উল্লাস জ্ঞাপন করিতে ছাড়িল না। তাহাদের ইচ্ছানুসারে কবিকে কয়েকবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া দু'চারিটি কথা বলিতে হইয়াছিল। ডেনমার্কের অধিবাসীরন্দ সম্মিলিত কণ্ঠে "ভারতের জয়" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে, কবি তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষার প্রতিদানে বাংলায় "ডেনমার্কের জয়" বলিয়া উঠেন।

ভারতী—ভাদ্র, ১৩২৮।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি—

(গান)

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

সিন্ধু—তেতালা।

গানে গানে ভরিয়ে দিলে
বিশ্বভুবন গানের কবি!
সুরের কিরণ ছড়িয়ে দিলে
ভুবনতলে ভুবন-রবি!
তোমার আলোয় ভুবন আলো,
বেসেছি তাই নিখিল ভাল;
মোর নয়ন হতে মুছলো কালো
তোমার পুণ্য প্রসাদ লভি'!
গানের কবি ভুবন-রবি
নমি তোমার পুণ্য ছবি!
জ্ঞানের আলোক প্রকাশিলে
জগৎ মাঝে ওগো কবি;
প্রেমের আলোয় বরি' নিলে
যেখানে যা' আছে সবই!
ধন্য তুমি ভুবন-রবি
কাব্যলোকের মুক্তি-কবি!
তোমার মাঝে আমরা লভি
প্রাচীন ঋষি-জনচ্ছবি।
বাংলা দেশের উজল রবি
নমি তোমার পুণ্য ছবি॥

পরমহংস শ্রীসিদ্ধারূঢ় স্বামী।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

(আষাঢ় মাসের অনুবৃত্তি)

তৎপরে প্রহরীর সহিত সোম ও ভীম তথায় উপস্থিত হইল। সোম ও ভীম সিদ্ধপ্পার নিকট সেই রাত্রের লাঞ্ছনার কথা বলিল। সিদ্ধপ্পা একটু হাস্য করিয়া বলিলেন "যেমন তোমরা আমার কথা না শুনিয়া গিয়াছিলে সেইরূপ ফল পাইয়াছ। এক্ষণে এই দেখ দেবতা তোমাদের জন্য খাদ্যসামগ্রী প্রেরণ করিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি সেই নৈবেদ্য তাহাদের সম্মুখে রাখিলেন এবং তিনজনে মিলিয়া তাহা ভক্ষণ করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে সোম ও ভীম বলিল "আমরা আর কষ্ট সহ্য করিতে পারি না। গৃহে প্রত্যাগমন করিব"। সিদ্ধপ্পা ইহাতে সম্মত হইয়া বলিলেন, "তবে তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও আমি এককই উদ্দেশ্যপথে গমন করিব।"

সিদ্ধপ্পা তথা হইতে হায়দ্রাবাদ হইয়া গোলকুণ্ডাভিমুখে গমন করিলেন। দিবাভাগে পথ চলিতেন, সায়ংকালে "করতল" ভিক্ষা করিয়া কিছু আহার করিতেন এবং রাত্রিকালে কোন মন্দির অথবা মস্‌জিদ কিম্বা বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতেন। কাহারও সহিত কোন কথা কহিতেন না। গোলকুণ্ডায় গমন করিয়া সিদ্ধপ্পা সেখানে একটি গুহা দেখিতে পাইয়া তথায় কিছুদিবস শিবধ্যানে মগ্ন হইবার ইচ্ছা করিয়া অবস্থান করিলেন।

কিছুদিন পরে সেই গুহা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় প্রবাসযাত্রার পথে অগ্রসর হইলেন। তৎপরে শ্রীশৈল্য মল্লিকার্জ্জুনে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে দক্ষিণদেশীয় তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে রাচোটীর বীরভদ্র মঠ দর্শন করিয়া সুরপুরা গমন করিলেন। এই সময় তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহাকে কখনও বা দুইদিন, কখনও বা তিনদিন অনাহারে, কখন বা ফলাহার করিয়া, কখন বা জলমাত্র পান করিয়া থাকিতে হইত। তাঁহার অঙ্গে কৌপীন, ছিন্ন বস্ত্র এবং কম্বল ব্যতীত কিছুই ছিল না; সেজন্য শীতে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি সেই সকল কষ্ট উপেক্ষা করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না। সর্ব্বদা শিবধ্যান, শিবচিন্তন দ্বারা সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সুরপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে ঘণ্টাকল নামক স্থানের নিকট অমরগুণ্ড নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে একজন মহা সিদ্ধপুরুষ বাস করিতেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া সিদ্ধপ্পার বড়ই আনন্দ হইল; তাঁহার শরীর

রোমাঞ্চিত হইল, কণ্ঠ গদ্‌গদ হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং অন্তঃকরণ প্রেমে ভরিয়া গেল। এই সকল ভাব দেখিয়া তিনি সেই সিদ্ধপুরুষের নিকট দীক্ষিত হইতে মনস্থ করিলেন। তৎপরে তাঁহার প্রতি সিদ্ধপুরুষের অনুকম্পা হওয়ায় তিনি সিদ্ধপ্পাকে যথারীতি দীক্ষিত করিলেন।

দীক্ষিত হইবার পর সিদ্ধপ্পা কিছু দিন গুরুর মঠে অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। কিছুদিন পরে মহাসিদ্ধ দেখিলেন যে সিদ্ধপ্পা ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার আর তথায় থাকিবার আবশ্যকতা নাই। এ কারণ তিনি সিদ্ধপ্পাকে বলিলেন "বৎস, তুমি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ। আর তোমার এখানে থাকিবার আবশ্যকতা নাই। তুমি এক্ষণে অন্যত্র গমন করিয়া স্বাধীনভাবে অবস্থান কর।" সিদ্ধপ্পা গুরুকে অনেক বিনীতভাবে বলিলেন যে, তিনি তথায় থাকিয়া গুরুসেবা করিবেন। কিন্তু সিদ্ধপুরুষ তাঁহাকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া অন্যত্র যাইতে সম্মত করাইলেন। এইস্থানে অবস্থান কালে সিদ্ধপ্পা সুব্বয়া শাস্ত্রী নামক জনৈক পণ্ডিতকে উপনিষদ্ সম্বন্ধীয় তর্কে পরাভূত করিয়া স্বীয় পরাজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

অতঃপর সিদ্ধপ্পা স্বামীর পাদবন্দনা পূর্ব্বক তথা হইতে যাত্রা করিয়া বিজাপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি "জড়ান্ধবধিরবৎ" থাকিতেন। দিবাভাগে কোন মস্‌জিদে পড়িয়া থাকিতেন এবং সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা করিয়া কিছু আহার্য্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেন এবং রাত্রিকালে কোন মস্‌জিদ কিম্বা দেবালয়ে নিদ্রা যাইতেন।

একদিবস রাত্রিকালে সিদ্ধপ্পা নিদ্রা যাইবার জন্য আশ্রয়-স্থানে যাইতেছিলেন। তখন সেই পথ দিয়া কোন বড় ঘরের বরযাত্রা যাইতেছিল। তাঁহাদের একজন মশালধারী আবশ্যক হয়। পথিমধ্যে ছিন্নবস্ত্রশোভিত সিদ্ধপ্পাকে দেখিয়া, তাঁহাকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিল। সিদ্ধপ্পা বিনা বাক্যব্যয়ে মশাল লইয়া যথাস্থানে গমন করিলেন। কিন্তু বরযাত্রীগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া যখন সকলের মজুরী চুকাইয়া দিতেছিলেন তখন তাঁহারা দেখিলেন যে, সেই মশালধারী পথিক তথায় নাই। বলাবাহুল্য যে সিদ্ধপ্পা তাঁহাদের কার্য্য সমাপন করিয়াই স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

এইরূপে বিজাপুরে কিছুদিবস থাকিয়া সিদ্ধপ্পা পুনরায় তথা হইতে যাত্রা করিলেন। অতঃপর তিনি গোকর্ণ নামক তীর্থস্থানে যাইয়া কিছুদিবস অবস্থান করিলেন। এই স্থানেও তিনি বিজাপুরের ন্যায় মৌন অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তাঁহার কোমরে কৌপীনমাত্র, অঙ্গে ছিন্ন বস্ত্র এবং কম্বল; কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই; এইরূপ ভাব দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে বাতুলমধ্যে পরিগণিত করিল। একদিবস হোলীর (দোলযাত্রার) সময় সিদ্ধপ্পাকে পথে যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া তাঁহার মুখে চূণ-কালি, কর্দ্দমাদি মাখাইয়া, তাঁহাকে একটী গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বসাইয়া নগরের চারিদিকে ফিরাইতে লাগিল। সিদ্ধপ্পা কোন বাক্যব্যয় না করিয়া অম্লানবদনে সেই সকল নিগ্রহ সহ্য করিয়া লোকের হাস্য বর্দ্ধন করিলেন।

গোকর্ণে কিছুদিবস থাকিয়া তিনি পুনরায় অন্য দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে হুবলী গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। তদবধি তিনি হুবলীতেই অবস্থান করিতেছেন।

হুবলীতে আসিয়া তিনি পুরাতন হুবলী নামক স্থানে রহিলেন। এখানে তিনি দিবাভাগে গোচারক (রাখাল) দিগের সহিত খেলা করিতেন; সায়ংকালে একবার মাত্র গ্রামমধ্যে গমন করিয়া করতল-ভিক্ষা করিয়া কিছু আহার করিতেন, এবং রাত্রিকালে গ্রামের পশ্চিমে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে একটি আম বাগানে জনৈক সাধুপুরুষের সমাধিস্থানে আসিয়া নিদ্রা যাইতেন। তাঁহার সঙ্গী রাখাল বালকগণ ভিন্ন তিনি আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। এইরূপে তিনি পাগলের ভাব দেখাইতে লাগিলেন।

একদিবস তিনি নিত্যনিয়মে এক গৃহস্থের বাটীতে ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। সেই গৃহস্থ ভাবুক ছিলেন। দৈববশত তথায় বেদান্তবিষয়ক কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। তন্মধ্যে কোন বিষয়, শ্রোতা ও বক্তা কাহারও বোধগম্য না হওয়ায় সকলেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন। সিদ্ধপ্পা মৌনব্রত পরিত্যাগ করিয়া সেদিন তাঁহাদিগের সেই জটিল প্রশ্ন সরল ভাষায় এমন সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, সমবেত জনমণ্ডলী আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। গৃহস্থ সেই রাত্রে সিদ্ধপ্পাকে আপনার বাটীতে রাখিয়া যথারীতি অতিথিসৎকার করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র অপর কেহ জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই সিদ্ধপ্পা উঠিয়া বনে রাখালদিগের নিকট চলিয়া গেলেন। কিন্তু সিদ্ধপ্পার ভাষণ সেই মণ্ডলীর প্রাণে লাগিয়া রহিল। সেইজন্য তাঁহারা অন্বেষণ করিয়া প্রতিদিন সেই উদ্যানে গিয়া বেদান্তচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। বেদান্তপাঠ আরম্ভ হইলেই সিদ্ধপ্পা সরল ভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ গ্রামময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মণ্ডলীর সভ্যগণ সিদ্ধপ্পার

বেদান্তব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া এতই প্রীত এবং মোহিত হইয়া গেলেন যে তাঁহারা অতঃপর সিদ্ধপ্পা যে বনমধ্যে রাখালবালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন তথায় যাইয়া বেদান্তচর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। এইরূপে নিত্য নিত্য মণ্ডলীর সভ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তন্মধ্যে অনেকেই তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িলেন। এই মণ্ডলী সিদ্ধপ্পার অসাধারণ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে সিদ্ধারূঢ় স্বামী নামে অভিহিত করিলেন। সেই অবধি সিদ্ধপ্পা সিদ্ধারূঢ় স্বামী নামে পরিচিত আছেন।

একদিবস সিদ্ধপ্পা নিত্যনিয়মিত সময়ে রাখালদিগের সহিত খেলিতে আসিলেন। বালকগণ হুরডা (কাঁচা জবারি) খাইতে অভিলাষ করিয়া কোন ক্ষেত্রে গমন করিল। সিদ্ধপ্পাও তাহাদিগের সহিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ক্ষেত্ররক্ষক তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ধরিবার জন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। রাখাল বালকগণ সকলেই পলায়ন করিল কিন্তু সিদ্ধপ্পা ধরা পড়িলেন। ক্ষেত্ররক্ষক রাগে অন্ধ হইয়া সিদ্ধপ্পাকে মারিতে লাগিল। সিদ্ধপ্পা বিনা বাক্যব্যয়ে সেই নির্য্যাতন সহ্য করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে স্বীয় ভক্তগণের জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া সিদ্ধপ্পা ক্ষেত্রস্বামীকে বলিলেন "ওরে এইবার পালা, ঐ ব্যক্তি তোকে দেখিলে মারিয়া ফেলিবে।" তখন সেই ক্ষেত্ররক্ষক আগন্তুককে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল।

সিদ্ধপ্পা মৌনব্রত পরিত্যাগ করিবার পর অবধি প্রতিদিন প্রাতঃ-সায়ংকালে বেদান্তাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তৎকালে হুবলীতে লিঙ্গায়তগণের মধ্যে আগমবাদী ও নিগমবাদী নামে দুই দল ছিল এবং প্রত্যেক পক্ষীয় লোকে আপন আপন মতের ঘোর অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পরস্পর ঈর্ষা-দ্বেষ করিত। এমন কি, একটি মঠে এই কারণে খুন পর্য্যন্তও হইয়াছিল।

এদিকে সিদ্ধপ্পার নিকট প্রতিদিন নিয়মিত বেদান্তচর্চ্চা চলিতে লাগিল। তাঁহার ব্যাখ্যান শুনিবার জন্য ক্রমে উপরি-উক্ত উভয়পক্ষেরই দুই একজন করিয়া লোক তথায় আসিতে আরম্ভ করিল। সেই সকল ব্যাখ্যান শ্রবণ করিয়া লোকের মনে ক্রমে সমদর্শিতাভাব জাগরিত হইতে লাগিল। বিষম ঈর্ষ্যাদ্বেষ তিরোহিত হইল। উভয় পক্ষের লোক একমত হইয়া পরস্পর স্নেহসদ্ভাবে পুনরায় মিলিত হইল।

সিদ্ধপ্পা কানাড়ী, তেলুগু, তামিল, মারাঠী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় সুন্দররূপে কথাবার্ত্তা চালাইতে পারেন। তিনি সর্ব্বজীবে সমদর্শী। এ কারণ তাঁহাকে লিঙ্গায়ত, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুসলমান, এমন কি খৃষ্টানও ভক্তি করিয়া থাকে। অধিক কি, অনেকে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় দেখে। তিনি মুসলমানধর্ম্মশাস্ত্রও বিশেষরূপে অবগত আছেন এবং সংস্কৃত না জানা সত্বেও তিনি সংস্কৃত ভাষায় বেদান্তাদির পাঠ শুনিয়া অতি সহজে উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

সিদ্ধারূঢ় স্বামীর ভক্তগণ পুরান হুবলী হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে তাঁহার জন্য একটি প্রকাণ্ড মঠ করিয়া দিয়াছেন। এই মঠে একত্র-সংলগ্ন চারিটি বৃহৎ ঘর আছে। তন্মধ্যে দুই তিন শত লোক থাকিতে পারে। রন্ধন করিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। মঠের এক পার্শ্বে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত স্বামীজীর জন্য একটি সুবৃহৎ সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমাধির নিম্নে নির্জ্জন উপাসনার জন্য একটি তল-ঘর আছে। সমাধির পশ্চাতে বৃহৎ প্রাঙ্গণ ও একটি প্রশস্ত দালান আছে। মঠের অপর পার্শ্বে দীর্ঘ-প্রস্থে ১২৫ ফুট একটি ধর্ম্মশালা আছে। ইহার মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ এবং চারি পার্শ্বে মাঙ্গালোর টালির চৌসপি ঘর আছে। এই স্থানটি সর্ব্বদা এরূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয় এবং সেই জন্য এত মনোরম যে একবার এখানে আসিলে আর ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। এই ধর্ম্মশালায় স্বামীজী প্রতিদিন কিছু ক্ষণ বসিয়া ভক্তগণের সহিত বেদান্তচর্চ্চা করিয়া থাকেন। মঠের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র বারান্দায় স্বামীজীর বসিবার জন্য একটি সিংহাসন আছে। এই সিংহাসনের পশ্চাদ্‌ভাগস্থ প্রাচীরে স্বামীজীর একটি ফটো রক্ষিত আছে। মঠ, সমাধি ও ধর্ম্মশালার সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ এবং প্রস্তরনির্ম্মিত সোপানাবলী সহ একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

মঠে পূর্ব্বে প্রতিবৎসর কার্ত্তিক-শুক্ল-পক্ষীয় চতুর্দ্দশী হইতে কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া পর্য্যন্ত পাঁচ দিবসব্যাপী যাত্রা ও মেলা হইত। প্রথম দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় স্বামীজীর ভক্তগণ স্বামীজীকে পাল্কীতে বা হস্তিপৃষ্ঠে উপবেশন করাইয়া, নানাবিধ বাদ্যাদি সহ মহাসমারোহের সহিত শোভাযাত্রায় নির্গত হইয়া সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক রাত্রি দশ ঘটিকায় পুনরায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। শত শত লোক এই শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়া "নমঃ শিবায়" শব্দে চতুর্দ্দিক মাতাইয়া তুলিত। যাত্রার দিবস সহরের নানা স্থানে ভক্তগণ এবং বেদান্তশাস্ত্রনিপুণ ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতেন।

সেদিন স্বামীজীর সদানন্দ মুখ যে কেহ বারেক মাত্র দর্শন করিয়াছে সে উহা কখনও ভুলিতে পারিবে না। উক্ত দিবস স্বামীজী ব্রহ্মানন্দে ভরপুর হইয়া থাকিতেন। তাঁহার শরীর হইতে এক আশ্চর্য্য এবং অনির্বচনীয় তেজ নির্গত হইত। সে মূর্ত্তি দেখিয়া পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়, ঘোর পাপীরও নব জীবন লাভ হয়। সে দিনের শোভা এবং আনন্দ বর্ণনা করা কবিরও অসাধ্য বলিয়া জ্ঞান হইত। যাত্রার সময় স্বামীজীর মুখ-নিঃসৃত মধুর ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যমাত্রই ভাবসাগরে নিমগ্ন হইত। যাত্রার কয়েক দিবস অন্নসত্র খোলা থাকিত। যাত্রিগণ জাতিনির্ব্বিশেষে সেই অন্নসত্রে গমন করিয়া আহার করিত। এতলোকের সমাগম হইত যে মঠের অতি বিস্তৃত প্রাঙ্গণে পা-রাখিবার স্থান থাকিত না। প্রতিদিন সায়ংকালে বেদান্তশ্রবণ সম্পন্ন হইলে পর প্রেমপূর্ণ ভজনের সহিত স্বামীজীর পূজা হইত। কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদে স্বামীজীর রথোৎসব হইত। সেই দিন দুই তিন লক্ষ লোক ও শত শত ভজনের দল সেই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইত। এই কার্ত্তিকী যাত্রা ভিন্ন মহা শিবরাত্রির দিনে মঠমধ্যে আর একটি অপেক্ষাকৃত সামান্য যাত্রা হইত।

খৃঃ ১৮৯৭ সাল হইতে দুঃসময় এবং প্লেগের জন্য কার্ত্তিকী যাত্রা বন্ধ হইয়াছে। সেই অবধি ভক্তগণ মহাশিবরাত্রির সময়ই প্রধান যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়াছেন এবং এই যাত্রায় সাত দিবসব্যাপী উৎসব হইয়া থাকে। এবং উক্ত সাত দিবসই অন্নসত্র খোলা থাকে। এই যাত্রার অপূর্ব্বতা এই যে, সর্ব্ব ধর্ম্মের, সর্ব্ব বর্ণের এবং সকল অধিকারী লোকই একযোগে উৎসবানন্দে যোগদান করে। পরস্পর বর্ণাশ্রমভেদ একেবারে ভুলিয়া যায়। সাত দিবস সকলে কাজ কর্ম্ম প্রায় বন্ধ করিয়া সারা দিন ভজন এবং শ্রবণ কার্য্যে নিমগ্ন হয়। শিব পঞ্চাক্ষরী (নমঃ শিবায়) মন্ত্রের ধ্বনিতে সর্ব্বত্র দুন্দুভিত হইতে থাকে। স্বামীজির বাক্‌চাতুর্য্যে সর্ব্বালোক আনন্দে মগ্ন হয়। সর্ব্বপ্রকার দোকানদারগণ মঠসন্নিকটে আপন আপন দোকান খুলিয়া বসে। নিভৃত প্রান্তর রাজধানীতে পরিণত হয়। বাস্তবিক, এই যাত্রা দেখিলে পৌরাণিক ব্রহ্মসত্র বলিয়া বোধ হয়।

যাত্রার সময় একটি উচ্চ মঞ্চ বাঁধিয়া, তদুপরি বহুমূল্য বস্ত্র, সাজসজ্জা, আলোকাদিতে ভূষিত একটি সিংহাসনে স্বামীজিকে বসাইয়া, তাঁহার অঙ্গে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি এবং শিরোদেশে সুবর্ণ মুকুট পরাইয়া তাঁহার আরতি করা হয়। এই আরতির সময় স্বামীজি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শিবযোগ সমাধিতে মগ্ন হইয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্যে যাত্রিমাত্রেরই হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত করেন।

হুবলীর একজন কারিকর স্বামীজির একটি দারুমূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিটী ধর্ম্মশালায় সুরক্ষিত আছে। যাত্রার সময় এই দারুমূর্ত্তি মঞ্চের নিম্নভাগে স্থাপিত হয়। এই মূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, রং ও ভাবাদি এরূপ সুন্দর যে অনেকের দূর হইতে ইহাকে সমাধিস্থ স্বামীজি বলিয়া ভ্রম হয়।

স্বামীজি যাত্রার সময় নানাদেশ হইতে নানা জাতীয় ও নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগের প্রদত্ত খাদ্য দ্রব্য অন্নাদি আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকেন। স্বামীজির অঙ্গে লিঙ্গ-তিলকাদি কোন প্রকার ধর্ম্ম ও জাতিগত চিহ্ন বর্ত্তমান না থাকায়, লোকে সহজে তাঁহার জাতি এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছুই নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় না।

শিবরাত্রির যাত্রা ভিন্ন শ্রাবণ মাসের শেষে সোমবার হইতে ছয় দিবসব্যাপী একটি উৎসব হয়। এই উৎসবেও অনেক লোকের জনতা হইয়া থাকে। পূর্ব্ববৎ ছয় দিবস সায়ং-প্রাতঃ বেদান্তশ্রবণ ও ভজন হয়, অন্নসত্র মুক্তদ্বার থাকে, নিত্য হরিসংকীর্ত্তন হয়, এবং রাত্রি আটটা-নয়টার সময় ভক্তগণ কর্ত্তৃক স্বামীজির আরতি হয়।

স্বামীজির মঠের কোন স্থায়ী আয় নাই। লিঙ্গায়ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক বড় বড় লোক তাঁহার ভক্ত-শ্রেণীভুক্ত। ইহাঁরা অর্থ, দ্রব্যাদি ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা সকল কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। শ্রমজীবিগণ বিনা পারিশ্রমিকে মঠের এবং যাত্রার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে স্বামীজি তাম্রকপর্দ্দক পর্য্যন্তও স্পর্শ করেন না।

শিবরাত্রির উৎসবের সময় প্রায় ২৫।৩০ হাজার এবং শ্রাবণ মাসের উৎসবের সময় ৪।৫ হাজার লোক বম্বে, মান্দ্রাজ, মহীশূর প্রভৃতি দূরদেশ হইতে স্বামীজিকে দর্শন করিতে আসে এবং হুবলী, ধারবাড়, গদগ, রাণীবেণুর প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী নগর ও গ্রাম হইতেও অনেক নরনারী আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বামীজির উৎসবে কখনও কলেরা প্রভৃতি কোন মহামারী উপস্থিত হয় নাই।

বাঙ্গালা দেশের শ্রীমৎরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ন্যায় স্বামীজীর সহজ ভাষণ অতি মধুর ও জ্ঞানপ্রদ। আমরা অতঃপর স্বামীজীর কয়েকটি সহজ ভাষণ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

১। একদা স্বামীজী মঠ হইতে গ্রামে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে একটি কৃষক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহারাজ ক্ষেত কখন বপন করিব?" স্বামীজী বলিলেন, "যখন মনে আনন্দ আসিবে তখনই করিবে।" সরল প্রকৃতির কৃষক স্বামীজীর কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় বলিল, "পরন্তু মহারাজ কোনদিন ক্ষেত বপন করিব? স্বামীজী তখন বলিলেন, "যাহারা জানে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও"। স্বামীজী প্রথমে ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, যখন মনে আনন্দ আসিবে তখনই শুভ মুহূর্ত্ত বলিয়া জানিবে। তুকারামও বলিয়াছেন, "তুকা ম্হণে হরিচ্যা দাসা। শুভকাল দাহী দিশা।"

২। একদা স্বামীজি এক ভক্তের বাটীতে আহার করিতে যান। আহারকালীন স্বামীজি ঝাল ও নিমকী বস্তু খাইতেছিলেন, মিষ্টান্নে হাত দেন নাই। ইহা দেখিয়া ভক্ত বলিলেন, "স্বামীজির তিঁকট মিঠ" (ঝাল ও নিমকি বস্তু ভাল লাগে, মিষ্টান্ন ভাল লাগে না)। স্বামীজি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন "ইহা রসপরিণাম।"

৩। একদিন কোন ভক্ত স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, অবেলায় মিষ্টান্নাদি সুখাদ্য ভাল কিম্বা সময়ে কেবলমাত্র অন্নই ভাল।" স্বামীজি বলিলেন "যখন যাহা মিলে তাহাই ভাল।"

৪। একদিন কোন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ সাত্ত্বিক আহার কাহাকে বলে? স্বামীজি বলিলেন "মিতাহারই সাত্ত্বিক আহার।"

৫। এক সময় স্বামীজি অতিশয় পীড়িত হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার কথা বলিতেও কষ্ট হইত। সেই অবস্থায় তাঁহাকে সর্ব্বদা আগন্তুকগণের সহিত কথা কহিতে দেখিয়া একজন ভক্ত তাঁহাকে বলিলেন "মহারাজ, দুই দিবস কথা বন্ধ করিলে ভাল হয় না?" স্বামীজি বলিলেন "কথা বলা বন্ধ করিলেই যদি দুঃখের অবসান হয় এইরূপ বুঝ, তবে মনুষ্যেতর জীবগণও তো মূকভাবে অবস্থান করে, তবু কেন তাহাদের অসুখ হয় এবং সেই অসুখ হইতে মৃত্যু হয়? যদি কেবল চুপ করিয়া থাকিলেই জরা-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় তবে অজগর প্রভৃতি সর্পগণ সারাজীবন স্তব্ধভাবে থাকিয়াও কেন জরা-মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পায় না।"

৬। একদা স্বামীজি বলিলেন, "রাত্রি জাগরণ করিলে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। শরীর রক্ষার জন্য একবার আহারই যথেষ্ট। যাহার শরীর বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক সে-ই দুইবার আহার করিবে। এইজন্য সাধুজনের পক্ষে নিশাভোজন পরিত্যাজ্য।"

৭। একদিবস স্বামীজি কোন ভক্তের গৃহে ভোজন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি স্বামীজির প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক উক্ত ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনি কে?" স্বামীজি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "আপনি কে বুঝিতে পারিলে অন্য ব্যক্তি কে ইহা বুঝা যায়।"

৮। একদিন স্বামীজি মঠে আসিতেছিলেন। ঐ সময় সূর্য্যের উত্তাপ অতি প্রখর ছিল। একজন ভক্ত ছাতা খুলিয়া স্বামীজির উপর ধরিলেন। স্বামীজি বলিলেন, "ভিতর শীতল থাকিলে বাহিরের উত্তাপকে কে গ্রাহ্য করে?"

৯। একদিন জনৈক ভক্ত স্ত্রীর সহিত স্বামীজির নিকট আসেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "মহারাজ ইহাকে কিছু উপদেশ দিন"। স্বামীজি বলিলেন, "উপদেশ, অনুগ্রহ, এ সব বিষয় একজনের—অপরের জন্য বলায় ফল নাই। জন্ম-মৃত্যুর ভয় যাহার হয়, নিবৃত্তির ইচ্ছা তাহারই হওয়া উচিত এবং সেই নিবৃত্তিসম্বন্ধীয় প্রশ্ন তাহারই করা আবশ্যক।"

১০। একদা কোন ভক্ত স্বামীজীকে প্রশ্ন করিল, "সাধুগণ বলেন 'ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা'। কিন্তু অহঙ্কার ইহার প্রতিবন্ধক"। স্বামীজি বলিলেন, "জগৎ মিথ্যা কি-না, ভেবে অহঙ্কারকেও তন্মধ্যে নিক্ষেপ কর।" এই কথা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গল্পটি বলিলেন—

এক গ্রামে এক ধনী ব্যক্তি পীড়িত হয়। অনেক বৈদ্য আসিয়া তাহার রোগ নির্ণয় বা আরোগ্য করিতে পারিল না। অতঃপর সে ব্যক্তি ঘোষণা করিয়া দিল যে, যে ব্যক্তি তাহাকে আরোগ্য করিবে সে বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইবে। এই কথা শুনিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামের এক ধূর্ত্ত ব্যক্তি আসিয়া জানাইল যে সে চিকিৎসা করিতে প্রস্তুত। পরে সে সেই ধনীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, রোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা। তখন সে পীড়িত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার কি অসুখ"? সে বলিল "তাহাই ত আমি বুঝিতে পারি না।" তখন সেই ধূর্ত্ত কবিরাজ বলিল, "আমি রোগ ধরিয়াছি, আমি ৫টি ঔষধ ব্যবস্থা করিতেছি। এই ঔষধ সেবন করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে"। পীড়িত ব্যক্তি তাহার দেওয়ানকে ঔষধ লিখিয়া লইতে বলিল। কবিরাজ বলিল— "লিখ, প্রথম—৪ তোলা তাঁতার ঘড়-ঘড়।" দেওয়ানজী ঔষধের নাম শুনিয়াই অবাক্। মনে মনে বলিল—একি ঔষধ না বিদ্রূপ। যাহা হউক সে সেই মতই লিখিল। তখন বৈদ্য বলিল "দ্বিতীয়—৪ তোলা আকাশের গড়-গড়।" ইহাও লিখিত হইল। বৈদ্য বলিল, তৃতীয়—৪ তোলা দ্বারের

ফড়-ফড়; চতুর্থ—রৌদ্রের ঝল-ঝল।" ইহা লিখিত হইলে বৈদ্য যেন পঞ্চম ঔষধের নাম স্মরণ হইতেছে না এইভাবে মাথা চুলকাইতে লাগিল। দেওয়ানজী বলিল, কবিরাজ মহাশয় যে চারিটি ঔষধ পূর্ব্বে বলিয়াছেন সে সবটাই ত মিথ্যা; এক্ষণে পঞ্চম ঔষধটি কি বলুন। চতুর কবিরাজ তখনই বলিলেন, "যদি পূর্ব্বোক্ত চারিটিই মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়া থাক তবে তাহারই (ঐ মিথ্যারই) ৪ তোলা উপরি-উক্ত ৪টী ঔষধের সহিত মিলাইয়া দাও।" এই বলিয়াই কবিরাজ তথা হইতে প্রস্থান করিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জগৎ যদি মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয় তবে অহঙ্কারকেও মিথ্যা বলিয়া জানিয়া পরিত্যাগ করিবে।

১১। একদা শ্রীমন্ত অপ্পা সাহেব জমখণ্ডিকার পুনরায় স্বামীজিকে দর্শন করিতে আসেন। তাঁহার থাকিবার জন্য তাঁবু প্রভৃতি খাটান ও অন্যান্য কাজের জন্য ত্রিশ-চল্লিশ জন পরিচারক তিন চারি দিন পরিশ্রম করিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করে। শ্রীমন্ত দুই এক দিবস থাকিয়াই চলিয়া গেলেন। তৎপরে ঐ সকল লোক তাঁবু উঠাইয়া সমস্ত দ্রব্যাদি লইবার জন্য দুই তিন দিন পূর্ব্বের মত পরিশ্রম করে। ইহা দেখিয়া জনৈক ভক্ত বলিলেন, "মহারাজ দেখুন একজন লোকের জন্য ত্রিশ-চল্লিশ জন লোককে চার-পাঁচ দিন কত পরিশ্রম করিতে হইল" ইহা শুনিয়া স্বামীজি বলিলেন, "উহাতে (লৌকিক ঐশ্বর্য্যে) যদি সুখ থাকিত তাহা হইলে তিনি এখানে আসিবেন কেন?"

১২। একদা একজন ভক্ত আত্মহত্যা করে। এই উপলক্ষে জনৈক ভক্ত স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোন কোন সন্ন্যাসী "জলসমাধি" লইয়া দেহ বিসর্জ্জন করেন, তাঁহাদের কি আত্মহত্যার পাপ হয় না?" স্বামীজি বলিলেন, "অন্তঃকরণ মধ্যে এক অনিবার্য্য শক্তি বর্ত্তমান আছে। এই শক্তি বলপূর্ব্বক মনুষ্যকে ইচ্ছাবিরুদ্ধ পথে লইয়া যায়। উদাহরণ—মন্দ কথা বলিব না মনে করিলেও ইহা মন্দ কথা বলায়, পাপ বা হিংসাদি করিব না মনে করিলেও সেই শক্তি উক্ত কর্ম্ম করিতে বাধ্য করে। এই শক্তি জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী সকলেরই শরীরে সমভাবে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি সংকল্পরহিত অর্থাৎ নিঃসংকল্প থাকা হেতু তাঁহার দ্বারা কোন কর্ম্ম সংঘটিত হইলে—ইহা যে কোন রূপই হউক না কেন—তাহার পক্ষে প্রতিবন্ধক হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সংকল্পিত কর্ম্ম দোষের কারণ হয় কিন্তু নিঃসংকল্প কর্ম্মে দোষ হইতে পারে না।

১৩। একদিন স্বামীজি ভক্তগণে পরিবৃত হইয়া শাস্ত্রালোচনা করিতেছিলেন। সেই সময় গোয়াদেশস্থ কয়েকটি বারনারী বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া আসিয়া মহারাজকে দর্শন করিয়া চলিয়া যায়। এই সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তৎপরে স্বামীজি বলিলেন, "স্ত্রী এবং ধন (কামিনী-কাঞ্চন) মোহকারী। ইহা যে কোন ব্যক্তির ক্ষণিক মোহ উৎপাদন করিতে পারে। অজ্ঞান লোকে এই মোহের বশীভূত হইয়া দুঃখ পায়; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাকে (মোহকে) সম্যক্ জানিয়া পরিত্যাগ করেন।"

১৪। একদিবস জনৈক ভক্ত স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিল "মহারাজ, আপনার ভাই ভগনী, আত্মীয়-স্বজন কেহ আছে কি না?" স্বামীজি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "এরূপ কখনও জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ এইরূপ প্রশ্নে যে কোন লোকেরই হউক না কেন বিস্মৃত বিষয় মনে আসিয়া উদ্বেগ উপস্থিত করে। শরীরসম্বন্ধীয় ব্যক্তির নাম স্মরণে আসিলে সন্তাপদায়ক হয়। ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এইজন্য মনুষ্য লৌকিকগত বিষয়ের স্মরণ করিবে না।

১৫। একদিন কোন ভক্ত স্বামীজির জন্য ইক্ষুরস আনে। স্বামীজির স্বভাব এই যে, যে-কেহ যে-কোন বস্তুই আনুক না কেন, তিনি উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া দেন। দাতার মনে কষ্ট না হয় এইজন্য তিনি স্বয়ং ঐ আনীত দ্রব্য হইতে কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করেন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তিনি ইক্ষুরস বণ্টন করিয়া একটি উচ্ছিষ্ট নারিকেলপাত্রে কিঞ্চিৎ রস গ্রহণ করিয়া পান করিলেন। একজন ভক্ত তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "মহারাজ উহা উচ্ছিষ্ট পাত্র, খাইবেন না।" স্বামীজি বলিলেন "তুমি উচ্ছিষ্টকে ঐরূপ বলিবে।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বস্তু ভাল কিম্বা মন্দ, উচ্ছিষ্ট কিম্বা শুদ্ধ ইহা মনের কল্পনা মাত্র। ঈশ্বর-নির্ম্মিত বস্তু যেমন তেমনই থাকে। শুদ্ধ বা অপবিত্র, ভাল বা মন্দ হয় না।

১৬। একদিবস মঠে লোকজন খাইবে। ভক্তগণ ক্ষেওড়ার শিঙ্গা (এক জাতীয় সিম) বাছিতেছিল। স্বামীজিও তাহাদের সহিত শিঙ্গা বাছিতেছিলেন। একজন একটি শিঙ্গা বাছিয়া রাখিলে অপর একজন ঐ শিঙ্গায় একটি কীট দেখিতে পাইয়া বলিল, "ঐ শিঙ্গায় একটি ক্রীট রহিয়াছে।" স্বামীজি অমনি বলিলেন "আমরাও কীট মাত্র।"

১৭। একদিন একজন ভক্ত স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার কি কোন প্রতিবন্ধ আছে?" স্বামীজি বলিলেন "যখন কোন প্রতিবন্ধ না থাকে তখনই লোকে প্রতিবন্ধ আছে এইরূপ

কল্পনা করে, ইহাই একটি প্রতিবন্ধ। যখন সত্য সত্য প্রতিবন্ধ থাকে তখন কাহারও প্রতিবন্ধ আছে বলিয়া জ্ঞান হয় না।"

১৮। একজন ভক্তের বাটীতে কোন মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান হেতু সে স্বামীজিকে পত্র লিখিয়া জানাইল যে তাঁহাকে উক্ত কার্য্য উপলক্ষে আসিতেই হইবে। স্বামীজি তদুত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন "যখন তোমার চিত্তবৃত্তি শান্ত দেখিবে তখনই আমি আসিয়াছি এইরূপ জানিবে।"

১৯। একদা একজন ভক্ত স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, মনোমধ্যে লয়সাক্ষিত্ব একবার অনুভব হইলে লোক পুনরায় বিষয়ে আসক্ত হয় কি না?" স্বামীজি বলিলেন, "মনের ব্যাপ্তি যেখানে যেখানে হয়,অর্থাৎ মন যে যে বিষয়ে গমন করে, সেই সেই ব্যাপ্ত বিষয়ে স্বাক্ষীস্বরূপের অনুসন্ধান না রাখা হেতু মনুষ্যের বিক্ষেপ উপস্থিত হয়। এবং 'আত্মস্বরূপকে ছাড়িয়া আমার মন বিষয়ে আসক্ত হইতেছে' এইরূপ তাহার বোধ হয়, এবং সে সেই বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে, বিচার করিতে পারে না। এই বিক্ষেপের নিবৃত্তি করিবার জন্য সাধকগণ আত্মস্বরূপের বিচার এবং সাক্ষীস্বরূপের স্মরণ অখণ্ড রাখেন।"

শিশু-শিক্ষা।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ স্যান্যাল)

আমাদের দেশ জুড়ে এই যে অভাবের তাড়না ও অকাল-মরণের ব্যথা জেগে উঠেছে, সেইটেই আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সব চাইতে বড় কথা নয়; ভাববার কথা আমাদের জীবনপ্রবাহের উৎসমুখ আবর্জ্জনার চাপে রুদ্ধপ্রায়। তাই সংসারের যত কিছু অকল্যাণ আমাদের কপালেই জমে উঠল। চোখের জলের কারণ ঠিক করতে আমরা অন্যকেই দোষী বানিয়েছি; একবার নিজেদের ভুলের কথা ভাবলুম না।

জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ উন্নতি বুড়োদের উপর নির্ভর করে না, সে চেয়ে থাকে শিশুদের সদাচঞ্চল সরল হৃদয়ের পানে। আজ আমরা এই বড় কথাকে ভুল করে জাতীয় জীবনে সর্ব্বনাশ ডেকে এনেছি। চঞ্চলতায় চলা-ধর্ম্মই উন্নতিপথের প্রধান পাথেয়। চলার আবেগকে শাসনের চাপে দমিয়ে দিয়ে আমরা কি হয়েছি ভাববার কথা।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ শিশুর বোঝবার ক্ষমতা হবার সাথে সাথেই নানারকম ভয় দেখিয়ে তার ছুটোছুটী করে বেড়াবার আকাঙ্ক্ষা সঙ্কুচিত করে তোলা হয়। বাঘের ভয়, জুজুর ভয়, ভূতের ভয় তার নির্ম্মল হৃদয়ে এমনি একখানা কালো যবনিকা টেনে দিয়ে যায় যা দূর করে ফেলবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তার আর থাকে না। গভীর রাত্রে নির্জ্জন পথের মাঝে বিনা কারণে একটা অজানা ভয়ে তার বুকখানি কেঁপে উঠে—সে পাগল হয়ে যায়। আমাদের দেশে কাল্পনিক ভয়ে মারা যাবার ইতিহাস ত খুব বিরল নয়। যখন ভয় দেখিয়ে তাকে শান্ত করবার ব্যবস্থা আমরা করেছিলুম তখন আমাদের এই কথাটা মনে হয় নি, সেই শিশুর এবং তারই সাথে জাতীয় উন্নতির পথে কত বিরাট একটা বাধা গড়ে তুলছি! ভয় দেখিয়ে শাসন করবার মত পাপ আর নেই। সে শুধু যাকে ভয় দেখান হয় তাকেই অক্ষম করে তোলে না, যে ভয় দেখায় তাকেও অনেকখানি নীচে নামিয়ে দেয়। মনুষ্যত্ব ছোট হয়ে যায়, আত্মনির্ভর চলে যায়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বিপদের মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস আর হয় না। নিজের মন দিয়ে সে স্বতন্ত্রভাবে ভাবতে শেখে না; অন্যের ইচ্ছার অনুরূপে আপনাকে গড়ে তুলতে পারলেই সে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। যার নিজের উপর বিশ্বাস নেই তার যে কেমন করে ভগবানের উপর নির্ভর আসতে পারে আমি জানি নে। এমনি ভাবেই আমরা জাতীয় ভবিষ্যৎ আশাকে ভিতরে বাইরে কাঙ্গাল করে তুলচি। রাজা হবার আকাঙ্ক্ষা তার আসবে কোথা থেকে?

এ কথা বোধ হয় আমরা সকলেই জানি, শিক্ষা মানুষের ভিতরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলে, তার সকল কালিমা উজ্জ্বল করে দিয়ে তাকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে। তাই মানুষ শিক্ষার্থীকে এত শ্রদ্ধা ভক্তি করে থাকে। আমাদের আজকালকার শিক্ষাপীঠকে জেলখানা ছাড়া আর কোন নামে অভিহিত করা যায় কিনা আমার জানা নেই। তাই মানুষ না হয়ে তার অপভ্রংশটাই আমাদের কপালে এসে জুটল। ছোট ছেলে মার কোল ছেড়ে, খেলার সাথীর সঙ্গ ছেড়ে, ধূলোখেলা ফেলে রেখে পাঠশালায় গেল; কিন্তু সেখানে তার আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা মুছিয়ে দেবার কোন বন্দোবস্ত নেই। তার অশান্ত মন, পণ্ডিতমহাশয়ের সমস্ত তাড়না অগ্রাহ্য করে, বই খাতার বেড়া ডিঙ্গিয়ে সেই কোন আমবাগানের ধারে ধারে, পেয়ারা গাছের ডালে ডালে, আর নদীর তীরে তীরে তার আপন সঙ্গীদের সাথে ঘুরে বেড়াবার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। টেবিল, চেয়ার, কাল বোর্ড ও পণ্ডিতমহাশয়ের লম্বা বেত তাই তার মনে পড়াশোনার বিরুদ্ধে একটা গভীর তীব্র

প্রতিবাদ আনিয়ে তোলে। শব্দ তার কাছে শুষ্ক বলে মনে হয়; শিক্ষার আনন্দটাও তার কাছে চিরদিনের মত গোপনই থেকে যায়। বেতের তাড়নায় তাদের বেড়ে ওঠবার ক্ষমতা পঙ্গু হয়ে যায়। কোন আদর যত্ন ভালবাসা সেখানে নেই—সমস্ত নীরস কঠোর। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ ঠিক যেন পুলিশ-কয়েদীর সম্পর্কের মত—শাসনের ভয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারলেই সমস্ত কর্ত্তব্যের অবসান। এমনি করে শাসনের চাপে তাদের হৃদয়-কুঁড়ি ফুট্‌তে পারে না—সবই চিরদিনের মত অন্ধকারে রাখবার ব্যবস্থা। যাতে তারা প্রাণে আনন্দ পায়, যে পথে তাদের প্রাণ খোলে, সে পথে তারা এক পাও এগোতে পারে না। সেই জন্য অচিরেই তারা এমন প্রাণহীন উৎসাহ-হীন হয়ে পড়ে যে কোন রকম আনন্দে যোগ দেবার ইচ্ছাটা পর্য্যন্ত তাদের মনে হয় না; কারণ থাকলেও প্রাণ খুলে হাস্‌তে পারে না। বিদ্যালয়ে এসে খেলবার কোন কথা নেই। এগারটা থেকে তিনটে, চারটে অবধি কেবলই বই মুখস্থের পালা। তার উপর আমাদের শিক্ষার মনুসংহিতায় ভাল-বেসে, চুমো খেয়ে, কোলে করে পড়াবার নিয়ম নাই। তাই জ্ঞানের সমস্ত কথাই তাহাদের কাছে নীরস বলে মনে হয়। প্রাণ দিয়ে তাকে তারা গ্রহণ করতে পারে না বলেই শিক্ষার প্রকৃত গুণ-বিকাশের পথে তাদের এগিয়ে না দিয়ে অবিদ্যার কালো যবনিকাকে আরও নিবিড় ভাবে টেনে দেয়। এমনি করেই বিদ্যা দেবার নামে আমাদের দেশে শিশু-বলি চল্‌চে। ঘুমের ঘোর আমাদের কাটবে কবে?

আমাদের দেশে ছেলেদের নিতান্ত শিশু-কাল থেকেই প্রবীণের মত হবার জন্য চেষ্টা করতে হয়। বালহৃদয়ের চপলতার প্রকাশ বাইরের চোখে খারাপ দেখায়। বড়রা পাগল হয়ে যান, ছেলে লক্ষ্মীছাড়া দুষ্ট হয়ে গেল। তার ইহকাল-পরকালের ভাবনায় সকলের মন ভরে ওঠে। নানা রকম শাসন, চপেটাঘাত, গালিবর্ষণের অভিনয় তখন সেই ক্ষুদ্র বালকের উপর চল্‌তে থাকে। হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া গাল শুনতে শুনতে তার মনে এমনি একটা নিরাশার ভাব এসে হাজির হয় যা তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মলিন করে দেয়। সে ভাবতেও পারে না তার দ্বারা জগতের কোন মঙ্গল প্রয়োজন সাধিত হতে পারে; এবং সেও যে বড় হয়ে জগতের বুকে একটা বিরাট কীর্ত্তি অঙ্কিত করে যেতে পারে একথাটা তার মনে পর্য্যন্ত উদয় হয় না। সকলের ছি-ছি তার জীবনটাকে সত্যই একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতায় ভরে তোলে। এমনি করে ভিতরে বাইরে অবি-রাম অত্যাচার অবিচারের পেষণে তাদের বিকাশোন্মুখ হৃদয়কে আমরা নষ্ট করে দিচ্চি। এই কথাটা আমি বুঝতে পারি নে—শিশুর স্বাভা-বিক ধর্ম্মকে চেপে রাখবার ব্যবস্থার মধ্যে এমন কি মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত থাকতে পারে যার সন্ধানের জন্য আমাদের এই অস্বাভাবিক চেষ্টা। স্থাবর হওয়া-টাই যদি জগতের সব চাইতে বড় কথা হত তাহলে বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে নূতনের চঞ্চলতার উৎসব প্রতিদিন চলত না; লীলাও কাঙ্গাল হয়ে উঠত। জোর করে এই মুখোস পরাবার অভিনয় কেন?

এই কথাটা কেউ মনে করবেন না, শিশুকে বেড়ে ওঠবার অবাধ সুযোগ দেবার মানেই তার উপর দৃষ্টি রাখবার অপ্রয়োজনীয়তা। আমি তা মনে করি নে। যারা বড়, তাদের কাজ হচ্ছে ভালবেসে, চুমু খেয়ে, বুকে চেপে ধরে, নানা উপ-দেশের মধ্য দিয়ে তাদের প্রাণে অমৃতের আস্বাদ জানিয়ে দেওয়া। তাদের শেখাতে হবে "আমাতেও ভগবান"। কিন্তু এমনই আমাদের ভাঙ্গা কপাল, আমাদের "পেনাল কোডের" ব্যবস্থা ঠিক এর উল্টো।

এমনই যে দেশের অবস্থা, এমনই দুর্ভাগ্য যাদের, তাদের যে কোন্‌কালে ভাল হবে আমি জানি নে। উন্নতি তাদের অনেক দূরে। জাতির বেড়ে ওঠবার পথ কাঁটা দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে উন্নতি-কামনার বাতুলতা আজ আমাদের দেশেই সম্ভবপর হয়েচে। নবজাগরণের দিনে এই কথাটা আমা-দের মনে রাখা উচিত—শিশুদেরও একটা প্রাণ আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে এবং বেড়ে ওঠবার প্রণালী আছে,—সে মাটীর ডেলা নয়। তার ভিতরেও শ্রদ্ধা করবার অনেক জিনিষ আছে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রের ভাষায় বলতে হবে—

"আমি তারে শাসন করি
বুকেতে বেঁধে—
আমি তারে কাঁদাই যে গো
আপনি কেঁদে।"—(শিশু)

প্রার্থনা করি যেন আমাদের চৈতন্য হয়।
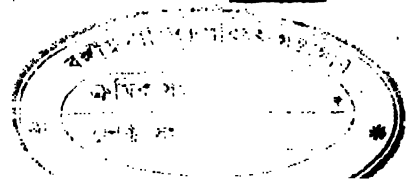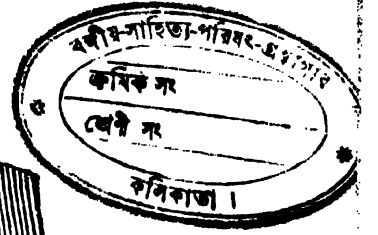
বিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

আশ্বিন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯২

৯৩৮ সংখ্যা — ১৮৪৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

প্রার্থনা।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

হে সুন্দর, হৃদয়েশ, আনন্দ-নির্ঝর,
তোমার আনন্দ-লোকে দাও মোরে স্থান;
জন্ম-জন্মান্তর ধরি' তৃষিত অন্তর
মাগিতেছে অনুক্ষণ শুধু সেই দান!

আমারে শিখায়ে দাও সে মহাসঙ্গীত
অমৃত পরশ-ভরা রাঙ্গা চরণের;
গাহিব নিয়ত হয়ে আপনা-বিস্মৃত
ক্ষুদ্র বিহঙ্গটী যথা তোমারি কুঞ্জের!

ভগন হৃদয়ে মোর দাও হেন বল
জীবন সার্থক হোক্ তোমারি সেবায়;
সাধ আশা ভালবাসা নয়নের জল
তুমি নিও অর্ঘ্য-রূপে তোমারি পূজায়!

সুনির্ম্মল স্থিরজ্যোতিঃ ধ্রুবতারা সম
সদা মোর লক্ষ্য-পথে রহ প্রিয়তম!

দেবতা ও প্রতিমাদির পূজাঅর্চ্চনা।

(শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকার প্রণীত "ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও ব্যাখ্যান" নামক মরাঠী গ্রন্থ হইতে শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥

ভগবদ্গীতা, ১৭-৪।

অর্থ:—"যাহারা সত্ত্বগুণসম্পন্ন তাহারা দেবতাদিগকে ভজনা করে, যাহারা রজোগুণসম্পন্ন তাহারা যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে ভজনা করে এবং যাহারা তমোগুণপ্রধান তাহারা ভূত ও প্রেতদিগকে ভজনা করে।"

সমস্ত জগতের ধর্ম্ম-ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্যের অন্তঃকরণের উপর যখন তমোগুণের প্রাবল্য থাকে তখন তাহার দেবতাও তমোগুণের হইয়া থাকে। সেই দেবতা ক্রূর ও রাগী হয় এবং তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য, তাহার নিকট মহিষ-বলি এবং কখন কখন নর-বলিও দিতে হয়। আমাদের দেশে 'বহিরোবা', 'ম্হসোবা' 'চামুণ্ডা' প্রভৃতি দেবতা এই প্রকারের। সেইরূপ আবার আমাদের মধ্যে বেতালাদি ভূতগণকেও ভক্তি করিতে দেখা যায়। অতএব, লোকের অন্তঃকরণের যেরূপ অবস্থা এই দেবতাও সেই প্রকারের হইয়াছে। এই সকল দেবতার ভজনা-যোগে মানব-মনের মূলগত যে তামসী বৃত্তি তাহাই দৃঢ় হইবার কথা; উন্নত বৃত্তি প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে—যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ—অর্থাৎ "যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে সেই প্রকারের হইয়া থাকে।" তোমার দেবতা যদি ক্রূর ও রক্তের অভিলাষী হয়, তাহা হইলে তুমিও ক্রূর হইবে, রক্তপিপাসু হইবে। অতএব অন্যকে ও আপনাকে যদি উন্নত

অবস্থায় উপনীত করিতে চাও, তাহা হইলে এই প্রকার দেবতার ভজন-পূজন বর্জ্জন করিতে হইবে। অর্থাৎ 'ম্সোবা', 'বহিরোবা' প্রভৃতি দেবতার উপর বিশ্বাস নষ্ট করিতে হইবে।

ভগবদ্‌গীতার উপরি-উক্ত শ্লোকে আর এক তৃতীয় শ্রেণীর কথা বলা হইয়াছে—সেই শ্রেণী যাঁহারা দেবতাদিগকে ভজনা করেন। এক্ষণে, এই উপাসকগণ ও তাঁহাদের দেবতা সাত্ত্বিক হইলেও, দেবশব্দের দ্বারা উপনিষদ্ ও ভগবদ্‌গীতায় যে পরমাত্মা বর্ণিত হইয়াছে তাঁহার স্বরূপ আমরা ঐ সকল গ্রন্থের বাক্য গ্রহণ করিয়া, "ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান ও নিবন্ধে" বিবৃত করিয়াছি। তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। দেবতা শব্দে—অত্যন্ত অল্প বৈভবসম্পন্ন, অল্প সামর্থ্যবিশিষ্ট, সুখ-দুঃখের ভোক্তা, যাঁহাদের আচরণে সর্ব্বথা বিশুদ্ধ মঙ্গল ভাব নাই এই প্রকারের—মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথচ অনেকটা মনুষ্যের ন্যায় জীবাত্মা। প্রাচীন স্কন্দ, বিশাখ এবং হালের গণপতি, মারুতি প্রভৃতি দেবতা, কিংবা রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার-পুরুষ এই প্রকার দেবতা জানিবে। এই প্রকার দেবতাদিগের ভজনাতেও মনুষ্য উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রকৃত উন্নত অবস্থা,—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, বিশুদ্ধ, আনন্দময়, সত্যস্বরূপ—এই প্রকারে বর্ণিত যে পরমাত্মা তাঁহারই আরাধনা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই ভগবদ্‌গীতাতেও কথিত হইয়াছে:—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।

অর্থ:—"দেবোপাসকেরা দেবতাদিগের প্রতি, পিতৃ উপাসকেরা পিতৃগণের প্রতি ভূত-উপাসকেরা ভূতগণের প্রতি গমন করে এবং আমার উপাসক আমার নিকট আসে"। এক্ষণে "অমুকের প্রতি গমন করা" এই বাক্যের তাৎপর্য্য—তাঁহাদের সাদৃশ্য লাভ করা—এইরূপ বুঝিতে হইবে। তাই, ঐ উপাসকেরা অনুক্রমে, দেবগণের, পিতৃগণের, ভূতগণের এবং আমার সাদৃশ্য লাভ করে—এইরূপ অর্থ। ভগবদ্‌গীতার অবলম্বিত সাধারণ পন্থা হইতে, 'আমি' শব্দের অর্থ—সর্ব্বশক্তিমান, এক অদ্বিতীয় যে পরমাত্মা, বিশ্বের অধিপতি, বিশ্বপালক তিনি—এইরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব, পরমমঙ্গল, আনন্দময়, এই রকমের সাদৃশ্য অর্থাৎ অত্যন্ত উন্নত দশা যদি আমাদের লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পরমাত্মারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য, ইতর দেবতাদিগের উপাসনা করা ঠিক্ নহে। যাহারা ইতর দেবতাদিগের উপাসনা করে তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ কথিত হইয়াছে:—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥

"সমস্ত যাহা কিছু পূজা, তাহা যে দেবতারই উদ্দেশে হউক না কেন, তাহা আমাকেই প্রাপ্ত হয়, আমি তাহার ভোক্তা ও প্রভু; কিন্তু অন্য দেবতার উদ্দেশে যাহারা ভজনা করে তাহারা আমার তত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃত স্বরূপ জানে না, তাই ভ্রষ্ট হয়"। তাই পরমেশ্বর পরমাত্মা যিনি তাঁহাকেই একান্তিক-ধর্ম্ম-অনুসারী ব্যক্তি—আমি পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে যাহা বিবৃত করিয়াছি—মনের সহিত আরাধনা করিবেক। একান্তিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সকল মনুষ্যই তাঁহাকেই পূজা করিবে।

এই কথাটিরও বিচার করা আবশ্যক যে, এই যে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর তাঁহা হইতে ভিন্ন অন্য যে সকল দেবতা তাহারা কাল্পনিক। মনুষ্য যখন অসংস্কৃত অথবা অসভ্য অবস্থায় থাকে তখনই তাহার এই প্রকার অসংখ্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। যেমন-যেমন জনসমাজ সংস্কৃত অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়, তদনুসারেই এই বহু দেবতাবিষয়িনী শ্রদ্ধা এবং দেবতাদিগের নিষ্ঠুরতাদি দোষসম্বন্ধীয় ধারণাও বিনষ্ট হয়। বেদের মধ্যে বহু দেবতা সম্বন্ধে যে সকল লেখা আছে তাহা আর্য্যদিগের প্রাচীন দশার নিদর্শক। যেমন-যেমন আর্য্যগণের অবস্থা উন্নত হইল, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে এই বিচার পরিবর্ত্তিত হইয়া শেষে 'দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ', এইরূপ উক্তি তাঁহাদের মুখ হইতে বাহির হইল। আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে অনেক বাক্য যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা ঋষিগণেরই মুখনিঃসৃত। অতএব, একমাত্র পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী, সত্যস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, মঙ্গলস্বভাব—

এই সিদ্ধান্তই ঠিক্ এবং তদ্ভিন্নস্বভাববিশিষ্ট যে সকল বহু দেবতা তাহারা ভ্রান্তিমূলক।

এক্ষণে, পাষাণ কিংবা ধাতুর প্রতিমা গড়িয়া তাহার যে পূজা প্রচলিত তাহার বিচার করা যাক্। সেই প্রতিমা দেবতাদিগের প্রতিমা হইলেও সেই দেবতাদিগের পূজার মধ্যে যে দোষ সেই দোষ প্রতিমাপূজার মধ্যেও আছে। অতএব ঐ বিষয়ে পৃথক্ বিচার করিব না। কিন্তু সত্য যে এক পরমাত্মা তাঁহার প্রতিমা গড়িয়া তাঁহার পূজা করাতেও মস্ত দোষ আছে। প্রথমতঃ মনুষ্য কিংবা পশু কিংবা বৃক্ষ—ইহাদের আকার সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরে আরোপ করিলে তাঁহাকে অত্যন্ত লঘু করা হয়। সেই মূর্ত্তির পূজা করায় অনাদ্যনন্ত সর্ব্বব্যাপী মঙ্গলস্বরূপ আনন্দময় পরমেশ্বরের পূজা সর্ব্বথা হয় না। মূর্ত্তির স্বরূপ যেরূপ সংকুচিত, সেইরূপ বৃত্তিগুলিরও প্রকার সংকুচিত হয়। আমাদের বৃত্তিগুলিকে যদি উন্নতভাবাপন্ন করিতে হয় তাহা হইলে, অনন্ত অবর্ণনীয় অতর্ক্য যাঁহার মহিমা, যিনি সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সমস্ত মনুষ্যের অন্তঃকরণে যিনি বাস করিতেছেন, যাঁহার আনন্দময় স্বরূপ সূর্য্যচন্দ্রতারকা বিশিষ্ট আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীস্থিত সমুদ্র, ভূমি, পর্ব্বত, নদী ও অসংখ্য প্রাণী মিলিয়া প্রকাশ করিতেছে, যিনি আমাদের সকলের পরম সখা, যিনি সকলের অন্তঃকরণে থাকিয়া ভাল-মন্দের জ্ঞান প্রদান করিতেছেন, তাঁহার এই স্বরূপের চিন্তা অন্তঃকরণে পুনঃপুনঃ করিলে তবেই আপনাদিগকে উন্নত ভাবাপন্ন করিতে পারা যায়। কেবল মনুষ্যের মত, কিংবা অন্য কোন প্রাণীর মত পাষাণ কিংবা ধাতুর মূর্ত্তিকে দেখিলে আমাদের মনোবৃত্তি উন্নতভাব প্রাপ্ত হইবে না। ভগবদ্গীতায়, যাহারা দেবের ভজনা করে তাহারা উন্নত দশা প্রাপ্ত হয় কিংবা উন্নত অবস্থা প্রাপ্তির জন্য দেবকে ভজনা কর—এইরূপ যখন-যখন বলা হইয়াছে, তখন পরমাত্মার যে বর্ণনা সেই বর্ণনাই করা হইয়াছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে এই প্রকার বাক্য সকল প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—"আমি সকলের প্রভু এবং আমা হইতেই সমস্ত প্রবৃত্ত হয়—এইরূপ যে ধীরেরা মনে জানেন তাঁহারা আমাকে ভজনা করেন। ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বাস করিয়া সকলকে ঘুরাইতেছেন, তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও তাঁহা হইতেই তুমি অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হইবে"। এই প্রকার বাক্যের মধ্যে যে দেবের ভজনার কথা আছে, কিংবা শরণাপন্ন হইবার কথা আছে, সেই দেব এই প্রকারের হইবে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কোন প্রতিমাকে কিংবা ক্ষুদ্র দেবতাকে ভজনা কর কিংবা তাহাদের শরণাপন্ন হও, এ কথা বলা হয় নাই। আসল কথা, মনুষ্যের উন্নতবৃত্তি হওয়া যদি অভীষ্ট হয় তবে এই প্রকার দেবেরই ধ্যান ভজনা কর,—এই কথা সকলকে বলায় ইষ্ট আছে। চক্ষের সম্মুখে প্রতিমা রাখিয়া ভজন-পূজন করা হইতে বহু অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়। প্রতিমা পুরুষের কিংবা স্ত্রীর হইলে, সত্যদেবের মহিমা ও উচ্চভাব বিস্মৃত হইয়া সেই দেবতার উপাসক সেই দেবতার উপর মনুষ্যের ধর্ম্ম আরোপ করিয়া থাকে। তারপর, সেই দেবতা পুরুষ হইলে তাহাকে 'বর' ও স্ত্রীলোক হইলে 'কনে' বলিয়া কল্পনা করা হয়; এবং উপাসক তামাকখোর হইলে, পানসুপারী ও তামাক, এমন কি পিক্‌দানী পর্য্যন্ত দেবতার ঘরে প্রস্তুত রাখা হয়! এইরূপে দেবতার বিড়ম্বনা হইয়া থাকে। মনুষ্য একবার নিম্নগামী হইলে কত নীচে নামিয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই, অতএব ক্ষুদ্র মানবব্যবহারের অনুকারী এইরূপ দেবতার ধ্যান করিয়া উপাসকের উন্নতি হইবে কি করিয়া? অতএব এইরূপ অনিষ্ট-পরিণাম যাহাতে না ঘটে, তজ্জন্য ধর্ম্মপ্রকরণের মধ্যে মূর্ত্তিপূজাকে স্থান দেওয়া উচিত নহে।

এক্ষণে, কেহ কেহ এ কথাও বলেন যে, অজ্ঞান লোকদিগের মন স্থির করিবার জন্য প্রতিমার ন্যায় দৃশ্য বস্তু সম্মুখে রাখা দরকার। কিন্তু এইরূপ মন স্থির যদি কখন করিতে হয়, মনুষ্যের মত কোন দেবতার উদ্দেশেই তাহা করিতে হইবে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, ঐ পাষাণ কিংবা ঐ ধাতুর বাহিরে উপাসকের দৃষ্টি যায় না। তবে, এই প্রকার বস্তুর উপর কিংবা মানুষের মত দেবতার উপর মন স্থির করিলে কি কাজ হইবে? শাশ্বত, পুরাণ পুরুষ, অদ্ভূত যাঁহার কর্ম্ম, অচিন্ত্য যাঁহার লীলা, যিনি প্রেমস্বরূপ ও আনন্দময়, তাঁহার উপর শ্রদ্ধা

স্থাপন করিলে ও একান্তভাবে মনোনিবেশ করিলে কিরূপ ফল পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। নামদেবের মত ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরা প্রতিমা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে "ব্রহ্মাণ্ডনায়ক, যাঁহার মহিমা জানা যায় না, যাঁহাতে মনের প্রবেশ হয় না, যাঁহার স্বরূপ বাক্য-মনের অতীত", এইরূপ পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হন এবং তাঁহাদের অন্তঃকরণ বিমল হইয়া ব্রহ্মের সহিত সমরস হয় এবং তাঁহারা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন; কিন্তু এই প্রকার ব্যক্তি সংখ্যায় অল্পমাত্র, অধিকাংশ লোকই প্রতিমা পূজাযোগে প্রপঞ্চ-কর্দ্দমে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে।

এখন সাধারণ লোকের জন্য মূর্ত্তির আবশ্যকতা আছে একথা যদি কেহ বলে, তাহাও প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। মুসলমান ও খৃষ্টান লোকদিগের মধ্যে প্রতিমার আবশ্যকতা অনুভূত হয় না এবং আমাদের রাষ্ট্রে বৈদিক কালে, ইন্দ্র বরুণ পূষা সবিতা ইত্যাদি—এই যে বহু দেবতা, ইহাঁদের প্রতিমা গঠিত হইয়াছে বলিয়া কোথাও পাওয়া যায় না; কিন্তু সেই সকল দেবতার উদ্দেশে রচিত সূক্ত ও প্রার্থনা অনেক আছে। অতএব এই আপত্তিও অমূলক।

"ফুল ফুটিয়ে তোল্"।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

এই মঞ্জুরিত বনের সাথে
ফুল ফুটিয়ে তোল্!
ও তুই ফুল ফুটিয়ে তোল্!
এই ভাবনারাশির পর্দ্দাখানি
দু'হাত দিয়ে খোল্!
ও তুই দু'হাত দিয়ে খোল্!
দূর্ করে দে ভাবনা শত
স্বার্থ-মোহের চিন্তা যত
ঘুচিয়ে দিয়ে মনের আঁধার
আপনাকে তুই ভোল্
ওরে আপনাকে তুই ভোল্!
যেমন গাহে প্রভাত-পাখী
পুষ্প যেমন গায়
তেম্নিতর সহজ যেন
পরাণ-পাখী গায়
ও তোর হৃদয়-কুসুম চায়!
বিশ্বে যে সুর উঠ্ছে দুলে
তা'রি সনে যা'রে মিলে
আনন্দময় ভুবন সাথে
গানের তুফান তোল্
ও তুই গানের তুফান তোল্!
মনের কোণের ভাবনা যত
ঢেলে দে ওই পায়
ওরে ঢেলে দে ওই পায়!
বিশ্বচিন্তাহরণ তিনি—
কিসের ভাবনা ভয়
ও তোর কিসের ভাবনা ভয়!
তাঁরি চরণ বুকে ধরে
দে না ভুবন গানে ভরে;
হেসে গেয়ে নেচে তাঁরি
তোল্‌রে জয়রোল
ও তাঁর তোল্‌রে জয়রোল॥

ভাগ ২—গীতা ও উপনিষৎ।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক্ষণে দেখা যাক্, যে, গীতা ও বিভিন্ন উপনিষদের পরস্পর সম্বন্ধ কি। বর্ত্তমান মহাভারতেই স্থানে স্থানে সাধারণভাবে উপনিষদের উল্লেখ আসিয়াছে; এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে (বৃ. ১. ৩; ছা. ১. ২) প্রাণেন্দ্রিয়দিগের যুদ্ধের বৃত্তান্তও অনুগীতায় (অশ্ব. ২৩) প্রদত্ত হইয়াছে; এবং "ন মে স্তেনো জনপদে" ইত্যাদি কৈকেয়-অশ্বপতি রাজার মুখের শব্দও (ছাং. ৫. ১১. ৫) শান্তিপর্ব্বে উক্ত রাজার কথা বলিবার সময় ঠিক ঠিক আসিয়াছে (শাং. ৭৭. ৮)। সেইরূপ আবার, শান্তিপর্ব্বের জনক-পঞ্চশিখসংবাদে "ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি" অর্থাৎ মরিয়া যাইবার পর জ্ঞাতার কোন সংজ্ঞা থাকে না কারণ সে ব্রহ্মে মিশিয়া যায়, বৃহদারণ্যকের এই বিষয় (বৃ. ৪. ৫. ১৩) পাওয়া যায়; সেইখানেই শেষে, প্রশ্ন এবং মুণ্ডক উপনিষদের (প্রশ্ন. ৬. ৫; মুং. ৩. ২. ৮) নদী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত নাম-রূপবিমুক্ত পুরুষের উদ্দেশে প্রযুক্ত

হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণকে ঘোড়া বলিয়া ব্রাহ্মণব্যাধ-সংবাদে (বন. ২১০) এবং অনুগীতায় বুদ্ধির সহিত সারথির যে উপমা দেওয়া হইয়াছে, তাহাও কঠোপনিষদ হইতেই লওয়া হইয়াছে (ক. ১. ৩. ৩); শান্তিপর্ব্বে (১৮৭. ২৯ ও ৩৩১. ৪৪) দুই স্থানে "এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা" (কঠ. ৩. ১২) এবং "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ" (কঠ. ২. ১৪) কঠোপনিষদের এই দুই শ্লোকও স্বল্পভেদে প্রদত্ত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরের "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং" শ্লোকও মহাভারতে অনেক স্থানে এবং গীতাতেও প্রদত্ত হইয়াছে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও এই সাদৃশ্য শেষ হয় নাই; ইহা ব্যতীত উপনিষদের আরও অনেক বাক্য মহাভারতের স্থানে স্থানে আসিয়াছে। ইহাই কেন, মহাভারতের অধ্যাত্মজ্ঞান প্রায় উপনিষদ হইতেই লওয়া হইয়াছে এরূপ বলিতে বাধা নাই।

মহাভারতের ন্যায়ই ভগবদ্গীতার অধ্যাত্মজ্ঞানও উপনিষদ্কে অবলম্বন করিয়া আছে; শুধু তাহা নহে, গীতার ভক্তিমার্গও এই জ্ঞানকে ত্যাগ করিয়া নাই ইহা গীতারহস্যের নবম ও ত্রয়োদশ প্রকরণে আমি সবিস্তার দেখাইয়াছি। তাই, তাহার পুনরুক্তি এখানে না করিয়া সংক্ষেপে ইহাই বলিতেছি যে, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আত্মার অশোচ্যত্ব, অষ্টম অধ্যায়ের অক্ষর-ব্রহ্মস্বরূপ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচার এবং বিশেষ করিয়া 'জ্ঞেয়' পরব্রহ্মের স্বরূপ—এই সমস্ত বিষয় অক্ষরশঃ উপনিষদের ভিত্তিতেই বর্ণিত হইয়াছে। কোন উপনিষৎ গদ্যে এবং কোন উপনিষৎ পদ্যে রচিত। তন্মধ্যে গদ্যাত্মক উপনিষদের বাক্য পদ্যময় গীতায় যেমনটি-তেমনি উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে; তথাপি ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ্ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদের সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, 'যাহা আছে তাহা আছে, যাহা নাই তাহা নাই' (গী. ২. ১৬), "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং" (গী. ৮. ৬), ইত্যাদি বিচার ছান্দোগ্যোপনিষদ হইতে; এবং "ক্ষীণে পুণ্যে" (গী. ৯. ২১) "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (গী. ১৩. ১৭), এবং "মাত্রাস্পর্শাঃ" (গী. ২. ১৪) ইত্যাদি বিচার ও বাক্য বৃহদারণ্যক হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু গদ্যাত্মক উপনিষৎ ছাড়িয়া পদ্যাত্মক উপনিষদ্ গ্রহণ করিলে, এই সাম্য উহা হইতেও অধিক স্পষ্ট ব্যক্ত হয়। কারণ, এই পদ্যাত্মক উপনিষদের কোন কোন শ্লোক যেমন-তেমনিটি ভগবদ্গীতায় গৃহীত হইয়াছে। উদাহরণ যথাঃ—কঠোপনিষদের ছয় সাত শ্লোক অক্ষরশঃ কিংবা অল্প শব্দভেদে গীতায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি" (২. ২৯) শ্লোক, কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর "আশ্চর্য্যো বক্তা" (কঠ. ২. ৭) শ্লোকের সমান; এবং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" (গী. ২. ২০) শ্লোক এবং "যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি" (গী. ৮. ১১) এই শ্লোকার্দ্ধ গীতায় ও কঠোপনিষদে অক্ষরশঃ একই (কঠ. ২. ১৯; ২. ১৫)। "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ" (গী. ৩. ৪২) গীতার এই শ্লোক কঠোপনিষদ হইতে গৃহীত (কঠ. ৩. ১০) ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেইরূপ গীতার পনরো অধ্যায়ের অশ্বত্থ বৃক্ষের রূপকটি কঠোপনিষদ হইতে এবং "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো" (গী. ১৫. ৬) শ্লোক কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ হইতে অল্প শব্দভেদে গৃহীত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের অনেক কল্পনা ও শ্লোকও গীতায় আছে। মায়া শব্দ প্রথম প্রথম শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রদত্ত হয় এবং সেইখান হইতেই গীতা ও মহাভারতে গৃহীত হইয়া থাকিবে, ইহা নবম প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি। শব্দসাদৃশ্য হইতে ইহাও প্রকাশ পায় যে, গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে "শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য" (গী. ৬. ১১) এইরূপ যে যোগাভ্যাসের যোগ্য স্থান বর্ণিত হইয়াছে তাহা "সমে শুচৌ" ইত্যাদি (শ্বে. ২. ১০) মন্ত্র হইতে এবং "সমং কায়শিরোগ্রীবং" (গী. ৬. ১৩) এই শব্দ "ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং" (শ্বে. ২. ৮) এই মন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। সেইরূপ আবার, "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং" শ্লোক এবং তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকার্দ্ধও, গীতায় (১৩. ১৩) ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে শব্দশঃ পাওয়া যায় (শ্বে. ৩. ১৬); এবং "অণোরণীয়াংসং" এবং "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" পদও গীতায় (৮. ৯) ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে একই আছে (শ্বে. ৩. ৯. ২০)। ইহা ব্যতীত গীতার ও উপনিষদের শব্দসাদৃশ্য দেখিতে গেলে "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং" (গী. ৬. ২৯) এবং "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো" (গী. ১৫. ১৫) এই দুই শ্লোকার্দ্ধ কৈবল্যোপনিষদে (কৈ. ১. ১০; ২. ৩) যেমনটি-তেমনি পাওয়া যায়। কিন্তু এই শব্দসাদৃশ্য সম্বন্ধে বেশী বিচার করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, গীতার বেদান্ত উপনিষৎ অবলম্বনে প্রতিপাদিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উপনিষদের আলোচনা এবং গীতার আলোচনার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না, এবং থাকিলে কোন্ বিষয়ে আছে ইহাই মুখ্যরূপে দেখিতে হইবে। তাই, এখন সেই বিষয়ের অভিমুখে যাওয়া যাক।

উপনিষদ্ অনেক। তন্মধ্যে কোন কোনটির ভাষা এতটা অর্ব্বাচীন যে, সেই উপনিষৎগুলি ও পুরাতন উপনিষৎ যে সমকালীন নহে তাহা সহজেই দেখা যায়। তাই

গীতা ও উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিবার সময়, ব্রহ্মসূত্রে যে সকল উপনিষদের উল্লেখ আছে সেই উপনিষৎগুলিকেই মুখ্যরূপে আমি এই প্রকরণে তুলনার জন্য গ্রহণ করিয়াছি। এই উপনিষদ্‌সমূহের অর্থ এবং গীতার অধ্যাত্ম যখন মিলাইয়া দেখি তখন প্রথম ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, নির্গুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ উভয়ের মধ্যে একই হইলেও, নির্গুণ হইতে সগুণের উৎপত্তি বর্ণনা করিবার সময়, 'অবিদ্যা' শব্দের বদলে 'মায়া' বা 'অজ্ঞান' এই শব্দই গীতায় প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বিষয় নবম প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছি যে, 'মায়া' শব্দ শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদে আসিয়াছে; এবং নামরূপাত্মক অবিদ্যারই ইহা অন্য পর্য্যায়শব্দ; এবং ইহাও পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের কোন কোন শ্লোক গীতায় অক্ষরশঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রথম অনুমান এই হয় যে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাং. ৩, ১৪. ১) বা "সর্বমাত্মানং পশ্যতি" (বৃ. ৪. ৪. ২৩) অথবা "সর্বভূতেষু চাত্মানং" (ঈশ. ৬.)—এই সিদ্ধান্তের কিংবা উপনিষদের সমস্ত অধ্যাত্ম-জ্ঞান গীতায় সংগৃহীত হইলেও নামরূপাত্মক অবিদ্যার উপনিষদেই 'মায়া' নাম প্রচলিত হইবার পর গীতাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

একণে উপনিষদের ও গীতার উপদেশের মধ্যে ভেদ কি, তাহার বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, গীতায় কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। বৃহদারণ্যক এবং ছান্দোগ্য এই দুই উপনিষদ জ্ঞান-প্রধান, কিন্তু উহাদের মধ্যে তো সাংখ্যপ্রক্রিয়ার নামও পাওয়া যায় না; এবং কঠাদি উপনিষদে অব্যক্ত, মহান্ ইত্যাদি সাংখ্যদিগের শব্দ সন্নিবেশিত হইলেও তাহাদিগের অর্থ সাংখ্যপ্রক্রিয়া অনুসারে না করিয়া বেদান্তের পদ্ধতিতেই করিতে হইবে ইহা সুস্পষ্ট। মৈত্র্যুপনিষদের উপপাদনেও ঐ কথাই খাটে। এইরূপ সাংখ্যপ্রক্রিয়ার বহিষ্করণ এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, বেদান্তসূত্রে পঞ্চীকরণের বদলে ছান্দোগ্যোপনিষদের মতানুযায়ী ত্রিবৃৎ-করণ তত্ত্বানুসারেই জগতের নামরূপাত্মক বৈচিত্র্যের উপপত্তি বিবৃত হইয়াছে (বেসূ. ২. ৪. ২০)। সাংখ্যকে একেবারে পৃথক করিয়া অধ্যাত্মের অন্তর্ভূত ক্ষরাক্ষর বিচার করিবার এই পদ্ধতি গীতায় স্বীকৃত হয় নাই। তথাপি সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত যেমনটি-তেমনি গীতায় গৃহীত হয় নাই, ইহা মনে রাখিতে হইবে। ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে, গুণোৎকর্ষের তত্ত্ব অনুসারে, সমস্ত ব্যক্ত জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল সেই সম্বন্ধে সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত, এবং পুরুষ নির্গুণ হইয়া দ্রষ্টা এই মতও গীতার গ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু দ্বৈত-সাংখ্যজ্ঞানের উপর অদ্বৈত-বেদান্তের প্রথমে এই প্রকার প্রাবল্য স্থাপিত করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র নহে—ঐ উভয়ই উপনিষদের আত্মরূপ একই পরব্রহ্মের রূপ অর্থাৎ বিভূতি; এবং পুনরায় সাংখ্যদিগেরই ক্ষরাক্ষরবিচার গীতায় বিবৃত হইয়াছে। উপনিষদের ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ অদ্বৈত মতের সহিত স্থাপিত দ্বৈতী সাংখ্যদিগের সৃষ্টি-উৎপত্তিক্রমের এই সম্মিলন, গীতার ন্যায় মহাভারতের অন্যান্য স্থানের অধ্যাত্মবিচারেও পাওয়া যায়। এবং এই সম্মিলন হইতে, গীতা ও মহাভারত এই দুই গ্রন্থ যে একই হাতের রচিত, উপরে এই যে অনুমান করা হইয়াছে, তাহা আরও দৃঢ় হয়।

উপনিষৎ অপেক্ষা গীতার উপপাদনে আর এক বড়-রকমের যে বিশিষ্টতা আছে তাহা ব্যক্তোপাসনা কিংবা ভক্তিমার্গ। ভগবদ্গীতার ন্যায় উপনিষদেও কেবল যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্ম জ্ঞানদৃষ্টিতে গৌণ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু ব্যক্ত মানবদেহধারী ঈশ্বরের উপাসনা প্রাচীন উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় না। অব্যক্ত ও নির্গুণ পরব্রহ্মের ধারণা করা কঠিন হওয়ায়, মন, আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি, যজ্ঞ ইত্যাদি সগুণ প্রতীকের উপাসনা করা আবশ্যক, এই তত্ত্ব উপনিষৎকারদিগের মান্য। কিন্তু উপাসনার জন্য প্রাচীন উপনিষদে যে সব প্রতীকের কথা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে মনুষ্যদেহধারী পরমেশ্বরস্বরূপের প্রতীক ধরা হয় নাই। রুদ্র, শিব, বিষ্ণু, অচ্যুত, নারায়ণ এই সমস্ত পরমাত্মারই রূপ ইহা মৈত্র্যুপনিষদে (মৈ. ৭. ৭) উক্ত হইয়াছে; শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে 'মহেশ্বর' প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ" (শ্বে. ৫. ১৩) এবং "যস্য দেবে পরাভক্তিঃ" (শ্বে. ৬. ২৩) প্রভৃতি বচনও শ্বেতাশ্বতরে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বচনে নারায়ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি শব্দে বিষ্ণুর মানব-দেহধারী অবতারই যে বিবক্ষিত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। কারণ, রুদ্র ও বিষ্ণু এই দুই দেবতা বৈদিক অর্থাৎ প্রাচীন; তখন ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায় যে, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" (তৈ. সং. ১। ৭. ৪) ইত্যাদি প্রকারে যাগযজ্ঞকেই বিষ্ণু-উপাসনার যে স্বরূপ পরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাই উপর্য্যুক্ত উপনিষদের অভিপ্রেত ছিল না? ভাল, যদি কেহ বলেন যে, মানব-দেহধারী অবতারের কল্পনা সেই সময়েও ছিল তাহাও একেবারে অসম্ভব নহে। কারণ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যে 'ভক্তি' শব্দ আছে তাহা যজ্ঞরূপ উপাসনা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা সঙ্গত মনে হয় না। ইহা সত্য যে, মহানারায়ণ, নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী এবং গোপাল-তাপনী প্রভৃতি উপনিষদের বচন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের

বচন অপেক্ষা কোথাও অধিক স্পষ্ট, তাই উহাদের সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহ করিবার কোন অবসরই থাকে না। কিন্তু এই উপনিষদের কাল নিশ্চিতরূপে স্থির করিবার কোন উপায় না থাকায়, বৈদিকধর্ম্মে মানবরূপধারী বিষ্ণুর উপাসনার কখন্ আবির্ভাব হইল এই প্রশ্নের মীমাংসা এই উপনিষৎসমূহের উপর ঠিক করিয়া করা যাইতে পারে না। তথাপি বৈদিক ভক্তিমার্গের প্রাচীনতা অন্য প্রকারে বেশ সিদ্ধ হয়। পাণিনির এক সূত্রে আছে "ভক্তিঃ"—অর্থাৎ যাহাতে ভক্তি হয় (পা. ৪. ৩. ৯৫); ইহার পরে "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্." (পা. ৪. ৩.৯৮) এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বাসুদেবের প্রতি যাহার ভক্তি আছে তাহাকে বাসুদেবক এবং অর্জ্জুনের প্রতি যাহার ভক্তি আছে তাহাকে 'অর্জুনক' বলিবে; এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ইহার উপর টীকা করিবার সময় এই সূত্রে 'বাসুদেব' ক্ষত্রিয়ের বা ভগবানের নাম এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে পাতঞ্জল ভাষ্য খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, এইরূপ ডাঃ ভাণ্ডারকর সিদ্ধ করিয়াছেন; এবং পাণিনির কাল ইহা অপেক্ষাও অধিক প্রাচীন হইবে, এই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাছাড়া, বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থেও ভক্তির উল্লেখ আছে; এবং শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত ধর্ম্মই বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযানপন্থায় ভক্তিতত্ত্ব প্রবেশের কারণ হওয়া সম্ভব ইহা আমি পরে সবিস্তার দেখাইয়াছি। তাই ইহা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয় যে, নিদানপক্ষে বুদ্ধের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের প্রায় ছয় শতাব্দীরও অধিক পূর্ব্বে, আমাদের এখানে ভক্তিমার্গ পুরামাত্রায় স্থাপিত হইয়াছিল। নারদপঞ্চরাত্র বা শাণ্ডিল্য অথবা নারদের ভক্তিসূত্র তদুত্তরকালীন। কিন্তু ইহা হইতে ভক্তিমার্গের কিংবা ভাগবতধর্ম্মের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনও বাধা হইতে পারে না। গীতারহস্যের বিচার আলোচনা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, প্রাচীন উপনিষদসমূহে যে সগুণোপাসনার বর্ণনা আছে তাহা হইতেই ক্রমে-ক্রমে আমাদের ভক্তিমার্গ নিঃসৃত হইয়াছে; পাতঞ্জলযোগে, চিত্ত স্থির করিবার জন্য কোন-না-কোন ব্যক্ত ও প্রত্যক্ষ বস্তুকে চক্ষের সম্মুখে রাখা আবশ্যক হয় বলিয়া উহা হইতে ভক্তিমার্গের আরও পুষ্টি হইয়াছে; ভক্তিমার্গ কিছু অন্য কোথাও হইতে ভারতবর্ষে আনা হয় নাই—এবং আনিবার কোনই কারণই ছিল না। নিজে ভারতবর্ষে এই প্রকারে প্রাদুর্ভূত ভক্তিমার্গের ও বিশেষতঃ বাসুদেবভক্তির উপনিষদের বেদান্তদৃষ্টিতে সমর্থন করাই গীতার প্রতিপাদনের একটি বিশেষ অংশ।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গীতার অধিক মহত্ত্বপূর্ণ অংশ হইতেছে কর্ম্মযোগের সহিত, ভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞানের মিলন ঘটাইয়া দেওয়াই। চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্ম কিংবা শ্রৌত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম উপনিষদে গৌণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, কোন কোন উপনিষৎকার বলেন যে, চিত্তশুদ্ধির জন্য তাহা করিতেই হইবে এবং চিত্তশুদ্ধি হইবার পরেও তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে। তথাপি অনেক উপনিষদেরই প্রবণতা সাধারণতঃ কর্ম্মসন্ন্যাসের দিকে, ইহা বলিতে পারা যায়। ঈশাবাস্যোপনিষদের ন্যায় অপর কোন কোন উপনিষদেও আমরণান্ত কর্ম্ম করা সম্বন্ধে "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি" এইরূপ বচন পাওয়া যায়; কিন্তু অধ্যাত্মজ্ঞান ও সাংসারিক কর্ম্মের বিবাদ দূর করিয়া দিয়া প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত এই কর্ম্মযোগের সমর্থন গীতায় যেমন আছে তেমন আর কোন উপনিষদে পাওয়া যায় না। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই বিষয়ে গীতার সিদ্ধান্ত অধিকাংশ উপনিষৎকারের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন। গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে এই বিষয়ের সবিস্তার বিচার করায় এখানে সেই সম্বন্ধে অধিক লিখিয়া জায়গা নষ্ট করি নাই।

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে যোগসাধনের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে পাতঞ্জলসূত্রে তাহার সবিস্তার ও পদ্ধতিযুক্ত আলোচনা পাওয়া যায়, এবং এক্ষণে পাতঞ্জলসূত্রই এই বিষয়ের প্রমাণগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই সূত্রের চারি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের আরম্ভে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" এইরূপ যোগের ব্যাখ্যা করিয়া "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ"—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই নিরোধ সাধিত হয়—এইরূপ বলা হইয়াছে। তাহার পর, যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামাদি যোগসাধনের বর্ণনা করিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে 'অসংপ্রজ্ঞাত' অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বারা অণিমা-লঘিমাদি অলৌকিক সিদ্ধি ও শক্তি কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই সমাধির দ্বারা শেষে কিরূপে ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ হয় তাহার নিরূপণ করা হইয়াছে। ভগবদ্গীতাতেও প্রথমে চিত্ত নিরোধ করিবার আবশ্যকতা (গী. ৬. ২০) বলিয়া পরে অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুই সাধনের দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করিবে (গী. ৬. ৩৫) বলা হইয়াছে এবং শেষে, নির্ব্বিকল্প সমাধি কিরূপে করিতে হইবে তাহা বলিয়া তাহাতে কি সুখ তাহা দেখানো হইয়াছে। কিন্তু কেবল ইহা হইতেই বলিতে পারা যায় না যে, পাতঞ্জল যোগমার্গ ভগবদ্গীতার অভিমত কিংবা পাতঞ্জলসূত্র ভগবদ্গীতা অপেক্ষা প্রাচীন। পাতঞ্জলসূত্রের ন্যায় ভগবান্ কোথাও বলেন নাই যে, সমাধিসিদ্ধ হইবার জন্য, নাক ধরিয়া সমস্ত জীবন কাটাইতে হইবে। কর্ম্মযোগে সিদ্ধির জন্য বুদ্ধির সমতা হওয়া চাই এবং এই সমতা প্রাপ্ত হইবার জন্য চিত্তনিরোধ ও সমাধি উভয়ই আবশ্যক, অতএব

কেবল সাধন বলিয়া গীতায় চিত্তনিরোধ ও সমাধির বর্ণনা করা হইয়াছে। তাই, বলিতে হয় যে, এই বিষয়ে পাতঞ্জলসূত্র অপেক্ষা শ্বেতাশ্বতর কিংবা কঠোপনিষদের সহিত গীতার অধিক সাম্য আছে। ধ্যানবিন্দু, ছুরিকা, এবং যোগতত্ত্ব এই উপনিষৎগুলিও যোগসংক্রান্তই বটে; কিন্তু উহাদের যোগই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, এবং ঐ-গুলিতে কেবল যোগেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হওয়ায়, যে গীতা কর্ম্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে, সেই গীতার সহিত এই একপক্ষীয় উপনিষদ্গুলির সর্ব্বাংশে মিল স্থাপন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে এবং সেরূপ মিল হইতেই পারে না। টমসন্ সাহেব ইংরাজীতে গীতার যে ভাষান্তর করিয়াছেন তাহার উপোদ্ঘাতে তিনি বলিয়াছেন যে, গীতার কর্ম্মযোগ পাতঞ্জলযোগেরই এক রূপান্তর; কিন্তু ইহা অসম্ভব। এই বিষয়ে আমার মত এই যে, গীতার 'যোগ' শব্দের প্রকৃত অর্থের প্রতি লক্ষ্য না করায় এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে; কারণ এদিকে গীতার কর্ম্মযোগ প্রবৃত্তি-মূলক এবং ওদিকে পাতঞ্জলযোগ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ নিবৃত্তিমূলক। তাই এই দুই গ্রন্থের একটীর অপর হইতে উদ্ভূত হওয়া কখনও সম্ভব নহে; এবং গীতাতেও সে কথা কোন স্থানে বলা হয় নাই। অধিক কি, ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যোগ শব্দের পুরাতন অর্থ কর্ম্মযোগই ছিল এবং সম্ভবত পাতঞ্জলসূত্রের পর ঐ শব্দই 'চিত্তনিরোধরূপ যোগ' অর্থে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সে যাহাই হউক, ইহা নির্ব্বিবাদ যে, প্রাচীনকালে জনকাদির আচরিত নিষ্কাম কর্ম্মমার্গেরই সদৃশ গীতার যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগমার্গ; এবং মনু-ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি মহা-পুরুষদিগের পরম্পরাক্রমে প্রচলিত ভাগবত ধর্ম্ম হইতে উহা গৃহীত হইয়াছে—পাতঞ্জলযোগ হইতে উহা উৎপন্ন হয় নাই।

এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে উপলব্ধি হইবে যে, গীতাধর্ম্ম ও উপনিষদ এই দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কোন্ কোন্ বিষয়ে আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ের বিচার গীতারহস্যের স্থানে স্থানে করা হইয়াছে। তাই এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলিতেছি যে, গীতার ব্রহ্মজ্ঞান উপনিষৎ অবলম্বনে বিবৃত হইলেও উপনিষদের অধ্যাত্মজ্ঞানেরই কেবল অনুবাদ না করিয়া, তাহার ভিতর বাসুদেবভক্তি এবং সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত জগদুৎপত্তিক্রম অর্থাৎ ক্ষরাক্ষর জ্ঞানের কথাও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে; এবং সাধারণ লোকের সহজসাধ্য এবং উভয় লোকের যাহা শ্রেয়স্কর সেই বৈদিক কর্ম্মযোগধর্ম্মই গীতায় মুখ্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপনিষৎ হইতে গীতায় যে-কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাই। তাই ব্রহ্মজ্ঞানের অতিরিক্ত অন্য বিষয়েও সন্ন্যাসমূলক উপ-নিষদের সহিত গীতার মিল স্থাপন করিবার জন্য সাম্প্র-দায়িক দৃষ্টিতে টানাবোনা করিয়া গীতার অর্থ করা উচিত নহে। উভয়েতেই অধ্যাত্মজ্ঞান একই প্রকার সত্য; তথাপি অধ্যাত্মরূপ মস্তক এক হইলেও সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ বৈদিকধর্ম্মপুরুষের দুই তুল্যবল হস্ত আছে; এবং তন্মধ্যে ঈশাবাস্যোপনিষদের ন্যায় গীতায় জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মই উচ্চকণ্ঠে প্রতিপাদিত হইয়াছে; ইহা আমি গীতারহস্যের ১১শ প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি।

ভাগ ৩—গীতা ও ব্রহ্মসূত্র।

জ্ঞানপ্রধান, ভক্তিপ্রধান ও যোগপ্রধান উপনিষদ্-সমূহের সঙ্গে ভগবদ্গীতার যে সাদৃশ্য ও ভেদ আছে, তাহার এইরূপ বিচার করিবার পর ব্রহ্মসূত্র ও গীতার তুলনা করিবার আবশ্যকতা বস্তুতঃ নাই। কারণ, বিভিন্ন বিভিন্ন উপনিষদ বিভিন্ন ঋষি কর্তৃক বিবৃত অধ্যাত্মসিদ্ধান্ত-সমূহের পদ্ধতিবদ্ধ বিচার আলোচনা করিবার জন্যই বাদরায়ণাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্র রচিত হয়, তাই উহাতে উপ-নিষদ্ হইতে ভিন্ন কোন বিচার আসিতে পারে না। তথাপি ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার করিবার সময় ব্রহ্মসূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ এই প্রকারে করা হইয়াছে,—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের "অনেক প্রকারে বিবিধ ছন্দে (অনেক) ঋষি পৃথক্ পৃথক্ এবং হেতুযুক্ত ও পূর্ণনিশ্চয়াত্মক ব্রহ্মসূত্র-পদের দ্বারাও বিচার করিয়াছেন" (গী. ১৩. ৪); এবং এই ব্রহ্মসূত্র ও বর্ত্তমান বেদান্তসূত্র এক বলিয়াই মনে করিলে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান বেদান্তসূত্রের পর বর্ত্তমান গীতা রচিত হইয়া থাকিবে। তাই গীতার কালনির্ণয় করিবার দৃষ্টিতে ব্রহ্মসূত্র কোন্‌টি, তাহার বিচার করা নিতান্তই আবশ্যক।* কারণ, বর্ত্তমান বেদান্তসূত্র ব্যতীত ব্রহ্মসূত্র নামক দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না অথবা তাহার বিষয় কোথাও কথিতও হয় নাই। এবং ইহা বলা তো কোন প্রকারে উচিত মনে করি না যে, বর্ত্তমান ব্রহ্মসূত্রের পর গীতা রচিত হইয়া থাকিবে, কারণ, গীতার প্রাচীনতা সম্বন্ধীয় পরম্পরাগত ধারণা চলিয়া আসিতেছে। ইহা প্রতীত হয় যে, প্রায় এই বাধার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাঙ্করভাষ্যে "ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ"র অর্থ "শ্রুতির কিংবা উপনিষদের ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য" করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিপরীতে শাঙ্করভাষ্যের টীকাকার আনন্দগিরি এবং রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য

* এই বিষয়ের বিচার ৺ তৈলঙ্গ করিয়াছেন; তাছাড়া ১৮৯৫ সনে এই বিষয়ের উপর অধ্যাপক তুকারাম রামচন্দ্র অমলনেরকর বি-এও এক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রভৃতি গীতার অন্যান্য ভাষ্যকার বলেন যে, এস্থলে "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব" শব্দে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" বাদরায়ণাচার্য্যের এই ব্রহ্মসূত্রেরই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এবং শ্রীধর স্বামীর উভয় অর্থ অভিপ্রেত। অতএব এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা আমাকে স্বতন্ত্র রীতিতেই স্থির করিতে হইবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিচার সম্বন্ধে "ঋষিরা অনেক প্রকারে পৃথক্" বলিয়াছেন; এবং তাহা ব্যতীত (চৈব) "হেতুযুক্ত ও বিনিশ্চয়াত্মক ব্রহ্মসূত্রপদের দ্বারাও" ঐ অর্থই কথিত হইয়াছে; এই প্রকারে এই শ্লোকে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচারের দুই ভিন্ন ভিন্ন স্থল উক্ত হইয়াছে, তাহা "চৈব" (আরও) এই পদ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। এই দুই স্থল শুধু ভিন্ন নহে, ইহাদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ ঋষিগণ কর্তৃক কৃত বর্ণনা "বিবিধ ছন্দে পৃথক্ পৃথক্ বিচ্ছিন্ন ও অনেক প্রকারের" এবং 'ঋষিভিঃ' (এই বহুবচন তৃতীয়ান্ত পদ) দ্বারা উহা যে অনেক ঋষিদিগের কৃত, তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। এবং ব্রহ্মসূত্রপদের অপর বর্ণনা "হেতুযুক্ত ও বিনিশ্চয়াত্মক"। এই প্রকারে এই দুই বর্ণনার বিশেষ প্রভেদ এই শ্লোকেই স্পষ্ট করা হইয়াছে। 'হেতুমৎ' শব্দ মহাভারতের কয়েক স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে; তাহার অর্থ—"নৈয়ায়িক পদ্ধতি অনুসারে, কার্য্যকারণভাব দেখাইয়া প্রতিপাদন করা"। উদাহরণ—জনকের নিকট সুলভা যে কথা বলিয়াছিলেন, কিংবা শ্রীকৃষ্ণ যখন মধ্যস্থতা করিতে কৌরবদিগের সভায় গিয়াছিলেন সেই সময় তিনি যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই ধর। মহাভারতেই প্রথম কথাকে "হেতুমৎ ও অর্থবৎ" (শাং. ৩২০. ১৯১) এবং দ্বিতীয় কথাকে 'সহেতুক' (উদ্যো. ১৩১. ২) বলা হইয়াছে। ইহা হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, যে প্রতিপাদনে সাধকবাধক প্রমাণ দেখাইয়া শেষে কোন একটি অনুমান নিঃসন্দেহরূপে সিদ্ধ করা হয় তাহার সম্বন্ধেই "হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" এই বিশেষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; একস্থানে এক রকম অন্যস্থানে অন্য রকম উপনিষদের এরূপ কোন সংকীর্ণ প্রতিপাদনসম্বন্ধে এই শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। তাই, "ঋষিভিঃ বহুধা বিবিধৈঃ পৃথক্" এবং "হেতুমদ্ভিঃ বিনিশ্চিতৈঃ" এই পদগুলির বিরোধাত্মক স্বারস্য যদি বজায় রাখিতে হয়, তবে ইহাই বলিতে হয় যে, গীতার উক্ত শ্লোকে "ঋষিগণ কর্তৃক বিবিধ ছন্দে কৃত অনেক প্রকারের পৃথক্" বিচার হইতে বিভিন্ন উপনিষদের সংকীর্ণ ও পৃথক্ বাক্যই অভিপ্রেত, এবং "হেতুযুক্ত ও বিনিশ্চয়াত্মক ব্রহ্মসূত্রপদ" এই পদগুলি হইতে সাধকবাধক প্রমাণ দেখাইয়া শেষ সিদ্ধান্ত যাহাতে নিঃসন্দেহরূপে নির্ণয় করা হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের সেই বিচার অভিপ্রেত। আর একটা কথার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত যে, উপনিষদের সমস্ত বিচার এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, অর্থাৎ অনেক ঋষিদের যেমন যেমন মনে আসিয়াছিল তেমনি-তেমনিই উক্ত হইয়াছিল, তাহার ভিতর কোন বিশেষ পদ্ধতি বা ক্রম নাই; অতএব সেই বিচারসমূহের সমন্বয় না করিলে উপনিষদের ভাবার্থ ঠিক অবগত হওয়া যায় না। তাই উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গেই যে গ্রন্থে কার্য্যকারণহেতু দেখাইয়া উহাদের (অর্থাৎ উপনিষদসমূহের) সমন্বয় করা হইয়াছে সেই গ্রন্থ বা বেদান্তসূত্রেরও (ব্রহ্মসূত্রের) উল্লেখ করা আবশ্যক ছিল।

গীতার শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্র গীতার পূর্ব্বে রচিত। তন্মধ্যে মুখ্য মুখ্য উপনিষৎ সম্বন্ধে কোন বিবাদই নাই; কারণ, এই উপনিষদসমূহের অনেক শ্লোক গীতায় শব্দশ পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার স্থান আছে; কারণ, ব্রহ্মসূত্রসমূহে 'ভগবদ্গীতা' শব্দটি সাক্ষাৎভাবে না আসিলেও, ভাষ্যকার মনে করেন যে, অন্ততঃ কতকগুলি সূত্রে 'স্মৃতি' শব্দের দ্বারা ভগবদ্গীতারই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যে ব্রহ্মসূত্রগুলিতে শাঙ্করভাষ্য অনুসারে 'স্মৃতি' শব্দের দ্বারা গীতারই উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নপ্রদত্ত সূত্রগুলিই মুখ্য।

ব্রহ্মসূত্র—অধ্যায়, পাদ ও সূত্র।	গীতা—অধ্যায় ও শ্লোক।
১. ২. ৬ স্মৃতেশ্চ।	গীতা ১৮. ৬১ "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং" আদি শ্লোক।
১. ৩. ২৩ অপি চ স্মর্য্যতে।	গীতা ১৫. ৬ "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যঃ" ইত্যাদি।
২. ১. ৩৬ উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ	গীতা ১৫. ৩ "ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে" ইত্যাদি
২. ৩. ৪৫ অপি চ স্মর্য্যতে।	গীতা ১৫. ৭ "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ" ইত্যাদি।
৩. ২. ১৭ দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে।	গীতা ১৩. ১২ "জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি" ইত্যাদি।
৩. ৩. ৩১ অনিয়মঃ সর্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্	গীতা ৮. ২৬ "শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে" ইত্যাদি।
৪. ১. ১০ স্মরন্তি চ।	গীতা ৬. ১১, "শুচৌ দেশে" ইত্যাদি
৪. ২. ২১ যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে।	গীতা ৮. ২৩, "যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ" ইত্যাদি

উপরি-প্রদত্ত আট স্থলের মধ্যে কোন কোন স্থল সন্দিগ্ধ বলিয়া মনে করিলেও আমার মতে, চতুর্থ (ব্রসূ. ২.৩.৪৫) ও অষ্টম (ব্রসূ. ৪.২.২১) এই দুই স্থলে কোন সন্দেহ নাই; এবং ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, এই বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য এই চারি ভাষ্যকারদিগের মত একই প্রকার। ব্রহ্মসূত্রে উক্ত দুই স্থলের (ব্রসূ. ২.৩.৪৫ এবং ৪.২.২১) সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গের উপরেও দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহার বিচার করিবার সময় প্রথমে জগতের অন্য পদার্থের ন্যায় জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা "নাত্মাঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (ব্রসূ. ২.৩.১৭) এই সূত্রের দ্বারা নির্ণয় করিয়া, পরে "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" (২.৩.৪৩) এই সূত্রে জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ এইরূপ বলিয়া, তাহার পর "মন্ত্রবর্ণাচ্চ" (২.৩.৪৪) এইরূপ শ্রুতির প্রমাণ দেখাইয়া শেষে "অপিচ স্মর্য্যতে" (২.৩.৪৫) "স্মৃতিতেও ইহাই উক্ত হইয়াছে", এই সূত্রের প্রয়োগ করা হইয়াছে। সকল ভাষ্যকারেরাই বলিয়াছেন যে, এই স্মৃতি অর্থাৎ গীতার "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গী. ১৫.৭) এই বচন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা শেষের স্থলটি (অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র ৪.২.২১) আরও নিঃসন্দেহ। দেবযান ও পিতৃযান এই দুই গতিতে ক্রমানুসারে উত্তরায়ণের ছয়মাস এবং দক্ষিণায়নের ছয় মাস হয়, এবং উহাদের অর্থ কালমূলক না করিয়া বাদরায়ণাচার্য্য বলেন যে, ঐ শব্দগুলি হইতে তৎতৎকালাভিমানী দেবতা অভিপ্রেত (বেসূ. ৪.৩.৪), ইহা পূর্ব্বেই দশম প্রকরণে আমি বলিয়াছি। এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ এই শব্দদ্বয়ের কালবাচক অর্থ কি কখনই গ্রহণ করা যাইবে না? এই জন্য "যোগিনঃ প্রতি চ স্মর্য্যতে" (ব্রসূ ৪.২.২১) অর্থাৎ এই কাল "স্মৃতিতে যোগীদিগের পক্ষে বিহিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে"—এই সূত্রের প্রয়োগ করা হইয়াছে; এবং "যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ"—(গী. ৮.২৩) এই গীতাবচনে, এই কাল যোগীদিগের পক্ষে বিহিত, এইরূপ স্পষ্ট বলা হইয়াছে। ইহা হইতে ভাষ্যকারদিগের কথা অনুসারে অগত্যা বলিতে হয় যে, উক্ত দুই স্থলে ব্রহ্মসূত্রের 'স্মৃতি' শব্দের দ্বারা ভগবদগীতাই বিবক্ষিত হইয়াছে।

কিন্তু ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মসূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং ব্রহ্মসূত্রে 'স্মৃতি'শব্দের দ্বারা ভগবদ্গীতারই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে স্বীকার করিলে, উভয়ের মধ্যে কালদৃষ্টিতে বিরোধ উৎপন্ন হয়। তাহা এই; ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মসূত্রের স্পষ্ট স্পষ্ট উল্লেখ থাকায়, ব্রহ্মসূত্র গীতার পূর্ব্বে রচিত বলিয়া মনে হয়, এবং ব্রহ্মসূত্রে "স্মৃতি" শব্দের দ্বারা গীতাই বিবক্ষিত হইয়াছে মনে করিলে, গীতাকে ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরিতে হয়। একবার ব্রহ্মসূত্র গীতার পূর্ব্ববর্ত্তী, আর একবার উহা গীতার পরবর্ত্তী হওয়া সম্ভব নহে। ভাল; এখন এই মুস্কিল এড়াইবার জন্য, গীতার "ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ" এই শব্দের শাঙ্করভাষ্যে প্রদত্ত অর্থ স্বীকার করিলে, "হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ" ইত্যাদি পদের (স্বারস্য সার্থকতা) আদৌ থাকে না; এবং ব্রহ্মসূত্রের অন্তর্গত "স্মৃতি" শব্দের দ্বারা গীতা ব্যতীত অন্য কোন স্মৃতিগ্রন্থ বিবক্ষিত হইয়া থাকিবে মনে করিলে, সমস্ত ভাষ্যকারই ভুল করিয়াছেন বলিতে হয়। ভাল; তাঁহারা ভুল করিয়াছেন বলিলেও 'স্মৃতি' শব্দের দ্বারা কোন্ গ্রন্থ বিবক্ষিত তাহা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। তখন এই মুস্কিল কাটাইবে কি করিয়া? আমার মতে এই মুস্কিল হইতে উদ্ধার পাইবার একটিমাত্র পথ আছে। ব্রহ্মসূত্র যিনি রচিয়াছিলেন তিনিই মূল ভারতের এবং গীতার বর্ত্তমান রূপটি প্রদান করিয়া থাকিবেন—এইরূপ মনে করিলে, কোন গোলযোগই থাকে না। ব্রহ্মসূত্রকে "ব্যাসসূত্র" বলিবার প্রচলিত রীতি আছে; এবং "শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ" (বেসূ. ৩.৪.২) এই সূত্রের উপর শাঙ্করভাষ্যের টীকায়, আনন্দগিরি লিখিয়াছেন যে, জৈমিনি বেদান্তসূত্রকার ব্যাসের শিষ্য ছিলেন; এবং আরম্ভের মঙ্গলাচরণেও "শ্রীমদ্ব্যাসপয়োনিধির্নিধিরসৌ" এইরূপ তিনি ব্রহ্মসূত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। এই কথা মহাভারতের ভিত্তিতে আমি উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, মহাভারতকার ব্যাসের, পৈল, শুক, সুমন্তু, জৈমিনি ও বৈশম্পায়ন এই পাঁচ শিষ্য ছিলেন; এবং ব্যাস তাঁহাদিগকে মহাভারত পড়াইয়াছিলেন। এই দুই কথা একত্র করিয়া বিচার করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, মূল ভারত এবং তদন্তর্গত গীতার বর্ত্তমান রূপ প্রদান করা এবং ব্রহ্মসূত্রের রচনা, এই দুই কাজই একই বাদরায়ণ ব্যাস করিয়া থাকিবেন। বাদরায়ণাচার্য্য বর্ত্তমান মহাভারত নূতন রচিয়াছিলেন, এই কথার ইহা অর্থ নহে। আমার উক্তির ভাবার্থ এই যে, মহাভারত গ্রন্থ অতি বিস্তীর্ণ হওয়ায় বাদরায়ণাচার্য্যের সময়ে ইহা সম্ভব যে, তাহার কোন কোন অংশ এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত কিংবা লুপ্তও হইয়া থাকিবে। এই অবস্থায় তৎকালে প্রাপ্ত মহাভারতের অংশসমূহের অনুসন্ধান করিয়া এবং যেখানে যেখানে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ, অশুদ্ধ ও দোষযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখা গিয়াছিল সেই সেই

স্থানে তাহার শুদ্ধি ও পূর্ত্তি করিয়া এবং অনুক্রমণিকা প্রভৃতি জুড়িয়া দিয়া বাদরায়ণাচার্য্য এই গ্রন্থের পুনরুজ্জীবন করিয়া থাকিবেন কিংবা তাহার বর্ত্তমান রূপ দিয়া থাকিবেন। মারাঠী সাহিত্যে জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থের এইরূপ শুদ্ধিই একনাথ মহারাজ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে; এবং একথাও প্রচলিত আছে যে, সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ-মহাভাষ্যও একবার প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং চন্দ্রশেখরাচার্য্যকে তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইয়াছিল। মহাভারতের অন্য প্রকরণে গীতার শ্লোক কেন পাওয়া যায় তাহার উপপত্তি এক্ষণে ঠিক পাওয়া যাইতেছে; এবং গীতায় ব্রহ্মসূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ এবং ব্রহ্মসূত্রে 'স্মৃতি' শব্দের দ্বারা গীতার নির্দ্দেশ কেন করা হইল তাহারও মীমাংসা সহজে হইতেছে। গীতার যে ভিত্তিতে বর্ত্তমান গীতা রচিত হইয়াছে তাহা বাদরায়ণাচার্য্যের পূর্ব্বেও উপলব্ধ ছিল, তাই ব্রহ্মসূত্রে 'স্মৃতি' শব্দে তাহার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; এবং মহাভারতের সংশোধন করিবার সময় গীতায় * উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সবিস্তার বিচার ব্রহ্মসূত্রে করা হইয়াছে। বর্ত্তমান গীতায় ব্রহ্মসূত্রের এই যে উল্লেখ আছে তাহারই অনুরূপ সূত্রগ্রন্থের অন্য উল্লেখ বর্ত্তমান মহাভারতেও আছে। উদাহরণ যথা—অনুশাসন পর্ব্বের অষ্টাবক্রাদিসংবাদে "অনৃতাঃ স্ত্রিয় ইত্যেবং সূত্রকারো ব্যবস্যতি" (অনু. ১৯, ৬) এই বাক্য আছে। সেইরূপ আবার, শতপথ ব্রাহ্মণ (শান্তি. ৩১৮. ১৬-২৩), পঞ্চরাত্র (শান্তি. ৩৩৯. ১০৭), মনু (অনু. ৩৭. ১৬) এবং যাস্কের নিরুক্ত (শান্তি. ৩৪২. ৭১), ইহাদেরও অন্যত্র স্পষ্ট স্পষ্ট উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু গীতার ন্যায় মহাভারতের সকল অংশ মুখস্থ করিবার রীতি ছিল না, তাই গীতার অতিরিক্ত মহাভারতে অন্য স্থানে অন্য গ্রন্থের যে উল্লেখ আছে, তাহা কাল-নির্ণয়ার্থ কতটা বিশ্বসনীয় সে বিষয়ে সহজেই সংশয় উপস্থিত হয়। কারণ, যে অংশ কণ্ঠস্থ করা হয় না তাহাতে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করা কিছু কঠিন নহে। তথাপি আমাদের মতে বর্ত্তমান গীতায় প্রদত্ত ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ একমাত্র বা অপূর্ব্ব সুতরাং অবিশ্বাস্য নহে ইহা দেখাইবার জন্য উপরি-উক্ত অন্য উল্লেখের উপযোগ করা কিছু অনুচিত হইবে না।

"ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব" ইত্যাদি শ্লোকান্তর্ভূত পদসমূহের অর্থস্বারস্যের মীমাংসা করিয়া আমি উপরে নির্ণয় করিয়াছি যে, ভগবদ্গীতায় বর্ত্তমান ব্রহ্মসূত্রের কিংবা বেদান্তসূত্রেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আসিবার—এবং তাহাও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অর্থাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারেই আসিবার—আমার মতে অন্য এক মহৎ ও প্রবল কারণ আছে। ভগবদ্গীতায় বাসুদেব-ভক্তিতত্ত্ব মূল ভাগবত কিংবা পাঞ্চরাত্র-ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইলেও (আমি পূর্ব্ব প্রকরণসমূহে যেমন বলিয়া আসিয়াছি) চতুর্ব্যূহপাঞ্চরাত্র ধর্ম্মের মূল-জীব ও মনের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মত ভগবদ্গীতার মান্য নহে যে, বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ অর্থাৎ জীব, সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন (মন) এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার) উৎপন্ন হইয়াছে। জীবাত্মা অন্য কিছু হইতে উৎপন্ন হয় নাই (বেসূ. ২. ৩. ১৭), উহা সনাতন পরমাত্মারই নিত্য 'অংশ' (বেসূ. ২. ৩. ৪৩), ইহাই ব্রহ্মসূত্রের সিদ্ধান্ত। সেইজন্য, ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে প্রথমে বলা হইয়াছে যে, বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ হওয়া অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মীয় জীবের উৎপত্তি সম্ভব নহে (বেসূ. ২. ২. ৪২), এবং পুনরায় বলা হইয়াছে যে, মন জীবের এক ইন্দ্রিয় হওয়া প্রযুক্ত জীব হইতে প্রদ্যুম্নের (মন) উৎপত্তি হওয়াও সম্ভব নহে (বেসূ. ২. ২. ৪৩); কারণ লোকব্যবহারের দিকে দেখিলে তো ইহাই মনে হয় যে, কর্ত্তা হইতেই কারণ বা সাধন উৎপন্ন হইয়াছে দেখা যায় না। এই প্রকার বাদরায়ণাচার্য্য ভাগবত-ধর্ম্মের জীবোৎপত্তি যুক্তিপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। সম্ভবত এই

* ব্রহ্মসূত্র বেদান্তসম্বন্ধীয় মুখ্যগ্রন্থ এবং সেইরূপ গীতা কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে প্রধান গ্রন্থ—এইরূপ আমি পূর্ব্ব প্রকরণে দেখাইয়াছি। তখন ব্রহ্মসূত্র ও গীতা একই ব্যক্তি অর্থাৎ ব্যাস রচনা করিয়াছিলেন আমার এই অনুমান সত্য হইলে, এই দুই শাস্ত্রের কর্ত্তা ব্যাসকেই মানিতে হয়। আমি এই কথা অনুমানের দ্বারা উপরে সিদ্ধ করিয়াছি। কিন্তু কুম্ভকোণস্থ কৃষ্ণাচার্য্য, মহাভারতের দাক্ষিণাত্য পাঠানুসারে যে এক সংস্করণ অধুনা ছাপাইয়াছেন তাহাতে শান্তিপর্ব্বের ২১২ অধ্যায়ে (বার্ষ্ণেয়াধ্যাত্ম প্রকরণে) যুগারম্ভে বিভিন্ন শাস্ত্র ও ইতিহাস কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহার বর্ণনা করিবার সময় নিম্নলিখিত ৩৪তম শ্লোকটি দিয়াছেন:—

> বেদান্তকর্ম্মযোগং চ বেদবিদ্ ব্রহ্মবিদ্ বিভুঃ।
> দ্বৈপায়নো নিজগ্রাহ শিল্পশাস্ত্রং ভৃগুঃ পুনঃ॥

ইহাতে 'বেদান্তকর্ম্মযোগ' একবচনান্ত পদ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ 'বেদান্ত ও কর্ম্মযোগই' করিতে হয়। অথবা এইরূপও মনে হয় যে, 'বেদান্তং কর্ম্মযোগং চ' ইহাই মূল পাঠ হইবে এবং, লিখিবার সময় কিংবা ছাপিবার সময় 'ন্তং'-এর অনুস্বরটি বাদ পড়িয়া গিয়া থাকিবে। বেদান্ত ও কর্ম্মযোগ এই দুই শাস্ত্র ব্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভৃগু শিল্পশাস্ত্র পাইয়াছিলেন, এইরূপ এই শ্লোকে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোক বোম্বাই নগরের গণপৎ কৃষ্ণাজীর ছাপাখানায় মুদ্রিত সংস্করণে এবং কলিকাতার সংস্করণেও পাওয়া যায় না। কুম্ভকোণ-সংস্করণে শান্তিপর্ব্বের ২১২ অধ্যায় বোম্বাই ও কলিকাতার সংস্করণে ২১০ অধ্যায় হইয়াছে। কুম্ভকোণ পাঠের এই শ্লোক আমার মিত্র ডা. গণেশ-কৃষ্ণগর্দে আমার নজরে আনায় আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতেছি। তাঁহার মতে, কর্ম্মযোগ শব্দে এই স্থানে গীতাই বিবক্ষিত; এবং গীতা ও বেদান্তসূত্র এই দুয়েরই কর্ত্তৃত্ব এই শ্লোকে ব্যাসকেই প্রদত্ত হইয়াছে। মহাভারতের তিন সংস্করণের মধ্যে কেবল এক সংস্করণেই এই পাঠ পাওয়া যায় বলিয়া এই সম্বন্ধে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু যাই বল না কেন, উহা হইতে এটুকু তো সিদ্ধ হয় যে, বেদান্ত ও কর্ম্মযোগের কর্ত্তা যে একই, আমাদের এই অনুমান কিছুই নূতন কিংবা ভিত্তিহীন নহে।

সম্বন্ধে ভাগবতধর্ম্মী এই উত্তর দিবেন যে, আমি বাসুদেব (ঈশ্বর), সংকর্ষণ (জীব), প্রদ্যুম্ন (মন) ও অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার) এই চারি জনকেই সমান জ্ঞানী মনে করি এবং এক হইতে অপরের উৎপত্তিকে লাক্ষণিক ও গৌণ বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু এইরূপ মনে করিলে বলিতে হয় যে, এক মুখ্য পরমেশ্বরের স্থানে চারি মুখ্য পরমেশ্বর হইয়া দাঁড়ায়। তাই এই উত্তরও উপযোগী নহে এইরূপ ব্রহ্মসূত্রে উক্ত হইয়াছে; এবং পরমেশ্বর হইতে জীব উৎপন্ন হয় এই মত বেদের অর্থাৎ উপনিষদের বিরুদ্ধ অতএব ত্যাজ্য, এইরূপ বাদরায়ণাচার্য্য শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (বেসূ. ২. ২. ৪৪. ৪৫)। ভাগবতধর্ম্মের কর্ম্মমূলক ভক্তিতত্ত্ব ভগবদ্গীতায় গৃহীত হইয়াছে সত্য হইলেও গীতার ইহাও সিদ্ধান্ত যে, জীব বাসুদেব হইতে উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু: জীব নিত্য পরমাত্মারই 'অংশ' (গী. ১৫. ৭)। জীবসম্বন্ধী এই সিদ্ধান্ত মূল ভাগবতধর্ম্ম হইতে গৃহীত হয় নাই, এই জন্য উহার আধার কি তাহা বলা আবশ্যক ছিল; কারণ এরূপ না করিলে, এই ভুল ধারণা হইতে পারিত যে, চতুর্ব্যূহ ভাগবতধর্ম্মের প্রবৃত্তিমূলক ভক্তিতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গেই জীবের উৎপত্তিসংক্রান্ত কল্পনাও গীতার অভিমত। অতএব ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারে যখন জীবাত্মার স্বরূপ বলিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল তখন অর্থাৎ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আরম্ভেই, ইহা স্পষ্ট বলিতে হইয়াছিল যে, "ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ জীবের স্বরূপসম্বন্ধে আমাদের মত ভাগবতধর্ম্মের অনুরূপ নহে, বরঞ্চ উপনিষদের ঋষিদিগের মতানুযায়ী"। অধিকন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাবত ইহাও বলিতে হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে পৃথক্ পৃথক্ উপপাদন করায়, সেই সমস্তের ব্রহ্মসূত্রে কৃত সমন্বয়ই আমার অভিমত। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রে যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহা যাহাতে দূর হয় এই ভাবে ভাগবত ধর্ম্মের ভক্তিমার্গকে গীতার মধ্যে সমাবেশ করা হইয়াছে। রামানুজাচার্য্য স্বকীয় বেদান্তসূত্রভাষ্যে উক্ত সূত্রের অর্থ বদলাইয়া ফেলিয়াছেন (বেসূ. রাভা. ২. ২. ৪২-৪৫ দেখ)। কিন্তু আমাদের মতে, এই অর্থ ক্লিষ্ট অতএব অগ্রাহ্য। থিবো সাহেবের মনের ঝোঁক রামানুজভাষ্যে প্রদত্ত অর্থের দিকেই; কিন্তু থিবোর লেখা পড়িয়া তো ইহাই মনে হয় যে, তিনি এই মতবাদের ঠিক্ স্বরূপটি বুঝেন নাই। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের শেষ অংশে নারায়ণীয় কিংবা ভাগবতধর্ম্মের যে বর্ণনা আছে তাহাতে বাসুদেব হইতে জীব অর্থাৎ সংকর্ষণ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বর্ণনা নাই; কিন্তু "যিনি বাসুদেব তিনিই (স এব) সংকর্ষণ অর্থাৎ জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ" এইরূপ প্রথমে উক্ত হইয়াছে (শাং. ৩৩৪. ২৮ ও ২৯; এবং ৩৩৯. ৩৯ ও ৭১ দেখ); এবং ইহার পরে সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন পর্য্যন্ত কেবল পরম্পরা প্রদত্ত হইয়াছে। এক স্থানে তো স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, ভাগবতধর্ম্মকে কেহ চতুর্ব্যূহ, কেহ ত্রিব্যূহ, কেহ দ্বিব্যূহ এবং শেষে কেহ একব্যূহও মনে করেন (মভা. শাং. ৩৪৮. ৫৭)। কিন্তু ভাগবতধর্ম্মের এই নানা পক্ষ স্বীকার না করিয়া তন্মধ্যে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের পরস্পরসম্বন্ধবিষয়ে উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের যাহাতে মিল হইতে পারে এইরূপ একটি মতই গীতায় স্থির রাখা হইয়াছে। এবং এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিলে, এই প্রশ্নের ঠিক মীমাংসা হইবে যে, ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ গীতায় কেন করা হইয়াছে? অথবা, ইহা বলা বাহুল্য যে, মূল গীতায় এই একটী সংস্কারই সাধিত হইয়াছে।

বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

মানুষের যেমন নানা কারণে রোগোৎপত্তি হয়, বৃক্ষেরও তেমন কারণবিশেষে রোগ হইয়া থাকে। লক্ষণ দেখিয়া রোগ নির্ণয়পূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে বৃক্ষের রোগ-নিবৃত্তি হইয়া যায়। বৃক্ষের রোগের কারণ এবং লক্ষণসম্বন্ধে বরাহমিহির বলিয়াছেন যে, শীত, বায়ু ও তাপ, এই কয়টি কারণে বৃক্ষের রোগ হইয়া থাকে। রুগ্ন বৃক্ষের পাতা পাণ্ডুবর্ণ হয়, সঞ্জাত প্রবালের (অঙ্কুরের) বৃদ্ধি হয় না, শাখা শুকাইয়া যায়, বৃক্ষের স্থানবিশেষ হইতে রসস্রাব হইয়া থাকে। কথিত লক্ষণের অন্যতম দৃষ্ট হইলে প্রথমতঃ অস্ত্রের দ্বারা ব্রণযুক্ত স্থানের শোধন করিতে হয়, অর্থাৎ যে স্থান বিবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, অস্ত্রের দ্বারা সেই স্থান চাঁচিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। অনন্তর বিড়ঙ্গ, ঘৃত ও কর্দ্দম, এই কয়টি পদার্থ একত্র মিশাইয়া, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিতে হয়। তৎপর দুগ্ধমিশ্রিত জলের দ্বারা বৃক্ষের সেচন কর্ত্তব্য। (১৫) কাশ্যপের উক্তি হইতে জানা যায় যে, উক্ত রীতিতে

(১৫) শীতবাতাতপৈ রোগো জায়তে পাণ্ডুপত্রতা।
অবৃদ্ধিশ্চ প্রবালানাং শাখাশোষো রস-স্রুতিঃ॥ ১৪
চিকিৎসিতমথৈতেষাং শস্ত্রেণাদৌ বিশোধনম্।
বিড়ঙ্গ-ঘৃত পঙ্কাক্তান্ সেচয়েৎ ক্ষীরবারিণা॥ ১৫

চিকিৎসিত বৃক্ষসকল পুনর্ব্বার নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু তিনি রোগের কারণ ও লক্ষণ এই উভয় সম্বন্ধে আরও কিছু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শীত, উষ্ণ, বর্ষণ ও বাত্যা প্রভৃতির দ্বারা, হস্তীর ঘর্ষণের দ্বারা এবং বৃক্ষদিগের মূল পরস্পর মিশ্রিত হওয়ায় তাহাদের রোগ হইয়া থাকে। রুগ্ন বৃক্ষের পাতা পাণ্ডুবর্ণ হয়, এবং তাহাদের উপযুক্ত পত্র ও ফল হয় না। (১৬)

ফলনাশ চিকিৎসা।

বৃক্ষের ফলনাশ হইলে অর্থাৎ অপরিণত অবস্থায় ফল ঝরিয়া পড়িলে অথবা ফল সঞ্জাত না হইলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

কুলত্থ কলাই, মাষ, মুগ, তিল ও যব এই সকল শস্যের সহিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত পরিভাষানুসারে দুগ্ধ পাক করিবে, অনন্তর সেই দুগ্ধ শীতল হইলে তদ্দারা বৃক্ষের সেচন করিবে। ইহাতে বৃক্ষের ফল ও পুষ্প অতিমাত্র বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। (১৭)

বৃক্ষের বৃদ্ধিকর প্রয়োগ।

ভেড়ীর ও ছাগের বিষ্ঠাচূর্ণ প্রত্যেকে এক আঢ়ক পরিমিত। তিল এক আঢ়ক, সক্তু (ছাতু) এক প্রস্থ, জল এক দ্রোণ ও গোমাংস এক তুলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত রাখিয়া দিবে; অনন্তর ইহার দ্বারা বৃক্ষের সেক করিবে। ইহাতে বৃক্ষের শাখা, লতা, ফল ও পুষ্প বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। (১৮) এই স্থলে টীকাকার আঢ়ক প্রভৃতির অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৬৪ পলে এক আঢ়ক, ১৬ পলে এক প্রস্থ, দুই শত ছাপ্পান্ন পলে একদ্রোণ। একশত পলে একতুলা। টীকাকার ইহাও বলিয়াছেন যে, এইস্থলে বৃক্ষসেকের জন্য যে-পরিমিত বস্তুর নির্দ্দেশ করা হইল, উহা একটি বৃক্ষের সেকেই ব্যবহৃত হইবে। অধিকসংখ্যক বৃক্ষের সেচন করিতে হইলে, এই অনুপাতে দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

শুক্রনীতিসারে বরাহমিহিরোক্ত বচনের সমানার্থ কিঞ্চিৎ বিপর্য্যস্ত বচন দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকন্তু ইহাতে মৎস্য দ্বারা সেচন করিলে বৃক্ষের বৃদ্ধি হয়, একথা লিখিত হইয়াছে। (১৯) পূর্ব্বকালে বৃক্ষের মধ্যে কতকগুলি শুভকর ও কতকগুলি অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। বরাহমিহিরের মতে নিম, অশোক, পুন্নাগ, শিরীষ ও প্রিয়ঙ্গু এই সকল বৃক্ষ মঙ্গলজনক, সুতরাং ইহাদিগকে উপবনে ও গৃহে প্রথম রোপণ করিবে। বলা আবশ্যক যে, এই স্থলে গৃহশব্দে গৃহের সমীপবর্ত্তী স্থান অভিপ্রেত হইতে পারে, এবং রাজসভাগৃহ প্রভৃতি ধনবানের বিলাস ভবনও হইতে পারে; বরাহমিহিরের গ্রন্থে মাত্র চারি প্রকার বৃক্ষ মঙ্গল্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু কাশ্যপের মতে অশোক, চম্পক, নিম্ব, পুন্নাগ, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষ, উডুম্বর ও পারিজাত, এই আটপ্রকার মঙ্গল্য বৃক্ষ দেবালয়ে উদ্যানে গৃহে এবং উপবনে রোপণীয়। (২০)

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত হইয়াছে যে, নিম্ব, অশোক, পুন্নাগ, শিরীষ, আম্র, প্রিয়ঙ্গু, পনস, (অশোক) কদলী, জম্বু, লকুচ (ডেউয়া) ও দাড়িম, এই সকল মঙ্গলকর বৃক্ষ উপবনে এবং গৃহে প্রথম রোপণীয়। (২১) এই সকল বৃক্ষ বহুসংখ্যক রোপণ করিবে। এই স্থলে অশোক শব্দের দুই বার উল্লেখ দেখা যায়, সুতরাং উহা যে ভ্রমপূর্ণ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহের কারণ নাই; মুদ্রিত পুস্তকখানিও অশুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। উহাতে "পনসাশোক-

---

(১৬) যেঽপি পর্ণফলৈর্হীনা বৃক্ষাঃ পত্রৈশ্চ পাণ্ডুরৈঃ ॥
শীতোষ্ণবর্ষবাতাদ্যৈর্মূলৈর্বামিশ্রিতৈরপি ॥
শাখিনাস্তু ভবেদ্রোগো দ্বিপানাং লেখনেন চ ॥
চিকিৎসা তেষু কর্ত্তব্যা যে চ (?) ভূয়ঃ পুনর্নবাঃ।
শোধয়েৎ প্রথমং শস্ত্রৈঃ প্রলেপং দাপয়েত্ততঃ ॥
কর্দ্দমেন বিড়ঙ্গৈশ্চ ঘৃতমিশ্রৈশ্চ লেপয়েৎ।
ক্ষীরতোয়েন সেকঃ স্যাদ্রোহণং সর্ব্বশাখিনাম্ ॥

(১৭) ফলনাশে কুলত্থৈশ্চ মাষৈর্মুদ্গৈস্তিলৈর্যবৈঃ।
শৃতশীতপয়ঃসেকঃ ফলপুষ্পসমৃদ্ধয়ে ॥ ১৬।

(১৮) অবিকাজশকৃচ্চূর্ণস্যাঢ়কে দ্বে তিলস্য চ।
সক্তুপ্রস্থো জলদ্রোণো গোমাংস-তুলয়া সহ ॥
সপ্তরাত্রোষিতৈরেতৈঃ সেকঃ কার্য্যো বনস্পতেঃ।
বল্লীগুল্মলতানাঞ্চ ফলপুষ্পায় সর্ব্বদা ॥

(১৯) মৎস্যাম্ভসা তু সেকেন বৃদ্ধির্ভবতি শাখিনাম্। ৪।৫৮

(২০) অরিষ্টাশোক-পুন্নাগশিরীষাঃ সপ্রিয়ঙ্গবঃ।
শিরীষোদুম্বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পারিজাতকমেব চ ॥
এতে বৃক্ষাঃ শুভা জ্ঞেয়াঃ প্রথমং তাংশ্চ রোপয়েৎ।
দেবালয়ে তথোদ্যানে গৃহেষূপবনেষু চ ॥

(২১) অথোদ্যানে প্রবক্ষ্যামি প্রশস্তান্ পাদপান্ দ্বিজ।
অরিষ্টাশোকপুন্নাগশিরীষাম্রপ্রিয়ঙ্গবঃ ॥
পনসংশোককদলী (!) জম্বুলকুচদাড়িমাঃ।
মাঙ্গল্যাঃ পূর্ব্বমারামে রোপণীয়া গৃহেষু বা ॥
কৃত্বা বহুত্বমেতেষাং রোপ্যাঃ সর্ব্বে হ্যনন্তরম্ ॥
২য় খণ্ড, ৩য় অঃ। ১০। ১২।

কদলী-জম্বু লকুচদাড়িমাঃ” এইরূপ পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। পনসাশনকদলী এইরূপ পাঠকল্পনাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কারণ অশন বৃক্ষ বর্জ্জনীয় শ্রেণীতে পঠিত হইয়াছে। পনসাশোক-রোহিণী এইরূপ পাঠ হইলে কথঞ্চিৎ অর্থসঙ্গত হইতে পারে। কটকীয় পর্য্যায়ে অশোকরোহিণী শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কতকগুলি বৃক্ষ উপবনাদিতে রোপণের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে; যথা—

“শাল্মলীং কোবিদারঞ্চ বর্জয়িত্বা বিভীতকম্।
অপনং দেবদারুঞ্চ পলাসং পুষ্করন্তথা॥”

শিমুল, রক্তকাঞ্চন, বহেড়া, পীতশাল, দেবদারু, পলাস ও পুষ্কর (সম্ভবতঃ পদ্ম অথবা স্থল পদ্ম) এই সকল বৃক্ষ বর্জ্জন করিয়া অন্য বৃক্ষ রোপণ করিবে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, দেবতার উদ্যানে কোন বৃক্ষই নিষিদ্ধ নহে; কিন্তু দেবোদ্যানেও বহুসংখ্যক মঙ্গল্য বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়। (২২) শুক্রনীতিসারে কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ এবং খদির প্রভৃতি কতকগুলি বৃক্ষ আরণ্যক অর্থাৎ বন্য বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং এই সকল বৃক্ষ বনে রোপণ করিবার উপদেশ আছে। খদিরাদিগণের মধ্যে খদির, অশ্মন্ত, শাক, অগ্নিমন্থ (গণিয়ারী), শ্যোনাক, বাবল, তমাল, শাল, কুটজ, ধব, অর্জ্জুন, পলাশ, ছাতিম, শমী, তুন্ন (নন্দীবৃক্ষ), দেবদারু, বিকঙ্কত, করমর্দ্দ, ইঙ্গুদী, ভূর্জ, বিষমুষ্টি, করীর (ধুস্তুর), শল্লকী (গজভক্ষ্য লতাবিশেষ), কাশ্মরী (গাম্ভারী), পাঠা (আকনাদি লতা), তিন্দুক (গাব), বীজসার, হরীতকী, ভল্লাত (ভেলা গোটা), শম্পাক (সোন্দাল), আকন্দ, পুষ্কর, অরিভেদ, পীতদ্রু (সরল বৃক্ষ), শিমুল, বহেড়া, নরবেল, মহাবৃক্ষ ও মধুক (যষ্টিমধু) প্রভৃতি অন্যান্য বৃক্ষও আরণ্যক শ্রেণীর অন্তর্গত। অন্যান্য আতান-প্রতানযুক্ত গুল্ম, লতা প্রভৃতি যাহা স্বভাবতঃ গ্রামে জন্মে তাহা গ্রাম্য, এবং যাহা বনে জন্মে তাহা বন্য। গ্রাম্যদিগকে গ্রামে এবং বন্য উদ্ভিদকে বনে যত্নতঃ রোপণ করিবে। (২৩) যুক্তিকল্পতরুতে বাস্তুর (বসতির) শুভাশুভকর কতিপয় বৃক্ষের উল্লেখ দেখা যায়, এবং দিক্‌বিশেষে রোপিত বৃক্ষের দ্বারাও শুভাশুভ বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, নিজের বাটীতে রোপিত বৃক্ষের দোষে বংশ ও সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বদিকে অশ্বত্থ বৃক্ষ, দক্ষিণদিকে প্লক্ষ অর্থাৎ পাকুড়, ঈশান কোণে রক্তবর্ণ পুষ্প বৃক্ষ ও অগ্নি কোণে ক্ষীরী বৃক্ষ বর্জ্জন করিবে। ভাবপ্রকাশে ন্যগ্রোধ (বট), যজ্ঞডুম্বর, অশ্বত্থ, পারীষ ও প্লক্ষ ক্ষীরী বৃক্ষ নামে অভিহিত হইয়াছে। *

বিল্ব, দাড়িম, কেশর (বকুল ও পুন্নাগ উভয় বৃক্ষই কেশর নামে অভিহিত হয়), পনস ও নারিকেল বৃক্ষ যে কোন স্থানে রোপিত হইয়াই মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। নিশা (হরিদ্রা), নীল, পলাশ, চিঞ্চা (তেতুল), শ্বেত অপরাজিতা ও কোবিদার, ইহারা সর্ব্বত্র স্থিত হইয়াই সমস্ত মঙ্গল বিনষ্ট করে, অর্থাৎ অমঙ্গলোৎপাদন করে। (২৪)

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে যে, উত্তরদিকে প্লক্ষ, পূর্ব্বদিকে বট, দক্ষিণদিকে উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর) এবং সৌম্যদিকে অশ্বত্থ বর্জ্জন করিবে। যদিও সৌম্য শব্দে অন্যত্র উত্তরদিক অভিহিত

---

(২২) ন বিবর্জ্যাস্তথা কশ্চিদ্দেবোদ্যানেষু জানতা।
তত্রাপি বহুতা কার্য্যা মাঙ্গল্যানাং দ্বিজোত্তম। ২।৩০।১৩

(২০) যে চ কণ্টকিনো বৃক্ষাঃ খদিরাদ্যাস্তথাপরে।
আরণ্যকাস্তে বিজ্ঞেয়াস্তেষাং তত্র নিয়োজনম্॥
খদিরাশ্মন্তশাকাগ্নিমন্থ-শ্যোনাক-বব্বুলা।
তমালশাল-কুটজ-ধবার্জুন-পলাসকাঃ॥
সপ্তপর্ণশমীতুন্নদেবদারুবিকঙ্কতাঃ।
করমর্দ্দেঙ্গুদীভূর্জবিষমুষ্টিকরীরকাঃ॥
শল্লকী কাশ্মরী পাঠা তিন্দুকো বীজসারকঃ॥
হরীতকী চ ভল্লাতঃ শম্পাকোঽর্কশ্চ পুষ্করঃ।
অরিভেদশ্চ পীতদ্রুঃ শাল্মলিশ্চ বিভীতকঃ॥
নরবেলো মহাবৃক্ষোঽপরে যে মধুকাদয়ঃ।
প্রতানবত্যঃস্তম্বিন্যো গুল্মিন্যশ্চ তথৈবচ॥
গ্রাম্যা গ্রামে বনে বন্যা নিয়োজ্যাস্তে প্রযত্নতঃ॥
৪।৪।৫৪-৫৯।

* ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থ-পারীষপ্লক্ষপাদপাঃ।
পঞ্চৈতে ক্ষীরিণোবৃক্ষাস্তেষাং ত্বক্ পঞ্চবল্কলম্॥

(২৪) স্ববাস্তুবৃক্ষতো দোষঃ কুলসম্পত্তিনাশনঃ।
বর্জয়েৎ পূর্ব্বতোঽশ্বত্থং প্লক্ষং দক্ষিণতস্তথা॥
ঐশান্যাং রক্তপুষ্পঞ্চ আগ্নেয্যাং ক্ষীরিণস্তথা॥
যত্র তত্র স্থিতা বৃক্ষা বিল্বদাড়িম-কেশরাঃ।
পনসা নারিকেলাশ্চ শুভং কুর্ব্বন্তি নিশ্চয়ম্॥
নিশানীলীপলাসশ্চ চিঞ্চা শ্বেতাপরাজিতা।
কোবিদারশ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বং নিঘ্নন্তি মঙ্গলম্॥

হয়, তথাপি এই স্থলে পশ্চিম দিকই তাৎপর্য্য-লক্ষ বলিয়া মনে হয়। এই সকল বৃক্ষই আবার যথাক্রমে দক্ষিণাদি দিকে স্থাপিত হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (২৫)

বাড়ীর সম্মুখ দিকে তেঁতুল বৃক্ষ এবং পশ্চাৎ দিকে তালবৃক্ষ রোপণ বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্রই অমঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হয়। এই বিষয়ে একটি উপকথা আছে যে, এক গৃহস্থের বাড়ীতে একটি দধিমুখ বিড়াল ছিল। দধিমুখ বিড়াল থাকিলে সর্ব্ববিষয়ে গৃহস্বামীর মঙ্গল হয়, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে; কিন্তু উক্ত গৃহস্থের বাড়ীতে রোগ-শোক নিয়ত লাগিয়াই থাকিত, সুতরাং অদৃষ্টের দোষখ্যাপন প্রসঙ্গে গৃহস্বামিনী অনেক সময়ই বলিতেন,—"হায়! আমার বাড়ীতে দধিমুখ বিড়াল আছে, তথাপি রোগজ্বালা দূর হয় না"। এই কথা শুনিতে শুনিতে বিড়াল একদিন বিরক্ত হইয়া বলিল, "নিজের দোষ কেহই দেখে না, আগে তেতুল পাছে তাল, কি করিবে দধিমুখ বিড়াল"। বলা বাহুল্য যে গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে তেতুল গাছ এবং পশ্চাতে তাল গাছ ছিল।

শুক্রনীতিসারে উদুম্বর, অশ্বত্থ, বট, চিঞ্চা, চন্দন, জম্বুল, কদম্ব, অশোক, বকুল, বিল্ব, অমৃত, কপিত্থক, রাজাদন, আম্র, পুন্নাগ, তুদকাষ্ঠ, অম্ল, চম্পক, নীপ, কোকাম্র, সরল, দাড়িম, অক্ষোট, ভিস্মট, শিংশপা, শিগ্রু, বদর, নিম্ব, জম্বীর, ক্ষীরিকা, খর্জ্জুর, দেবকরঞ্জ, ফল্গু, তাপিঞ্জ, সিম্মলা, কুদ্দাল, লবলী, ধাত্রী, ক্রমুক, মাতুলুঙ্গ, লকুচ, নারিকেল, রম্ভা এবং যে সকল বৃক্ষের উত্তম ফলপুষ্প হয়, সেই সকল বৃক্ষ গ্রামের সমীপে রোপণের উপদেশ আছে। (২৬)

দোহদ।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে নানা প্রকার বৃক্ষদোহদের পরিচয় পাওয়া যায়। দোহদ পদার্থ কি তাহা বুঝাইবার জন্য টীকাকার মল্লিনাথ একটি কারিকার উপন্যাস করিয়াছেন। উহার অর্থ হইতে জানা যায় যে, অকালে বৃক্ষ-গুল্ম-লতাদির পুষ্প প্রভৃতির জনক ব্যাপারের নাম দোহদ। (২৭) উক্ত দোহদের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদাধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে যে, অতঃপর বৃক্ষদিগের প্রধান দোহদ বলিব। এই প্রতিজ্ঞার পর বলা হইয়াছে যে, জলের মধ্যে খণ্ড খণ্ড মৎস্য রাখিয়া সিদ্ধ করিবে, অনন্তর সেই জল শীতল হইলে তদ্দারা আম্রবৃক্ষের ও দ্রাক্ষার সেক করিবে। পক্ক মৃত্তিকা অর্থাৎ পোড়া মাটি ও রক্ত দাড়িমের দোহদ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ভব্য নামক বৃক্ষে তুষ দেওয়া এবং বকুল বৃক্ষে মদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। কামিনীদিগের মুখস্থিত মদ্য বিশেষরূপে বকুলের হিতকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। পদ্মিনী কামিনীদিগের চরণস্পর্শ অশোক-বৃক্ষের পুষ্পজনক (মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে অশোকবৃক্ষে সনূপুর চরণস্পর্শের বর্ণনা দেখা যায়)। শৃগালমাংসের কাথজল নারঙ্গ ও অক্ষোট (আখরোট) বৃক্ষের হিতকর। যষ্টিমধুর জল বদর বৃক্ষের পক্ষে প্রশস্ত। গন্ধোদক অর্থাৎ চন্দনের জল ও গোমাংস কতকের (নির্ম্মলী ফলের গাছ) হিতকর। দুগ্ধমিশ্রিত জল সেচন করিলে সপ্তচ্ছদ (ছাতিম) বৃক্ষ সুন্দর হয়। পচা মাংস বসা ও মজ্জার সেক কুরবক-বৃক্ষের হিতকর। পচামাংস, ঘৃত ও পচা কার্পাস ফলের সেক অরিমেদ ও পাটল বৃক্ষের পক্ষে প্রশস্ত। বিল্ব ও কপিত্থ বৃক্ষে গুড়সংযুক্ত জলসেক কর্ত্তব্য। জাতি (জায়ফল) ও মল্লিকা এই উভয়জাতীয় উদ্ভিদে গন্ধোদক অর্থাৎ সারচন্দন মিশ্রিত জলসেক অত্যন্ত হিতকর। কুরজ শ্রেণীর বৃক্ষের পক্ষে কূর্ম্ম মাংসের প্রয়োগ প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

খেজুর নারিকেল বাঁশ ও কদলীর পক্ষে

---

(২৫) উত্তরেণ শুভঃ প্লক্ষো বটঃ প্রাগ্‌ভার্গবোত্তম।
উদুম্বরশ্চ যাম্যেন সৌম্যেনাশ্বত্থ এবচ॥
এতে ক্রমেণ নেষ্যন্তে দক্ষিণাদিসমুদ্ভবাঃ॥ ২।৩০।১-২।

(২৬) উদুম্বরাশ্বত্থবট-চিঞ্চা-চন্দন-জম্বুলাঃ।
কদম্বাশোকবকুল-বিল্বামৃতকপিত্থকাঃ॥
রাজাদনাম্রপুন্নাগ-তুদকাষ্ঠাম্লচম্পকাঃ।
নীপ-কোকাম্র-সরল-দাড়িমাক্ষোট-ভিস্মটাঃ॥
শিংশপাশিগ্রু-বদর-নিম্বজম্বীর-ক্ষীরিকাঃ।
খর্জ্জুরদেবকরঞ্জা-ফল্গুতাপিঞ্জসিম্মলাঃ॥
কুদ্দালো লবলী ধাত্রী ক্রমুকো মাতুলুঙ্গকঃ।
লকুচা নারিকেলশ্চ রম্ভান্যে সৎফলা ক্রমাঃ।
সুপুষ্পাশ্চৈব যে বৃক্ষা গ্রামাভ্যর্ণে নিয়োজয়েৎ॥৪।৪।৩৬-৪১

(২৭) তরুগুল্মলতাদীনামকালে কুশলৈঃ কৃতম্।
পুষ্পাদ্যুৎপাদকং দ্রব্যং দোহদং স্যাত্তু তৎক্রিয়া॥

লবণযুক্ত জলসেক বৃদ্ধিকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বিড়ঙ্গ ও তণ্ডুলসংযুক্ত মৎস্যমাংস সকল বৃক্ষেরই দোহদরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, এই প্রকার দোহদ প্রয়োগ করিলে বৃক্ষসকল মনোহর পত্র-পুষ্প-সমন্বিত, সুগন্ধযুক্ত, ব্যাধিরহিত, সুরম্য, দীর্ঘজীবী ও সুস্বাদ ফলযুক্ত হয়। (২৮)

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দাড়িমের যে দোহদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, নৈষধ কাব্যে তাহা হইতে অন্যরূপ বস্তুরও পরিচয় পাওয়া যায়। নলরাজ তাঁহার বিলাস-কাননে প্রবিষ্ট হইয়া দাড়িমবৃক্ষে ধূমদোহদ দর্শন করিয়াছিলেন। (২৯)

বীজভাবনা।

বীজভাবনা প্রণালীর বিষয় পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে; এতৎসম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যকতা পুনরায় অনুভূত হইতেছে। কারণ, ঋষিযুগে আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠার দিনে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতিরও কতটা উন্নতি হইয়াছিল, বীজভাবনার প্রতি লক্ষ্য করিলে তদ্বিষয়ে অনেক সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পাঠে জানা যায় যে, কোন পুষ্পের বীজ রঙ্গজলে অর্থাৎ হরিদ্রা, নীল ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি বিবিধ রংএর জলে ভিজাইয়া রোপণ করিলে এবং তাহাতে রঙ্গজল সেচন করিলে সেই বৃক্ষ হইতে তত্তৎ রংএর ফুল হইয়া থাকে। (৩০)

প্রসিদ্ধ দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র যোগভাষ্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, মধুররসের দ্বারা ভাবিত আম্রবীজ প্রভৃতির পরম্পরা সম্বন্ধে নিয়তই ফলের মাধুর্য্য দেখা যায়। অর্থাৎ ইক্ষুরস মধু প্রভৃতি তরল মিষ্টদ্রব্যের দ্বারা আম্র প্রভৃতির বীজে ভাবনা দিয়া গাছ করিলে সেই গাছের ফল মিষ্টই হইয়া থাকে।

বাচস্পতির পংক্তির তাৎপর্য্যবর্ণনাবসরে টিপ্পনীকার উদাসীন বালরাম প্রাচীন কারিকার দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, বাচস্পতি মিশ্রের আদি-শব্দ প্রয়োগে লাক্ষারসাবসিক্ত কার্পাস বীজ বীজপূর বীজ প্রভৃতির অঙ্কুরাদিপরম্পরায় কার্পাসাদিতে রক্তিম গুণ প্রভৃতি সূচিত হইয়াছে। অর্থাৎ লাক্ষারস-সিক্ত কার্পাস বীজ বীজপূর বীজ প্রভৃতি হইতে রক্তফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, বীজে লাক্ষাদি রস সেচনের দ্বারা তাহাতে কোন একটী শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে, যাহার ফলে ফলগত রক্ততা প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। (৩১)

বৈয়াসিক-ন্যায়মালা।

(অথ প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ)

(শ্রীসুরেশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ
ও
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

(প্রথমে ব্রহ্মণ এব মনোময়ত্বাদ্যধিকরণে সূত্রাণি ॥)

---

(২৮) ততঃ প্রধানতো বক্ষ্যে দ্রুমাণাং দোহদান্যহম্।
মৎস্যোদকেন শীতেন চাম্রাণাং সেক ইষ্যতে ॥
মৃদ্বীকানাং তথাকাষাণ্ডেনৈব রিপুসূদন।
পক্কাসৃগ্রুধিরৈশ্চৈব (পক্কামৃক্রুধিরৈশ্চৈব) দাড়িমানাং প্রশস্যতে ॥
তুষং দেয়ঞ্চ ভব্যানাং মদাঞ্চ বকুলদ্রুমে।
বিশেষাৎ কামিনী-বক্ত্র-সংসর্গাত্ গুণং চ যৎ (?) ॥
প্রশস্তং চাপ্যশোকানাং কামিনীপাদতাড়নম্।
শৃগালমাংসতোয়ঞ্চ নারঙ্গাক্ষোট:য়োর্হিতম্ ॥
মধুযষ্ট্যুদকং চৈব বদরাণাং প্রশস্যতে।
গন্ধোদকঞ্চ গোমাংসং কতকানাং প্রশস্যতে ॥
ক্ষীরসেকেন ভবতি সপ্তপর্ণো মনোহরঃ।
মাংসপূতো (পূতি) বসামজ্জাসেকঃ কুরবকে হিতঃ ॥
পূতিমৎস্যাম্বুতঃ পূতি-কার্পাসফলমেব চ।
অরিমেদস্য সেকোঽয়ং পাটলেষু চ শস্যতে ॥
কপিত্থবিল্বয়োঃ সেকং গুড়তোয়েন কারয়েৎ।
জাতীনাং মল্লিকায়াশ্চ গন্ধতোয়ং পরং হিতম্ ॥
তথা কুব্জকজাতীনাং কূর্ম্মমাংসং প্রশস্যতে।
খর্জ্জুরনারিকেলাণাং বংশস্য কদলস্য চ ॥
লবণেন সতোয়েন সেকো বৃদ্ধিকরঃ স্মৃতঃ।
বিড়ঙ্গতণ্ডুলোপেতং মৎস্য-মাংসং ভৃগূত্তম ॥
সর্ব্বেষামবিশেষেণ দোহদং পরিকল্পয়েৎ।
এবঙ্কৃতে চারুপলাশপুষ্পাঃ
সুগন্ধিনো ব্যাধিবিবর্জ্জিতাশ্চ।
ভবন্তি নিত্যং তরবঃ সুরম্যা-
শ্চিরায়ুষঃ সাধুফলান্বিতাশ্চ ॥
২য় খং। ৩০ অ। ২৩-৩৩।

(২৯) ফলানি ধূমস্য ধয়ানধোমুখান্ সদাড়িমে দোহদধূপিনি দ্রুমে।
নৈষধ কাব্য। ১।৮২।

(৩০) রঙ্গতোয়োষিতং বীজং রঙ্গতোয়াভিষেচিতম্।
তদ্রঙ্গপুষ্পং ভবতি যৌবনে নাত্র সংশয়ঃ ॥

(৩১) মধুররসভাবিতানাং চাম্রবীজাদীনাং পরম্পরয়া ফলমাধুর্য্যনিয়মাৎ। (পাতঞ্জল দর্শন ১ পা—৩১ সূ, বাচস্পতিমিশ্র টীং আম্রবীজাদীনামিত্যাদিপদেন যথা লাক্ষারসাবসিক্তানাং কার্পাসবীজবীজপূরাদীনামঙ্কুরাদিপারম্পর্য্যেণ কার্পাসাদৌ রক্তিমনিয়ম ইতি গ্রাহ্যং। তথোক্তং :—
"যস্মিন্নেব হি সন্তান আহিতা কর্ম্মবাসনা।
ফলং তত্রৈব বধ্নাতি কার্পাসে রক্ততা যথা ॥
কুসুমে বীজপূরাদের্যল্লাক্ষাদ্যবসিচ্যতে।
শক্তিরাধীয়তে তত্র কাচিত্তাং কিং ন পশ্যসি ॥"

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১ ॥ বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ২ ॥ অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥ কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥ শব্দবিশেষাৎ ॥ ৫ ॥ স্মৃতেশ্চ ॥ ৬ ॥ অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ ॥ ৭ ॥ সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয়পাদস্য প্রথমাধিকরণমারচয়তি—

মনোময়োঽয়ং শারীর ঈশো বা প্রাণমানসে ॥
হৃদয়স্থিত্যণীয়স্ত্বে জীবে স্যুস্তেন জীবগাঃ ॥ ১ ॥
শমবাক্যগতং ব্রহ্ম তদ্ধিতাদিরপেক্ষতে ॥
প্রাণাদিযোগশ্চিন্তার্থশ্চিন্ত্যং ব্রহ্ম প্রসিদ্ধিতঃ ॥ ২ ॥

ছান্দোগ্যস্য তৃতীয়েঽধ্যায়ে শাণ্ডিল্যবিদ্যায়ামিদমাম্নায়তে—"মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ" ইতি। তত্র 'জীবঃ ঈশো বা' ইতি সন্দেহঃ। 'জীবঃ' ইতি তাবৎ প্রাপ্তং। মনঃসম্বন্ধাদীনাং জীবে সুসম্পাদত্বাৎ। 'মনসো বিকারো মনোময়ঃ' ইতি মনঃসম্বন্ধঃ। 'প্রাণঃ শরীরমস্য' ইতি প্রাণসম্বন্ধঃ। নচেদং দ্বয়মীশ্বরে সুসম্পাদং। "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" ইতি নিষেধাৎ। তথা "এষ ম আত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্" ইতি শ্রূয়মাণং হৃদয়েঽবস্থানং, অণীয়স্ত্বং চ নিরাধারস্য সর্বগতস্য ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে। তস্মাৎ জীবঃ। ইতি প্রাপ্তে—

ব্রূমঃ—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি শান্ত উপাসীত" ইত্যেতস্মিন্ শমবিধিপরে পূর্ববাক্যে শ্রূয়মাণং যদ্ব্রহ্ম, তদেব 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ' ইত্যেতাভ্যাং তদ্ধিতবহুব্রীহিভ্যাং বিশেষ্যত্বেনাপেক্ষ্যতে। শমবাক্যস্যায়মর্থঃ—'যস্মাৎ সর্বমিদং ব্রহ্ম তজ্জত্বাৎ, তল্লত্বাৎ, তদংত্বাচ্চ তস্মাৎ সর্বাত্মকে ব্রহ্মণি রাগদ্বেষবিষয়াসম্ভবাদুপাস্তিকালে শান্তো ভবেৎ' ইতি। এতদ্বাক্যগতে ব্রহ্মণি বিশেষ্যত্বেনান্বিতে মনোময়বাক্যমপি ব্রহ্মপরং ভবিষ্যতি। ন চ—ব্রহ্মণো মনঃপ্রাণসম্বন্ধাদ্যনুপপত্তিঃ, নিরুপাধিকে তদনুপপত্তাবপি সোপাধিকস্যোপাস্যস্য চিন্তনার্থতয়া তদুপপত্তেঃ। তস্মাৎ সর্বেষ্বপি বেদান্তবাক্যেষু যদ্ব্রহ্মোপাস্যত্বেন প্রসিদ্ধং। তদেবাত্রাপ্যুপাস্যং। ন হি কচিদপি বেদান্তে জীবস্যোপাস্যত্বং প্রসিদ্ধং। ততো 'ব্রহ্মৈব' ইতি সিদ্ধান্তঃ ॥

অনন্তর প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ।

(ব্রহ্মেরই মনোময়ত্বাদি প্রথম অধিকরণে সূত্রসমূহ [উক্ত হইতেছে] ॥)

সূত্রের অর্থ। সকল স্থলে প্রসিদ্ধের উপদেশ হেতু। ১। বিবক্ষিত গুণসমূহের সঙ্গতিহেতু। ২। কিন্তু (উক্ত গুণসমূহের) অসঙ্গতি হেতু শারীর (জীব) নহে।৩। কর্ম্ম ও কর্ত্তার উল্লেখ হেতুও।৪। শব্দের বিশেষ হেতু। ৫। স্মৃতি হেতুও। ৬। স্বল্পস্থানে বাসহেতু এবং তাহার উল্লেখ হেতু (ব্রহ্ম) নহে যদি বল, তাহা নহে, এই প্রকারে উপাস্যত্ব হেতু এবং ব্যোমের ন্যায়। ৭। সম্ভোগপ্রাপ্তি যদি বল, তাহা নহে, বিশেষত্ব হেতু। ৮ ॥

দ্বিতীয়পাদের প্রথম অধিকরণ রচিত হইতেছে—

শ্লোকের অর্থ। এই মনোময় (পুরুষ) জীব অথবা ঈশ্বর ? প্রাণ, মন, হৃদয়ে অবস্থিতি (এবং) অণীয় (বা ক্ষুদ্র) ভাব জীবেতেই সম্ভব, অতএব সেগুলি জীবের পক্ষেই প্রযুক্ত হইয়াছে। তদ্ধিত প্রভৃতি শম (বিধি-) বাক্যসূচিত ব্রহ্মকে অপেক্ষা করে। প্রাণ প্রভৃতির সংযোগ চিন্তার (উপাসনার) প্রয়োজনহেতুক। প্রসিদ্ধিহেতু ব্রহ্ম চিন্তনীয় (বা উপাস্য)।

টীকার অর্থ। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে শাণ্ডিল্যবিদ্যায় উক্ত হইয়াছে—"মনোময়, প্রাণশরীর, ভারূপ"। এস্থলে জীব অথবা ঈশ্বর (উদ্দিষ্ট), ইহাই হইল সন্দেহ। 'জীব'ই পাওয়া যায়। কারণ মনের সম্বন্ধ প্রভৃতি জীবে সুসঙ্গত হয়। 'মনের বিকার মনোময়' ইহাই হইল মনের সম্বন্ধ। 'প্রাণ ইহাঁর শরীর' ইহাতেই প্রাণের সম্বন্ধ। এবং এই দুইটী ঈশ্বরে সুসঙ্গত হয় না। "প্রাণবিহীন, মনবিহীন, শুভ্র" এই নিষেধ হেতু। সেইরূপ "এই আমার আত্মা হৃদয়ের অন্তরে (স্থিতি করিতেছেন), ইনি ক্ষুদ্র" এই প্রকারে শ্রুত হৃদয়ে অবস্থান এবং ক্ষুদ্রত্ব নিরাধার সর্ব্বগত (ব্রহ্মের) সম্বন্ধে কোনপ্রকারে সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব জীবই (উদ্দিষ্ট)। এখন—

বলিতেছি—"এই সমস্তই ব্রহ্ম, কারণ তাঁহা হইতেই এই সমস্ত উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই লীন হয়, এবং তাঁহাতেই স্থিতি করে—এইভাবে শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে" শমবিধিবিষয়ক এই পূর্ব্ববাক্যে

শ্রুত যে ব্রহ্ম, তিনিই তদ্ধিত ও বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা সিদ্ধ 'মনোময়' এবং 'প্রাণশরীর' এই দুইটী শব্দের বিশেষ্যরূপে উদ্দিষ্ট হইতেছেন। শমবাক্যের এই অর্থ—'যেহেতু এই সমস্তই ব্রহ্ম,—কারণ তাঁহা হইতেই (এই সমস্ত) উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই লীন হয় এবং তাঁহা দ্বারা জীবিত রহে,—সেই হেতু সকলের আত্মাস্বরূপ ব্রহ্মেতে রাগ ও দ্বেষের বিষয় থাকা অসম্ভব, অতএব উপাসনাকালে শান্ত হইবে।' এই বাক্যের অন্তর্গত ব্রহ্ম শব্দ বিশেষ্যরূপে উদ্দিষ্ট হইলে 'মনোময়' এই বাক্যও ব্রহ্মেতে প্রযুক্ত হইবে। ব্রহ্মের প্রতি মন প্রাণ প্রভৃতির সম্বন্ধের (উল্লেখ) অসঙ্গত নহে, কারণ উপাধিরহিত (ব্রহ্মে) উহার অসঙ্গতি হইলেও উপাধিবিশিষ্ট উপাস্য (ব্রহ্মের) চিন্তা (বা উপাসনা) করিবার জন্য উহার সঙ্গতি আছে। অতএব সমস্ত বেদান্তবাক্যেই যে ব্রহ্ম উপাস্যরূপে প্রসিদ্ধ, এস্থলেও তিনিই উপাস্য। বেদান্তের কোথায়ও জীব উপাস্য বলিয়া প্রসিদ্ধ নাই। অতএব ব্রহ্মই (উদ্দিষ্ট), ইহাই সিদ্ধান্ত॥

তাৎপর্য্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মোপাসনাবিষয়ক এক সন্দর্ভ আছে, তাহার নাম শাণ্ডিল্যবিদ্যা। এই বিদ্যা বা উপাসনা শাণ্ডিল্য ঋষি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম শাণ্ডিল্যবিদ্যা। এই শাণ্ডিল্যবিদ্যা বা ব্রহ্মোপাসনা সন্দর্ভে এই একটী বিধান আছে যে. মনুষ্য 'মনোময় প্রাণশরীর ও ভারূপ এইভাবে ধ্যান করিবে।' এইস্থলে 'মনোময়' 'প্রাণশরীর' ও 'ভারূপ' শব্দগুলি হইল বিশেষণ। এই বিশেষণগুলির বিশেষ্য কে, অর্থাৎ মনোময় প্রভৃতিরূপে কাহার ধ্যান করিতে হইবে? সংশয় আসিল যে, তিনি জীব অথবা ব্রহ্ম; কারণ উভয়েই চেতন, এবং মনোময়, প্রাণশরীর ও ভারূপ এই বিশেষণগুলি কেবল চেতনের পক্ষেই সঙ্গত হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষের মতে জীবই এইরূপে ধ্যেয়। তাঁহার এরূপ বলিবার যুক্তি এই যে, মন, প্রাণ ও ভা অর্থাৎ দীপ্তি দেহধারী জীবেরই থাকা সম্ভব, ব্রহ্মের থাকা সম্ভব নহে, কারণ শ্রুতিতে আছে যে, ব্রহ্ম "প্রাণবিহীন, মনবিহীন এবং শুভ্র বা নিষ্কলঙ্ক।" আবার, এই শাণ্ডিল্যবিদ্যারই এক স্থলে বলা হইয়াছে যে, "এই আত্মা আমার হৃদয়ের অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং ব্রীহি প্রভৃতি হইতেও সূক্ষ্মতর"। এখন, পূর্ব্বপক্ষ এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যে ব্রহ্ম নিরাধার, যাঁহার কোনই আধার নাই বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে আবার হৃদয়রূপ আধারে অবস্থিতি সম্ভব হইবে কিরূপে? আর, যে ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী অর্থাৎ যিনি এত বৃহৎ যে এই ব্রহ্মাণ্ড চরাচরের সকল স্থানই ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, তিনি আবার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অতি সূক্ষ্মই বা হইবেন কিরূপে? এই সকল যুক্তিমূলে পূর্ব্বপক্ষের মতে "মনোময়" প্রভৃতি বিশেষণ "জীব"কেই উদ্দেশ করিয়া উক্ত হইয়াছে।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন—উপরে যে "মনোময়, প্রাণশরীর" প্রভৃতি শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে তাহারই পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতিতেই আছে যে, "এই সমস্তই ব্রহ্ম" কারণ "তজ্জলান্" অর্থাৎ তাঁহা (ব্রহ্ম) হইতে এই সমস্তই জাত বা উৎপন্ন (=তজ্জ); তাঁহাতেই সকলই লয় প্রাপ্ত হয় (=তল্ল) এবং তাঁহা দ্বারাই সমুদয় অনিত বা জীবিত রহিয়াছে (=তদন্ অর্থাৎ তৎ=ব্রহ্ম+জ+ল+অন্=তজ্জলান্); "অতএব (সেই ব্রহ্মকে) শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে"। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, "মনোময়, প্রাণশরীর" প্রভৃতি শ্রুতিতে যে কয়টী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সব কয়টীই বিশেষণ; সে গুলির মধ্যে বিশেষ্য পদ একটীও নাই। কিন্তু বিশেষণ থাকিলেই তাহার একটী না-একটী বিশেষ্য চাই-ই। পূর্ব্বপক্ষ এই বিশেষণগুলির একটী নূতন বিশেষ্য কল্পনা করিয়া লইলেন 'জীব'। সিদ্ধান্তপক্ষের মনের কথা কিন্তু এই যে, যখন পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রুতি হইতে ব্রহ্মশব্দটীকে এখানে বিশেষ্যরূপে পাওয়া যাইতেছে, তখন নূতন কোন বিশেষ্য কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। এখন দেখিতে হইবে যে ব্রহ্মরূপ বিশেষ্যের সহিত মনোময়াদি শ্রুত্যুক্ত বিশেষণগুলির অন্বয় সুসঙ্গত হয় কি না। উক্ত শ্রুত্যুক্ত বিশেষণগুলির মধ্যে প্রথম দুইটী পদ অর্থাৎ 'মনোময়' ও 'প্রাণশরীর' এই দুইটী ব্যতীত অন্য যে কয়টী পদ আছে, ব্রহ্মের প্রতি সেগুলির প্রয়োগ যে সুসঙ্গত হইতে পারে,

তাহা পূর্ব্বপক্ষ স্বীকার করেন। কেবল ঐ প্রথম দুইটী বিশেষণই ব্রহ্মের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে কি না পূর্ব্বপক্ষ সন্দেহ করেন; কারণ, ঐ দুইটী পদের একটীতে 'মন' এবং অপরটীতে 'প্রাণ' এই দুইটী শব্দ বিশেষণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে; এবং মন ও প্রাণ উভয়ই দেহধারী জীবেরই থাকা সম্ভব, সুতরাং ব্রহ্মের প্রতি প্রযুজ্য নহে। তাই এখন সিদ্ধান্তপক্ষের দেখাইবার চেষ্টা হইবে এই যে, ঐ দুইটী বিশেষণ ব্রহ্মের প্রতি প্রয়োগ করিলেও অসঙ্গত হয় না। উপরোক্ত শ্রুতিতে পাওয়া গিয়াছে—"শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে"। এখন কাহার উপাসনা করিতে হইবে? জীবের উপাসনা করা সম্ভব নহে, কারণ সমস্ত বেদান্তের কোথাও জীবের উপাসনার বিধি প্রদত্ত হয় নাই, ব্রহ্মেরই উপাসনার বিধি আছে। আবার, নির্গুণ বা নিরুপাধি ব্রহ্মের উপাসনাও যে হইতে পারে না, তাহা সমস্ত উপনিষদের সিদ্ধান্ত এবং পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ উভয়েরই তাহা স্বীকৃত। কাজেই উপাসনা করিবার বিধি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে ব্রহ্মেরই উপাসনা করিতে হইবে এবং সগুণ বা সোপাধিক ব্রহ্মেরই উপাসনা করিতে হইবে; কারণ সগুণ ব্রহ্মই উপাস্য হইতে পারেন। সিদ্ধান্তপক্ষের মতে উপাসনার সুবিধার জন্য ব্রহ্মকে সগুণরূপে ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে 'মনোময়' অর্থাৎ মনরূপ উপাধিবিশিষ্ট এবং 'প্রাণশরীর' অর্থাৎ প্রাণরূপ উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া বলা হইয়াছে এবং ঐরূপ বলিলে কোন দোষ বা অসঙ্গতি আসে না। যখন ব্রহ্মের প্রতি ঐ দুই শব্দের প্রয়োগে কোনই অসঙ্গতি আসিল না, তখন সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, সমস্ত বেদান্তে যে ব্রহ্মকে উপাস্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মকে ছাড়িয়া অপর কোন কিছুর বিশেষণরূপে ঐ দুইটী শব্দ ধরা উচিত নহে। কাজেই বলিতে হয় যে ব্রহ্মেরই উদ্দেশে মনোময়, প্রাণশরীর ভারূপ প্রভৃতি বলা হইয়াছে।

"মনোময়াদি" শ্রুতিতে অন্যান্য যে সকল গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেগুলিও ব্রহ্মের প্রতি প্রযুক্ত ধরা হইলে অসঙ্গত হইবে না, সুসঙ্গতই হইবে। বরঞ্চ সেগুলি জীবের প্রতি প্রয়োগ করিলে অসঙ্গতিদোষ আসিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপে "সত্যসঙ্কল্প" শব্দটী ধরা যাউক। এই বিশেষণটীর অর্থ হইতেছে যাহার সঙ্কল্প বা ইচ্ছা সত্য বা অমোঘ অর্থাৎ নিষ্ফল নহে। এই গুণ জীবের থাকা সম্ভব নহে, কারণ আমরা অনেকস্থলে জীবের ইচ্ছা নিষ্ফল হইতে দেখি। কাজেই সত্যসঙ্কল্প শব্দকে জীবের বিশেষণরূপে ধরা চলে না।

সিদ্ধান্তপক্ষ তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থনে আরও কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। তন্মধ্যে একটী যুক্তি এই—শাণ্ডিল্যবিদ্যার শেষ অংশে একটী শ্রুতি আছে (এতম্ ইতঃ প্রেত্য অভিসম্ভবিতা অস্মি); তাহার অর্থ এই যে, এলোক হইতে প্রস্থান করিয়া (আমি) এই (আত্মাকে) প্রাপ্ত হইব। এস্থলে "প্রাপ্ত হইব" বলাতে "আমি" বা উপাসক জীব-রূপ কর্ত্তা উহ্য আছে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অথচ "এতং" অর্থাৎ এই "উপাস্য আত্মাকে" এই কর্ম্মেরও উল্লেখ আছে। ইহা সর্ব্ববাদসম্মত যে কর্ম্ম কখনও কর্ত্তা হইতে পারে না, অথবা কর্ত্তা কর্ম্ম হইতে পারে না। কাজেই এখানে কর্ত্তা যখন হইল জীব, তখন সেই জীবের লাভ করিবার বিষয় বা উপরোক্ত ক্রিয়ার কর্ম্মও জীব হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মকেই জীবের প্রাপ্তব্য বিষয় বা উপাস্য বলিয়া মানিতে হয়। উপরোক্ত শ্রুতিতে যে "এতং" বা "ইহাকে" বলা হইয়াছে, তাহা "মনোময়, প্রাণশরীর, ভারূপ" প্রভৃতি শব্দোদ্দিষ্ট উপাস্য বিষয়কেই উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে। সুতরাং "মনোময়" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা যে ব্রহ্মই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহাই উপরোক্ত শ্রুতির দ্বারা সমর্থিত হইতেছে।

সিদ্ধান্তপক্ষের সমর্থক আর একটী যুক্তি এই—উপরোক্ত শ্রুতির সজাতীয় আর একটী শ্রুতি শতপথব্রাহ্মণে আছে—"ব্রীহির্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাকতণ্ডুলো বা এবম্ অয়ম্ অন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্ময়ঃ" অর্থাৎ "আত্মার অন্তরে ব্রীহি প্রভৃতির ন্যায় হিরণ্ময় পুরুষ (অবস্থিতি করিতেছেন)। এস্থলে "অন্তরাত্মন্" শব্দ সপ্তমী বিভক্তিবিশিষ্ট এবং "পুরুষঃ" প্রথমা বিভক্তিবিশিষ্ট—উভয়ের দুইটী বিভিন্ন কারক বুঝা যাইতেছে—একটী অধিকরণ এবং অপরটী কর্ত্তা।

কর্ত্তা কখনও অধিকরণ হইতে পারে না। সুতরাং এই শ্রুতির "হিরণ্ময় পুরুষ" এবং "অন্তরাত্মন্" শব্দোপলক্ষিত আত্মা বিভিন্ন স্বীকার করিতেই হয়। ইতিপূর্ব্বে প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম অধিকরণে "হিরণ্ময় পুরুষ" যে ব্রহ্মেরই বাচক তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই "অন্তরাত্মন্" শব্দের আত্মা অর্থে যে জীবই বুঝাইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। পূর্ব্বপক্ষ সংশয় তুলিয়াছিলেন যে; "এই ক্ষুদ্র আত্মা আমার হৃদয়ের অন্তরে" এই শ্রুতিতে সর্ব্বগত ব্রহ্মের ক্ষুদ্র হওয়া অথবা জীবাত্মার অন্তরে ক্ষুদ্ররূপে অবস্থিতি সম্ভব নহে। সিদ্ধান্তপক্ষ সোপাধিক ব্রহ্মের পক্ষে উহা সম্ভব বলিয়া উপরোক্ত আলোচ্য শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের জীবাত্মার অন্তরে অবস্থিতি শ্রুতির বিবক্ষিত দেখাইয়া নিজমত সমর্থন করিলেন।

সিদ্ধান্তপক্ষের অপর একটী যুক্তি এই যে, গীতারূপ স্মৃতিতে আছে "ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে স্থিতি করিতেছেন।" (শ্রুতি ব্যতীত আর সকল শাস্ত্রকেই মোটামুটি হিসাবে স্মৃতি বলা যায়, তাই এখানে সূত্রোক্ত 'স্মৃতি'শব্দে গীতাকে ধরিতে কোন বাধা হইল না।) এইস্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, ঈশ্বর ও জীবের ভেদ করা হইয়াছে। অথচ এই স্মৃতি-উক্ত বাক্য উপরোক্ত "এই ক্ষুদ্র আত্মা আমার হৃদয়ে" এই শ্রুতিকেই অনুসরণ করিয়া উক্ত হইয়াছে। কাজেই মানিতে হয় যে, উক্ত শ্রুতির "আত্মা" শব্দে ব্রহ্মই বুঝাইতেছে এবং "আমার" অর্থে "জীবেরই" বুঝাইতেছে।

"এই ক্ষুদ্র আত্মা আমার হৃদয়ের অন্তরে" এই শ্রুতিতে "এই আত্মা হৃদয়রূপ ক্ষুদ্র স্থানে অবস্থিত" এবং স্পষ্টরূপে "এই আত্মা ক্ষুদ্র" বলিবার কারণে যদি "এই আত্মা" অর্থে পরমাত্মা ধরা না যায়, তবে তাহা অসঙ্গত হইবে। বস্তুতঃ পরমাত্মা ভূমা ও সর্ব্বগত হইলেও উপাস্য হিসাবে তাঁহাকে ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রস্থানে অবস্থিত বলা হইয়াছে। আকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বোধগম্য হইবে—আকাশ এক ও বৃহৎ হইলেও বুঝিবার সুবিধার জন্য ঘটাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে উহাকে ক্ষুদ্ররূপে বিভক্ত করিয়া ধরা হয়।

আর যদি বল যে, হৃদয়ের অন্তরে জীবাত্মা থাকিয়া যখন কর্ম্মফল ভোগ করে, তখন ব্রহ্মও হৃদয়ের অন্তরে থাকিয়া কর্ম্মফল ভোগ না করিবেন কেন? সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, এই কথা কোন কাজেরই কথা নহে, কারণ ইহা তো সর্ব্ববাদসম্মত যে ব্রহ্ম যেখানে এবং যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তিনি কখনই কর্ম্মফলের ভোক্তা নহেন। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব।

মাতৃহারা।

(শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ)

প্রাণ আমার তোমারই তরে
কেঁদে কেঁদে হ'ল সারা,—
আমি দেখি নাই ত কোন কালে
মা হয় এমন সৃষ্টি-ছাড়া।
সন্তান কাঁদিলে পরে,
আর সব কাজ থাকে প'ড়ে।
তুলে ল'ন মা বক্ষ'পরে,
এইত জানি মায়ের ধারা।
তুমি গো মা কেমন ধারা।
বেড়াও সদাই বিশ্ব সারা,
আমি কেঁদে কেঁদে সারা,
পাই না তবু তোমার সাড়া।
যদি দেখা নাহি দাও,
যদি ফিরে নাহি চাও,
আমার কথা শুনে নাও,
আমি কাঁদব না আর পাগল-পারা॥

"সমাজের একটা দিক"।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ সান্যাল)

সেদিন প্রবাসীতে শাস্তিপ্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা দেখছিলুম, স্তম্ভিত হয়ে গেছি,—দেখলুম বিধবাদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী। কত বড় লজ্জা ও দুঃখের কথা!

আমরা আজ রাষ্ট্রীয় অধিকার দাবী করতে খুব বড় গলায় চীৎকার করছি; কিন্তু এই কথাটা একবারও মনে হল না মায়ের জাতকে এমনি ভাবে কলঙ্কের নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়ে কোন জাতিই

কোনদিন পৃথিবীর ইতিহাসে বড় হতে পারে নাই। এখনও সংশোধনের উপায় আছে; ঘুমের ঘোর কাটবে কি ?

আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নাই, সমাজে লোকাচার ও তথাকথিত ধর্ম্মের নাম দিয়ে অনেক আবর্জ্জনা আমরা জমিয়ে তুলেছি। অতীত বিধি-নিষেধের উপর শ্রদ্ধা থাকা হয়ত ভাল, কিন্তু সেটা অন্ধ হলে কপালে কুফলটাই এসে হাজির হয়। মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকতে হলে যেমন বাহির থেকে অনেক জিনিষই গ্রহণ করতে হয়, একটা সমাজেরও ঠিক তাই। তাকে বিধি-নিষেধের গণ্ডী টেনে সময়ের গতি থেকে পৃথক করে রাখলে তা যে ক্রমে শক্তি হারিয়ে অক্ষম হয়ে উঠে, তা সকলেই জানেন; কেননা নূতন নূতন উপাদান দিয়ে নিজেকে আরও বেশী সবল ও সুন্দর করে তুলতে পারে শুধু তারাই, যাদের প্রাণের একটা দুর্দ্দমনীয় বেগ আছে। সমাজের সমস্ত দরজায় কুলুপ লাগিয়ে বাহিরের পরিবর্ত্তনশীল জগত থেকে সরে থেকে আমরা কি হয়েছি, ভাল করে বিবেচনা করা দরকার।

এখানে আমি বিধবা-বিবাহের ভাল-মন্দের বিচার করতে চাই না। বিদ্যাসাগর মহাশয় থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত অনেকেই অনেক রকম করে এর সূক্ষ্ম বিচার করে গেছেন। এইটাই শুধু জিজ্ঞাস্য যে, এই কলঙ্কিত অপমানিত জীবন থেকে দেশের জননীদের বাঁচাবার কি কোনই উপায় নাই? তাদের অভাবক্লিষ্ট মুখে আবার কি আনন্দের হাসি ফিরিয়ে আনা যায় না? এমন কোন ব্যবস্থা কি হতে পারে না, যাতে আত্মসম্মান বজায় রেখে সত্য পথে থেকে তারা নিজেদের শেষ কয়টা দিন কাটিয়ে দিতে পারে ?

আজ যতই কেন বড় বড় কথা দিয়ে, শাস্ত্রের নজীর দেখিয়ে বৈধব্য-জীবনকে সুখী ও গৌরবান্বিত বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করি না, সরকারী রিপোর্টের সাক্ষ্যকে অস্বীকার করবার বাতুলতা বোধ হয় কারও নাই। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিধবার জীবনযাত্রার ইতিহাস যে কত দুঃখ, অপমান ও লাঞ্ছনায় ভরা, তা আমরা বলতে পারব না—ভাষা এখানে ব্যথায় ভারী হয়ে উঠে। অভাব ও পরের গলগ্রহ হয়ে থাকবার দুর্ব্বিষহ অপমান তাদের জীবনকে অসহ্য করে তোলে, মনে হয় একটা বিরাট ব্যর্থতা; হৃদয় তাদের ভরে উঠে নিবিড় ঘৃণায়। আত্মীয়-স্বজনের দ্বারে দ্বারে দুটো ভাতের জন্য ঘুরে বেড়ান; গ্রামের ও পাড়ার লোকের ছি-ছি, আর অতীত দিনের সুখের স্মৃতি; ভাবতে পারেন কি, তাদের হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর কেমন করে হতাশার কালো যবনিকা টেনে দিয়ে যায়। এর জন্য দায়ী কে ? কোন জবাব-দিহিই কি করতে হবে না ?

জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি যেমন শিশুদের উপর নির্ভর করে তেমনি তাদের হৃদয়ও মানুষের মত বড় হয়ে উঠবার জন্য মেয়েদের পানেই চেয়ে থাকে। মা বোনের কোলে শুয়ে নানা গল্পের মধ্য দিয়ে তাদের যে শিক্ষা হয় সেটা এতই গভীরভাবে তাদের মনে বসে যায় যা মুছে ফেলবার ক্ষমতা বড় হলেও প্রায় হয় না। তাই সব দেশের বড় লোকেরা এই কথাটাই স্পষ্ট করে বলে গেছেন, মেয়েদের জীবন আনন্দ ও গৌরবে ভরে তুলতে না পারলে জাতির উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। আমাদের দেশও একদিন স্ত্রীজাতিকে মহাশক্তির অংশ বলে সম্মানিত করেছিল। এই শ্রদ্ধার কতটুকু আজও আমাদের মধ্যে টিকে আছে ? ভাবতে লজ্জায় সমস্ত হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে উঠে। শ্রদ্ধা করা ত দূরের কথা, অবিশ্বাস করে অসম্মানই করছি। তারা যে কিছু করতে পারে, দেশের উন্নতি যে কিছুমাত্র তাদের উপর নির্ভর করে, এটা আমাদের বিশ্বাস হয় না। পুরুষের অহঙ্কারের মোহে ভুলে নানা গণ্ডী টেনে বিধিনিষেধের বেড়া দিয়ে মেয়েদের কতখানি ছোট করে ফেললুম—আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য—একবারও মনে হয় না। প্রসারণের পথ বন্ধ, তাই উন্নতির পথ দূরে সরে গিয়ে অবনতির পথটাই আমাদের কপালে সহজ সরল হয়ে উঠল। গাছের আধখানা কেটে ফেলে তাকে বাঁচাবার পাগলামি আমাদের দেশেই শুধু আজ সম্ভব হয়েছে।

প্রত্যেক জীবনের যে একটা উদ্দেশ্য আছে এবং এর সকল চেষ্টার মধ্যেই যে তার আত্মার সার্থকতা, তা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করতে

পারবেন না। আত্মাকে উপলব্ধি করবার সংগ্রাম কোন ব্যক্তি কিম্বা শ্রেণীবিশেষের বিশেষ সম্পত্তি নয়। এর উপর সকলেরই অধিকার আছে; সকলেরই ভিতর কাঁদছে আপনাকে দেশে ও বিশ্বে প্রসারিত করে দেবার জন্য। এই আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা আমরা কিসের জোরে শাস্ত্রের কারাগারে চেপে রাখতে চাই? অবনতকে জয়ী করবার যে অস্ত্র প্রকৃতির কাছে রক্ষিত আছে তাকে প্রতিহত করবার কোন কৌশল আমাদের জানা আছে কি? জাতির জীবনে বিধবার কতখানি প্রয়োজন তা বাইরে অস্বীকার করলেও সবাই মনে মনে জানেন। তাই আজকের এই জাগরণের দিনে বিধবার ব্যর্থ শক্তি কেমন ভাবে দেশকে গড়ে তোলার কাজে লাগানো যায় ভেবে দেখা উচিত।

দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পে বিধবার স্থান কত উচ্চে তা শুধু তিনিই জানেন যিনি পুরুষ হয়ে জন্মাবার অহঙ্কারকে দূরে রাখতে পেরেছেন। ঘরের মোহের আবরণ যার সরে গেছে, শুধু সে-ই বাহিরকে ভালবাসতে পারে। প্রাণ দিয়ে রচনা করবার শক্তি যার নাই তার পক্ষে গড়ে তোলার কাজ একটা বিরাট পণ্ডশ্রম। তাই বন্ধনহীন বিধবার পক্ষে যেটা সহজ, সংসারের ভিতর যে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছে তার পক্ষে সেটা হয়ত অত্যন্ত কঠিন। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, এদের অক্লান্ত স্বার্থশূন্য সেবার ভিতর দিয়েই জাতির জীবন সুন্দর ও সরলভাবে গড়ে উঠবে।

এই কলঙ্কিত অপমানিত জীবন থেকে এদের বাঁচাতে হলে প্রত্যেক সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, অনাথ বিধবাদের জন্য আশ্রম খুলতে হবে। দেবী বলে শ্রদ্ধা করবার বিনয় যেন আমাদের থাকে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, তাদের ভিতরেও দেবত্ব আছে, জাতির শুভাশুভ তাদের উপরেও অনেকখানি নির্ভর করে; এবং অন্নসংস্থানের জন্য আত্মীয়-স্বজন ও পরের কাছে ভিক্ষা করে আত্মসম্মান হারাবার চেয়ে নিজের উপর নির্ভর করে না খেতে পেয়ে মরাও ভাল, কিন্তু ভিক্ষা নিয়ে হৃদয়-দেবতার অপমান করবার বাতুলতা যেন না আসে। এই সব আশ্রমে বিধবাদের জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলে, স্বাস্থ্য শিল্প ও নানা বিষয়ের শিক্ষা দিয়ে, তাদের দ্বারা সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে আদর্শ আশ্রম স্থাপন করে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলবার ব্যবস্থা করতে পারলে, দেশকে বড় করে তুলতে খুব যে বেশী সময় লাগে তা আমাদের মনে হয় না। এই রকম বড় কাজ ও বড় চিন্তার ভিতর থেকে তাদের জীবনও আনন্দে ও গৌরবে ভরে উঠবে। জীবনটা যে একটা দুর্ব্বহ ছি-ছি ও অপমানের ইতিহাস নয়, তাদেরও জীবনের যে একটা মহান উদ্দেশ্য আছে—এই ভাব নিপীড়িত লাঞ্ছিত হৃদয়েও আত্মসম্মান ফিরিয়ে আনবে; সেই কতকালের বাঁধা নিয়মের জীবন-যাত্রার জড়তার বিরুদ্ধে তাদের ভিতরে ভিতরে একটা তীব্র প্রতিবাদ জেগে উঠবে। তারা চঞ্চল হয়ে উঠবে জীবনপ্রবাহকে ব্যর্থ মরুভূমি থেকে সরসতার কোমল ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে। আমাদের সে উৎসাহ কৈ, সে সাধনা কৈ?

জাতিগঠন বলে একটা কথা আছে, সেটা এক-দিনে কিম্বা সভায় দাঁড়িয়ে বড় গলায় বক্তৃতা দিলে হয় না; তার জন্য যুগযুগান্তের সাধনা চাই, ত্যাগ চাই, শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ের ভক্তি চাই; কিন্তু দুঃখের ও লজ্জার কথা—কাজের সময়ে আমরা পিছিয়ে যাই, উৎসাহ যেন কেমন মলিন হয়ে যায়। ওজরের অভাব হয় না; আসল কথা চাপা পড়ে যায়।

এই সব অনাথা, অসহায়াদের জন্য প্রাণ কাঁদে কি?

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

মুলতান—আড়াঠেকা।

দিবানিশি পথ চাহি' জাগি হে নাথ।
পদ তোমারি চিত্তে সদা ধরি'
প্রেম ফুলে পূজি—বর মাগি হে নাথ॥

কথা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ২´ ৩ ০ ॥
জ্ঞা II পক্ষা দা পা -া। ক্ষপা -জ্ঞা -া -া। -া ঋা সা -া। ঋঋা -ন্‌া -সা ন্‌া।
দি বা॰ নি শি ॰ প॰ ॰ ॰ ॰ ॰ থ চা ॰ হি॰ ॰ ॰ জা

১ ০ ২´ ৩
। -সা ক্ষজ্ঞা -া ক্ষজ্ঞা। ক্ষঃ -পঃ -া -া -ক্ষজ্ঞা। -া জ্ঞক্ষা -পনা র্সর্ঋা।
॰ গি॰ ॰ ॰॰ হে ॰ ॰ ॰ ॰॰ ॰ না॰ ॰॰ ॰॰

০
। র্সনা -দপা -ক্ষজ্ঞা ক্ষজ্ঞা II
থ॰ ॰॰ ॰॰ "দি॰"

১ ২´ ৩ ০
{ পা II -ক্ষা জ্ঞা ক্ষা -া। পা -না -া -া। -র্সর্ঋা -না র্সা -া। -া -া -া র্সা।
প ॰ দ তো ॰ মা : ॰ ॰ ॰॰ ॰ রি ॰ ॰ ॰ ॰ চি

১ ২´ ৩ ০
। না র্সা র্সজ্ঞা -র্ঋা। র্সঃ র্সঃ -া -া না। -র্সর্সা -না র্সা -না। (-দা -পঃ -পঃ -া) }।
তে স দা॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ধ ॰॰ ॰ রি' ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
। -দা -পপা -ক্ষজ্ঞা জ্ঞা। ক্ষা পা -না র্সা। র্ঋা র্সা -া -না। -র্সনা দা পা -া।
॰ ॰॰ ॰॰ প্রে ম ফু ॰ লে পূ জি ॰ ॰ ॰॰ ব র ॰

০ ১ ২´
। -া -া -া ন্‌া। -সা ক্ষজ্ঞা -া -া। ক্ষঃ -পঃ -া -া ক্ষঃ জ্ঞঃ।
॰ ॰ ॰ মা ॰ গি॰ ॰ ॰ হে ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

৩ ০
। -া জ্ঞক্ষা পনা -র্সর্ঋা। র্সনা -দপা -ক্ষজ্ঞা ক্ষজ্ঞা II II
॰ না॰ ॰॰ ॰॰ থ॰ ॰॰ ॰॰ "দি॰"

রাগ ভৈরব—আড়াঠেকা।

এই হল এই হবে এই বাসনায়।
দিবা নিশি মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পায়।
মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি জানে,
না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হায়।
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং ॥

কথা—রাজা রামমোহন রায়। স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ২´ ৩ •
সমা II -গা মা -পা -া। পপা -ণা -দা। -পা -া দদা -পমা। -পা মগা -ঋা।
এই • হ ল • এ• ই • • • হ• •• • বে• •

১ ২´ ৩ •
। ঋা মগা -পঃ -মঃ -া। পা মা -া -পঃ -গা। -া -ঋা -সা -া। -া -া সা সা।
এই বা• • • • স না • • • • • • য়্ • • দি বা

১ ২´ ৩ •
। -ন্া সা গঋা -া। সসা -া সা -ঋা। মা -গপা মা মা। -পগা -ঋা -সা সা।
• নি শি• • •• • মু • গ্ধ •• হ য়ে •• • • দে

১ ২´ ৩ •
। সঋা গমা গপা মা। মাঃ -মঃ -পা -গা। -া -া -ঋা -া। -া সা -া সমা II
খি• তে• •• না পা • • • • • • • • য় • "এই"

১ ২´ ৩ •
মা II পা দা -র্সা র্সা। র্সা র্সা -া র্সা। -া -না -র্সা র্সা। -া -া -া দা।
ম রে লো • ক প্র তি • ক্ষ • • • ণে • • • দে

১ ২´ ৩ •
। দা না -র্সা র্সা। র্সা র্ঋা -া -া র্সর্সা। -া নর্সা ণা -দা। -পঃ -পঃ -া -া পা।
খে ত • বু না হি • • •• • জা• নে • • • • • না

১ ২´ ৩ •
। দা র্সা -া র্সা। না র্সা -া -া। -া নর্সা ণা দা। -পঃ -পঃ -া -া পা।
ম রি • ব এ ই • • • ম• নে • • • • • কি

১ ২´ ৩ •
। পদা ণা দা পা। পদা -ণা -া দা। -পা -পমা পগা -া। ঋা সা -া সমা II
আ• শ্চ • র্য্য হা• • • • • •• •• • • য় • "এই"

১ ২´ ৩
সসা II ঋা -া ঋঋা ঋা। ঋা ঋা -া সা। সা ঋা মা -া মমা।
অ হ • • ন্য হ নি ভূ তা • নি গ চ্ছ ন্তি • যম

• ১ ২´ ৩
। মগা পা মঃ মঃ -া। -পা -গা পদা দর্ঋা। র্সঃ র্সঃ -া র্সঃ র্সঃ -া। নর্সা ণা -দা পা।
ম• ন্ দি রং • • • শে• ষাঃ• স্থি র • ত্ব মি • চ্ছ• ন্তি • •

• ১ ২´ ৩
। -া পা দা -া। -া ণা -দা পা। পা দা -া -ণা। দা পা মঃ মঃ -া।
• কি মা • • শ্চ • র্য্য ম ত • • • • প রং •

•
। -মপা -মগা -ঋসা সমা II II
•• •• •• "এই"

—•—

রামকেলী—আড়াঠেকা।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়।
দারা সুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায়।
সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধিকল্পনাশূন্য,
ভাব তাঁরে হবে ধন্য, সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়।
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।
নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলং
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।
দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ু স্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ু।
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ॥

কথা—৺নীলমণি ঘোষ। স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ২´ ৩ ০
{ মা ণদা II -া দা পা -মা । পমা -া -া -পগা । -া গা -ঋা -া । সা -া -া সা I
স ত্য• • সূ চ • না• • • • •• • বি • • না • • স

১ ২´ ৩ ০
I ঋা মা -া গা । মা -দা -া -পদা । -ণদা -পপা -মগা -া । -মা গা } -া পা I
ক লি • বৃ থা • • •• •• •• •• • • য় • দা

১ ২´ ৩ ০
I পা দা -র্সা না । র্সা র্সা -া -া । -া নর্সা ণা -দা । -পা -া -া পা I
রা সু • ত ধ ন • • • জ• ন • • • • স

১ ২´ ৩ ০
I দা ণদা -দা পা । দা -া -া -পদা । -ণদা -পপা -মগা -া । -মা গা মা ণদা II
ঙ্গে না• • হি যা • • •• •• •• •• • • য় "স ত্য"

১ ২´ ৩ ০
-া পা II দা দা -র্সা না । র্সা -া -া র্সা । -া -না -র্সা র্সা । -া -া -া দা I
• সে অ তী • ত ত্রৈ • • গু • • • ণ্য • • • উ

১ ২´ ৩ ০
I দা না -র্সা র্সা । র্ঋা র্ঋা -া র্সর্সা । -া নর্সা ণা -দা । -পঃ -পাঃ -া পা I
পা ধি • কল্ প না • •• • শূ• ন্য • • • • ভা

১ ২´ ৩ ০
I দা দা র্ঋা র্সা । র্সনা র্সা -া -া । -া ণর্সা ণা -দা । -পা -া -া পা I
ব তাঁ • রে হ• বে • • • ধ• ন্য • • • • স

১ ২´ ৩ ০
I দা ণা -দা পা । পা -দা -া -পদা । -ণদা -পপা -মগা -া । -মা -গা মা ণদা II
র্ব্ব শা • স্ত্রে গা • • •• •• •• •• • • য় "স ত্য"

তালফের ঠুংরী।

১´ • ১´ •
II সা ঋা মা মা। মা মা মা মা I মা -া মা মা। মা -া মা -া I
(১) মা • কু রু ধ ন জ ন যৌ • ব ন গ • র্ব্বং •
(২) দি ন যা • • মি ন্যো • সা • • য়ং প্রা • তঃ •

১´ • ১´ •
I মা মা মা মা। মগা -পা মা -া I মা -া মা -া। মা -া পগা -া I
(১) হ র তি নি মে • • বা ত্ কা • লঃ • স • র্ব্বং •
(২) শি শি র ব স • • স্তৌ • পু ন রা • য়া • তঃ •

১´ • ১´ •
I পা -দা দা -র্সা। র্সা র্সা র্সা র্সা I না র্সা র্সা -া I নর্সা -া ণদা -পা I
(১) মা • য়া • ম য় মি দ ম খি লং • হি• • ত্বা• •
(২) কা • লঃ • ক্রী • ড় তি গ চ্ছ ত্যা • য়ুঃ • • •

১´ • ১´ •
I পা -া দা ণা। ণদা -া পা পা I পা দা ণা ণা। ণপা -ণা -া -া I
(১) ব্র • হ্ম প দং • প্র বি শা • শু বি দি• • • •
(২) ত দ পি ন মু • • ঞ্চ ত্যা • • • শা • • •

১´ • ১´ •
I দা -দা -পা -মা। -গা -মা -া -া I দা দা দা -া। না না র্সা র্সা I
(১) ত্বা • • • • • • • ন লি নী • দ ল গ ত
(২) বা • • • য়ুঃ • • • বা • ল • স্তা • বৎ ক্রী

১´ • ১´ •
I র্সা না র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা -া I দা -া দা -া। না -া র্সা র্সা I
(১) জ ল ম তি ত র লং • ত দ্ ব • জ্জী • ব ন
(২) • • ড়া • • স ক্ত • স্ত রু ণঃ • স্তা • • বৎ

১´ • ১´ •
I ঋা ঋা ঋা র্সা। না র্সা ণদা পা I দা ঋা র্সা র্সা। না র্সনা র্সা র্সা I
(১) ম তি শ য় চ প লং • ক্ষ ণ মি হ স • • জ্জ ন
(২) ত রু ণী • র • ক্তঃ • বৃ • দ্ধ • স্তা • • বৎ •

১´ • ১´ •
I না র্সনা র্সা র্সা। না -র্সা ণদা -পা I পা পা দা ণা। ণা -দা দা পা I
(১) সং • • গ তি রে • কা• • ভ ব তি ভ বা • র্ণ ব
(২) চি • • স্তা • ম • গ্নঃ • প র মে • ব্র • হ্ম ণি

১´ • ১ •
I পা দা ণা -দা। পা -ণা -া -া I দা -দা -পা -মা। -গা -মা মা ণদা II II
(১) ত র ণে • নৌ • • • কা • • • • • "স ত্য"
(২) কো • পি ন ল • • • গ্ন • • • • • • •

——o——

একমেবাদ্বিতীয়ং
বিংশ কল্প
তৃতীয় ভাগ
কার্ত্তিক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯২
৯৩৯ সংখ্যা ১৮৪৩ শক
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধর্ম্মবিধান ও পরলোক।

ধর্ম্মের কথা বলিতে গেলে পরলোকের কথা আসিয়া পড়ে। একের সঙ্গে অন্যের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ। সকল দেশের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে পরলোকতত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার করি আর নাই করি, পরলোকতত্ত্বকে অস্বীকার করিয়া কিন্তু ধর্ম্মের কথা বলিতে পারা যায় না।

জগতে যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব দেখিতে পাই তাহারা প্রত্যেকেই কোন-না-কোন একটী নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিয়ম কি? নিয়ম হইতেছে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। বস্তুর সমগ্র সত্তাকে স্বীকার করিতে গেলেই তাহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধও স্বীকার করিতে হয়। কোথাও একটী ফুল দেখিলে সেই ফুলের সঙ্গে সঙ্গে গাছের সত্তাও মনে আসে। দর্শনের ভাষায় ফুলটী হইল কার্য্য, আর গাছটী হইল কারণ—ফুলের সঙ্গে গাছের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। ফুলের সমগ্র সত্তাটী কেবল ফুলটুকুর মধ্যে পরিসমাপ্ত নহে—তাহার সন্ধান লইতে হইলে বৃক্ষ পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। এমনি ভাবে প্রত্যেক বস্তুর ক্ষুদ্র সত্তার সহিত তাহার বৃহত্তর সত্তার যে যোগ তাহাই হইল নিয়ম। সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সকলেই এই নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র—স্বতন্ত্র হইলেও একেবারে ভিন্ন নহে; একটী আর একটীকে অন্তরে লইয়া বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বৃহত্তম গণ্ডী কাটিয়া অবস্থান করিতেছে। একটী মানুষকে একান্ত করিয়া না দেখিয়া আরও পাঁচ জনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে তাহার যে একটী অখণ্ড যোগ ফুটিয়া উঠে তাহারই সন্ধান লইয়া সমাজনিয়ম বা নীতিনিয়ম গড়িয়া তুলিতেছেন সামাজিক। বৈজ্ঞানিক এই মানুষকে এক সুবৃহৎ জড়পিণ্ডের উপর দাঁড় করাইয়া তাহাকে ইহারই একটী টুক্‌রা-রূপে দেখিয়া যে একটা বৃহত্তর সত্তার সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাকে লইয়াই গাঁথিয়া তুলিতেছেন প্রাকৃতিক নিয়ম। দার্শনিক বা ধর্ম্মসন্ধিৎসু জগতের এই জড়-অজড় দুইটা ভাগকেই একটী সূত্রে গাঁথিয়া সন্ধান পাইলেন আরও একটী বৃহত্তম সত্তার। সমাজনিয়ম স্থাপিত হইয়াছিল একটী মানুষকে আরও পাঁচটীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া তাহাদের একান্ত প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান জীবনধারার উপর; কিন্তু ধর্ম্মনিয়ম মানুষের সত্তাকে এত খাটো করিয়া দেখিল না। সে এই বর্ত্তমানের ক্রোড়ে অভিব্যক্ত জীবন-ধারাটীর অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন গতির সন্ধান পাইল। সে দেখিল যে একটীর সঙ্গে আর একটী মিলিত হইয়াই যে কেবল একদিকেই মানুষের সত্তাকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে তাহা নহে—তাহার আপনার মধ্যেও একটা পূর্ণতার

অভিমুখে বিস্তৃতি আছে। মানুষের এই বর্ত্তমান জীবনধারাটার মধ্যে তাহার সমগ্র সত্তাটা ওতপ্রোত হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। মৃত্যুর পরও মানুষ থাকিবে।

এইরূপে ধর্ম্মের কথায় পরলোকের কথা আসিয়া পড়িলেও কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে জন্মান্তরের কল্পনা নাই। অনেকে মানুষের সত্তাকে অনন্ত বলেন কিন্তু অনাদি স্বীকার করেন না। ইহাতে ধর্ম্মনিয়ম স্থাপনের কোন ব্যাঘাত হয় নাই। মানুষের সত্তাকে বৃহত্তর করিয়া দেখিবার জন্য তাহার "ইহ"লোকের সঙ্গে "অসৌ"লোকের যোগ করিয়া দিতে হইবে—তা সে যোগের জন্য তাহার অগ্র-পশ্চাতের উভয় রেখাকেই বিস্তৃত কর বা একটাকে মাত্র বাড়াইয়া দেও। এই মত দার্শনিক যুক্তি অনুসারে সঙ্গত কি না সে বিষয়ে আমরা এখানে কিছু বলিতে চাহি না। তবে এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে ইহার উপর ধর্ম্মনিয়ম গড়িয়া তুলিবার কোন বাধা ঘটে না।

মানুষের আদিম প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা স্ব-তন্ত্রতা—স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল যে, এখনও—এই সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ম্মনিয়মের দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়াও—তাহা সময়ে সময়ে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে। মানুষ যখন পশুর মত বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত, যখন তাহার সমাজ সংঘ ধর্ম্ম কিছুই গড়িয়া উঠে নাই, তখন তাহার প্রকৃতি ছিল নিরঙ্কুশ। সেই নিরঙ্কুশ প্রকৃতির নগ্ন মূর্ত্তি বড়ই বীভৎস। এই নগ্ন মূর্ত্তির উপর একটা আচ্ছাদন দিয়া তাহার বীভৎসতাকে হ্রাস করিবার চেষ্টা যুগে যুগে হইয়া আসিতেছে। তাহারই ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে সমাজ সংঘ ও ধর্ম্ম-নিয়ম। মানুষ কি সহজে এই বন্ধনে ধরা দিয়াছে? তাহার বন্য প্রকৃতিকে কত প্রলোভন দেখাইয়া যে বশীভূত করিয়া পোষ-মানাইতে হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই ধরা দেওয়ায় তাহার লাভের অঙ্ক যে কত বাড়িয়া যাইবে, তাহার সুখ, সুবিধা, শান্তি যে কতগুণ বৃদ্ধি পাইবে, ইহা একটী একটী করিয়া তাহার চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইয়াছে তবে সে সকল সমাজ ও রাষ্ট্রনিয়ম এক-একটী করিয়া মানিয়া লইয়াছে।

এই সকল সমাজ ও রাষ্ট্রনিয়মের খুটিনাটি গড়িয়া উঠিয়াছে মানুষের বর্ত্তমান জীবনধারার উপর। কাজেই উহাদিগকে মানা বা না মানায় মানুষকে যে সুবিধা বা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা সব সময় হাতে হাতে না হউক দু' দশ বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই দেখাইয়া দেওয়া যায়। মানুষও তাই আপনার স্বার্থ বুঝিয়া লইয়া সুবোধ বালকের মত এই নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে বড় একটা দ্বিধা করে না। তবুও সময় সময় তাহার আদিম প্রকৃতি উজ্জীবিত হইয়া এই সব নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। কিন্তু বড় মুস্কিল হইয়াছে এই ধর্ম্মনিয়মকে লইয়া; ইহাকে তো বর্ত্তমানের মধ্যে বাঁধিয়া রাখা যায় না। ইহা যে মানুষের অতীত ও ভবিষ্যতের প্রচ্ছন্ন জীবন-ধারার উপর আপনার বৃহত্তম গণ্ডী কাটিয়া অব-স্থান করিতেছে। কাজেই বর্ত্তমানের মধ্যে ইহার সমস্ত লাভ-ক্ষতির হিসাব মিলাইতে গেলে অনেক সময় ঠকিতে হয়; মনে হয়, লাভের সংখ্যা অপেক্ষা ক্ষতির সংখ্যাই অনেক বেশী।

আরও এক কথা এই যে, সকল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মত ইহা যেমন কেবল বর্ত্তমানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত নহে, তেমনি উহাদের মত কেবল স্থূলকে লইয়াও ইহার কারবার নহে। মানুষের যে সূক্ষ্ম চিন্ময় সত্তা তাহার স্থূল বর্ত্তমান জীবনধারার বাহিরেও বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহারই সহিত মুখ্যতঃ ইহার কারবার। কাজেই সংকীর্ণ জীবনের চাপে যে সকল বিষয় লাভ-ক্ষতির মূর্ত্তি ধরিয়া গড়িয়া উঠে, এই বিস্তৃত জীবনের অবকাশের মধ্যে অনেক সময় তাহা-দের আকৃতি উল্টাইয়া যায়। গাছপালা-ঘেরা গ্রামের ছোট পরিসরটুকুর মধ্যে দাঁড়াইয়া মাথার উপরে ঊর্দ্ধোন্নত আকাশকে দেখিলে মনে হয় বুঝি সে আপনার শুচি-শুভ্র মূর্ত্তিকে ধরণীর পঙ্কিল স্পর্শ হইতে সযত্নে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু যখন উন্মুক্ত প্রান্তরে নামিয়া দাঁড়াই তখন দেখি ঠিক্ ইহার বিপরীত। সে তো তাহার এই শুচিতা রক্ষার জন্য দূরে সরিয়া যায় নাই;

সে যে মাগ্রহে সস্নেহে এই ধূলিমলিন পৃথিবীকে তাহার অনন্ত বাহুপাশের আবেষ্টনে বুকে আঁক-ড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম যে, ধর্ম্মবিধান যে বৃহত্তম ক্ষেত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার সমগ্র রূপটাকে না দেখিয়া আমরা যদি বর্ত্তমানের মধ্যেই তাহাকে দেখিতে যাই, তবে আমাদের সে দর্শন যে বিপরীতই হইবে তাহাতে আর সংশয় কি? ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে সঙ্ঘ, সমাজ ও রাষ্ট্রবিধান মানুষ কতকটা দায়ে পড়িয়া মানিয়া চলিলেও ধর্ম্মবিধান মানিয়া চলিতে বড় রাজি নহে।

মানুষের কাছে তাহার বর্ত্তমানের 'ইহ'লোক এত বড় হইয়া প্রকাশ পায় যে, তাহার তুলনায় সুদূরের 'অসৌ' লোক একেবারে অস্পষ্ট ম্লান অদৃশ্য হইয়া যায়। অথচ এই অসৌ-লোককে ছাড়িয়া ধর্ম্মের কথা বলা চলে না। তাই সকল দেশের প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণই মানুষের মনে এই অসৌ-লোকের কল্পনাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য দুইটী কৃত্রিম উপায়ের শরণ লইয়াছেন। তাঁহারা প্রলোভন ও ভয় দেখাইয়া মানুষকে ধার্ম্মিক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহাদের ঐ অসৌ-লোকের দুইটী অংশ কল্পনা করিতে হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটী হইতেছে সুখভূমি স্বর্গ, অন্যটী হইতেছে দুঃখভূমি নরক। মানুষ এই মর্ত্ত্যলোকে যে সুখের সন্ধানে ছুটিয়া মরিতেছে, তাহাকেই দুঃখের সংস্পর্শ হইতে ছাঁকিয়া লইয়া একত্র স্তূপীকৃত করিয়া গড়িয়া তোলা হইল স্বর্গলোক। মানুষ সুখের কাঙ্গাল হইলেও এই স্বর্গের প্রলোভনে সে বড় সাড়া দেয় নাই; কারণ জীবনের পথে অনেকবার ঠকিয়া শিখিয়া মানুষ সেই অতি প্রাচীন কাল হইতেই "যো ধ্রুবাণি" শ্লোকের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের দ্বিতীয় উপায়টীর প্রয়োগ একেবারে অব্যর্থ হইল। কারণ অজ্ঞই হউক বা বিজ্ঞই হউক মানুষমাত্রেরই স্বভাব এই যে, সে তাহার এই আলোকময় জীবনের মধ্যে মৃত্যুর ছায়াকায়ার কল্পনা ভাল বাসে না। ইহলোকের প্রান্ত সীমায় যে অন্ধকার-গুহার মুখে আসিয়া মানুষের জীবন-পথের শেষ হইয়াছে, মানুষ সেই অন্ধকার-গুহাকে বড় ভয় করে। মানুষ মনে করে ঐ অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিলে সে আপনাকেই হারাইয়া ফেলিবে, তাই মানুষ সারা জীবন ধরিয়া একান্ত যত্নে এই মৃত্যুকে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে—যদিও শেষের দিনটীতে ইহাকেই বরণ করিয়া লওয়া ছাড়া তাহার আর উপায়ান্তর নাই। মৃত্যুর প্রতি এই স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা কেবল মানুষের নহে, জীব-মাত্রেরই সাধারণ। জীবনসংগ্রাম চালাইবার জন্য মানুষ ও পশু উভয়েই ইহা প্রকৃতির নিকট হইতে সহজাত সংস্কাররূপে লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ মনুষ্যপ্রকৃতির এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহা-দের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। মানুষের বর্ত্তমান জীবনধারার দুর্দ্দমনীয় গতিকে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য তাহার চক্ষুর সম্মুখে মৃত্যুর বিভীষিকাকে খুব বড় করিয়া আঁকিয়া ধরা হইল। ক্ষুদ্র এতটুকু পাপের জন্য যে কেমন করিয়া জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া কুম্ভীপাক নরকের মধ্যে পড়িয়া ঘূর্ণিপাক খাইতে হয় তাহার বর্ণনায় তাঁহারা সহস্রমুখ হইলেন।

কিন্তু ইহা যে যথার্থ পথ নয়—কৃত্রিমতার পথ তাহা বুঝিতে আমাদের অধিক বিলম্ব হয় না। প্রলোভন বা ভয় দেখাইয়া যে কাহা-কেও প্রকৃত মঙ্গলের পথে আনা যায় না ইহা সর্ব্ববাদসম্মত। মানুষের চিন্ময় সত্তাকে বিকশিত করিয়া তোলাই হইল প্রকৃত উদ্দেশ্য। অথচ তাহা যে ইহা দ্বারা কেমন করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ভয়ের মধ্যে আছে একটা সঙ্কোচ, যাহা মানুষের বিকাশের পথ রুদ্ধ ছাড়া কখনই মুক্ত করে না। বেত্রের ভয় দেখাইয়া ছাত্রকে পুস্তকের পাঠ গলাধঃকরণে বাধ্য করিলেও যে তাহাকে মানুষ করিয়া তোলা যায় না একথা আজকাল অনেকেই স্বীকার করেন। মৃত্যুর মধ্যে যে এই বিভীষিকা, ইহাকেই জীবনের আলোর সম্মুখে তুলিয়া ধরায় যে দীর্ঘায়তন ছায়ার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই উপর মূর্ত্ত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এই নরক কল্পনা। কেহ কেহ আবার জীবনপ্রান্তের এই করাল ছায়াটীকে এমন দীর্ঘ-নিবিড় করিয়া তুলিয়াছেন যে তাহার সংস্পর্শে

জীবনের আলোটুকু পর্য্যন্ত কাজো হইয়া উঠিয়াছে। জোর করিয়া চিরদিনের জন্য মানুষের এই ক্ষীণ জীবনশিখাটি নিবাইয়া ফেলা যাইতে পারে তাহারই চেষ্টায় আবার একদল লোক ব্যাপৃত।

মানুষের সত্তাকে বৃহত্তম করিয়া দেখিবার জন্য তাহার ইহলোকের সঙ্গে অসৌ-লোকের যোগ করিয়া দেওয়া দরকার হইয়াছিল। কিন্তু একটীকে খর্ব্ব করিয়া অন্যটীর অন্তর্গত করিলেই তো যোগ হয় না; সে যে একের মধ্যে অন্যের বিনাশ। নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হইয়া পরস্পরের যে প্রীতির স্বাধীন মিলন তাহাই যোগ। ইহাতে সামঞ্জস্যের কোন হানি ঘটে না। ইহ-লোকের সঙ্গে অসৌ-লোকের এইরূপ সামঞ্জস্যমূলক মিলনই প্রার্থনীয়। নীতিজ্ঞেরা এই সামঞ্জস্য-মূলক মিলনের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ঠিক পথটা খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহারা বলেন যে, ইহসর্ব্বস্ব হইয়া অর্থ প্রভৃতি পার্থিব বিষয়ের সন্ধান লও, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে গিয়া একেবারে অসৌ-সর্ব্বস্ব হও। হঠাৎ শুনিলে মনে হয় মীমাংসাটী মন্দ নয়। ভাবিয়া দেখিলে কিন্তু বুঝিতে পারা যায় না যে ইহা কেমন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে সম্ভব হইতে পারে। মানুষের মন তো একটী স্থূল জড়পিণ্ড নহে যে, তাহাকে দুই ভাগ করিয়া কাজ চালাইব। সুতরাং যে মন লইয়া অর্থোপার্জ্জনে ইহসর্ব্বস্ব হইয়া উঠিব, সে মন লইয়া তো আর তখনই ধর্ম্মানুষ্ঠানে অসৌসর্ব্বস্ব হইতে পারি না।

যাহা হউক নীতিশাস্ত্রের কথা আমাদের বিচার্য্য নহে। কিন্তু প্রায় সকল দেশের অধিকাংশ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্যেই এই দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহলোকের সঙ্গে অসৌলোকের মিলন ঘটাইতে গিয়া তাঁহারা ইহলোককে খর্ব্ব করিয়া ফেলি-য়াছেন। অথচ মানবমনের স্বাভাবিক প্রবণতা এই ইহলোকেরই প্রতি। মানুষের মন কতকটা স্থিতি-শীল; সে ধ্রুবের মধ্যেই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে ভাল বাসে, অধ্রুবের ডাকে বড় সাড়া দেয় না। তাই জগতের একদল লোক ধর্ম্মশাস্ত্রের অসৌ-সর্ব্বস্ব হইবার কথা হাসিমুখে উড়াইয়া দিয়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে ইহসর্ব্বস্ব হইয়াই দিন কাটাই-তেছেন; আর অন্য দলের লোক যদিও শাস্ত্রকে মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন তথাপি তাহার বিধিগুলি ঠিক ঠিক মানিয়া চলিতে পারিতেছেন না। ইহাঁদের দশা হইয়াছে "ন যযৌ ন তস্থৌ"। ইহাঁরা প্রাণের স্বাভাবিক টানে না পারিতেছেন ইহ-লোককে ত্যাগ করিতে, না পারিতেছেন শাস্ত্র-বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অসৌলোককে ধরিতে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাঁদের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় বলিয়া মনে হয়, কারণ ইহাঁরা উভয়তঃ বঞ্চিত। রক্ত-আঁখি গুরুমহাশয়ের উত্তোলিত বেত্রের ভয়ে ভীত শিষ্যের মত ইহাঁরা না পারিতেছেন খেলায় যোগ দিতে, না পারিতে-ছেন পড়ায় মন বসাইতে।

এই প্রকার কোন পন্থাই উভয় লোকের যোগ স্পষ্ট দেখাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া মনে হয় যে ইহলোকের সঙ্গে অসৌলোকের যোগ বুঝি একটা কাল্পনিক পদার্থ। কাল্পনিক পদার্থ মনে করেন বলিয়াই সকল দেশের অধিকাংশ মনীষী ব্যক্তিরা চেষ্টা করিয়াও ইহাকে ঠিক স্ব-ভাবে দাঁড় করাইতে পারেন নাই। এ-টীকে টানিয়া আনিতে ওটী পিছাইয়া পড়িয়াছে; ওটীকে গুছাইয়া লইতে এটী বিগ্‌ড়াইয়াছে। ইহার ফলে সকল দেশেরই ধর্ম্মশাস্ত্রে পরলোক সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থা প্রায় একই প্রকারের হইয়াছে। কিন্তু আমরা যদি দূরের ও নিকটের এই সকল একঘেঁয়ে বিধিব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া একটু পশ্চাতে হঠিয়া যাইতে পারি তবে একটা নূতন জিনিস দেখিতে পাই। বৈদিকসাহিত্যের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে আমরা এই গুরুতর সমস্যার এক সুন্দর মীমাংসা খুঁজিয়া পাই। সেখানে ইহলোকের সঙ্গে অসৌ-লোকের কোন বিরোধ নাই। একটীকে অন্যটীর জন্য খর্ব্ব করা হয় নাই। উভয়ের মহিমায় উভয়ই মহিমান্বিত। ব্যোম-নিম্নে ধরিত্রীর মূর্ত্তি যেমন মহিমময়ী হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি অসৌলোকের সংস্পর্শে ইহ-লোকের আকৃতিতে একটা দিব্য জ্যোতিঃ সঞ্চারিত হইয়াছে। আবার ধরণী যেমন আপনার বৈচিত্র্য দ্বারা আকাশের একান্ত রিক্ততাকে পূর্ণ করিয়া মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহলোকও তেমনি

আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া অসৌ-লোককে গৌরবান্বিত করিয়াছে। "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" উভয়েই পূর্ণ; কেহ কাহারও নিকট খর্ব্ব নহে। জগতের ছোট-বড় প্রত্যেক বস্তুই "ঈশাবাস্যম্", ভগবানের জ্যোতিতে মণ্ডিত। তাই তখনকার লোকের দৃষ্টিতে ধরণী সুন্দরী হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। জগতের প্রতি বস্তুটী তখন ভগবৎজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহাদের দৃষ্টিতে অমৃত বর্ষণ করিত। বায়ু তখন মধু ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া যাইত; সিন্ধু অমৃত বিলাইতে বিলাইতে ছুটিয়া চলিত। ধরণীর তুচ্ছ ধূলিকণা পর্য্যন্ত তখন তাঁহাদের দৃষ্টিতে অমৃতসিক্ত হইয়া ধন্য হইয়া উঠিয়াছিল। অসৌলোকের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য তখন ইহলোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হইত না। অসৌলোক তখন ইহলোকের মধ্যেই নামিয়া আসিয়াছিল। ইহ-পরলোকের এই অখণ্ড যোগ তখনকার মানুষের হৃদয়ে এত স্পষ্ট হইয়া অনুভূত হইয়াছিল যে তাঁহারা ব্যগ্র-কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিলেন --

> আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
> আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
> আনন্দংপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

এই বিচিত্র বিশ্ব ভগবানের আনন্দ-উৎস হইতেই উৎক্ষিপ্ত হইতেছে; এবং আনন্দের সৃষ্টি বলিয়াই ইহা প্রাণের স্পন্দনে নব নব ভাবে নিত্য ফুটিয়া উঠিতেছে এবং আনন্দকেই লক্ষ্য করিয়া আবার অন্তিমে তাহারই মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। জীবনের সহিত মৃত্যুর, ইহলোকের সহিত পরলোকের কি সুন্দর যোগ! জানিনা, অনন্তকাল ধরিয়া চিরন্তনের কোন্ সে মহিমান্বিত মহাশিশু কারণ বারিরাশি লইয়া মনের আনন্দে ক্রীড়ায় মগ্ন! বারি মুহুর্মুহুঃ করতলতাড়িত হইয়া ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে; বিন্দু বিন্দু হইয়া অনন্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে; সূর্য্যকিরণে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আবার পর মুহূর্ত্তেই আনন্দের সেই প্রিয় আঘাত পাইবার আশায় নামিয়া পড়িতেছে। আনন্দ-মেলায় এই ওঠানামার সুখদুঃখের পাটোয়ারী হিসাবের স্থান কোথায়? এখানে উঠিবার জন্যই নামা এবং নামিবার জন্যই উঠা; আর এই ওঠা ও নামার মূলে আছে একটী মাত্র অখণ্ড আনন্দের প্রেরণা। সুতরাং ইহলোকের সহিত পরলোকের বিরোধ কোথাও নাই—উভয়েই একটী মাত্র আনন্দ-সূত্রে পরস্পরগ্রথিত। এই জন্যই তো জীবন ও জগৎকে নশ্বর ভাবিয়া কোনও দিন তাঁহারা ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন নাই। ইহলোকের পার্শ্বে অসৌলোকের স্থান তাঁহারা অসঙ্কোচেই প্রদান করিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহাদিগকে প্রলোভন দেখাইবার জন্য স্বর্গ বা বিভীষিকা দেখাইবার জন্য নরকের কল্পনা করিতে হয় নাই। পুণ্যাত্মাদিগের সুখভোগের জন্য সোমলোক বা চন্দ্রলোকের কল্পনা আমরা উপনিষদে পাই বটে; কিন্তু সেখানে অপ্সরা প্রভৃতি মানুষের ইন্দ্রিয়সুখের উপযোগী কোন বিষয় থাকিবার কথা উপনিষদে পাওয়া যায় না। আর নরকের কল্পনাও বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না।

উপনিষদে পরলোকযাত্রীদিগের জন্য দুইটী পথের কল্পনা দেখিতে পাই। একটী চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত গিয়াছে। অন্যটী চন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দুইটী পথই পুণ্যাত্মাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। পাপীদিগের গতি তবে কি হইবে? তাহারা কোন পথ ধরিয়া উৎকট পাপের ফল ভোগ করিতে লোকান্তরে গমন করিবে? বৈদিক সাহিত্যে এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না। সেখানে পাপের ফল ভোগ করিতে লোকান্তরে যাইবার কল্পনা দেখিতে পাই না। পাপ অজ্ঞানের কার্য্য। তাহার ফলে জীবের আত্মজ্যোতিবিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়; এবং এই জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তে (জায়স্ব-ম্রিয়স্বরূপ তৃতীয় স্থানে) পড়িয়া ঘূর্ণিপাক খাইতে হয়; আত্মোন্নতি বিধানের অবকাশ থাকে না, প্রবৃত্তিও আসে না। ইহাই তাহাদের শাস্তি। লোকান্তরে যাইয়া অন্যবিধ শারীরিক শাস্তির কল্পনা বৈদিক সাহিত্যে খুঁজিয়া পাই না। ব্রহ্মচারী বালক নচিকেতাকে একবার যমলোকে যাইতে দেখি বটে; কিন্তু সে ঠিক পাপের ফলভোগ করিবার জন্য পরবর্ত্তী যুগের কল্পিত যমলোক নহে। বিশেষতঃ সেখানকার "সাম্পরায়" শব্দটীও কেবল যমলোকের

অর্থেই প্রযুক্ত হয় নাই। যম নচিকেতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

> ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
> প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং।

"ধনগর্ব্বে যাহারা মূঢ় হইয়াছে সেই প্রমত্ত অজ্ঞদিগের নিকট সাম্পরায় প্রকাশ পায় না।" সাম্পরায় শব্দটী নির্ব্বিশেষে পরলোকমাত্রকেই নির্দ্দেশ করিতেছে—কিন্তু কেবল যমলোককে নহে। কারণ শ্লোকের অপরার্দ্ধেই আবার যম বলিতেছেন,

> অয়ং লোকঃ, নাস্তি পর ইতিমানী
> পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥

"ইহলোকই আছে, কিন্তু পরলোক নাই, যাহারা ইহা মনে করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ আমার বশে আসিয়া থাকে"। শেষের দুইটী চরণের প্রথম চরণটী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সাম্পরায় শব্দটী পরলোকমাত্র অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় চরণটী লইয়া একটু গণ্ডগোল আছে। আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রামানুজাচার্য্য উপনিষদ্‌যুগেও নরক-কল্পনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে এই চরণটীই উদ্ধৃত করিয়াছেন। "অজ্ঞ জীব পুনঃ পুনঃ আমার বশে আসে", ইহার ভাবার্থ তিনি বলেন যে, পাপের ফল যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে জীব যমপুরে আসিতে বাধ্য। কিন্তু সহজবুদ্ধিতে আমরা ইহার অর্থ অন্যরূপ বুঝি। "পুনঃ পুনঃ আমার বশে আসে" এখানে "আমার" অর্থে "মৃত্যুর"। কারণ এই উপাখ্যানটীতে "বৈবস্বত" ও "মৃত্যু" মাত্র এই দুইটী নাম পাওয়া যায়, "যম" নাম পাওয়া যায় না। কাজেই "পুনঃ পুনঃ আমার বশে আসে" ইহার অর্থ দাঁড়াইল এই যে "পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর বশে পতিত হয়" অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিতে থাকে, কিন্তু "যমপুরীতে যমযন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য গমনের" কথা আসিতে পারে না। ছান্দোগ্যের যে "জায়স্বম্রিয়স্ব"রূপ "তৃতীয়-স্থানে"র কথা আছে, তাহাই যমনাচিকেত সম্বাদে প্রকারান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু নরক নহে।

কোনও কোনও উপনিষদে এক প্রকার অন্ধকার-লোকের কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। হয়তো ইহারই উপর পরবর্ত্তী যুগে অন্ধতামিস্র প্রভৃতি নরকের কল্পনা গড়িয়া উঠিয়া থাকিবে। কিন্তু উপনিষদ-যুগে এই অন্ধকার-লোককে যে নরক বলিয়া মনে করা হইত না তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়; কারণ ইহা কেবল পাপীদিগের জন্যই সৃষ্ট হয় নাই, পুণ্যাত্মারাও আত্মতত্ত্বজ্ঞ না হইলে এখানে আসিতে বাধ্য হইতেন। এই জন্যই দেখিতে পাই যজ্ঞাদি ও জনহিতকর (ইষ্টাপূর্ত্ত) কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাঁহারা পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু আত্মতত্ত্বের কিছুই জানেন না, তাঁহারা যখন তাহার ফল-ভোগের জন্য সোমলোকের যাত্রী হন, তখন এক অন্ধকার পথ ধরিয়াই তাঁহাদিগকে যাইতে হয়। আত্মজ্ঞদিগের যে আলোকময় পথ সোমলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাতে তাঁহাদের প্রবেশের কোন অধিকার নাই।

পাপ ও পুণ্যের ফলে জীবের ঊর্দ্ধাধোগতির উল্লেখ স্থানে স্থানে পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ ঊর্দ্ধাধোগতি কোন লোকবিশেষকে নির্দ্দেশ করে না। এই পৃথিবীতেই উচ্চ ও নীচ-যোনিতে জন্মগ্রহণই যে ঊর্দ্ধাধোগতি, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আমরা উপনিষদে পাই। শাঙ্করভাষ্য পাঠ করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, শঙ্করাচার্য্যের মত একজন অদ্বিতীয় বৈদিক পণ্ডিতও নচিকেতার উপাখ্যান প্রভৃতি ছাড়া উপনিষদের আর কোথাও নরককল্পনার বীজও অনুসন্ধান করিয়া পান নাই। সার কথা, জগতের প্রায় সকল ধর্ম্মেই নরককল্পনার প্রচুর প্রসার থাকিলেও বৈদিক ধর্ম্মে কিন্তু ইহার এতটুকু অবকাশ ছিল না। কেমন করিয়াই বা থাকিবে? যাঁহারা জগৎসৃষ্টির মূলে ভগবানের আনন্দই লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাঁহারা কেমন করিয়া তাহার একটা নিরানন্দ বিভীষিকার কল্পনা করিতে পারেন? বৈদিক ধর্ম্মের আদি প্রস্রবণে নরকের কল্পনা না থাকিলেও কেমন করিয়া এবং কবে যে তাহা ইহাতে প্রবেশ লাভ করিল এবং পৌরাণিক যুগে একেবারে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, তাহা ভাবিবার বিষয়।

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল)

কানেড়া মিশ্র—একতালা।

এই গগনের নীল পাথারে
কি করুণা নয়নে চাও
নিমেষে সকল হৃদয়-পরাণ
কেমনে হে তুমি ভুলাও।
তব অপরূপ কান্তি
হৃদে ঢালে একি শান্তি;
কেড়ে লয় সারা প্রাণটি—
কি মোহন বাঁশরী বাজাও।
একি ফুলে ফুলে তব হাসি
একি ইন্দু পৌর্ণমাসী
একি শ্যাম ঘন তৃণরাশি
চরণের তলে বিছাও।
একি আলো-ছায়া তব ভুবনে
একি সুখ-দুখ মম জীবনে
একি নিত্য জনম-মরণে
কি অপরূপ খেলা খেলাও॥

"কেশরী"-পত্র ও প্রার্থনা সমাজ।*

(ডাঃ স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার লিখিত প্রবন্ধ
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

পুণার কেশরী পত্রের ২৩ আগষ্ট তারিখের ১৮৮১ সংখ্যার প্রকাশিত 'অনুকরণ' সম্বন্ধে সম্প্রতি ধর্ম্মমণ্ডলীতে যে আন্দোলন হইতেছে এবং বিশেষত প্রার্থনা সমাজ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ ছাপা হইয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া আমাদের মনে অত্যন্ত খেদ উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ, কেশরী-পত্রের যিনি কর্ত্তা তিনি আধুনিক নবীন সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। মনুষ্যমাত্রের অন্তঃকরণে যে বিষয় সম্বন্ধে অত্যন্ত ব্যাকুলতা আছে সেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে গাম্ভীর্য্যসহকারে বিচার করিয়া আপন অভিপ্রায় তাঁহাদের মত ব্যক্তিদের প্রবীণ-রীতিতে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য; তাহা না করিয়া, ক্ষুদ্রভাবই প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখকের অন্তঃকরণে গাম্ভীর্য্যের ধারণা নাই এরূপ নহে; কিন্তু তাহা দমন করিয়া, তরুণদিগের বিদ্রূপ করিবার যে অনিবার্য্য কামনা তাহারই আধিপত্য উক্ত প্রবন্ধ মধ্যে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তাছাড়া, আপনার ঘরে বসিয়া সমস্ত বিশ্বের ব্যবস্থা করা,—এই যে আলস্যপরতা ইহা পূর্ব্ব হইতেই আমাদের হিন্দুজাতির মধ্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত আছে, উহা আজকালের ইংরাজী বিদ্যার যোগে নিষ্ট হইয়াছে এইরূপ আমাদের ধারণা ছিল। কিন্তু এই বিষয়েও উক্ত প্রবন্ধে আমরা নিরাশ হইয়াছি। কারণ, প্রার্থনাসমাজ সম্বন্ধে যিনি টীকাটিপ্পনী করিয়াছেন সেই ব্যক্তি তৎবিষয়ে সমাজে বারংবার গিয়া খোঁজখবর লইবার শ্রম স্বীকার কথনই করেন নাই। স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে একটা ঘটনা তিনি এইরূপ লিখিতেছেন যে, প্রার্থনা মন্দিরে পূর্ব্বে শ্রোতাগণের খুব ভিড় হইত,—কেন হইত? না, স্ত্রীলোকেরা উপরের দালানে আসিয়া বসিত, শ্রোতৃগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিবার জন্য; তাহার পর এই বিষয় যখন সমাজের লোকেরা জানিতে পারিল তখন তাহারা স্ত্রীলোক-দিগকে আর লইয়া আসিত না, এবং তখন হইতে মন্দিরের ভিড় কমিয়া গেল। সাবাস্!! উত্তম কাব্য রচিত হইয়াছে (তা সে যে-ই রচনা করুক)। ইহার মধ্যে তথ্যাংশ যে একটুও নাই সে বিষয় নির্ব্বিবাদ। এবং এই কাব্যের মধ্যে কাব্যকর্ত্তা কেবল আপনার স্বভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন।

তারপর 'একপক্ষসমর্থক' এই নাম দিয়া এক পত্রপ্রেরক কেশরীতে এক পত্র পাঠাইয়া-ছেন; সেই পত্র ও তৎসম্বন্ধে কেশরীর অভিপ্রায় ৩০শে তারিখ আগষ্টের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সম্বন্ধে কেশরীর গাম্ভীর্য্যের সহজ সংস্কার জাগিয়া উঠিয়াছে এবং ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনেকটা নিরস্ত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি বলেন, ঐ বিষয় সম্বন্ধে বিচার করা উচিত। 'পক্ষসমর্থক' কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে উত্তরও দিয়া-

* প্রার্থনাসমাজ প্রথম অবধিই আদিব্রাহ্মসমাজের পন্থা অনুসরণ করিয়াই সংগঠিত। প্রার্থনাসমাজের মতামত যাহা এই প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে, সে সমস্তই আদিব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য তাই আমরা এই প্রবন্ধ সাদরে প্রকাশ করিলাম। তং সং

ছেন। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার অনুকরণ নিন্দনীয় এই মতটি স্বীকার করিলে বাপ মারাঠা ভাষা বলিত, ধুতি পরিত, পিঁড়েতে বসিয়া আহার করিত, তাই ছেলেও তাই করিতে লাগিল—ইহা নিন্দনীয় বলিতে হইবে। ইংরাজদের দেখাদেখি ভূমি ছাপাখানা স্থাপন করিয়া সংবাদপত্র বাহির কর এবং রাজকীয় ও অন্য ব্যাপারাদিসম্বন্ধে আন্দোলন কর—ইহাও নিন্দনীয় বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। যে বিষয় নিরর্থক, যাহা গ্রহণ করিলে কোন লাভ নাই এবং কেবল অন্যে করিতেছে বলিয়া ছেলেমানুষের মত আমরাও করি—ইহাই অবলম্বন করা নিন্দনীয় এইরূপ আমরা বলি। এইরূপ অনুকরণে অনুকরণকারী কেবল আপনার শূন্যগর্ভতাই প্রকাশ করে। কিন্তু আজকাল ধর্ম্মসম্বন্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহাকে এই কোঠার মধ্যে ফেলা সর্ব্বথা অপ্রশস্ত। লোকে অন্যের ধর্ম্ম দেখিলে আপন ধর্ম্মে বিরক্ত হইবে এই প্রকার উক্তি অশ্লাঘ্য। খৃষ্টধর্ম্ম যিনি স্বীকার করিয়াছেন কিংবা প্রার্থনাসমাজের যিনি সভ্য হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই এই প্রকার অন্যের ধর্ম্ম দেখিয়া আপনধর্ম্মে বিরক্ত হইবেন এইরূপ অর্থ আপন লেখার মধ্যে গর্ভিত করা সর্ব্বদা অনুচিত। এক মনুষ্যের অন্য মনুষ্যের সহিত কিংবা এক রাষ্ট্রের লোকের অন্য রাষ্ট্রের লোকের সহিত সমাগম হওয়ায় পুরাপুরি পরস্পরের অনুকরণ না হইলেও, পরস্পরের মধ্যে কল্পনা-বিচার, চাল-চলন এই সকলের মধ্যে কিছু না কিছু তফাৎ হইয়া পড়িবেই। পরস্পরের সম্বন্ধে এইরূপ পরিবর্ত্তন না ঘটিলে, সেই সকল মনুষ্য কিংবা সেই সকল লোক নিতান্ত জড়বুদ্ধি বলিতে হইবে। হিন্দু চীন প্রভৃতি প্রাচ্য লোকের সমাগমে য়ুরোপীয় লোকদিগের চিন্তা-প্রবাহে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সেইরূপ তাহাদের সমাগমেও আমাদের চিন্তাপ্রবাহে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ঈশ্বরের প্রেমী ভক্ত যতই হোক না কেন, এবং তাহাদের আচরণ যতই শুদ্ধ হোক না কেন, তথাপি যিশুর উপর বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া তাহাদের উদ্ধার হইবে না, এই যে খৃষ্টানদিগের দৃঢ় ধারণা তাহা আমাদের মত লোকের সমাগমে আস্তে আস্তে শিথিল হইয়া আসিতেছে। এবং পরমেশ্বর যিশুকে দিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম, অন্য কিছু ধর্ম্ম নহে—এই ধারণা নষ্ট হইয়া, ধর্ম্ম মনুষ্যের অন্তঃকরণে নিহিত এবং তৎসম্বন্ধীয় সত্যসকল যিশু ছাড়া আর কেহ বলিতে সমর্থ নহে এরূপ নহে, ঐরূপ কথা অনেকেই বলিয়াছেন,—এইরূপ ধারণা হইতেছে। তবে, উহাদের সমাগমে আমাদের ধর্ম্মবিচারের মধ্যে কিছু বদল হয় নাই কি? ব্রাহ্মণ ভূদেবতা, আর সব বর্ণ ব্রাহ্মণকে বন্দনা করিবে, শূদ্রেরা সেবা করিবে—এই যে আমাদের ধারণা ইহা মিথ্যা বলিয়া কি আমাদের মনে হয় না? সেইরূপ আবার, মূর্ত্ত পদার্থের পূজা করা প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনার মার্গ নহে; অবতার কল্পনা করিয়া নানা প্রকার কদাচার বা ব্যসন ঈশ্বরে আরোপ করিলে মনুষ্যের উন্নতি হয় না; বরং গুজরাটী মহারাজসংক্রান্ত ব্যাপার যেরূপ বহু বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছে, সেইরূপ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে মনুষ্য নীচতা প্রাপ্ত হয়—এইরূপ ধারণা আমাদের মনে প্রবিষ্ট হওয়ায় সেই ধারণাকে কেন উপহাস করিবে? সমস্ত জীবন পাতক এবং সম্ভবতঃ চুরি করিয়া ধনোপার্জ্জনের পর শেষে এক রামের মন্দির বাঁধা হইল, ব্রাহ্মণভোজন করান হইল, কিংবা কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা হইল—তাহা হইলেই সর্ব্বপাতক নষ্ট হইল—এই ধারণাটি অসত্য ও ভয়ঙ্কর, এইরূপ আমাদের মনে হইলে, কেবল অন্যের দেখা-দেখি আমাদের যাহা আছে তাহার প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মিয়াছে এই কথা কি কোন সুবিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি বলিবেন? ইতিহাসের মধ্যে সর্ব্বত্র এক রাষ্ট্রের লোক অন্য রাষ্ট্রের লোকের উন্নতির কারণীভূত হইয়াছে এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে।

এক্ষণে, প্রথম সংখ্যায়, ব্রাহ্মসমাজের পন্থা আপনাকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া থাকেন এই কথা যাহা "কিশোরী" উল্লেখ করিয়াছিল, "কৈবারী" (সমর্থক) তাহার উপযুক্ত উত্তর দিয়াছিলেন; তথাপি সেই অর্থ দ্বিতীয় সংখ্যাতেও কেশরী গর্ভিত রাখিয়াছিল। (implied) কেশরী বলে যে, "একে ত, সমস্ত হিন্দুধর্ম্মেরই মূল্য এক

অকিঞ্চিৎকর নহে এই বিশ্বাসে উহাকে ত্যাগ করিতে হইবে এবং আর এক নূতন পন্থা অঙ্গীকার করিতে হইবে—এইরূপ যখন আমরা মনে করি না, এখন ব্রাহ্মসমাজের মত সম্বন্ধে ছোট-খাটো জ্ঞাতব্য বিষয়ে জানিবার জন্য আমাদের আজও আগ্রহ হয় নাই।" উহার গর্ভিত অর্থ এই যে—প্রার্থনা সমাজের লোকেরা সকলেই হিন্দুধর্ম্মের মূল্য কাণাকড়িও নহে এইরূপ মনে করে। এ কিরূপ আরোপ! এই কথা ব্রাহ্মসমাজের উপর আরোপ করিবার পূর্ব্বে, সমাজের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিষয় না হউক, অন্তত কোন একটা মুখ্য মত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ খোঁজখবর লইবার একটু পরিশ্রমও কি আমাদের মিত্রেরা করিয়াছেন? তোমাদের যদি গরজ না থাকে তবে তোমরা সমাজের মত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিও না; কিন্তু টীকা-টিপ্পনী করিতে ত তোমাদের ভাল লাগে? যদি তাহা হয় তবে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা যাহাতে পড়িতে পারেন এরূপ যোগ্যতার সহিত টীকাটিপ্পনী করিতে হইলে, তৎসম্বন্ধে সত্য সংবাদ সংগ্রহ করা কি তোমাদের কর্ত্তব্য নহে? আর তাহাতে বেশী পরিশ্রমও করিতে হইবে না; আমাদের পত্রিকাদি যদি তোমরা নিয়মমত বরাবর পাঠ করিতে, তাহা হইলে তোমরা উহা হইতে সমস্ত খোঁজখবর পাইতে; কিন্তু তোমরা যে তাহা করিয়াছ এরূপ মনে হয় না। সে যাহাই হোক, এই সম্বন্ধে এখন কিছু বলা আবশ্যক।

কেশরী-সম্পাদক তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে যে শ্লোকের এক পাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই শ্লোকের মধ্যে প্রার্থনাসমাজের মুখ্য বীজ নিহিত আছে বলিলেও চলে। শ্লোক-রচনার সময় শ্লোক-রচয়িতার মনের যে অবস্থা ছিল, প্রার্থনাসমাজের মনের অবস্থাও তদ্রূপ। সেই শ্লোকটি এই;—

> তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
> নৈকো মুনির্যস্য মতং প্রমাণম্।
> ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
> মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

"শুষ্ক তর্কে নির্ণয় হয় না। বেদবাক্য (উপনিষদ্বাক্য) পরস্পরবিরুদ্ধ; এমন কোন মুনি নাই যাহার মত প্রমাণ বলিয়া অনুসারে চলা যায়; ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহার মধ্যে নিহিত; অতএব জনসমূহ যে পথে চলিয়াছে সেই পথই ঠিক পথ"। গুহাশব্দের অর্থ দুর্গম স্থান হওয়ায়, ধর্ম্মতত্ত্ব অতীব গহন, উহা করা কঠিন, অতএব জনসমূহ যে পথে চলিয়াছে সেই পথই ঠিক, এইরূপ অর্থ হয়। ইহাতে "মহাজন" অর্থে জনসমূহ। এই শব্দটি অমুক বিশেষ দেশ কিংবা অমুক বিশেষ কালের সূচনা করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই। অতএব সমস্ত পৃথিবীর ও সমস্ত কালের প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন মানবপ্রাণী এইরূপ অর্থই এখানে গ্রহণ করিতে হইবে। তাই, সারাংশে ইহাই নিষ্পন্ন হয় যে, যেহেতু সমস্ত মনুষ্যজাতি ইহার অনুসরণ করিয়া আসিতেছে অতএব ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। মনুষ্যজাতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে কেন?—উহা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম বলিয়াই। অতএব অন্তঃকরণের সহজপ্রবৃত্তি যাহাতে আছে এইরূপ যে ধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীময় পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। তবে, এইরূপ সমস্ত মনুষ্যের অভিমত এবং আপনার অন্তঃকরণের রুচিকর ধর্ম্ম কোনটি তাহা সমস্ত দেশের ধর্ম্মগ্রন্থ দেখিয়া একত্র করিয়া তাহা অবলম্বন করিবে। ইহাই প্রার্থনাসমাজের মুখ্য পক্ষ।

কিন্তু 'গুহা' শব্দের অর্থ, বেশীর ভাগ অন্তঃকরণ কিংবা বুদ্ধিরূপ গুহা—এইরূপ বুঝায়। "অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ" এইরূপ উপনিষদের এক বচন আছে, তাহার অর্থ এইরূপ—"সূক্ষ্মাপেক্ষা সূক্ষ্ম, বৃহৎ অপেক্ষা বৃহৎ—এইরূপ আত্মা প্রাণীদের গুহায় স্থাপিত হইয়াছে"। এখানে গুহাশব্দের অর্থ অন্তঃকরণ কিংবা বুদ্ধি—এইরূপ করিতে হয়। সেইরূপ "তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্", "পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্", "সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ" ইত্যাদি উপনিষদের অনেক বাক্যে 'গুহা' শব্দের অর্থ ঐরূপই গ্রহণ করিতে হইবে, এবং ভাষ্যকারেরাও তাহাই করিয়াছেন। অতএব "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্" ইহার অর্থ এই—ধর্ম্মের তত্ত্ব মনুষ্যের অন্তঃকরণে স্থাপিত আছে। সেই অন্তঃকরণের যে দিক সহজ

প্রবৃত্তি হয় তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম ; অধিকন্তু, উপরে লিখিত তাৎপর্য্যার্থ এই প্রকারে বাচ্যার্থও হয়।

ইহাই প্রার্থনাসমাজের মুখ্য পক্ষ হইলেও, এই যে অন্তঃকরণের ধর্ম্মবৃত্তি, ভরতখণ্ডেই তাহার উন্নতি উৎকৃষ্টরূপে হইয়াছে ; তাই, এই দেশে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা অবলোকন করিয়া, তাহাতে দেশকালের বিশেষত্ব অনুসারে যে বিশেষ অংশ অথবা অসাধারণ অংশ মিশ্রিত হইয়াছে তাহা বাদ দিয়া, যে সকল অংশ সর্ব্বসাধারণ মনুষ্যের অন্তঃকরণের অভিমত তাহা একত্র করিয়া তাহা অবলম্বন করিবেক— ইহাই দ্বিতীয় পক্ষ। এবং এইরূপ নির্ব্বাচিত অংশের মধ্যে কোন কিছু অন্যরাষ্ট্রীয় লোকের আপাততঃ মান্য না হইলেও তাহা আমরা সংগ্রহ করিব। কোন প্রকার সদ্‌গুণ, ঈশ্বরারাধনার কোন প্রণালী, এবং ঈশ্বরের কোন গুণ—এই সমস্ত হিন্দুদিগের অন্তঃকরণে যেরূপ গ্রাহ্য হয় সেইরূপ অন্যরাষ্ট্রীয় লোকের মধ্যে হয় না ; কারণ, তাহাদিগের দেশ-বৃত্তির ক্রমানুসারে তাহাদিগের অন্তঃকরণ তৎপ্রতি বিমুখ হইয়া আছে। তথাপি সেই সদ্‌গুণ সকল, সেই আরাধনাপ্রণালী, সেই ঈশ্বরের গুণসমূহ আমাদের ধর্ম্মের অন্তর্ভূত করা আবশ্যক। উদাহরণ যথা—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ—ইহাদের বিশিষ্ট রূপ, যাহা সাধারণ হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা প্রার্থনাসমাজের মান্য না হইলেও সেই মার্গ প্রার্থনাসমাজের মান্য। তাহার যে সারাংশ অর্থাৎ স্থিরাংশ, তাহা প্রার্থনাসমাজ গ্রহণ করেন। এবং উহার মধ্যে যোগমার্গ কর্ম্মনিষ্ঠ পাশ্চাত্যদেশবাসীর মান্য না হইলেও তাহা সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। সেইরূপ, সন্ন্যাস ইত্যাদি বৃত্তি এবং অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধেও বিচার আলোচনা করা হয়। উপনিষদ্, ভারত, গীতা, ভাগবতাদি পুরাণ, তুকারাম, রামদাস ইত্যাদি প্রাকৃত গ্রন্থে এরূপ বহু অংশ আছে যাহা সমাজের মান্য ও সমাজ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই সকল গ্রন্থের যাহা সারাংশ তাহা সমাজের শিরোধার্য্য ; তাহা অন্তঃকরণের উন্নতিকারক, শান্তিপ্রদ ও অত্যন্ত আনন্দজনক। তাহা অবহেলা করা অত্যন্ত মূর্খতা। হিন্দুদের গ্রন্থে, হিন্দুদের ভাষায়, হিন্দুরীতি অনুসারে প্রকাশিত বিষয় হিন্দুদের নিকট বিশেষ মান্য হইয়া থাকে। এই জন্য সমাজ তাহা গ্রহণ করা প্রথমতঃ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে এবং এই সকল বিষয়, উপদেশ ও আরাধনা উপরোক্ত উপনিষদাদি গ্রন্থে প্রায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কামরূপের ইতিহাসের টুকরা টাকরা।

(আসাম-পর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

(১)

মহীরঙ্গ দানব কামরূপের আদি রাজা বলিয়া অবগত হওয়া যায়। তারপর হাটকাসুর, সম্বরাসুর, রত্নাসুর প্রভৃতি দানব পর্য্যায়ক্রমে কামরূপে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। গৌহাটী হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে "মৈরক" নামে যে পর্ব্বত আছে, কথিত আছে সেখানে মহীরঙ্গ দানব রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্থানীয় লোকদিগের মতে উক্ত পর্ব্বতের যে স্থানে গভীর গহ্বর ও বক্র শিলাখণ্ডসমূহ অদ্যাবধি বিদ্যমান সেখানে তাঁহার পুরী ছিল। অতঃপর নরকাসুর কামরূপের রাজা হন। কালিকাপুরাণের মতে তিনি শোণিতপুর (আধুনিক তেজপুর)-রাজ বাণাসুরের সমসাময়িক। আধুনিক রচিত কামাখ্যা তন্ত্র পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ৺কামাখ্যা দেবীর রূপ-মাধুর্য্যে তাঁহার মোহের আবির্ভাব ও তজ্জন্য তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ হেতু দেবীহস্তে তিনি নিহত হন। কিন্তু দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত তেজপুরে আবিষ্কৃত হর্জ্জরের পুত্র বনমাল দেবের তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ নরককে নিহত করিলে নরকপত্নীর বিলাপে তিনি তীব্র মনোবেদনা প্রাপ্ত হইয়া ভগদত্ত ও বজ্রদত্ত নামে দুই পুত্র উৎপাদন না করিয়া বিরত থাকিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন :—

কৃষ্ণেন তং নিহত্য চ স্বষ্টৌ ভগদত্ত বজ্রদত্তাখ্যৌতস্য।
সুতৌ তদ্বনিতাকরুণবিলাপহৃতহৃদয়েন ॥ ৪

৮ কামাখ্যা দেবীর মাহাত্ম্য প্রচারোদ্দেশে কামাখ্যা তন্ত্র আধুনিক কালে সঙ্কলিত। কামাখ্যা-তন্ত্রে কেবল এই আজগুবি কথার উল্লেখ আছে; অন্য কোন তন্ত্র বা পুরাণ-শাস্ত্রে লেখক ইহা প্রাপ্ত হন নাই।

(২)

যোগিনীতন্ত্র মতে মীনাঙ্ক, গজবাঙ্ক, শুকনাঙ্ক ও মৃগাঙ্ক নামে অভিহিত নরপতিগণ দুই শত বৎসর কামরূপের "লৌহিত্যপুর" নামক স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উপরিউক্ত প্রথম তিন জন রাজার রাজ্যশাসন সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তৎপরে ফিঙ্গুয়া নামে জনৈক রাজা তথায় রাজত্ব করেন। ইঁহার সময়ে "মছলন্দ গাজী" নামক জনৈক মুসলমান লৌহিত্য-পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন। এইরূপ জনপ্রবাদ ফিঙ্গুয়া রাজা কামরূপে রঙ্গীয়ার নিকট "বৈদ্যগড়" নামে একটী গড় খনন করাইয়াছিলেন তেজপুরে মহারাজ ধর্ম্মপাল দেবের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, Major F. Jenkins ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দের Jour. of the A. S. B নামক পত্রিকায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ তাম্রশাসনে উল্লিখিত পাঁচজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে।

(৩)

দেবেশ্বর—

শকাব্দের প্রারম্ভে (প্রায় ৭৮ খ্রীঃ অব্দে) কামরূপ রাজ্য মিথিলার (১) অধীন অথবা ইহার অংশবিশেষ ছিল। তৎকালে দেবেশ্বর নামক জনৈক শূদ্রবংশীয় মিথিলারাজ কামরূপে লিঙ্গপূজার প্রবর্ত্তন করেন এবং জনৈক ব্রাহ্মণ (শঙ্কর কাপালিক ?) দ্বারা যোগিনীতন্ত্র সঙ্কলিত করাইয়া কপটতা-পূর্ব্বক প্রচার করেন যে, এই ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তি-সমূহ দেবাদিদেব মহাদেবের মুখ-নিঃসৃত। এই দেবেশ্বর শালিবাহন রাজার সমসাময়িক ছিলেন। উক্ত শতাব্দীতে দেবসা বা দেভাসা নামক স্থানের মানচিত্র দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে, আধুনিক কামরূপ আসামের পার্ব্বত্য বিভাগ ও কঙ্গগিরি (এক্ষণে ভূটানরাজের অধিকারভুক্ত) প্রভৃতি স্থান উহার অন্তর্গত ছিল। রাজা দেবেশ্বরের অনেকগুলি মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। Dr. Buchanon রংপুর জেলার Official Statisticsএ ইঁহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪)

খৃষ্টীয় প্রায় ৬০৬ অব্দে গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করেন। বাণভট্ট তদীয় হর্ষচরিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি কর্ণসুবর্ণ নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন। এই কর্ণসুবর্ণ বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ হইতে বার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল, উহা এক্ষণে রাঙ্গা-মাটী নামে অভিহিত। য়ুয়ণ চং (Hiuen Tsang) শশাঙ্ককে গৌড়ের (পুণ্ড্রবর্দ্ধনের) রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু হইলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুপ্তবংশীয় মাধব গুপ্ত সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের প্রিয় বয়স্য ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর মাধবপুত্র আদিত্য সেন মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণে সাহসী হন।

আদিত্য সেনের দৌহিত্রী (বৎস দেবীর) পুত্র-সহ ভগদত্তবংশীয় কামরূপরাজ হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীর বিবাহ হইয়াছিল। মৌখরিবংশীয় "ভোগবর্ম্মণ" মগধের গুপ্তবংশীয় মহারাজ আদিত্য সেনের জামাতা ছিলেন:—

মাধব গুপ্ত = শ্রীমতী দেবী (স্ত্রী)
|
আদিত্য-সেন
|
দেব গুপ্ত | কন্যা = ভোগবর্ম্মণ (মৌখরি-রাজ)
|
বৎস দেবী = শিবদেব

উদয় দেব
|
নরেন্দ্র
|
হর্ষদেব

জয়দেব = রাজ্যমতী

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে ভগদত্ত-বংশীয় হর্ষদেব সুযোগ বুঝিয়া গৌড়, উড্র প্রভৃতি জনপদ জয় করিয়া "গৌড়োড্রাদি-কলিঙ্গ-কোশ-লাধিপ" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। রাখাল বাবু অনুমান করেন, "অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে গৌড়দেশ, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশল কামরূপ-রাজগণের হস্তগত হয়।

(১) ইহা রাজর্ষি জনকের পুরী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার অপর নাম "বিদেহ"।

(৫)

রাজগণের সংক্ষিপ্ত তালিকা—

(ক) বরাহ
- নরক
- ভগদত্ত
- বজ্রদত্ত (মহাভারতের মতে)
- • • • • •
- পুষ্যবর্ম্মা
- সমুদ্রবর্ম্মা
- বলবর্ম্মা
- কল্যাণ বর্ম্মা
- গণপতি বর্ম্মা
- মহেন্দ্র বর্ম্মা
- নারায়ণ বর্ম্মা
- মহাভূত বর্ম্মা
- চণ্ডমুখ বর্ম্মা
- স্থিতি বর্ম্মা
- সুস্থিতবর্ম্মা (নামান্তর মৃগাঙ্ক)
- সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মা, ভাস্করবর্ম্মা
- • • • •

(খ) স্তম্ভবংশীয় নৃপতিগণ :—
- শালস্তম্ভ
- বিগ্রহস্তম্ভ
- পলকস্তম্ভ
- বিজয়স্তম্ভ
- • • •
- হরিষ

(গ) প্রলম্ব* = জীবদা (স্ত্রী)
- •
- হর্জ্জর = তারা (স্ত্রী)
- বনমাল দেব
- জয়মল
- বীরবাহু
- বলবর্ম্মা দেব

(ঘ) ব্রহ্মপাল = কুলদেবী (স্ত্রী)
- রত্নপাল
- ইন্দ্রপাল

(ঙ) পালবংশীয় নিম্নলিখিত রাজগণ কামরূপ আক্রমণ করেন—

(১) ধর্ম্মপাল, (২) দেবপালের আদেশে তদীয় অনুজ জয়পাল, (৩) রামপাল দেবের সেনাপতি মারণ, (৪) কুমারপালের মন্ত্রী ও সেনাপতি বৈদ্যদেব।

* শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের অনুমান-মতে প্রলম্ব ভগদত্তবংশীয়; জয়মল বা তাঁহার পৌত্র, ত্রিবিদেবপালের সমসাময়িক—গৌড়রাজ মালা, পৃঃ ৩১

(৬)

যাদববংশীয় জাতবর্ম্মা—

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার রূপগঞ্জ থানার অধীন মহেশ্বরী পরগণার অন্তর্গত বেলাব গ্রামে নৃপতি ভোজবর্ম্মার যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে উল্লেখ আছে, "যে যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভোজবর্ম্মার বংশ সেই যদুবংশ হইতে উদ্ভূত।" ঐ তাম্রশাসনখানি দৈর্ঘ্যে ১০৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৯॥০ ইঞ্চি। ভোজবর্ম্মার পিতামহ জাতবর্ম্মা "কামরূপ" বিজয় করিয়া কর্ণ-দুহিতা বীরশ্রীর পাণিগ্রহণ করেন। তৎসম্বন্ধে এক্ষণে উক্ত তাম্রশাসন হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :—

জাতবর্ম্মা ততোজাতো গাঙ্গেয় শান্তনোঃ
দয়াব্রতং রণঃক্রীড়া ত্যাগো যস্য মহোৎসবঃ।
গৃহ্ণন্ বৈণ্যপৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রিয়ম
যো [ং] গেষু প্রথমন্থিরং পরিভবং স্তাং
কামরূপশ্রিয়ম্। নিন্দন্ দিব্য ভুজশ্রিয়ং
বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ম কুবন শ্রোত্রীয়
যাচিছ্র্য়ম বীতভবান্ যাং সার্ব্বভৌমশ্রিয়ম। * *

ঐ কর্ণ চেদিরাজ্যের অধিপতি ও কলচুরীবংশীয় ছিলেন। দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে চেদির কলচুরিগণ তাঁহার অধীনে শক্তিশালী হইয়া উঠেন। ত্রিপুরী নগরী (জব্বলপুরের নিকট বর্ত্তমান তিবর) কলচুরী বংশের আদিম রাজধানী ছিল। গৌড়াধিপ ১ম বিগ্রহপাল কলচুরী রাজকুমারী লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করায় চেদির কলচুরী বংশের সহিত গৌড়ের পালবংশ পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। তৎপরে ৩য় গৌড়াধিপতি বিগ্রহপাল কর্ণের অপর দুহিতা "যৌবনশ্রী"কে এবং মগধ ও অঙ্গের রাষ্ট্রকূট-রাজ মথন দেবের ভগিনী শঙ্কর দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন (রামচরিত কাব্য, ১। ৯ টীকা)। ৩য় রামপালের জীবনচরিত অবলম্বনে যে রামচরিত কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহার টীকার একাংশে উল্লেখ আছে যে, ৩য় বিগ্রহপাল দাহনরাজ (২) কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে পরাভূত করিয়া এবং পরিশেষে

* তাম্রশাসনের উক্ত অংশটী অত্যন্ত ভ্রমসঙ্কুল মনে হয়। তাকিং

(২) চেদিরাজ্যের পরিমাণ "দাহল" নামে অভিহিত হইত। উহার রাজধানীর নাম ছিল ত্রিপুরী নগরী।

তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া তাঁহার দুহিতা "যৌবনশ্রী"র পাণিগ্রহণ করেন। তাহা হইলে উপরিউক্ত কামরূপ-বিজেতা জাতবর্ম্মার সহিত উক্ত গৌড়াধিপতির শালিপতি সম্বন্ধ ছিল ঃ—

শানজাতির আগমনের পূর্ব্বে —
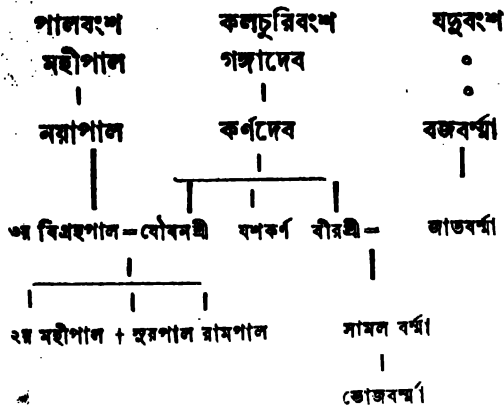
উপর আসামে (Upper Assam) শান-জাতির অধিকারের বহু পূর্ব্বে সেনবংশীয় রাজ-গণের শাসন-শৈথিল্য বশতঃ বড় ভুঁইয়ারা (ভূস্বামী) বিজনী, ফুলগুরী প্রভৃতি কামরূপের নানা স্থানে শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তৎ-কালে "হাজো" নামে জনৈক মেছ (মতান্তরে কোচ) জাতীয় শাসনকর্ত্তা কামরূপের একাংশে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই হাজোর "হীরা ও জীরা" নামে দুই কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। হিরা বা হরিয়া মণ্ডল (৩) নামক জনৈক মেছ সর্দ্দার তাঁহার এই কন্যাদ্বয়ের পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে হীরা ও জীরার গর্ভে বিশু ও শিশু নামে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। বিশু বা বিশ্বসিংহ কোচবংশের আদি রাজা। বর্ত্তমান কোচবিহারের অন্তর্গত "আঠার কোঠা" নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত ছিল। কোচবিহারের ইতিহাসে (রাজো-পাখ্যান) বিশ্বসিংহের তিন পুত্রের এবং দরঙ্গ বংশা-বলীতে অষ্টাদশ পুত্রের নাম পাওয়া যায়। ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে কোচেরা (৪) এবং ১৬১৫ খ্রীঃ অব্দে মুসলমানেরা তাঁহাদের প্রাধান্য সংস্থাপনার্থ ঐ রাজ্য আক্রমণ করেন। তখনও কামরূপের সকল অংশে অহমদিগের প্রভাবপ্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পশ্চিমাংশে কোচরাজগণের এবং পূর্ব্বাংশে অহমগণের অধিকার স্থাপিত হয়।

(৮)

বৌদ্ধধর্ম্ম—

হাঙ্গেরীয়া দেশীয় পরিব্রাজক ও প্রগাঢ় পণ্ডিত Cosmo-de-Karos দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, "গৌহাটীতেই দুইটী শাল বৃক্ষের পাদদেশে বুদ্ধ-দেব দেহ ত্যাগ করেন।" তিব্বত ও ভূটান-দেশীয় লোকেরাও ঐরূপ ধারণার বশবর্ত্তী। যাহা হউক সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কামরূপে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, অনুসন্ধিৎসার দ্বারা তাহা সম্যক অবগত হওয়া যায়। তত্রত্য বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের বংশ-ধরেরা পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রচারকগণের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে থাকায় এক্ষণে বৌদ্ধযুগের কয়েকটী নিদর্শন-স্মৃতি ব্যতীত উহার অস্তিত্বের বিলোপ-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানে কামরূপে যে সকল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বসবাস করিতেছেন তাঁহা-দের অধিকাংশই অন্যদেশীয় লোক—শান ও ভূটিয়া। কামরূপের ৺ কামেশ্বর বা ৺ কামাখ্যা দেবালয় এক্ষণে হিন্দুদিগের বিশেষতঃ শাক্তধর্ম্মা-বলম্বীদিগের অন্যতম প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। পূর্ব্বে উহা বৌদ্ধ দেবালয় ছিল। এখানকার মন্দিরা-ভ্যন্তরে যে প্রস্তরময় "যোনিমুদ্রা"র পূজা-বিধি প্রবর্ত্তিত আছে তাহা বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গৃহীত। বৌদ্ধপুরাণে এই যোনিমুদ্রা "প্রজ্ঞাদেবী" বা জগন্মাতা নামে অভিহিত। বৌদ্ধদিগের প্রজ্ঞা দেবী এক্ষণে হিন্দুদিগের নিকট পূজিত হইতেছে— ৺ কামাখ্যামন্দিরে বৌদ্ধযুগের উহা একটী নিদর্শন। কামরূপে "হাজো ও মঙ্গলচণ্ডী" দেবালয়ের শিলা-মূর্ত্তিগুলি অদ্যাবধি বৌদ্ধ তান্ত্রিক যুগের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।

+ ২য় মহীপাল রাজা হইয়া স্বীয় সহোদর শূরপাল ও রামপালকে নিগড়বদ্ধ করেন। "দিব্বোক" নামে জনৈক কৈবর্ত্তপতি তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকে রাজা করেন। রামপাল ভীমকে বধ করিয়া রাজ্যোদ্ধার করেন।

(৩) হিরা বা হরিয়া মণ্ডল—ইনি গোয়ালপাড়া জেলার "খুটা-ঘাট" পরগণার অন্তর্গত 'চিকণ গ্রামে' বসবাস করিতেন। উক্ত জেলায় (১) পাণবার (২) পিডিলা, (৩) পেডপিডো, (৪) বারিহানা, (৫) কাঠিয়া, (৬) গোবার, (৭) মেঘা, (৮) বৈশাগু, (৯) জগাই, (১০) গুড়িকাটা, (১১) দাখার, (১২) যুগবার প্রভৃতি স্থান যে ১২ জন মেছ-সর্দ্দার (ভুঁইয়া) কর্ত্তৃক শাসিত হইত, তিনি তাঁহাদিগের মণ্ডল বা প্রধান ছিলেন।

He (Bisu) Married a number of wives by whom he had eighteen sons, including Malla Deva, Sukladhoj, Nar sing and Gosain Kamal—Gait's Assam History. P. 47.

(৪) কোঁচবিহারৰ ৰজা কোঁচবংশৰ হোৱাৰ নিমিত্তে ভাটী অঞ্চলৰ কোঁচে ৰাজবংশী বুলি কয়—স্বৰ্গীয় গুণাভিরাম বড় য়া কৃত আসাম বুৰঞ্জী।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ।
দৃষ্টি হীন নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যাজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর॥

কথা—রাজা রামমোহন রায়। স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ২´ ৩ •
{ মা ণদা II -া দা পা -মা। পা মা -া -পগা। -া গা -ঋা -া। সা -া -া সা I
ম নে॰ ॰ ॰ ক র ॰ শে ষে ॰ ॰ ॰ র ॰ ॰ সে ॰ ॰ দি

১ ২´ ৩ •
I ঋা মা মা -পা। মা -দা -া -া। -া দদা -পমা -গা। -মা -গা } -া পা I
ন ভ য় ॰ ঙ্ক ॰ ॰ ॰ ॰ র॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ ॰ অ

১ ২´ ৩ •
I পা দা র্সা না। র্সা র্সা -া -া। -া নর্সা ণা -দা। পা -া -া পা I
ন্যে বা ॰ ক্য ক বে ॰ ॰ ॰ কি॰ ন্তু ॰ ॰ ॰ ॰ তু

১ ২´ ৩ •
I দা ণদা ণদা -পা। পমা ণদা -া দা। -া দদা -পমা -গা। -মা -গা মা ণদা II
মি র॰ বে॰ ॰ নি॰ রু॰ ॰ ত্ত ॰ র॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ "ম নে॰"

১ ২´ ৩ •
-া পা II দা না -র্সা র্সা। র্সা র্সা -া -া। -া র্সনা -র্সা র্সা। -া -া -া দা I
॰ যা র প্র ॰ তি য ত ॰ ॰ ॰ মা॰ ॰ য়া ॰ ॰ ॰ কি

১ ২´ ৩ •
I দা না -র্সা র্সা। ঋা ঋা -া -র্নসা। -া নর্সা ণা -দা। -পা -া -া পা I
বা পু ॰ ত্র কি বা ॰ ॰॰ ॰ জা॰ য়া ॰ ॰ ॰ ॰ তা

১ ২´ ৩ •
I দা দা ঋা র্সা। র্সনা র্সা -া -া। -া নর্সা ণা -দা। -পা -া -া পা।
র মু ॰ খ চে॰ য়ে ॰ ॰ ॰ ত॰ ত ॰ ॰ ॰ ॰ হ

১ ২´ ৩ •
। দর্সা ণদা -া পা। -া -া দা -া। -া দদা -পমা -গা I -মা -গা মা ণদা II
ই॰ বে॰ ॰ কা ॰ ॰ ত ॰ ॰ র॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰ "ম নে॰

ভৈরব—তেতালা।

অসার বিশ্ব সংসার সার সত্যের সাধন।
চঞ্চল তড়িৎসম জীবের জীবন।
ত্যজিয়ে সংসার পাশ, কর মোক্ষ অভিলাষ,
ধর্ম্ম বলে কর জয় দুর্জ্জয় শমন॥

কথা—*　　　　　　　　　　স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

০　　　　　১　　　　　২´　　　　　৩
গাম ণদা -া পা II -া মগা -মা পা। ণদা -ণদা -পা -দপা। -দমা পা মা -া।
অ০ সা ০ র ০ বি০ ০ শ্ব সং০ ০০ ০ ০০ ০০ সা র ০

০　　　　　১　　　　　২´　　　　　৩
।-পমা -পগা -া সা I ঋা মা -গপা মা। মা পা -গা -মা। -গা ঋা সা -া।
০০ ০০ ০ সা র স ০০ ত্যে র সা ০ ০ ০ ধ ন ০

০　　　　　১　　　　　২´　　　　　৩
।-া -া -া ঋা। সা ণ্দ্ -া ন্ া। সা -মা -া -া। -গা পা মা -া।
০ ০ ০ চ ঞ্চ ল০ ০ ত ড়ি ০ ০ ০ ৎ স ম ০

০　　　　　১　　　　　২´　　　　　৩
।-গা -মা -গা মা I -ণা দা -র্সনা র্সা। র্সনা -র্সনা -দা পা। দপা -দমা -পগা -মগা II
০ ০ ০ জী ০ বে ০০ র জী০ ০০ ০ ব ন০ ০০ ০০ ০০

　　১　　　　　২´　　　　　৩　　　　　০
পা II পা মা -ণা -দা। র্সা -া র্সা র্সা। -া র্সনা -র্সা র্সা। -র্সা -দা -া র্সনা I
ত্য জি য়ে ০ ০ সং ০ সা র ০ পা০ ০ শ ০ ০ ০ ক০

১　　　　　২´　　　　　৩　　　　　০
I র্সা র্মা -া র্মা। র্পা র্মা র্গা -র্ঋা। -র্সা -র্ঋা -র্সা -া। -র্সা -দা -া দা I
র মো ০ ক্ষ অ ভি ০ ০ ০ লা ষ ০ ০ ০ ০ ধ

১　　　　　২´　　　　　৩　　　　　০
I দা পা -দা পা। পা মা -া -পগা। -মা -গা মা ণদা। -র্সা -া -া পা I
র্ম্ম ব ০ লে ক র ০ ০০ ০ ০ জ য় ০ ০ ০ দু

১　　　　　২´　　　　　৩
I দা দর্সা -নর্ঋা র্সা। নর্সা -নর্সা -দা -পা। দপা -দমা -পগা -মগা II II
র্জ্জ য়০ ০০ শ ম০ ০০ ০ ০ ন০ ০০ ০০ ০০

---

* এই গানটী আদিব্রাহ্মসমাজের প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীতের প্রথম ভাগে থাকাতে জানা যাইতেছে যে, ইহা রাজা রামমোহন রায়ের রচিত অথবা তাঁহার সমসাময়িক ব্রহ্মসভার কোন সভ্যের রচিত। কিন্তু আমরা এই গানটী রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লিখিত দেখি না। তঃ সং

গীতা-রহস্য অথবা কর্ম্মযোগ-পরিশিষ্ট।

৪ ভাগ—ভাগবত ধর্ম্মের উদয় ও গীতা।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

গীতারহস্যের অনেক স্থানে এবং এই প্রকরণেও প্রথমে বলিয়াছি যে. উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান ও কাপিল সাংখ্যের ক্ষরাক্ষর-বিচারের সঙ্গে ভক্তির এবং বিশেষত নিষ্কাম কর্ম্মের মিল স্থাপন করিয়া, শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে কর্ম্মযোগের পূর্ণ সমর্থন করাই গীতাগ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, কিন্তু এত বিষয়ের সমন্বয় করিবার গীতার পদ্ধতিটি যাঁহাদের সম্পূর্ণ হৃদ্গত হয় না, এবং এত বিষয়ের সমন্বয় করা অসম্ভব যাঁহাদের প্রথম হইতেই এই ধারণা হয়, তাঁহাদের নিকট গীতার অনেক সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উদাহরণ যথা—এই আপত্তিকারীদের মত এই যে, এই জগতে যাহা কিছু আছে সে সমস্তই নির্গুণ ব্রহ্ম ত্রয়োদশ অধ্যায়ের এই উক্তি এই সমস্ত সগুণ বাসুদেবই সপ্তম অধ্যায়ের এই উক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী ; এই প্রকারই ভগবান একস্থলে বলিতেছেন যে, "আমার নিকট শত্রুমিত্র দুই-ই সমান" (৯. ২৯), আবার অন্য স্থানে ইহাও বলিতেছেন যে, "জ্ঞানী ও ভক্তিমান পুরুষ আমার অত্যন্ত প্রিয়" (৭. ১৭ ; ১২. ১৯)—এই দুই উক্তি পরস্পরবিরুদ্ধ। কিন্তু গীতা-রহস্যে আমি অনেক স্থানে স্পষ্ট দেখাইয়াছি যে, বস্তুত এই বিরোধ নাই, কিন্তু একই বিষয়সম্বন্ধে একবার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, আর একবার ভক্তিদৃষ্টিতে বিচার করায়, এই বিরোধী বিষয় বলা হইয়াছে মনে হইলেও, শেষে ব্যাপক তত্ত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে গীতায় উহাদের মিলও স্থাপিত করা হইয়াছে। ইহার উপরেও কেহ কেহ এই আপত্তি করেন যে, অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্যক্ত পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তির মধ্যে উক্ত প্রকার মিল স্থাপিত হইলেও মূল গীতায় এই মিল স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে ; কারণ মূল-গীতা বর্ত্তমান গীতার ন্যায় পরস্পরবিরোধ-প্রচুর নহে, তাহার মধ্যে বেদান্তীরা কিংবা সাংখ্যশাস্ত্রাভিমানীরা নিজ নিজ শাস্ত্রের অংশ পরে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। উদাহরণ যথা—প্রো. গার্বে বলেন যে, মূল গীতায় কেবল সাংখ্য ও যোগেরই সহিত ভক্তির মিল স্থাপিত হইয়াছে, বেদান্তের সহিত এবং মীমাংসকদিগের কর্ম্মমার্গের সহিত ভক্তির মিল স্থাপনের কাজ কেহ পরে করিয়াছে। মূল গীতায় এই প্রকার যে শ্লোক পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার, নিজ মতানুসারে, এক তালিকাও তিনি জর্ম্মন ভাষায় অনুবাদিত নিজের গীতার শেষে দিয়াছেন! আমার মতে, এই সমস্ত কল্পনা ভ্রান্তিমূলক। বৈদিক ধর্ম্মের বিভিন্ন অঙ্গের ঐতিহাসিক পরম্পরা এবং গীতার 'সাংখ্য' ও 'যোগ' এই দুই শব্দের প্রকৃত অর্থ ঠিক না বুঝিবার কারণে, এবং বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞানবিরহিত অর্থাৎ শুধু ভক্তিমূলক খৃষ্টধর্ম্মেরই ইতিহাস উক্ত লেখকদিগের (প্রো. গার্বে প্রভৃতির) চক্ষের সম্মুখে থাকায় এই প্রকার ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে। মূলে খৃষ্টধর্ম্ম নিছক ভক্তিমূলক ছিল ; এবং গ্রীকলোকদিগের এবং অন্যদিগের তত্ত্বজ্ঞানের সহিত উহার মিল স্থাপন করিবার কার্য্য পরে করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মের কথা সেরূপ নহে। হিন্দুস্থানে ভক্তিমার্গের আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বেই মীমাংসকদিগের যজ্ঞমার্গ, উপনিষৎকারদিগের জ্ঞান এবং সাংখ্য ও যোগ,—এই সমস্ত পরিপক্ব অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। সেইজন্য প্রথম হইতেই আমাদের দেশবাসীদের স্বতন্ত্র রীতিতে প্রতিপাদিত এমন ভক্তিমার্গ কখনও মান্য হওয়া সম্ভব ছিল না, যাহা এই সমস্ত শাস্ত্র হইতে আরও বিশেষভাবে উপনিষদ-সমূহে বর্ণিত ব্রহ্মজ্ঞানকে ছাড়িয়া থাকে। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, গীতার ধর্ম্মপ্রতিপাদনের স্বরূপ, প্রথম হইতেই প্রায় বর্ত্তমান গীতার প্রতিপাদনের সমানই ছিল তাহা না মানিয়া থাকা যায় না। গীতারহস্যের বিচারও এই বিষয়েরই উপর দৃষ্টি রাখিয়া করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয় অত্যন্ত গুরুত্ববিশিষ্ট বলিয়া গীতাধর্ম্মের মূলস্বরূপ ও পরম্পরা-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে, আমাদের মতে কোন্ কোন্ বিষয় নিষ্পন্ন হয় এখানে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

গীতারহস্যের দশম প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি যে, বৈদিক ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাচীন স্বরূপ না ছিল ভক্তিপ্রধান, না ছিল জ্ঞানপ্রধান এবং না ছিল যোগপ্রধান ; কিন্তু উহা যজ্ঞময় অর্থাৎ কর্ম্মপ্রধান ছিল, এবং বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণসমূহে বিশেষভাবে এই যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মমূলক ধর্ম্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে, পরে এই ধর্ম্মই জৈমিনীর মীমাংসাসূত্রে সুব্যবস্থিতরূপে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম হইল 'মীমাংসকমার্গ'। কিন্তু 'মীমাংসক' এই নাম নূতন হইলেও, ইহা নিঃসন্দেহ যে, যাগযজ্ঞাদিধর্ম্ম অত্যন্ত প্রাচীন ; অধিক কি, ঐতিহাসিকদৃষ্টিতে ইহাকে বৈদিকধর্ম্মের প্রথম ভিত্তি বলা যাইতে পারে। 'মীমাংসকমার্গ' নাম প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে উহার নাম ছিল ত্রয়ীধর্ম্ম, অর্থাৎ তিন বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত

[illegible] এবং এই মামই গীতাতেও প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ৯.২০ ও ২১ দেখ)। কর্মময় ব্রহ্মীবর্গ এইরূপ মত প্রচলিত থাকিলে পর, কর্মের দ্বারা অর্থাৎ কেবল যাগযজ্ঞাদির বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ কিরূপে হইবে? জ্ঞানলাভ একটা মানসিক অবস্থা হওয়ায় পরমেশ্বর-স্বরূপের বিচার করা ব্যতীত জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে, ইত্যাদি বিষয় ও কল্পনা বাহির হইতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে উহারই মধ্য হইতে ঔপনিষদিক জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইল। এই বিষয় ছান্দোগ্যাদি উপনিষদের প্রারম্ভে প্রদত্ত অবতারণা হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। এই ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞানই পরে 'বেদান্ত' নাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মীমাংসা শব্দের ন্যায় বেদান্ত নাম পরে প্রচলিত হইলেও ইহা বলা যায় না যে, ব্রহ্মজ্ঞান কিংবা জ্ঞানমার্গও নূতন। ইহা সত্য যে, কর্মকাণ্ডের পরই জ্ঞানকাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু এই উভয়ই প্রাচীন এ কথা যেন মনে থাকে। কাপিল সাংখ্য এই জ্ঞানমার্গেরই অপর, কিন্তু স্বতন্ত্র, শাখা। গীতারহস্যে ইহা উক্ত হইয়াছে যে, একদিকে ব্রহ্মজ্ঞান অদ্বৈতী, ওদিকে সাংখ্য দ্বৈতী; এবং সৃষ্টির উৎপত্তিক্রম সম্বন্ধে সাংখ্যদিগের বিচার মূলে ভিন্ন। কিন্তু ঔপনিষদিক অদ্বৈতী ব্রহ্মজ্ঞান এবং সাংখ্যের দ্বৈতীজ্ঞান, দুই-ই মূলে বিভিন্ন হইলেও কেবল জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে, এই দুই মার্গ তৎপূর্বের যাগযজ্ঞাদি কর্মমার্গের সমানই বিরোধী ছিল। তাই, কর্মের সহিত জ্ঞানের মিল কিরূপে স্থাপন করা যাইবে এই প্রশ্ন স্বভাবত উত্থিত হইল। এই কারণে উপনিষদের কালেই এই বিষয়ে দুই পক্ষ হইয়াছিল। তন্মধ্যে বৃহদারণ্যকাদি উপনিষৎ ও সাংখ্য বলিতে লাগিলেন যে, কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে নিত্য বিরোধ থাকায়, জ্ঞান হইলে পর কর্ম ছাড়িয়া দেওয়া শুধু প্রশস্ত নহে, কিন্তু আবশ্যকও। পক্ষান্তরে, ঈশাবাস্যাদি অন্য উপনিষৎ প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন যে, জ্ঞানোদয়ের পরেও কর্ম ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, বৈরাগ্যযোগে বুদ্ধিকে নিষ্কাম করিয়া জগতে ব্যবহারসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তিকে সমস্ত কর্ম করিতেই হইবে। এই সকল উপনিষদের ভাষ্যসমূহে এই ভেদ দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণের শেষে যে বিচার আছে তাহা হইতে উপলব্ধি হইবে যে, শাঙ্করভাষ্যের এই সাম্প্রদায়িক অর্থ টানা-বোনা করিয়া করা হইয়াছে; এবং এইজন্য এই সকল উপনিষদের উপর স্বতন্ত্র রীতিতে বিচার করিবার সময় ঐ অর্থ গ্রাহ্য বলিয়া মানা যাইতে পারে না। শুধু যাগযজ্ঞাদি কর্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানেরই মধ্যে মিল স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল তাহা নহে; কিন্তু মৈত্র্যুপনিষদের বিচার আলোচনা হইতে ইহাও সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, কাপিল-সাংখ্যে সর্বপ্রথম স্বতন্ত্রীতিতে উৎপন্ন [illegible] জ্ঞান এবং উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানের সমন্বয়—যতটা সম্ভব—করিবারও প্রযত্ন এই সময়েই আরম্ভ হইয়াছিল। বৃহদারণ্যকাদি প্রাচীন উপনিষদসমূহে, কাপিল-সাংখ্যজ্ঞানের কোন প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। কিন্তু মৈত্র্যুপনিষদে, সাংখ্যদিগের পরিভাষা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে যে, শেষে এক পরব্রহ্ম হইতেই সাংখ্যদিগের চতুর্বিংশ তত্ত্ব নির্মিত হইয়াছে। তথাপি কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রও বৈরাগ্যমূলক অর্থাৎ কর্মের বিরুদ্ধ। তাৎপর্য্য এই যে, প্রাচীনকালেই বৈদিকধর্মের তিন দল হইয়াছিল—(১) কেবল যাগযজ্ঞাদি কর্ম করিবার মার্গ; (২) জ্ঞান ও বৈরাগ্যযোগে কর্মসন্ন্যাস করা অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা বা সাংখ্যমার্গ; এবং (৩) জ্ঞানযোগে ও বৈরাগ্যবুদ্ধিতেই নিত্য কর্ম করিবার মার্গ অর্থাৎ জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়ের মার্গ। ইহাদের মধ্যে, জ্ঞানমার্গ হইতেই পরে অন্য দুই শাখা—যোগ ও ভক্তি—উৎপন্ন হইয়াছে। ছান্দোগ্যাদি প্রাচীন উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভের জন্য ব্রহ্মচিন্তন অত্যন্ত আবশ্যক; এবং এই চিন্তন, মনন ও ধ্যান করিবার জন্য চিত্তকে একাগ্র করা আবশ্যক; এবং চিত্তকে স্থির করিবার জন্য পরব্রহ্মের কোন একটি সগুণ প্রতীক প্রথমে চোখের সম্মুখে রাখিবে। এই প্রকার ব্রহ্মোপাসনা করিতে থাকিলে চিত্তের যে একাগ্রতা হয়, পরে তাহাকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইতে লাগিল এবং চিত্তনিরোধরূপ যোগ একটি ভিন্ন মার্গ হইয়া পড়িল; এবং যখন সগুণ প্রতীকের পরিবর্তে পরমেশ্বরের মানবরূপধারী ব্যক্ত প্রতীকের উপাসনা আরম্ভ হইতে লাগিল, তখন শেষে ভক্তিমার্গ বাহির হইল। এই ভক্তিমার্গ ঔপনিষদিক জ্ঞান হইতে পৃথক, মাঝখান হইতে স্বতন্ত্ররূপে উৎপন্ন, হয় নাই; এবং ভক্তির কল্পনাও অন্য কোন দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসে নাই। সমস্ত উপনিষদ দেখিলে এই ক্রম দেখা যায় যে, প্রথমে ব্রহ্মচিন্তনের নিমিত্ত যজ্ঞের অঙ্গসমূহের কিংবা ওঁকারের, পরে রুদ্র, বিষ্ণু ইত্যাদি বৈদিক দেবতার, অথবা আকাশাদি সগুণ ব্যক্ত ব্রহ্মপ্রতীকের উপাসনা শুরু হয়; শেষে এই কারণেই অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্যই রাম, নৃসিংহ, শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব ইত্যাদির ভজনা, অর্থাৎ একপ্রকার উপাসনা, প্রচলিত হইয়াছে। উপনিষদসমূহের ভাষা হইতে ইহাও স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, উহাদের মধ্যে যোগতত্ত্বাদি যোগসম্বন্ধীয় উপনিষদ এবং নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী প্রভৃতি ভক্তিসম্বন্ধীয় উপনিষৎ ছান্দোগ্যাদি উপনিষৎ অপেক্ষা অর্বাচীন। অতএব ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বলিতে হয় যে, ছান্দোগ্যাদি প্রাচীন উপনিষদে বর্ণিত কর্ম, জ্ঞান কিংবা সন্ন্যাস, এবং জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়

এই তিন মার্গের উদ্ভব হইবার পরই পরে যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গ প্রাধান্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু যোগ ও ভক্তি এই দুই সাধন এইরূপে শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত হইলেও তৎপূর্ববর্তী ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই—এবং হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। তাই, যোগ-প্রধান ও ভক্তিপ্রধান উপনিষদেও, ব্রহ্মজ্ঞানকে ভক্তি ও যোগের অন্তিম সাধ্য বলা হইয়াছে; এবং এরূপ বর্ণনাও কয়েক স্থলে পাওয়া যায় যে, যাহারা রুদ্র, বিষ্ণু, অচ্যুত, নারায়ণ ও বাসুদেব প্রভৃতির ভজনা করে, তাহারাও পরমাত্মার কিংবা পরব্রহ্মের রূপ (মৈত্র্য. ৭. ৭; রামপূ. ১৬; অমৃতবিন্দু, ২২. প্রভৃতি দেখ)। সারকথা, বৈদিক ধর্ম্মে সময়ে সময়ে আত্মজ্ঞানী পুরুষেরা যে ধর্মাঙ্গ-সকল প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন সময়ে প্রচলিত ধর্মাঙ্গ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; এবং প্রাচীন কালে প্রচলিত ধর্মাঙ্গের সহিত নব ধর্মাঙ্গের মিল করাই বৈদিক ধর্মের অভিবৃদ্ধির আরম্ভ হইতে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; এবং বিভিন্ন ধর্মাঙ্গের সমন্বয় করিবার এই উদ্দেশ্যকেই স্বীকার করিয়া পরে স্মৃতিকারেরা আশ্রম-ব্যবস্থাধর্মের প্রতিপাদন করিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্মাঙ্গ-সমূহের সমন্বয় করিবার এই প্রাচীন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করিলে একমাত্র গীতাধর্মই উক্ত পূর্ব্বাপর পদ্ধতিকে ছাড়িবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ বলা সযুক্তিক নহে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থের যাগযজ্ঞাদি কর্ম, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান, কাপিল সাংখ্য, চিত্তনিরোধরূপ যোগ ও ভক্তি, ইহাই বৈদিকধর্মের মুখ্য মুখ্য অঙ্গ এবং ইহাদের উৎপত্তিক্রমের সাধারণ ইতিহাস উপরে বলা হইয়াছে। এক্ষণে, গীতায় এই সমস্ত ধর্মাঙ্গের যে প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহার মূল কি—অর্থাৎ ঐ প্রতিপাদন সাক্ষাৎ বিভিন্ন উপনিষৎ হইতে গীতায় গৃহীত হইয়াছে কিংবা মাঝে তাহার আরও সোপান আছে—তাহার বিচার করিব। শুধু ব্রহ্মজ্ঞানের বিচারের সময় কঠাদি উপনিষদের কোন কোন শ্লোক গীতায় যেমনটি তেমনি গৃহীত হইয়াছে এবং জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় পক্ষের প্রতিপাদন করিবার সময় জনকাদির ঔপনিষদিক দৃষ্টান্তও প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, গীতাগ্রন্থ সাক্ষাৎ উপনিষৎ অবলম্বনেই রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু গীতাতেই প্রদত্ত গীতাধর্মের পরম্পরা দেখিলে দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে কোথাও উপনিষদের উল্লেখ নাই। যেরূপ গীতায় দ্রব্যময় যজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ নির্দ্ধারিত হইয়াছে (গী. ৪. ৩৩), সেইরূপ ছান্দোগ্যোপনিষদেও একস্থানে (ছাং. ৩. ১৬, ১৭) মনুষ্যের জীবন এক প্রকার যজ্ঞই এইরূপ বলিয়া এই প্রকার যজ্ঞের ব্যাখ্যা নির্ণয় করিবার সময় "এই যজ্ঞবিদ্যা ঘোর আঙ্গিরস নামক ঋষি, দেবকী-পুত্র কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন" ইহাও উক্ত হইয়াছে। এই দেবকী-পুত্র কৃষ্ণ এবং গীতার শ্রীকৃষ্ণ একই মনে করিবার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু কণ্কালের জন্য উভয়কে একই ব্যক্তি মানিয়া লইলেও, যে গীতা জ্ঞানযজ্ঞকে প্রধান মনে করেন সেই গীতায় ঘোর আঙ্গিরসের কোথাও উল্লেখ নাই এ কথা মনে রাখা উচিত। তাছাড়া, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, জনকের মার্গ জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক হইলেও, সে সময়ে এই মার্গে ভক্তির সমাবেশ হয় নাই। তাই, ভক্তিযুক্ত জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় পন্থার সাম্প্রদায়িক পরম্পরায় জনকের গণনা হইতে পারে না—এবং তাহা গীতাতেও করা হয় নাই। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের আরম্ভে উক্ত হইয়াছে (গী. ৪. ১-৩) যে, গীতাধর্ম্ম যুগারম্ভে ভগবান প্রথমে বিবস্বানকে, বিবস্বান মনুকে, এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে উপদেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু কালের হেরফেরে তাহা নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, তাহা অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বার বলিতে হইয়াছিল। গীতাধর্মের পরম্পরা বুঝিবার পক্ষে এই শ্লোক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; কিন্তু টীকাকারেরা উহাদের শব্দার্থ বলা ছাড়া বেশী কিছু খুলিয়া বলেন নাই; এবং সেদিকে তাঁহাদের ইচ্ছাও ছিল না। কারণ, গীতাধর্ম্ম মূলে কোন বিশিষ্ট পন্থার ছিল এরূপ বলিলে, উহা হইতে অন্য ধর্ম্মপন্থার ন্যূনাধিক লাঘব না হইয়া যায় না। কিন্তু আমি গীতারহস্যের আরম্ভে এবং গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম দুই শ্লোকের টীকায় প্রমাণসহ স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি যে, গীতার এই পরম্পরা মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় উপাখ্যানে ভাগবত ধর্মের পরম্পরার অন্তিম ত্রেতাযুগের যে পরম্পরা দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে তাহার খাপ খায়। ভাগবতধর্মের ও গীতাধর্মের পরম্পরায় এই ঐক্য দেখিলে গীতাগ্রন্থ ভাগবতধর্মেরই গ্রন্থ এইরূপ বলিতে হয়; এবং সেই সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিলে, "গীতায় ভাগবতধর্ম্মই বিবৃত হইয়াছে" (মভা. শাং, ৩৪৬. ১০) মহাভারতে প্রদত্ত বৈশম্পায়নের এই বাক্য হইতে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়। গীতা ঔপনিষদিক জ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্তের স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে—উহাতে ভাগবতধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধ হইলে পর, ভাগবতধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া গীতার যে কোন আলোচনা হইবে তাহা অপূর্ণ ও ভ্রান্তিমূলক হইবে তাহা আর বলিতে হইবে না। তাই ভাগবতধর্ম্ম কখন্ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহার মূল-স্বরূপ কিরূপ ছিল ইত্যাদি প্রশ্ন সম্বন্ধে যে সকল বিষয় একালে উপলব্ধ হয়, তাহাদেরও বিচার সংক্ষেপে করিতে হইবে। এই ভাগবত ধর্ম্মেরই অন্য নাম ছিল—নারায়ণীয়,

সাত্বত, পাঞ্চরাত্রধর্ম, ইত্যাদি ইহা গীতারহস্যে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

উপনিষৎকালের পর ও বুদ্ধের পূর্ব্বে রচিত বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে অনেকগুলি লুপ্ত হওয়ায়, গীতা ব্যতীত ভাগবতধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ যাহা এক্ষণে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মুখ্য গ্রন্থ হইতেছে—মহাভারতান্তর্গত শান্তিপর্ব্বের শেষ অষ্টাদশ অধ্যায়ে নিরূপিত নারায়ণীয়োপাখ্যান (মভা. শাং. ৩৩৪-৩৫১), শাণ্ডিল্যসূত্র, ভাগবত-পুরাণ, নারদ-পাঞ্চরাত্র, নারদসূত্র এবং রামানুজাচার্য্যাদির গ্রন্থ। তন্মধ্যে রামানুজাচার্য্যের গ্রন্থ প্রত্যক্ষ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মের বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তের সহিত মিল স্থাপনের জন্য বিক্রম ১৩৩৫ সম্বতে (শালিবাহন শকের প্রায় ১২শ শতাব্দীতে) লিখিত হইয়াছে। তাই, ভাগবতধর্ম্মের মূল-স্বরূপ স্থির করিবার জন্য এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করা যায় না; এবং মাধ্বাদি অন্য বৈষ্ণব গ্রন্থেরও কথা ইহাই। শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী; কিন্তু এই পুরাণের আরম্ভেই এই কথা আছে যে (ভাগ. স্কং. ১ অ. ৪ ও ৫ দেখ), মহাভারতে সুতরাং গীতাতেও, নৈষ্কর্ম্ম্যমূলক ভাগবতধর্ম্মের যে নিরূপণ আছে তাহাতে ভক্তির যথোচিত বর্ণনা নাই, এবং 'ভক্তি ব্যতীত শুধু নৈষ্কর্ম্ম্য শোভা পায় না' ইহা দেখিয়া ব্যাসের মন কিছু উদাস ও অপ্রসন্ন হইয়া গেল; এবং নিজের মনের এই বিক্ষোভ দূর করিবার জন্য নারদের কথা-মত তিনি ভক্তির মাহাত্ম্য প্রতিপাদনকারী ভাগবত পুরাণ রচনা করিলেন। ঐতিহাসিকদৃষ্টিতে এই কথার বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মূল অর্থাৎ মহাভারতের ভাগবতধর্ম্মে নৈষ্কর্ম্ম্যের যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল তাহা কালান্তরে হ্রাস হইয়া এবং তাহার স্থানে ভক্তির প্রাধান্য যখন আসিল তখন ভাগবতধর্ম্মের এই অন্য স্বরূপের (অর্থাৎ ভক্তিপ্রধান ভাগবতধর্ম্মের) প্রতিপাদন করিবার জন্য এই ভাগবত-পুরাণরূপ সুমধুর পুলীপিঠা পরে রচিত হইয়াছিল। নারদ-পঞ্চরাত্র গ্রন্থও এই প্রকারের অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তিমূলক; এবং উহাতে দ্বাদশস্কন্ধীয় ভাগবত পুরাণের এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, গীতা ও মহাভারতের নামতঃ স্পষ্ট নির্দেশ করা হইয়াছে (না. পং ২. ৭. ২৮-৩২; ৩. ১৪. ৭৩; এবং ৪. ৩. ১৫৪ দেখ)। কাজেই ইহা সুস্পষ্ট যে, ভাগবতধর্ম্মের মূলস্বরূপ স্থির করিবার পক্ষে এই গ্রন্থ ভাগবত-পুরাণ অপেক্ষাও কম উপযোগী। নারদসূত্র ও শাণ্ডিল্যসূত্র এই দুই গ্রন্থ নারদ-পঞ্চরাত্র অপেক্ষাও সম্ভবত প্রাচীনতর; কিন্তু নারদসূত্রে ব্যাস ও শুকের (না. সূ. ৮৩) উল্লেখ থাকায় উহা ভারত ও ভাগবতের পরবর্ত্তী; এবং শাণ্ডিল্যসূত্রে ভগবদ্গীতার শ্লোকই গৃহীত হওয়ায় (শা. সূ. ৯, ১৫ ও ৮৩) এই সূত্র নারদসূত্রাপেক্ষা প্রাচীন (না. সূ. ৮৩) হইলেও গীতা ও মহাভারতের যে পরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, ভাগবতধর্ম্মের মূলগত ও প্রাচীন স্বরূপ কি তাহার নির্ণয় শেষে মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় আখ্যানের ভিত্তিতেই করিতে হয়। ভাগবত-পুরাণ (১. ৩. ২৪) এবং নারদ-পঞ্চরাত্র (৪. ৩. ১৫৬-১৫৯; ৪. ৮. ৮১) এই দুই গ্রন্থে বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে। কিন্তু নারায়ণীয় আখ্যানে বর্ণিত দশাবতারের মধ্যে বুদ্ধের গণনা নাই—প্রথম অবতার হংস এবং পরে কৃষ্ণের পর একেবারেই কল্কি অবতারের উল্লেখ করা হইয়াছে (মভা. শাং ৩৩৯. ১০০)। ইহা হইতেও সিদ্ধ হয় যে, নারায়ণীয় আখ্যান ভাগবতপুরাণ ও নারদ-পঞ্চরাত্র হইতে প্রাচীন। এই নারায়ণীয় আখ্যানে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, পরব্রহ্মেরই অবতার যে নর ও নারায়ণ নামক দুই ঋষি, তাঁহারাই নারায়ণীয় অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, এবং তাঁহাদের কথামত নারদ ঋষি শ্বেতদ্বীপে গমন করিলে পর সেখানে স্বয়ং ভগবান নারদকে এই ধর্ম্মের উপদেশ করেন। যে শ্বেতদ্বীপে ভগবান থাকেন সেই দ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রে অবস্থিত; এবং সেই ক্ষীরসমুদ্র মেরু-পর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত, ইত্যাদি নারায়ণীয় আখ্যানের অন্তর্গত বর্ণনা প্রাচীন পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ডবর্ণনারই অনুযায়ী এবং সেই সম্বন্ধে আমাদের এখানে কাহারও কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু বেবর নামক পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই কথার বিপর্য্যায় করিয়া এই এক দীর্ঘ সংশয় করিয়াছিলেন যে, ভাগবতধর্ম্মের ভক্তিতত্ত্ব শ্বেতদ্বীপ হইতে অর্থাৎ ভারতবর্ষবহির্ভূত কোন এক দেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল, এবং ভক্তির এই তত্ত্ব তৎকালে খৃষ্টধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মে প্রচলিত ছিল না অতএব খৃষ্টানদেশ হইতেই ভক্তির কল্পনা ভাগবতধর্ম্মীদের মনে আসিয়াছিল! কিন্তু পাণিনি বাসুদেব-ভক্তিতত্ত্বের কথা অবগত ছিলেন এবং বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্মেও ভাগবতধর্ম্মের ও ভক্তির উল্লেখ আছে; এবং পাণিনি ও বুদ্ধ ইঁহারা দুজনেই খৃষ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক ছিলেন ইহা নির্ব্বিবাদ। এইজন্য বেবরের উক্ত সংশয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই এখন ভিত্তিহীন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভক্তিরূপে ধর্ম্মাঙ্গ আমাদের এখানে জ্ঞান-মূলক উপনিষদের পরে বাহির হইয়াছে ইহা উপরে বলিয়াছি। তাই ইহা নির্ব্বিবাদরূপে প্রকাশ পাইতেছে যে, জ্ঞানমূলক উপনিষদের পর এবং বুদ্ধের পূর্ব্বে বাসুদেব-ভক্তি-মূলক ভাগবতধর্ম্ম বাহির হইয়াছে। এখন কেবল ইহাই প্রশ্ন যে, উহা বুদ্ধের কত শতাব্দী *

* ভক্তিমান্ (পাঠান্তর—ভক্তিমা) শব্দ থেরগাথায় (গ্লো, ৩৭০) প্রদত্ত হইয়াছে এবং একটি জাতকেও ভক্তির উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে? পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে ইহা উপলব্ধি হইবে যে, উক্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ নিশ্চয়াত্মক উত্তর দিতে না পারিলেও, মোটামুটি ধরণে এই কালের অনুমান করা অসম্ভবও নহে।

গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা তৎপূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছিল (গী. ৪, ২)। ভাগবত ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানে পরমেশ্বর বাসুদেব নামে, জীবাত্মা সংকর্ষণ নামে, মন প্রদ্যুম্ন নামে এবং অহংকার অনিরুদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাসুদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই নাম, সংকর্ষণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের, এবং প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ও পৌত্রের নাম। ইহা ব্যতীত এই ধর্ম্মের 'সাত্বত' বলিয়া যে আরও এক নাম আছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ যে যাদবজাতিতে জন্মিয়াছিলেন সেই জাতির নাম। ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যে কুলে ও জাতিতে জন্মিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই এই ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল এবং তখনই শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রিয়মিত্র অর্জ্জুনকে উহার উপদেশ করিয়া থাকিবেন; এবং ইহাই পৌরাণিক কথাতেও উক্ত হইয়াছে। এই কথাও প্রচলিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই সাত্বত জাতির শেষ হইয়াছিল, এই কারণে শ্রীকৃষ্ণের পরে সাত্বত জাতির মধ্যে এই ধর্ম্মের প্রসার হওয়াও সম্ভব ছিল না। ভাগবত ধর্ম্মের বিভিন্ন নামের সম্বন্ধে এই প্রকার ঐতিহাসিক উপপত্তি দেওয়া যাইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে বোধ হয় তাহা নারায়ণীয় কিংবা পাঞ্চরাত্র নামে ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়া থাকিবে, এবং পরে সাত্বত-জাতির মধ্যে উহার প্রসার হইলে পর, উহার 'সাত্বত' নাম হইয়া থাকিবে, এবং তাহার পর, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনকে নর-নারায়ণেরই অবতার মানিয়া লোকেরা এই ধর্ম্মকে 'ভাগবতধর্ম্ম' বলিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবে। এই বিষয়ে ইহা মনে করিবার কোনই প্রয়োজন নাই যে, তিন বা চারি ভিন্ন ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রত্যেকে এই ধর্ম্ম প্রচার করিবার সময় নিজের দিক হইতে কিছু-না-কিছু সংস্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—বস্তুত এরূপ মনে করিবার কোন প্রমাণও নাই। মূলধর্ম্মে ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন হইবার কারণেই এই কল্পনা উৎপন্ন হইয়াছে। বুদ্ধ, খৃষ্ট কিংবা মহম্মদ তো স্বয়ং একা-একই নিজ নিজ ধর্ম্মের সংস্থাপক হইয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাদের ধর্ম্মে অনেক পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছিল; কিন্তু সেই কারণে কেহ স্বীকার করেন না যে, বুদ্ধ, খৃষ্ট বা মহম্মদ একাধিক ছিলেন। সেই প্রকার মূল ভাগবতধর্ম্ম পরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া ততগুলি শ্রীকৃষ্ণও হইয়াছিলেন, ইহা কিরূপে মানা যায়? ইহা মনে করিবার আমার মতে কোনই কারণ নাই। যে কোন ধর্ম্মই হোক না কেন, কালের হেরফেরে তাহার রূপান্তর হওয়া খুবই স্বাভাবিক; তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্ণ, বুদ্ধ বা খৃষ্ট স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই।* কোন কোন ব্যক্তি—বিশেষত কোন কোন পাশ্চাত্য তার্কিক—এই তর্ক করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ, যাদব ও পাণ্ডব, এবং ভারতীয় যুদ্ধ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা নহে, এ সমস্ত কল্পিত কথা; এবং কাহারো কাহারো মতে, মহাভারত তো অধ্যাত্মমূলক একটি বৃহৎ ও মহৎ রূপক। কিন্তু আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ দেখিলে, এই সংশয় যে ভিত্তিহীন তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল কথার মূলে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, ইহা নির্বিবাদ। সারকথা, শ্রীকৃষ্ণ চার পাঁচ জন নহে, তিনি কেবল একই ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন ইহাই আমার মত। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের কালসম্বন্ধে বিচার করিবার সময় রা. ব. চিন্তামণি রাও বৈদ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ, যাদব, পাণ্ডব ও ভারতীয় যুদ্ধ—ইহাদের কাল একই অর্থাৎ কলিযুগের আরম্ভ; পুরাণগণনানুসারে সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত পাঁচ হাজার বৎসরেরও অধিক চলিয়া গিয়াছে; এবং ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত

তাছাড়া প্রসিদ্ধ ফ্রেঞ্চ পালীপণ্ডিত সেনার্ট (Senart) 'বৌদ্ধধর্ম্মের মূল' এই বিষয়ের উপর ১৯০৯ অব্দে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে ভাগবতধর্ম্ম বাহির হইয়াছে ইহা স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন। "No one will claim to derive from Buddhism, Vishnuism or the Yoga. Assuredly Buddhism is the borrower"......... "To sum up, if there had not previously existed a religion made up of doctrines of yoga, of Vishnuite legends, of devotion to Vishnu-Krishna, worshipped under the title of Bhagavata, Bhuddhism would not have come to birth at all." সেনার্টের এই প্রবন্ধ, পুণায় প্রকাশিত *The Indian Interpreter* নামক মিশনরী ত্রৈমাসিকের অক্টোবর ১৯০৯ ও জানুয়ারী ১৯১০-এর সংখ্যায় ভাষান্তরে প্রকাশিত হয়; এবং উপরি-প্রদত্ত বাক্য জানুয়ারীর সংখ্যায় পৃঃ. ১৭৭ ও ১৭৮—পাওয়া যাইবে। ডাঃ বুহ্লরও বলিয়াছেন—The ancient Bhagabata, Satvata or Pancharatra sect devoted to the worship of Narayan and his deified teacher Krishna—Devakiputra dates from a period long anterior to the rise of Jainas in the 8th Century B. C."—*Indian Antiquary* Vol XXIII (1894) P. 248. এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে এই পরিশিষ্টেরই ষষ্ঠ ভাগে করিয়াছি।

* শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে পরাক্রম, ভক্তি ও বেদান্ত ব্যতীত গোপীদিগের রাসক্রীড়ার সমাবেশ হইয়া থাকে এবং এই সকল কথা পরস্পর-বিরোধী, তাই মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন, গীতার শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন, এবং গোকুলের কান'ই ভিন্ন, এইরূপ আজকাল কতকগুলি বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এইরূপ মতই ডাঃ ভাণ্ডারকর স্বকীয় 'বৈষ্ণব শৈব প্রভৃতি পন্থা' সম্বন্ধীয় ইংরাজী গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে ইহা ঠিক নহে। গোপীদের কথার মধ্যে যে সকল শৃঙ্গারের বর্ণনা আছে তাহা পরে আসে নাই, সে কথা নহে; কিন্তু সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ নামের বিভিন্ন ব্যক্তি হইয়াছিলেন এরূপ মনে করিবার আবশ্যকতা নাই, এবং শুধু কল্পনা ছাড়া তাহার অন্য প্রমাণও নাই। তাছাড়া, গোপীদের কথা ভাগবত কালেই প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল এরূপও নহে; কিন্তু শক কালের আরম্ভে, অর্থাৎ আনুমানিক বিক্রম ১৩৬ সম্বতে অশ্বঘোষ-লিখিত বুদ্ধচরিতে (৪. ১৪) এবং ভাসের বালচরিত নাটকেও (৩. ২) গোপীদের উল্লেখ আছে। অতএব এই বিষয়ে ভাণ্ডারকারের কথা অপেক্ষা, চিন্তামণি রাও বৈদ্যের কথাই আমার নিকট অধিক সযুক্তিক বলিয়া মনে হয়।

কাল। † কিন্তু পাণ্ডবগণ হইতে শক-কাল পর্য্যন্ত আবির্ভূত রাজাদিগের পুরাণে বর্ণিত বংশাবলী দেখিলে এই কালের মিল দেখা যায় না। তাই, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে এই যে বচন আছে যে, "পরীক্ষিত রাজার জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত ১১১৫ কিংবা ১ ১৫ বৎসর হয়" (ভাগ. ১২. ২. ২৬; ও বিষ্ণু. ৪. ২৪. ৩২) তাহারই প্রমাণমূলে, বিদ্বানেরা এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্টের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে পাণ্ডব ও ভারতীয় যুদ্ধ হইয়া থাকিবে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও ইহাই কাল; এবং এই কাল স্বীকার করিলে, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১৭০০ শতাব্দীতে অথবা বুদ্ধের প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকিবেন, এইরূপ পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিক ব্যক্তি হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিতে তাঁহার অনেক রূপান্তর দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ নামক এক ক্ষত্রিয় যোদ্ধা প্রথমে মহাপুরুষের পদ প্রাপ্ত হন, তাহার পর বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন, এবং ক্রমে ক্রমে শেষে পরব্রহ্মরূপে কল্পিত হয়েন—এই সকল অবস্থার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনেকটা কাল অতিবাহিত হইয়া থাকিবে, এবং সেই জন্য ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাব-কাল এবং ভারতীয় যুদ্ধের কাল—এই দুই কাল এক বলিয়া মানিতে পারা যায় না। কিন্তু এই আপত্তি নিরর্থক। 'কাহাকে দেবতা বলিয়া মানিবে ও কাহাকে মানিবে না' এই সম্বন্ধে আধুনিক তার্কিকদিগের ধারণা এবং দুই চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার লোকদিগের ধারণার (গী. ১০. ৪১) মধ্যে অনেক প্রভেদ হইয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বেই রচিত উপনিষদসমূহে সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তি স্বতই ব্রহ্মময় হইয়া যান (বৃ. ৪. ৪. ৬); এবং মৈত্র্যুপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, রুদ্র, বিষ্ণু, অচ্যুত, নারায়ণ, ইঁহারা ব্রহ্মই (মৈত্র্যু. ৭. ৭) আবার শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মত্ব লাভে বিলম্ব হইবার কারণই কি? ইতিহাসের দিকে দেখিলে বিশ্বসনীয় বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহেও দেখা যায় যে, বুদ্ধ আপনাকে 'ব্রহ্মভূত' বলিতেন (সেলসুত্ত. ১৪; থেরগাথা ৮৩১); তাঁহার জীবদ্দশাতেই তিনি দেবতার মান পাইতে আরম্ভ করেন; এবং তাঁহার মৃত্যুর পর শীঘ্রই তিনি 'দেবাধিদেবের' কিংবা বৈদিক ধর্ম্মের পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হন; এবং তাঁহার পূজাও সুরু হয়। খৃষ্টধর্ম্মের কথাও এইরূপ। ইহা সত্য যে, বুদ্ধ ও খৃষ্টের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসী ছিলেন না এবং ভাগবতধর্ম্মও নিবৃত্তিমূলক নহে। কিন্তু কেবল তাহারই ভিত্তিতে বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্মের মূল ব্যক্তিদিগের ন্যায় ভাগবতধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণেরও প্রথম হইতেই ব্রহ্মের কিংবা দেবতার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবার পক্ষে কোনও বাধা উপস্থিত হইবার কোন কারণই দেখা যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের কাল এইরূপে নিশ্চিত করিলে পর উহাকেই ভাগবতধর্ম্মেরও আবির্ভাবকাল মনে করা প্রশস্ত ও সযুক্তিক। কিন্তু সাধারণতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ঐরূপ মনে করিতে বিমুখ হইবার অন্য কোন কারণ আছে। এই পণ্ডিতদিগের মধ্যে অধিকাংশের অদ্যাপি এই ধারণাই আছে যে, স্বয়ং ঋগ্বেদের কাল খৃষ্টপূর্ব্ব আন্দাজ ১৫০০ কিংবা বড় জোর ২০০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। তাই তাঁহাদের নিজেদের দৃষ্টিতে ইহা বলা অসম্ভব মনে হয় যে, ভাগবতধর্ম্ম খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বাহির হইয়া থাকিবে। কারণ, বৈদিকধর্ম্ম-সাহিত্যের এই ক্রম নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয় যে, ঋগ্বেদের পর যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মপ্রতিপাদক যজুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, তাহার পর জ্ঞানপ্রধান উপনিষদ ও সাংখ্যশাস্ত্র এবং শেষে ভক্তিমূলক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এবং শুধু ভাগবত ধর্ম্মের গ্রন্থসমূহ দেখিলেও স্পষ্ট দেখা যায় যে, ঔপনিষদিক জ্ঞান, সাংখ্যশাস্ত্র, চিত্তনিরোধরূপ যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মাঙ্গ, ভাগবতধর্ম্ম বাহির হইবার পূর্ব্বেই প্রচলিত হইয়াছিল। কালের ইচ্ছামত টানাটানি করিলেও স্বীকার করিতে হয় হয় যে, ঋগ্বেদের পর এবং ভাগবতধর্ম্ম বাহির হইবার পূর্ব্বে উক্ত বিভিন্ন ধর্ম্মাঙ্গের আবির্ভাব ও বৃদ্ধির মধ্যে দশবারো শতাব্দী চলিয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু ভাগবতধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ আপনারই কালে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১৪০ শতাব্দীতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন এইরূপ মনে করিলে, উক্ত বিভিন্ন ধর্ম্মাঙ্গের অভিবৃদ্ধির পক্ষে উক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে একটুও কালাবকাশ থাকে না। কারণ, এই সকল পণ্ডিত ঋগ্বেদের কালকেই খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ কিংবা ২০০০ শতাব্দীর অধিক প্রাচীন মনে করেন না; এই অবস্থায় তাঁহাদের ইহা মানিতে হয় যে, ভাগবতধর্ম্ম এক শত কিংবা বড়-জোর পাঁচ ছয় শত বৎসর পরেই আবির্ভূত হইয়াছিল। এইজন্য উপরি-উক্ত উক্তি অনুসারে কোন-না-কোন শুষ্ক হেতু দর্শাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম্মের সমকালীনতা অস্বীকার করেন, এবং কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাব বুদ্ধের পরে হইয়া থাকিবে, এইরূপ কথা বলিবার জন্যও প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহেই ভাগবতধর্ম্মের যে উল্লেখ আছে তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, ভাগবতধর্ম্ম বুদ্ধ হইতে প্রাচীন। তাই ডাঃ বুহ্লর বলিয়াছেন যে, ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাব-কাল বুদ্ধের পরে ঠেলিয়া লইয়া যাইবার বদলে, আমার 'ওরায়ন' গ্রন্থের প্রতিপাদন * অনুসারে ঋগ্বেদাদি গ্রন্থের কালই পিছে হঠাইয়া লইয়া যাওয়া আবশ্যক। এইরূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যা করিয়া যাহা-তাহা একটা অনুমান করিয়া লইয়া বৈদিকগ্রন্থের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা ভ্রমমূলক; বৈদিককালের পূর্ব্ব সীমা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৫০০ বৎসরের কম ধরিতে পারা যায় না; বেদের উত্তরায়ণ-স্থিতিপ্রদর্শক বাক্যের প্রমাণমূলে আমি আমার 'ওরায়ণ' গ্রন্থে এই সকল বিষয় সিদ্ধ করিয়া দেখাইয়াছি; এবং এই সিদ্ধান্তই এক্ষণে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরই গ্রাহ্য হইয়াছে। ঋগ্বেদকালকে এইরূপে পিছাইয়া লইয়া গেলে বৈদিক ধর্ম্মের সমস্ত অঙ্গের অভিবৃদ্ধির পক্ষে যথোচিত কালাবকাশ পাওয়া যায় এবং ভগবতধর্ম্মের আবির্ভাব-কালের সঙ্কোচ করিবার কোনই কারণ থাকে না।

† রাওবাহাদুর চিন্তামণি রাও বৈদ্যের এই মত তাঁহার মহাভারত-সম্বন্ধীয় টীকাত্মক ইংরেজী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাছাড়া; এই বিষয়ের উপরেই এখানকার, ডেক্যান কালেজের আনিভর্সরি প্রসঙ্গে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতেও ইহার বিচার করা হইয়াছে।

* ডাঃ বুহ্লর *Indian Antiquary*, September 1894 (Vol. XXIII. P. 238-249) ইহাতে, 'ওরায়ন' গ্রন্থের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা দেখ।

মরাঠীভাষায় ৺শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিহাসে দেখাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদের পর ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে কৃত্তিকাদি নক্ষত্রের গণনা থাকায় উহাদের কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০০ শতাব্দী ধরিতে হয়। কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত দেখি নাই যে, উত্তরায়ন-স্থিতি হইতে গ্রন্থের কালনির্ণয় করিবার এই পদ্ধতি উপনিষদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। রামতাপনীর ন্যায় ভক্তিপ্রধান এবং যোগতত্ত্বের ন্যায় যোগ-প্রধান উপনিষদের ভাষা ও রচনা প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না,—এই ভিত্তির উপরেই কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, সমস্ত উপনিষদই বুদ্ধের অপেক্ষা চারিপাঁচ শত বৎসরের অধিক প্রাচীন হইবে না। কিন্তু কালনির্ণয়ের উপরি-উক্ত পদ্ধতি অনুসারে দেখিলে এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া উপলব্ধি হইবে। জ্যোতিষের পদ্ধতিতে সমস্ত উপনিষদের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে না সত্য তথাপি মুখ্য মুখ্য উপনিষদের কাল স্থির করিবার পক্ষে এই পদ্ধতিই সমধিক উপযোগী। ভাষার দৃষ্টিতে দেখিলে, মৈত্র্যুপনিষৎ পাণিনি অপেক্ষাও প্রাচীন, ইহা প্রোঃ মোক্ষমূলর বলিয়াছেন; * কারণ এই উপনিষদে এরূপ কতকগুলি শব্দসন্ধির প্রয়োগ করা হইয়াছে যাহা শুধু মৈত্রায়ণী সংহিতায় পাওয়া যায় এবং যাহার প্রচলন পাণিনির সময়ে রহিত হইয়া গিয়াছিল (অর্থাৎ যাহাকে ছান্দস বলা যায়)। কিন্তু মৈত্র্যুপনিষৎ কিছু সর্ব্বপ্রথম অর্থাৎ অতি প্রাচীন উপনিষৎ নহে। মৈত্র্যুপনিষদে কেবল ব্রহ্মজ্ঞান ও সাংখ্যের মিলন ঘটাইয়া দেওয়া হয় নাই, কিন্তু কয়েক স্থানে ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, কঠ ও ঈশাবাস্য উপনিষদসমূহের বাক্য এবং শ্লোকও উহাতে প্রমাণার্থ উদ্ধৃত হইয়াছে। হাঁ ইহা সত্য যে, এই সকল উপনিষদের নাম মৈত্র্যুপনিষদে স্পষ্টরূপে প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু এই সকল বাক্যের পূর্ব্বে "এবং হ্যাহ" কিংবা 'উক্তং চ' (= এইরূপ উক্ত হইয়াছে), এই প্রকার পর-বাক্যপ্রদর্শক পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, কাজেই ঐ বাক্যসকল যে অন্য গ্রন্থ হইতে গৃহীত মৈত্র্যুপনিষদকারের নিজের নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না; এবং ঐ সকল বাক্য কোন্ গ্রন্থের তাহা অন্য উপনিষদ্ দেখিলে সহজেই স্থির করা যায়। এক্ষণে এই মৈত্র্যুপনিষদে কালরূপ কিংবা সম্বৎসররূপ ব্রহ্মের বিচার করিবার সময় (মৈত্র্য. ৬. ১৪) এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, "মঘানক্ষত্রের আরম্ভ হইতে ক্রমশঃ শ্রবিষ্ঠা অর্থাৎ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের অর্দ্ধাংশের উপর আসা পর্য্যন্ত (মঘাদ্যং শ্রবিষ্ঠার্দ্ধং) দক্ষিণায়ন হয়; এবং সার্প অর্থাৎ অশ্লেষা নক্ষত্র হইতে বিপরীত ক্রমে (অর্থাৎ অশ্লেষা, পুষ্যা ইত্যাদি ক্রমে) পিছনে গণিত হইলে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণ হয়। ইহা নিঃসন্দেহ যে, উত্তরায়ণ-স্থিতিপ্রদর্শক এই বচন তৎকালীন উত্তরায়ণস্থিতিকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং ফের উহা হইতেই এই উপনিষদের কালনির্ণয়ও গণিতপদ্ধতিতে সহজেই করা যাইতে পারে। কিন্তু এই দৃষ্টিতে কেহ তাহার বিচার করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না। মৈত্র্যুপনিষদে বর্ণিত এই উত্তরায়ণ-স্থিতি বেদাঙ্গজ্যোতিষে কথিত উত্তরায়ণস্থিতির পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ, বেদাঙ্গজ্যোতিষে এইরূপ স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, উত্তরায়ণের আরম্ভ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের আরম্ভ হইতে হয়; এবং মৈত্র্যুপনিষদে উহার আরম্ভ 'ধনিষ্ঠার্দ্ধ' হইতে করা হইয়াছে। এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, মৈত্র্যুপনিষদের 'শ্রবিষ্ঠার্দ্ধং' শব্দে যে 'অর্দ্ধং' পদ আছে তাহার অর্থ 'ঠিক অর্দ্ধেক' করিতে হইবে, কিংবা "ধনিষ্ঠা ও শততারকার মধ্যে কোন স্থানে" এইরূপ করিতে হইবে। কিন্তু যাহাই বলনা কেন, এ বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নাই যে, বেদাঙ্গজ্যোতিষের পূর্ব্বেকার উত্তরায়ণস্থিতি মৈত্র্যুপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, এবং উহাই তৎকালীন স্থিতি হইবে। তাই বলিতে হয় যে, বেদাঙ্গজ্যোতিষকালের উত্তরায়ণ মৈত্র্যুপনিষৎকালীন উত্তরায়ণ অপেক্ষা প্রায় অর্দ্ধ নক্ষত্র পিছনে হটিয়া আসিয়াছিল। এইরূপ জ্যোতির্গণিত অনুসারে ইহা সিদ্ধ হয় যে, বেদাঙ্গজ্যোতিষে * কথিত উত্তরায়ণস্থিতি খৃষ্টের প্রায় ১২০০ বা ১৪০০ শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী। এবং উত্তরায়ণের অর্দ্ধ নক্ষত্র পিছাইয়া পড়িতে প্রায় ৪৮০ বৎসর লাগে; তাই মৈত্র্যুপনিষৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ১৮৮০ হইতে ১৬৮০ বৎসরের মধ্যে কোন এক সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে, এইরূপ গণিতের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। নিদাপক্ষে, এই উপনিষৎ বেদাঙ্গজ্যোতিষের পূর্ব্ববর্ত্তী এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন, ছান্দোগ্যাদি যে সকল উপনিষদের উদ্ধৃতবাক্য মৈত্র্যুপনিষদে গৃহীত হইয়াছে সেগুলি উহা হইতেও প্রাচীন তাহা বলা বাহুল্য। সার কথা, এই সকল গ্রন্থের সময়ের নির্ণয় এই ভাবে হইয়া গিয়াছে যে, ঋগ্বেদ খৃষ্টের প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী; যজ্ঞযাগাদিবিষয়ক ব্রাহ্মণগ্রন্থ খৃষ্টের প্রায় ২৫০০ এবং ছান্দোগ্যাদি জ্ঞানপ্রধান উপনিষৎ খৃষ্টের প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী। এখন, যে কারণে ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাবকালকে পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই দিকে সরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন, প্রকৃতপক্ষে সে কারণ আর থাকে না; এবং শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম্মকে গাভী ও বৎসের নৈসর্গিক যুগলের ন্যায় একই কালরজ্জুতে বাঁধিতে কোন ভয়ই দেখা যায় না; এবং বৌদ্ধ গ্রন্থকারদিগের বর্ণিত এবং অন্য ঐতিহাসিক অবস্থারও সহিত ঠিক্ ঠিক্ মিল হয়। এই সময়ে বৈদিক কাল শেষ হইয়া, সূত্র ও স্মৃতির কাল প্রায় আরম্ভ হয়।

উপরি-উক্ত কাল-গণনা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাব খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১৪০০ শতাব্দীতে অর্থাৎ বুদ্ধের প্রায় সাত আটশো বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে। এই কাল অতি প্রাচীন; তথাপি ইহা উপরে বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের কর্ম্মমার্গ ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন এবং উপনিষদের ও সাংখ্য শাস্ত্রের জ্ঞানও ভাগবতধর্ম্ম আবির্ভাবের পূর্ব্বেই প্রচলিত হইয়া সর্ব্বমান্য হইয়াছিল। এই অবস্থায় এরূপ কল্পনা করা আমার মতে সর্ব্বৈব অনুচিত যে, উক্ত জ্ঞান ও ধর্ম্মাঙ্গের অপেক্ষা না রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় চতুর ও জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের ধর্ম্ম

* See Sacred Books of the East series, Vol. XV. Intro, pp. XLVIII-LII.

* বেদাঙ্গজ্যোতিষের কালসম্বন্ধীয় বিচার আমার Orion (ওরায়ণ) নামক ইংরেজী পুস্তকে এবং মারাঠীতে ৺বালকৃষ্ণ দীক্ষিতের "ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিহাসে" (পৃ. ৮৭-৯৩ ও ১২৭-১৩৯) করা হইয়াছে তাহা দেখ। তাহাতেই উত্তরায়ণ অনুসারে বৈদিক গ্রন্থের কালসম্বন্ধেও বিচার করা হইয়াছে।

প্রবর্ত্তিত করিবেন, কিংবা তাহা করিলেও ঐ ধর্ম্ম তত্তৎকালীন স্মার্ত্ত ও ব্রহ্মবিদিগের নিকট মান্য হইয়া লোকের মধ্যে প্রসার লাভ করিবে। খৃষ্ট স্বকীয় ভক্তি-প্রধান ধর্ম্মের উপদেশ সর্ব্বপ্রথম যে ইহুদি-লোকের মধ্যে করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে তৎকালে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানের প্রসার না হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানের সহিত নিজধর্ম্মের মিল করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেবল ইহা দেখাইলে খৃষ্টের ধর্ম্মোপদেশসম্বন্ধীয় কাজ সম্পূর্ণ হইতে পারিত যে, বাইবেলের পুরাতন অঙ্গীকারে যে কর্ম্মময় ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে তাহারই জন্য তাঁহার ভক্তিমার্গও বাহির হইয়াছে, এবং তিনি এইটুকু চেষ্টাই করিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের এই বৃত্তান্তের সহিত ভাগবতধর্ম্মের ইতিহাস তুলনা করিবার সময়, একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, ভাগবতধর্ম্ম যে লোকের মধ্যে এবং যে কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সেই লোকের মধ্যে সেই কালে শুধু কর্ম্মমার্গই নহে, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ও কাপিল সাংখ্য শাস্ত্রেরও পুরাপুরি পরিচয় ছিল; এবং তিন ধর্ম্মাঙ্গের সমন্বয় করিতেও তাহারা শিখিয়াছিল। এইরূপ লোকের নিকট ইহা বলা কোন প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হইত না যে, "তোমার কর্ম্মকাণ্ড কিংবা ঔপনিষদিক ও সাংখ্য জ্ঞান ছাড়িয়া দাও, এবং কেবল ভাগবত ধর্ম্মই শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার কর"। ব্রাহ্মণাদি বৈদিক গ্রন্থে বর্ণিত ও তৎকালে প্রচলিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল কি? উপনিষদের কিংবা সাংখ্যশাস্ত্রের জ্ঞান কি নিরর্থক? ভক্তি ও চিত্তনিরোধরূপ যোগের মিল কিরূপে হইতে পারে?— ইত্যাদি প্রশ্ন যাহা সহজভাবে তখন উত্থিত হইয়াছিল তাহাদের ঠিক ঠিক উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত ভাগবতধর্ম্মের প্রসার হওয়াও কখনই সম্ভব ছিল না। তাই ন্যায়তঃ ইহা উপলব্ধি হয় যে, এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ভাগবতধর্ম্মে প্রথম হইতেই করা আবশ্যক ছিল; এবং মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয়-উপাখ্যান হইতেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়। এই আখ্যানে ভাগবতধর্ম্মের সঙ্গে ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞান এবং সাংখ্যপ্রতিপাদিত ক্ষরাক্ষর বিচারের মিল স্থাপন করা হইয়াছে; এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, "চার বেদ এবং সাংখ্য বা যোগ এই পাঁচেরই তাহার (ভাগবতধর্ম্ম) মধ্যে সমাবেশ হয় বলিয়া তাহার নাম হইয়াছে পাঞ্চরাত্রধর্ম্ম" (মভা. শাং. ৩৩৯. ১০৭); এবং "বেদারণ্যকসমেত (অর্থাৎ উপনিষৎ-সমূহকেও লইয়া) এই সমস্ত (শাস্ত্র) পরস্পরের অঙ্গ" (শাং. ৩৪৮. ৮২)। 'পাঞ্চরাত্র' শব্দের এই নিরুক্তি ব্যাকরণ দৃষ্টিতে শুদ্ধ না হইলেও উহা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের সমন্বয় ভাগবতধর্ম্মে আরম্ভ হইতেই করা হইয়াছিল। কিন্তু ভক্তির সঙ্গে অন্য সমস্ত ধর্ম্মাঙ্গের সমন্বয় করাই কিছু ভাগবতধর্ম্মের মুখ্য বিশেষত্ব নহে। ভক্তির ধর্ম্মতত্ত্ব ভাগবতধর্ম্মই যে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত করেন তাহা নহে। মৈত্র্যুপনিষদের উপরিপ্রদত্ত বাক্য হইতে (মৈত্র্যু. ৭. ৭) স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, রুদ্রের কিংবা বিষ্ণুর কোন-না-কোন স্বরূপের ভক্তি ভাগবতধর্ম্ম বাহির হইবার পূর্ব্বেই সুরু হইয়াছিল; এবং উপাস্য যাহাই হউক না কেন, উহা ব্রহ্মেরই প্রতীক কিংবা একপ্রকার রূপ এই কল্পনাও পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছিল। রুদ্রাদি উপাস্যের পরিবর্ত্তে বাসুদেব উপাস্য বলিয়া ভাগবতধর্ম্মে গৃহীত হইয়াছেন সত্য; কিন্তু ভক্তি যে কোন দেবতাকে করিলেও তাহা এক ভগবানকেই করা হয়—রুদ্র ও ভগবান্ বিভিন্ন নহেন, ইহা গীতায় ও নারায়ণীয় উপাখ্যানেও বর্ণিত হইয়াছে (গী. ৯. ২৩; মভা. শাং. ৩৪১. ২০-২৬ দেখ)। তাই, শুধু বাসুদেবভক্তি ভাগবতধর্ম্মের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া মানা যায় না। যে সাত্বতজাতির মধ্যে ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই জাতির সাত্বকি আদি ব্যক্তি, পরম ভগবদ্ভক্ত ভীষ্মার্জ্জুন, এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও খুব পরাক্রমী ছিলেন এবং অন্যের দ্বারা পরাক্রমের কার্য্য করাইবার লোক ছিলেন। এইজন্য অন্য ভগবদ্ভক্তের উচিত যে, তাহারাও এই আদর্শকেই সম্মুখে রাখিয়া তৎকালে প্রচলিত চাতুর্ব্বর্ণ্যানুসারে যুদ্ধাদি সমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্ম করিবে—ইহাই মূল ভাগবতধর্ম্মের মুখ্য বিষয় ছিল। ভক্তি-তত্ত্ব স্বীকার করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত তীব্র বুদ্ধিতে সংসারত্যাগী ব্যক্তি তখন একেবারেই ছিল না, এরূপ নহে। কিন্তু ইহা কিছু সাত্বতদিগের কিংবা শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতধর্ম্মের মুখ্যতত্ত্ব নহে। ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বর-জ্ঞান হইলে পর ভগবদ্ভক্তকে পরমেশ্বরের ন্যায় জগতের ধারণপোষণার্থ সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সার। উপনিষৎ-কালে জনক প্রভৃতিই ইহা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষেরও নিষ্কামধর্ম্ম করা অনুচিত নহে। কিন্তু সে সময় তাহার মধ্যে ভক্তির সমাবেশ করা হয় নাই; তাছাড়া জ্ঞানোদয়ের পর কর্ম্ম করা কিংবা না করা, প্রত্যেকের ইচ্ছার উপর অবলম্বিত ছিল অর্থাৎ বৈকল্পিক বলিয়া ধরা হইত (বেসূ. ৩. ৪. ১৫)। বৈদিক ধর্ম্মের ইতিহাসে ভাগবত ধর্ম্ম এই একটী অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ এবং স্মার্ত্তধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন কাজ করিয়াছেন যে, উহা (ভাগবতধর্ম্ম) আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া শুদ্ধ নিবৃত্তি অপেক্ষা নিষ্কামকর্ম্মমূলক প্রবৃত্তিমার্গকে (নৈষ্কর্ম্ম্য) অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং জ্ঞানের সহিত শুধু নহে, ভক্তিরও সহিত কর্ম্মের উচিত মিলন স্থাপন করিয়াছেন। এই ধর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক নর ও নারায়ণ ঋষিও এইরূপই সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতেন, এবং মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদের ন্যায় সকলেরই এইরূপ কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য (মভা. উদ্যো. ৪৮. ২১. ২২)। নারায়ণীয় আখ্যানে তো ভাগবত-ধর্ম্মের এই লক্ষণ স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, "প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধর্ম্মো নারায়ণাত্মকঃ" (মভা. শাং. ৩৪৭. ৮১) অর্থাৎ নারায়ণীয় কিংবা ভাগবত ধর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক বা কর্ম্মমূলক। নারায়ণীয় কিংবা মূল ভাগবত ধর্ম্মের যে নিষ্কাম প্রবৃত্তি-তত্ত্ব তাহারই নাম 'নৈষ্কর্ম্ম্য', এবং ইহাই মূল ভাগবত-ধর্ম্মের মুখ্য তত্ত্ব। কিন্তু ভাগবত পুরাণে দেখা যায় যে, পরে কালান্তরে এই তত্ত্ব মন্দীভূত হইতে লাগিলে এই ধর্ম্মে বৈরাগ্যমূলক বাসুদেবভক্তিকে মানা যাইতে লাগিল। নারদপঞ্চরাত্রে তো ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভাগবতধর্ম্মে মন্ত্র-তন্ত্রেরও সমাবেশ করা হইয়াছে। তথাপি এই সমস্ত এই ধর্ম্মের মূল স্বরূপ নহে, ইহা ভাগবত হইতেই স্পষ্ট প্রকাশ পায়। যেখানে নারায়ণীয় কিংবা সাত্বত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানে

সাত্বতের কিংবা নারায়ণ ঋষির ধর্ম্ম (অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্ম) 'নৈষ্কর্ম্ম্য-লক্ষণ' বলিয়া ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে (ভাগ. ১. ৩. ৮ ও ১১. ৪. ৬)। এবং পরে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, নৈষ্কর্ম্ম্য ধর্ম্মে এই ভক্তির যথোচিত প্রাধান্য না দেওয়ায়, ভক্তিপ্রধান ভাগবত পুরাণ বিবৃত করা আবশ্যক হইল (ভাগ. ১. ৫. ১২)। ইহা হইতে নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয় যে, মূল ভাগবতধর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রধান অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম্মপ্রধান ছিল কিন্তু পরে কালান্তরে তাহার স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া ভক্তিপ্রধান হইয়া দাঁড়ায়। গীতারহস্যে এই ঐতিহাসিক প্রশ্নসমূহের বিচার পূর্ণেই করা হইয়াছে যে, জ্ঞান ও ভক্তির নিত্য মিলনকারী মূল ভাগবতধর্ম্ম ও আশ্রমব্যবস্থারূপ স্মার্ত্তমার্গের মধ্যে ভেদ কি; কেবল সন্ন্যাসপ্রধান জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারে ভাগবতধর্ম্মের কর্ম্মযোগ পিছাইয়া পড়িয়া উহা ভিন্ন স্বরূপ অর্থাৎ বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তির স্বরূপই কিরূপে প্রাপ্ত হইল; এবং বৌদ্ধধর্ম্মের হ্রাসের পর যে বৈদিক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তন্মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় তো শেষে ভগবদ্গীতাকেই সন্ন্যাসপ্রধান, আবার কোন সম্প্রদায় কেবল ভক্তিপ্রধান এবং কতকগুলি বিশিষ্টাদ্বৈত-মূলক স্বরূপ কিরূপে দিয়াছিল।

উপরি-প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিচার হইতে জানা যাইবে যে, বৈদিক ধর্ম্মের সনাতন প্রবাহে ভাগবতধর্ম্মের কবে আবির্ভাব হইল, এবং প্রথমে উহা প্রবৃত্তিপ্রধান বা কর্ম্মপ্রধান হইলেও পরে তাহাতে ভক্তিপ্রধান এবং শেষে রামানুজাচার্য্যের কালে বিশিষ্টাদ্বৈত স্বরূপ কিরূপে আসিল। ভাগবতধর্ম্মের এই বিভিন্ন স্বরূপের মধ্যে একেবারে গোড়ার অর্থাৎ নিষ্কামকর্ম্মপ্রধান যে স্বরূপ তাহাই গীতা-ধর্ম্মের স্বরূপ। এক্ষণে এই প্রকার মূল গীতার কালসম্বন্ধে কি অনুমান করা যাইতে পারে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ ও ভারতীয় যুদ্ধের কাল একই অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১৪০০ অব্দ হইলেও মূল গীতা ও মূল ভারত,—ভাগবত-ধর্ম্মের এই দুই প্রধান গ্রন্থও যে সেই সময়েই রচিত হইয়াছিল এরূপ বলিতে পারা যায় না। কোন ধর্ম্মপন্থা বাহির হইলে তখনই তৎসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রস্তুত হয় না। ভারত ও গীতা সম্বন্ধেও এই ন্যায়ই যুক্ত হইতে পারে। বর্ত্তমান মহাভারতের আরম্ভে আছে যে, ভারতীয় যুদ্ধ হইয়া গেলে যখন পাণ্ডবদিগের পৌত্র জনমেজয় সর্পসত্র করিতেছিলেন, তখন সেখানে বৈশম্পায়ন তাঁহার নিকট গীতার সহিত ভারত সর্ব্বপ্রথম বিবৃত করেন; এবং পরে যখন তাহাই সৌতি শৌনককে শোনান, তখন হইতেই ভারত প্রচলিত হয়। সৌতি প্রভৃতি পৌরাণিক-দিগের মুখ হইতে বাহির হইয়া পরে ভারতের কাব্য-গ্রন্থের স্থায়ী স্বরূপ লাভ করিতে মধ্যে কতকটা সময় যে অতিবাহিত হইয়া থাকিবে, তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্তু সে কতটা সময় তাহা নিশ্চিতরূপে স্থির করিবার এখন কোন উপায় নাই। এই অবস্থায় যদি স্বীকার করা যায় যে, ভারতীয় যুদ্ধের পর প্রায় পাঁচশো বৎসরের ভিতরেই আর্ষ মহাকাব্যাত্মক মূল ভারত রচিত হইয়া থাকিবে, এরূপ মনে করিতে বিশেষ সাহসের দরকার হইবে না। কারণ, বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ বুদ্ধের মৃত্যুর পর, ইহা অপেক্ষাও শীঘ্র প্রস্তুত হইয়াছে। এখন আর্ষমহাকাব্যে নায়কের শুধু পরাক্রমেরই বর্ণনা করিলে চলে না; কিন্তু তাহাতে ইহাও দেখাইতে হয় যে, নায়ক যাহা কিছু করেন তাহা উচিত বা অনুচিত; অধিক কি নায়কের কার্য্যের দোষগুণ বিচার করা যে আর্ষ মহাকাব্যের এক মুখ্য অংশ—তাহা সংস্কৃত ব্যতীত অন্য সাহিত্যের এইপ্রকার মহাকাব্য হইতেও জানা যায়। অর্ব্বাচীন দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয় যে, নায়কের কার্য্যের সমর্থন শুধু নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিতেই করিতে হইবে। কিন্তু প্রাচীনকালে, ধর্ম্ম ও নীতির মধ্যে পৃথক্ ভেদ মানা যাইত না, অতএব ধর্ম্মদৃষ্টি ব্যতীত উক্ত সমর্থনের অন্য মার্গ ছিল না। আবার, ভারতের নায়কদিগের গ্রাহ্য কিংবা তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত যে ভাগবত ধর্ম্ম, তাহারই প্রমাণমূলে তাঁহাদের কার্য্যের সমর্থন করাও আবশ্যক ছিল। তাহা ছাড়া, আরও এক কারণ এই যে, ভাগবতধর্ম্ম ব্যতীত তৎকালে প্রচলিত অন্য বৈদিক ধর্ম্মপন্থা ন্যূনাধিক পরিমাণে কিংবা সর্ব্বাংশে নিবৃত্তিমূলক ছিল, তাই তদন্তর্গত ধর্ম্মতত্ত্বের প্রমাণে মহাভারতের নায়কদিগের পরাক্রম-কার্য্যের পূর্ণরূপে সমর্থন করা সম্ভব ছিল না। অতএব মহাকাব্যাত্মক মূল-ভারতেই কর্ম্মযোগমূলক ভাগবতধর্ম্মের নিরূপণ করা আবশ্যক ছিল। ইহাই মূলগীতা; এবং ভাগবতধর্ম্মের মূল স্বরূপের সোপপত্তিক প্রতিপাদন করিবার সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ না হইলেও ইহা আদিগ্রন্থদিগের মধ্যে নিশ্চয়ই অন্যতর এবং ইহার কাল খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৯০০ বৎসর হইবে, এই একটা স্থূল অনুমান করিতে কোন বাধা নাই। গীতা এইরূপে ভাগবতধর্ম্মসংক্রান্ত প্রথম গ্রন্থ না হইলেও উহা মুখ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে নিশ্চয়ই একটী; তাই উহাতে প্রতিপাদিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ তৎকালে প্রচলিত অন্য ধর্ম্মপন্থার সহিত—অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের সহিত, ঔপনিষদিক জ্ঞানের সহিত, সাংখ্যের সহিত, চিত্তনিরোধ-রূপ যোগের সহিত এবং ভক্তিরও সহিত—অবিরুদ্ধ, ইহা দেখান আবশ্যক হইয়াছিল। অধিক কি, ইহাই এই গ্রন্থের মুখ্য প্রয়োজন বলিলেও চলে। বেদান্ত ও

মীমাংসাশাস্ত্র পরে রচিত হওয়ায় মূল গীতায় উহাদের প্রতিপাদন আসিতে পারে না; এবং এই কারণেই গীতার বেদান্ত পরে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কেহ কেহ এইরূপ সংশয় করিয়া থাকেন। কিন্তু পদ্ধতিবদ্ধ বেদান্ত ও মীমাংসাশাস্ত্র পরে রচিত হইলেও উহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় যে খুবই প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহ—এবং এই বিষয়ে আমি উপরে বলিয়াছি। তাই এই বিষয় মূল-গীতায় আসিলে কালদৃষ্টিতে কোন প্রত্যবায় হয় না। তথাপি মূল-ভারত যখন মহাভারতে পরিণত হইল তখন মূল-গীতায় একেবারেই কোন বদল হয় নাই একথাও আমি বলি না। যে কোন ধর্ম্মপন্থা ধর না কেন, তাহার ইতিহাসে তো ইহাই দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে সময়ে সময়ে মতভেদ হইয়া অনেক উপপন্থা বাহির হয়। ভাগবত ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। নারায়ণীয় উপাখ্যানে এইরূপ স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (মভা. শাং. ৩৪৮. ৫৭) যে, কোন কোন লোক ভাগবতধর্ম্মকে চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এইপ্রকার চারি ব্যূহের; আবার কেহ কেহ ত্রিব্যূহ, দ্বিব্যূহ বা একব্যূহই মনে করিয়া থাকেন। পরে এই প্রকার আরও অনেক মতভেদ উপস্থিত হইয়া থাকিবে। সেইরূপ আবার, ঔপনিষদিক ও সাংখ্যজ্ঞানেরও বৃদ্ধি হইতেই চলিয়াছিল। তাই মূলগীতায় যাহা কিছু বিচ্ছিন্নতা আছে, তাহা দূর হইয়া বৃদ্ধিশীল অত্রব্রহ্মাণ্ডজ্ঞানের সহিত ভাগবতধর্ম্মের সম্পূর্ণ মিল হইয়া যায়, এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা অস্বাভাবিক কিংবা মূল গীতার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধও ছিল না। সেইজন্যই বর্ত্তমান গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আসিয়াছে ইহা পূর্ব্বে "গীতা ও ব্রহ্মসূত্র" শীর্ষক আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত এই প্রকার অন্য পরিবর্ত্তনও মূল গীতায় হইয়া থাকিবে। কিন্তু মূল গীতা-গ্রন্থে এই প্রকার পরিবর্ত্তন হওয়াও সম্ভব ছিল না। বর্ত্তমানে গীতার যে প্রামাণ্য আছে তাহা হইতে মনে হয় না যে, উহা বর্ত্তমান মহাভারতের পরে প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রেও 'স্মৃতি' শব্দে গীতাকে প্রমাণ ধরা হইয়াছে ইহা উপরে উক্ত হইয়াছে। মূল ভারত মহাভারত হইবার সময় যদি মূল-গীতাতেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিত, তাহা হইলে এই প্রামাণ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ কোন বাধা আসিতই। কিন্তু তাহা না হইয়া গীতাগ্রন্থের প্রামাণ্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাই এই অনুমানই করিতে হয় যে, মূল-গীতায় যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা বড় রকমের নহে, কিন্তু মূল গ্রন্থের অর্থ যাহাতে পরিস্ফুট হয় এই প্রকারের হইয়া থাকিবে। বিভিন্ন পুরাণে বর্ত্তমান ভগবদ্গীতার ধরণে যে অনেক গীতা বিবৃত হইয়াছে তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, উক্ত প্রকারের মূল গীতার যে স্বরূপ একবার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাই আজ পর্য্যন্ত বজায় আছে—উহার পরে উহাতে কোনই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। কারণ, এই সমস্ত পুরাণের মধ্যে অতি প্রাচীন পুরাণের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেই, বর্ত্তমান গীতা যদি সম্পূর্ণ প্রমাণভূত (সুতরাং অপরিবর্ত্তনীয়) না হইয়া থাকিত তবে সেই নমুনা-দৃষ্টে অন্য গীতা বিবৃত করিবার কল্পনাও মনে আসা সম্ভব ছিল না। সেইরূপ আবার, গীতার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীকাকারেরা একই গীতার শব্দসমূহকে টানা-বোনা করিয়া, গীতার্থ নিজ নিজ সম্প্রদায়েরই অনুকূল দেখাইবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারও কোন কারণ থাকিত না। বর্ত্তমান গীতার কোন কোন সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী দেখিয়া কেহ কেহ এই আশঙ্কা করেন যে, বর্ত্তমান মহাভারতের অন্তর্গত গীতাতেও পরে সময়ে সময়ে কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই বিরোধ বাস্তবিক নহে; ধর্ম্মপ্রতিপাদক পূর্ব্বাপর বৈদিক পদ্ধতির স্বরূপটি ঠিক লক্ষ্য না করায় এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমি প্রথমেই বলিয়া দিয়াছি। সারকথা, উপর্য্যুক্ত বিচার আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে যে, বিভিন্ন প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মাঙ্গের সমন্বয় করিয়া প্রবৃত্তি-মার্গের বিশেষ সমর্থক ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাবের প্রায় পাঁচশো বৎসর পরে, (অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৯০০ বৎসর) ঐ মূল ভাগবতধর্ম্মেরই প্রতিপাদক মূলভারত ও মূলগীতা প্রথমে রচিত হয়; এবং ভারতের মহাভারত হইবার সময় এই মূল গীতায় তদর্থপোষক কিছু সংস্কার সাধিত হইলেও উহার প্রকৃতস্বরূপ তখনও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই; এবং বর্ত্তমান মহাভারতে গীতা সংযোজিত হইবার সময়, এবং তাহার পরেও উহাতে কোন নূতন পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং হওয়া সম্ভবও ছিল না। মূল গীতা এবং মূল ভারতের স্বরূপ ও কালসম্বন্ধীয় এই নির্ণয় স্বভাবত মোটামুটভাবে ও আন্দাজে করা হইয়াছে। কারণ এ সময়ে তাহার জন্য কোন বিশেষ উপায় আমাদের উপলব্ধ হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান মহাভারত এবং বর্ত্তমান গীতার কথা সেরূপ নহে; কারণ ইহাদের কালনির্ণয় করিবার অনেক উপায় আছে। তাই এই বিষয়ের আলোচনা পরবর্ত্তী ভাগে স্বতন্ত্ররূপে করিয়াছি। এখানে পাঠকগণের মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান গীতা ও বর্ত্তমান মহাভারত আমরা যাহা পাইয়াছি এই দুইটী সেই গ্রন্থই, যাহার মূলস্বরূপে কালান্তরে পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এগুলি তৎপূর্ব্বের মূল গ্রন্থ নহে।

---

৭৪০ সংখ্যা ১৮৪৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভগবানের আশ্বাসবাণী।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় চ সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ভারতের—কেবল ভারতের কেন, সমস্ত জগতের—ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে উজ্জ্বলতম রত্ন ভগবদগীতা আমাদিগকে গভীর আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন যে, যখনই এবং যেখানেই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধর্ম্ম সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাহে, তখনই এবং সেখানেই সাধুদিগের রক্ষার জন্য এবং অসাধুদিগকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভগবান প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে আত্মপ্রকাশ করেন।

গীতার বিভিন্ন শ্লোকে বিভিন্ন সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই আশ্বাসবাণী সেই সার্ব্বভৌমিক চিরন্তন সত্যসমূহের অন্যতর। গীতার মুখে ভগবানেরই আশ্বাসবাণী আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই আশ্বাসবাণী কেবল গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াই আমরা ইহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি না; কিন্তু ইহা আমাদের প্রত্যেকের, প্রত্যেক মানবেরই অন্তরের পরীক্ষিত সত্য। স্পষ্টভাবে হৌক, বা অস্পষ্টভাবে হৌক, আমাদের অন্তরে এই আশ্বাসবাণী উপলব্ধি না করিলে আমরা সংসারে নির্ভয়ে চলিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। এই আশ্বাসবাণী সত্য বলিয়া অন্তরের অন্তরে না জানিলে আজ আমরা ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয় দেখিতে পাইতাম না—দেখিতে চাইতামই না; অধর্ম্মের শাসনে কখন্ কোন্ অন্ধকারের মধ্য হইতে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইব, সেই ভয়েই জীবন্মৃত হইয়া থাকিতাম।

এই আশ্বাসবাণীর সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না। আজ ন্যূনাধিক শত বৎসর হইতে চলিল, আমাদের দেশকে নানাবিধ বিপদ আপদ চারিদিক হইতে ঘিরিতেই চলিয়াছে দেখি। ধর্ম্ম বল, সমাজ বল, রাজশাসন বল, সকল বিষয়েই বিপদ আপদ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেশকে গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ঐ আশ্বাসবাণী সত্য বলিয়াই আমরা দেখি যে, ভগবান পদে পদে সমস্ত বিপদের মেঘজাল কাটাইয়া দিয়া মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়া এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ঐ আশ্বাসবাণী সত্য বলিয়াই ভগবান বর্ত্তমান বিপদসঙ্কুল যুগের সেই আদিমকালে রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বোত্তম সংকটমোচন মন্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকল্পে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করাইলেন।

আমি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বলিয়া একথা বলিতেছি না; কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভাবে আমি একথা বলিতেছি না। গভীররূপে আলোচনা করিয়া আমি ইহা উপলব্ধি করিয়াছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মই বর্ত্তমান যুগের সমস্ত বিপদ কাটাইবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অমোঘ উপায়। আমার স্থির ধারণা এই যে, ধর্ম্মের আকরভূমি এই ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াই ভগবান সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্য এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাঁহার স্নেহের দানস্বরূপে পাঠাইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মই বর্ত্তমান যুগে শ্রেষ্ঠতম মঙ্গলময় ভগবৎবিধান বলিয়া আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, এবং ইহা বিশ্বাস করি বলিয়াই গীতার ঐ আশ্বাসবাণীকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া আজ বলের সহিত প্রচার করিতে সক্ষম হইতেছি।

ধর্ম্মের গ্লানির কথা বলিয়া আসিলাম—ধর্ম্ম কি? জগতসংসারকে যাহা ধারণপোষণ করে তাহাই ধর্ম্ম। মানবের ধর্ম্ম কি? সমগ্র মানবত্বকে যাহা ধারণপোষণ করিবে, তাহাই মানবের ধর্ম্ম। মানবের শরীরসংস্থানে, শারীরিক রক্ষাসাধনে যাহা সহায়তা করিবে তাহাও ধর্ম্ম; মানবের জ্ঞানার্জ্জনে যাহা সহায়তা করিবে তাহাও ধর্ম্ম; আবার যাহা মানবকে ভগবানের সঙ্গে একাত্মযোগে যুক্ত হইবার পথপ্রদর্শন করিবে তাহাও ধর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে যাহা আমাদিগকে ভগবানের সঙ্গে যোগযুক্ত হইবার পথ দেখাইয়া দেয়, আমরা সাধারণতঃ তাহাকেই ধর্ম্ম বলি বটে, কারণ তাহাই সকল ধর্ম্মের মূল। যে ভগবান এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও অধিপতি, তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইলে মানসিকসংস্থানই বল, আর শারীরিক সংস্থানই বল, সকল সংস্থানই যে পূর্ণ হইয়া যায়, সকল বিষয়েরই অভাব যে দূর হইয়া যায়। কিন্তু মোট কথা এই যে, আমরা ভগবানের সহিত যোগকেই মূলগত ধর্ম্ম বলিয়া ধরিলেও আমাদের জীবনব্যবহারের কোন অঙ্গকেই ধর্ম্মের বহির্ভূত করিয়া ভাবিতেই পারি না। এই কারণে আমরা আমাদের আহার-বিহার নিদ্রাজাগরণ প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যকেই ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং ধর্ম্মের দ্বারা সংযত দেখিতে চাহি এবং দেখিতে ভালও বাসি। আমরা শৈশব অবধিই এইভাবেই শিক্ষাও পাইতে থাকি।

এইখানেই আমাদের এবং পাশ্চাত্যবিহিত শিক্ষার মূলগত প্রভেদ। একটী কথা এদেশে সর্ব্বত্র ও শতবার আলোচিত ও প্রচারিত হইলেও এবং ইহা পুনরুক্ত করিয়া সকলের বিরক্তিভাজন হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি আরও একবার এখানে বলিতে চাহি যে, মানবজীবনের যে অংশ ভগবানকে লইয়া এক-আধটু নাড়াচাড়া করে, পাশ্চাত্ত্যেরা কেবল সেই অংশটুকুকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করেন; মানবজীবনের যে বৃহত্তর অংশ অবশিষ্ট রহিল, সে সমুদয়কে তাঁহারা ধর্ম্ম নাম দিতে প্রস্তুত নহেন; সে সমুদয়কে তাঁহারা ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া, ধর্ম্মের সহিত অসংযুক্তভাবে আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার কারণ এই যে, পাশ্চাত্যেরা ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতেই দেখিতে অভ্যস্ত। পাশ্চাত্যদিগের ধর্ম্ম্য কার্য্যসকল প্রধানতঃ তাঁহাদের নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মমতে সায় দিবার উপরেই অবলম্বিত থাকে।

এইভাবে জীবনের সকল ব্যবহার হইতে ধর্ম্মকে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে, এই ভ্রান্ত সংস্কারের ফলে পাশ্চাত্যেরা এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিলেন, তাহাকে ঐ ভাবের উপরেই সংগঠিত করা হইল। তাহারই ফলে এদেশে পাশ্চাত্যবিহিত শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত অবধিই ভবিষ্যতের আশাস্থল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে ধর্ম্মের গ্লানি রোপিত হইয়াছিল, এবং তাহা বর্দ্ধিত হইতে হইতে আজ দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ শিক্ষার ফলেই পাশ্চাত্য প্রদেশে কোনকিছুর সংস্কার সাধন করিতে গেলেই সামান্য মতভেদ হইতেই ফরাসিবিপ্লবের ন্যায় বিপ্লবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া রক্তস্রোত বহাইয়া দেয়। এইরূপ শিক্ষার ফলেই আমাদের দেশেও যে গুরুতর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, আজ তাহা ভারতের শাসনকর্ত্তাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে; এতদিনে তাঁহারা সেই শিক্ষার ফল মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। তথাপি ভারতবাসীর সকল কার্য্য আজও অনেক পরিমাণে ধর্ম্মকেন্দ্রক আছে বলিয়াই শতপ্রায় বৎস-

য়ের ধর্ম্মবিচ্ছিন্ন শিক্ষা সত্ত্বেও এবং দেশব্যাপী অসন্তোষের মধ্যেও আজ অহিংসাধর্ম্মের এবং অনুগ্র অসহযোগের মন্ত্র প্রচারিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে।

ভারতের শাসনভার মুসলমানদিগের হস্ত হইতে যখন ইংরাজদিগের হস্তে আসিয়া পড়িল, সেই পরিবর্ত্তনের যুগ অবধিই বিশ্বাসঘাতকতা মিথ্যা ব্যবহার প্রভৃতির ভিতর দিয়া অধর্ম্ম যে কিরূপে এদেশকে ছাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল, ইতিহাসপাঠকের তাহা অবিদিত নাই। যে কলিকাতা নগর সময়ে রাজধানী হইয়া সমস্ত ভারতের এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জগতের শিক্ষাদীক্ষার উপর স্বীয় অতুল প্রভাব বিস্তার করিবে, সেই কলিকাতা নগর বলিতে গেলে অধর্ম্মের লীলাক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুরাপান, ব্যভিচার, দারিদ্র্য, অত্যাচার ও অবিচার প্রভৃতি ইহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিতেছিল। অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের অহঙ্কার নিজেদের অন্ধকারে কলিকাতার অধিবাসীদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ধর্ম্মের আলোচনা সে সময়ে কলিকাতায় স্থান পাইত বলিয়া মনে হয় না। সে সময়ে পল্লীগ্রামসমূহে ধর্ম্মপ্রাণতার অভাব না ঘটিলেও পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞানচর্চ্চা যে ছিল না, ধর্ম্মের বহিরাবরণই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর লাভ করিত, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তাহার উপর, ইহা সর্ব্ববিদিত যে, কলিকাতার ধর্ম্মবিচ্ছিন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রভাব অল্পে অল্পে পল্লীগ্রামেও বিস্তৃতি-লাভ করিতেছিল। এদেশের, এবং বিশেষতঃ কলিকাতার অধিবাসীগণ অধর্ম্মের ভারে প্রপীড়িত হইয়া ভগবানের আত্মপ্রকাশ দেখিবার জন্য অন্তরে অন্তরে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাই তো ভগবানের আত্মপ্রকাশের প্রকৃষ্ট অবসর। সেই আত্মপ্রকাশের জন্য ভগবানের দৃষ্টিতে সমগ্র ধরামণ্ডলের মধ্যে এই দরিদ্র ভারতের একটী কোণ এই কলিকাতা নগরই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইল, ইহাই আশ্চর্য্য! ভগবানের মঙ্গলবিধানে রাজা রামমোহন রায় অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জন্মভূমি সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে উত্তোলিত হইয়া এই কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া ভগবান যে সত্যধর্ম্ম এদেশে প্রতিষ্ঠিত করাইলেন, তাহা অসাম্প্রদায়িক না হইয়া সাম্প্রদায়িক হইবে কি প্রকারে? পাপী-তাপী সাধু-অসাধুনির্ব্বিশেষে যেমন সকলকেই সূর্য্য উত্তাপ ও কিরণদান করেন, সেইরূপ ভগবৎ-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মও এমনটী হওয়া চাই, যাহা সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকলেরই অন্তরে সাম পাইতে পারে। সে ধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক না হইলে বিশেষ কোন কার্য্যে আসিত বলিয়া মনে হয় না। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মের অভাব এদেশে বড় একটা হয় নাই। সেই একবার,—যখন হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বড়ই প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে বাবা নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম প্রচারের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। আবার এই বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টধর্ম্ম, এই তিন সুবিস্তৃত ধর্ম্মের মধ্যে যখন প্রবল পরস্পর-সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখন সেই সংঘর্ষের অগ্নিতে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীসকল দগ্ধ হইয়া গেল এবং অদাহ্য ও অক্ষয় অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম স্বীয় উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিলেন। যে দেশ বিভিন্ন ধর্ম্মকে অকুতোভয়ে স্বীয় অঙ্কে স্থান দিতে পারিয়াছে; যে দেশে বেদ-উপনিষদের ঋষিমুনি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধু তুকারাম, বাবা নানক, চৈতন্যদেব প্রভৃতি সিদ্ধ মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার প্রতি ধূলি-কণাকে পবিত্র করিয়া দিয়াছেন; যে দেশের পণ্ডিতগণ বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনায় স্বীয় প্রতিভাবলে দেশবিদেশের পণ্ডিতগণকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং যে দেশের অপরাধীগণও যথাসম্ভব জীবনের সমস্ত ব্যবহার ধর্ম্মানুগত করিবার চেষ্টা করিয়া ডার্ব্বিনের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতকেও চমৎকৃত করিতে পারিয়াছে, সেই দেশেরই এক উপযুক্ত সন্তান ঐ উজ্জ্বল মূর্ত্তি অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের মহিমা বুঝিলেন এবং তিনিই তাহা ধারণ করিয়া দেশকে সেই অক্ষয় কবচ দানের অধিকার লাভ করিলেন।

মানুষের মস্তক অবিকৃত থাকিলে অন্যান্য

অঙ্গপ্রত্যঙ্গও অনেক পরিমাণে বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা পায়, ইহা চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতর পরীক্ষিত সত্য। রাজা রামমোহন রায়ও স্বীয় সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বুঝিয়াছিলেন যে, যে ধর্ম্ম ভগবানের সঙ্গে মানুষকে যোগযুক্ত করিয়া দেয়, সেই ধর্ম্মের উপর দাঁড়াইতে পারিলে মানসিক উন্নতিসাধক জ্ঞানার্জনেরই ধর্ম্ম বল, আর শরীরসংস্থানেরই ধর্ম্ম বল, সকল ধর্ম্মই যথাসময়ে আমাদের হস্তগত হইতে বাধ্য। ইহা বুঝিয়াই তিনি অন্যান্য ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মজ্ঞানমূলক অসাম্প্রদায়িক আধ্যাত্মিক সত্যধর্ম্ম প্রচারেই দেহমন নিয়োগ করিলেন। এই সত্যধর্ম্ম পরিণামে নামে ও কার্য্যে ব্রাহ্মধর্ম্মে অভিব্যক্ত হইয়া পড়িল। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম নিজের অসাম্প্রদায়িকতার কারণেই কেবল এদেশের নহে, সমগ্র জগতের উদ্ধারের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়স্বরূপে দাঁড়াইয়া আছেন। ইহাতে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, এ বাদ সে বাদ, কোনপ্রকার বাদেরই বিবাদবিসম্বাদ স্থান পাইতে পারে না, অথচ সকল বাদেরই ইহাতে সমাবেশ হইতে পারে। ইহার মূলমন্ত্র হইল এই বিশ্বসংসারের অধিপতি, আত্মার আত্মা পরমাত্মা আমাদের পিতা, প্রভু ও উপাস্য; আর প্রত্যেক মানব তাঁহার সন্তান, দাস ও উপাসক। এই মূলমন্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজগতকে নিজের বিরাট আলিঙ্গন প্রদান করিতে উদ্যত ও প্রস্তুত। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উদারতম অসাম্প্রদায়িক মূলমন্ত্র স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এইরূপ অসাম্প্রদায়িক বলিয়াই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডকে ধর্ম্মের বন্ধনে আবদ্ধ করিবার সূচনা করিতে পারিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক বলিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারকগণ ইউরোপ ও আমেরিকার অন্তরে অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের প্রতি একটা আন্তরিক অনুরাগ জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন গ্রন্থের উপর দাঁড়াইয়া নাই, অথচ ইহা বেদ উপনিষৎ বাইবেল কোরাণ এবং সকল কালের সকল স্থানের সাধুদিগের সত্যবাণী সকল সাদরে গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

ব্রাহ্মধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক বলিয়াই ভগবানের সহিত প্রত্যেক মানবের প্রত্যক্ষ যোগের কথা ঘোষণা করিয়া সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক পরাধীনতা চিরকালের জন্য কাটিয়া দিলেন এবং এদেশবাসীর সঙ্গে জগতবাসীকেও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার উন্মুক্ত প্রশস্ত পথ স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ব্বে আর কোন ধর্ম্ম এত স্পষ্টভাবে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করিয়াছেন, বলিয়া দেখি না। এখন আমরা জন্মাবধি এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে এত সহজে ও স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত হই, বস্তুত এই স্বাধীনতার ভিতরেই এতটা লালিত-পালিত হই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম এই স্বাধীনতার পথ ধরাইয়া দিয়া আমাদের যে কি উপকার করিয়াছেন, সেটা আমরা সকল সময়ে মনেই আনিতে পারি না; বরঞ্চ এখন আমরা আধ্যাত্মিক পরাধীনতার কথা শুনিলেই চমকিয়া উঠি, তাহাকেই খুব অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করি। এখন আমরা শত শত বৎসরের অভ্যাসের ফলে অযথা গুরুবাদ, অযথা পৌরোহিত্য প্রভৃতির নিকট আত্মবলি না দিলে আর কোন কিছুই আমাদিগকে ভগবান হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিবে না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেই আধ্যাত্মিক পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরাধীনতাও বিদূরিত হইবার পথ প্রশস্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিবার পূর্ব্বে বেদবেদান্ত প্রভৃতি স্ত্রী-শূদ্রাদির অনধিগম্য ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সে গণ্ডী বজায় রাখিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই অন্তরে নিহিত আছে," তখন বেদবেদান্ত হোক, বাইবেল-কোরাণ হোক, বা অন্য যাহা কিছু হোক, যাহা কিছু সেই স্বর্গীয় অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিবার সহায়তা করিবে, তাহা হইতে কোন নরনারীকে ঠেলিয়া রাখিবার অধিকার ব্রাহ্মধর্ম্মের থাকিল না। ব্রাহ্মধর্ম্ম কাজেই আমাদিগকে মানসিক পরাধীনতা হইতেও মুক্তিলাভের পথপ্রদর্শনের উপায় করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের কল্যাণে আমাদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক পরাধীনতা অপসৃত হওয়াতেই আমরা এখন উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে শরীরসংস্থানবিষয়ক পরাধীনতা আমাদিগকে কতটা

আটেঘাটে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। আধ্যাত্মিক ও মানসিক পরাধীনতা হইতে কতকটা মুক্তিলাভ করিয়াছি বলিয়াই আজ শারীরিক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় আমাদের অধিকার জন্মিয়াছে। এই যে আমরা চারিদিকে অসন্তোষের বীজ ছড়াইয়া আছে দেখি, ইহা সেই শরীরসংস্থান-বিষয়ক স্বাধীনতালাভের চেষ্টার অতিরিক্ত আর তো কিছুই নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং" পরবশ যাহা কিছু সমস্তই দুঃখের কারণ এবং আত্মবশ যাহা কিছু তাহাই সুখের কারণ। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ও মানসিক স্বাধীনতার ন্যায় শরীর-সংস্থানবিষয়েও প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে চলিবার জন্য সর্ব্বদাই উপদেশ দেন। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম এমনটী চিরনির্দ্দিষ্ট করিয়া বলেন না যে, দেশকালঅবস্থানির্ব্বিশেষে এইটী বা ঐটীই একমাত্র কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য এইটী বা ঐটীই একমাত্র ভক্ষ্য বা অভক্ষ্য, এইটী বা ঐটীই একমাত্র পরিধেয় বা অপরিধেয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধনকেই মূল লক্ষ্যরূপে স্থির রাখিয়া গীতার সহিত একবাক্যে বলেন যে, যে ভাবে শরীরসংস্থানের চেষ্টা করিলে ভগবানের অপ্রিয় কার্য্য করা হইবে না, প্রত্যুত তাঁহার প্রতি প্রীতিসাধনের, তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ-সাধনের সহায়তা হইবে, সেই ভাবেই জীবনের সমস্ত ব্যবহার, আহারবিহার নিয়মিত করিবে। দেশকাল-অবস্থার বিভিন্নতা অনুসারে জ্ঞানার্জনের পদ্ধতির ন্যায় আহারবিহারেরও পদ্ধতি, শরীর-সংস্থানের চেষ্টাও বিভিন্ন হইতে পারে; তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্য সকল বিষয়ে মানবকে যথাযুক্ত স্বাধীনতা প্রদান করিয়া কেবল ভগবানকেই জীবনের কেন্দ্র করিবার উপদেশ দেন। এই কারণেই ব্রাহ্মধর্ম্মের দেবতাও যেমন একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, তেমনি তাহার মন্ত্রবীজও আসলে একটীমাত্র—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—তাঁহাতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার উৎস বলিয়া বর্ত্তমান পরাধীনতার যুগে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ, বিশেষভাবে প্রেরিত মঙ্গলবিধান বলিয়া মনে করি। মনে হয়, ভারতবাসীকে শত শত বৎসরের সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতা হইতে মুক্তিদান করিবার জন্য এবং সেই সঙ্গে জগতবাসীকে স্বাধীনতার এক নবতর পন্থা দেখাইবার জন্যই যেন ভগবান তাঁহার মঙ্গলভাব ও করুণার বিশেষ চিহ্নরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মকে বর্ত্তমান অশান্তিযুগের প্রারম্ভেই এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। এই সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার উৎস, আমাদের জীবনে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা দিতে সক্ষম ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি আমরা গ্রহণ না করি, ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি আমাদের জীবনের নিয়ামক না করি, এবং সেই কারণেই যদি আমরা সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা অর্জনে অক্ষম হই, তবে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের দোষ নহে, তাহা আমাদেরই আলস্যের দোষ, আমাদের অবহেলার ফল। হীরকখণ্ড সম্মুখে দেখিয়াও যদি তাহা ছাড়িয়া একটী কাচখণ্ড লইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই, তবে তাহা হীরকের দোষ নহে, তাহা আমাদের মনেরই মোহ বা ভ্রান্তির ফল।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম একটা অতিপ্রাকৃত ধর্ম্ম নহে। যে ধর্ম্ম সৃষ্টির আদি অবধি মানবহৃদয়ে অভিব্যক্ত হইয়া আসিতেছে; যে ধর্ম্ম এই পুণ্যভূমিতে শত সহস্র লোকের তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছে; এবং যে ধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়া শতবিধ পরাধীনতার মধ্যেও ভারতভূমিকে সগৌরবে উন্নতশিরে দাঁড়াইবার অধিকার দিয়াছে, প্রকৃতির নিয়মে সেই ধর্ম্মই দেশকালের ধারা বজায় রাগিয়াই আজ ব্রাহ্মধর্ম্মে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা এত সহজ ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে, ইহাতে অতিপ্রাকৃত কোন কিছু দেখাইয়া লোকসংগ্রহের প্রয়োজনই অনুভূত হয় না—অবসরই নাই।

গীতায় আমরা ভগবানের যে আশ্বাসবাণী পাইয়াছি যে, ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় উপস্থিত হইলেই ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবেই আমরা তাহার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিতেছি। সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতা হইতে, অধর্ম্মের করাল কবল হইতে মুক্তি দিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরিত হইয়াছেন—ইহা গ্রহণ করা বা

না করা আমাদের হাতে। মুক্তি যদি চাই, তবে ইহার আশ্রয় লইতে বাধ্য; আর যদি ইহার আশ্রয় না লই, তবে মুক্তির আশা এখনও অনেক দূরে। গীতা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে "ভগবানকে অনন্যমনে উপাসনা করিলে তিনি স্বয়ং ভক্তদিগের যোগক্ষেম বহন করেন বা ঐহিক সুখ বিধান করেন।" ব্রাহ্মধর্ম্মও ভগবানের মঙ্গল-দৃষ্টি উপলব্ধি করিয়া আমাদিগকে এই মহান আশ্বাসবাণী দিতেছেন এবং এই আশ্বাসবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে,"ভগবানে ঐকান্তিক প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা এবং সেই উপাসনা দ্বারাই মানবের কেবল পারলৌকিক মঙ্গলই সাধিত হয় না, ঐহিক মঙ্গলও সংসাধিত হয়"। *

"যোগ দিতে যে হবে"

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

সোহিনী—দাদরা।

ভোরের পাখী গাইছে যে গান
সেই গানে মোর
যোগ দিতে যে হবে!
ভোরের আলোক তুল্‌ছে যে তান
সেই তানে মোর
যোগ দিতে যে হবে!
আসুক্ দুঃখ আসুক্ মরণ
ধরতে হবে তাঁরি চরণ—
এই ঝঞ্ঝা ঝড়ে বাজে যে গান
সেই গানে মোর
যোগ দিতে যে হবে!
নিত্য তিনি আসেন প্রাণে
কতই দুঃখ-বেদন-গানে
রুদ্ধ দুয়ার দিয়ে সে গান
পশে না মোর কানে!
ফুলে ফুলে সাজিয়ে বেদী
ডাকেন তিনি নিরবধি—
তাঁর বাঁশীর সুরে ভরা ভুবন
সেই সুরে মোর
যোগ দিতে যে হবে॥

* গত ৩০ কার্ত্তিক বেহালা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিবৃত।

মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা।

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম এ)

শৈশবে কিশোরীচাঁদ একটি পাঠশালায় রামনারায়ণ সরকার নামক জনৈক গুরুমহাশয়ের নিকট মাতৃভাষা শিক্ষা করেন। সে সময়ের বাঙ্গালা ভাষার দারিদ্র্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং কিশোরীচাঁদের সমসাময়িক ছাত্রগণ যে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কিশোরীচাঁদ যদিও তাঁহার ভ্রাতা প্যারীচাঁদের ন্যায় বাঙ্গালা পুস্তকাদি রচনা দ্বারা আমাদিগের সাহিত্য-ভাণ্ডার তাঁহার উচ্চ ভাব ও নির্ম্মল নীতি-মূলক রচনায় সমৃদ্ধ করেন নাই, তথাপি তাঁহার যে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থাবলী হইতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের নিকট ইংরাজীরই সমধিক সমাদর ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডেভিড্ হেয়ারের তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভায় কিশোরীচাঁদ যথার্থই বলিয়াছিলেন —"There is a large number of our educated friends who can relish nothing that is Bengali, their taste seems to be diametrically opposed to all that is written in their own tongue. The most elevated thoughts and the most sublime sentiments when embodied in it become flat, stale and unprofitable."

অর্থাৎ, আমাদের শিক্ষিত বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য নিতান্ত অনাদৃত; যাহা কিছু মাতৃভাষায় লিখিত হয় তাহা যেন তাঁহাদিগের রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চতম কল্পনা, গভীরতম ভাব সকল বাঙ্গালা ভাষায় সজ্জিত হইলেই যেন প্রাণহীন, ভাবহীন, ও উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালা শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তৎকালীন রীত্যনুসারে একজন মুন্সী কর্তৃক কিশোরীচাঁদ ফারসী ভাষায় শিক্ষা-প্রাপ্ত হন। এই ভাষায় কিশোরীচাঁদ তাদৃশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা সকলেরই উপলব্ধি হয়। বিশেষতঃ তীক্ষবুদ্ধি রামনারায়ণ হিন্দুকলেজে প্যারীচাঁদের শিক্ষায় উন্নতি দেখিয়া কিশোরীচাঁদকে উত্তম ইংরাজী শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

বাল্যকাল হইতেই প্যারীচাঁদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য আগ্রহ দৃষ্ট হয়। তিনি যখন হিন্দুকলেজের উচ্চ শ্রেণীতে

পাঠ করেন, তখন (১৮৩০ খৃষ্টাব্দে) স্বীয় বাটীতে "হিন্দু দাতব্য বিদ্যালয়" নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। বিদ্যালয়ে প্রাতঃকালে শিক্ষা দেওয়া হইত। শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, রাধানাথ সিকদার, কালাচাঁদ শেঠ, রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি ইহার অবৈতনিক শিক্ষক এবং প্যারীচাঁদ ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষার চিরবন্ধু ডেভিড্ হেয়ার, মহাপ্রাণ ডিরোজিও এবং হিন্দু কলেজের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ডি আনসলেম প্রভৃতি মহোদয়গণ উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ ও পারিতোষিক বিতরণ করিতেন; কিশোরীচাঁদ এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষায় প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন এবং ডেভিড্ হেয়ার প্রভৃতি মহাপুরুষগণের সহিত পরিচিত হন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে হেয়ারের আগ্রহে রামনারায়ণ কিশোরীচাঁদকে হেয়ার স্কুলে প্রেরণ করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কিশোরীচাঁদ প্রভূত উন্নতি লাভ করিলেন এবং বৎসর বৎসর পারিতোষিক পাইতে লাগিলেন। মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার প্রত্যেক বালকের চরিত্র ও শিক্ষাবিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। পরিশ্রমী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুচরিত্র ও মেধাবী কিশোরীচাঁদ একাগ্রচিত্তে ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; এবং হেয়ারের নিতান্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন। হেয়ারের উপদেশে তিনি যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইলেন। কিশোরীচাঁদ যত দিন জীবিত ছিলেন ডেভিড্ হেয়ারের এই উপকার বিস্মৃত হন নাই। এদেশে ইংরাজী শিক্ষার জন্মদাতা ডেভিড্ হেয়ারের মৃত্যু হইলে, তাঁহারই প্রযত্নে ও চেষ্টায় 'হেয়ার সাম্বৎসরিক স্মৃতিসভা' প্রবর্ত্তিত হয় এবং কিশোরীচাঁদ এই সভার বাৎসরিক অধিবেশনে প্রায়ই উপস্থিত থাকিয়া হেয়ারের গুণকীর্ত্তন করিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম—

"এতদ্দেশবাসিগণকে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার নিগড় হইতে মুক্ত করাই ডেভিড্ হেয়ারের জীবনের ব্রত ছিল। এই ব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি, সময়, অর্থ ও জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এতদ্দেশবাসীগণের মনোবৃত্তি যে উচ্চতম বিকাশলাভে সমর্থ তাঁহার এই ধারণা ছিল এবং তাঁহার এই অভিমত আজ আমাদিগের নিকট উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট বাস্তবরূপে পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদিগের নৈতিক ও মানসিক উন্নতিবিধানই তাঁহার চরম উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা স্বয়ং লক্ষ্য করেন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে আমাদিগের স্বজাতীয়গণের প্রতি তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রেমের গভীরতা উপলব্ধি করা দুষ্কর। কি ধনী কি নির্ধন সকল ছাত্রের প্রতি তাঁহার ভালবাসা সমভাবে লক্ষিত হইত। আমাদিগের কলিকাতার অনেক প্রসিদ্ধ লোকহিতৈষীর অনুগ্রহ জাতি বা বর্ণবিষয়ক পার্থক্যানুসারে প্রদর্শিত হয়! কিন্তু ডেভিড্ হেয়ার প্রত্যেক মনুষ্যকেই প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেন; কারণ সমগ্র মানবজাতিই তাঁহার প্রেমের বিষয় ছিল। দেশের পার্থক্য, জাতির পার্থক্য, সামাজিক বা বিজাতীয় অবস্থার পার্থক্য তাঁহার সহানুভূতির বৃদ্ধি বা সঙ্কোচ উৎপাদিত করিতে পারিত না। তিনি জাতি বা সামাজিক অবস্থাঘটিত পক্ষপাতিত্বের বহু উচ্চে অবস্থিত ছিলেন। মানুষ যে চাপকান বা শাল, পাল্কী বা গাড়ী অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বিষয়ের অধিকারী তাহা তিনি জানিতেন। তিনি কৃষ্ণকায় লোককেও ভ্রাতার মত দেখিতেন। এই ভ্রাতৃভাবের অস্তিত্বের ঔচিত্য অকাট্য যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত হইলেও এখনও সাধারণের দ্বারা স্বীকৃত বা অনুভূত হয় নাই এবং ইংলণ্ডবাসীদিগের মনে এই ভাব প্রবিষ্ট করাইবার নিমিত্ত এখনও প্রধানমন্ত্রিগণের বক্তৃতার প্রয়োজন অনুভূত হয়। লোকহিতৈষী ডেভিড্ হেয়ার, ভারতবর্ষে এই লোকহিতৈষণার যুগেও একটি নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। তাঁহার সময় হইতেই ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের উপর দিয়া নূতন ভাবস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে, ইহা দ্বারা অন্ধকার হইতে আলোক উদ্ভূত হইবে এবং হিন্দু ও য়ুরোপীয়গণের মধ্যে ইচ্ছা, আশা ও আকাঙ্ক্ষার ঐক্য সংসাধিত হইবে। এতদ্দেশবাসিগণের উন্নতিসম্বন্ধীয় বিষয়ে তাঁহার যেরূপ অসীম আগ্রহ ছিল, তাঁহার তৎসাধনেচ্ছাও সেইরূপ বলবতী ছিল। প্রত্যেক দেশবাসীকে তাঁহার অবস্থা উন্নত করিবার এবং উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিবার অভূতপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। যে স্বার্থপরতা, নীচাশয়তা ও ঈর্ষ্যা আজ দেশবাসিগণকে তাঁহাদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া কেবল নীচ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পায়, তাহার মধ্যে অবস্থিত হইয়াও তাঁহাদিগের উন্নতিবিষয়ে ডেভিড্ হেয়ারের আগ্রহ ও তাঁহাদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বীকারের কথা স্মরণ করিলে মনে আনন্দের উদয় হয়।

"হিন্দুর প্রতি প্রগাঢ় আগ্রহপূর্ণ প্রেম যেন তাঁহার প্রকৃতির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত ছিল। তাঁহার পরোপকারেচ্ছা গভীর ছিল, কিন্তু অসংযত ছিল না; এবং তাঁহার মনের এই বিশেষ ভাব তাঁহার সমস্ত জীবনে ও চরিত্রে লক্ষিত হয়। তাঁহার প্রেমময় আনন হইতে যেন ইহা বিস্ফুরিত হইত! কি বাবুর বৈঠকখানায়, কি রাজার নৃত্যশালায়, কি দরিদ্র পরান্নভোজী বালকের অপ্রশস্ত গৃহে, কি রাজকুমারের রোগ-শয্যার পার্শ্বে সর্ব্বত্রই ইহা লক্ষিত হইত। দেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে পরিভ্রমণকালে ইহা বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হইত।

অজ্ঞতার বিষময় ফলে আমাদিগের সমাজের জীবনী-শক্তি অপচিত হইতেছে দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কি কর্ত্তব্য তিনিই তাহা সর্ব্বপ্রথমে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। আপনারা আপনাদিগের অভিজ্ঞতাফলে ইহা দেখিয়া থাকিবেন যে, কোনও কোনও বিশেষ ব্যক্তির দৃষ্টি দেশের কোনও কোনও বিশেষ ব্যাধির প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদিগের সমাজের কল্যাণসাধনে বিশেষভাবে সাহায্য করে; কারণ এই সকল বিশেষ ব্যাধির প্রতীকারকল্পে এই সকল বিশেষ ব্যক্তি অপরের অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহের সহিত চেষ্টা পান। ইহার প্রভাবে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি সতীদাহ নিবারণে এবং অপর কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি দাসত্ববিমোচনে প্রয়াস পান। আমি যে মহাত্মার বিষয় বলিতেছি, তিনি দেশবাসিগণকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে হীনাবস্থায় পতিত দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন। মানসিক ও নৈতিক অন্ধকাররূপ মহাব্যাধির প্রতিই তাঁহার হৃদয় ও মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই অন্ধকার দূরীকরণ,—শিক্ষার কল্যাণকর প্রভাববিস্তার, তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল। এই সংকল্পসাধনার্থ তিনি হিন্দুকলেজ, স্কুল সোসাইটীর স্কুল এবং অন্য কয়েকটী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিবিধান করেন। এতদ্দেশে শিক্ষাবিস্তারে তিনি সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী ছিলেন এবং তাঁহার নাম যে 'শিক্ষার জন্মদাতা' এবং 'দেশবাসিগণের উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী' বলিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের নিকট সম্মানের সহিত স্মরণীয় হইবে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।"

হেয়ার স্কুল তৎকালে "স্কুল সোসাইটীর স্কুল" নামে অভিহিত হইত। স্কুল সোসাইটী ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার প্রযত্নে হেয়ারের স্কুল প্রভৃতি অনেক স্কুল ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেভিড্ হেয়ারের স্কুল তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। এই স্কুলের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ছাত্রগণ উক্ত সোসাইটীর ব্যয়ে হিন্দু কলেজে শিক্ষার্থ প্রেরিত হইতেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষার্থী ধনী ছাত্রগণ এই সকল ছাত্রকে বিদ্রূপ করিয়া "বড়ে" নামে অভিহিত করিতেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন "কেন 'বড়ে' বলিত তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। হেয়ার সাহেব তাঁহার স্কুল হইতে তাহাদিগকে বড়ের মতন কলেজে চালাইয়া দিতেন, এইজন্য কিম্বা বালকেরা দরিদ্র বলিয়া তাহারা কলেজের বড়মানুষ ছাত্রদিগের কল্পনানুসারে বড়ি ভাতে দিয়া ভাত খাইয়া তাহাদিগের বড়মানুষ সমাধ্যায়ী অপেক্ষা সকাল সকাল কলেজে আসিতে সমর্থ হইত, এই বলিয়া তাহারা উক্ত বড়মানুষ ছাত্রদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের নিকট অগৌরব কিন্তু প্রকৃতরূপে গৌরবসূচক এই উপাধি লাভ করিয়াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না।" ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সমাজবিজ্ঞান সভায় (Bengal Social Science Association.) পঠিত "বাঙ্গালায় শিক্ষাবিস্তার" নামক প্রবন্ধে এই সকল ছাত্রগণের সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাবানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"এই সকল ছাত্র তাঁহাদিগের কলেজের সহপাঠীদিগকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেন। তাঁহারাই সমস্ত সম্মান প্রাপ্ত হইতেন এবং যে সকল ছাত্র বেতন দিয়া পড়িতেন তাঁহাদিগের অপেক্ষা ইহাঁরাই কলেজের গৌরববর্দ্ধন করিতেন। ইহার কারণ, ইহাঁদিগের অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্য, নিম্ন বিদ্যালয়ে অর্জ্জিত পরিশ্রমের অভ্যাস, পারিতোষিক বৃত্তি প্রভৃতির উদ্দীপক প্রলোভন। ইহাঁরা সুপরিচিত উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্ব্বাচিত বালক। ইহাঁরা তাঁহাদিগের স্কুলে অন্যান্য সহাধ্যায়িগণকে প্রতিযোগিতায় অতিক্রম করিয়াছেন এবং ইহাঁদিগের জ্ঞানার্জ্জনে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। অপরপক্ষে হিন্দুকলেজের যে সকল ছাত্র আদি হইতে তথায় বেতন দিয়া পড়িতেন তাঁহারা বিলাসের ক্রোড়ে চিরলালিত। সুতরাং যাঁহারা বিদ্যার্জ্জন ঐশ্বর্য্য ও যশোলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন—সেই সকল পরিশ্রমী 'বড়ে'র (হেয়ারের ছাত্রগণের) নিকট বিলাসী ও আমোদপ্রিয় বালকগণ যে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

প্রতিভাবান ছাত্র কিশোরীচাঁদ হেয়ারের স্কুল হইতে হিন্দুকলেজে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরিত হইলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্ট একটি নূতন শিক্ষাপদ্ধতির অনুমোদন করিয়া এতদ্দেশে ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচারের অপূর্ব্ব সুযোগ প্রদান করেন। পূর্ব্বে কোর্ট অব ডাইরেক্টরসের আদেশানুসারে যে দশ সহস্র পাউণ্ড শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত তাহার অধিকাংশই দেশীয় সাহিত্য-চর্চ্চা ও সাহিত্য-প্রচার জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। এতদ্দেশের Board of Education কিছু পূর্ব্বে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। কয়েকজন সদস্য সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার প্রচারার্থী ছিলেন এবং অপর সদস্যগণ পাশ্চাত্য ভাষার প্রচারার্থী ছিলেন। প্রাচ্যভাষা-প্রচারার্থীরাই প্রথমে বিজয় লাভ করেন। কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড মেকলে অপর পক্ষে যোগদান করিলেন তখন পাশ্চাত্যভাষাপ্রচারার্থীরাই জয়ী হইলেন। মেকলে, তাঁহার ২রা ফেব্রুয়ারি (১৮৩৫) তারিখের সুপ্রসিদ্ধ

মন্তব্যে লিখিলেন, "যে কোন উৎকৃষ্ট য়ুরোপীয় পুস্তকালয়ের একটি মাত্র আলমারী সমগ্র সংস্কৃত ও আরব্য সাহিত্যের সমতুল্য।" তিনি এই সুদীর্ঘ মন্তব্যের উপসংহারে আরও বলিলেন, "ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমরা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্টের বিধি দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ নহি, আমরা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোনও প্রতিজ্ঞা দ্বারা বদ্ধ নহি, আমরা আমাদের ধনভাণ্ডার যেরূপে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি; যাহা জানা আবশ্যক তাহারই শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের ইহার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; সংস্কৃত অথবা আরবী ভাষা অপেক্ষা ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অধিক; দেশবাসীগণ ইংরাজী শিক্ষা করিতে সমুৎসুক; ধর্ম্ম অথবা ব্যবহারশাস্ত্রের ভাষা বলিয়া সংস্কৃত অথবা আরবী ভাষা প্রচার করিবার বিশেষ কারণ বিদ্যমান নাই; এতদ্দেশীয় লোকদিগকে ইংরাজীতে সুপণ্ডিত করা সম্ভব; এই উদ্দেশ্যে আমাদের সকল চেষ্টা প্রযুক্ত করা উচিত।"

বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ইহাতে এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন—

১। সপার্ষদ গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর শিক্ষাসমিতির সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রেরিত বিগত ২১শে ও ২২শে জানুয়ারি তারিখের পত্রদ্বয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি মনোযোগের সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

২। বড়লাট বাহাদুর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবাসীগণের মধ্যে য়ুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচার করিলেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এবং তিনি বিবেচনা করেন যে, শিক্ষার জন্য যে অর্থ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ইংরাজী শিক্ষায় প্রয়োগ করাই শ্রেয়স্কর।

৩। কিন্তু সপার্ষদ বড়লাট বাহাদুরের এমত অভিপ্রায় নহে যে, যত দিন দেশবাসীগণ দেশীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সমুৎসুক থাকিবে ততদিনের মধ্যে দেশীয় পাঠশালা বা উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ তুলিয়া দেওয়া হইবে। অতএব সপার্ষদ বড় লাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন যে, শিক্ষাসমিতির তত্ত্বাবধানে যে সকল বিদ্যালয় বর্ত্তমানে পরিচালিত হইতেছে সে সকলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ পূর্ব্বের ন্যায় বৃত্তি পাইবেন। কিন্তু শিক্ষাবস্থায় ছাত্রগণের সাহায্যার্থ যে বৃত্তি প্রদানের প্রথা বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে সপার্ষদ বড় লাট বাহাদুর সে প্রথার সমর্থন করিতে অক্ষম। তাঁহার বিশ্বাস যে, যে প্রথায় অধুনা শিক্ষা প্রদত্ত হয়, সেই প্রথা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অন্যবিধ অধিকতর আবশ্যক প্রথার দ্বারা অধিকারভ্রষ্ট হইবে এবং উচ্চ বৃত্তি প্রদানের একমাত্র ফল এই হইবে যে, সেই সকল অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অধ্যয়নে অস্বাভাবিক উৎসাহ প্রদান করা হইবে। অতএব তিনি আদেশ দিতেছেন যে, অতঃপর যে সকল ছাত্র এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবেন তাঁহারা কোনও প্রকার বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন না এবং যখন কোনও প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক তাঁহার কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন, শিক্ষাসমিতি গবর্ণমেণ্টকে তাঁহার বিদ্যালয়ের অবস্থা ও ছাত্রসংখ্যার একটি বিবরণ পাঠাইবেন, এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহার স্থলে নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে বিচার করিবেন।

৪। সপার্ষদ গবর্ণর জেনারেলের গোচরে আসিয়াছে যে, শিক্ষাসমিতি প্রাচ্য সাহিত্যাদি বিষয়ক পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রচারে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। সপার্ষদ বড় লাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন যে, অতঃপর উক্ত কার্য্যে আর অর্থ ব্যয় করা হইবে না।

৫। সপার্ষদ বড় লাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন যে, এই সকল সংস্কার সাধিত হইলে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, শিক্ষাসমিতি সেই সমস্ত অর্থ অতঃপর দেশবাসীগণের মধ্যে ইংরাজী ভাষার সহায়তায় ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচারার্থ প্রয়োগ করিবেন এবং বড়লাট বাহাদুর সমিতিকে এতদর্থে অতি শীঘ্র একটি শিক্ষাপদ্ধতিবিষয়ক প্রস্তাব প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন।"

যখন এই অবধারণ অনুসারে কার্য্য আরব্ধ হইল, যখন প্রতীচ্য জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার এতদ্দেশীয় ছাত্রগণের সম্মুখে উন্মুক্ত করা হইল, ঠিক সেই সময়ে অনুপম উৎসাহ ও অতৃপ্ত জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা লইয়া কিশোরীচাঁদ হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন।

হেয়ার স্কুলে তাঁহার যে অসামান্য অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভা লক্ষিত হইয়াছিল হিন্দু কলেজে কাপ্তেন রিচার্ডসন শীঘ্রই তাহা দেখিতে পাইলেন। কিশোরীচাঁদ ডি-এল-রিচার্ডসনের একজন প্রিয়তম ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য খ্যাতনামা ইংরাজ লেখকগণের গ্রন্থাবলী কিশোরীচাঁদ রিচার্ডসনের তত্ত্বাবধানে পাঠ করিতে লাগিলেন। রিচার্ডসন একজন সুপণ্ডিত, সুলেখক, সুকবি ও সমালোচক ছিলেন। তাঁহার আবৃত্তিশক্তি অসাধারণ ছিল। বহুদর্শী সমালোচক লর্ড মেকলে তাঁহার সেক্সপিয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ভারতবর্ষের সকল কথা বিস্মৃত হইতে পারি; কিন্তু আপনার সেক্সপিয়র পাঠ কখন ভুলিতে পারিব না।" কিশোরীচাঁদ ইঁহার নিকট কেবল ভাষা শিক্ষা করিলেন না; ইংরাজী আবৃত্তিশক্তিও সঞ্চয় করিলেন। এই উচ্চারণের বিশুদ্ধতা গভীর জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত

হইয়া উত্তরকালে কিশোরীচাঁদের বক্তৃতাগুলিকে শ্রোতামাত্রেরই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিত।

অধিকাংশ সাহিত্যসেবীর ন্যায় কিশোরীচাঁদ গণিত শাস্ত্রে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না। কিন্তু তিনি ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার সহপাঠিগণের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রধান অধিকার করিতেন এবং প্রতিবৎসর কলেজের পারিতোষিক ও ছাত্রবৃত্তিগুলি অধিকার করিতেন। তাঁহার বার্ষিক পরীক্ষায় লিখিত একটি রচনা বিশপ উইলসন কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট হৌসে পারিতোষিক বিতরণকালে পঠিত হয় এবং বাঙ্গালার তদানীন্তন চীফ্ জষ্টিস স্যর্ এডওয়ার্ড রায়ন এই বালকের অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হয়েন।

কিশোরীচাঁদের সতীর্থ ও সমসাময়িক ছাত্রগণের মধ্যে প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দকৃষ্ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় (৺ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), জগদীশনাথ রায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রাজেন্দ্র দত্ত, ভোলানাথ চন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং গৌরদাস বসাকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিশোরীচাঁদ বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বন্ধুবৎসল, পরদুঃখকাতর ও উচ্চমনা ছিলেন। শুনা গিয়াছে যে, স্বীয় পরিশ্রমার্জ্জিত ছাত্রবৃত্তি হইতে তিনি অনেক দরিদ্র জ্ঞানপিপাসু সহপাঠীর বিদ্যালয়ের বেতন দিয়া সাহায্য করিতেন। হিন্দু কলেজের উচ্চশ্রেণীতে পাঠকালে তিনি সিমুলিয়া দাতব্য বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে দরিদ্র বালকগণকে শিক্ষা দিতেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১২ই মার্চ্চ তারিখে তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং রাজকৃষ্ণ দে মহোদয়দিগের প্রস্তাবে সংস্কৃত কলেজে একটি সভার অধিবেশন হয়। ইহাতে এতদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের মানসিক উন্নতির জন্য "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge) নামক একটি সভা প্রতিষ্ঠা করা স্থিরীকৃত হয় এবং ঐ বৎসর ১৬ই মে তারিখে উক্ত সভা কার্য্য আরম্ভ করেন। প্রতিমাসে একটি অধিবেশন হইত এবং সুধীবৃন্দ বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনাদি করিতেন। মহাত্মা ডেভিড হেয়ার উক্ত সভার সভাপতি হন। জ্ঞানপিপাসু কিশোরীচাঁদ উক্ত সভার প্রারম্ভ হইতেই উহাতে যোগদান করেন এবং উক্ত সভার দ্বিতীয়বার্ষিকী কার্য্যবিবরণী হইতে দৃষ্ট হয় যে, তিনি উক্ত সভার মাসিক অধিবেশনে ১৮৪০ ও ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে "সত্য" ও "শিক্ষিত দেশবাসিগণের বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ আশা" শীর্ষক দুইটি মনোহর প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত কার্য্যবিবরণীর ভূমিকায় লিখিত আছে যে, উক্ত প্রবন্ধদ্বয় লেখকের বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

অনুমান ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে* কিশোরীচাঁদ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করেন। এই বৎসরের হিন্দুকলেজের পুরস্কার-বিতরণসভার কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে প্রতীত হয় যে কিশোরীচাঁদ ইংরাজী প্রবন্ধরচনায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া তদানীন্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড অক্ল্যাণ্ডের নিকট হইতে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পাঠকগণের অবগতির জন্য এই কার্য্য-বিবরণীর কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(At the Hindu College Prize Distribution of 1841 held at the Town Hall)

"One of the boys of the First Class—Kissory Chand Mittra—was then called upon to read an essay entitled "Travels & enterprises considered with regard to Hindus" which he had been summoned to compose at a time when he has perfectly unprepared for it, and no assistance had been afforded to him from books &c. He wrote it in the presence of Dr. Wise, the secretary. It was a very creditable production and we were happy to see the infamous system of the Dhurmo-Sobha touched up. It was styled a diabolical system, the suppression of which reflected great credit on those who had done so. The same young man had answered in writing several questions from Grecian, English, Indian & Scotch histories. These also reflected great credit to the student. Lord Auckland awarded him the first prize which consisted of some dozen books of great value." (Friend of India 4th March 1841 reported from Calcutta courier of 25th February 1841)

আজিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব যুগের শিক্ষিত পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন; কিন্তু হায়, সে শিক্ষায় ও আজি-

* রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার আত্মচরিতে বলেন যে, যে বৎসর তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন সেই বৎসর কিশোরীচাঁদ হিন্দুকলেজ পরিত্যাগ করেন।

কার শিক্ষার কত প্রভেদ। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সুপণ্ডিত লালবিহারী দে স্বসম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' নামক মাসিক পত্রিকার "৺কিশোরীচাঁদ মিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ে লিখিয়াছিলেন—

"আমাদের সাহিত্যসেবকগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি চলিয়া গেলেন। বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র যে সম্প্রদায়ের শিক্ষিত বাঙ্গালী ছিলেন—তাঁহাদিগের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব যুগের ব্যক্তিগণ নানা বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ অপেক্ষা অধিকতর উন্নতচেতা, অধিকতর পবিত্র রুচিসম্পন্ন, ইংরাজী সাহিত্যের ভাবে অধিকতর প্রভাবাপন্ন এবং সাহিত্যসেবায় অধিকতর যত্নশীল ছিলেন। ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত আমাদের কলেজের ছাত্রগণ নিকৃষ্টতর প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। এই কুফল আমাদের আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির দোষেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য ছোট ছোট বালকগণের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ভিতর ব্যাকরণের শুষ্ক কঠোর সূত্র, শব্দের নীরস ধাতু ও প্রত্যয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজারে প্রচলিত অর্থপুস্তকে লিখিত গ্রন্থের মর্ম্ম (যাহা হইতে গ্রন্থকারের সমস্ত ভাব উবিয়া গিয়াছে) এবং সরল ভাষায় অনূদিত বা সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থ অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব যুগের ব্যক্তিগণ ইংরাজী সাহিত্য উপভোগ করিতেন, বর্ত্তমান কালের যুবকগণ পরীক্ষাস্থলে যাহা প্রয়োজনীয় তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই পাঠ করেন না। সুতরাং এক্ষণে জ্ঞানলাভের জন্য যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয় না ইহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি?"

অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি উক্ত মন্তব্য বোধ হয় আজিও সমর্থন করিবেন। পূর্ব্বোল্লিখিত "বঙ্গে শিক্ষা বিস্তার" বিষয়ক প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ যথার্থই বলিয়াছেন যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি "বুদ্ধি-যন্ত্র নির্ম্মাণের উপযোগী—বুদ্ধিমান মনুষ্য গঠনের নহে"।

কুশাগ্র বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও শিক্ষামার্জ্জিত সুরুচি লইয়া উচ্চতমভাবে প্রণোদিত যুবক কিশোরীচাঁদ কিরূপে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন তাহাই পরপরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। কিন্তু এই পরিচ্ছেদ সমাপ্তির পূর্ব্বে কিশোরীচাঁদের জীবনের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করা উচিত। হিন্দু কলেজ পরিত্যাগের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কিশোরীচাঁদ রাজপুরনিবাসী ৺গোরাচাঁদ ঘোষ মহাশয়ের বুদ্ধিমতী সুশীলা ও সুন্দরী কন্যা কৈলাসবাসিনীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিশোরীচাঁদের দাম্পত্য জীবন অতি সুখময় হইয়াছিল।

অদৃষ্ট।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

যখন যাহা পাস্ রে দান
নিস্ রে মন! অবিচারে;
যা' আছে তোর ভাগ্যে লেখা
খণ্ডাতে তা' কেউ না পারে!
তুই রে ছিলি রাজার ছেলে
সিংহাসনের অধিকারী,
ধন্য হ'ত বিশ্ব ভুবন
পেলে রে তোর কৃপাবারি!
আজ রে সব হেলায় ছেড়ে
দাঁড়ালি তুই সবার দ্বারে,
সাজে কি তোর মানাভিমান
নাইক জোর আর ত কারে'!
আপন ভাবে আপনি চল্,
ওরে পাগল! সৃষ্টিছাড়া!
বাঁধন যদি টুটেই থাকে
ফেলিস্ নেরে অশ্রুধারা!
সুখের স্বাদ অনেক পেলি,
দুঃখে এবার পরখ কর্,
ফুলের মালা আস্লি ফেলে,
বজ্র নয় মাথায় ধর্!
সকল-কিছু দু'দণ্ডেরি,
মিলাবে সব অন্ধকারে,
ভাবনা তবে কিসের তরে,
ডুব্ দে মন! কাল-পাথারে!

লিঙ্গায়ত আচার্য্য।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

লিঙ্গায়ত ব্রাহ্মণ (জঙ্গম) গণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) আচার্য্য এবং (২) প্রকন্দা। কথিত আছে যে, ইহারা সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান নামক শিবের পঞ্চমুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

উপরি-উক্ত পঞ্চমুখ হইতে ক্রমান্বয়ে (১) রেবনারাধ্য, (২) মরুলারাধ্য, (৩) একরামারাধ্য, (৪) পণ্ডিতারাধ্য এবং (৫) বিশ্বারাধ্য নামক

পঞ্চমূল আচার্য্যগণ উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহারাই আচার্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়।

রেবনারাধ্য কোল্লিপাকী ক্ষেত্রস্থ সোমেশ্বর লিঙ্গ হইতে, মরুলারাধ্য বটক্ষেত্রস্থ সিদ্ধেশ লিঙ্গ হইতে, একরামারাধ্য ধাতুকুণ্ডস্থ শ্রীমল্লিকার্জ্জুন লিঙ্গ হইতে, পণ্ডিতারাধ্য দ্রাক্ষারামস্থ রামনাথলিঙ্গ হইতে এবং বিশ্বারাধ্য কাশীক্ষেত্রস্থ বিশ্বেশ্বর লিঙ্গ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের সিংহাসনাধিপত্য (আশ্রম) স্থান—(১) রম্ভাপুরী (বালীহথী), (২) উজ্জয়নীপুরী (৩) শ্রীশৈল পর্ব্বত, (৪) হিমবৎকেদার এবং (৪) কোল্লিপাকী (কাশী)। ইহাদিগের গোত্র (১) বীর, (২) নন্দি, (৩) বৃষভ, (৪) ভৃঙ্গি ও (৫) স্কন্দ। ইহাদিগের সূত্র (১) পড়বিড়ি, (২) বৃষ্টি, (৩) মুক্তগুচ্ছ, (৪) লংবন ও (৫) পঞ্চবর্ণ। ইহাদিগের প্রবর বীরশৈব। ইহাদিগের শাস্ত্র (১) ঋগ্বেদ, (২) যজুর্ব্বেদ, (৩) সামবেদ, (৪) অথর্ব্ববেদ এবং (৫) অজপবেদ। ইহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ কলশীর ধাতু—(১) স্বর্ণ, (২) রৌপ্য, (৩) তাম্র, (৪) লৌহ ও (৫) সিসা। ইহাদিগের তত্ত্ব—(১) পৃথ্বী, (২) অপ, (৩) তেজ, (৪) মরুৎ ও (৫) ব্যোম। ইহাদিগের বীজমন্ত্র—(১) নকার, (২) মকার, (৩) শকার, (৪) বকার ও (৫) যকার। ইহারা প্রত্যেকে দ্বাদশ উপসূত্রে বিভক্ত। রেবনারাধ্য হইতে—(১) পুরাণ, (২) পঞ্চকথা, (৩) ষড়ঙ্গ, (৪) সুরভি, (৫) মহিষী, (৬) দিগম্বর, (৭) বেণী, (৮) ভিত্তি, (৯) মোরট, (১০) নাটী, (১১) গৌরী ও (১২) মুসড়ী উৎপন্ন; মরুলারাধ্য হইতে—(১) লৌহকন্থা, (২) স্বর্ণকন্থা, (৩) শৃঙ্গী, (৪) মসনা, (৫) কুঠার, (৬) মৈত্রী, (৭) কঠার, (৮) চামরী, (৯) কবাট, (১০) কুম্ভকন্থা, (১১) জলকন্থা, এবং (১২) সিংহী; একরামারাধ্য হইতে—(১) গোণীকন্থা, (২) দণ্ডী, (৩) জঠর, (৪) ত্রিগুণ, (৫) কেশকন্থা, (৬) ললাট, (৭) ব্যাঘ্রকন্থা, (৮) লোচন, (৯) ভগিনী, (১০) জালকন্থা, (১১) নটন এবং (১২) বদড়ি; পণ্ডিতারাধ্য হইতে—(১) ত্রিপুটী, (২) রজ্জু, (৩) কন্থা, (৪) ভস্মী, (৫) শিখরী, (৬) রৌপ্যক, (৭) চন্দ্রগুপ্ত, (৮) মৃৎকন্থা, (৯) কাষ্টক, (১০) পবন (১১) রামগিরি এবং (১২) খড়গী; এবং বিশ্বারাধ্য হইতে—(১) পঞ্চবর্ণ, (২) কম্বাল, (৩) বৃষভ, (৪) দশবক্ত্র, (৫) জরৎ কন্থা, (৬) পঞ্চমুখ, (৭) গুহাগ্র, (৮) গোচর, (৯) গগন, (১০) মুসলী, (১১) লগুড় ও (১২) শিথিলী।

মুখ্যপঞ্চমাগণ উপরিউক্ত পঞ্চমুখ হইতে যথাক্রমে (১) মথারি (২) কালারি (৩) পুরারি, (৪) স্মরারি, ও বেদারি—নামে অভিহিত হয়। ইহাদিগের গুরু—(১) রেবনারাধ্য, (২) মরুলারাধ্য, (৩) একরামারাধ্য, (৪) পণ্ডিতারাধ্য ও (৫) বিশ্বারাধ্য। ইহাদিগের গোত্র, সূত্র, প্রবর, শাস্ত্র, ধাতু, তত্ত্ব এবং বীজমন্ত্র আচার্য্যগণের ন্যায়।

এই পঞ্চ মুখ্য পঞ্চমাগণ প্রত্যেকে দ্বাদশ উপপঞ্চমে বিভক্ত—মথারি হইতে—(১) শড়াঙ্গ, (২) প্রমুখ, (৩) শর্কর, (৪) বৃষভ, (৫) সহস্রাক্ষ (৬) ধর্ম্ম, (৭) বিষম, (৮) মৌচক, (৯) বৃকভেদী, (১০) কুঞ্জারী, (১১) শেষ ও (১২) শিখিহরিৎ; কালারি হইতে—(১) কেশরাক্ষ, (২) মৃগারি, (৩) নাকেশ, (৪) বৃষণ, (৫) শিলাঙ্গ, (৬) শৃঙ্গশীর্ষ, (৭) নীলাম্বর, (৮) কুহাসন, (৯) শতবাহু, (১০) বহুজিহ্ব, (১১) নাগদন্ত ও (১২) ষণাবপু। পুরারি হইতে—(১) অগ্নিমুক্ত, (২) হারীত, (৩) জবাল, (৪) নির্জ্জর, (৫) নিশিত, (৬) শশাঙ্ক, (৭) ললাটাক্ষ, (৮) করাঙ্কক, (৯) পাদাস্য, (১০) বিকটাঙ্গ, (১১) শিলাদ ও (১২) হরিন্মুখ; স্মরারি হইতে—(১) সহস্রশীর্ষ, (২) পীতাঙ্গ, (৩) নগমাল, (৪) নিরাশন, (৫) যমদ্যুতি, (৬) সপ্তাঙ্গ, (৭) লতাঙ্গ, (৮) মৃত্যুনাশন, (৯) অতনু, (১০) ঘোটবক্ত্র, (১১) নীরোগ এবং (১২) ভব; এবং বেদারি হইতে—(১) পশ্চাদ্দৃক, (২) বিশ্বপুষ্ট, (৩) গোমুখ, (৪) গিরিবক্ত্র, (৫) সুবর্ণ-নগর, (৬) অজাক্ষী, (৭) দশানন, (৮) বিষানন, (৯) উগ্রহেয়, (১০) শতপদ, (১১ সহস্রস্কন্দ এবং (১২ ত্রিমুখস্কন্দ।

পঞ্চমাগণ এবং তাহাদিগের আচার্য্যগণের গোত্র এক। ইহাদিগের মধ্যে সগোত্রবিবাহ নিষিদ্ধ।

সাধারণত লিঙ্গায়তগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) জঙ্গম (পুরোহিত), (২) শিলাবন্ত

(সাধু), (৩) বণ্ঠিগ (বাণিজ্যকারী) ও (৪) পঞ্চমশালী।

জার্ম্মনদেশস্থ ডাক্তার বুহ্লার (G. Buhler) প্রতিষ্ঠিত Encyclopedia of the Indo-Aryan Research Society হইতে প্রকাশিত (Printed by Karl J. Trubner—Strassburg—1913) ডাক্তার সার আর, জি, ভাণ্ডারকার কৃত Vaisnavism, Saivism and minor religious systems নামক পুস্তকে লিঙ্গায়তদিগের সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধে তিনি লিঙ্গায়তদিগের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

The impression that this whole account cr eates in one is that Lingayatism owes its origin to a spirit of jealousy of the power exercised by Brahminism and of rivalry with the system. Such a spirit of jealousy and rivalry can not be expected to have arisen in thoroughly depressed minds. The system therefore must have come into existence among the spirited members of the upper classes of Non-Brahminic Hindus under the leadership of a body of men composed of Brahmans known by the name of Aradhyas. Some of the members of this body did not go far enough in the desired reform, as mentioned before, and formed a distinct sect. It will thus be seen that all the Lingayats have not sprung up from the Sudra caste, but there is a mixture of the three higher orders among them. The claim that the two main classes of the sect put forward of their being Lingi-Brahmanas, i. e., Brahmanas wearing Linga, seems to be founded on truth. The Acarya or Jangama class is said to have sprung from the five holy persons, adored on the occasion of a religious ceremony, whose names end in the suffix aradhya significative of their being Brahmanas. We might therefore safely take them to be of Brahmanic descent. As to the Pancamas they probably represent the Vaisya order of the Brahmanic system which followed the occupation of traders and cultivators, and as the Vaisyas belong to the class of the twice-born, so also do the Pancamas and hence they are included in the Lingi-Brahmana group.

লিঙ্গায়ত আচার্য্যগণের নিকট কন্নাড়-সাহিত্য বিশেষ ঋণী। কন্নাড়-ভাষা লিখিত সাহিত্যে পরিণত হইবার পর হইতে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা কেবল জৈন লেখকদিগের দ্বারা লালিত-পালিত হইয়াছিল। তৎপরে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত লিঙ্গায়তগণই ইহার পরিপুষ্টিসাধনে যত্নবান ছিলেন। এমন কি, এই দুই শত বৎসরের মধ্যে যতগুলি লেখকের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে দুই-তিন জন ছাড়া প্রায় সকলেই লিঙ্গায়ত। পঞ্চদশ শতাব্দীর পর ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, শৈব, জৈন, লিঙ্গায়ত প্রভৃতি নানাজাতীয় সাহিত্যিকগণ ইহার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন।

কেশীরাজই কন্নাড়-ভাষায় প্রথম লিঙ্গায়ত লেখক মধ্যে গণ্য হইতে পারেন। শিলালিপি দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, এই কেশীরাজ ভরদ্বাজগোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কল্যাণরাজ বিজলালের অধীনে দণ্ডনায়ক ছিলেন। ১১৬০ অব্দে বসবা কর্ত্তৃক লিঙ্গায়ত ধর্ম্ম পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইনি লিঙ্গায়ত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কেশীরাজ আপনাকে যাদবকটকাচার্য্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম 'শব্দমণিদর্পণ' নামক প্রসিদ্ধ কন্নাড়ব্যাকরণ কন্নাড়-ভাষায় প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন চোলাপালক-চরিত, সুভদ্রাহরণ, প্রবোধচন্দ্র, কিরাত প্রভৃতি আরও কয়েকখানি পুস্তক কেশীরাজ কর্ত্তৃক রচিত হয়।

খ্রীঃ ১২৯০ অব্দে হরীশ্বর নামক জনৈক লিঙ্গায়ত লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি হেলে-বিডুর নামক স্থানের প্রধান কর্ণিক (হিসাব-রক্ষক) ছিলেন। তৎপরে তিনি পম্পা ক্ষেত্রে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিরূপাক্ষের মন্দিরে যাইয়া অবস্থান করেন। তিনি গিরিজাকল্যাণ, শিবজ্ঞান, নম্বী আম্না, মহাদেব রগেলী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত পুস্তকদ্বয় রগেলী ছন্দে লিখিত।

খ্রীঃ ১৩০০ অব্দে ষট্‌পদী ছন্দের আবিষ্কারক রাঙ্কোবা নামক একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। রাঙ্কোবাঙ্ক-চরিত নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি হরীশ্বরের ভাগিনেয় এবং শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মহাদেব ভট্ট। তিনি হাম্পা নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং হম্পাসম্রাট দেবরাজের সভায় হরিশ্চন্দ্র কাব্য বিবৃত করিয়া যশস্বী হন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার মাতুল ও গুরু অসন্তুষ্ট হওয়ায় তাঁহার লেখনী লিঙ্গায়ত ধর্ম্ম-গ্রন্থ-প্রণয়নে সঞ্চালিত হয়। তাঁহার রচিত সোমনাথ-সৎকাব্য, বীরশৈব-কথা, অন্ধভজন-কথা, অনুভবশিখামণি, সিদ্ধরামেশ্বর-কথা প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যে কেবল গ্রন্থ রচনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ নহে। লিঙ্গায়ত ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যেও তিনি বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তৎকালে হৈষেলা নগরে ত্রিভুবনতাত নামক জনৈক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। রাঙ্কোবা তাঁহাকে তর্কে পরাজিত করিয়া লিঙ্গায়ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

উক্ত অব্দে সোমেশ্বর ও হরভক্ত নামক আরও দুই জন লিঙ্গায়ত লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়। সোমেশ্বর 'মত্তে ভাবীক্রীড়' ছন্দে সোমেশ্বর শতক, গণসহস্রনাম, অক্রুর-চরিত নামক গ্রন্থগুলি রচনা করেন। তিনি তৈলঙ্গ দেশবাসী ছিলেন এবং তৈলঙ্গ ভাষায় বসবা পুরাণের অনুবাদ করেন। হরভক্ত বেদভাষ্য লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

খ্রীঃ ১৩৩০ অব্দে শিরভক্ত নামক জনৈক আচার্য্য বাসব-পুরাণের এক নূতন সংস্করণ রচনা করেন।

খৃঃ ১৩৬৯ অব্দে ভীমা কবি ষট্‌পদী ছন্দে কন্নাড়-ভাষায় বাসব-পুরাণ প্রণয়ন করেন এবং মল্লানাচারী, বীরশৈবামৃত, শিবভক্তপুরাণ, ভাবচিন্তারত্ন ও পুরাতন রগেলী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শৃঙ্গীরাজা, মলবসব-চরিত রচনা করেন।

খ্রীঃ ১৪৬০অব্দে চাম অরস প্রভুলিঙ্গলীলা নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বিজয়নগর সম্রাজ্যের রাজকবিপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই সময় মল্লালিঙ্গ নামক জনৈক কবি অষ্টবর্ণতিলক, বাসবলিঙ্গ ও শিবদীক্ষাপুরাণ নামক গ্রন্থগুলি রচনা করেন।

খ্রীঃ ১৪৮০ অব্দে তোতা আর্য্য নামক প্রসিদ্ধ কবি লিঙ্গায়ত ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠের সুবিধার জন্য ১২০ ষট্‌পদী ছন্দে শব্দমঞ্জরী নামক সংস্কৃত-কন্নাড় অভিধান রচনা করেন।

খ্রীঃ ১৫৮৫ অব্দে বিরূপাক্ষ নামক জনৈক লিঙ্গায়ত আচার্য্য ষট্‌পদী ছন্দে চন্নবসব পুরাণ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিদ্যানগরস্থ হিরি মঠের গুরু সিদ্ধ বীরেশের শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে যে এই সিদ্ধ বীরেশ প্রায় ৭০০ মুসলমান ফকীরকে লিঙ্গায়তধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তৎপরে তিনি মক্কানগরে গমন করিয়া যোগবলে অসময়ে বৃষ্টি উৎপাদন করিয়া সুলতানের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন।

গীতা-রহস্য অথবা কর্ম্মযোগ-পরিশিষ্ট।

৫ ভাগ—বর্ত্তমান গীতার কাল।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুদিত)

ইহা আলোচিত হইয়াছে যে, ভগবদ্‌গীতা, ভাগবতধর্ম্মের প্রধান গ্রন্থ, এবং এই ভাগবতধর্ম্ম খৃষ্টের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়; এবং উহার কয়েক শতাব্দী পরে মূল গীতা বাহির হইয়া থাকিবে, তাহাও মোটামুটিভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এবং ইহাও বলিয়াছি যে, মূল ভাগবতধর্ম্ম নিষ্কামপ্রধান হইলেও পরে ভক্তিপ্রধান স্বরূপ হইয়া শেষে উহাতে বিশিষ্টাদ্বৈতেরও সমাবেশ হইয়াছে। মূল গীতা এবং মূল ভাগবতধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা বেশী জ্ঞাতব্য বিবরণ অন্ততঃ বর্ত্তমান কালে তো পাওয়া যায় না; এবং এই দশাই ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান মহাভারত ও বর্ত্তমান গীতারও ছিল। কিন্তু ডাঃ ভাণ্ডারকর, ৺কাশীনাথপন্থ তৈলঙ্গ, ৺শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত এবং রাওবাহাদুর চিন্তামণি রাও বৈদ্য প্রভৃতি বিদ্বান ব্যক্তিগণের উদ্যোগে বর্ত্তমান মহাভারতের এবং বর্ত্তমান গীতার কালনির্ণয় সম্বন্ধে অনেক উপকরণ পাওয়া গিয়াছে; এবং সম্প্রতি, আরও দুই একটা প্রমাণ ৺ত্র্যম্বক গুরুনাথ কালে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সমস্ত একত্র করিয়া, এবং আমার ধারণা অনুসারে তাহার মধ্যে আরও যাহা কিছু দিবার আছে তাহাও সন্নিবিষ্ট করিয়া পরিশিষ্টের এই ভাগ সংক্ষেপে লিখিয়াছি।

এই পরিশিষ্ট প্রকরণের আরম্ভেই ইহা আমি প্রমাণসহ দেখাইয়াছি যে, বর্ত্তমান মহাভারত ও বর্ত্তমান গীতা, এই দুই গ্রন্থ এক হাতেরই রচনা। এই দুই গ্রন্থ একই হাতের সুতরাং একই কালের বলিয়া স্বীকার করিলে, মহাভারতের কাল হইতে গীতার কালও সহজেই নির্ণয় হয়। তাই, এই ভাগে প্রথমে বর্ত্তমান মহাভারতের কাল স্থির করিবার জন্য যে প্রমাণ প্রধান বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাই দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহার পর স্বতন্ত্ররূপে বর্ত্তমান গীতার কাল স্থির করিবার উপযোগী প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। উদ্দেশ্য এই যে, মহাভারতের কালনির্ণয় করিবার প্রমাণগুলি কেহ সন্দেহমূলক মনে করিলেও তজ্জন্য গীতার কালনির্ণয়ে বাধা কোন হইবে না।

মহাভারত-কালনির্ণয়—মহাভারত-গ্রন্থ অতি বিস্তীর্ণ এবং মহাভারতেই লিখিত হইয়াছে যে, উহা লক্ষ শ্লোকাত্মক। কিন্তু রাওবাহাদুর বৈদ্য স্বকীয় মহাভারতের টীকাত্মক ইংরেজী গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টে দেখাইয়াছেন যে, এক্ষণে মহাভারতের যে গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহাতে এই লক্ষ শ্লোক অপেক্ষা কিছু কমিবেশী হইয়া পড়িয়াছে, এবং উহার মধ্যে হরিবংশের সমাবেশ করিলেও লক্ষ অঙ্ক সম্পূর্ণ হয় না। * তথাপি ভারত মহাভারতে পরিণত হইবার পর যে বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা অনেকটা বর্ত্তমান মহাভারতেরই সদৃশ হইবে এরূপ মনে করিতে কোন বাধা নাই। এই মহাভারতে যাস্কের নিরুক্ত ও মনুসংহিতার উল্লেখ এবং ভগবদ্গীতাতে আবার ব্রহ্মসূত্রেরও উল্লেখ আছে, ইহা উপরে বলিয়াছি। এক্ষণে ইহা ব্যতীত মহাভারতের কালনির্ণয়ার্থ যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা এইরূপ—

(১) আঠারো পর্ব্বের এই গ্রন্থ এবং হরিবংশ, এই দুই সম্বৎ ৫৩৫ ও ৬৩৫ অব্দের ভিতর জাবা ও বালীদ্বীপে ছিল, এবং তত্রত্য প্রাচীন 'কবি' নামক ভাষায় তাহার ভাষান্তর হইয়াছিল; এই ভাষান্তরের আদি, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, আশ্রমবাসী, মুষল, প্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ এই আট পর্ব্ব বালীদ্বীপে এক্ষণে পাওয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে কোন কোনটা ছাপাও হইয়াছে। কিন্তু ভাষান্তর 'কবি' ভাষাতে হইলেও উহাতে স্থানে স্থানে মহাভারতের মূল সংস্কৃত শ্লোকই রক্ষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে উদ্যোগপর্ব্বের শ্লোক আমি মিলাইয়া দেখিয়াছি। ঐ সমস্ত শ্লোক বর্ত্তমান মহাভারতের কলিকাতা-সংস্করণের উদ্যোগ পর্ব্বের অধ্যায়ের মধ্যে মধ্যে ক্রমশঃ পাওয়া যায়। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত ৪৩৫ সম্বতের পূর্ব্বে প্রায় দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রমাণভূত মানা যাইত। কারণ তাহা না হইলে উহা জাবা ও বালীদ্বীপে লইয়া যাইবার কোন কারণ ছিল না। তিব্বতীয় ভাষাতেও মহাভারতের এক ভাষান্তর হইয়াছে, কিন্তু ইহা উহার পরবর্ত্তী। †

(২) চেদি-সম্বৎ ১৯৭ অর্থাৎ বিক্রমী ৫০২ সম্বতে লিখিত গুপ্ত-রাজাদিগের সময়ের এক শিলালিপি সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে যে, মহাভারত-গ্রন্থে তৎকালে এক লক্ষ শ্লোক ছিল; এবং ইহা হইতে দেখা যায় যে, বিক্রমী ৫০২ সম্বতের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে উহার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই ছিল। *

(৩) বর্ত্তমানে ভাস কবির যে নাটক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশ মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে রচিত। সুতরাং সেই সময়ে মহাভারত পাওয়া যাইত এবং লোকেরাও উহাকে প্রমাণ বলিয়া মনে করিত, ইহা সুস্পষ্ট। ভাস কবির বালচরিত নাটকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকথা ও গোপীদিগের উল্লেখ আছে। তাই, বলিতে হয় যে, হরিবংশও তখন পাওয়া যাইত। ভাস কবি যে, কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা নির্ব্বিবাদ। ভাস কবির নাটকসমূহের সম্পাদক পণ্ডিত গণপতিশাস্ত্রী স্বপ্নবাসবদত্তা নামক নাটকের প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে, ভাস চাণক্যেরও পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কারণ, ভাস কবির নাটকের এক শ্লোক চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়, এবং উহাতে বলা হইয়াছে যে, তাহা অন্য কাহারও। কিন্তু এই কাল সন্দিগ্ধ মনে হইলেও ভাস কবিকে যে খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতাব্দীর অধিক আধুনিক বলিয়া মানা যাইতে পারে না, তাহা আমার মতে নির্ব্বিবাদ।

(৪) অশ্বঘোষ নামে এক বৌদ্ধ কবি শালিবাহন শকের আরম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা বৌদ্ধ গ্রন্থের সাহায্যে স্থির হইয়াছে। এই অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ নামক দুই বৌদ্ধধর্ম্মীয় সংস্কৃত মহাকাব্য ছিল। এই গ্রন্থ এক্ষণে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুয়েতেও ভারতীয় কথার উল্লেখ আছে। তাছাড়া

* *The Mahabharat: a criticism*, P. 185. রা, ব, বৈদ্যের মহাভারতসম্বন্ধীয় যে টীকাত্মক পুস্তকের পরে আবশ্যকমত উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এই পুস্তক।

† জাবাদ্বীপের মহাভারতসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত *The modern Review*, July 1914 PP. 32, 38-এর মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা দেখ; এবং তিব্বতী ভাষায় মহাভারত সম্বন্ধীয় উল্লেখ Rockhill's *Life of the Budha*, P. 228 note-এ আছে।

* এই শিলালিপি *Inscriptionum Indicarum* নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে পৃ. ১৩৪-তে সমগ্র প্রদত্ত হইয়াছে এবং ৺শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রে (পৃ. ১০৮) তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বজ্রসূচিকোপনিষদের উপর ব্যাখ্যানরূপ অশ্বঘোষের এক গ্রন্থ আছে; কিংবা বলিতে হয় যে, এই বজ্রসূচি উপনিষৎ তাঁহারই রচিত। প্রোঃ বেবর এই গ্রন্থ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণীতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহাতে হরিবংশের অন্তর্গত শ্রাদ্ধমাহাত্ম্যের মধ্যে "সপ্তব্যাধা দশার্ণেষু" (হরি. ২৪. ২০ ও ২১) ইত্যাদি শ্লোক এবং স্বয়ং মহাভারতেরও অন্য কতকগুলি শ্লোক (যথা—মভা. শা. ২৬১. ১৭) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, শকারম্ভের পূর্ব্বে হরিবংশসমেত বর্ত্তমান লক্ষ-শ্লোকাত্মক মহাভারত প্রচলিত ছিল।

(৫) আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (৩. ৪. ৪) ভারত এবং মহাভারতের পৃথক পৃথক উল্লেখ আছে; এবং বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের এক স্থানে (২. ২. ২৬) মহাভারতের অন্তর্গত যযাতি উপাখ্যানের এক শ্লোক পাওয়া যায় (মভা. আ. ৭৮. ১০)। কিন্তু কেবল এই শ্লোকের ভিত্তিতে বৌধায়নের পূর্ব্বে মহাভারত ছিল এই অনুমান দৃঢ় হয় না, এই কথা বুহ্লর সাহেব বলেন।* কিন্তু এই সন্দেহ ঠিক নহে; কারণ, বৌধায়নের গৃহ্যসূত্রে বিষ্ণুসহস্রনামের স্পষ্ট উল্লেখ আছে (বৌ. গৃ. শে. ১. ২২. ৮) এবং পরে এই সূত্রেই (২. ২২. ৯) গীতার "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" শ্লোকও (গী. ৯. ২৬) পাওয়া যায়। বৌধায়নসূত্রের এই উল্লেখ সর্ব্বপ্রথম ৺ত্র্যম্বক গুরুনাথকালে প্রকাশ করেন। † এই সকল উল্লেখ হইতে বলিতে হয় যে, বুহ্লর সাহেবের সন্দেহটা নির্ম্মূল, এবং আশ্বলায়ন ও বৌধায়ন এই দুই গ্রন্থই মহাভারতের সহিত পরিচিত ছিল। বৌধায়ন খৃষ্টের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন, বুহ্লরই তাহা অন্য প্রমাণাদি হইতে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

(৬) স্বয়ং মহাভারতে যেখানে বিষ্ণু-অবতারের বর্ণনা আছে, সেখানে বুদ্ধের নাম পর্য্যন্ত নাই; এবং নারায়ণীয় উপাখ্যানে (মভা. শাং. ৩৩৯. ১০০) যেখানে দশ অবতারের নাম আছে সেখানে হংসকে প্রথম অবতার ধরিয়া এবং কৃষ্ণের পরই একেবারে কল্কির উল্লেখ করিয়া দশসংখ্যা পূরণ করা হইয়াছে। কিন্তু বনপর্ব্বে কলিযুগের ভবিষ্যৎ অবস্থার বর্ণনা করিবার সময় বলা হইয়াছে যে, "এডুকচিহ্না পৃথিবী ন দেবগৃহভূষিতা" অর্থাৎ পৃথিবীতে দেবালয়ের বদলে এডুক হইবে (মভা. বন. ১৯০. ৬৮)। এডুক অর্থে বুদ্ধের কেশ দাঁত প্রভৃতি কোন স্মারক বস্তুকে জমীর ভিতরে পুরিয়া তাহার উপর যে স্তম্ভ, মিনার বা ইমারৎ নির্ম্মিত হয়, তাহাই; এখন ইহাকে "ডাগোবা" বলা হয়। ডাগোবা শব্দ সংস্কৃত 'ধাতুগর্ভ' (=পালী ডাগব) শব্দের অপভ্রংশ, এবং 'ধাতু' অর্থে 'ভিতরে-রাখা স্মারক বস্তু'। সিংহল ও ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে এই ডাগোবা পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে, বুদ্ধ আবির্ভূত হইবার পরে—কিন্তু তাঁহার অবতার মধ্যে পরিগণিত হইবার পূর্ব্বেই—মহাভারত রচিত হইয়া থাকিবে। মহাভারতে, 'বুদ্ধ' ও 'প্রতিবুদ্ধ' শব্দ অনেক স্থানে পাওয়া যায় (শাং. ১৯৪. ৫৮; ৩০৭. ৪৭; ৩৪৩. ৫২)। কিন্তু জ্ঞানী, জ্ঞানবান অথবা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি—এই অর্থই ঐ সকল শব্দের অভিপ্রেত। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে ঐ শব্দ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু এরূপ মনে করিবার বলবৎ কারণ আছে যে, বৌদ্ধেরাই এই শব্দ বৈদিক ধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবে।

(৭) মহাভারতে নক্ষত্রগণনা অশ্বিনী প্রভৃতি হইতে নহে, কিন্তু কৃত্তিকা আদি হইতে (মভা. অনু. ৬৪ ও ৮৯), এবং মেষ-বৃষভাদি রাশির কোথাও উল্লেখ নাই—এই কথাটি কালনির্ণয়ের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, গ্রীক লোকদিগের সহবাসে, মেষ-বৃষভাদি রাশি ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ অলেক্‌জাণ্ডরের পূর্ব্বেই মহাভারত গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে—শ্রবণা আদি নক্ষত্রগণনার কথা। অনুগীতায় (মভা. অশ্ব. ৪৪. ২ ও আদি. ৭১. ৩৪ দেখ) উক্ত হইয়াছে যে, বিশ্বামিত্র শ্রবণাদি নক্ষত্রগণনা সুরু করেন; এবং টীকাকার উহার এই অর্থ করিয়াছেন যে, তখন শ্রবণা নক্ষত্র হইতে উত্তরায়ণের সুরু হইত—ইহা ব্যতীত অন্য অর্থও ঠিক্ হয় না। বেদাঙ্গজ্যোতিষের কালে উত্তরায়ণের আরম্ভ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইতে হইত। ধনিষ্ঠায় উত্তরায়ণ হইবার কাল জ্যোতির্গণিত-পদ্ধতি অনুসারে শকের পূর্ব্বে প্রায় ১৫০০ বৎসর হইয়া থাকে; এবং জ্যোতির্গণিতপদ্ধতি অনুসারে উত্তরায়ণের এক নক্ষত্র পশ্চাতে হটিতে প্রায় হাজার বৎসর লাগে। এই হিসাবে, শ্রবণারম্ভে উত্তরায়ণ হইবার কাল শকের পূর্ব্বে প্রায় ৫০০ বৎসর হয়। সার কথা, গণিতের দ্বারা দেখাইতে পারা যায় যে, শকের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান মহাভারত রচিত হইয়া থাকিবে। ৺শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রে এই অনুমানই করিয়াছেন (ভা. জ্যো. পৃ. ৮৭-৯০, ১১১ ও ১৪৭ দেখ)। এই প্রমাণের

---

* See Sacred Books of the East Series, Vol. XIV. Intro. p. Xli.

† ৺ত্র্যম্বক গুরুনাথ-কালের সমস্ত লেখা *The Vedic Magazine and Gurukula Samachar*, Vol. VII Nos 6, 7. pp. 528-532-তে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখকের নাম দেওয়া হইয়াছে প্রোঃ কালে; উহা ভুল।

বিশেষত্ব এই যে, এই কারণে বর্ত্তমান মহাভারতের কাল শকপূর্ব্ব ৫০০ বৎসরের অধিক পিছাইয়া লইতেই পারা যায় না।

(৮) রাও বাহাদুর বৈদ্য, স্বকীয় মহাভারতের টীকাত্মক ইংরেজী পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্তের দরবারে (খৃঃ পূঃ প্রায় ৩২০ বৎসর) অবস্থিত মেগস্থনীস নামক গ্রীক দূতের নিকট মহাভারতের কথা বিদিত ছিল। মেগস্থনীসের গ্রন্থ এক্ষণে সমস্ত পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা হইতে অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক উদ্ধৃত অংশ একত্র করিয়া প্রথমে জর্ম্মণ ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং ম্যাক্‌ক্রিণ্ডল তাহারই ইংরাজী ভাষান্তর করিয়াছেন। এই পুস্তকে (পৃ. ২০০-২০৫) উক্ত হইয়াছে যে, উহাতে বর্ণিত হেরক্লীজই শ্রীকৃষ্ণ এবং মেগস্থনীসের সময় মথুরা-নিবাসী শৌরসেনী লোকেরা তাঁহার পূজা করিত।* তাছাড়া হেরক্লীজ নিজের আদিপুরুষ ডায়োনিসস্ হইতে পঞ্চদশ পুরুষ ছিলেন, ইহাও তাহাতে লিখিত আছে। মহাভারতেও (সভা. অনু. ১৪৭. ২৫-৩৩) এইরূপ বর্ণনা আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ দক্ষপ্রজাপতি হইতে পঞ্চদশ পুরুষ। এবং মেগস্থনীস কর্ণপ্রাবরণ, একপাদ, ললাটাক্ষ প্রভৃতি অদ্ভুত লোকদিগের কথা (পৃ. ৭৪), এবং ভূগর্ভ হইতে সোনা বাহির করিবার পিপীলিকার কথা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও মহাভারতেই পাওয়া যায় (সভা. ৫১ ও ৫২)। এই কথা এবং অন্য কথা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, শুধু মহাভারত গ্রন্থ নহে, শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ও শ্রীকৃষ্ণের পূজাও মেগস্থনীসের সময়ে প্রচলিত ছিল।

উপরিপ্রদত্ত প্রমাণগুলি পরস্পরসাপেক্ষ নহে, স্বতন্ত্র—এই কথা মনে রাখিলে, শকপূর্ব্ব প্রায় ৫০০ অব্দে মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল, ইহা নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি হয়। ইহার পর কখনও কেহ কোন নূতন শ্লোক উহাতে ঢুকাইয়া দিয়া থাকিবে কিংবা উহা হইতে কিছু বাহির করিয়া দিয়াও থাকিবে। কিন্তু উপস্থিত সময়ে কোন বিশিষ্ট শ্লোকের সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন নাই,—প্রশ্ন তো সমগ্র মুখ্য গ্রন্থেরই সম্বন্ধে; এবং এই সমগ্র গ্রন্থ শকাব্দের অন্যূন পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছে ইহা প্রমাণিত। এই প্রকরণের আরম্ভেই আমি সিদ্ধ করিয়াছি যে, গীতা, এই সমগ্র মহাভারত গ্রন্থেরই এক অংশ এবং উহা মহাভারতে পরে ঢুকাইয়া দেওয়া হয় নাই। অতএব গীতারও এই কালই ধরিতে হয়। সম্ভবত মূল গীতা ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী, কারণ, এই প্রকরণেরই চতুর্থ ভাগে যেমন দেখাইয়াছি উহার পরম্পরা অনেক প্রাচীন কাল পর্য্যন্ত পিছাইয়া লইয়া যাইতে হয়। কিন্তু যাহাই বলনা কেন, ইহা নির্ব্বিবাদ যে, গীতার কালকে মহাভারতের পরে লইয়া যাওয়া যায় না। কেবল উপরিউক্ত প্রমাণ অনুসারেই এই কথা সিদ্ধ হয় এরূপ নহে, ঐ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রমাণও পাওয়া যায়। সে প্রমাণগুলি কি, এক্ষণে তাহা বলিতেছি।

গীতারকাল-নির্ণয়। উপরে যে সকল প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে গীতার নামতঃ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হয় নাই। এক্ষণে যে সকল প্রমাণে গীতার স্পষ্ট উল্লেখ আছে, সেইগুলি ক্রমান্বয়ে এখানে দিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ইহা বলা আবশ্যক যে, ৺তৈলং গীতাকে আপস্তম্ব ঋষির পূর্ব্বের অর্থাৎ খৃষ্ট অপেক্ষা অন্তত তিন শত বৎসরের অধিক প্রাচীন স্থির করিয়াছেন; এবং ডাঃ ভাণ্ডারকর স্বকীয় "বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি পন্থা" এই ইংরেজী গ্রন্থে প্রায় এই কালই স্বীকার করিয়াছেন। প্রোঃ গার্বের * মতে তৈলঙ্গের নির্দ্ধারিত কাল ঠিক নহে। তাঁহার মতে মূল গীতা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত এবং খৃষ্টের পর দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঐ গীতার কিছু সংশোধন করা হয়। কিন্তু গার্বের এই কথা যে ঠিক নহে তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে—

(১) গীতার উপর যে টীকা ও ভাষ্য পাওয়া যায় তন্মধ্যে শাঙ্কর ভাষ্যই অত্যন্ত প্রাচীন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহাভারতের অন্তর্গত সনৎসুজাতীয় প্রকরণেরও ভাষ্য লিখিয়াছেন এবং তাঁহার সেই গ্রন্থে মহাভারতের অনুগীতা, মনু-বৃহস্পতিসংবাদ এবং শুকানুপ্রশ্ন হইতে অনেক বচন অনেক স্থানে প্রমাণার্থ গৃহীত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, মহাভারত ও গীতা এই

---

* See M'crindle's *Ancient India—Megasthenes and Arrian* pp. 200-205. মেগস্থনীসের এই কথা আজকাল এক গবেষণার দ্বারা আশ্চর্য্যরূপে দৃঢ় হইয়াছে। বোম্বাই সরকারের Archeo logical department এর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের Progress Report সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে এক শিলালিপি আছে, উহা গোয়ালিয়র-রাজ্যের ভিল্‌সা সহরের নিকট বেসনগর গ্রামে খাম্বাবা বলিয়া এক গরুড়ধ্বজ স্তম্ভের উপর পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, উক্ত স্তম্ভের সম্মুখে বাসুদেবের দেবালয়, হেলিয়োডোরস্ নামক বিষ্ণু-ভক্ত এক যবন অর্থাৎ গ্রীক গড়িয়াছিল এবং সেই যবন তক্ষশিলার অন্টিয়াল্‌কিডস্ নামক ভগভদ্র নামক রাজার দরবারে তক্ষশিলার অন্টিয়াল্‌কিডস্ নামক গ্রীক রাজার দূত ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০ বৎসরে অন্টিয়াল্‌কিডস্ রাজত্ব করিতেন ইহা তাঁহার মুদ্রা হইতে এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে। তখন, এই সময়ে বাসুদেবভক্তি প্রচলিত ছিল শুধু নহে, কিন্তু যবনও বাসুদেবের মন্দিরনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়। মেগেস্থেনিসের শুধু নহে, বাসুদেবভক্তি পাণিনিরও বিদিত ছিল ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

* See Telang's *Bhagabad Gita* S. B. E. Vol. VIII. Intro. pp. 21 and 34; Dr. Bhandarkar's *Vaishnavism, Shaivism and other Sects*, P. 13; Dr. Garbe's *Die Bhagavadgita*, P. 64.

দুই গ্রন্থ তাঁহার কালে প্রমাণ বলিয়া মনে করা হইত। এক সাম্প্রদায়িক শ্লোকের প্রমাণে প্রোঃ কাশীনাথ বাপু পাঠক শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জন্মকাল ৮৪৫ বিক্রমী সম্বৎ (৭১০ শকাব্দ) স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে, এই কাল আরও একশত বৎসর পিছাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কারণ মহানুভাব পন্থার 'দর্শনপ্রকাশ' নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, "যুগ্মপয়োধিরসান্বিতশাকে" অর্থাৎ ৬৪২ শকে (বিক্রমী সম্বৎ ৭৭৭), শ্রীশঙ্করাচার্য্য গুহাপ্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ে তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর ছিল; অতএব তাঁহার জন্মকাল ৬১০ শকাব্দ (সম্বৎ ৭৪৫) এইরূপ সিদ্ধ হয়। আমার মতে এই কালই প্রোফেসর পাঠক-নির্দ্ধারিত কাল অপেক্ষা অধিক সযুক্তিক। কিন্তু এই সম্বন্ধে সবিস্তার বিচার এখানে করিতে পারা যায় না। গীতার শাঙ্করভাষ্যে পূর্ব্বেকার অধিকাংশ টীকাকারদিগের উল্লেখ আছে, এবং উক্ত ভাষ্যের আরম্ভেই শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, এই সকল টীকাকারদিগের মত খণ্ডন করিয়া আমি নূতন ভাষ্য লিখিয়াছি। তাই, আচার্য্যের জন্মকাল শকাব্দ ৬১০ই ধর, কিংবা ৭১০ই ধর, ইহা নির্ব্বিবাদ যে, ঐ সময়ের অন্ততঃ দুই-তিনশত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪০০ শকের কাছাকাছি গীতা প্রচলিত ছিল। এক্ষণে দেখা যাক্, ইহারও পূর্ব্বে কিরূপে এবং কতটা যাওয়া যাইতে পারে।

(২) গীতা কালিদাস ও বাণভট্টের যে বিদিত ছিল, তাহা ৺তৈলঙ্গ দেখাইয়াছেন। কালিদাসের রঘুবংশে (১০. ৩১) বিষ্ণুস্তুতিতে "অনবাপ্তমবাপ্তব্যং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে" এই যে শ্লোক আছে তাহা "নানবাপ্তমবাপ্তব্যং" গীতার (৩. ২২) এই শ্লোক হইতে পাওয়া যায়; এবং বাণভট্টের কাদম্বরীর "মহাভারতমিবানন্তগীতাকর্ণনানন্দিতনরং" এই এক শ্লেষপ্রধান বাক্যে গীতার স্পষ্ট উল্লেখ আসিয়াছে। কালিদাস এবং ভারবির স্পষ্ট উল্লেখ ৬৯১ সম্বতের (শকাব্দ ৫৫৬) এক শিলালিপিতে পাওয়া যায়; এবং ৺পাণ্ডুরং গোবিন্দ শাস্ত্রী পারখী স্বকীয় বাণভট্টসম্বন্ধীয় এক মারাঠী প্রবন্ধে বিচার করিয়াছেন এবং এক্ষণে ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, বাণভট্ট ৬৬৩ সম্বতের (৫২৮ শকাব্দের) কাছাকাছি হর্ষরাজার নিকটে ছিলেন।

(৩) জাবা দ্বীপে যে মহাভারত এখান হইতে যায় তদন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে এক গীতাপ্রকরণ আছে এবং তাহাতে গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রায় একশো সওয়াশো শ্লোক অক্ষরশঃ পাওয়া যায়। কেবল ১২, ১৫, ১৬ ও ১৭ এই চার অধ্যায়ের শ্লোক তাহাতে নাই। তাহেই এরূপ বলায় কোন প্রত্যবায় নাই যে, তখনও গীতার স্বরূপ বর্ত্তমানেরই সদৃশই ছিল। কারণ, কবি ভাষায় ইহা গীতার অনুবাদ এবং তাহাতে যে সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায় তাহা মধ্যে মধ্যে উদাহরণ কিংবা প্রতীকস্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ঐ পরিমিত শ্লোকই যে সে সময়ে গীতায় ছিল এরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ডাঃ নরহর গোপাল সরদেশাই যাবা-দ্বীপে যখন গিয়াছিলেন, তখন তিনি এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কলিকাতার "মডর্ণরিভিউ" নামক মাসিকের জুলাই ১৯১৪-র সংখ্যায় এবং তৎপূর্ব্বে পুণার "চিত্রময় জগৎ" মাসিকেও উহা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, ৪০০।৫০০ শকাব্দের পূর্ব্বে অন্যূন ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত, মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে গীতা ছিল এবং উহার শ্লোকও এখনকার গীতা-শ্লোকের ক্রম-পরম্পরা অনুসারেই ছিল।

(৪) বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে ভগবদ্-গীতার ধরণে রচিত অন্য যে সকল গীতা দেখা যায় কিংবা উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের বিবরণ এই গ্রন্থের প্রথম প্রকরণে, প্রদত্ত হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তখন ভগবদ্গীতা প্রমাণ ও পূজ্য বলিয়া বিবেচিত হইত; তাই তাহার উক্ত প্রকারে অনুকরণ করা হইয়াছে, এবং ঐরূপ না হইলে কেহই তাহার অনুকরণ করিত না। অতএব সিদ্ধ হয় যে, এই পুরাণ-সমূহের মধ্যে অত্যন্ত প্রাচীন যে পুরাণ তাহা অপেক্ষাও ভগবদ্গীতা অন্ততঃ দুই-একশো বৎসর অধিক প্রাচীন অবশ্য হইবে। পুরাণকালের প্রারম্ভ, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী অপেক্ষা অধিক আধুনিক বলিয়া মনে করা যায় না, অতএব গীতার কাল অন্যূন শকারম্ভের অল্প পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

(৫) উপরে বলিয়াছি যে, গীতা, কালিদাসের ও বাণের বিদিত ছিল। কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাস কবির নাটকগুলি, সম্প্রতি ছাপা হইয়াছে। তন্মধ্যে 'কর্ণভার' নামক নাটকে দ্বাদশ শ্লোক এইরূপ আছে যথা;—

হতোঽপি লভতে স্বর্গং জিত্বা তু লভতে যশঃ।
উভে বহুমতে লোকে নাস্তি নিষ্ফলতা রণে॥

এই শ্লোক গীতার "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং" (গী. ২, ৩৭) এই শ্লোকের সহিত একেবারে সমানার্থক। এবং যখন ভাসকবির অন্য নাটক হইতে দেখা যায় যে, তাঁহার মহাভারতের সহিত পূর্ণ পরিচয় ছিল, তখন তো ইহা অনুমান করিতে কোনও বাধা নাই যে, উপরিপ্রদত্ত শ্লোকটি লিখিবার সময় গীতার শ্লোকটি তাঁহার মনের সম্মুখে নিশ্চয়ই আসিয়াছিল। অর্থাৎ ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, ভাসকবির পূর্ব্বেও মহাভারত ও গীতার

অস্তিত্ব ছিল। পণ্ডিত ড. গণপতিশাস্ত্রী স্থির করিয়াছেন যে, ভাস কবির কাল শকপূর্ব্ব দুই-তিনশত বৎসর হইবে। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহার কাল শকাব্দের দুই একশো বৎসর পরে হইবে। এই দ্বিতীয় মতকে ঠিক মনে করিলেও উপরি-উক্ত প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয় যে, ভাসের অন্যূন একশো দুশো বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ শককালের আরম্ভে মহাভারত ও গীতা এই দুই গ্রন্থ সর্ব্বমান্য হইয়াছিল।

(৬) কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থকারের গীতার শ্লোক গ্রহণ করিবার আরও বলবত্তর প্রমাণ ৺ত্র্যম্বক গুরুনাথ কালে, গুরুকুলের 'বৈদিক ম্যাগাজিন' নামক ইংরেজী মাসিক পুস্তকে (পুস্তক ৭, সংখ্যা ৬। ৭ পৃ. ৫২৮-৫৩২, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, সংবৎ ১৯৭০) প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের এইরূপ ধারণা ছিল যে, সংস্কৃত কাব্য কিংবা পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন কোন গ্রন্থে (উদাহরণ যথা সূত্রগ্রন্থেও) গীতার উল্লেখ পাওয়া যায় না; এবং সেইজন্য বলিতে হয় যে, সূত্রকালের পর, অর্থাৎ বড় জোর খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে গীতা রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু ৺কালে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ধারণা ভ্রান্ত। বোধায়ন গৃহ্যশেষসূত্রে (২. ২২. ৯) গীতার (৯. ২৬) শ্লোক "তদাহ ভগবান্" বলিয়া স্পষ্ট গৃহীত হইয়াছে, যথা—
দেশাভাবে দ্রব্যাভাবে সাধারণে কুর্য্যান্মনসা বার্চয়েদিতি। তদাহ ভগবান্—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ইতি

এবং পরে উক্ত হইয়াছে যে, ভক্তিনম্র হইয়া এই মন্ত্র বলিবে—"ভক্তিনম্রঃ এতান্ মন্ত্রানধীয়ীত"। এই গৃহ্যশেষসূত্রেরই তৃতীয় প্রশ্নের শেষে "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়, ইহাও উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় যে, বোধায়নের পূর্ব্বে গীতা প্রচলিত ছিল এবং বাসুদেব-পূজাও সর্ব্বমান্য হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বোধায়নের পিতৃমেধসূত্রের তৃতীয় প্রশ্নের আরম্ভেই এই বাক্য আছে:—
জাতস্য বৈ মনুষ্যস্য ধ্রুবং মরণমিতি বিজানীয়াত্তস্মাজ্জাতে
ন প্রহৃষ্যেৎ মৃতে চ ন বিষীদেত।

ইহা হইতে সহজেই দেখা যায় যে, ইহাই গীতার "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি" এই শ্লোক হইতে মনে উদয় হইয়া থাকিবে; এবং উহার সহিত উপরিপ্রদত্ত "পত্রং পুষ্পং" এই শ্লোক যোগ দিলে তো কোন সংশয়ই থাকে না। উপরে বলিয়াছি যে, স্বয়ং মহাভারতের এক শ্লোক বোধায়নসূত্রে পাওয়া যায়। বুহ্লর সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, * বোধায়নের কাল আপস্তম্ব ঋষির দুই-একশত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে এবং আপস্তম্বের কাল খৃষ্টপূর্ব্ব তিন শত বৎসরের কম হইতে পারে না। কিন্তু আমার মতে উহাকে আর একটু এদিকে পিছাইয়া দেওয়া উচিত; কারণ, মহাভারতে মেষবৃষভাদি রাশি নাই এবং কালমাধবে তো বোধায়নের "মীনমেষয়োর্মেষবৃষভয়োর্বা বসন্তঃ" এই বচন প্রদত্ত হইয়াছে— এই বচনই ৺শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রেও (পৃ. ১০২) গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা হইতে এইরূপ নিশ্চিত অনুমান হয় যে, মহাভারত বোধায়নেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। শকপূর্ব্ব নিদেন চারি শত বৎসর বোধায়নের সময় হওয়া উচিত এবং শকপূর্ব্ব পাঁচ শত অব্দে মহাভারত ও গীতার অস্তিত্ব ছিল। ৺কালে বোধায়নের কালকে খৃষ্টপূর্ব্ব সাত আট শত অব্দ ধরিয়াছেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বুঝা যায় যে, রাশিসম্বন্ধীয় বোধায়নের বচন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

(৭) উপরি-উক্ত প্রমাণাদি হইতে যে কোন ব্যক্তিরই ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, শকপূর্ব্ব প্রায় পাঁচশত অব্দে বর্ত্তমান গীতার অস্তিত্ব ছিল; উহা বোধায়ন ও আশ্বলায়নের বিদিত ছিল, এবং তখন হইতে শঙ্করাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত উহার পরম্পরা অবিচ্ছিন্নরূপে দেখান যাইতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে গৃহীত। এক্ষণে সম্মুখে চলিয়া যে সকল প্রমাণ দেওয়া যাইবে সে গুলি বৈদিকেতর অর্থাৎ বৌদ্ধ সাহিত্যের। ইহার দ্বারা, গীতার উপরি-উক্ত প্রাচীনত্ব স্বতন্ত্রভাবে আরও অধিক বলবৎ ও নিঃসন্দিগ্ধ হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বেই ভাগবতধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছিল, এই সম্বন্ধে বুহ্লর ও প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত সেনার্টের মত পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে; বর্ত্তমান প্রকরণের পরবর্ত্তী ভাগে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বৃদ্ধি কিরূপে হইল, এবং হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি বিষয়ের বিচার, স্বতন্ত্ররূপে করা হইবে। এখানে কেবল গীতার কালসম্বন্ধেই যাহা উল্লেখ করা আবশ্যক তাহাই সংক্ষেপে করা হইবে। ভাগবতধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী, কেবল এইটুকু বলিলেই গীতাও বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না; কারণ, ভাগবতধর্ম্ম ও গীতাগ্রন্থের আবির্ভাব যে এক সঙ্গেই হইয়াছিল এইরূপ বলিবার কোন প্রমাণ নাই। অতএব দেখা আবশ্যক যে, বৌদ্ধগ্রন্থকার গীতাগ্রন্থের স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও করিয়াছেন কি না। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, চারি বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ইতিহাস, নিঘণ্টু, প্রভৃতি বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থ বুদ্ধের সময়ে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। তাই বৈদিক ধর্ম্ম বুদ্ধের পূর্ব্বেই যে পূর্ণতায় উপনীত হইয়াছিল এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার পর বুদ্ধ যে নূতন পন্থা চালাইয়াছেন, তাহা অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অনাত্মবাদী ছিল, উহাতে—যাহা পরবর্ত্তী ভাগে বলা যাইবে—আচরণদৃষ্টিতে উপনিষদের সন্ন্যাসমার্গেরই অনুকরণ করা হইয়াছিল। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের এই অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বনবাস ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ও পরোপকারের কাজ করিবার জন্য পূর্ব্বদিকে চীনদেশে এবং পশ্চিমদিকে আলেক্‌জান্দ্রিয়া ও গ্রীস্ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই যে, বনবাস ছাড়িয়া লোকসংগ্রহের কাজ করিবার জন্য বৌদ্ধ যতি কিরূপে প্রবৃত্ত হইলেন? বৌদ্ধধর্ম্মের গ্রন্থ দেখ। সুত্তনিপাতের

* See Sacred Books of the East Series, Vol 11. Intro p. xliii. and also the same series Vol XIV. Intro, p. xliii.

খগ্গবিসাণসুত্তে উক্ত হইয়াছে যে, যে ভিক্ষু পূর্ণ অর্হৎ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে সে কিছু না করিয়া গণ্ডারের মত বনে বাস করুক। এবং মহাবগ্গে (৫. ১. ২৭) বুদ্ধের শিষ্য সোনকোলীবিসের কথায় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে "যে ভিক্ষু নির্ব্বাণাবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহার না কিছুই করিবার থাকে, আর না তাহাকে কৃত কর্ম্মই ভোগ করিতে হয়—'কতস্স পটিচয়ো নত্থি করণীয়ং ন বিজ্জতি' ইহা শুদ্ধ সন্ন্যাসমার্গ; এবং আমাদিগের ঔপনিষদিক সন্ন্যাসমার্গের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাম্য আছে। "করণীয়ং ন বিজ্জতি" এই বাক্য "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" এই গীতাবাক্যের সহিত শুধু সমানার্থক নহে, কিন্তু শব্দশও একই। কিন্তু বৌদ্ধভিক্ষুর যখন এই মূল সন্ন্যাসমূলক আচার পরিবর্ত্তিত হইল এবং যখন উহারা পরোপকারের কাজে প্রবৃত্ত হইল তখন পুরাতন ও নূতন মতের মধ্যে বিবাদ বাধিল; পুরাতন লোকেরা আপনাদিগকে 'থেরবাদ' (বৃদ্ধপন্থা) বলিতে লাগিল, এবং নূতন মতের লোকেরা আপনাদিগের পন্থার 'মহাযান' এই নাম দিয়া পুরাতন পন্থাকে 'হীনযান' (অর্থাৎ হীন পন্থা) বলিতে লাগিল। অশ্বঘোষ মহাযান পন্থাবলম্বী ছিলেন; এবং বৌদ্ধ যতিরা পরোপকারের কাজ করিবে এই মত তাঁহার গ্রাহ্য ছিল। তাই, সৌন্দরানন্দ (১৮. ৪৪) কাব্যের শেষে নন্দ অর্হৎ অবস্থায় পৌঁছিলে পর, তাঁহাকে বুদ্ধ যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার প্রথমে উক্ত হইয়াছে—

অবাপ্তকার্য্যোঽসি পরাং গতিং গতঃ
ন তেঽস্তি কিঞ্চিৎ করণীয়মণ্বপি।

অর্থাৎ "তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে; উত্তম গতি তুমি লাভ করিয়াছ, এখন তোমার (নিজের) তিলমাত্র কর্ত্তব্যও অবশিষ্ট নাই"; এবং পরে এইরূপ স্পষ্ট উপদেশ করিয়াছেন যে,—

বিহায় তস্মাদিহ কার্য্যমাত্মনঃ কুরু
স্থিরাত্মন্ পরকার্য্যমপ্যথো॥

"অতএব এখন তুমি আপন কার্য্য ছাড়িয়া স্থিরবুদ্ধি হইয়া পরকার্য্য করিতে থাক" (সৌ. ১৮. ৫৭)। বুদ্ধের কর্ম্মত্যাগমূলক উপদেশ—যাহা প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে পাওয়া যায়—এবং সৌন্দরানন্দ-কাব্যে অশ্বঘোষ বুদ্ধের মুখ দিয়া যাহা বাহির করাইয়াছেন সেই উপদেশ, এই দুইয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভিন্নতা আছে। আবার অশ্বঘোষের এই উক্তিসমূহে এবং গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে যে যুক্তিপ্রয়োগ আছে, উহাতে 'তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে' 'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর' (গী. ৩. ১৭, ১৯) অর্থাৎ তাহার কিছুই বাকী নাই, তাই যে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে, তাহাই সে নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিবে—কেবল অর্থদৃষ্টিতে নহে, শব্দশও সাম্য আছে। অতএব ইহা হইতে অনুমান হয় যে, অশ্বঘোষ এই যুক্তি গীতা হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কারণ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অশ্বঘোষের পূর্ব্বেও মহাভারত ছিল। কিন্তু ইহা কেবল অনুমানমাত্র নহে। বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তারানাথ বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে তিব্বতী ভাষায় যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধদিগের পূর্ব্বকালীন সন্ন্যাসমার্গে মহাযান পন্থা যে কর্ম্মযোগমূলক সংস্কার করিয়াছিল উহা 'জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ ও গণেশ' হইতে মহাযান-পন্থার প্রধান প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুনের গুরু রাহুলভদ্র জানিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ রুসী ভাষার মধ্য দিয়া জর্ম্মন ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে, ইংরাজীতে হয় নাই। ডাঃ কের্ণ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যে পুস্তক লেখেন তাহাতে যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই উদ্ধৃতাংশ হইতে আমি ইহা গ্রহণ করিয়াছি *। এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণের নামে ভগবদ্গীতারই উল্লেখ করা হইয়াছে, এইরূপ ডাঃ কের্ণেরও মত। মহাযানপন্থার বৌদ্ধগ্রন্থের মধ্যে 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক' নামক গ্রন্থেও ভগবদ্গীতার শ্লোকের মত কতকগুলি শ্লোক আছে। কিন্তু এই সমস্ত এবং অন্য সমস্ত বিষয়ের বিচার পরবর্ত্তী ভাগে করা যাইবে। এখানে কেবল বলিতে হইবে যে, বৌদ্ধগ্রন্থকারদিগেরই মতে মূল বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সন্ন্যাসপ্রধান হইলেও উহাতে ভক্তিপ্রধান ও কর্ম্ম-প্রধান মহাযানপন্থার উৎপত্তি ভগবদ্গীতারই কারণে হইয়াছে; এবং অশ্বঘোষের কাব্য ও গীতার মধ্যে যে সাম্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা হইতেও এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়। মহাযানপন্থার প্রথম প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন শকপূর্ব্ব প্রায় একশো দেড়শো অব্দে আবির্ভূত হইয়া-থাকিবেন, এইরূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন; এবং এই পন্থার বীজারোপণ অশোকের আমলে অবশ্য হইয়াছিল, ইহা তো স্পষ্টই দেখা যায়। গ্রন্থ হইতে এবং স্বয়ং বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণের লিখিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস হইতে, স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধ হয় যে, মহাযান-বৌদ্ধ-পন্থা বাহির হইবার পূর্ব্বে—অশোকেরও পূর্ব্বে—অর্থাৎ প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব নিদান ৩০০ বৎসর পূর্ব্বেই ভগবদ্গীতার অস্তিত্ব ছিল।

এই সকল প্রমাণের উপর বিচার করিলে, শালিবাহন শকের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ভগবদ্গীতার অস্তিত্ব ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। ডাঃ ভাণ্ডারকর, ৺ তৈলঙ্গ, রাও বাহাদুর চিন্তামণি রাও বৈদ্য এবং ৺ দীক্ষিত ইঁহাদের মতও অনেকটা এইরূপই এবং উহাই এই প্রকরণে গ্রাহ্য বলিয়া মানিতে হইবে। প্রোঃ গার্ব্বের মত অন্যরূপ। তাঁহার মতের প্রমাণস্বরূপে তিনি গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সম্প্রদায়পরম্পরার শ্লোকের মধ্যে, 'যোগো নষ্টঃ;' যোগ নষ্ট হইল—এই বাক্য ধরিয়া যোগ শব্দের অর্থ 'পাতঞ্জল যোগ' করিয়াছেন। কিন্তু আমি প্রমাণ-সহ দেখাইয়াছি যে, যোগ শব্দের অর্থ সেখানে 'পাতঞ্জল যোগ' নহে, 'কর্ম্মযোগ'। অতএব প্রোঃ গার্ব্বের মত ভ্রান্তিমূলক ও অগ্রাহ্য। বর্ত্তমান গীতার কাল শালিবাহন শকের পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের অপেক্ষা আর কম স্বীকার করা যায় না, ইহা নির্ব্বিবাদ। পূর্ব্বভাগে ইহা বলিয়াই আসিয়াছি যে, মূলগীতা ইহা অপেক্ষাও আরও কয়েক শতাব্দী প্রাচীন হইবে।

বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ।

(কবিরাজ শ্রীমথুরামোহন মজুমদার, কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি)

এই পত্রিকায় "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" হইতে সমুদ্ধৃত বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলাম।

---

* See Dr. Kern's *Manual of India Buddhism*, Grundriss III. 8. p. 122. মহাযান পন্থার 'অমিতায়ুসুত্ত' নামক মুখ্য গ্রন্থ চিনীয় ভাষায় আনুমানিক ১৪৮ সনে ভাষান্তরিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ দেখিয়া জানা গেল, বৃহৎসংহিতা হইতে লেখক উক্ত প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়াছেন। সংস্কৃতের রত্নভাণ্ডারে কোন্ বিষয়ে প্রাচীনকালে সম্যক্ আলোচনা হয় নাই তাহা নির্দ্ধারণ করা বাস্তবিকই অতি সুকঠিন ব্যাপার। আমাদের দেশের বহু-লোকেই এদেশে কিছুই ছিল না, সকল প্রকার লোকহিতকর উন্নতির ব্যাপারই ইদানীন্তন কালে সংঘটিত হইয়াছে, ধ্রুবজ্ঞান করিয়া প্রাচীন কাল বা সংস্কৃতশাস্ত্রকে নিতান্তই অবহেলার চক্ষুতে দেখিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঐ প্রকার মতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যাঁহাদিগকে সকল বিষয়েই আদর্শ বলিয়া আপন মনে অভিমান প্রকাশ পূর্ব্বক গর্ব্বিত হইয়া থাকেন, সেই পাশ্চাত্য সুধীবৃন্দের অনেক মহাত্মাই প্রাচীন সংস্কৃতভাণ্ডারের নিগূঢ় তত্ত্ব সংগ্রহ পূর্ব্বক সংস্কৃত যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনায় রিক্তভাণ্ডার ছিল না তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া দেখাইতে বিরত হন নাই।

উপরে 'বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ' নাম প্রদান করিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করা গিয়াছে। শার্ঙ্গধর পণ্ডিত স্বনামে 'শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি' বলিয়া যে একখানি সুবৃহৎ সংস্কৃত শ্লোকসংগ্রহ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন তাহারই অন্যতম পরিচ্ছেদ এই 'বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ'। বম্বে এল্-ফিন্‌ষ্টোন কলেজের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ প্রফেসর পিটার পিটারসন্ এম-এ, মহোদয় এই গ্রন্থরত্ন-খানি বহু আয়াসে সম্পাদিত করিয়া এই দেশবাসী-গণের নিতান্তই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। সম্পাদক ছয়খানি হস্তলিখিত পুথি অবলম্বন পূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং গ্রন্থখানি মহা-মান্য বুঁদী রাজ্যের অধিপতির উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন। শার্ঙ্গধর বুঁদী রাজ্যেশ্বর চৌহান-কুলাবতংস মহারাজ হামীরের মন্ত্রী রাঘবের পৌত্র ছিলেন। রাঘবের তিন পুত্র,—গোপাল, দামোদর ও দেবদাস। শার্ঙ্গধর ঐ দামোদরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন, তাঁহার অন্য দুই সহোদরের নাম লক্ষ্মীপতি ও কৃষ্ণ।

শার্ঙ্গধরপ্রণীত পদ্ধতিগ্রন্থে মোট পরিচ্ছেদ সংখ্যা ১৬৩ ও শ্লোক সংখ্যা ৬৩০০;—গ্রন্থ মধ্যে ঐরূপ সমুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায় 'বিদেহ-মুক্তি'র পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ১৬৩ এবং গ্রন্থপরিসমাপ্তিতেও মোট ৪৬২০ শ্লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদুপরে অতি-রিক্ত 'খড়গ-পরীক্ষা' নামক পরিচ্ছেদ ধরিয়া গ্রন্থের মোট শ্লোক সংখ্যা হয় ৪৬৮৯।

এই গ্রন্থ নানাবিষয়ক শ্লোকসমূহে পরিপূর্ণ। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের বংশপরিচয়, বিষয়সংগ্রহ, নানা দেবতার স্তুতি, সাধারণ নীতি, রাজনীতি, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ, শাকুনশাস্ত্র, শৃঙ্গার ও অন্যান্য রসবিষয়ক এবং যোগসম্বন্ধীয় শ্লোক আছে; বাহুল্যভয়ে এস্থলে অতিসংক্ষেপে গ্রন্থোক্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলির উল্লেখ করা গেল। গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে নিজের এবং অন্যান্য কবিদিগের শ্লোক যাহা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন তাহারও বিনির্দ্দেশ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। যদ্যপি শার্ঙ্গধর কর্ত্তৃক সমুল্লেখিত কবিবৃন্দের নাম-গুলি উল্লেখ করা যায় তাহা হইলে প্রবন্ধ অতি বৃহৎ আকার ধারণ করে, কাজেই এস্থলে তাহা পরিত্যাগ করা গেল। বৃক্ষসম্বন্ধে গ্রন্থে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাও এস্থলে অতি সংক্ষেপে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

শার্ঙ্গধরের পদ্ধতিগ্রন্থে বৃক্ষসম্বন্ধীয় এই পরিচ্ছেদে মোট ২৩৭টি শ্লোক আছে। গ্রন্থকার বলিতেছেন;—

অনেক বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে তিনি এই পরিচ্ছেদোক্ত শ্লোকগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে গ্রন্থকার এস্থলে আর বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রসমূহের নামগুলি প্রদান করিয়া যান নাই। যাহাহউক, তাঁহার এই বৃক্ষা-য়ুর্ব্বেদ প্রবন্ধে ১ উপবনবিনোদ ৩; ২ তরুমহিমা ২০; ৩ নিবাসীসন্ন তরু শুভাশুভ লক্ষণ ১০; ৪ ভূমিনিরূপণ ৯; ৫ পাদপ পরীক্ষা ৭; ৬ বীজোপ্ত-বিধি ৭; ৭ রোপণবিধান ১৪; ৮ নিষেচনবিধি ৬; ৯ ক্রমরক্ষা ৬; ১০ উপবনপ্রক্রিয়া ১২; ১১ কূপার্থ ভূমি-পরীক্ষা ৫৩; ১২ পোষণবিধি ২৪; ১৩ কূপজল ৪; ১৪ তরুচিকিৎসা ২০; ১৫ বিচিত্র করণ ২৭; এবং ১৬ অন্নাদিনিষ্পত্তি ৬; এই ষোলটি প্রকরণ আছে। প্রকরণের নাম হইতেই প্রকরণোক্ত বিষয়গুলি সুপ্রতীত হইবে। এস্থলে অতি সংক্ষেপে কিছু কিছু উল্লেখ করা

গেল। প্রথম সংখ্যা বিষয়সূচক ও পরবর্ত্তী সংখ্যা তাহার শ্লোকনির্দ্দেশক।

সুখার্থী ভূপতির উপবনের অভাবে ধন, জন, যৌবন বা রমণীবিলাস সকল বৃথা হইয়া থাকে। (২)

মনুষ্যের ধর্ম্ম ও অর্থবিহীন জীবনে অনেক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেও তাহা নিষ্ফল হইয়া পড়ে, কিন্তু একটি ছায়াপাদপ রোপণ করিলে, যাহার আশ্রয়ে মানব, পশু ও বিহঙ্গমগণ বিশ্রাম লাভ করিতে পারে,—তাহা হইতেই তাহার জন্মগ্রহণ সার্থক হইতে পারে। (৪)

নৃপতি বা সম্পত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বাসভবনের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্বভাগে শুভশংসী বৃক্ষ রোপণ করিয়া উপবন প্রস্তুত করেন। (৩২)

যে ভূমি বিষদুষ্ট, যাহাতে পাষাণবাহুল্য, যেখানে উইয়ের প্রাদুর্ভাব, যাহা মরুপ্রায় এবং যাহার সন্নিকটে জল নাই, সেরূপ ভূমি বৃক্ষের হিতকর নহে। (৩৬)

বনস্পতি, দ্রুম, লতা ও গুল্ম,—বৃক্ষ এই চারি জাতিতে বিভক্ত এবং বীজ, কাণ্ড ও কন্দ ভেদে বৃক্ষের উৎপত্তি তিন প্রকারে হইয়া থাকে। (এস্থলে কাণ্ড কি কলমের সূচনা করেনা ?) (৪৩)

সমতল ভূমিপ্রদেশ অগ্রে কর্ষণ করিয়া, তাহাতে মাষ বা তিল বপন করিতে হইবে ; তৎপরে অভিমত অনুসারে সেইস্থানে বৃক্ষরোপণ করিবে। (৫০)

একহাত পরিমিত ক্ষুদ্র বৃক্ষ জলসিক্ত করিয়া এবং তাহাতে ঘৃত, মধু, বেণার মূল ও বিড়ঙ্গসংমিশ্র পিণ্ড সম্ভবপর মাখিয়া লইয়া, গর্ত্তে ঘুটের চূর্ণ নিক্ষেপ করতঃ রোপণ করিতে হইবে। (৫৯)

বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহাতে প্রত্যহ সায়ং ও প্রাতঃকালে জলের অভিষেক প্রদান করিবে। যাহাতে অতিরিক্ত শীত বা বাতাসে বৃক্ষশিশুর স্বাস্থ্যহানি না ঘটে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। (৭১)

নীহার, প্রচণ্ড বায়ু, ধূম ও অগ্নি বৃক্ষের প্রবল শত্রু ; অতএব ঐ সকল উপদ্রব হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। (৭৭)

উপবনের মধ্যে সুমিষ্ট জলপূর্ণ কূপ খনন করিবে। যাহাতে উপবনমধ্যবর্ত্তী সকল বৃক্ষই সেই জলের আস্বাদ পাইতে পারে তাহার সদুপায় বিধান জন্য পাষাণবদ্ধ পরিখা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। (৯১)

কূপের জল যদি কটু, লবণ, বা বিরস আস্বাদ অথবা ঘোলা হয়, তাহা হইলে উহা নিবারণের জন্য সেই জলে রসাঞ্জন, মুতা, বেনারমূল, নাগকেশর ঝিঞ্জা ও কেতকফল চূর্ণ করিয়া দিবে ; তাহা হইলে জল বিশুদ্ধ হইবে। (৯০।৯৩)

যে স্থানে কাশ বা কুশ জন্মিয়াছে, যে স্থানের মৃত্তিকা নীল বা কৃষ্ণবর্ণ, যাহাতে কাঁকর আছে অথবা যাহার তিক্ত আস্বাদ, সেইস্থানে কূপ খনন করিলে, তাহার জল সুরস হইবে। (১৪৫)

বৃক্ষরোপণ করিলেই হইবে না, তাহার পোষণের সদুপায়ও করা কর্ত্তব্য। যষ্টিমধু, মৌয়াফুল, কুড়, চিনি ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া, সেই গুটিকা বৃক্ষের মূলদেশে প্রদান করিতে হইবে। (১৬৯)

বৃক্ষ দুগ্ধের দ্বারা পরিষেক করিলে, তাহাতে সুমিষ্ট ফল জন্মিয়া থাকে। (১৭০)

হরিণ, কিটিম (কীট বিশেষ), মৎস্য, মেষ, ছাগ বা গণ্ডারের (ইহাদের মধ্যে অন্যতমের, যথালাভ মাংস, মেদ, বসা ও মজ্জা লইয়া জলদ্বারা অগ্নিতে পাক করিবে। পাক সম্পন্ন হইলে তাহাতে দুগ্ধ প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর তিলের খইল, সুস্বিন্ন কুট্টিত মাষকলাই, মধু ও ঘৃত তাহাতে প্রদান করিতে হইবে। পুনর্ব্বার উহাতে উষ্ণজল মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। এই সকল দ্রব্যের কোন নির্দ্দিষ্ট মাত্রা নাই, আন্দাজ করিয়া বুঝিয়া যথালাভ প্রদান করিতে হইবে। এই ঔষধ কোন উষ্ণ প্রদেশে (যেখানে যাহাতে কোনমতে ঠাণ্ডা না লাগে) সুরক্ষিত ভাণ্ডে পনের দিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে হইবে। ইহার নাম 'কুণপ' ইহা বৃক্ষের পক্ষে অত্যন্ত পুষ্টিকারক মহৌষধ। (১৭১-১৭৩)

যেরূপ বাত, পিত্ত ও কফ হইতে মানুষের রোগ জন্মে, সেইরূপ বৃক্ষেরও ঐ সকল দোষ হইতে নানারূপ ব্যাধি জন্মিয়া থাকে, অতএব

সেই সকল দোষের শাস্তি বিধান করিতে হইবে। (১৭৫)

বিষয়ভেদে বৃক্ষের চিকিৎসাও পৃথক্ পৃথক্। যেমন কীটদষ্ট বৃক্ষের এক রকম, অগ্নিদগ্ধে অন্য প্রকার, ক্ষতভগ্নে বিভিন্ন চিকিৎসা, বৃক্ষ বজ্রাহত হইলে অন্যবিধ এবং তরুর অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ফেলিলে তাহারও বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। (১৭৬)

গাছে পোকা লাগিলে করঞ্জ, সোদাল, নিম, ছাতান ছাল, মুতা ও বিড়ঙ্গ গোমূত্রের দ্বারা একত্র বাটিয়া লইয়া তাহার প্রলেপ লাগাইতে হইবে। (১৮৪)

বৃক্ষ যদি অগ্নিদগ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার মূল পূর্ব্বোক্ত কুণপ-জলের দ্বারা সিক্ত করিতে হইবে এবং পদ্মের কন্দ বাঁটিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ প্রদান করিতে হইবে। (১৮৫)

বৃক্ষের অঙ্গচ্ছেদ করিলে ঘৃত, মধু, বিড়ঙ্গ ও তিলের প্রলেপ দিয়া, সেই কর্ত্তিত স্থান মাটি দিয়া পূর্ণ করিয়া দিবে এবং দুগ্ধদ্বারা বৃক্ষকে সেচন করিতে হইবে। (১৯২)

প্রিয়ঙ্গু, কর্কারি (কুষ্মাণ্ডভেদ), বৈকল ও অর্জ্জুন ছাল পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধদ্বারা সিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলে, বৃক্ষের স্রাবনির্গম নিবারিত হইয়া থাকে। (১৯৪)

ভুঁইকুমড়ার চূর্ণ ইক্ষুরস দ্বারা পাক করিয়া লইয়া তাহার অথবা কেবল ইক্ষুরসের সেক রীতি-মত প্রদান করিলে, অসময়ে গাছে ফুল ফুটিয়া থাকে। (২০০)

যষ্টিমধু, কুড়, মোয়াফুল, মধু ও ঘৃতের দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিয়া, উহা দ্বারা বৃক্ষের মূল আচ্ছাদিত করিয়া দিলে, উহার ফলে আঁটি জন্মিবে না। (২৭২)

বনস্পতির ফল ও কুসুমের বৃদ্ধি দেখিয়া দ্রব্যের ও শস্য উৎপত্তির শুভত্ব বিজ্ঞাত হওয়া যায়, যেমন বটে যব, গাবে যেটেধান এবং অশ্বত্থে সকল প্রকার শস্যের সমুৎপত্তি সূচনা করিয়া থাকে। (২৩২-৩৩)

প্রবন্ধের আকারবাহুল্যের আশঙ্কায় এস্থলে অতি সংক্ষেপে বিষয়গুলি নিবদ্ধ করিয়া, উপস্থিত প্রবন্ধের উপসংহার করা গেল। বারান্তরে বিভিন্ন পুস্তক হইতে ও বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রদর্শনের ইচ্ছা রহিল। *

ঢাকা-কাহিনী।

(শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

১। ঢাকার সাত গুম্বজ মসজিদ।

ঢাকা সহর হইতে ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে জাফরাবাজার বাঁশবাড়ী নামক স্থানে অতি সুন্দর একটী মস্‌জিদ দেখিতে পাওয়া যায়। নবাব সায়েস্তা খাঁ ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই মস্‌জিদের দক্ষিণপ্রান্ত দিয়া বুড়ীগঙ্গা প্রবাহিত হইত, বর্ত্তমানে উহা এক মাইল দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে; মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিশাল প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। সৌন্দর্য্য ও মনোহারিতায় এই মস্‌জিদ লালবাগের পরিবিবির সমাধির প্রায় সমকক্ষ। এই মস্‌জিদের সন্নিকটে দুইটী অতি প্রাচীন দরগা আছে; উহা সায়েস্তা খাঁর কন্যা বেগম বিবি ও গুলজার বিবির সমাধি। যেস্থানে একদিন সহস্র সহস্র ভক্ত মুসলমান মিলিত হইতেন, যে পুণ্যমন্দিরের মুক্ত প্রাঙ্গণে বসিয়া মুসলমান বালকেরা সমস্বরে পুণ্যগ্রন্থ কোরাণ পাঠ করিত, মহিমোজ্জ্বল নমাজে যে স্থান প্রতিনিয়ত মুখরিত হইত, সেই মস্‌জিদ আজ নীরব ও নির্জ্জন। মস্‌জিদের গাত্রস্থ ইষ্টকাভ্যন্তর হইতে গুল্মলতা ও অশ্বত্থবৃক্ষ বহির্গত হইয়া চিরজয়ী কালের বিজয়-গৌরব ঘোষণা করিতেছে। ঢাকার বিখ্যাত দানবীর স্যর্ আবদুল গণি এই মস্‌জিদটীর সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি একজন মোল্লাকে বারশালী জমি নিষ্কর দান করিয়া এই মস্‌জিদের দেবকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

সাতটী গুম্বজ আছে বলিয়া এই মস্‌জিদের নাম সাতগুম্বজ মস্‌জিদ। মধ্যভাগে বড় বড় তিনটী ও চারিকোণে ছোট ছোট চারিটী গুম্বজ আছে। ইহার প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগে এক-খানি প্রস্তরফলক গ্রথিত ছিল, এখন আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মস্‌জিদের ভিতর-কার পরিমাণ ৪৮´×১৬´ ফিট। ভিতরে চারিটী অষ্টকোণসমন্বিত দ্বিতল প্রকোষ্ঠ আছে। এই

* ৫ই কার্ত্তিক (১৩২৮) সন্মিলনী হইতে উদ্ধৃত।

চারিটী প্রকোষ্ঠের শীর্ষদেশে চারিটী গুম্বজ পরিশোভিত।*

মস্‌জিদের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্ন মস্‌জিদ, সমাধি এবং দুইটী তালগাছ উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই স্থানের সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি করিতেছে। ইহার গাত্রস্থ ইষ্টকরাশি সুগঠিত ও খোদিত; আজিও ইষ্টকের কারুকার্য্যাদি দেখিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়।

২। পীর শাহ আলী সাহেবের দরগা।

ঢাকা সহরের ৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে বংশাই নদীর ধারে মীরপুর গ্রাম। এখানে বিশিল নামক পল্লীতে পীর শাহ আলীর দরগা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই প্রাচীনকালে এই স্থানটী নানাবিধ ফলবান্ বৃক্ষরাজি দ্বারা সুশোভিত ছিল। এই পুণ্য স্থানের নৈসর্গিক শোভায় বিমুগ্ধ হইয়া পীর সাহেব এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। আজিও এই দরগার চারিদিকের দৃশ্য অনুপম। এই দরগাটী সমচতুষ্কোণ। ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় ২৪ হাত। প্রাচীরের ঘনত্ব প্রায় চারি হাত। মধ্যস্থলে পীর সাহেবের সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীর গাত্র হইতে উর্দ্ধে একটীমাত্র গুম্বজ উঠিয়াছে, চারি কোণে চারিটি মিনারেট আছে। প্রবেশ দ্বারে দুইখানি প্রস্তরফলক; একখানি টুঘরা আরবী অক্ষরে ও অপরখানি পারশী অক্ষরে উৎকীর্ণ। এই প্রস্তরলিপি দু'খানির কালির ছাপ লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে যে কি আছে তাহা আজিও জানা যায় নাই।

পীর সাহেবের অলৌকিক গুণাবলী সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে পীরসাহেব বোগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মাতাপিতার ধর্ম্মভাব দর্শনে ও মহাকবি হাফেজের গ্রন্থ অধ্যয়নে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। ক্রমশঃ বৈরাগ্য প্রবলভাবে ধারণ করিলে পীরসাহেব সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া চারিজন শিষ্যসহ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তখন ভারতবর্ষ মোগল সম্রাটের শাসনে ছিল। পীর সাহেব ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া অবশেষে ঢাকা নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হন। কিছুকাল সহরে বাস করিয়া একদিন তিনি বেড়াইতে বেড়াইতে মীরপুরে গিয়া উপস্থিত হন এবং এই নির্জ্জন পল্লী সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করিয়া এখানে একটী ক্ষুদ্র মস্‌জিদে বাস করিতে থাকেন।

মীরপুরে বড় একটী সিম্নিগাছের নীচে পীর সাহেব আসন করিয়া যোগে নিমগ্ন থাকিতেন। এই পুণ্যবৃক্ষটী আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার যোগবল-দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইত। তাঁহার মুখশ্রীতে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ সতত প্রতিভাত হইত। ইনি হিন্দু ও মুসলমান সকলকেই সমানভাবে দেখিতেন এবং সকলকেই আদর করিয়া সদুপদেশ প্রদান করিতেন।

কথিত আছে, পীরসাহেব সমাধিস্থ হইবার জন্য তাঁহার শিষ্যগণকে আদেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমরা দেড় বৎসর আমার ধ্যান ভঙ্গ করিও না।' এই আদেশ দিয়া তিনি মস্‌জিদের দরজা বন্ধ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি কিছুই আহার করিতেন না। দেড় বৎসর শেষ হইতে মাত্র একটি দিন অবশিষ্ট আছে এমন সময়ে শিষ্যেরা গৃহের ভিতরে অগ্নির উপর ফুটন্ত তরল দ্রব্যের 'টগবগ' শব্দ শুনিয়া—অত্যন্ত কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহারা বলপ্রয়োগে গৃহের দরজা ভাঙ্গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ফুটন্ত রক্ত স্রোত ব্যতীত ধ্যানমগ্ন পীরসাহেবের আর কোন চিহ্নই নাই। সেই সময়ে দৈববাণী হইল 'তোমরা আমার এই শেষ চিহ্ন রক্ত এস্থানে গোর দাও।' বিস্ময়বিমুগ্ধ ভক্তমণ্ডলী গুরুর আদেশ মত কাজ করিলেন। হিন্দু ও মুসলমান সমবেত হইয়া মহাসমারোহে পীর সাহেবের সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

* "The Mosjid is an oblong hall 48′× 16′ feet inside measurement with 4 hollow octagonal towers of 8′ inside and 12′ outside measurement. These are in two stories and are surmounted each by a dome. The main hall is also roofed over by three domes in the usual masque fashion, and those domes with the four others on the corner towers make in all seven in number, which give rise to the name of the Sât Gomboj Masjid, or the mosque of 7 domes." List of Ancient Monuments in Bengal Page 204.

উত্তরকালে পীর সাহেবের সমাধির উপর একটী মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে, পীর সাহেবের তিরোভাবের কয়েক বৎসর পরে মীরপুরের একটী মুসলমান ব্যবসায়ী পীর সাহেবের মানত করিয়া ব্যবসায়ে বহু অর্থলাভ করিয়াছিলেন। তিনি পীরসাহেবের প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই মসজিদটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই পবিত্র তীর্থস্থানে প্রতিবৎসর নানাস্থান হইতে অসংখ্য লোক উপস্থিত হয়। ঢাকার ভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় নবাব বাহাদুর স্যর্ আবদুল গণি সাহেব এই গোরস্থানের প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সংস্কার করিয়াছেন; আগন্তুক ফকীর ও মুসলমান মহিলাদের জন্য প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। দরগার চারিদিকে সুন্দর একখানি বাগান রচনা ও ক্ষুদ্র একটী জলাশয় খনন এবং রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া নবাব সাহেব স্থানটীকে সুশোভন এবং পীর সাহেবের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই পুণ্যস্থানের স্মৃতি মুসলমান সমাজের নিকট বড় পবিত্র। কেবল মুসলমান সমাজই নহে, হিন্দুরাও পীর সাহেবের প্রতি যথোচিত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

৩। পঞ্চসারের শিববাটী ও গজারি বৃক্ষ।

বিক্রমপুরের মহকুমা মুন্সীগঞ্জের দেড় মাইল পশ্চিমে পঞ্চসার গ্রাম। এই গ্রামের দিঘী, রাজপথ ও উচ্চক্ষেত্রগুলি দেখিলে মনে হয় যে, এই গ্রাম পর্য্যন্ত পাল ও সেনবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী রামপাল বিস্তৃত ছিল। এই গ্রামের নাম 'পঞ্চসার' হইবার প্রকৃত কারণ বর্ত্তমানে আবিষ্কার করা অসম্ভব। কাহারও মতে কান্যকুব্জ হইতে আনীত সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ রামপালসংলগ্ন পঞ্চসার গ্রামে অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম পঞ্চসার হইয়াছে। আদিশূরের রাজধানী রামপাল কি গৌড়ে ছিল, ইহা লইয়া একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থায় পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনপ্রসঙ্গও নানা সন্দেহে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চসার দেবভোগ, চাঁপাতলী, বিনোদপুর, রতনপুর প্রভৃতি কতকগুলি খণ্ডগ্রামে বিভক্ত।

রামপালের রাজবাটীর বাহিরে ও বিখ্যাত দিঘীর উত্তর তীরে বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গজারি বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গজারি বা শালবৃক্ষ ভাওয়াল ব্যতীত অন্য কোথায়ও দৃষ্ট হয় না, জনসাধারণের ইহাই বিশ্বাস; কিন্তু পঞ্চসার গ্রামে বিশাই দিঘীর পশ্চিম পারেও একটি অতি প্রাচীন শাল বৃক্ষ আছে। কথিত আছে যে, সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের যজ্ঞস্থানে এই গাছটী রোপণ করিয়াছিলেন। আজিও পল্লী-রমণীরা বিবাহাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়া উপলক্ষে এখানে আগমন করিয়া উক্ত বৃক্ষের পূজা করেন। বৃক্ষটীর পূর্ব্বাবস্থা আর নাই, ইহার চারিদিকে নানাজাতীয় কণ্টকবৃক্ষ ও লতা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

বঙ্গদেশে বারভূঁইয়ার সময় হইতে পঞ্চসার দেবভোগ খিদিরপুর পরগণার সামিল এবং রায় চৌধুরীবংশ ইহার জমীদার ছিলেন। এক সময়ে ইঁহাদের প্রতাপ যথেষ্ট ছিল। বর্ত্তমানে ইঁহাদের পূর্ব্বাবস্থা নাই বলিলেও চলে। গৌরবের দিনে এই রায় বংশের কোন ব্যক্তি একটী শিববাটী নির্ম্মাণ করেন। সেই সময়ে শিবের দৈনিক পূজার জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কালের মহিমায় সেই শিববাটী এক্ষণে জঙ্গলে পরিণত; নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে শিববাটী আজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

৪। ঢাকা নবাবপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র।

ষোড়শ শতাব্দীতে ফরিদপুরের অন্তর্গত পোড়াগাছা বা কেদারপুরের বিখ্যাত ভুঞা চাঁদ রায় কেদার রায় রাজত্ব করিতেন। শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম শিলা ইহাঁদেরই কুলদেবতা। একাদশ শতাব্দীতে এই চক্রশিলা চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা স্থাপন করেন। সেই অবধি এই বিগ্রহ উক্ত পরিবারে বিশেষ জাকজমকের সহিত প্রত্যহ সেবা পাইতেন। কিন্তু চাঁদরায় কেদার রায় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলে বিগ্রহের সেবার দিকে বড় একটা যত্ন করিতেন না। জনশ্রুতি এই যে, ভুঞাদের সেবার অপরাধে, অবিচারে ও লোকের প্রতি অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে এবং বিখ্যাত কৌল সাধক ব্রহ্মাণ্ড গিরির অভিশাপে এই রায়বংশের অধঃপতনের সূচনা হয়। সেই সময়ে শালগ্রাম শিলা পোড়াগাছা ছাড়িয়া ঢাকা নবাবপুরের কৃষ্ণদাস ও গোপাল দাস এই দুই সহোদরের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য স্বপ্নাদেশ করেন। এই স্বপ্নাদেশের ফলে ৯৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (ইং ১৫৭৫ খৃঃ এপ্রিল) জনৈক ব্রাহ্মণের দ্বারা উক্ত শালগ্রাম শিলা ঢাকায় প্রেরিত হন। এই সময়ে ভক্ত কৃষ্ণদাস ব্রহ্মপুত্রতীরে লাঙ্গলবন্ধ স্থানে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ গণ্ডকী শিলা লইয়া লাঙ্গলবন্ধ যান এবং সেখানে পঞ্চমী ঘাটে শিলার কাহিনী ও স্বপ্নাদেশ কৃষ্ণদাসকে বলেন। দরিদ্র কৃষ্ণদাস বসাক নিজে শিলা স্পর্শ না করিয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া ঢাকায় ফিরিয়া আসেন। তিনি দরিদ্র হইলেও আনন্দে শিলার নিত্য সেবার ব্যবস্থা করেন। কথিত আছে সেই অবধি কৃষ্ণদাসের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল। কাহারও মতে

কেদার রায়ের অধঃপতনের পরই এই শালগ্রাম শিলা কোনও প্রকারে কৃষ্ণদাসের হস্তগত হইয়াছিল।

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র প্রতিষ্ঠার অল্প কিছু দিন পরে ঢাকার নবাব ইস্‌লাম খাঁ বাহাদুর কৃষ্ণদাস মুচ্ছুদ্দিকে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর উৎসব ও মিছিল কৃষ্ণদাস মুচ্ছুদ্দি কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের প্রীত্যর্থ প্রবর্ত্তিত হয়। ১০২০ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণদাস মহাসমারোহে অমরপুরের (নবাবপুর) নিজগৃহে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে তিনি গয়া হইতে পাষাণময় শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহ আনিয়া ও অষ্টধাতুময়ী শ্রীশ্রীকিশোরী মূর্ত্তি গড়িয়া শ্রীবীরভদ্র গোস্বামীর নামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে একই শিল্পী শ্রীশ্রীকিশোরী মূর্ত্তি ও ঢাকার ঢাকেশ্বরী ভগবতী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ত্রিতল। নিম্ন তলা মাটির নীচে প্রোথিত এবং এই তলায় অনেকগুলি কুঠরী আছে। সম্ভবতঃ বর্গীর অত্যাচার ও লুণ্ঠন হইতে ধনরত্নাদি রক্ষা করিবার জন্য মাটীর নীচে এই কুঠরীগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই হিসাবে এই মন্দিরের সহিত শিবসাগরের বোরানগরের অহোম রাজাদিগের প্রাসাদাবলীর বিশেষ সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশীয় দস্যুদের আক্রমণ হইতে ধন ও প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য এই প্রাসাদগুলির নিম্নতল ভূমধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল।

বেদ-গান।

কল্যাণ—তেওরা।

সুর—ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু। মা মা হিংসীঃ ॥
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥ যজুর্ব্বেদ।

সা -া II রা পা -ক্ষপা। গা -া। রা -া I গা ধা -া। পা -রা। গা -রা I
ওঁ • পি তা •• নো • সি • পি তা • নো • বো •

I -ন্া -রা -া। সা -া। -া -া I সা ধা -া। সা -া। সা -া I সা -রা গা।
• • • ধি • • • ন ম • স্তে • স্ত • মা • মা

। -পা পা। -ধা র্সা I -া -ধর্রা র্সর্সা। -ধপা -গপা। -গরা -সা II
• হিং • সীঃ • •• •• •• •• •• •

II গা গা -া। গা পা। ঃ -ক্ষঃ ধা I পা ধা র্সা। -া র্সা। র্সা র্সা I
বি শ্বা • নি দে • ব স বি ত দু রি তা

I -া -া র্সা। র্সা র্সনা। -র্রা -র্সর্সা I র্সা র্সা -া। গা -া। গা -া I
• • নি প রা• • •• সু ব • য দ্‌ ভ •

I গা -া -া। রা -া। রা রা I -ন্া -রা -া। -া সা। সা -া I সা সা -া।
দ্রং • • ত • ন্ন আ • • • • সু ব • ন মঃ •

। সা -া। রা রা I -া রা রা। রা সা। -রা গা I গা -া গা। গা রা।
শ • ম্ভ বা • য় চ ম য়ো • ভ বা • য় চ ন

। গা -া I ক্ষা -া ক্ষা। ক্ষা -া। গা ক্ষা I পা পা পা। পা -া। পা পা I
মঃ • শ • ঙ্ক রা • য় চ ম য় স্ক রা • য় চ

I ক্ষা পা ধা। ধা -া। পা ধা I না না না। না -া। -ধা -না I -র্রা -া র্সা।
ন মঃ শি বা • য় চ শি ব ত রা • • • • • য়

। র্সা -া। র্সা -া II II
চ • "ওঁ"

৯৪১ সংখ্যা

১৮৪৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রার্থনাসমাজের মত।

(ডাঃ সার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকার কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

মনুষ্যের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ভৌতিক বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিবার যেরূপ সামর্থ্য আছে, সেইরূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিবারও শক্তি আছে। এবং এই প্রকারে উৎপন্ন জ্ঞানের সত্যতা সম্বন্ধে মনুষ্য সমানই বিশ্বাস করিয়া থাকে। সূর্য্য বলিয়া কোন পদার্থ আছে এই বিষয়ে মনুষ্যের যেরূপ সংশয় হয় না, সেইরূপ কোন ব্যক্তির বিশ্বাস-ঘাতকতা করা, মিছামিছি ভোগা দিয়া কাহারও সর্ব্বস্ব নষ্ট করা,—ইহা যে অনুচিত এ বিষয়েও সংশয় হয় না। সেইরূপ আবার, সুন্দর বা আনন্দ-দায়ক কোন বস্তু সম্বন্ধে উৎপন্ন যে জ্ঞান, সে বিষয়েও কোনও সংশয় হয় না। সূর্য্যাদি ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ ও তাহার ব্যাপারসমূহও কোনও এক শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ও পরিচালিত হইতেছে এইরূপই মনুষ্যের ধারণা এবং তদনু-সারে বসা, ওঠা, ঘটপটাদি নির্ম্মাণ করা—এই সমস্ত আমাদের শক্তিযোগে ও ইচ্ছাক্রমে আমরা করিয়া থাকি এবং তাহার দরুণ শক্তি ও ইচ্ছার ধারণা স্বকীয় অনুভূতিতে মনুষ্য উপলব্ধি করে। সেইরূপ এই বাহ্য ভৌতিক পদার্থ কাহারও-না-কাহারও শক্তিতে ও ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহার ব্যাপার সকল চলিতেছে, এইরূপ সহজ ধারণা মনুষ্যের হইয়া থাকে। এই প্রকারে যিনি ব্রহ্ম-চক্র ঘুরাইতেছেন তিনি পরমাত্মা পরমেশ্বর এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয় এবং আকাশের চন্দ্র সূর্য্য ও তারা, পৃথিবীর উচ্চ পর্ব্বত, গভীর উপত্যকা, এক-সঙ্গে বহমান জলপ্রবাহ, বিরাট বিশাল সমুদ্র ইত্যাদি সমস্ত বিশ্বের দীপ্যমান মহিমা একই সময়ে যে ব্যক্তির দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হয়, তৎসম্বন্ধে তাহার পূজ্যবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ আবার, এই মহিমার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া মনুষ্যের মন সুখানুভব করে ও আনন্দে নিমগ্ন হয়। তখন এই যে পুরুষ বিশ্বব্যাপার পরিচালনা করিতেছেন তিনি আনন্দময়, এইরূপ ধারণা হয়। সেইরূপ আবার, বিশ্বাসঘাতকতার মত কোন কার্য্য অনুচিত, এবং অন্যের প্রতি প্রীতি করিয়া তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য—এইপ্রকার যে উচিতানুচিত ভাব তাহার কখনই ব্যতিক্রম হয় না—তাহা শাশ্বত এইরূপ মনুষ্যের ধারণা হইয়া থাকে। অতএব, উহা যদি শাশ্বত হইল, উহার আধারভূত যে শাশ্বত পুরুষ, তিনি অবশ্য শাশ্বত হইবেন; অর্থাৎ, সদ্ধর্ম্মের আধার কিংবা প্রতিষ্ঠা একমাত্র পরমেশ্বর—এইরূপ অন্তঃকরণে প্রতীতি হয়। সেইরূপ আবার, বাহ্যবিশ্বে প্রকাশমান মহিমা ও আনন্দ ও শাশ্বতধর্ম্ম—এই সমস্তের আধার সেই একই সনাতন পুরুষ এইরূপ মনুষ্যের উপলব্ধি হয়। এবং এই তিন প্রকারে পূজ্যবুদ্ধি অন্তঃকরণে স্থিরতা লাভ করিয়া, সেই দেব-দেবের ভজনা

করা, তাঁহার বন্দনা করা, ধ্যান করা, যাহাতে করিয়া তাঁহাকে আমরা লাভ করিতে পারি এইরূপ কার্য্য করা—এই সব বিষয়ে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হয়, এবং পরমেশ্বরের মহিমার পূর্ণজ্ঞান হইয়া তাঁহার যে পবিত্র বিমল স্বরূপ, তাহা মনোমধ্যে আনিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইব—এই মনোরথ মনুষ্যের অন্তঃকরণে উদিত হয়।

এখন, এই প্রকারের উচ্চ জ্ঞান ও মনোরথ শুদ্ধভাবে মনুষ্যের মনে আরম্ভেই উৎপন্ন হয় না; এই যে উপরি-উক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব, তাহার বিকাশ মনুষ্যের অন্তঃকরণে ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়। পরন্তু সকলের মধ্যে বীজরূপেও ঐ তত্ত্ব আছে এবং ন্যূনাধিকভাবে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেরই লোকের মধ্যে তাহার বিকাশ হইয়া থাকে। ন্যূনাধিকভাবে আছে,—অর্থাৎ, সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বই পূর্ণভাবে সমস্ত প্রচলিত ধর্ম্মের মধ্যে আছে, একথা বলা যায় না; তবে, সকল ধর্ম্মের মধ্যে সত্যের কোন-না-কোন অংশ আছে; পরন্তু সকল সত্যই কোন এক ধর্ম্মের মধ্যে বদ্ধ এরূপ নহে। যে-কোন তত্ত্বই হোক তাহার একাধিক বিচার-মার্গ বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে, তাহার মধ্যে কোন্‌টি ভাল ও কোন্‌টি মন্দ এই সম্বন্ধে মনুষ্য জিজ্ঞাসা করিতে থাকে; এবং এইরূপে তাহার বুদ্ধির মধ্যে বিচার-বিবেচনা—এই গুণটি উৎপন্ন হয়। এই বিচার-বিবেচনার যোগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে যে সকল সত্য আছে তাহা বাহির করা, যে সকল অসত্য আছে তাহার অনাদর করা—এই বিষয়ের সামর্থ্য মনুষ্যের উৎপন্ন হয়। তখন বিচার-বুদ্ধি দ্বারা, সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে যে সত্য আছে তাহা গ্রহণ করিবেক এবং অসত্যের অর্থাৎ দেশকাল-অনুযায়ী প্রচলিত যে অসত্যের অংশ তাহা পরিত্যাগ করিবেক এবং জাগৃত বিচার-বুদ্ধির যোগে যে সকল মত উন্নতিকারক বলিয়া অন্তঃকরণে উপলব্ধি হয় তাহা অবলম্বন করিবেক—ইহাই প্রার্থনাসমাজের প্রথম সিদ্ধান্ত। এই বিচার-বুদ্ধির ব্যাপার, প্রথমেই আমাদের দেশের যে ধর্ম্ম-গ্রন্থ ও ধর্ম্মমত আছে, তাহার উপরে চালনা-করিয়া যে সিদ্ধান্ত বাহির হয় এবং যাহা প্রার্থনা-সমাজ গ্রহণ করে তাহা এই :—

পরমাত্মা সর্ব্বভূতের হৃদয়ে থাকিয়া ব্রহ্মচক্র ঘুরাইতেছেন; অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে পূর্ব্বাপেক্ষা শিবতর উচ্চতর স্বরূপ প্রদান করিতেছেন; তিনি মনুষ্যের অন্তঃকরণে থাকিয়া, অমুক কার্য্য ভাল, অমুক কার্য্য মন্দ এইরূপ উপদেশ দিতেছেন; ভালকে অবলম্বন করিলে মনুষ্যের অন্তঃকরণে শান্তি ও সন্তোষ উৎপন্ন হয়; যে মন্দকে অবলম্বন করে তাহার অন্তঃকরণে অনুতাপ অর্থাৎ আত্মধিক্কারজনিত খেদ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে তিনি মনুষ্যকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে লইয়া যান। পরমাত্মা অনাদি, অনন্ত; মনুষ্য তাঁহার মহিমার সীমা করিতে পারে না। এইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে অসীম পূজ্য-বুদ্ধি হৃদয়ের মধ্যে পরিপুষ্ট করা শ্রেয়স্কর। সদ্ধর্ম্মের অধিষ্ঠান বলিয়া তিনি আমাদের বন্দনীয়, পূজনীয়, অনুকরণীয় এবং শুদ্ধভাবে যে প্রকার বন্দনা ও ভজনা করিলে অন্তঃকরণে শান্তি ও সন্তোষ লাভ করা যায় তাঁহার বন্দনা ও পূজা সেইভাবে করিতে হইবে। কেবল শব্দ উচ্চারণ করিয়া বন্দনা ও ভজনা করিলে কোন ফল হয় না। সেই বন্দনা ও ভজনা শুদ্ধভাবে করা চাই; পরমেশ্বরই আমাদের একমাত্র গতি এইরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলে তবেই শ্রেয়োলাভ হয়। এইরূপে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ করিয়া তাহারই অনুরূপ জীবনের সমস্ত কাজ করা চাই। কাম-ক্রোধাদিকে নিগ্রহ করিয়া সত্যনিষ্ঠা ও ক্ষমা পরিপুষ্ট করা আবশ্যক। পরার্থ-সাধনের জন্য, পরের বিপত্তি হরণ করিবার জন্য স্বার্থকে পরিত্যাগ করা, পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য করা, সকল বিষয়ের মধ্যেই পরমেশ্বরকেই প্রমাণ বলিয়া মনে করা, আপনার মানাপমান, আপনার আচরণ সম্মুখে আসিলে, তাহাকে পশ্চাতে সরাইয়া দিয়া পরমেশ্বরের অভিমত কার্য্য করা, অর্থাৎ আপনার সৎকর্ম্মরূপ পুষ্প প্রভুর চরণে স্থাপন করিয়া তাঁহার পূজা করা,—এই সব কাজ উপরি-উক্ত সর্ব্বাত্মসমর্পণের মধ্যে আইসে। নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া বনবাস স্বীকার করা, জনসহবাস ত্যাগ করা, পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করা—এ সমস্ত প্রার্থনাসমাজের সম্মত নহে। সংসারে থাকিয়াই প্রীতিপূর্ব্বক পরমেশ্বরের ধ্যান

ভজন করা, তাঁহার উপরেই সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া সৎকর্ম্ম করা, অর্থাৎ সংসারে থাকিয়াই সদাসর্ব্বদা পরমার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা—ইহাই শ্রেয়স্কর মার্গ। একান্তবাস বা অরণ্যবাসযোগে কামক্রোধাদি রিপুর নিগ্রহ করিবার সামর্থ্য আমাদের সত্যই হইয়াছে কিংবা হয় নাই,—ইহার পরীক্ষা হয় না। কামক্রোধাদি যাহাতে উদ্দীপিত হয় সেই সাংসারিক ব্যবহার ও প্রসঙ্গের মধ্যে থাকিয়াই, সেই সকল উদ্দীপিত হইলে পর, তাহাদের নিগ্রহ করিবার অভ্যাস নিয়ত করিলে সেই সামর্থ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং সংসারে থাকিয়াই একান্তে বসিয়া পরমেশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করিলে সেই সামর্থ্য দৃঢ় হয়। আমাদের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য আমাদের স্বার্থ পরিত্যাগ করা অনেক বিষয়ে আবশ্যক। তাহা করা চাই। এই পর্য্যন্তই আমরা নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া থাকি। কর্ত্তব্য সাধনের জন্য স্বার্থত্যাগের আবশ্যকতা আছে, এবং

নওহে আরাণুক সংসারাচ্যা হাতীঁ ॥
সর্বকাল চিন্তীঁ তোচি ধন্দা ॥ ১ ॥
দেবধর্ম সাঁদীঁ পড়লা সকল ॥
বিষয়ীঁ গোঁধলে গাজতসে ॥ ২ ॥

তুকারামের এই বচন অনুসারে সর্ব্বদা চিত্তে সংসারকে রাখা, দেবধর্ম্মের উপেক্ষা করা, বিষয়জঞ্জালের মধ্যে ডুবিয়া থাকা উচিত নহে। এই পর্য্যন্তই নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করা আবশ্যক।

এখন—সেই যে অনাদি অনন্ত শুদ্ধ বিমলস্বরূপ তাহা অন্তঃকরণের সম্মুখে স্থাপন করিলে তবেই উপরি-উক্ত কার্য্য সকলের সাধন সুলভ হয়। সেই স্বরূপ অন্তঃকরণের সম্মুখে না রাখিয়া কোন স্থূলপদার্থ, ধাতু কিংবা পাষাণের প্রতিমা নেত্রসমক্ষে রাখিয়া গন্ধপুষ্পের সেই সাধন সফল হয় না। ঈশ্বরের ভজন-পূজন করিবার সময় সত্যস্বরূপকে মনের সম্মুখে স্থাপন করিয়া, আমাদের দুষ্কর্ম্ম,দুর্বৃত্তি,পাপ—এই সকলের তালিকা মনে মনে পাঠ করিয়া আমাদের ভয়ঙ্কর অবস্থা তাঁহাকে নিবেদন করা এবং তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করা—এইপ্রকার ঈশ্বরের পূজাই শ্রেয়স্কর, পাষাণের উপর কিংবা ধাতুর উপর গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ করা শ্রেয়স্কর নহে।

ভগবদ্গীতাদি গ্রন্থে যে সাধন উক্ত হইয়াছে তাহা উপরি উক্ত সাধনের অন্তর্ভূত। অন্তঃকরণকে শুদ্ধ রাখিয়া উত্তরোত্তর নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে সৎকর্ম্ম করা—এই বিষয়ে আমরা অত্যন্ত দুর্ব্বল। আমাদের কোন প্রতিজ্ঞা অন্তঃকরণে স্থায়ী হয় না। আমরা পুনঃপুনঃ মোহে পতিত হই এবং দুষ্কর্ম্ম করি, অন্তঃকরণবৃত্তি দূষিত হইয়া পড়ে; এই অবস্থা দেখিয়া আমাদের দীনতার ধারণা অন্তঃকরণের মধ্যে পূর্ণরূপ আনিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া, তাঁহাকেই আমরা রক্ষক বলিয়া বরণ করিব এইরূপ ভাব মনোমধ্যে স্থির করা এবং তাঁহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করা, এই যে সব সাধনের অঙ্গ—তাহা প্রপত্তি বলিয়া অভিহিত হয়। কর্ম্মযোগের দ্বারা ফলের উপর দৃষ্টি না রাখা—এই অঙ্গকে কর্ম্মযোগ বলে। কর্ম্মযোগের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ সতত অন্তঃকরণের সম্মুখে রাখিয়া স্পষ্টরূপে তাহা উপলব্ধি করা—ইহাকেই জ্ঞানযোগ বলে। এবং এই জ্ঞানযোগের দ্বারা ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্বরূপ হৃদয়ের সম্মুখে স্থাপন করিয়া সেই বিষয়ে উৎপন্ন যে প্রেম তাহার পরিপোষণ করা, ইহাকেই ভক্তিযোগ বলে। এই তিন অঙ্গের যে অন্তিম সাধনা—ইহার উদ্দেশ্য ঈশ্বরের সহিত অংশতঃ সমরস হওয়া। ইহাই মুক্তি। এখন পরমাত্মা পরমেশ্বর সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণে বাস করেন—ইহা উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকেন এবং আমরা সেই বিষয় পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি। যদিও তিনি সকলের অন্তঃকরণে আছেন, তথাপি তাঁহার সান্নিধ্যযোগে কাহারও কাহারও বিমল জ্ঞান হয়, কাহারও বা ঘোলাটে-রকমের জ্ঞান হয়। এইরূপে মনুষ্যের মধ্যে পরমার্থজ্ঞানের উচ্চনীচ ভাব আছে; একজনের মধ্যে পরমেশ্বরের অংশ বিশেষরূপে প্রকাশ পায়, আর একজনের মধ্যে কম পরিমাণে থাকে। তখন পরমাত্মা অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও মনুষ্যের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন স্বরূপ ধারণ করেন; অর্থাৎ অবতার গ্রহণ করেন; এই মতের মধ্যে যে সত্য আছে তাহা এইটুকুই যে, তাহার মধ্যে অর্থাৎ অবতাররূপে স্বীকৃত পুরুষের মধ্যে পরমেশ্বর বিশেষরূপে বাস করেন।

নচেৎ, দেশকালে অনাদি অনন্ত যে পরমেশ্বর তিনি সাদি, সান্ত পদার্থের স্বরূপ গ্রহণ করেন, এই কল্পনা অসঙ্গত ও অসম্বদ্ধ। অনাদি অনন্ত যিনি তিনি চিরকাল সেইরূপেই থাকিবেন; তিনি কখনো অন্তবৎ হইতে পারেন না। ইহাও প্রার্থনা-সমাজের একটি মত।

পরমেশ্বর মনুষ্যের মধ্যে আছেন বলিয়া, সর্ব্বতোভাবে সাম্যবুদ্ধি স্থাপন করা অর্থাৎ মনুষ্য পরমেশ্বরের সন্তান—এই হেতু সকল মনুষ্যই আমাদের ভাই-ভগিনীর ন্যায়,—এইরূপ ভাব অন্তঃকরণে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। সকলের আত্মাই আমার আত্মা এইরূপ ভাব অন্তঃকরণে পরিপক্ক করা উচিত। জ্ঞানোবার উক্তি অনুসারে ঃ—

আপন পা বিশ্ব দেখিজে।
বিশ্বচি আপণ হোই যে॥

এইরূপ ভাব পরিপক্ক হইলে, মনুষ্যের বুদ্ধি অত্যন্ত উন্নত হইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়। তুকোবা-র "সর্ব্বাত্মকপণে যোগ ঝালা" এই উক্তি অনুসারে সকলের আত্মা এবং আমার আত্মা একই হইয়া গেলে বিমল আনন্দ অথবা সুখ ভোগ করা যায়। এই যে মত—এই মতানুসারে জাতিভেদ ও সমাজস্থিতি ও গৃহস্থিতি—ইহার মধ্যে যে অন্যায় প্রথা প্রচলিত আছে তৎপ্রতি প্রার্থনাসমাজ প্রতিকূল এইরূপ সিদ্ধ হয়।

অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত প্রার্থনাসমাজের আদরের সম্বন্ধ; বিরোধের সম্বন্ধ নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঈশ্বরই মনুষ্যের অন্তঃকরণে থাকিয়া ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি করেন—এই উক্তি হইতেই উপরোক্ত কথা সিদ্ধ হইবে। যে অংশ সমাজের মতের সহিত মেলে না তাহা মনুষ্যের অজ্ঞতা ও দেশকালের অবস্থা অনুসারে গঠিত হইয়াছে। তাই, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া যে অংশের সহিত মিল আছে সেই অংশের উপরেই সমাজের মুখ্য দৃষ্টি। যে-কোন ধর্ম্মই হোক্ না, তাহার যে অংশ গ্রাহ্য, প্রার্থনাসমাজ তাহাই গ্রহণ করেন। উদাহরণ—যদিও ভগবদ্‌গীতা বলিয়াছেন যে কর্ম্মযোগই শ্রেয়স্কর, তথাপি সংসারসম্বন্ধে অত্যন্ত বৈরাগ্য মনোমধ্যে দৃঢ় করিয়া সংসারকে ত্যাগ করিবার দিকেই আমাদের প্রাচ্য লোকের বিশেষ ঝোঁক। পরন্তু সংসার ত্যাগ না করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করা সম্বন্ধে প্রতীচ্য লোকদিগের যে বিশেষ লক্ষ্য, তাহাই প্রার্থনা-সমাজ গ্রহণ করেন। পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে উদার বিচার-আলোচনার প্রবাহ আধুনিক কালে চলিতেছে তাহার সহিত প্রার্থনা-সমাজের পূর্ণ সহানুভূতি আছে—এবং তাহার মধ্যে অনেক অংশ যাহা গ্রাহ্য প্রার্থনা-সমাজ তাহা স্বীকার করেন।

জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন ও আয়োজন।

(শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী)

অনেক দিন হইতেই আমাদের দেশে শিক্ষা-সমস্যার সূত্রপাত হইয়াছে। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলন ইহাকে একটী বিশিষ্ট আকার-দিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে শিক্ষা আমরা এতদিন পাইয়া আসিয়াছি, তাহা যেন ঠিক আমাদের উপযুক্ত হয় নাই। এ যাবৎ যাঁহারা এ শিক্ষা পাইয়াছেন বা পাইতেছেন—তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যথার্থ চিন্তাশীল—তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন যে, এই বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর কোন না কোন স্থানে একটা প্রকাণ্ড গলদ রহিয়া গিয়াছে। অসহযোগীরা বলেন এ শিক্ষার প্রধান গলদ—Slave Mentality—অর্থাৎ দাসজনোচিত মনোভাবের সৃষ্টি। কথাটী আদৌ অসঙ্গত নয়। ইহা যে ইংরাজী শিক্ষার দোষ এ কথা আমরা বলিতে চাহি না; তবে ইহা বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষ। কতকগুলি বিজাতিদ্বেষী ইংরাজ শিক্ষক ও লেখক হয়ত এ ভাবটী সৃজনের পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজের ইতিহাস বা সাহিত্য ইহার জন্য দায়ী নহে। ইংরাজ ব্যবসায়ীগণের কল্যাণে যখন দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে দেশীয়গণের হস্তচ্যুত হইতে লাগিল—এবং নানাবিধ বৈদেশিক বিলাসব্যসনের আতিশয্যে আমাদের ঘর ও বাহির, মন ও দেহ ভারাক্রান্ত হইতে লাগিল—সেই সময় ইংরাজীশিক্ষার মন্ত্রপ্রভাবে আমাদের

নিকট অর্থোপার্জ্জনের এক নূতন পথ খুলিয়া গেল; সেটী ইংরাজের আপিস-আদালত ইত্যাদি কর্ম্মস্থানে চাকরী গ্রহণ। ক্রমে শিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিতগণ চাকরির নাগপাশে বদ্ধ হইলেন। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ চলিত আছে—"যেমন তেমন চাকরি ঘি-ভাত"; ছেলেবেলায় যখন লেখাপড়ায় একটু-আধটু শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছি তখনই আমাদের নিকট প্রলোভনের চিত্র ধরা হইয়াছে—লেখাপড়া শিখলে বড় চাকরী পাওয়া যায়—উকিল হওয়া যায়, জজ্-ম্যাজিষ্টর হওয়া যায়, গাড়ী-ঘোড়া চড়া যায়, "লেখা পড়া শিখে যেই গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।" এই আরাম উপভোগ বর্ত্তমান শিক্ষার যথার্থ আদর্শ। এ শিক্ষা আমাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে জাগরিত করিয়া জীবন-সংগ্রামের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করে না। জীবনকে এক অখণ্ড সত্যরূপে উপলব্ধি করাইবার শক্তি এ শিক্ষার নাই; এ চায় শুধু আরাম, শুধু উপভোগ,—অপরের উপর কর্ত্তৃত্ব, নিজের উপর নহে। জীবনের যথার্থ স্বরূপ জানিয়া তাহার চরম পরিণতির প্রতি ইহার আদৌ লক্ষ্য নাই। আমাদের প্রাচীনকালের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দেখিতে পাই—উহার গতি জীবনের চরম পরিণতির দিকে। আর্য্যেরা মানব-জীবনের চারিটী স্তর আবিষ্কার করেন, তন্মধ্যে প্রথম স্তর ব্রহ্মচর্য্য—ছাত্রজীবন; সর্ব্বপ্রকার বিলাস-বাসন বর্জ্জন করিয়া ত্যাগ ও কঠোরতার দ্বারা জীবন-গঠন—তাহার সম্মুখে কোনরূপ আরামের চিত্র ধরা হয় নাই। কঠোর সংসার-সমরক্ষেত্রে যেরূপ সংযত-ভাবে সৈনিকপুরুষকে যুদ্ধ করিতে হইবে—তাহারই উপযোগী শিক্ষা সে পাইবে। তারপর গার্হস্থ্য; এখানেও ধর্ম্মার্থে দারপরিগ্রহ কর্ত্তব্য—ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার্থে নয়। অতিথিসেবা, দীন-দরিদ্র অনাথ আতুরের জন্য জীবনের সুখবিসর্জ্জন—ইহাও চাই। তার পর বানপ্রস্থ, পরে যতি। ইহাই ভারতের শিক্ষা। পরম সত্য যে ব্রহ্মজ্ঞান সমস্ত জীবনেরই লক্ষ্য সেই ব্রহ্মোপলব্ধির প্রয়াস। তথাপি ভারতবর্ষ সংসারকে অতিক্রম করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করেন নাই। ভোগকে একেবারে ত্যাগ করেন নাই। সাংসারিক সুখও ভারতের অন্যতম কাম্য; তবে তাহা ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া নহে। সে সুখেরও প্রারম্ভে বিদ্যাশিক্ষা আছে—

> বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদযাতি পাত্রতাং।
> পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মস্ততঃ সুখং॥

কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"ভোগের বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে"। সেবার যখন স্বদেশী আন্দোলন হয় তখন একদল ছেলে স্কুল-কলেজ হইতে বাহির হইয়াছিল জাতীয় শিক্ষা পাইবার জন্য। অসহযোগ আন্দোলনের ফলেও অনেক ছাত্র বাহির হইয়াছিল। অনেকে আবার ফিরিয়া গিয়াছে। অবশ্য অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে ছাত্রগণকে আহ্বান করা হইয়াছিল বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী উচ্ছেদের নিমিত্ত। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তিনি ছাত্রগণকে অগ্র-পশ্চাৎ অনেক বিবেচনা করিয়া তবে এ আন্দোলনে যোগ দিবার কথা বলিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষা স্বতন্ত্র। একটী উচ্ছেদ আর একটী নব সৃষ্টি। তবে প্রথমটীর অবশ্যম্ভাবী ফল যে দ্বিতীয়টী তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অসহ-যোগ আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় সাফল্য লাভ করিলে এতদিন জাতীয় শিক্ষার আয়োজন সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইত। আংশিক ভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে বলিয়া এ সম্বন্ধে কিছু কিছু লেখা পড়া চলিতেছে। দুই দশটা বিদ্যালয়ও গড়িয়া উঠিতেছে। এবার ছেলেরা যখন স্কুল কলেজ বন্ধ করে তখন তাহারা স্কুল ও কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করে যে তত্তৎ স্কুল ও কলেজকে "জাতীয়" বলিয়া ঘোষণা করা হউক। গুজব শুনিয়াছিলাম বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার কলেজকে জাতীয় কলেজে পরিণত করিতে প্রস্তুত আছেন। এমন কি পূজনীয় আশু বাবুও নাকি বলিয়াছিলেন, "কোটী টাকা নিয়ে এস—এই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতেছি"। জাতীয় শিক্ষা বলিতে ইঁহারা কি বুঝেন তাহা জানি না—কেবল মাত্র নাম-পরিবর্ত্তনেই কি বস্তু-পরিবর্ত্তন হইবে?

বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষ কি? ইহার
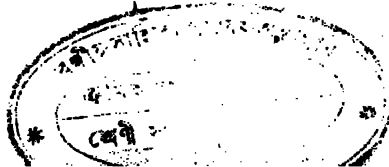
সর্ব্বপ্রধান দোষ এই যে আমাদের জীবনের সহিত ইহার মিল নাই। সেই জন্য এ শিক্ষা আমাদিগকে জীবনের গন্তব্য পথে পরিচালিত করে না; ইহার ভারে আমরা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছি। আমাদের জীবন চিন্তাক্লিষ্ট দাসত্বভারে অবনত। নূতন সৃজনের শক্তি আমাদের নাই। মুষ্টিমেয় শিক্ষিতগণ সমগ্র বিরাট জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। দুর্ব্বল প্রতিবাসীর নিকট হইতে কোনও প্রকারে কিছু সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা দিনপাত করেন। ওকালতী ডাক্তারী ইত্যাদি ব্যবসায়ের নীতি ইহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। বিবাদের মীমাংসায় নয়, নূতন বিবাদের সৃষ্টিতে ব্যবহারাজীবের আনন্দ; রোগ আরোগ্য করায় নয়, দেশে নূতন নূতন ব্যাধির উদ্বোধনসঙ্গীতেই ডাক্তারের আনন্দ। কোন নূতন ভাবের প্রচারে গ্রন্থকারের কিছু আগ্রহ দেখি না, কি করিয়া তাঁহার পুস্তকখানি সর্ব্বত্র কাটতি হইবে ইহাই তাঁহার চেষ্টা। প্রতিবৎসরেই ছাত্রগণ অঙ্ক শিখিবার জন্য নূতন নূতন পাটীগণিত, বীজগণিত কিনিয়া থাকে। শিক্ষার অভাব যতই অনুভূত হইতেছে, শিক্ষার ব্যয়বাহুল্যও ততই অধিক হইতেছে। আদালতে যেমন অনেক টাকা খরচ করিয়া বিচার ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, বিদ্যালয়েও সেইরূপ অতি উচ্চহারে বিদ্যা-বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে; অথচ জীবনযাত্রার পক্ষে সে বিদ্যার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, এ কথা বোধ হয় স্বীকার না করিলেও চলে। দরিদ্র ছাত্রগণের বিদ্যালয়ে স্থান নাই। তাহাদের নিজেদের বাসগৃহ যতই কুৎসিত হউক না কেন, বিদ্যালয়টী অট্টালিকা হওয়া অত্যাবশ্যক; নতুবা কর্ত্তৃপক্ষ সে বিদ্যালয়কে আমলেই আনিবেন না। কেহ পাঠ করুক বা নাই করুক, বিদ্যালয়ের পাঠাগার বহুমূল্য পুস্তক ও আলমারীতে পরিপূর্ণ করা চাইই-চাই। অথচ এই বাংলা দেশের এমন একদিন ছিল, যখন হরিঘোষের গোয়াল ঘর হইতে মহামহোপাধ্যায় নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ বাহির হইয়া সমগ্র দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ভাঙ্গা চালের নীচে দরিদ্র অধ্যাপকের টোলে কুমার, নৈষধ, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও পাণিনির নূতন নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছে। কিন্তু আজকাল শিক্ষার আয়োজনেই সর্ব্বস্ব ব্যয় হইয়া গেল, তথাপি কর্ত্তৃপক্ষগণের নাসিকা-কুঞ্চনের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া ভার!

আজ দেশের সর্ব্বত্র কথা উঠিয়াছে জাতীয় শিক্ষা—শুধু নাম পরিবর্ত্তনে নয়, বর্ত্তমান শিক্ষা-সংস্কারে নয়; এই শিক্ষা (অর্থাৎ এই শিক্ষাপ্রণালী) একেবারে বর্জ্জন করিয়া নূতন প্রণালীতে সমগ্র জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, সাধারণের সহিত শিক্ষিতগণের যোগ সাধন করিতে হইবে। এই মিলন যদি কখনও সম্ভবপর হয় তবেই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, নতুবা নহে। বঙ্গের পরিত্যক্ত পল্লীগুলিতে শিক্ষিতগণকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে, সহরে বসিয়া প্রবন্ধ লিখিলে বা বক্তৃতা করিলে, কোনও ফল ফলিবে না। একদল ত্যাগী কর্ম্মী আবশ্যক যাঁহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া এক একটী শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করিবেন। অনেককে মুখে বলিতে শুনিয়াছি, পল্লীগ্রাম আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, অথচ তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে কেহই অগ্রসর হইবেন না; কিন্তু সেই পল্লীরই কৃষকগণের কঠোর পরিশ্রমের অর্থ লইয়া সহরে মোটরগাড়ী চালাইতে তাঁহারা বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত নহেন। পল্লীতে আসিয়া পল্লীর সর্ব্বপ্রকার সুবিধা ও অসুবিধা মাথা পাতিয়া গ্রহণ না করিলে জাতীয় জীবনের মুক্তি অসম্ভব। প্রথম যাঁহারা আসিবেন সকল রকমের অসুবিধার মধ্যেই তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হইবে। নিত্য দারিদ্য, ম্যালেরিয়া, অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, অশিক্ষা ও কুসংস্কার তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিবে। ভয় করিলে চলিবে না; সাহসে ভর করিয়া একাগ্রচিত্তে কার্য্য করিতে হইবে। একনিষ্ঠ সাধকের মত তাঁহাকে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে হইবে। দেশের জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে হয়ত এ কাজ অতি সহজে পারিতেন; কিন্তু তাঁহারা সহসা ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া মনে হয় না। একদল শিক্ষিত সাহসী যুবককে অগ্রণী হইতেই হইবে, তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলে অনেক সহায়তা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন দেশব্যাপী এই আন্দোলন চলিতেছে; কার্য্যারম্ভের ইহাই মাহেন্দ্রক্ষণ।

অনেকে দেশের দুঃখ অনুভব করিয়াছেন কিন্তু তাহা দূর করিবার উপায় খুঁজিয়া পান না; সহরে বসিয়া সহস্রবারও চিন্তা করিলে উপায় আবিষ্কৃত হইবে না। অনেক উৎসাহী যুবক সহরে আইন অধ্যয়নের নিমিত্তবৃথা আশায় কালক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যেকে স্বস্ব পল্লীগ্রামে প্রত্যাগমন করুন। সেখানে জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া দেশকে জাগ্রত করুন। সাধারণ লোকের সহিত —নিরক্ষর কৃষীর সহিত স্নেহবন্ধন প্রতিষ্ঠা করুন। সে ছোট আমি বড়, এ ভাব লইয়া যাইবেন না, পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে। তাহার সহিত মিত্রভাবে মিলিত হউন। উকিল বাবু, ডাক্তার বাবু, দারোগা বাবু, নায়েব মহাশয়, মুহুরী মহাশয় প্রভৃতি যেরূপ ভাবে গিয়া থাকেন সে ভাবে যাইবেন না; তাহাদের দুঃখ বুঝিতে হইবে, প্রাণে তাহা অনুভব করিতে হইবে। এই নিরক্ষর সরল পল্লীবাসী কৃষিজীবী যে কত নিরুপায় তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। বহুকাল পূর্ব্বে একবার রবীন্দ্রনাথের বীণায় তাহাদের মর্ম্মবেদনা ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহার বীণায় আজ সে সুর আর দেখি না। কিন্তু দেশে সেই সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠার দিন আজ আসিয়াছে। কবি তাঁহার কবি-প্রতিভাকে দেশসেবায় ব্রতী করিবার নিমিত্ত উদ্বোধিত করিতেছেন—

"কবি তবে উঠে এস যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই আজ লহ সাথে তাই কর দান;
সম্মুখেতে কষ্টের সংসার, দীন হাহাকার
শুধু দুটী অন্ন খুঁটি কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রাখে বাঁচাইয়া, সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে
সে প্রাণে বেদনা দেয় গর্ব্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচার
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে
দরিদ্রের ভগবানে বারেক স্মরিয়া মরে সে
নীরবে। এই সব ম্লান মুখে দিতে ভাষা
এই সব জীর্ণ বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।

দেশের একনিষ্ঠ যুবকবৃন্দের এখন একমাত্র সঙ্কল্প হওয়া প্রয়োজন—"এই সব জীর্ণ বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"। বহু শতাব্দীর অত্যাচারের নিষ্পেষণে তাহাদের কণ্ঠ নীরব, ভাষা মূক; রুদ্ধ বেদনার পাষাণভারে তাহাদের অন্তর নিপীড়িত; তাহারা কাহাকেও বন্ধু বলিয়া জানে না, প্রতিবেশীর সহিত ফৌজদারী মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া নিরন্তর নিজেদের বলক্ষয় করিতেছে। গ্রাম্য মহাজনকেই তাহারা একমাত্র বন্ধু বলিয়া জানে; অথচ সেই মহাজনের কাছে ঋণের দায়ে তাহার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রীত। ম্যালেরিয়া, কলেরা ও বসন্তের প্রকোপে তাহাদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে। তাহারা নিজেরা জরাজীর্ণ, রোগশোকক্লিষ্ট; ব্যাধিপ্রতিষেধের উপায় তাহারা জানে না, চিকিৎসার খরচ তাহাদের কুলাইয়া উঠে না, ঔষধ পথ্য কোথা হইতে সংগৃহীত হইবে? ইহারাই বাঙ্গালার কৃষিজীবী। অন্য প্রদেশের কথা জানি না, বাঙ্গালা দেশের অবস্থা এই। এই অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মরণাপন্ন কৃষক আট কোটী বঙ্গবাসীর অন্নসংস্থান করিয়া দিতেছে; বৈদেশিক ব্যবসায়ীগণের উদরপূরণের ব্যবস্থা করিতেছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী এখনও যদি শিক্ষার ভ্রান্ত অভিমান ভুলিয়া এই কৃষকগণের সহিত বন্ধুভাবে সম্মিলিত হইতে পারেন তবেই দেশ রক্ষা পাইবে; নতুবা গোলদীঘি ও টাউনহলের শতসহস্র বক্তৃতাতেও কোন ফল ফলিবে না, দেশ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে। জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা বলিয়া কথা উঠিয়াছে, তাই এই কথা বলিতেছি। জাতীয় শিক্ষার জন্য সহরে কোন আন্দোলনের বিশেষ আবশ্যকতা নাই। গ্রামে গ্রামে শিক্ষাকেন্দ্র অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হউক। এখনও পল্লীগ্রামে (আমি খাঁটি কৃষিনিষেবিত পল্লীর কথা বলিতেছি—District Town Subdivisional Town কি Municipal Town নয়) সুলভে জমি পাওয়া যায়। সেখানে জমি গ্রহণ করিয়া আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তাঁত, চরকা ইত্যাদি শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে, জাতীয়-শিক্ষা সাফল্য লাভ করিবে। দেশ স্বরাজ-সাধনায় অগ্রসর হইবে। শিক্ষিতগণ নিজেদের পুস্তকলব্ধ বিদ্যার সহিত দেশীয় চাষী ও শিল্পীর অভিজ্ঞতা মিলিত করিলে আশানুরূপ ফল পাইবেন। কৃষি ও শিল্প হইতে উৎপন্ন দ্রব্যজাতের ব্যবসায়ে এবং অন্য প্রকার ব্যবসায়লব্ধ অর্থ দ্বারা ঐ সকল বিদ্যালয় কালে আপনার খরচ আপনি সঙ্কুলান করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। এখনও পল্লীগ্রামে অনেক

পতিত জমি আছে; এইরূপভাবে সেই সব জমি উদ্ধার করিলে এবং দেশের ধনকুবেরগণ সাহায্য করিলে, এই সকল অনুষ্ঠান আদৌ অসম্ভব নয়। ইহাতে পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে, দেশের নিষ্কর্ম্মা যুবকগণ কার্য্য পাইবে এবং সমগ্র দেশে সত্ত্বই জাতীয় শিক্ষা বিস্তৃত হইবে। যদি এইরূপ ভাবে জাতীয়শিক্ষা কার্য্যকরী হইয়া উঠে, দেশের আপামর-সাধারণ জাতীয় শিক্ষাকে বরণ করিয়া লয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির থাম আপনিই খসিয়া পড়িবে—Slave Mentality বা দাসবৃত্তিকে নির্মূল করিবার জন্য অন্য কোনও প্রকার চেষ্টা পাইতে হইবে না।

প্রতিভা চিরদিনই অগ্রগামী। সমাজকে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। কবি যেদিন এই আদর্শকে ভাব ও ভাষা দিয়া প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছিলেন সেইদিনই তাঁহার দেশকে তিনি স্বরাজমূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। দেশে আজ সেই স্বরাজ-সাধনার দিন আসিয়াছে। ঋষিকল্প মহাত্মা গান্ধী ও অরবিন্দ কর্ম্ম ও জ্ঞানের আদর্শ লইয়া আমাদের জাতীয় জীবনের অন্ধকার দূর করিতেছেন; আমরা স্বরাজসাধনায় সফলকাম হইব সন্দেহ নাই। জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্রে তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেশের চিরসুপ্ত শিক্ষিত জনসমাজ আজ প্রবুদ্ধ হইয়া এই মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করুন—

"এই সব ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা
এই সব জীর্ণ বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"

এই মন্ত্র দেশের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইয়া দেশকে যথার্থ কর্ম্মের পথে প্রবর্ত্তিত করুক।

"স্বরাজ"।

(শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল বিএ-ল্)

স্বরাজ তোমার অন্তরে গো
স্বরাজ তোমার অন্তরে!
'সম্রাট্ আমি' প্রাণ খুলে বল—
স্বরাজ লভিবে মন্তরে!
রাজার রাজা পাঠা'ন্ মোদের
রাজটীকা দিয়া ভালে—
সে ললাট মোরা লুণ্ঠিত করি
দাসত্ব-ধূলি-জালে?
এই যে ভীষণ দৈন্য মোদের
নিত্য যে সহি অপমান,
এর চেয়ে মোদের মৃত্যু সে ভাল—
কলঙ্ক হয় অবসান!
রাজা হয়ে এসে দাস হয়ে থাকা—
এ যে স্রষ্টারে দেওয়া লজ্জা;
এরি তরে কিগো পাঠালেন তিনি
দিয়ে এত সাজ-সজ্জা!
'তাঁরি বলে মোরা সদা বলীয়ান্'
এই কথা বল সবে;
ঢালি দাও মন ঢালি দাও প্রাণ
পদে,—জয় জয় রবে!
জাগ ভাই আজি জাগ ভাই সবে—
স্বরাজ সে রহে অন্তরে
বুক তুলে বল "দাস নহি মোরা"—
স্বরাজ লভিবে মন্তরে॥

শ্রীমৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তি-অঞ্জলি।

(শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

(শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক বিবৃত)

আমাদের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। পিতামহকে বিস্মরণ হওয়া যেমন অসম্ভব, পিতাকে বিস্মৃত হওয়া তেমনি অসম্ভব। তাঁহার ঋষিভাব, যোগভাব, বিশুদ্ধ প্রীতিভাবের নূতন সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইলাম। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নিকট যাহা পাইয়াছিলেন তাহার তিনি নিয়মাদি স্থির করিলেন। একটি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসকমণ্ডলীর রাজ্য স্থাপিত হইল। রামমোহন রায়ের সময়ে মণ্ডলী গঠিত হয় নাই। তাঁহার কার্য্যের অবশিষ্ট অংশ যিনি পরে আসিলেন তিনি করিলেন। হিন্দুশাস্ত্র হইতে আলোচনা দ্বারা অমৃতময় সত্য উদ্ভাবন করিলেন। হিন্দু আচার-ব্যবহার হইতে উদ্ধার করিয়া একটি সংস্কৃত হিন্দুসমাজ গঠিত

হইল। সেই দলের ভিতর দিয়া যাহা কিছু হিন্দু-সমাজের ভাল তাহা আসিল। ইনি বর্ত্তমান ভারত-বর্ষীয় ঋষি-আত্মা। এই পবিত্র ঋষি-আত্মা—দেবেন্দ্রনাথের আত্মা, বঙ্গবাসীর মন সবল ও সুস্থ করিল। যখন ইনি স্বর্গ হইতে আসিলেন তখন ঈশ্বর ইঁহাকে দীক্ষিত করিয়া দেন। ইনি ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিয়া দুই-এক বৎসর নয়, কিন্তু যৌবন হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত ইঁহার সমস্ত শরীর মন উদ্যম তোমার আমার ন্যায় জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মপিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ। যদিও তোমাদের সঙ্গে তোমাদের ধর্ম্মপিতা ও ধর্ম্মপিতামহের সকল মতের ঐক্য না হয়, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-উপহার অর্পণ কর। যদি হৃদয়বন্ধুদিগকে কৃতজ্ঞতা না দিবে, তবে তোমরা নববিধানের উপযুক্ত নহ। তোমাদের শত্রু নাই, ব্রহ্ম তোমাদিগকে কঠোর শাসনে বদ্ধ করিয়াছেন। অন্যের মত তোমরা সাধুবিচারে প্রবৃত্ত হইতে পার না। যাঁহাদিগের সঙ্গে বিরোধ, যদি তাঁহাদিগের নিকট বিন্দুমাত্র উপকার পাইয়া থাক, করযোড়ে কৃতজ্ঞ হও। আমাদিগের উপকারী বন্ধুর কালদিক যে দেখিতে নাই, ইহা আমাদিগের সৌভাগ্য। আমরা ধর্ম্ম-পিতা ধর্ম্মপিতামহকে কৃতজ্ঞতা দিব। পিতা-পিতামহ-সম্পর্কে আমরা সকলে ভ্রাতা। আমা-দিগের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রণয় স্থাপন করিব। পরস্পরের প্রতি প্রণয়ে আবদ্ধ হইব। আমরা এই সম্বন্ধে ঐক্য বন্ধন স্থাপন করিব। রাজা রামমোহন রায় প্রদত্ত ধন কি কম? কম ধনী কি দেবেন্দ্রনাথ? কত খাইবে খাও, মনের সাধ পূর্ণ কর, ভাবনা নাই, ভয় নাই। বড় সংসার, এমন ধনীদ্বয়, এত বড় সংসার, সে সংসারে আবার দুঃখ দারিদ্র্য? একজন মৃত, একজন জীবিত অবস্থায় বলিতেছেন, "লও প্রাচীন শাস্ত্র। আর্য্যোচিত কার্য্য তোমরা সর্ব্বদা কর, আমরা তোমাদিগের সহায়তা করিবার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত"। আমাদিগের নিকট হইতে যদি ইঁহারা কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করেন, আমরা কৃতার্থ হইব। ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া ইঁহাদিগের দুইজনের চরণে মস্তক নত করিব। নববিধান আমাদিগকে সমুদায় উপকারী বন্ধুদিগের নিকটে প্রণত করিতেছেন। নববিধানের আজ্ঞাতে সাধুনিন্দা হইতে বিরত থাকিব। আর্য্য-পুত্র এই দুই ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মউপাসককে কৃতজ্ঞতা-ফুলের মালাতে হৃদয়ে জড়াইয়া দিব। ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে ইহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি দিন। ১লা জানুয়ারী ১৮৮৩।

"প্রভাত"।

(শ্রীনির্ম্মলহাসিনী দেবী)

আবরি' সুচারু তনু গোলাপী বসনে,
ছড়াইয়া রূপরাশি উজলি' ভুবন,
সুবর্ণপ্রতিমা মরি সুবর্ণ আসনে
ধীরে উষারাণী ওই দিলা দরশন।
কনক চম্পকাঙ্গুলি ঈষৎ হেলায়ে
হাসিয়া প্রীতির হাসি মধুর অধরে
জাগাইলা সুপ্ত বিশ্বে ধীরে আলিঙ্গিয়ে।
সঞ্জীবনী-সুধাধারা বরিষণ করে
সুধীরে মলয়া আসি ফুলবালাদলে
হাসাইলা নাচাইলা আপনি নাচিয়া।
নব রবিকর লভি' বিহঙ্গমকুলে
জাগিয়া আকুল সবে কুসুম চুমিয়া;
শাখে শাখে বসি' গাহে বিহঙ্গের কুল
ললিত ঝঙ্কার তান পঞ্চমে তুলিয়া।
হেরি' রবি প্রাণচ্ছবি আবেশে আকুল,
ফুটন্ত কমল হাসে আপনা ভুলিয়া;
চকিতে চমকি সবে ভয়াতুর-হিয়া
নিশাচর প্রাণী আর হিংস্র জন্তুগণ
ত্রস্তে পলাইল সবে আলো নিরখিয়া—
পুণ্য-তেজে পাপ যথা করে পলায়ন
মনে মনে ইষ্টদেবে করিয়া স্মরণ
ধীরে ধীরে সুপবিত্র সুপ্রভাত হেরি;
নিদ্রালস ত্যজি ত্বরা উঠি নরগণ
স্ব-স্ব কার্য্যে দিলা মন বিভুপদ স্মরি'।

* * *

ভগবন্!

নাহি জানি কবে মোর হৃদয়-আকাশে
উজলিবে জ্ঞানরূপী ওই দিবাকর
কবে বা গাইবে পাখী ফুটিবে কুসুম
তুলিয়া এ হাসি-মাঝে শান্তির লহর?
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি রিপুগণ
বল প্রভো কবে এই হৃদি হ'তে মম
নিশা-শেষে দিবালোক করি দরশন
পলাইয়ে যাবে সবে হিংস্র জন্তুসম—
করিব কর্ত্তব্য কর্ম্ম তবাদেশ স্মরি'
পদে পদে তব পদে করি' প্রণিপাত;—
বল প্রভো! এই মত কখনো আমার
হবে নাকি হায় নাথ! জীবন-প্রভাত।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

রাগিণী তোড়ি-ভৈরবী—তেতালা।

শুনিয়া তোমার অভয় বাণী ঘুচিল বেদনা-জ্বালা।
নিভিল সকল চিত্ত-দহন ফুটিল কুসুম-মালা।
দূরে গেল মোহ-তিমির-ভার ঘুচে গেল ভয় ছুটিল আঁধার,—
শান্তি-কমল শুভ্র-অমল করিল জীবন আলা।
সংসার-পথে পথে বিচরিব সুখে তোমারে ডাকিব ভয়ে দুখে শোকে
নির্ভয়ে আমি গাহি যাব গান, জীবন পায়ে দিব ডালা।
আজ, দুঃখ নাহি মোর, বেদন নাহি, আনন্দে আজি সবা মুখ চাহি
আনন্দে আমি তব গান গাহি গাঁথি হৃদি ফুল-মালা॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

১ ২´ ৩ ০
[দা র্সা র্সণা -া দপ মপা মা -া ॥
II { ণা সা দা দা I পা -া -া পা। পা ণা দা -পা। মজ্ঞাঃ -া জ্ঞাঃ ঋসঃ।
শু নি য়া তো মা ০ ০ র অ ভ য় ০ বা০ ০ ণী ০০

১ ২´ ৩ ০
জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা]
। সা ঋা সা সা I ঋা -া -া মা। জ্ঞা -া -ঋা -া। সা -া -া -া } ।
ঘু চি ল বে দ ০ ০ না জ্বা ০ ০ ০ লা ০ ০ ০

১ ২´ ৩ ০
। ঋা সা ণা দা I দা -া দা -ণা। সা -া -া -রজ্ঞা। জ্ঞা রা মজ্ঞা -া।
নি ভি ল স ক ০ ল ০ চি ০ ০ ০ত্ত দ হ ন০ ০

১ ২´ ৩ ০
। ঋা সা সা সা I ঋা -া -া মা। জ্ঞা -া -ঋা -া। সা -া -া -া II
ফু টি ল কু সু ০ ০ ম মা ০ ০ ০ লা ০ ০ ০

অন্তরা।

১ ২´ ৩ ০
[দা দা]
II { পা পা মা মা I ণদা -া -া ণা। র্সা -া র্সা র্সা। ণা -র্সা -া -া।
দূ রে গে ল মো০ ০ ০ হ তি ০ মি র ভা ০ ০ র

১ ২´ ৩ ০
। ণা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I ঋা -া র্সা -া। ণা র্সা ঋা র্সা। ণা -া -া দা } ।
ঘু চে গে ল ভ ০ য় ০ ছু টি ল আঁ ধা ০ ০ র

১ ২´ ৩ ০
। পদণা -র্সঋা -া র্সা I র্সণা -র্সা র্সা র্সা। ণা -া -া দা। ণদা -া পা পা।
শা০০ ০ন্ ০ তি ক০ ০ ম ল শু ০ ০ ভ্র অ০ ০ ম ল

১ ২´ ৩ ০
। পা পা জ্ঞা জ্ঞা I মা -ণা দা -পা। মাঃ -জ্ঞা -ঋাঃ -াঃ। সা -া -া -া II
ক রি ল জী ব ০ ন ০ আ ০ ০ ০ লা ০ ০ ০

সঞ্চারী।

১ ২´ ৩ ০
II সা -া সা সা I সা -া সা -রা। জ্ঞা মা মা মা। মজ্ঞা -া মা -া।
সাং ০ সা র প ০ থে ০ বি চ রি ব সু ০ খে ০

১ ২´ ৩ ০
। জ্ঞা জ্ঞা -া রা I জ্ঞা -া জ্ঞা সা। ঋা মা জ্ঞা জ্ঞা। ঋা -া -া সা।
তো মা ০ রে ডা ০ কি ব ভ য়ে দু খে শো ০ ০ কে

১ ২´ ৩ ০
। সা -া দা দা I পা -া -া পা। পা ণা দা পা। পজ্ঞা -া -া া।
নি ০ র্ভ য়ে আ ০ ০ মি গা হি যা ব গাং ০ ০ ন্

১ ২´ ৩ ০
। মা -ণা দা পা I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা মা। জ্ঞা -া -ঋা -া। সা -া -া -া II
জী ০ ব ন পা য়ে দি ব ডা ০ ০ ০ না ০ ০ ০

আভোগ।

১ ২´ ৩ ০
II { পপা -া মা মা I ণদা -া -া ণা। ণর্সা -া র্সা ণা। র্সা -া -া -র্সা।
আজহঃ ০ খ না হি ০ ০ মোর বে ০ দ ন না ০ ০ হি

১ ২´ ৩ ০
। ণা র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা I র্ঋা -া -া র্সা। ণা র্সা র্ঋা র্সা। ণা -া -া দা }।
আ ন ন্ দে আ ০ ০ জি স বা মু খ চা ০ ০ হি

১ ২´ ৩ ০
। দা র্সা -ণ ণা I র্ঋা -া র্সা -া। ণা ণা ণা ণা। ণদা -া -া পা।
আ মন্ ০ দে আ ০ মি ০ ত ব গা ন গা ০ ০ হি

১ ২´ ৩ ০
। প্মা প্মা প্মা মা I প্ম -ণ্ম দা -পা। মাঃ -জ্ঞাঃ -ঋা -াঃ। সা -া -া -া II II
গা থি হৃ দি স্তু ০ ম ০ থা ০ ০ ০ না ০ ০ ০

চামর।

(পণ্ডিত শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

প্রাচীনকালে রাজাদিগের চামর ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়; ভোজরাজ যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে চামরকে রাজোপকরণের অন্তর্গত করিয়াছেন। জলজ ও স্থলজ, সাধারণতঃ চামরের এই দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। মেরু, হিমালয়, বিন্ধ্য, কৈলাস, মলয়, উদয়গিরি, অস্তাচল ও গন্ধমাদন এই সকল পর্ব্বতে যে সমস্ত চমরী সম্ভূত হয়, তাহাদের লোমই "চমর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতভেদে চমরের বর্ণগত পার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বরাহমিহির কেবল হিমালয় পর্ব্বতকেই চমরীর জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার বচনের অর্থ হইতে জানা যায় যে, চামর নির্ম্মাণের উপযুক্ত লোমের জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক হিমালয় পর্ব্বতের গুহাতে চমরীর সৃষ্টি হইয়াছে, এমত প্রসিদ্ধি আছে। এই চমরীদিগের লাঙ্গুলোৎপন্ন লোম ঈষৎ পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ এবং শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে।

দেবৈশ্চমর্য্যঃ কিল বালহেতোঃ সৃষ্টা হিমক্ষ্মাধরকন্দরেষু।
আপীতবর্ণাশ্চ ভবন্তি তাসাং কৃষ্ণাশ্চ লাঙ্গুলভবাঃ সিতাশ্চ॥
(৭১ অ। ১)

তিনি চমরীর গুণকথনপ্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্নেহ (তৈলাক্তের মত), মৃদুত্ব, লোমের বহুত্ব, নির্ম্মলতা, সংলগ্ন অস্থিমালার অল্পত্ব এবং শুক্লতা তাহাদের গুণসম্পদ।

স্নেহো মৃদুত্বং বহুবালতা চ বৈশদ্যমল্পাস্থিনিবন্ধনত্বম্।
শৌক্ল্যং চ তাসাং গুণসম্পদুক্তা............ (৭০। ২)

যুক্তিকল্পতরুতে চমরীগুলি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, ইহাদের লোমেরও নানা প্রকার দোষগুণ বিবেচিত হইয়াছে। এমন কি, দুষ্ট চামরের ব্যবহারে মৃত্যুর আশঙ্কা পর্য্যন্তও কথিত হইয়াছে।

জলজ চামর সমুদ্রজাত চমরীর লোম হইতে প্রস্তুত হয়, যুক্তিকল্পতরুতে ইহা কথিত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, লবণ-সমুদ্র প্রভৃতি সপ্ত সমুদ্রের অভ্যন্তরে নানা জাতীয় চমরী বাস করে; তাহাদের বিবর অতি বিস্তৃত। অনাবশ্যকবোধে সেই অপ্রীতিকর বিষয় উপেক্ষিত হইল।

সমুদ্রজাত চমরীর লোম কি উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যুক্তিকল্পতরুতে এই বিষয়ের একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আছে। পৌরাণিকের মতানুসারে জানা যায় যে, সমুদ্রজাত চমরীদিগের পুচ্ছ মকর প্রভৃতি জন্তু কর্ত্তৃক কৃত্ত (খণ্ডিত) হইলে, তীরবাসী পুণ্যশালী মানবগণ তাহা কখনও কখনও পাইয়া থাকেন। চামরদণ্ডের পরিমাণ সম্বন্ধে বরাহমিহির বলিয়াছেন যে, উহা সার্দ্ধ হস্ত, একহস্ত অথবা অরত্নি-সমান হইবে। উক্ত দণ্ড প্রশস্ত লক্ষণান্বিত কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত হইবে, তাহা আবার স্বর্ণের দ্বারা অথবা রূপার দ্বারা আচ্ছাদিত হইবে, এবং বিবিধ রত্নসন্নিবেশের দ্বারা ভূষিত হইবে; এইরূপ চামর রাজাদিগের হিতকর হয়।

অধ্যর্দ্ধহস্ত-প্রমিতোঽস্য দণ্ডো হস্তোঽথবাঽরত্নিসমোঽথবান্যঃ
কাষ্ঠাচ্ছুভাৎ কাঞ্চনরূপ্যগুপ্তাদ্রত্নৈশ্চ সর্ব্বৈশ্চ হিতায় রাজ্ঞাম্।

চামরদণ্ডের বর্ণ কাহার কিরূপ হইবে, তৎ-সম্বন্ধেও ঋষিযুগে একটা নিয়ম হইয়াছিল। গর্গঋষি উপদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, লাঠি, ছত্র, অঙ্কুশ প্রভৃতির দণ্ডের বর্ণ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পক্ষে যথাক্রমে পীত, লোহিত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে—

বিপ্রাণাং পীতবর্ণঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়াণান্তু লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতবর্ণশ্চ শূদ্রাণামসিতপ্রভঃ॥
দণ্ডঃ শুভপ্রদো জ্ঞেয়ো যষ্টিধ্বজাঙ্কুশাদিষু।
(ভট্টোৎপল-ধৃত)

বরাহমিহির বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের যষ্টি, ছত্র, অঙ্কুশ, বেত্র (বেতের ছড়ি), ধনু, বিতান, কুন্ত (বল্লম), ধ্বজ ও চামর ইহাদের দণ্ড যথাক্রমে পীতবর্ণ, পীতলোহিত বর্ণ, মধুর মত ঈষৎ পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে।

যষ্ট্যাতপত্রাঙ্কুশ-বেত্র চাপ-বিতান-কুন্ত-ধ্বজ-চামরাণাম্।
ব্যাপীততন্ত্রীমধুকৃষ্ণবর্ণা বর্ণক্রমেণৈব হিতায় তেষাম্॥

বরাহমিহিরের উক্তি হইতে ইহাও জানা যায় যে, চামরের দণ্ড-সম্বন্ধ পর্ব্ব-(গ্রন্থি)-সংখ্যানুসারে শুভাশুভ বিবেচনা হইত; তন্মধ্যে দুই হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত যুগ্মগ্রন্থির অশুভ ফল কথিত হইয়াছে। যথা—দুই পর্ব্বে মাতৃবিনাশ, চারি পর্ব্বে ভূমি-ক্ষয়, ছয়পর্ব্বে ধন-ক্ষয়, অষ্টপর্ব্বে কুলক্ষয়, দশপর্ব্বে রোগজনন, এবং দ্বাদশপর্ব্বে মরণ। বলা বাহুল্য যে,

এই নিয়ম কেবল চামরদণ্ডের পক্ষে নহে, যষ্টি প্রভৃতির পক্ষেও উহা বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে তিন হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত অযুগ্ম সংখ্যার শুভ ফল বিবেচিত হইয়াছে। যথা—তিন পর্ব্বে যাত্রায় জয় লাভ, পঞ্চপর্ব্বে শত্রুবিনাশ, সপ্তপর্ব্বে বহুলাভ, নবপর্ব্বে ভূমিলাভ, একাদশ পর্ব্বে চতুষ্পদের বৃদ্ধি এবং ত্রয়োদশ পর্ব্বে অভীষ্ট লাভ হয়। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ সংখ্যার অধিক সমবিষম সংখ্যায় সাধারণতঃ অশুভ এবং শুভ বিবেচনীয়।

মাতৃ-ভ্রাতৃ-ধন-কুলক্ষয়াবহা য়োগমৃত্যুজননাশ্চ পর্ব্বভিঃ।
দ্ব্যাদিভির্দ্বিকবিবর্দ্ধিতৈঃ ক্রমাৎ দ্বাদশান্ত-বিরতৈঃ সমৈঃ ক্রমাৎ॥
যাত্রাপ্রসিদ্ধির্দ্বিষতাং বিনাশো লাভাঃ প্রভূতা বসুধাগমশ্চ।
বৃদ্ধিঃ পশূনামভিবাঞ্ছিতাপ্তিস্ত্র্যাদেষ্বযুগ্মেষু তদীশ্বরাণাম্॥
(৭১।৫।৬)

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চামরের দণ্ড সম্বন্ধে অন্যপ্রকার ব্যবস্থা দেখা যায়। উক্ত গ্রন্থের মতে চামরের দণ্ড স্বর্ণ-নির্ম্মিত, রৌপ্যনির্ম্মিত, প্রবাল-নির্ম্মিত অথবা বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত হইবে; কিন্তু বৈদূর্য্য-প্রবাল-নির্ম্মিত চামরদণ্ডও সুবর্ণ শোভিত হওয়া আবশ্যক। ক্ষীরবৃক্ষ-কাষ্ঠের দ্বারাও চামরদণ্ড হইতে পারে; কিন্তু উহাকে সুবর্ণের দ্বারা অথবা রূপার দ্বারা আবৃত করিতে হয়। কাঞ্চননির্ম্মিত দণ্ড উৎকৃষ্ট রত্নের দ্বারা চিত্রিত হইলে উহা প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। চন্দনকাষ্ঠ গজদন্ত এবং (মহিষ প্রভৃতি পশুর) শৃঙ্গের দ্বারাও উপযুক্ত দণ্ড হইতে পারে। ইহার পরিমাণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, চামরদণ্ড অর্দ্ধহস্তের ন্যূন হইবে না, এবং দেড় হস্তের অধিক হইবে না। পুষ্কর পরশু-রামকে ইহাও বলিয়াছেন যে, রাজা কখনও রঞ্জিত (রং-করা) চামর ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু রাজার পুরোহিত, অমাত্য, দৈবজ্ঞ, মহিষী, যুবরাজ ও সৈন্য ইহাদের পক্ষে ঈষৎ পীতবর্ণ চামর এবং অন্যান্যের পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ চামর প্রশস্ত।

দণ্ডশ্চ চামরে কার্য্যো রুক্মরৌপ্যময়স্তথা।
প্রবালবৈদূর্য্যময়স্তথৈব কনকান্বিতঃ॥ ২
ক্ষীর-বৃক্ষস্য বা কার্য্যো রুক্মরূপ্যনিবন্ধনঃ।
রত্নৈঃ প্রশস্তৈশ্চিত্রো বা কাঞ্চনস্য প্রশস্যতে॥ ৩
চন্দনস্যাথ দন্তস্য শার্ঙ্গঃ কার্য্যো যথা ভবেৎ।
অর্দ্ধহস্তান্নচাপ্যূনস্ত্বধ্যর্দ্ধান্ন তথাধিকঃ॥ ৪
কর্ত্তব্যং চামরং রাজ্ঞো ন চ ভার্গব রঞ্জিতম্।৫
আপীতবর্ণং তু ভবেৎ প্রশস্তং সাংবৎসরামাত্যপুরোহিতানাম্।
নরেন্দ্রপত্নী-যুবরাজ-সৈন্যস্যান্যস্য শেষস্য জনস্য কৃষ্ণম্॥৬
(২য় খঃ। ১২ অঃ)

সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে চামর ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজাদিগের পার্শ্বে চামর আন্দোলিত হইত, এই বর্ণনা অনেক স্থলেই দৃষ্টিগোচর হয়। শিশুপালবধ কাব্য পাঠে জানা যায় যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে তদীয় ভবনাভিমুখে প্রস্থিত ভগবান কৃষ্ণের পার্শ্বে ভীমসেন কর্ত্তৃক সাগরফেন-পুষ্প সদৃশ চামর সঞ্চালিত হইয়াছিল (১৩।২০)। এই বর্ণনা হইতে ইহাও উপলব্ধ হয় যে, সেকালে চামরান্দোলন বিশিষ্ট ব্যক্তির অভ্যর্থনার একটা অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এক এক জন ভূপতির পরিচর্য্যার জন্য অনেকগুলি চামর-গ্রাহিণী নিযুক্ত হইত। কাদম্বরী পাঠে জানা যায়, রাজা শূদ্রক সভা ভঙ্গ করিয়া স্নানার্থ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে বহুসংখ্যক চামরগ্রাহিণী স্কন্ধদেশে চামর নিহিত করিয়া এদিক্ ওদিক্ ছুটা-ছুটি করিতেছিল। মেঘদূত-কাব্যে বারবিলাসিনী কর্ত্তৃক রত্নখচিত-দণ্ড-যুক্ত চামর গ্রহণ পূর্ব্বক লাস্য-নৈপুণ্য-প্রদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় (পূর্ব্বমেঘ ৩৬ শ্লোক)। বর্ত্তমান সময়েও ঢপ্‌ওয়ালী-দিগকে চামর-হস্তে গান করিতে দেখা যায়। দেবমূর্ত্তির পার্শ্বে চামরান্দোলন-পদ্ধতি অদ্যাপি অনেক স্থলেই দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং চামর রাজোপকরণ বলিয়া পরিগণিত হইলেও প্রয়োজনান্তরের সহিত উহার সম্পর্ক রহিয়াছে। এমন কি, চামর-বিশেষের বায়ুস্পর্শে অনেক প্রকার রোগের উপশম হয়, শাস্ত্রে এরূপ উপদেশও দেখা যায়।

যুক্তিকল্পতরুতেই বলা হইয়াছে, "অস্য বাতেন নশ্যেত্তু তৃষ্ণামূর্চ্ছামদোভ্রমঃ"। ইহার অর্থ (দধিসমুদ্র-জাত) এই চামরের বায়ুর দ্বারা তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মদরোগ ও ভ্রমরোগ বিনষ্ট হয়। এইরূপ অন্যান্য চামরেরও গুণবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ পরীক্ষালব্ধ গুণবিশেষের অনুরোধেই প্রথমতঃ চামর ব্যবহারের আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছিল। ইহার পরীক্ষা

ব্যাপারেও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থলজ চামর সুখদাহ্য; অর্থাৎ অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত হইবামাত্র অনায়াসেই পুড়িয়া যায়, এবং দহন সময়ে ইহার মিষ্ মিষ্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। জলজ চামর শীঘ্র দগ্ধ হয় না, এবং উহা হইতে প্রভূত ধূম নির্গত হইয়া থাকে। মসূরের জল প্রভৃতি দ্বারা বালুকাতে চামরের সংস্কার করিতে হয়। যদি চামরের দণ্ড কৃত্রিম বলিয়া প্রতিভাত হয়, তবে অষ্টসলিল কাথের দ্বারা তাহার সেই কৃত্রিমত্ব বিনষ্ট করার উপদেশ আছে। জাঙ্গল-দেশজাত রাজা যদি জলজ চামর ব্যবহার করেন, তবে অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার কুল, বীর্য্য, লক্ষ্মী, এবং আয়ু বিনষ্ট হয়। পক্ষান্তরে অনূপ-দেশজাত রাজা যদি স্থলজ চামর ব্যবহার করেন, তবে তাঁহারও আয়ুঃ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। সুতরাং পরীক্ষা করিয়া চামর ব্যবহার কর্ত্তব্য।

স্থলজং সুখদাহ্যং হি দাহে মিষমিষায়তে।
জলজং বহ্নিদুর্দাহ্যং মহান্তং ধূমমুদ্গিরেৎ॥
জলজং চামরং রাজা যো ধত্তে জাঙ্গলেশ্বরঃ।
তস্যাচিরাৎ কুলং বীর্য্যং লক্ষ্মীরায়ুশ্চ নশ্যতি॥
অনূপাধীশ্বরো রাজা যো বহেৎ স্থলজন্তথা।
তস্যৈতানি বিনশ্যন্তি লক্ষ্মীরায়ুর্যশো বলম্॥

যুক্তিকল্পতরু।

গীতা-রহস্য অথবা কর্ম্মযোগ-পরিশিষ্ট।

ভাগ ৬—গীতা ও বৌদ্ধগ্রন্থ।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত)

বর্ত্তমান গীতার কালনির্ণয়ের জন্য উপরে যে বৌদ্ধ-গ্রন্থের প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে, তাহার পূর্ণ গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য গীতা ও বৌদ্ধগ্রন্থ বা বৌদ্ধধর্ম্মের সাধারণ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধেও এখানে একটু বিচার করা আবশ্যক। গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ প্রবৃত্তি-মার্গেরই অনুসরণ করেন—ইহাই গীতাধর্ম্মের বিশেষত্ব, ইহা পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি। কিন্তু এই বিশেষ গুণটিকে ক্ষণকাল একপাশে রাখিয়া, এইরূপ পুরুষের কেবল মানসিক ও নৈতিক গুণসমূহেরই বিচার করিলে, গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ (গী. ২. ৫৫, ৭২) ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ (৪. ১৯-২৩; ৫. ১৮-২৮) এবং ভক্তিযোগী পুরুষের (১২. ১৩-১৯) যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই সব লক্ষণ এবং নির্ব্বাণ-পদের অধিকারী অর্হৎদিগের অর্থাৎ পূর্ণ অবস্থায় উপনীত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থে যে সকল লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে সেই সব লক্ষণ—এই উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সাম্য আছে দেখিতে পাওয়া যায় (ধম্মপদ শ্লো. ৩৬০-৪২৩ ও সুত্তনিপাতের মধ্যে মুনি-সুত্ত ও ধম্মিকসুত্ত দেখ)। অধিক-কি, এই বর্ণনাসমূহের শব্দসাম্য হইতে দেখা যায় যে, স্থিতপ্রজ্ঞ এবং ভক্তিমান ব্যক্তির সমানই প্রকৃত ভিক্ষুও 'শান্ত' 'নিষ্কাম', 'নির্ম্মম', 'নিরাশী' (নিরিস্‌সিত), 'সমদুঃখসুখ', 'নিরারম্ভ', 'অনিকেতন', বা 'অনিবেশন' অথবা 'সমনিন্দাস্তুতি', এবং 'মানাপমান ও লাভালাভে সমদর্শী' হইয়া থাকে (ধম্মপদ ৪০. ৪১ ও ৯১; সুত্তনি. মুনিসুত্ত. ১. ৭ ও ১৪; দ্বয়তানুপস্সনসুত্ত ২১-২৩; ও বিনয়পিটক চুল্লবগ্‌গ. ৭. ৪. ৭ দেখ)। জ্ঞানী পুরুষের নিকট যাহা! আলোক অজ্ঞানের নিকট তাহাই অন্ধকার, দ্বয়তানুপস্সন সুত্তের ৪০ শ্লোকের এই বিচার "যা নিশা সর্ব্বভূতানং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী" (গী. ২. ৬৯) গীতার এই বিচারের অনুরূপ; এবং "অরোসনেয্যো ন রোসেতি"—অর্থাৎ নিজেও কষ্ট পায় না, অন্যকেও কষ্ট দেয় না, মুনিসুত্তের ১০ শ্লোকের এই বর্ণনা গীতার "যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ" (গী. ১২. ১৫) এই বর্ণনার সদৃশ। সেইরূপ আবার, সল্ল-সুত্তের "যাহার জন্ম তাহারই মৃত্যু" এবং "ভূতদিগের আদি ও অন্ত অব্যক্ত হওয়ায় তাহার শোক করা বৃথা" (সল্লসুত্ত. ১ ও ৯ এবং গী. ২. ২৭ ও ২৮) ইত্যাদি বিচার অল্প শব্দভেদে গীতার বিচার। গীতার দশম অধ্যায়ে কিংবা অনুগীতায় (মভা. অশ্ব. ৪৩. ৪৪) "জ্যোতিষ্মান্‌দিগের মধ্যে সূর্য্য, নক্ষত্রদিগের মধ্যে চন্দ্র, বেদমন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী" ইত্যাদি যে বর্ণনা আছে তাহাই অবিকল সেলসুত্তের ২৭ ও ২২ শ্লোকে এবং মহাবগ্‌গে (৬. ৩৫. ৮) প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ছোট-খাটো শব্দসাদৃশ্য ও অর্থসাদৃশ্য ৺ তৈলং স্বকীয় গীতার ইংরাজী ভাষান্তরের টিপ্পনীতে দেখাইয়াছেন। তথাপি প্রশ্ন উঠে যে, এই সাদৃশ্য কিরূপে উৎপন্ন হইল? এই বিচার মূলে বৌদ্ধদিগের, বা বৈদিক ধর্ম্মের? এবং ইহা হইতে কি অনুমান হয়? কিন্তু প্রশ্নসমূহের নির্ণয় করিবার জন্য সে সময়ে যে সাধন পাওয়া গিয়াছিল, তাহা অপূর্ণ থাকায় উপরি-উক্ত আশ্চর্য্য শব্দ-সাদৃশ্য ও অর্থসাদৃশ্য প্রদর্শন অপেক্ষা আর বেশী কিছু এই বিষয়ে তিনি লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল অধিক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে

বলিয়া এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি। ৺তৈলং-কৃত গীতার ইংরাজী ভাষান্তর যাহা 'প্রাচ্যধর্ম্মগ্রন্থমালায়' প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে পরে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থসমূহের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বিষয় প্রায় সেই সকল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং প্রমাণার্থ উপস্থাপিত বৌদ্ধগ্রন্থের স্থলনির্দ্দেশও এই সকল ভাষান্তরেরই অনুযায়ী করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে পালীশব্দ ও বাক্য মূল পালী গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

এই কথা এখন নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধ হইয়াছে যে, জৈনধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মও আপন বৈদিক ধর্ম্মরূপ পিতারই পুত্র, যে নিজের সম্পত্তির অংশ লইয়া কোন কারণে পৃথক হইয়া গিয়াছে; অর্থাৎ উহা পরকীয় নহে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে এখানে যে ব্রাহ্মণধর্ম্ম ছিল, উহারই এখানে উৎপন্ন এক শাখা। সিংহলদ্বীপের মহাবংস কিংবা দীপবংসাদি পুরাতন পালীগ্রন্থে, বুদ্ধের পরবর্ত্তী রাজাদিগের ও বৌদ্ধ আচার্য্য-পরম্পরার যে বর্ণন আছে, তাহা হইতে হিসাব করিয়া দেখিলে নিষ্পন্ন হয় যে,— ৮০ বৎসর বয়সে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে, গৌতমবুদ্ধের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইহাতে কতকগুলি কথা অসম্বদ্ধ আছে; এইজন্য প্রোঃ মোক্ষমূলর এই গণনাসম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া বুদ্ধের প্রকৃত নির্ব্বাণকাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৩ অব্দে হইয়াছিল বলিয়াছেন; এবং ঐ কালই অশোকের শিলালিপি হইতে সিদ্ধ হয় ইহা বুহ্লরও দেখাইয়াছেন। তথাপি প্রোঃ রিজ-ডেভিড্‌স্ এবং ডাঃ কের্ণ-এর ন্যায় কোন কোন তত্ত্বানুসন্ধানী, ইহা অপেক্ষা ৬৫ ও ১০০ বৎসর আরও পরের দিকে হটাইতে চাহেন। প্রোঃ গায়গর সম্প্রতি এইসমস্ত মতের বিচার করিয়া খৃঃ পূঃ ৪৮৩ * অব্দকে বুদ্ধের নির্ব্বাণকাল স্থির করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে কালই স্বীকার কর না কেন, বুদ্ধের জন্ম হইবার পূর্ব্বেই বৈদিকধর্ম্ম পূর্ণাবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, এবং শুধু উপনিষদ্ নহে, কিন্তু ধর্ম্মসূত্রের ন্যায় গ্রন্থও তাহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল, ইহা নির্ব্বিবাদ। কারণ, পালী ভাষার প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থসমূহেই লিখিত আছে যে, "চারি বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ইতিহাস ও নিঘণ্টু" প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগকে এবং জটাধারী তপস্বীদিগকে গৌতম বুদ্ধ তর্ক করিয়া আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন (সুত্তনিপাতের মধ্যে সেলসুত্তের সেলের বর্ণনা ও বথ্থু গাথা ৩০-৩৫)। কঠাদি উপনিষদে (কঠ. ১. ১৮; মুণ্ড. ১. ২. ১০), এবং উহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া গীতায় (২. ৪০-৪৫; ৯. ২০, ২১) যাগ-যজ্ঞাদি শ্রৌতকর্ম্মের যেরূপ লঘুতা বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ এবং কোন কোন অংশে সেই সকল শব্দেরই দ্বারা তেবিজ্জসুত্তে (ত্রৈবিদ্য সূত্রে) বুদ্ধও স্বমতানুসারে 'যাগযজ্ঞাদিকে' অনুপযোগী ও ত্যাজ্য স্থির করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ যাহাকে 'ব্রহ্মসহব্যতায়' (ব্রহ্মসহব্যত্যয় = ব্রহ্ম-সাযুজ্যতা) বলেন সেই অবস্থা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নিরূপণ করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, ব্রাহ্মণধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—কিংবা গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও সন্ন্যাসধর্ম্ম, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—এই দুই শাখা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হইবার পর, তাহার সংস্কার সাধন করিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সংস্কার-সাধনের সাধারণ নিয়ম এই যে, উহাতে পূর্ব্বের কোন কোন বিষয় বজায় থাকে এবং কোন কোন বিষয় পরিবর্ত্তিত হয়। তাই এই নিয়মানুসারে, বৌদ্ধধর্ম্মে বৈদিকধর্ম্মের কোন্ কোন্ কথা বজায় রাখা হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার বিচার করিব। এই বিচার গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও সন্ন্যাস এই দুইয়ের পৃথক পৃথক দৃষ্টিতে করিতে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম মূলে সন্ন্যাসমার্গীয় কিংবা নিবৃত্তিপ্রধানই হওয়ায় প্রথমে দুইয়ের সন্ন্যাসমার্গের বিচার করিয়া তাহার পর উভয়ের গার্হস্থ্যধর্ম্মের তারতম্যের উপর বিচার করিব।

বৈদিক সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিলে উপলব্ধি হইবে যে, কর্ম্মময় জগতের সমস্ত ব্যবহার তৃষ্ণামূলক সুতরাং দুঃখময়; উহা হইতে অর্থাৎ জন্ম-মরণের ভবচক্র হইতে আত্মার চিরমুক্তি সাধনের জন্য মনকে নিষ্কাম ও বিরক্ত করিয়া উহাকে দৃশ্য জগতের মূলে অবস্থিত আত্ম-স্বরূপ নিত্য পরব্রহ্মে সমাধান পূর্ব্বক সাংসারিক কর্ম্মসকল সর্ব্বথা ত্যাগ করা উচিত; এই আত্মনিষ্ঠ অবস্থাতেই সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকা সন্ন্যাসধর্ম্মের মুখ্য তত্ত্ব। দৃশ্যজগৎ নামরূপাত্মক ও নশ্বর; এবং তাহার অখণ্ডিত ব্যাপার কর্ম্মবিপাক প্রযুক্তই বরাবর বজায় আছে।

কম্মনা বত্ততী লোকো কম্মনা বত্ততী পজা (প্রজা)।
কম্মনিবন্ধনা সত্তা (সত্ত্বানি) রথস্সাণীব যায়তো॥

অর্থাৎ "কর্ম্মের দ্বারাই লোক ও প্রজা বজায় আছে; চলতি গাড়ী যেরূপ রথের কীলকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেইপ্রকার প্রাণীমাত্র কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছে"

---

* প্রোঃ মোক্ষমূলর স্বকীয় ধম্মপদের ইংরেজী ভাষান্তরের প্রস্তাবনায় বুদ্ধের নির্ব্বাণকালসম্বন্ধীয় বিবরণ দিয়াছেন S. B. E. Vol. X. Intro. pp. xxxv-xiv এবং ডাঃ গায়গর ১৯১২ অব্দে প্রকাশিত স্বীয় মহাবংসের ভাষান্তরের প্রস্তাবনায় উহার সমালোচনা করিয়াছেন—তাহা দেখ (The *Mahavamsa* by Dr. Geiger Pali Text Society, Intro p. xxiif).

(সুত্তনি. বাসেঠসুত্ত. ৬১)। বৈদিকধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ডের উক্ত তত্ত্ব, অথবা জন্ম-মরণের চক্র বা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহেশ্বর, ঈশ্বর, যম, প্রভৃতি অনেক দেবতা ও উঁহাদের বিভিন্ন স্বর্গপাতালাদি লোকসমূহের ব্রাহ্মণধর্ম্মে বর্ণিত অস্তিত্ব বুদ্ধের মান্য ছিল; এবং সেইজন্যই নামরূপ, কর্ম্মবিপাক, অবিদ্যা, উপাদান ও প্রকৃতি প্রভৃতি বেদান্ত বা সাংখ্য-শাস্ত্রের শব্দ ও ব্রহ্মাদি বৈদিক দেবতাদিগের কথাও (বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়া) ন্যূনাধিক ভেদে বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। দৃশ্য জগৎ নশ্বর ও অনিত্য এবং উহার ব্যবহার কর্ম্মবিপাকনিবন্ধন চলিতেছে, ইত্যাদি কর্ম্মজগৎসংক্রান্ত বৈদিক ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত বুদ্ধের মান্য হইলেও নামরূপাত্মক নশ্বর জগতের মূলে নামরূপের অতিরিক্ত আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মের সমান এক নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী বস্তু আছে, বৈদিক ধর্ম্মের সুতরাং উপনিষদের এই সিদ্ধান্ত বুদ্ধ স্বীকার করিতেন না। এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে ইহাই গুরুতর প্রভেদ। গৌতম বুদ্ধ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আত্মা বা ব্রহ্ম বস্তুত কিছু নাই—কেবল ভ্রম; তাই আত্মানাত্মবিচারে বা ব্রহ্মচিন্তনের গোলযোগে পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করা কাহারও উচিত নহে (সব্বাসবসুত্ত. ৯-১৩ দেখ)। আত্মার সম্বন্ধে কোন প্রকার কল্পনাই বুদ্ধের মান্য ছিল না, ইহা দীঘনিকায়ের অন্তর্গত ব্রহ্মজালসুত্ত হইতেও স্পষ্ট প্রকাশ পায়।*

এই সকল সুত্তে প্রথমে বলা হইয়াছে যে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক কি দুই; আবার এই প্রকার ভেদেই বলিবার সম্বন্ধে আত্মার ৬২ প্রকার বিভিন্ন কল্পনার কথা বলিয়া এই সমস্তই মিথ্যা 'দৃষ্টি' বলা হইয়াছে; এবং মিলিন্দ-প্রশ্নেও বৌদ্ধধর্ম্মানুসারে "আত্মা বলিয়া কোন যথার্থ বস্তু নাই" এইরূপ নাগসেন গ্রীক মিলিন্দকে (Minander) স্পষ্ট বলিয়াছেন (মি. প্র. ২. ৩. ৬ ও ২. ৭. ১৫)। আত্মা ও তদ্বৎ ব্রহ্ম দুই ভ্রমই, সত্য নহে, এইরূপ স্বীকার করিলে তো ধর্ম্মের ভিত্তিই ধসিয়া যায়। কারণ, তাহলে তো সমস্ত অনিত্য বস্তুই অবশিষ্ট থাকে, এবং নিত্য সুখও থাকে না আর সেই সুখের ভোক্তাও কেহ থাকে না; এবং এই কারণেই তর্কদৃষ্টিতে এই মত শ্রীশঙ্করাচার্য্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু এখন আমাকে কেবল ইহাই দেখিতে হইবে যে, প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম কি, এইজন্য এই তর্ক এখানেই ছাড়িয়া দেখিব যে, বুদ্ধ স্বকীয় ধর্ম্মের কি উপপত্তি বলিয়াছেন। আত্মার অস্তিত্ব বুদ্ধের মান্য না হইলেও, (১) কর্ম্মবিপাক নিবন্ধন নামরূপাত্মক দেহকে (আত্মাকে নহে) নশ্বর জগতের প্রপঞ্চে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং (২) পুনর্জ্জন্মের এই চক্র বা সমস্ত সংসারই দুঃখময়, এই দুই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ একমত ছিলেন; ইহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া চিরন্তন শান্তি বা সুখ অর্জ্জন করা অত্যাবশক। এই প্রকার সাংসারিক দুঃখের অস্তিত্ব এবং তন্নিবারণের আবশ্যকতা, এই দুই বিষয় স্বীকার করিলে বৈদিক ধর্ম্মের এই প্রশ্নটি সমান থাকিয়া যায় যে, দুঃখ নিবারণ করিয়া অত্যন্ত সুখলাভের পন্থাটি কি, এবং তাহার কোন-না-কোন সন্তোষজনক ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়। উপনিষৎকারেরা বলিয়াছেন যে, যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা ভবচক্র হইতে মুক্তি লাভ করা যায় না এবং বুদ্ধ আরও একটু বেশী অগ্রসর হইয়া এই সমস্ত কর্ম্মকে হিংসাত্মক সুতরাং সর্ব্বথা ত্যাজ্য ও নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। সেইরূপ আবার, স্বয়ং 'ব্রহ্মকেই' এক মহা ভ্রম বলিয়া মনে করিলে, দুঃখনিবারণার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের মার্গকেও ভ্রান্তিমূলক ও অসম্ভব বলিয়া স্থির করিতে হয়। তাহা হইলে দুঃখময় ভবচক্র হইতে মুক্তিলাভের মার্গটি কি? বুদ্ধ ইহার উত্তর দিয়াছেন যে, কোন রোগ দূর করিতে হইলে সেই রোগের মূল কি তাহা স্থির করিয়া সেই মূল কারণকেই উন্মূলিত করিবার জন্য সংবৈদ্য যেরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সাংসারিক দুঃখের রোগ দূর করিবার জন্য (৩) তাহার কারণ অবগত হইয়া (৪) সেই কারণকেই দূর করিবার মার্গ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবলম্বন করিতে হইবে। এই কারণসমূহের বিচার করিলে দেখা যায় যে, তৃষ্ণা বা বাসনাই এই জগতের সমস্ত দুঃখের মূল; এবং এক নাম-রূপাত্মক দেহের নাশ হইলে, অবশিষ্ট এই বাসনাত্মক বীজ হইতেই অন্যান্য নামরূপাত্মক দেহ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং তাহার পর বুদ্ধ স্থির করিয়াছেন যে, পুনর্জ্জন্মের দুঃখময় সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধ্যান ও বৈরাগ্যের দ্বারা তৃষ্ণার সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু হওয়াই এক প্রকৃত মার্গ, এবং এই বৈরাগ্য-যুক্ত সন্ন্যাস হইতেই চিরন্তন শান্তি ও নিত্য সুখ লাভ করা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, যাগযজ্ঞাদির এবং আত্মানাত্ম-বিচারের গোলযোগে না পড়িয়া, নিম্নোক্ত চারি প্রত্যক্ষ বিষয়ের উপরেই বৌদ্ধধর্ম্ম খাড়া করা হইয়াছে—সাংসারিক দুঃখের অস্তিত্ব, তাহার কারণ, তাহার নিরোধ বা নিবারণ করিবার আবশ্যকতা, এবং উহা সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য বৈরাগ্য-রূপ সাধন; কিংবা বৌদ্ধ পরিভাষা অনুসারে অনুক্রমে দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ। নিজ ধর্ম্মের এই চারি

* ব্রহ্মজালসুত্তের ভাষান্তর ইংরেজীতে হয় নাই, কিন্তু তাহার সংক্ষিপ্ত সার রিস্-ডেভিড্স্ S. B. E. Vol XXVI Intro. pp, xxiii-xxv-এর মধ্যে দিয়াছেন—তাহা দেখ।

মূলতত্ত্বকে বুদ্ধ 'আর্য্যসত্য' নাম দিয়াছেন। উপনিষদের আত্মজ্ঞানের বদলে চারি আর্য্যসত্যের প্রত্যক্ষ ভিত্তির উপর এই প্রকারে বৌদ্ধধর্ম্মকে দাঁড় করাইলেও নিত্য শান্তি বা সুখ লাভ করিবার জন্য তৃষ্ণা কিংবা বাসনার ক্ষয় করিয়া যাহার দ্বারা মনকে নিষ্কাম করিতে হইবে, বুদ্ধের উপদিষ্ট সেই মার্গ (চতুর্থ সত্য), এবং মোক্ষলাভের জন্য উপনিষদের বর্ণিত মার্গ—এই দুই মার্গ বস্তুত একই হওয়ায়, দুই ধর্ম্মের চরম দৃশ্য সাধ্য মনের নির্ব্বিষয় অবস্থাই, ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে প্রভেদ এই যে, ব্রহ্ম ও আত্মাকে যাঁহারা এক বলিয়া মানেন সেই উপনিষৎকারেরা মনের এই নিষ্কাম অবস্থাকে 'আত্মনিষ্ঠা', 'ব্রহ্মসংস্থা', 'ব্রহ্মভূততা', 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' (গী. ৫.১৭-২৫; ছাং. ২.২৩.১), অর্থাৎ ব্রহ্মেতে আত্মার লয় হওয়া, ইত্যাদি চরম আধার সূচক নাম দিয়াছেন, এবং বুদ্ধ উহাকে কেবল 'নির্ব্বাণ' অর্থাৎ "বিরাম পাওয়া বা প্রদীপ নিভিবার ন্যায় বাসনার নাশ হওয়া" এই ক্রিয়াপ্রদর্শক নাম দিয়াছেন। কারণ, ব্রহ্ম বা আত্মা ভ্রম, ইহা বলিবার পর এই প্রশ্ন আর অবশিষ্ট থাকে না যে, "বিরাম কে পায়, ও কেমন করিয়া পায়" (সুত্তনিপাতে রতনসুত্ত ১৪ ও বঙ্গীসসুত্ত ১২ ও ১৩ দেখ); এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তির এই গূঢ় প্রশ্নের বিচারও করা উচিত নহে, ইহা বুদ্ধ স্পষ্ট বলিয়াছেন (সব্বাসবসুত্ত ৯-১৩ ও মিলিন্দপ্রশ্ন ৪.২.৪ ও ৫ দেখ)। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না, এই জন্য এক দেহের নাশ হইয়া অন্য দেহ প্রাপ্ত হইবার সাধারণ ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রযুক্ত 'মরণ' শব্দের উপযোগ বৌদ্ধধর্ম্মের অনুসারে 'নির্ব্বাণ' সম্বন্ধে করিতেও পারা যায় না। নির্ব্বাণ তো 'মরণের মরণ' কিংবা উপনিষদের বর্ণনা অনুসারে "মৃত্যু পার হইবার পথ"—শুধু মরণ নহে। সাপ যেরূপ আপন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করিতে ভয় পায় না, সেইরূপ এই অবস্থায় উপনীত মনুষ্য নিজের শরীরের জন্য ভাবে না, বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (৪.৪.৭) এই যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত বৌদ্ধভিক্ষুর বর্ণনা করিবার সময় সুত্তনিপাতের অন্তর্গত উরগসুত্তের প্রত্যেক শ্লোকে গৃহীত হইয়াছে। "আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাপপুণ্যে সর্ব্বদাই অলিপ্ত থাকায় (বৃ. ৪.৪.২৩) মাতৃবধ কিংবা পিতৃবধের সদৃশ পাতকেরও দোষ তাহাকে স্পর্শ করে না, বৈদিক ধর্ম্মের এই তত্ত্ব (কৌষী. ব্রা. ৩.১) ধম্মপদে শব্দশঃ যেমন-টি-তেমনি বলা হইয়াছে (ধম্ম. ২৯৪ ও ২৯৫ ও মিলিন্দপ্রশ্ন ৪.৫ ৭ দেখ)। সার কথা, ব্রহ্ম ও আত্মার অস্তিত্ব বুদ্ধ স্বীকার না করিলেও মনকে শান্ত, বিরক্ত ও নিষ্কাম করা প্রভৃতি মোক্ষলাভের যে সকল সাধন উনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল সাধনই বুদ্ধের মতে নির্ব্বাণলাভের পক্ষেও আবশ্যক, এই জন্য বৌদ্ধ যতি ও বৈদিক সন্ন্যাসীর বর্ণনা মানসিক অবস্থার দৃষ্টিতে একই রকমের; এবং সেই কারণে পাপপুণ্যের দায়িত্ব সম্বন্ধে, এবং জন্ম-মরণের চক্র হইতে মুক্তিলাভ বিষয়ে বৈদিক সন্ন্যাসধর্ম্মের সিদ্ধান্তই বৌদ্ধধর্ম্মেও বজায় রাখা হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক ধর্ম্ম গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায়, এই বিচার আসলে যে বৈদিক ধর্ম্মেরই, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

বৈদিক ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম্মের ভেদাভেদ কি, তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্বন্ধে বুদ্ধ কি বলিয়াছেন তাহা দেখা যাক্। আত্মানাত্মবিচারের তত্ত্বজ্ঞানকে প্রাধান্য না দিয়া সাংসারিক দুঃখের অস্তিত্ব প্রভৃতি দৃশ্য ভিত্তির উপরেই বৌদ্ধধর্ম্ম খাড়া করা হইলেও, মনে থাকে যেন, কোঁতের ন্যায় আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিছক্ আধিভৌতিক ধর্ম্মের সদৃশ—কিংবা গীতাধর্ম্মেরও মত—বৌদ্ধধর্ম্ম মূলে প্রবৃত্তিমূলক নহে। ইহা সত্য যে, উপনিষদের আত্মজ্ঞানের তাত্ত্বিক 'দৃষ্টি' বুদ্ধের মান্য নহে, কিন্তু "সংসার সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া মনকে নির্ব্বিষয় ও নিষ্কাম করাই এই জগতে মনুষ্যের একমাত্র পরম কর্ত্তব্য", বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত যাজ্ঞবল্ক্যের এই সিদ্ধান্ত (বৃ. ৪.৪.৬) বৌদ্ধধর্ম্মে সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখা হইয়াছে। এই জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম মূলে কেবল সন্ন্যাসপ্রধান হইয়াছে। সংসারকে ত্যাগ না করিয়া, কেবল গৃহস্থাশ্রমেই থাকিয়া, পরম সুখ ও অর্হতাবস্থা লাভ করা কখনই সম্ভব নহে, ইহাই বুদ্ধের সমস্ত উপদেশের তাৎপর্য্য; তথাপি ইহা বুঝিতে হইবে না যে, উহাতে গার্হস্থ্যবৃত্তির কিছুমাত্র বিচারই নাই। ভিক্ষু না হইয়া, বুদ্ধ, বুদ্ধের ধর্ম্ম ও বৌদ্ধভিক্ষুদিগের সংঘ বা মণ্ডলী—এই তিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি", এই সংকল্প উচ্চারণের দ্বারা যাহারা ঐ তিনের শরণাপন্ন হয়, বৌদ্ধগ্রন্থে তাহাদিগকে 'উপাসক' বলা হয়। ইহারাই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী গৃহস্থ। এই উপাসকেরা স্বকীয় গার্হস্থ্যবৃত্তি কিরূপে নির্ব্বাহ করিবে তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে স্বয়ং বুদ্ধ কোন কোন স্থানে উপদেশ করিয়াছেন (মহাপরিনিব্বাণসুত্ত. ১.২৪)। বৈদিক গার্হস্থ্যধর্ম্মের মধ্যে হিংসাত্মক শ্রৌত যাগযজ্ঞ ও চাতুর্ব্বর্ণ্যভেদ বুদ্ধ স্বীকার করিতেন না। এই বিষয়গুলি ছাড়িয়া দিলে, স্মার্ত্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ, দানাদি পরোপকারধর্ম্ম ও নৈতিক আচরণ করাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য থাকিয়া যায়; এবং গৃহস্থধর্ম্ম বর্ণনা করিবার সময়, বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে এই সকল বিষয়েরই উল্লেখ করা হইয়া থাকে। পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থ অর্থাৎ উপাসকের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে, ইহা বুদ্ধের মত। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, সর্ব্বভূতে দয়া ও (আত্মা স্বীকৃত না হইলেও) আত্মৌপম্যদৃষ্টি, শৌচ বা মনের পবিত্রতা, এবং বিশেষ করিয়া সৎপাত্রে অর্থাৎ বৌদ্ধভিক্ষুকে এবং বৌদ্ধ ভিক্ষু-সংঘকে অন্নবস্ত্রাদি দান করা প্রভৃতি নীতিধর্ম্মের পালন বৌদ্ধ উপাসককে করিতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম্মে ইহাকেই 'শীল' বলে; এবং দুয়ের তুলনা করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, পঞ্চমহাযজ্ঞের ন্যায় এই নীতিধর্ম্মও ব্রাহ্মণধর্ম্মের ধর্ম্মসূত্র এবং প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ (মনু. ৬.৯২ ও ১০.৬৩ দেখ) হইতে বুদ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন।* অধিক কি, স্বয়ং বুদ্ধ ব্রাহ্মণধম্মিকসুত্তে এই সকল আচার সম্বন্ধে পুরাতন ব্রাহ্মণদিগের স্তুতি করিয়াছেন; এবং মনুস্মৃতির কতক শ্লোক তো ধম্মপদে অক্ষরশ পাওয়া যায় (মনু. ২.১২১ ও ৫.৪৫

* See Dr. Kern's *Manual of Buddhism* (Grundriss III. 8) p. 68.

এবং ধম্মপদ ১০৯ ও ১৩১ দেখ)। বৈদিকগ্রন্থ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল পঞ্চমহাযজ্ঞ ও নীতিধর্ম্মই লইয়াছে তাহা নহে। গৃহস্থাশ্রমে সম্পূর্ণ মোক্ষলাভ কখনই হয় না, বৈদিকধর্ম্মে কোন কোন উপনিষৎকার প্রথমে এই মত প্রতিপাদন করেন; এবং এই মতও বুদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন, উদাহরণ যথা—সুত্তনিপাতের ধম্মিকসুত্তে ভিক্ষুর সঙ্গে উপাসকের তুলনা করিয়া বুদ্ধ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, উত্তম শীলের দ্বারা, গৃহস্থ বড় জোর 'স্বয়ংপ্রকাশ' দেবলোক প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু জন্মমরণের চক্র হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভের জন্য সংসার ও পুত্রকলত্রাদি ত্যাগ করিয়া শেষে উঁহাকে ভিক্ষু-ধর্ম্মই স্বীকার করিতে হইবে (ধম্মিকসুত্ত ১৭. ২৯; ও বৃ. ৪. ৪. ৬ ও মভা. বন. ২. ৬৩ দেখ)। তেবিজ্জসুত্তে বর্ণিত হইয়াছে (তে. সু. ১. ৩৫; ৩. ৫) যে, কর্ম্মমার্গীয় বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তর্ক করিবার সময়, আপনার উক্ত সন্ন্যাসপ্রধান মত সিদ্ধ করিবার জন্য বুদ্ধ "তোমার ব্রহ্মের যদি স্ত্রীপুত্র ও ক্রোধ-লোভ নাই, তবে স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে থাকিয়া ও যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম করিয়া তোমাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি কিরূপে হইবে?" এইপ্রকার যুক্তিবাদ করিতেন; এবং স্বয়ং বুদ্ধ যৌবনকালেই স্ত্রীপুত্র ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম অঙ্গীকার করিবার ছয় বৎসর পরে, তিনি বুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, এই কথাও প্রসিদ্ধ আছে। বুদ্ধের সমকালীন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বেই সমাধিপ্রাপ্ত, মহাবীর নামক শেষ জৈন তীর্থঙ্করেরও উপদেশ এইরূপই। কিন্তু তিনি বুদ্ধের ন্যায় অনাত্মবাদী ছিলেন না; এবং এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে একটা গুরুতর প্রভেদ এই যে, বস্ত্রপ্রাবরণাদি ঐহিক সুখত্যাগ এবং অহিংসা ব্রত প্রভৃতি ধর্ম্মপালন, এই ধর্ম্ম জৈন যতি বৌদ্ধভিক্ষু অপেক্ষা অধিক কড়াকড়িভাবে পালন করিত; এবং অদ্যাপি পালন করিয়া থাকে। আপনার আহারের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক মারা হয় নাই এইরূপ প্রাণীদিগের 'পবত্ত' (সং. প্রবৃত্ত) অর্থাৎ 'তৈয়ারী মাংস' (হাতী, সিংহ প্রভৃতি কোন কোন প্রাণীকে বর্জ্জন করিয়া) বুদ্ধ স্বয়ং খাইতেন এবং 'পবত্ত' মাংস ও মৎস্য বৌদ্ধভিক্ষুদিগকেও তিনি খাইতে অনুমতি দিয়াছেন; এবং বস্ত্র ব্যতীত নগ্ন হইয়া ভ্রমণ করা বৌদ্ধভিক্ষুধর্ম্মের নিয়মানুসারে দোষ (মহাবগ্গ ৬, ৩১. ১৪ ও ৮. ২৮. ১)। সারকথা, অনাত্মবাদী ভিক্ষু হও, ইহা বুদ্ধের নিশ্চিত উপদেশ হইলেও, কায়ক্লেশময় উগ্রতপ সম্বন্ধে বুদ্ধের অভিমত ছিল না (মহাবগ্গ ৫. ১. ১৬ ও গী. ৬. ১৬); বৌদ্ধভিক্ষুদিগের বিহারের অর্থাৎ তাহাদের থাকিবার জন্য নির্ম্মিত মঠের সমস্ত ব্যবস্থাও এরূপ রাখা হইত যাহাতে শরীরের বেশী কষ্ট না হয় এবং প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস সহজে হইতে পারে। তথাপি অর্হতাবস্থা কিংবা নির্ব্বাণসুখ প্রাপ্ত হইবার জন্য গৃহস্থাশ্রম ছাড়িতেই হইবে, এই তত্ত্ব বৌদ্ধধর্ম্মে পুরাপুরি বজায় থাকায় বৌদ্ধধর্ম্ম যে সন্ন্যাসপ্রধান, ইহা বলিতে কোন প্রত্যবায় নাই।

ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মানাত্ম-বিচার ভ্রমের একটা বড় জালমাত্র, ইহাই যদিও বুদ্ধের স্থির মত ছিল, তথাপি এই প্রত্যক্ষ কারণের জন্য অর্থাৎ দুঃখময় সংসারচক্র হইতে মুক্ত হইয়া নিরন্তর শান্তি ও সুখ লাভ করিবার জন্য বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নির্ব্বিষয় করা—এই যে উপনিষদে বর্ণিত সন্ন্যাসমার্গীদিগের সাধন—তাহা তাঁহার স্বীকৃত হইয়াছিল। এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যভেদ ও হিংসাত্মক যাগযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে বৈদিক গার্হস্থ্যধর্ম্মের নীতিনিয়মই অল্প হেরফেরে গৃহীত হইয়াছে, ইহা যখন সিদ্ধ হইল, তখন যদি উপনিষদ ও মনুস্মৃতি ইত্যাদি গ্রন্থে বৈদিক সন্ন্যাসীদিগের যে বর্ণনা আছে তাহা, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বা অর্হৎদিগের বর্ণনা অথবা অহিংসাদি নীতিধর্ম্ম, দুই ধর্ম্মে একই সমান—কখন কখন শব্দশঃও একই—দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, এই সমস্ত কথা মূল বৈদিক ধর্ম্মেরই। কিন্তু কেবল এই বিষয়গুলিই বৌদ্ধেরা বৈদিকধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করে নাই, প্রত্যুত দশরথজাতকের মত বৌদ্ধধর্ম্মের জাতকগ্রন্থও প্রাচীন বৈদিক পুরাণ ইতিহাস কথার বৌদ্ধধর্ম্মানুকূল করিয়া রচিত রূপান্তরমাত্র। শুধু বৌদ্ধেরা কেন, জৈনেরাও স্বকীয় অভিনব পুরাণসমূহে বৈদিক কথাসকলের এইরূপ রূপান্তর করিয়াছে। খৃষ্টের পর আবির্ভূত মহম্মদীয় ধর্ম্মে খৃষ্টচরিত্রের এইরূপ এক বিপর্য্যয় করা হইয়াছে, ইহা সেল সাহেব * লিখিয়াছেন। আধুনিক গবেষণা হইতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, বায়বলের পুরাতন অঙ্গীকারের অন্তর্গত সৃষ্টির উৎপত্তি, প্রলয় ও নোয়া প্রভৃতির কথা, প্রাচীন খাল্দীয় জাতির ধর্ম্মকথার এইরূপ রূপান্তর করিয়া ইহুদীরা বর্ণনা করিয়াছে। উপনিষৎ, প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র ও মনুস্মৃতিতে বর্ণিত কথা কিংবা বিচার যখন বৌদ্ধগ্রন্থে এইরূপ—অনেক সময় একেবারে শব্দশ—গৃহীত হইয়াছে, তখন সহজেই এই অনুমান হয় যে, ইহা আসলে মহাভারতেরই। বৌদ্ধগ্রন্থকারেরা এই সকল উহা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া থাকিবেন। বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থের যে ভাব ও শ্লোক বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহার কয়েকটা উদাহরণ প্রদত্ত হইল—"জয়ের দ্বারা বৈরতা বৃদ্ধি হয়; এবং বৈরতা দ্বারা বৈরতার উপশম হয় না" (মভা. উদ্যো. ৭১. ৫৯ ও ৬৩), "অন্যের ক্রোধকে শান্তির দ্বারা জয় করিবে" ইত্যাদি বিদুরনীতির উপদেশ (মভা. উদ্যো. ৩৮. ৭৩), এবং জনকের এই "আমার এক বাহু চন্দনে চর্চ্চিত করা ও অন্য বাহু কাটিয়া ফেলা আমার নিকট উভয়ই সমান" (মভা. শাং. ৩২০. ৩৬); ইহার অতিরিক্ত মহাভারতের আরও অনেক শ্লোক বৌদ্ধগ্রন্থে শব্দশ পাওয়া যায় (ধম্মপদ ৫ ও ২২৩ ও মিলিন্দপ্রশ্ন ৭. ৩. ৫)। ইহা নিঃসন্দেহ যে, উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও মনুস্মৃতি প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ বুদ্ধাপেক্ষা প্রাচীন, তাই উহাদের যে সকল শ্লোক বা বিচার বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাদের বিষয়ে নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, বৌদ্ধগ্রন্থকারেরা সেগুলি উক্ত বৈদিক গ্রন্থ হইতেই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এই কথা মহাভারতের বিষয়ে বলিতে পারা যায় না। মহাভারতেই বৌদ্ধ 'ডাগোবাদিগের' যে উল্লেখ আছে, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহাভারতের শেষ সংস্করণ বুদ্ধের পরে হইয়াছে। অতএব কেবল শ্লোকসাদৃশ্য হইতে স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে, বর্ত্তমান মহাভারত

* See Sale's *Koran*, "To the Reader" (Preface) p. xx and the Preliminary Discourse, Sec. IV. p. 58(Chandos Classics Ed.)

বৌদ্ধগ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং গীতা মহাভারতেরই এক অংশ হওয়ার ঐ ন্যায়ই গীতাসম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। তাছাড়া; গীতাতেই ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে এবং ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধমতের খণ্ডন আছে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা প্রভৃতির (বৈদিক ও বৌদ্ধ) উভয়ের সাদৃশ্য ছাড়িয়া দিয়া এখানে বিচার করিব যে, উক্ত সংশয় দূর করিবার এবং গীতাকে নির্ব্বিবাদরূপে বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে প্রাচীন প্রমাণিত করিবার জন্য বৌদ্ধগ্রন্থে অন্য কোন সাধন পাওয়া যায় কি না।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূল স্বরূপ নিছক নিরাত্মবাদী ও নিবৃত্তি-মূলক, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। কিন্তু উহার এই স্বরূপ বেশী দিন টিকে নাই। ভিক্ষুদিগের আচার-সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিল এবং বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাহার মধ্যে কেবল অনেক উপপন্থাই গঠিত হইতে আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ মতভেদ উৎপন্ন হইল। আজকাল কেহ কেহ এই তর্কও করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, 'আত্মা নাই' এই উক্তি দ্বারা এই কথা বলাই বুদ্ধের মনোগত অভিপ্রায় যে, "অচিন্ত্য আত্মজ্ঞানের শুষ্ক তর্কের মধ্যে না গিয়া বৈরাগ্য ও অভ্যাসের দ্বারা মনকে নিষ্কাম করিতে প্রথমে চেষ্টা কর, আত্মা থাক্ বা নাই থাক্; মনোনিগ্রহের কাজই মুখ্য এবং তাহা সিদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রথমে করা আবশ্যক''; ব্রহ্ম বা আত্মার আদৌ অস্তিত্ব নাই এরূপ বলা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। কারণ, তেবিজ্জসুত্তে স্বয়ং বুদ্ধ 'ব্রহ্মসহব্যতায়' অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেলসুত্তে ও থের-গাথাতে "আমি ব্রহ্মভূত" এইরূপ তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন (সেলসু. ১৪; থেরগা. ৮৩১ দেখ)। কিন্তু মূল কারণ যাহাই হোক, ইহা নির্ব্বিবাদ যে, এই প্রকার নানাবিধ মত, তর্ক ও উৎসাহী পন্থা তত্ত্বজ্ঞান-দৃষ্টিতে রচিত হইয়া প্রচার করিতেছিল যে, "আত্মা বা ব্রহ্মের মধ্যে কোন নিত্য বস্তুই জগতের মূলে নাই, যাহা কিছু দেখা যায় তাহা ক্ষণিক বা শূন্য" অথবা "যাহা কিছু দেখা যায় তাহা জ্ঞান, জ্ঞান-ছাড়া জগতে কিছুই নাই" ইত্যাদি (বেসূ. শাং ভা. ২. ২. ১৮—২৭ দেখ)। এই নিরীশ্বর ও অনাত্মবাদী বৌদ্ধ মতকেই ক্ষণিকবাদ, শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ বলা হয়। এই সমস্ত পন্থার এখানে বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রশ্ন—ঐতিহাসিক। তাই, উহার মীমাংসা পক্ষে মহাযান নামক পন্থার বর্ণনা যতটুকু আবশ্যক তাহাই এখানে করা হইতেছে। বুদ্ধের মূল উপদেশে আত্মা বা ব্রহ্মের (অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের) অস্তিত্বই অস্বীকৃত কিংবা গৌণ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় স্বয়ং বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে লাভ করিবার মার্গের উপদেশ করা সম্ভব ছিল না; এবং তাঁহার ভব্য মূর্ত্তি ও চরিত্র লোকদিগের চক্ষের সম্মুখে যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ ছিল সে পর্য্যন্ত এই মার্গের কোন আবশ্যকতাই ছিল না। কিন্তু পরে ইহা আবশ্যক হইল যে, এই ধর্ম্ম সাধারণ লোকের প্রিয় হউক এবং ইহার আরও বেশী প্রচারও হউক। অতএব সংসার ত্যাগ করিয়া ও ভিক্ষু হইয়া মনোনিগ্রহের দ্বারা স্বস্থানে থাকিয়াই নির্ব্বাণ লাভ করিবার—কিসে তাহা না বুঝিয়া—এই নিরীশ্বর নিবৃত্তিমার্গ অপেক্ষা কোন সহজ ও প্রত্যক্ষ-গোচর মার্গের প্রয়োজন হইল। খুব সম্ভব যে, সাধারণ বুদ্ধভক্তেরা তৎকালে প্রচলিত বৈদিক ভক্তিমার্গের অনুকরণ করিয়া, আপনারাই বুদ্ধের উপাসনা প্রথম-প্রথম আরম্ভ করিয়া থাকিবে। অতএব বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর শীঘ্রই বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বুদ্ধকেই "স্বয়ম্ভূ ও অনাদ্যনন্ত পুরুষোত্তমের" রূপ প্রদান করে; এবং তাহারা বলিতে লাগিল যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণ পাওয়াও বুদ্ধেরই লীলা; "প্রকৃত বুদ্ধের কখনও বিনাশ হয় না—তাঁহার অস্তিত্ব চিরস্থায়ী"। সেইরূপ আবার, বৌদ্ধগ্রন্থে প্রতিপাদিত হইতে লাগিল যে, প্রকৃত বুদ্ধ "সর্ব্বজগতের পিতা এবং লোকেরা তাঁহারই সন্তান" অতএব তিনি সকলের প্রতিই "সমদৃষ্টি, কাহাকেও তিনি প্রীতি করেন না, কাহাকেও তিনি দ্বেষও করেন না", "ধর্ম্মের ব্যবস্থা বিগড়াইয়া গেলে তিনি 'ধর্ম্ম কার্য্যের' জন্যই সময়ে সময়ে বুদ্ধের রূপে প্রকট হইয়া থাকেন", এবং এই দেবাদিদেব বুদ্ধের প্রতি ভক্তি করিলে তাঁহার গ্রন্থ পূজা করিলে এবং তাঁহার ডাগোবার সম্মুখে কীর্ত্তন করিলে" অথবা "তাঁকে ভক্তি-পূর্ব্বক দুই-চারি কমল বা একটী ফুল দিলেই" মনুষ্য সদ্গতিলাভ করে (সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক ২. ৭৭-৯৮; ৫. ২২; ১৫. ৫-২২ ও মিলিন্দপ্রশ্ন ৩. ৭. ৭ দেখ)।* মিলিন্দপ্রশ্নে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, "মনুষ্যের সমস্ত জীবিত-কাল দুরাচরণে অতিবাহিত হইলেও মৃত্যুসময়ে যদি সে বুদ্ধের শরণ লয়, তাহা হইলে তাহার স্বর্গলাভ না হইয়া যায় না'' (মি. প্র. ৩. ৭. ২); এবং সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে যে, সমস্ত লোকের "অধিকার, স্বভাব ও জ্ঞান একই প্রকার না হওয়ায়, অনাত্মপর নিবৃত্তিপ্রধান মার্গ ব্যতীত ভক্তির এই মার্গ (যান) বুদ্ধই কৃপা করিয়া স্বকীয় 'উপায় কুশলতা দ্বারা' নির্ম্মাণ করিয়াছেন''। নির্ব্বাণাবস্থা প্রাপ্তির জন্য ভিক্ষুধর্ম্মকেই স্বীকার করিতে হইবে, বুদ্ধ স্বয়ং এই যে ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, ইহা একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না; কারণ, তাহা করিলে বুদ্ধের মূল উপদেশেই হরিতাল লাগানো হইত। কিন্তু ইহা বলা কিছু অনুচিত ছিল না যে, ভিক্ষু হইল তো কি হইল, অরণ্যে 'গণ্ডারের' মত একাকী ও উদাসীনভাবে না থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচারাদি লোকহিতকর ও পরোপকার-কার্য্য 'নিরিস্সিত' বুদ্ধিতে করাই বুদ্ধ-ভিক্ষুদের কর্ত্তব্য; † এই মতই মহাযান পন্থার সদ্ধর্ম্ম-পুণ্ডরীকাদি গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং নাগসেন মিলিন্দাকে বলিয়াছেন যে, "গৃহস্থাশ্রম নির্ব্বাহ করিয়া নির্ব্বাণপদ লাভ করা একেবারেই অসম্ভব নহে,—এবং ইহার অনেক উদাহরণও আছে" (মি. প্র. ৬. ২, ৪)। ইহা যে-কোন-লোকের সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, এই বিচার অনাত্মবাদী ও নিছক্ সন্ন্যাস-প্রধান মূল বৌদ্ধধর্ম্মের নহে, অথবা শূন্যবাদ বা বিজ্ঞান-বাদ স্বীকার করিয়াও ইহার উপপত্তি জানা যায় না;

---

* 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক' গ্রন্থের প্রাচ্যধর্ম্মপুস্তকমালার ২১ খণ্ডে ভাষান্তর হইয়াছে। এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এক্ষণে মূল সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থও ছাপা হইয়াছে।

† সুত্ত-নিপাতে খগ্গ-বিসাণসুত্তের ৪১ শ্লোকের ধ্রুবপদ "একো চরে খগ্গবিসান কপ্পো" এইরূপ আছে। খগ্গবিসাণ অর্থাৎ গণ্ডার, এবং উহারই ন্যায় বৌদ্ধ ভিক্ষুর বনে একাকী বাস করিতে হয়, উহার এই অর্থ।

এবং প্রথম প্রথম অধিকাংশ বৌদ্ধধর্ম্মীর নিজেদেরই মনে হইত যে এই বিচার বুদ্ধের মূল উপদেশের বিরুদ্ধ। কিন্তু আবার এই নূতন মতটিই স্বভাবত অধিকাধিক লোকপ্রিয় হইতে লাগিল; এবং বুদ্ধের মূল উপদেশ অনুসারে যাহারা চলিত তাহাদের নাম হইল "হীনযান" (হাল্কা মার্গ) এবং এই নূতন পন্থার নাম হইল 'মহাযান' (বড় মার্গ)। * চীন, তিব্বৎ ও জাপান প্রভৃতি দেশে আজকাল যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহা মহাযানপন্থার; এবং বুদ্ধের নির্ব্বাণের পরে মহাযানপন্থী ভিক্ষু-সংঘের দীর্ঘ উদ্যোগেই বৌদ্ধধর্ম্মের এত শীঘ্র বিস্তার হয়। বৌদ্ধধর্ম্মে এই যে সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, তাহা শালিবাহন শকের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া থাকিবে এইরূপ ডাঃ কের্ণ স্থির করিয়াছেন। † কারণ, শক-রাজা কনিষ্কের শাসনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যে এক মহাপরিষৎ বসিয়াছিল উহাতে মহাযানপন্থার ভিক্ষুরা উপস্থিত ছিল, এইরূপ বৌদ্ধ-গ্রন্থে উল্লেখ আছে। এই মহাযানপন্থার 'অমিতায়ুসূত্ত' নামক প্রধান সূত্রগ্রন্থের চিনীয় ভাষায় ভাষান্তর প্রায় ১৪৮ খৃষ্টাব্দে করা হয়; তাহা এখন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার মতে, এই কাল ইহা হইতেও প্রাচীন হইবে। কারণ, খৃঃ পূঃ প্রায় ২৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত অশোকের শিলালিপিতে সন্ন্যাস-মূলক নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ ভাবে কোনই উল্লেখ নাই; উহাতে সর্ব্বত্র প্রাণীমাত্রের প্রতি দয়াপর প্রবৃত্তিমূলক বৌদ্ধধর্ম্মই উপদিষ্ট হইয়াছে। তখন ইহা সুস্পষ্ট যে, তৎপূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান পন্থার প্রবৃত্তিপ্রধান স্বরূপ আসিতে আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধ যতি নাগার্জ্জুন এই পথের মুখ্য প্রবর্ত্তক ছিলেন, মূল সংস্থাপক নহে।

ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া, উপনিষদের মতানুসারে কেবল নিবৃত্তিমার্গের মনকে নির্ব্বিষয় করিবার উপদেশ যে গ্রহণ করিয়াছে, সেই মূল নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই পরে ক্রমশ স্বাভাবিকভাবে ভক্তিপর প্রবৃত্তিমার্গ বাহির হওয়া কখনও কি সম্ভব ছিল; এই জন্য বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর, শীঘ্রই বৌদ্ধধর্ম্ম যে এই কর্ম্মপ্রধান ভক্তির স্বরূপ প্রাপ্ত হইল, ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, ইহার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের বাহিরের তৎকালীন কোন-না-কোন অন্য কারণ থাকিবে; এবং এই কারণের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবদ্গীতার উপর দৃষ্টি না পড়িয়া থাকিতে পারে না। কারণ, ভারতবর্ষে তৎকালে প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে জৈনধর্ম্ম ও উপনিষদ্ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তিপরই ছিল; এবং বৈদিক ধর্ম্মান্তর্গত পাশুপত কিংবা শৈব প্রভৃতি পন্থা ভক্তিপর হইলেও প্রবৃত্তিমার্গ ও ভক্তির মিল ভগবদ্গীতা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যাইতেছিল না, ইহা আমি গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি। গীতায় ভগবান আপনাকে পুরুষোত্তম এই নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এই বিচার ভগবদ্গীতাতেই আসিয়াছে যে, "আমি পুরুষোত্তমই সমস্ত লোকের 'পিতা' ও 'পিতামহ' (৯. ১৭); আমার নিকট সকলেই সমান ('সম'), আমার কেহ দ্বেষ্যও নাই, কেহ প্রিয়ও নাই (৯. ২৯); আমি অজ ও অব্যয় হইয়াও ধর্ম্মসংরক্ষণার্থ সময়ে সময়ে অবতার ধারণ করি (৪. ৬-৮); মনুষ্য যতই দুরাচারী হোক্ না, আমাকে ভজিতে আরম্ভ করিলে সে সাধু হইয়া যায় (৯. ৩০), কিংবা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ফুল, পত্র কিংবা একটু জলও দিলে আমি তাহা সন্তোষের সহিত গ্রহণ করি (৯. ২৬); এবং অজ্ঞলোকের জন্য ভক্তি এক সুলভ মার্গ" (১২. ৫); ইত্যাদি। এই প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির লোকসংগ্রহার্থ প্রবৃত্তিধর্ম্মকেই স্বীকার করা কর্ত্তব্য, এই তত্ত্ব গীতা ছাড়া অন্য কোথাও সবিস্তার প্রতিপাদিত হয় নাই। তাই, এইরূপ অনুমান অগত্যা করিতে হয় যে, মূল বৌদ্ধধর্ম্মে যেরূপ বাসনাক্ষয়ের নিছক্ নিবৃত্তিপর মার্গ উপনিষৎ হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেইরূপ পরে মহাযানপন্থা বাহির হইলে পর উহাতে প্রবৃত্তিপ্রধান ভক্তিতত্ত্বও ভগবদ্গীতা হইতেই গৃহীত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই কথাটা কেবল যে অনুমানেই অবলম্বিত হইয়া আছে তাহা নহে। তিব্বতীয় ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মী তারানাথের যে এক গ্রন্থ আছে তাহাতে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে, মহাযানপন্থার মুখ্য প্রবর্ত্তকের অর্থাৎ "নাগার্জ্জুনের গুরু রাহুলভদ্র নামক বৌদ্ধ প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং এই ব্রাহ্মণের (মহাযানপন্থার) কল্পনা উদ্রেক করিবার কারণ জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ ও গণেশ হইয়াছিলেন"। ইহা ব্যতীত অন্য এক তিব্বতীয় গ্রন্থেও এইরূপ উল্লেখই পাওয়া যায়। *

---

* হীনযান ও মহাযান এই দুই পন্থার ভেদ-বর্ণনা-কালে ডাঃ কের্ণ বলেন—Not the Arhat who has shaken off all human feeling, but the generous, self-sacrificing, active Bodhisattva is the ideal of the Maha-yanists, and this attractive side of the creed has, more perhaps than anything else, contributed to their wide conquests, whereas S. Buddhism has not been able to make converts except where the soil had been prepared by Hinduism and Mahayanism,"—*Manual of Indian Buddhism*, P.c.69. Southern Buddhism অর্থাৎ হীনযান, মহাযানপন্থায় ভক্তিরও সমাবেশ হইয়াছিল। Mahayanism lays a great stress on devotion, in this respect as in many others harmonising with the current of feeling in India which led to the growing importance of *Bhakti*." *Ibid* p. 124.

† See Dr. Kern's *Manual of Indiau Buddhism*, pp. 6, 69 and 119. মিলিন্দ (মিনণ্ডর নামক গ্রীক রাজা) প্রায় খৃঃ পূঃ ১৪০ কিংবা ১৫০ অব্দে ভারতবর্ষের বায়ুকোণে ব্যাকট্রিয়া দেশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাকে নাগসেন বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন ইহা মিলিন্দপ্রশ্নে উক্ত হইয়াছে। মহাযানপন্থার লোকেরাই বৌদ্ধধর্ম্মের এই প্রচারকার্য্য করিত, তাই ইহা সুস্পষ্ট যে, মহাযানপন্থা তখন আবির্ভূত হইয়াছিল।

* See Dr. Kern's *Manual of Indian Buddhism*, p. 122. "He (Nagarjuna) was a pupil of the Brahmana Rahulabhadra, who himself was a Mahayanist. This Brahmana

তারানাথের গ্রন্থ প্রাচীন নহে, একথা সত্য ; কিন্তু উহার বর্ণনা প্রাচীন গ্রন্থের ভিত্তি ছাড়িয়া হয় নাই ইহা বলা বাহুল্য। কারণ, কোনও বৌদ্ধ গ্রন্থকার স্বকীয় ধর্ম্ম-পন্থার তত্ত্ব বলিবার সময়, কোন কারণ বিনা পরধর্ম্মের এই প্রকার উল্লেখ করিবে ইহা সম্ভবপর নহে। এইজন্য স্বয়ং বৌদ্ধগ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক এই বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ ভগবদ্গীতা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণোক্ত অন্য প্রবৃত্তিপর ভক্তিগ্রন্থ বৈদিক ধর্ম্মেই নাই ; অতএব ইহা হইতে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় যে, মহাযানপন্থার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই শুধু ভাগবতধর্ম্ম নহে, ভাগবতধর্ম্মসম্বন্ধীয় শ্রীকৃষ্ণোক্ত গ্রন্থ অর্থাৎ ভগবদ্গীতাও সে সময়ে প্রচলিত ছিল ; এবং ডাঃ কের্ণও এই মত সমর্থন করেন। গীতার অস্তিত্ব যখন বৌদ্ধধর্ম্মীয় মহাযানপন্থার পূর্ব্ববর্ত্তী স্থির হইল, তখন মহাভারতও উহার সঙ্গে ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বুদ্ধের মৃত্যুর পর সত্বরই তাঁহার মত সকল একত্র সংগ্রহ করা হইয়াছিল, ইহা বৌদ্ধগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু ইহা হইতে সিদ্ধ হয় না যে, বর্ত্তমান কালে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থও সেই সময়েই রচিত হইয়াছিল। মহাপরিনিব্বাণসুত্ত বর্ত্তমান বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু উহাতে পাটলিপুত্র নগর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহা হইতে প্রোফেসর রিস্‌-ডেভিড্‌স্ দেখাইয়াছেন যে, এই গ্রন্থ বুদ্ধের নির্ব্বাণের অন্যূন শত বৎসর পূর্ব্বেও বোধ হয় রচিত হয় নাই। এবং বুদ্ধের শত বৎসর পরে, বৌদ্ধধর্ম্মীয় ভিক্ষুদের যে দ্বিতীয় পরিষদের অধিবেশন হইয়াছিল, উহার বর্ণনা বিনয়পিটকের অন্তর্গত চুল্লবগ্‌গ গ্রন্থের শেষে দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় * যে, সিংহলদ্বীপের পালিভাষায় লিখিত বিনয়পিটকাদি প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ, এই পরিষদের পরে রচিত। এই বিষয়ে বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরাই বলিয়াছেন যে, অশোকের পুত্র মহেন্দ্র প্রায় খৃঃ পূঃ ২৪১ অব্দে সিংহল দ্বীপে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় এই গ্রন্থও সেখানে গিয়াছে, এবং তাহার প্রায় ১৫০ বৎসর পরে ইহা সেখানে সর্ব্বপ্রথম পুস্তকাকারে লিখিত হয়। এই গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিবার রীতি ছিল এবং তৎপ্রযুক্ত মহেন্দ্রের কাল হইতে উহাতে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, মনে করিলেও, কি প্রকারে বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণের পরে এই গ্রন্থ যখন সর্ব্বপ্রথম রচিত হয় তখন, অথবা পরে মহেন্দ্র বা অশোকের কাল পর্য্যন্ত, তৎকালে প্রচলিত বৈদিক গ্রন্থ হইতে ইহাতে কোন কিছুই গৃহীত হয় নাই? অতএব মহাভারত বুদ্ধের পরে হইলেও অন্য প্রমাণ হইতেও উহার, অলেক্‌জণ্ডর বাদ্‌শার পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩২৫ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধ হয় ; এই জন্য মনুস্মৃতির শ্লোকের ন্যায় মহাভারতের শ্লোকও মহেন্দ্রের সিংহলে নীত পুস্তকসমূহের মধ্যে পাওয়া সম্ভব। সার কথা, বুদ্ধের মৃত্যুর পরে তাঁহার ধর্ম্মের প্রসার হইতেছে দেখিয়া শীঘ্রই প্রাচীন বৈদিক গাথা ও কথা সমূহ মহাভারতে একত্র সংগ্রহ করা হয় ; উহার যে শ্লোক বৌদ্ধগ্রন্থে শব্দশঃ পাওয়া যায় তাহা বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা মহাভারত হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন, মহাভারতকার বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু যদি স্বীকার করা যায় যে, বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা এই সকল শ্লোক মহাভারত হইতে না লইয়া মহাভারতের আধারভূত কিন্তু এক্ষণে বিলুপ্ত তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থাদি হইতে লইয়া থাকিবেন ; এবং সেই জন্য মহাভারতের কালনির্ণয় উপর্য্যুক্ত শ্লোকসাদৃশ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি নিম্নোক্ত চারি বিষয় হইতে ইহা তো নিঃসন্দেহ সিদ্ধ হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মে মহাযান পন্থার প্রাদুর্ভাব হইবার পূর্ব্বে কেবল ভাগবতধর্ম্মই প্রচলিত ছিল না, বরং সে সময় ভগবদ্গীতাও সর্ব্বমান্য হইয়াছিল, এবং এই গীতারই আধারেই মহাযানপন্থা বাহির হইয়াছে, এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রণীত গীতার তত্ত্ব বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হয় নাই। ঐ চারিটী বিষয় হইতেছে—(১) নিছক অনাত্মবাদী ও সন্ন্যাসপ্রধান মূল বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেই পরে ক্রমশ স্বাভাবিকভাবে ভক্তিপ্রধান ও প্রবৃত্তিপ্রধান তত্ত্ব বাহির হওয়া অসম্ভব, (২) মহাযান পন্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বয়ং বৌদ্ধ গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের নাম স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন, (৩) মহাযান পন্থার মতের সহিত গীতার ভক্তিপর ও প্রবৃত্তিপর তত্ত্বের অর্থতঃ ও শব্দশঃ সাদৃশ্য, এবং (৪) বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই তৎকালে প্রচলিত অন্যান্য জৈন ও বৈদিক পন্থায় প্রবৃত্তিপর ভক্তিমার্গের অভাব। উপর্য্যুক্ত প্রমাণসমূহ হইতে বর্ত্তমান গীতার যে কালনির্ণয় করিয়াছি তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে।

---

was much indebted to sage Krishna and still more to Ganesha. This quasi-historical notice, reduced to its less allegorical expression, means that Mahayanism is much indebted to the Bhagabadgita and more even to Shivaism." 'গণেশ' শব্দে ডাঃ কের্ণ শৈবপন্থা বুঝিয়াছেন এইরূপ মনে হয়। ডাঃ কের্ণ, প্রাচ্যধর্ম্মপুস্তক-মালায় সদ্ধর্মপুণ্ডরীকগ্রন্থের ভাষান্তর করিয়াছেন এবং তাহার প্রস্তাবনায় এই মতই তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন (S. B. E. Vol. XXI. Intro. pp. xxv-xxviii.)

* See S. B. E. Vol. XI. Intro. pp. xv-xx and p. 58.

আসামের পারিবারিক ও সামাজিক চিত্র।

(আসাম-পর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

(১)

আসামদেশীয় মহিলারা সাধারণতঃ দুইখানি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একখানির নাম "মেখলা" (বৃহৎ কাপড়ের ঘেরবিশেষ), ও অপরখানি "রীহা" নামে অভিহিত। কটিদেশ হইতে পদমূল আবৃত রাখিবার জন্য তাঁহারা মেখলা ও কটিদেশ হইতে গলদেশ আবরণার্থ রীহা পরিধান করিয়া থাকেন। এই রীহাগুলি দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ অন্যূন সাত হাত। মুখমণ্ডলে অবগুণ্ঠনের আবশ্যক হইলে তাহা রীহা

দ্বারাই সমাধান হয়। যখন তাঁহারা সমাজে যান, তখন আর একখানি স্বতন্ত্র বস্ত্র পরিধান করত গাত্রাবরণ করিয়া থাকেন। ঐ বস্ত্রখানি রীহার স্থানাভিষিক্ত হইয়া ঘোমটার কার্য্যও করে।

আসাম "মুগা ও এড়ি"র জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। মুগা দেখিতে অনেকাংশে তসরের ন্যায়। আসামদেশীয় মহিলারা উহার দ্বারা স্ব স্ব গৃহে এই রীহা ও মেখলা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এড়ির সূতা মোটা বলিয়াই উহার দ্বারা তাঁহারা প্রধানতঃ শীত-বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকেন। তাঁতের সাহায্যে এ অঞ্চলের সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোকেরা ধুতি, শাড়ী, গায়ের চাদর (থলিয়া)ও গামছা বয়ন করেন। ইহা তাঁহাদিগের অন্যতম গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। বিলাতী বস্ত্র-মোহ এখানকার ললনা-দিগের উপর এখনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এমন কি, সম্ভ্রান্ত মহিলারা ও সূতা কাটিয়া বস্ত্রবয়ন করিতে কিছুমাত্র অপমান বোধ করেন না। বাঙ্গালা দেশে পাত্রী দেখার সময় যেমন কুমারীর হস্তাক্ষর পরীক্ষা হয়, আসাম-দেশে তেমনই কুমারী-কৃত মেখলা, রীহা, শাড়ী, চাদর ও রুমাল পরীক্ষা হয়। এখানকার রমণীরা সীবন-কার্য্যেও সিদ্ধহস্ত। তৎপ্রসূত শিল্পকলার পরিপাট্য এরূপ শোভন যে, উহা দর্শন মাত্রেই বিদেশীয়গণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। মহাত্মা গান্ধী বিগত আগষ্ট মাসে আসাম অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান পর্য্যটন করিয়া তদীয় সাপ্তাহিক "ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকা"য় "Lovely Assam" শীর্ষক প্রবন্ধে শতমুখে ইঁহাদের শিল্প-চাতুর্য্যের যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন তাহাতে প্রতীতি হয় যে, তিনি ভারতের কুত্রাপি বামাহস্তে এরূপ শিল্পচাতুর্য্য অবলোকন করেন নাই।

কোন উৎসব অথবা বিবাহের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে সঙ্গতিপন্ন গৃহের মহিলারা পট্টবস্ত্রের কিংবা সিখা-পের রীহা ও মেখলা পরিধান করিয়া থাকেন। সিখাপের মূল্য অন্যূন ১০০৲ একশত টাকা হইবে; ইহা কারুকার্য্য সমন্বিত।

যে সকল আয়তি (সধবা) নগর ও উহার উপকণ্ঠে বাস করেন, তাঁহারা কপালে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে সিন্দুরের টিপ পরেন মাত্র। কিন্তু পল্লী-গ্রামের স্ত্রীলোকেরা কেবল সিঁথায় সিন্দুর দেন। অসমীয়ারা (১) ইহাকে "শিরোট সিন্দুর" বলে। এতদ্ব্যতীত পল্লীগ্রামের বধূ ও আয়তিদিগকে কপালে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সিন্দুররেখা ধারণ করিতেও দেখা যায়। অসমীয়ারা এই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিকে "রেখা" বলেন।

(১) অসমীয়া—আসামের অধিবাসীকে "অসমীয়া" বলা হয়।

আজকাল ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে এবং বঙ্গ-মহিলাদিগের দেখাদেখি সহরের শিক্ষিত লোকের মেয়েরা জ্যাকেট, সেমিজ, ব্লাউন প্রভৃতি পরিধান করিতেছেন। গ্রামে কেবলমাত্র জ্যাকেট ও শাড়ী ঢুকিয়াছে। পূর্ব্বে তাঁহারা শাড়ী ঘৃণা করিতেন। তবে তাহাও বেশী দিন নহে।

বঙ্গনারীরা যে ধরণে মস্তকে খোপা বাঁধেন, ইঁহাদের খোপা সে ধরণের নয়। বাঙ্গালীর মেয়েরা চিরুণী দিয়া চুলগুলি উত্তমরূপে আঁচড়াইয়া বিন্যাস করিবার পর উহার গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত ফিতা দিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধেন; তৎপরে উহা বিনুণী করত মাথায় ঐ চুলগুচ্ছের খোপা বাঁধা হয়। চুল বাঁধিবার জন্য আসামদেশীয় কোন রমণীকে ফিতা ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। লেখকও উহা ব্যবহার করিতে দেখেন নাই। চুল দিয়াই তাঁহারা খোপা বাঁধিয়া থাকেন। আধুনিক-কালে সহরবাসী বাঙ্গালীর মেয়েরা যেমন "ফিরিঙ্গি খোপা, পিরিলি খোপা" ইত্যাদি বিজাতীয় হাল-ফ্যাসানের উদ্ভট ধরণের খোপা-বাঁধা ধরিয়াছেন, এখানকার মেয়েদিগকেও আজকাল তেমনি নূতন নূতন ঢংয়ের আমদানীতে অন্যান্য ধরণে খোপা করিতে দেখা যায়। মাথায় চিরুণী গুঁজিবার প্রথা আসামদেশে কস্মিনকালে ছিল না—এখনও নাই।

(২) অলঙ্কার।

এখানকার স্ত্রীলোকেরা হাতে বলয় (বালা) ধারণ করেন। তাঁহাদিগকে অনন্ত (তাগা) ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি-দিগের কন্যারা বিবাহের সময় "খাড়ু" হাতে দেন। এই খাড়ুর মূল্য ন্যূনপক্ষে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা। যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল নহে, কন্যার বিবাহকালে দেশীয় প্রথানুযায়ী সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য অন্যত্র হইতে "খাড়ু" আনিয়া তাঁহাদিগের কন্যাকে উহা পরিতে দিয়া থাকেন।

আসামে "বিড়ি" নামক অলঙ্কার খুব প্রচলিত। এখানকার অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের কন্যারা কাণে "থুরিয়া" নামক এক প্রকার অলঙ্কার সচরাচর পরিয়া থাকেন। এই থুরিয়াগুলি স্বর্ণ-নির্ম্মিত; ইহাতে মূল্যবান প্রস্তর বসান থাকে। নিম্নশ্রেণীর রমণীদিগকে "জাংফাইন" নামক ধাতুর "কেরু" ব্যবহার করিতেও দেখা যায়।

অন্যান্য স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে (২) এখানকার

(২) পূর্ব্বে বলিয়াছি তাঁহারা চিরুণীর ব্যবহার মোটেই করেন না। লেখক দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত "বিদেটী" নামক স্থান হইতে দুই ক্রোশ দূরে অরণ্যমধ্যস্থ এক অসভ্য "মিরি" পল্লীতে ঐ জাতীয় স্ত্রী-পুরুষদিগকে কাষ্ঠনির্ম্মিত চিরুণী পরিধান করিতে দেখিয়াছিলেন।

রমণীরা কণ্ঠে "গজেরা ও বেণা" নামক অলঙ্কার ধারণ করেন। এই গজেরাতে পাথর বসান থাকে। কেহ কেহ গজেরার পরিবর্ত্তে "ধুকধুকি" নামক অলঙ্কার ব্যবহার করেন। গলদেশে "বেণা" নামক যে অলঙ্কার ব্যবহার করা হয় তাহাতে "মিনা" নামক সবুজবর্ণ ধাতু বসান থাকে। এতদ্ব্যতীত আসামদেশীয় মহিলাগণের মধ্যে "করিয়া" নামক কর্ণালঙ্কার, "গলপোতা" নামক কণ্ঠাভরণ ও অন্যান্য অলঙ্কারের প্রচলনও দেখা যায়। বাহুল্যভাভয়প্রযুক্ত তাহাদের উল্লেখ করা হইল না।

(৩) বিহু।

বিহু আসামদেশের একটি সামাজিক উৎসব। ইহা কতকটা বঙ্গদেশের বিষুব ও পৌষপার্ব্বণের ন্যায় বলা যাইতে পারে। মাঘমাসের বিহুর পূর্ব্বদিন বালকগণের মধ্যে ধুমধামের সহিত একটা ভোজ হয়। ইহার জন্য তাহারা আপনাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে চাঁদা তুলিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। গ্রামের বৃদ্ধ ও বয়ঃস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদ সম্ভোগার্থ অর্থসাহায্য করিয়াও থাকেন। বিহুর প্রত্যেক দিনই বিশেষতঃ চৈত্রমাসের বিহু-পার্ব্বণ উপলক্ষে অসমীয়াগণ গীত-বাদ্য করে। এই উৎসবটী চৈত্র, আশ্বিন ও পৌষ এই তিন মাসের তিন সংক্রান্তিতে বৎসরে তিন বার হয়। যে-কোন বিহুর দিনে রাত্রে ব্যতীত দিবাভাগে কেহই অন্ন গ্রহণ করে না। ঐদিন দ্বিপ্রহরে পিষ্টক অথবা অন্যান্য জলযোগ (সিক্ত চিপিটকাদি) করাই দেশীয় প্রথা।

চত বা বহাগবিহু।

চৈত্রমাসের সংক্রান্তিতে যে বিহুর পরোয়া হয়, তাহার নাম "চত বা বহাগ বিহু"। ইহাকে "রঙ্গালি বিহু"ও বলা হয়। রঙ্গ শব্দের অর্থ আনন্দ। এই বিহু চৈত্রমাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ হইয়া বৈশাখ মাসের ৭ সাত দিন পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে।

"রঙ্গালী" বিহুর প্রথম দিনকে "গরুবিহু" বলা হয়। ঐদিন এখানকার গৃহস্থেরা তাহাদের গো-সমূহের শৃঙ্গে তৈল মাখাইবার পর উহাদের মাথায় "কলাই" সহ মর্দ্দিত হরিদ্রা লেপন করিয়া থাকে। এই লেপন-কার্য্য সচরাচর বাটীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তৎপরে ঐ গরুগুলিকে স্নান করাইয়া দিবার জন্য নদীতে লইয়া যাওয়া হয়। বাটীর ছেলেরাও ঐ সময় উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নদীতে যাইয়া নিরতিশয় হর্ষসহকারে সন্তরণ ও ছুটাছুটী করিয়া কতই আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুক করিয়া থাকে। অতঃপর তাহারা গরুগুলিকে বাড়ীতে আনিয়া পরিতোষরূপে খাওয়াইয়া উহাদের পুরাতন দড়িগুলি ফেলিয়া দেয়, এবং উহাদিগকে নূতন রজ্জুতে বন্ধন করে। "তরা" নামক এক জাতীয় ঘাসের দ্বারা ঐ রজ্জু প্রস্তুত করত উহা-দ্বারা গরুগুলিকে বন্ধন করা দেশীয় প্রথা। ঐ দিন সন্ধ্যায় গোয়ালঘরের দরজায় ধুঁয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিনের বিহুকে অসমীয়ারা "মানুহবিহু" বলেন। ঐদিন তাঁহারা আত্মীয়-স্বজনকে ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। তৃতীয় দিন তাঁহাদের "গোঁহাই বিহু"। ঐদিন বিশেষরূপে গৃহদেবতার পূজা দেওয়া হয়। দেবালয় হইতে গ্রামের মধ্যে যেখানে ঠাকুর লইয়া যাওয়া হয়, সেখানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

৺দুর্গা-পূজোপলক্ষে নূতন বস্ত্র পরিধান করা বঙ্গীয় হিন্দুদিগের যেমন একটী প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়; আসামদেশেও "রঙ্গালী বিহু" উপলক্ষে বালক-বালিকগণ তেমনই নূতন বস্ত্র-পরিধান করিয়া থাকে। এই বস্ত্র তাহারা কখনও বাজার হইতে ক্রয় করে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি আসামের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে কি উচ্চ শ্রেণীর, কি নিম্ন-শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা তাঁতে কাপড় বুনিয়া থাকেন। এ কারণ রঙ্গালী বিহুর কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদিগকে তাঁত লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। এই উৎসব উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনদিগকেও উপহারস্বরূপ নূতন বস্ত্র দেওয়া হয়। এই উপহার "বিহন" নামে অভিহিত। যাঁহার বস্ত্র দিবার সামর্থ্য নাই তিনি অন্ততঃ একখানি নূতন গামছা দিয়া আপনার সম্মান অনেকটা বজায় রাখেন।

বহাগ বিহুতে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে খাওয়া লওয়া অপেক্ষা আমোদ-আহ্লাদ, নৃত্যগীত অধিক হয়। অসমীয়ারা ইহাকে "হুচাং" বলে। ঐদিন বৈকালে নিভৃত প্রান্তরে অথবা জঙ্গলের মধ্যস্থ উন্মুক্ত স্থানে অসমীয়া যুবতিগণ একত্র হইয়া নৃত্যগীত করিয়া থাকেন। কুমারী ও অবিবাহিত যুবকগণ এই নাচের অধিকারী। অনেক সময় এই আসরে পরস্পরের মনোমিল হইলেই বিবাহের সূত্রপাত হয়। যে-সকল যুবক-যুবতি এ মিলনে তাহাদের অভিভাবকের সম্মতি পাইবে না মনে করে, তাহারা পলাইয়া গিয়া কোন আত্মীয়ের বাটীতে উপস্থিত হয় এবং সেখানে তাহাদের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক্ষণে অসমীয়াগণ এরূপ প্রথার বিরোধী হওয়ায় ক্রমশঃ উহা কমিয়া যাইতেছে। আশ্বিন মাসে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জনান্তে "শান্তি জল" গ্রহণ করিবার পর বঙ্গীয় হিন্দুগণ পরস্পরে যেমন কোলাকুলি, নমস্কার ও প্রণাম করত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ও প্রদান করিয়া থাকে "চত বা বহাগ বিহু"তে আসামে তদ্রূপ প্রথা প্রচলিত

দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি—বিহু উৎসব আসামে আধুনিক নহে। তথাকার প্রাচীন অধিবাসী কাছাড়ী, মিরি প্রভৃতি জাতিও এই উৎসব উপলক্ষে আনন্দে মাতোয়ারা হয়।

কাছাড়ীরা "চত বহাগ বিহু"র পরোয়া অতি সমাদরে অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহাদের এই পরোয়ার চিহ্ন একটী সুদীর্ঘ বংশদণ্ড। উহার অগ্রভাগে বস্ত্র জড়াইয়া ও তৎনিম্নে নিশান বাঁধিয়া গ্রামের বহির্ভাগে একটী বৃক্ষপার্শ্বে ঐ দণ্ডটী পুতিয়া বহু সংখ্যক কাছাড়ী যুবক, যুবতি, বালক, বালিকা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ উহার চতুর্দ্দিকে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া নৃত্যগীত করত আমোদে আত্মহারা হইয়া পড়ে।

কাতি বা কাঙ্গালী বিহু।

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে যে বিহু হয় তাহার নাম "কাতি বা কাঙ্গালী বিহু"। এই বিহুতে তেমন ধুমধাম হয় না। কাতি বিহুর উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলসী বৃক্ষ রোপণ ও পূজা। সন্ধ্যার সময় এই সদ্যরোপিত তুলসী বৃক্ষের তলায় প্রদীপ দেওয়া হয় ও সকলে মিলিয়া "নাম গান" অর্থাৎ কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত করে। এই সঙ্গীত গীত হইবার জন্য প্রত্যেক গ্রামেই এক একটী করিয়া পৃথক ঘর আছে। ইহার নাম "নাম ঘর"। বহাগ বিহুতে স্কুল আফিস প্রভৃতি অনেক দিনের জন্য বন্ধ থাকে, কিন্তু কাতি বিহু উপলক্ষে কেবল এক দিনের জন্য বন্ধ হয়।

পৌষ সংক্রান্তির বিহু।

পৌষ সংক্রান্তিতে অসমীয়ারা যে বিহুর অনুষ্ঠান করে উহা "মাঘ বিহু" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। মাঘ বিহুর পূর্ব্ব-দিবস রাত্রে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতি সকলে একত্র হইয়া "লগ ভাত" খায়। "লগ" শব্দের অর্থ "সঙ্গ"। সকলে এক সঙ্গে মিলিয়া খায় বলিয়া ইহার নাম "লগ ভাত"। গ্রাম্য বালকেরা পৌষ-সংক্রান্তির বিহু উৎসবের আট নয় দিন পূর্ব্বে মাঠে ঘর বাঁধিয়া ঢোল ও অন্যান্য বাদ্য-যন্ত্র লইয়া পরস্পর আমোদ করিবার জন্য সেইখানেই রাত্রিবাস করে। পৌষ সংক্রান্তির দিনে তাহারা ঐ গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া আনন্দে মাতিয়া থাকে।

গ্রন্থ পরিচয়।

শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন ঘোষ প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তক কয়েকখানি সমালোচনার জন্য আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

"জীবন-সংগ্রাম" দ্বিতীয় সংস্করণ—এই পুস্তকখানি পাঠে আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। ভুবন বাবু একজন ৭৩ বৎসরের প্রবীণ লেখক; তাঁহার এই দীর্ঘকালব্যাপী জীবনের বহুদর্শিতার ফল এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং পুস্তকখানিতে পড়িবার, বুঝিবার ও শিখিবার অনেক আছে। এই পুস্তকখানি সময়োচিত এবং ইহা যুবা, বৃদ্ধ, পুরুষ, স্ত্রী, সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার উপযুক্ত। ইহার নায়ক নরেন্দ্রনাথ একজন কর্ম্মবীর। তাঁহার উদ্যমশীল চরিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক উপাধিধারী যুবকবৃন্দের আদর্শ। এইরূপ পুস্তক বঙ্গের প্রতিগৃহে থাকিলে আমরা সুখী হইব। সিল্ক ও কাপড়ে বাঁধাই মূল্য যথাক্রমে ২॥০ ও ২৷০।

চিত্র—ইহা একখানি গল্পের বহি। ইহার গল্পগুলি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

পারিজাত—ইহা একখানি কবিতা পুস্তক। প্রায় সকল কবিতই মধুর ও হৃদয়রঞ্জক। ইহার পারিজাত নাম সার্থক হইয়াছে।

দ্বিনবতিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় মহর্ষি-দেবের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা-সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

বিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

মাঘ, ব্রাহ্মসংবৎ ৯২

৯৪২ সংখ্যা

১৮৪৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাঘোৎসবের উদ্বোধন।

এতদিন ধরিয়া যে পবিত্র পুরুষের, যে প্রাণারাম পরমেশ্বরের সান্নিধ্য উপভোগ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, আজ সেই পরম পুরুষ এই উৎসবক্ষেত্রে আমাদের পবিত্র মঙ্গল আরতি শুনিবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত। আজ তাঁহার পবিত্র সংস্পর্শ লাভ করিবার সুন্দর অবসর উপস্থিত। আজ এই উৎসবের মুখে আমাদের সকলের প্রাণমন সেই বিশ্বপিতা অখিলমাতার চরণস্পর্শ করিবার উপযুক্ত হইয়া উঠুক; সুনীল গগন-প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া কোটী কোটী সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র দিবানিশি যাঁহার আরতি করিতেছে, আমাদের মঙ্গল আরতি সেই দেবাধিদেবের চরণবন্দনার উপযুক্ত হউক। আজ এই ব্রহ্মোৎসবের প্রদোষে আমাদের হৃদয়মন মধুময় হউক, দিকসকল প্রসন্ন হউক, রবির কিরণ মধুময় হউক, নিশীথের শিশিরধারা মধুময় হউক। আমাদের হৃদয় হইতে নিরাশা নিরানন্দ বিদূরিত হউক। ভগবানের করুণা শান্তিধারায় নামিয়া দেশকে শীতল করুক।

দেশের চারিদিকে বিপদের ঘন অন্ধকার যে প্রকার ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা তো আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে; অশান্তি অমঙ্গলের কণ্টকরাশি যে ভাবে নির্ব্বিচারে চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে, তাহাও তো আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই সমস্ত মৃত্যুর ছায়া প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া প্রাণ আতঙ্কিত হয় বটে, মন বিকল হইয়া পড়ে বটে। কিন্তু আজ এই উৎসবের দিনে সেই ঘন অন্ধকার, সেই বিপদরাশি, সেই সমস্ত অশান্তি অমঙ্গল, সেই সমস্ত কণ্টকরাশি, সে সকলই অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মোৎসবের আনন্দে আমাদের প্রাণমন ঢালিয়া দিতে হইবে; শান্তিসমুদ্র অতিগভীর পরমাত্মাতে আত্মা সমাহিত করিয়া ব্রহ্মোৎসবকে সার্থক করিতে হইবে।

জগন্মাতার নিকট ছুটিয়া যাইবার ইহাই তো সুন্দর অবসর। বিপদের কঠোর কশাঘাত যতই আমাদের প্রাণের উপর আঘাত করিয়া আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া তুলিবে, দুঃখশোকের মর্ম্মন্তুদ জ্বালাযন্ত্রণা যতই আমাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিবে, ততই তো সেই স্নেহময়ী মাতার নিকট ছুটিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হইবে; ততই তো সেই সকল আঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় অন্বেষণে আমরা সহজেই ছুটিয়া চলিব। যাঁহার প্রেমের কণামাত্র পাইয়া মাতা স্বীয় জীবনেরও বিনিময়ে সন্তানের জীবনরক্ষা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না, তিনি যে সংসারগহনের কণ্টকে বিক্ষতদেহ সন্তানকে স্বীয়

সুশীতল ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন, ইহা প্রত্যেক মায়ের ছেলেই অনুভব করিতে পারিবে। প্রকৃতই তিনি তাঁহার অক্ষয় স্নেহে আমাদিগকে অভিষিক্ত করিবার জন্য অপরূপ অরূপ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার প্রাণ-জুড়ানো ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলে আমাদের সকল বেদনা, সকল জ্বালা, সকল ব্যথা দূর হইয়া যাইবে, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে।

তাঁহার আশ্রয় পাইলে আমাদের কিসের ভয়? মৃত্যুই যাঁহার আদেশে সংসারে বিচরণ করিতেছে; ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়, সেই দয়াঘন করুণাময় ভগবানের চরণতলে আশ্রয় লাভ করিলে মৃত্যুই যখন আমাদিগকে ভয় প্রদর্শনে অক্ষম হইবে, তখন সেই মৃত্যুর ছায়া বিপদ আপদ দুঃখ শোক কি প্রকারে ভয় দেখাইতে পারিবে? আমাদের চারিদিকে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়া সময়ে সময়ে আমাদের মনে সংশয় আসে বটে যে, যাঁহার শাসনে এই বিশ্বজগতে মঙ্গলভাব জলন্ত প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহার রাজ্যে মৃত্যু এ প্রকার বিকট সংহারমূর্ত্তিতে বিচরণ করে কেন? মৃত্যুর মধ্যে সেই অমৃত পুরুষের সন্দর্শন না পাইয়া অনেক সময়ে আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস টলমল করে বটে। কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, যে দেবাধিদেব এই জগত সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার ইঙ্গিতে এই বিশ্বজগত নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেছে, প্রলয়ের প্রচণ্ড নৃত্যের মধ্যেও তাঁহারই মঙ্গল হস্ত প্রসারিত। ক্ষুধা শরীরের ক্ষয়সাধন করে বটে, কিন্তু সেই ক্ষুধারই সহায়তায় শরীরের বলাধান হয়, বুদ্ধিবৃত্তি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। সেই অমৃত পুরুষ একদিকে যেমন সমস্ত বিশ্বের অধিপতিরূপে নিজের মহিমায় নিজে স্থির হইয়া আছেন, তেমনি তিনি আমাদের মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটেরও ব্যথায় ব্যথিত হইয়া উঠেন; আমাদের প্রতি নিমেষের অশ্রুজল মুছাইয়া দেন এবং রক্ষাকবচ হইয়া আমাদের প্রত্যেককে রক্ষা করেন। অশান্তি অমঙ্গলের ঘূর্ণায় পড়িয়া এই প্রত্যক্ষ সত্যটী ভুলিয়া যাই বলিয়াই আমরা নানাবিধ বিভীষিকায় এত ভীত হই। কিন্তু একবার সেই অমৃতনিকেতনে দাঁড়াইয়া অমৃতপুরুষের চরণতলে সকল দুঃখ শোক সকল জ্বালা যন্ত্রণা নিবেদন করিয়া দেখ, দেখিবে যে, কোন কষ্টই থাকিবে না, সকল যন্ত্রণাই মুছিয়া যাইবে, সকল বিভীষিকাই দূরে পলায়ন করিবে।

যাঁহার ভয়ে মৃত্যু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং যাঁহার ভয়ে মৃত্যু আমাদের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে, তাঁহাকে আমরা কেবল মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবরূপেই প্রত্যক্ষ করি না। তিনি আজ আমাদের এই উৎসবে আমাদের অন্তরতম প্রাণসখারূপে স্বপ্রকাশ। সুখসম্পদের ভিতর দিয়া, দুঃখবিপদের ভিতর দিয়া, সকলেরই ভিতর দিয়া তাঁহার মঙ্গলমূর্ত্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। মৃত্যুর বিকট করাল অন্ধকারের ভিতরেও তাঁহার মঙ্গল জ্যোতি খেলিতে থাকে, তাঁর অমৃতভাব নিত্য উৎসারিত হইতে থাকে। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে, জগতের প্রত্যেক ঘটনাতেই তাঁহার প্রেমমুখ স্বপ্রকাশ। তাঁহার সেই আশ্চর্য্য প্রেমমুখ অভয় মূর্ত্তি একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লও, আর অভয় হইয়া যাও—সকল দুঃখ সকল ভয় বিদূরিত হইবে, প্রাণমন শীতল হইবে, আত্মা শান্ত হইবে।

সংসারের শতবিধ অশান্তির মধ্য হইতেও সেই শান্তিময়ের শান্তিরাজ্যে আমাদের মনকে লইয়া যাইতে হইবে—ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এই শিক্ষাই দেন। মৃত্যুর বিভীষিকা দেখিয়া যখন সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ি, তখনই ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের রুদ্ধ হৃদয়ে আঘাত দিয়া বলিতে থাকেন—"ভীত হইও না; সকল ভয়ের যিনি ভয়, তিনিই তোমাদের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া মাভৈ-রবে তোমাদিগকে আশ্বস্ত করিতেছেন।" মৃত্যুর বিভীষিকাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া শত অশান্তির মধ্যেও হৃদয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই, শত অমঙ্গলের মধ্যে ভগবানের মঙ্গল হস্ত প্রসারিত দেখিতে পারিলেই ব্রহ্মোপাসনার সার্থকতা। সংসারে যতই কেন বৃহৎ মৃত্যুযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হউক না, অশান্তির যতই কেন বৃহৎ ঘূর্ণাবায়ু বিভীষিকা দেখাক না, তাহার মধ্যেও শান্তিচক্রধারী মঙ্গলবিধাতা ভগবানকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিলেই ব্রহ্মোৎসবের সার্থকতা, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়জয়কার।

আজ এই ব্রহ্মোৎসবে আসিয়া সেই জগন্মাতা বিশ্ববিধাতার মঙ্গলভাবে স্থিরনিশ্চয় হও। হৃদয় হইতে সকল সংশয় দূর করিয়া দাও, আতঙ্ক বিদূরিত কর। তাঁহার আদেশে সৃষ্টি আদি অবধি উন্নতির পথে, কল্যাণের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই আনন্দময় বিশ্বাধিপতি মাভৈ-রবে আমাদিগকে নিয়তই অভয় দিতেছেন এবং আমাদের অন্তরের অন্ধকার শতখণ্ডে বিধ্বস্ত করিয়া কোটী আলোকের প্রদীপ জ্বালিয়া নিত্যই বলিয়া দিতেছেন যে, এই বিশ্বজগত তাঁহারই রাজ্য। পিতামাতার নিকটে সন্তান যেমন অভয় হয়, তেমনি পরমেশ্বরকেও পিতামাতা বলিয়া জান, তাঁহাকেই একমাত্র সুহৃৎ ও সহায় বলিয়া জান এবং তাঁহাতেই একান্ত নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় হও। সেই পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ কর—হৃদয়ের যত কিছু ভয়-ভাবনা, সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া যাক। যখন তাঁহার অনিমেষ নয়ন আমাদের জীবনের প্রতি নিমেষের উপর প্রজ্বলিত রহিয়াছে, যখন আমাদের জীবনের চতুর্দ্দিক তাঁহারই পুণ্য আলোকে নিত্য উদ্ভাসিত, সেই মঙ্গলময় অমৃত পুরুষ যখন আমাদের নিত্য-সঙ্গী, তখন আমাদের ভয় কোথায়?

এসো—এই পবিত্র সন্ধ্যাকালে, এই পবিত্র উৎসবমন্দিরে সেই চিরসঙ্গী চিরসখা পিতামাতা পরমেশ্বরের জয়গান করিয়া জীবনকে ধন্য করি। যে দেবদেব এই উৎসবে আমাদের পূজাগ্রহণের জন্য স্বীয় মঙ্গলহস্ত প্রসারিত করিতেছেন, এসো তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের দেবতা বলিয়া অন্তরে উপলব্ধি করি এবং সর্ব্বপ্রকার ভয়ভাবনা হইতে মুক্ত হই। যাঁহার আদেশে এই ব্রহ্মাচক্রের অগণিত সূর্য্যচন্দ্র অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র আমাদের মঙ্গলসাধনে নিয়তই নিযুক্ত রহিয়াছে, এসো, সেই প্রাণের প্রাণ প্রাণরাম পরমেশ্বরের চরণে আমরা ভক্তিভরে বারবার প্রণাম করি।

সাহচর্য্য।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ)

আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের অধিক অতীত হইল, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দলাদলির প্রাবল্য দেখিয়া পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার রোগশয্যা হইতে যে সকল ধর্ম্মানুকূল উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই একটী অমূল্য উপদেশ ছিল—"মৈত্রীই তোমাদের ব্যবহারের নিয়ামক হউক।" আজ সুদীর্ঘকাল পরে এই ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজ হইতে সেই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার যে চেষ্টা হইতেছে, ইহাতে ব্রাহ্মমাত্রেরই আনন্দের কথা।

বিগত মহাসমরের পর যে জগতে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সেই যুদ্ধ অবধি আজ পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরের ঘটনা ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে সকলেরই উপলব্ধি হইবে যে, অন্যোন্যসাহচর্য্যই এই নবযুগের মূল প্রাণ, মৈত্রীই নবযুগের যুগধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগে প্রধানত রাজনীতি-ক্ষেত্রেই এই যুগধর্ম্ম বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে সন্দেহ নাই। বাতাসকে চাপিয়া বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিতে গেলে যেমন তাহা নিজের আধার শতখণ্ডে বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতে চাহে, সেইরূপ পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এবং তাহার অনুসরণ করিয়া এদেশেও রাজনীতি ক্ষেত্রেই মৈত্রীভাবকে বিশেষভাবে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়াই আজ তাহা সেই রাজনীতিক্ষেত্রেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া বাহিরে প্রকাশ হইতে চাহিতেছে। কিন্তু ইউরোপে ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহও এই যুগধর্ম্মের প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে নাই। কেমন করিয়াই বা পারিবে? পরস্পরের সহানুভূতিপূর্ণ সাহচর্য্য লাভ করিয়া মিলিতভাবে কার্য্য করিবার উপরেই যে বর্ত্তমান যুগের সকল আশা-ভরসাই নির্ভর করিতেছে। বর্ত্তমান যুগে জগতের সকল স্থানের কর্ম্মক্ষেত্র যেরূপ তীব্র গতিতে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও স্ফীত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে কোন ব্যক্তি বা কোন জনসংঘ অপরের সাহায্য ব্যতীত একাকী সকল কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতে পারিবে মনে করিলে মস্ত ভুল করিবে—সে কথা এখন আর চলিতেই পারে না। বর্ত্তমান কালের সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরের সাহায্য কেবল নিতান্ত আবশ্যক নহে, নিতান্ত অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করি। পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত বর্ত্তমান যুগে কোন কর্ম্মের সিদ্ধি লাভ করিবার দ্বিতীয় উপায় দেখি না।

সংসারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরস্পরের সাহায্য করা যে ভগবানের অভিপ্রেত, তাহা তাঁহার প্রত্যেক বিধানেই প্রকাশ পায়। আহারে বল, বিহারে বল; জ্ঞান অর্জ্জনে বল অথবা ধর্ম্মলাভে বল, সকল বিষয়েই পরস্পরের সাহায্য নিতান্তই আবশ্যক—পরস্পরের সাহায্য না লইলে সংসার চলিতেই পারে না। জগতের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, যে জাতির মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করিবার ভাব যত কম, সে জাতি ততই হীনবল হইয়া পড়ে; এবং যে

---

* ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজের উৎসব উপলক্ষে ১০২৮ সালের ৮ই মাঘে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

জাতির মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করিবার ভাব যত প্রবল, সেই জাতি উন্নতির পথে তত দ্রুতগতি অগ্রসর হয়।

ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবকালে মৈত্রীভাব, পরস্পরকে সহায়তা করিবার ইচ্ছা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া ইহার প্রবল প্রতাপ অনুভূত হইয়াছিল; অল্পকালের মধ্যেই দেশের মধ্যে সকল ক্ষেত্রেই ইহা একটা প্রবল শক্তিরূপে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহার পর, পরস্পরের মনের প্রকৃত ভাব ভুল বুঝিবার কারণেই হউক বা অন্য যে কারণেই হউক, সেই যে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ বিরোধবিচ্ছেদ প্রবেশ লাভ করিল, সেই অবধি ব্রাহ্মসমাজ হইতে মৈত্রীভাব অল্পে অল্পে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিল। তাহার ফলে দেশবিদেশের জনসাধারণের নিকট ব্রাহ্মসমাজ কিরূপ পদে পদে হেয় ও লাঞ্ছিত হইতেছে, তাহা ভাবিলে প্রাণ স্বতই কাঁদিয়া উঠে। আমরা যদি ব্রাহ্মসমাজকে আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূল বলিয়া জানি, ব্রাহ্মসমাজকে যদি আমরা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার উৎস এবং সকল কল্যাণের মূল বলিয়া মনে করি; ইহা জানিয়া ব্রাহ্মসমাজকে যদি আমরা সকল প্রকার অমঙ্গল অকল্যাণ হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, ব্রাহ্মসমাজকে যদি সত্যই আপনার মনে করিয়া তাহাকে অকালমৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইতে ইচ্ছা করি, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে যুগধর্ম্মের অনুকূলেই চলিতে হইবে, মৈত্রীভাবকেই আমাদের সকল কার্য্যের নিয়ামক করিয়া তুলিতে হইবে। যুগধর্ম্মের প্রতিকূলে চলিলে আমাদের ইচ্ছা ও আশা কখনই সফল হইবে না। এখন আমাদিগকে জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে যে, বিরোধবিবাদের সময় চলিয়া গিয়াছে, বৃথা বাদবিসম্বাদের সময় চলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন আমাদিগকে মিলিতভাবে পরস্পরের স্কন্ধে স্কন্ধ দিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে; মৈত্রীকে সহায় করিয়া ধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া অধর্ম্মের পরাজয় সাধন করিতে হইবে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইতে হইবে।

বিভিন্ন খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যে কিরূপ গুরুতর মারাত্মক মতভেদ আছে, তাহা অনেকেই জানেন। খৃষ্টধর্ম্মে যাহারা শ্রদ্ধাবান্ নহে, তাহাদের জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থাবিষয়ক মতামতই এই মতভেদের অন্যতর প্রধান কারণ বলিয়া উক্ত হয়। নবযৌবনদৃপ্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্য জাতিগণের মধ্যে জীবন আছে বলিয়াই, তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় যখনই মিলিতভাবে কার্য্য করিতে গিয়া দেখিলেন যে, ঐ মতটাই তাঁহাদের মধ্যে মৈত্রীভাব আনিবার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অমনি তাঁহারা সেই মত পরিত্যাগ করিয়া অন্যোন্যসাহচর্য্যের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এবং অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে বিরোধবিবাদের কারণ সেরূপ কোন মতভেদ না থাকা সত্ত্বেও আমরা আমাদের মধ্যে মৈত্রীভাবকে আনিতে পারিতেছি না। ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হইবে যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্ম বর্ত্তমানে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। ইহা সঙ্কীর্ণভাবের কথা নহে; ইহা স্বাভাবিক, কারণ ইহা উদারতম ধর্ম্মবীজের উপর দাঁড়াইয়া আছে। সেই ধর্ম্মবীজটী হইতেছে—ঈশ্বরকে প্রীতি করিয়া এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াই তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। এই উদারতম ধর্ম্মবীজে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরোধ নাই এবং হইতে পারে বলিয়াও জানি না। এই উদারতম ধর্ম্মবীজ এবং তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত মহান্ উদার ধর্ম্ম আমরা গ্রহণ করিয়াছি, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রচারিত বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসনার ব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি, অথচ মৈত্রীভাবকে আমাদের সকল কার্য্যের পশ্চাতে রাখিতে চাহি! ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি আমাদের নিজেদের জীবনে প্রতিপালিত দেখিতে চাহি, পুত্রকন্যাগণের চরিত্র যদি ধর্ম্মভাবে সংগঠিত দেখিতে চাহি; এক কথায় মুমূর্ষু ব্রাহ্মসমাজকে যদি নবজীবন দিয়া বাঁচাইতে চাহি, তবে মৈত্রীভাবকে আমাদের সকল কার্য্যের নিয়ামক করিয়া তুলিতে মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করা উচিত নয়। আসল কথা এই যে, মৈত্রীভাবকে দাঁড় করাইতে গেলে স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিতে হইবে, সঙ্কীর্ণভাবকে নির্ম্মূল করিতে হইবে, অহঙ্কারকে বিচূর্ণ করিতে হইবে। আগুনের সহবাসে যেমন ঘৃত গলিয়া যায়, ভগবানের সহবাসে তেমনি আমাদের নিজেকে গলাইয়া ফেলিতে হইবে; ভগবানের চরণে আমি-কে বলি দিতে হইবে।

অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মই হইল মৈত্রীভাবের শ্রেষ্ঠতম ভিত্তি। এই সত্যধর্ম্ম জগতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যতই ফুটিয়া উঠিতেছে, মৈত্রীভাবও ততই অভিব্যক্ত হইয়া জাগ্রতভাব ধারণ করিতে চলিয়াছে। এই সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইলে কিছুতেই বিবাদ আসিতে পারে না। বিশ্বজগত ব্যাপ্ত করিয়া যে সত্যধর্ম্ম দাঁড়াইয়া আছে, তাহা লইয়া কি প্রকারে বিবাদ আসিবে? ঈশ্বর আছেন, ইহার উপর যদি বিরোধ না আসে, তবে তাঁহাকে প্রাণমন দিয়া ভালবাসিতে হইবে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে, একথা লইয়াও বিবাদ আসিতে পারে না। সেই সর্ব্বব্যাপী সত্যকে যখন সীমাবদ্ধ সংসারে নামাইয়া আমাদের সীমাবদ্ধ কার্য্যে প্রয়োগ করিতে চাই, তখনই বিরোধের সম্ভাবনা

আসে। ভগবানকে ভাল বাসিব—ঠিক কথা; কিন্তু তাঁহাকে কি প্রকারে ভাল বাসিব—পিতৃভাবে ভাল বাসিব বা মাতৃভাবে ভাল বাসিব; ভ্রাতৃভাবে ভাল বাসিব কি, সখাভাবে ভাল বাসিব—এই ভাবে যখনই বিচার করিতে বসিব, তখনই তাহার মধ্যে বাদবিসম্বাদ এবং সুতরাং বিরোধবিচ্ছেদ আসিবার সম্ভাবনা। সেই প্রকার তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে, ইহাও ঠিক কথা; কিন্তু কোন্ কার্য্যটী তাঁহার প্রিয় কার্য্য, কোন্ কার্য্যটী তাঁহার অপ্রিয়, সংসারের দিক হইতে সেই বিষয় বিচার করিতে বসিলেই বাদবিসম্বাদ এবং সুতরাং বিরোধবিচ্ছেদ আসিবার সম্ভাবনা। বিরোধবিবাদ দূর করিয়া মৈত্রীভাবকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগকে ঐ অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের উপর, ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের উপর দাঁড়াইতে হইবে, তাহার সাংসারিক প্রয়োগের উপর অতিমাত্র ঝোঁক দিলে চলিবে না। আমাদের এইটী স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে ভগবানের অনন্ত শক্তি অসংখ্য মানবে অসংখ্য আকারে নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং সহস্র মতভেদ সত্বেও কাহাকেও ঘৃণা করিবার অধিকার আমাদের নাই; অথবা এই অসংখ্য মানবকে ছোটখাটো মতামতেও বলপূর্ব্বক আমাদের সহিত এক ও অভিন্ন করাইবার অধিকারও আমাদের নাই, আর অধিকার নাই বলিয়াই তাহা অসম্ভব। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই চাহে যে, তাহার বাহিরের প্রত্যেক ধর্ম্মই তাহার বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক মতে প্রত্যেক ক্রিয়াপদ্ধতিতে সম্পূর্ণ সায় দিবে—সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই চাহে যে, প্রাণে যত মিল হউক আর নাই হউক সকলেই তাহার বহিরঙ্গে সায় দিক। ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন যে, সকলে মূল বীজে একমত হউক, প্রাণে একমত হউক, কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে যথাযথ স্বাধীনতা থাকুক। ব্রাহ্মধর্ম্ম চাহেন যে, ভগবানের নামে যেন আমাদের সকলেরই হৃদয়-তন্ত্রী সমানভাবে ঝঙ্কার দিয়া উঠে এবং আমাদের সকল কার্য্যই স্বাধীনভাবে প্রত্যেকের নিজের নিজের উপযোগীরূপে করিবার অধিকার থাকিলেও যেন সে সমস্তই তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের অনুগত করা হয়।

সত্যধর্ম্মের এক অঙ্গ ভগবানকে প্রীতি করা—সেটী আমাদের প্রত্যেকের নিজের প্রাণের কথা, প্রত্যেকের অন্তরঙ্গের কথা। সত্যধর্ম্মের দ্বিতীয় অঙ্গ হইতেছে ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন। এইটীই হইল তাহার বহিরঙ্গ। এই জন্য এই দ্বিতীয় অঙ্গ, ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধনই হইল মৈত্রীভাবের সাধনাক্ষেত্র। সংসারের অন্যান্য সকল বিষয়ের ন্যায় ধর্ম্মের এই বহিরঙ্গসাধনেও পরস্পরের সাহায্য নিতান্তই আবশ্যক। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনের দ্বারা ভগবানের উপাসনার পথে সিদ্ধিলাভ করিতে চাহিলে কেবলমাত্র আমাদের নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। সে বিষয়ে যেমন আমাদের নিজেরও শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে, তেমনি অপরাপর সাধুভক্তদেরও নিকটে সাহায্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। আবার সিদ্ধির পথে আমাদেরও যাহা কিছু লাভ হইবে, তাহাও অপরের সাহায্যের জন্য বাঁটিয়া দিতে হইবে। একদিকে আমাদের নিজেদের হৃদয়কে বিশ্বজগতের সহিত এক সুরে যেমন বাঁধিতে হইবে, সেইরূপ আমার ভাইবন্ধুদিগের আমার দেশবাসীরও হৃদয়কে সেই সুরের সঙ্গে সমতানে ঝঙ্কার দিবার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এইভাবে মৈত্রীভাবের সাধনার পথে অগ্রসর হইতে থাকিলে আমাদের মধ্যে অচিরেই সদ্ভাব ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে; আমরা নববলে বলীয়ান হইতে পারিব। এই সদ্ভাব ও শান্তি অপেক্ষা সংসারে ভগবানের শ্রেষ্ঠতর আর কোন আশীর্ব্বাদ আছে কিনা জানি না। ইহা যেমন অর্থের বিনিময়েও কিনিতে পারা যায় না, তেমনি দারিদ্র্যও ইহাকে বিনষ্ট করিতে পারে না, অথচ ইহাই আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণসাধনের অনুকূল। গৃহে পরিবারের মধ্যে এই সদ্ভাব ও শান্তির অভাব থাকিলে ধনসম্পত্তি যাহা কিছু সকলই ব্যর্থ। সেইরূপ সমাজই বল, আর জাতিই বল, বিরোধ-বিবাদ থাকিলেই তাহা বিষকীটের ন্যায় সমাজের জাতির সকল সুখ সকল কল্যাণের মূল বিনষ্ট করে। বিবাদ-কলহে দুঃখকষ্ট অন্তর্নিহিত আছে বলিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায় যে তাহা ভগবানের অভিপ্রেত নহে; মৈত্রীভাবে সুখশান্তি থাকাতেই প্রত্যক্ষ জানা যাইতেছে যে তাহারই সাধনা ভগবানের অভিপ্রেত।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই মৈত্রীসাধনের সুন্দর অবসর আসিয়াছে। প্রেমের যুগ আসিয়াছে। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধনের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হইবার পথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকে দুঃখকষ্টের হাহাকার, কঠোর কশাঘাতের তীব্র জ্বালা-যন্ত্রণার ভিতর দিয়া দেশের যে এক মর্ম্মভেদী ক্রন্দন উঠিয়াছে, সেই ক্রন্দন আমাদিগের থামাইতে হইবে। মতামত লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করিয়া দাও। কথা-কাটাকাটির উপর মারামারি করিবার আর সময় নাই। কেবল ঈশ্বর আছেন জানিয়া কোনই লাভ নাই। তাঁহার কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে। দুঃখকষ্টের অশ্রুজলে যাহাদের বক্ষস্থল ভাসিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে সত্য-সত্যই প্রাণের মধ্যে স্থান দিতে হইবে, ভ্রাতৃবন্ধনে নিজের বুকের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে;

সংসার-অরণ্যের কণ্টকে যাহারা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহাদিগকে সেই রসস্বরূপ ভগবানের অমৃত নাম শুনাইয়া সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে ঈশ্বরের পথে অটলভাবে দাঁড়াইয়া ভাইবন্ধু সকলকে সেই সরল পথ দেখাইতে হইবে। এখন মানুষকে ছাড়িয়া ভগবানেরই মঙ্গল দৃষ্টির উপর স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া দেশের কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন আর ভেদাভেদ করিবার অবসরই নাই। এখন আর কে স্পৃশ্য, কে অস্পৃশ্য, কে উচ্চ, কে নীচ, এ সমস্ত প্রশ্ন করিবার অবসরই নাই। এই যে শত সহস্র ব্যক্তি প্রাণের ভিতর দেশের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্য লইয়া কারাগারের অভিমুখে নিত্যই ছুটিয়া চলিতেছে, কে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে তুমি স্পৃশ্য কি অস্পৃশ্য, তুমি ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ? এই সুন্দর অবসরে দেশের মধ্যে মৈত্রীভাবের ধারা বহাইয়া দাও, প্রেমের নদী বহাইয়া দাও; বিগতবিবাদ পরমেশ্বর জয়যুক্ত হউন।

আজ এই উৎসবের প্রদোষে এই উৎসবমন্দিরের উপাসনার ভিতর দিয়া যদি আমরা আবার ভায়ে-ভায়ে মিলিতে পারি, বহুকাল যাবৎ বিরহবিচ্ছেদের পর সে মিলনের তুলনা কোথায়? সেই মিলন সম্পন্ন হইলে এই ব্রহ্মোৎসব সার্থক হইবে, ব্রাহ্মসমাজ ধন্য হইবে। সেই মিলন দেখিয়া দেশ চক্ষু সার্থক করিবে। সেই মিলনের উপর দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিবেন, ভগবান তাঁহার নিত্য আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন।

এস, আমরা মিলিতকণ্ঠে এই মিলনোৎসবের যিনি দেবতা, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সেই মহান্ দেবতা পরমেশ্বরকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া জীবনকে ধন্য করি।

আসামে অহম নৃপতিগণ।*

(আসাম-পর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ-চৌধুরী)

আসামের বিশেষ কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। যাহা কিছু আছে তাহা নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত। পুরাণগুলিতে ঐতিহাসিক ঘটনার কিছু কিছু নিদর্শন আছে, কিন্তু মূল ঘটনাগুলি অজ্ঞাত ছিল বলিয়া সে নিদর্শনসমূহ সম্যক্ পরিস্ফুট নহে। আবার যে সকল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নানা মুণির নানা মতের সহিত সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। আসামের পরবর্ত্তীকালের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, এই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে কোচ, কাছাড়ী, ছুটীয়া অহম ও জয়ন্তীয়া প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ভারতে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় নাই। তৎপূর্ব্বে দেশের বিবরণগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। গল্প ও প্রবাদে ঐ সকল শিক্ষা করা হইত। অস্মদ্দেশে একটী প্রবাদ আছে:—রাজ্য পেলে লেখে, যার যা খুসি লেখে। শ্রীযুক্ত সেক্সপীয়র (L. W. Shakespear) সাহেব তাঁহার History of Upper Assam নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—A copper plate inscription records an invation by Vikramaditya, king of Ujjain about 57 B. C., and as he was a Buddhist it is probable he fostered that religion in that land, where as we shall see, it never took a serious hold. *

পৌরাণিক ও প্রাচীন সংজ্ঞা—

পৌরাণিক সময়ে বর্ত্তমান আসাম প্রদেশ অনেক অংশে বিভক্ত ছিল, যথা—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, শোণিতপুর, কৌণ্ডিল্য, মণিপুর প্রভৃতি। তারপর কামরূপের প্রাধান্য সময়ে কামপীঠ, রত্নপীঠ, স্বর্ণপীঠ ও সৌমারপীঠ প্রভৃতি নামে নানা খণ্ডে এ দেশ বিভক্ত ছিল। করতোয়া হইতে সোনকোষ নদী পর্য্যন্ত "কামপীঠ", সোনকোষ হইতে কামরূপ জেলার রূপিকা বা রূপহী নদী পর্য্যন্ত "রত্নপীঠ", রূপহী হইতে ভৈরবী (ভরলী) নদী পর্য্যন্ত "স্বর্ণপীঠ", এবং ভৈরবী হইতে দিক্রাই নদী পর্য্যন্ত "সৌমার পীঠ" কথিত হইত। এই সৌমার পীঠে বর্ত্তমান লক্ষীমপুর ও শিবসাগর জেলা গঠিত হইয়াছে। টাই বা অহম জাতি এখানে রাজত্ব করিবার পূর্ব্বে উহা বরাহ ও মরাণ জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। এখন সমগ্র দেশের নাম হইল "আসাম"। এই আসা-

---

* এই প্রবন্ধের প্রুফ গৌহাটীর Extra Asstt. Commissioner শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোহাঁই দেখিয়া দেওয়ায় তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

* খৃঃ পূঃ ৫৭ অব্দে বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজা ছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে মাত্র। তাহার কোন প্রমাণ নাই। যখন বিক্রমাদিত্য ঐ সময়ে ছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই, তখন তাঁহার কামরূপ আক্রামণের ও ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা উঠিতেই পারে না। এই উপাধিধারী সাতজন নৃপতি বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রাদুর্ভূত হন। মৎলিখিত প্রবন্ধ (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪১ শক, কার্ত্তিক সংখ্যা, পৃ ১৮২) দ্রষ্টব্য।

মেরও বহুতর নাম ছিল, তন্মধ্যে এই কয়টী প্রধান :—পীটান, কামতা, (১) হুমও, কাণ্ঠা, কড়া, গড়, উত্তরগড়, উত্তরগোল ও দক্ষিণগোল। বর্ত্তমান কামরূপ ও আসামের কিয়দংশকে এক সময়ে "ধর্ম্মারণ্য" বলা হইত।

আসাম সংজ্ঞা ও বিবরণ—

প্রাচীন ভারতান্তর্গত আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এই দেশ অবস্থিত। পুরাকালে আসাম নামে কোন রাজ্য ছিল না। তৎকালে ভিন্ন ভিন্ন রাজগণের প্রাধান্য সময়ে এই দেশ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কামতা, কামরূপ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। "অহম" নামে পরিচিত "টাই" বংশের শাখাসম্ভূত "শান" জাতি ১২২৮ খৃঃ অব্দে পূর্ব্ব উপদ্বীপ হইতে আসিয়া আপার-আসামে (২) প্রবেশ করত সেখানে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এই অহমদিগের মধ্যে কেহ কেহ পৌত্তলিক ছিলেন; কিন্তু শান জাতির অধিকাংশ ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্ম আচরণ করিতেন। ভারতবর্ষের জল-বাতাসে ক্রমে অহমেরা সভ্য হইলেন, এবং পরবর্ত্তী তিন শত বৎসরের মধ্যে ইহাদের পরাক্রম সমগ্র দেশে ছড়াইয়া পড়িল। অহমেরাই তাঁহাদের নামানুসারে এই দেশকে "আসাম" নামে অভিহিত করেন। ইংরাজ বণিকদিগের মধ্যে মিঃ ব্রুস পণ্যদ্রব্য নির্ব্বাচনার্থ ১৮২৩ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম আসামে প্রবেশ করেন। তখনও উক্ত দেশ আসাম নামে তেমন পরিচিত হয় নাই। (৩)

অহম বিবরণ—

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে ক্যাপটেন পামবার্টন মণিপুরে "শান"জাতির একটী প্রাচীন ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হন। তাহা হইতে তিনি জানিতে পারেন যে, "টাই" জাতির শাসনকর্ত্তা চুকাফা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বহুসংখ্যক জাতিকে পরাজিত করিয়া তৎপরে আসাম দেশ আক্রমণ করেন এবং সেখানে অহম রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই জাতি অমিত-পরাক্রমশালী ছিল। যুদ্ধে তাঁহারা হিলৈ (gun), পাথর কালাই, বড় তোপ, (cannon) কাঁড়, ধনু, যাঠী (spear) খড়্গ (খাঁড়া), বারু, ঢাল, তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহার করিতেন। এই অহমেরা পং (Pong) নামে একটী প্রাচীন রাজ্যে বসবাস করিতেন। এই রাজ্য আপার-চিণ্ডওয়ান (Upper Chindwan হইতে ইরাওয়াদি নদীর উত্তরভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন পং রাজ্য বর্ত্তমানে মৌলুন বা মঙ্গোয়ুন (Mongyoun) নামে পরিচিত।

অহমেরা পাটকাই পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক বহুপুরুষ যাবৎ দিহিং নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী স্থানসমূহে বসবাস করিতেছিলেন। পরে তাঁহারা সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইয়া পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে ঐ নদীর বামতীরে "শলগুরিনগর" নামক স্থানে প্রথম তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর তাঁহারা সদলবলে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া দিক্ষু নদীর তীরস্থ প্রাচীন গরগাঁও (বর্ত্তমান নাজিরা) নগরে তাঁহাদিগের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। শ্রীযুক্ত গেইট সাহেবকৃত আসামের ইতিহাসে দেখিতে পাই "চুকাফা ১২২৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১২৬৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অহমেরা অহিন্দু, পূর্ব্বে তাঁহারা "চোমদেও" * নামক দেবতার উপাসক ছিলেন। আসামের অহমেরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না, তাঁহারা এক প্রকার জড়োপাসক ছিলেন। অহম রাজ প্রতাপ সিংহ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং আপনাদিগকে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের বংশধর বলিয়া বিখ্যাত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে আসামের অহমেরা দলে দলে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকেন। অহমদিগের লিখিত ইতিহাসের নাম "বুরঞ্জী"। এই বুরঞ্জীর সংখ্যা এত অধিক যে অদ্যাপি উহার নির্ণয় কঠিন ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। প্রথমে উহা অহম ভাষায় লিখিত হইত, পরে অসমীয়া ভাষায় লিখা হয়। অহমনৃপতি রাজ্যেশ্বর সিংহের বড় বরুয়া (Chief

(১) কামতা—Jarret's trans. Ayeen Akbari, Vol. ii, P. 118.

(২) আপার-আসাম—আসাম প্রদেশ ইংরাজ শাসনাধীনে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, সুরমা উপত্যকা ও পার্ব্বতীয় বিভাগ, এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা আবার তিন ভাগে বিভক্ত :—আপার-আসাম, মধ্য-আসাম ও নিম্ন-আসাম। লখিমপুর ও শিবসাগর জেলা লইয়া "আপার-আসাম" গঠিত।

(৩) The Tea plant etc. of Assam, p. 21.

* চোমদেও—অসমীয়া ভাষায় "স"র উচ্চারণ "চ"র ন্যায়। "চোমদেও" প্রকৃতপক্ষে উচ্চারিত হইবে "সোমদেও"। সোম অর্থে বৈদিক ইন্দ্র।

Justice) কীর্ত্তিচন্দ্রের আদেশে অসংখ্য বুরঞ্জী নষ্ট করা হয়। রাজা বুঢ়াগোঁহাই, বড়গোঁহাই ও বড়পাত্র গোহাঁই-উপাধিধারী তিন জন মন্ত্রীর পরামর্শানুসারেই রাজ্যশাসন করিতেন। এই মন্ত্রীত্রয়ের সমান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি ছিল। প্রথম বড়পাত্র গোহাঁই মহারাজ চুপিমফার ঔরসে জনৈক অজ্ঞাতনামা রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অহম বুরঞ্জীতে "রাজা—ইন্দ্রবংশীয়, বুঢ়াগোহাঁই—সূর্য্যবংশীয়, বড়গোহাঁই—চন্দ্রবংশীয় এবং রাজপণ্ডিত—বৃহস্পতিবংশীয়" বলিয়া উল্লেখ আছে। নিম্নে অহম নৃপতিগণের তালিকা সহ সংক্ষিপ্ত রাজত্বকাল উল্লেখ করা হইল :—

১। চুকাফা = ১২২৮—৬৮ খ্রীঃ অব্দ।

বুঢ়াগোহাঁই—থাওমুক্লিংলুং-মাং রায়; বড়গোহাঁই—থাওমুংকালং।

(১) পাটকাই পর্ব্বত অতিক্রমকালে নাগদিগের সহিত যুদ্ধ, (২) পরাজিত মোরাণ ও বরাহীদিগকে মৈত্রীপাশে আবদ্ধকরণ; (৩) সৌমারপীঠ (উজনীখণ্ড) অধিকার।

২। চুতেউফা = ১২৬৮—৮১ খৃীঃ অব্দ।

বুঢ়াগোহাঁই—থাওরুরু; বড়গোহাঁই— চাওবিন।

(১) কাছাড়ীদিগকে দিখৌ নদীর পূর্ব্বদিকস্থ যাবতীয় স্থান প্রত্যর্পণ।

৩। চুবিনফা = ১২৮১—৯৩ খৃীঃ অব্দ।

বুঢ়াগোহাঁই—থাওরুরু; বড়গোহাঁই—চাওবিন।

(১) মাতক বা মরাণ জাতীয় জনৈকা রূপবতী কন্যাকে বিবাহ করিবার কয়েক বৎসর পরে নিরুদ্দেশ।

৪। চুখাংফা = ১২৯৩—১৩৩২ খৃীঃ অব্দ।

বুঢ়াগোহাঁই—থাওরুরু, বড়গোহাঁই—চাওপাংবওক।

(১) কামতাপুরের খেন বা খেইন বংশীয় রাজা নীলাম্বরের সহিত যুদ্ধে পরাজয় ও তদীয় করে "রজনী" ও "ভাজনী" নামক স্বীয় কন্যাদ্বয়কে অর্পণকরত সখ্যতা স্থাপন; (২) চুখ্রাংফা, চতুফা, তাওখামতি ও চাওপুলাই নামে চারি পুত্র রাখিয়া স্বর্গলাভ।

৫। চুখ্রাংফা = ১৩৩২—৬৪ খৃীঃ অব্দ।

বুঢ়াগোহাঁই—চাওফ্রুংডাম।

(১) বৈমাত্রের ভ্রাতা (রজনীর পুত্র) চাওপুলাইয়ের ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ হওন।

৬। চতুফা = ১৩৬৪—৭৬ খ্রীঃ অব্দ।

(১) ইনি চুখ্রাংফার ভ্রাতা; (২) ছুটিয়ারাজের হস্তে নিধন।

(ক) অহমরাজ্য ব্যাপিয়া অশান্তি হেতু ১৩৭৬ খৃঃঅব্দ হইতে ১৩৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসন শূন্য থাকে।

৭। তাওখামথি = ১৩৮০—৮৯ খৃঃ অব্দ।

বুঢ়াগোহাঁই—চাওখাইখুম, বরগোহাঁই—ত্যাতানবিন।

(১) ইনি চুটুফার ভ্রাতা; ভ্রাতৃবৈরী ছুটিয়াদিগের রাজ্য আক্রমণ।

(খ) ১৩৮৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অরাজকতা হেতু সিংহাসন শূন্য থাকে।

৮। চুডাফাং বা বামুনী কোঁয়র = ১৩৯৭—১৪০৭ খ্রীঃ অব্দ।

(১) ইনি চুক্রেমথির ভ্রাতা; (২) পঞ্চদশ বৎসর বয়সে রাজ্যপ্রাপ্তি; (৩) ব্রাহ্মণগণের প্রতিপত্তি আরম্ভ।

৯। চুজাংফা = ১৪০৭—২২ খৃঃ অব্দ।

বুঢ়াগোহাঁই—চাওখাইখুম; বড়গোহাঁই—নাংচুখাম।

তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

১০। চুফাকফা = ১৪২২—৩৯ খৃঃ অব্দ।

কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

১১। চুচেনফা = ১৪৩৯—৮৮ খৃঃ অব্দ।

(১) ইনি টিপামের রাজকুমারীর গর্ভজাত; (২) নাগা যুদ্ধে জয়লাভ।

১২। চুহেনফা = ১৪৮৮—৯৩ খৃঃ অব্দ।

বুঢ়াগোহাঁই—খেনলুং; বড়গোহাঁই—১ম ত্যাওকাংবানরেক।

(১) কোচরাজ বিশ্বসিংহের তদীয় রাজ্য আক্রমণ; (২) কোচরাজ বিশ্বসিংহের তদীয় রাজ্য আক্রমণ; (২) ১৪৯০ খৃঃ অব্দে কাছাড়ীদিগের নিকট পরাজয়; (৩) ১৪৯৩ খৃঃ অব্দে খেললুং নামে বুঢ়া গোহাঁইয়ের চক্রান্তে "লানতুরুন্ বাণ" নামক জনৈক নৃশংস ব্যক্তির হস্তে নিধন।

১৩। চুপিমফা = ১৪৯৩—৯৭ খৃঃ অব্দ।

(১) লানতুরুণ বাণকে সবংশে নিধনকরা ব্যতীত বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

(প্রভৃতি)

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

রাগিণী বেহাগ—তাল রূপকড়া।

কি যে গান শুনিলাম—হিয়ার মাঝারে আনন্দ ঝঙ্কারে।
নীরব নিশীথে সব-অলখিতে শিশির নীরে আসিয়া ধীরে
শোনাও গানে পাগল প্রাণে মোহিয়া লও হে ভবের পারে
গ্রহের সাথে জোছনা রাতে বেড়াব ঘুরে হৃদয় পুরে—
বাতাসে খোলা পরাণ ভোলা অসীম নীল আকাশ পরে।
আনন্দ সাগরে ডুবি চিরতরে পূজিব গোপনে তোমারি চরণে
জীবন যৌবন সোনার বরণ উঠিবে ফুটিয়া মরম মাঝারে ॥

কথাও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II র্সা র্সা না। -া -ধপা। -পা -া মা I মা মপা গা। -া -া। রসা -সা -া I
কি যে গা • •• • • ন্ শু নি• লা • • •• • ম্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা ন্া সা। গা -া। গা গা মা I পা না ধা। না র্সা। র্রা র্সা না I
হি য়া র মা • ঝা রে • আ ন • ন্দ ঝ • ঙ্কা •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I ধপপা -া -গমা। -রগা -া। পা মা গা I -া -া -রসা। -া সন্া। সা -া -া II
রে•• • • • • কি যে গা • • •• ন্ শুনি লা • ম্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II{ পা ধা পা। না -া। না না -া I না র্সা র্রা। না -র্সা। র্সা র্সা -া I
নী র ব নি • শী থে • স ব অ ল • খি তে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা র্সা র্সা। র্সা -না। র্রর্সা -র্সা -া I না না নধা। পা -নধা। না -া -া }I
শি শি র নী • রে• • • আ সি য়া• ধী •• রে • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা র্সা র্সা। র্গা -া। র্গর্মা; -া র্গর্মর্পা I র্গা র্গা র্গর্রা। র্গা র্রর্সা। নর্রা র্সা -া I
শো না ও গা • নে• • ••• পা গ ল• প্রা •• •• ণে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা সা। গা -া। -া গমা -পধা I পা মা পা। গাঃ -রঃ। ন্রা সা -া II
মো হি য়া ল ও • হে• •• ভ বে র পা • •• রে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II{ সা সা সা। গা -া। গা -া -মা I পা পা পা। পা ধা। ধণা র্সণা ধপা I
গ্র হে র সা • থে • • জো ছ না রা • তে• ••••

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা ধা পা। পা -া। ধপা -া -া I মা গা মা। রা গমা। মা -া -া I
বে ড়া ব ঘু • রে • • হৃ দ য় পু •• রে • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I গা গা গা। গাঃ -রঃ। গা -া -া। গা মা পা। পমা -া। গা -া -গা I
বা তা সে খো • লা • • প রা ণ ভো • লা • •

১ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I গা গা গা। গা -া। -া গমা -পধা I পা মা পা। গাঃ -রঃ। -ন্‌রা সা -া }I
অ সী ম নী • • ল• •• আ কা শ প • •• রে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I{ পা ধা -া। পা না। -া না না I না র্সা র্রা। না র্সা। র্সা র্সা -া I
আ ন • ন্দ সা • গ রে ডু বি চি র • ত রে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা র্সা র্সা। র্সা া। র্রা র্সা -া I না না নধা। পা নধা। না না -া }I
পূ জি ব গো • প নে • তো মা রি• চ •• র ণে •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I পা পা পা। পা -া। পা পধা ণর্সা I র্সা ণা ণধা। পা ধপা। মা গা -া I
জী ব ন যৌ • ব ন• •• সো ণা র• ব •• র ণ •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I গা গা গা। গা -া। গা গমা পধা I পা মা পা। গাঃ -রঃ। সা সা -া II II
উ ঠি বে ফু • টি রা• •• ম র ম মা • ঝা রে •

———•———

রামকেলী—আড়াঠেকা।

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাব হরে নিশ্চয় মরণ।
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত,
ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণে।
অশ্রুপড়ে বাসনার, দন্ত করে হাহাকার,
মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।
অতএব চিন্তু শেষ, ভাব সত্য নির্ব্বিশেষ,
মরণ সময়ে বন্ধু এক মাত্র তিনি হন॥

কথা—রাজা রামমোহন রায়। স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ২´ ৩ •
{ মা ণদা II -া দা পা -মা। পা মা -া -পগা। -া গা -ঋা -া। সা -া -া সা I
অ নি• • ত্য বি • ষ য় • •• • ক • • র • • স

১ ২´ ৩ •
I ঋা মা -া গা। মা -দা -া -া। -া দদা -পমা -গা। -মা -গা } -া পা I
র্ব্ব দা • চি ন্ত • • • • ন• •• • • • • ভ্র

১ ২ ৩ •
I পা দা -র্সা না। র্সা র্সা -া -া। -া নর্সা ণা -দা। -পা -া -া পা I
মে ও • না ভা ব • • • হ• রে • • • • নি

১ ২´ ৩ •
I দা ণদা -ণদা -পা। পমা ণদা -া -া। -া দদা -পমা -গা। -মা -গা মা ণদা II
শ্চ য়• •• • ম• র• • • • ণ• •• • • • "অ নি•"

১ ২´ ৩ ০
-া পা II দা না -র্সা র্সা। র্সা র্সা -া -া। -া র্সনা -র্সা র্সা। -া -া -া দা I
´০ বি ষ য় ০ ভা বি বে ০ ০ ০ য০ ০ ত ০ ০ ০ বা

১ ২´ ৩ ০
I দা না -র্সা র্সা। র্ঋা র্ঋা -া -র্সর্সা। -া নর্সা ণা -দা। -পা -া -া পা I
স না ০ বা ড়ি বে ০ ০০ ০ ত০ ত ০ ০ ০ ০ ক্ষ

১ ২´ ৩ ০
I দা দা -র্ঋা র্সা। র্সনা র্সা -া -া। -া নর্সা -ণা -দা। -পা -া -া পা I
ণে হা ০ স্য ক্ষ০ ণে ০ ০ ০খে০ ০ ০ ০ ০ দ ন্তু

১ ২´ ৩ ০
I দর্সা ণদা -া পা। দা দা -া দা। -া দদা -পমা -গা। -মা -গা মা ণদা II
ষ্টি০ রু০ ০ ষ্টি ক্ষ ণে ০ ক্ষ ০ণে০ ০০ ০ ০ ০ "অ নি০"

১ ২´ ৩ ০
-া সা II সা সা -া ঋা। মা মা -া -া। -া মা -া -া। -গা -া -া মা I
০ অ শ্রু প ০ ড়ে বা স ০ ০ ০ না ০ ০ ০ ০ র দ

১ ২´ ৩ ০
I মা -গা মা পা। পা দপা -ণা -দপা। -া দা -পা -া। -দা -মা -া পা I
ন্ত ০ ক রে হা হা০ ০ ০০ ০ কা ০ ০ ০ ০ র মৃ

১ ২´ ৩ ০
I দা দা -র্সা না। র্সা র্সা -া -না। -র্সা ণা -দা -া। পা -া -া পা I
ত্যু র ০ স্ম র ণে ০ ০ ০ কাঁ ০ ০ পে ০ ০ কা

১ ২´ ৩ ০
I দা ণা দা -পণা। দা দা -া -া। দা -া দদা -পমা। -গা -মা -া পা।
ম ক্রো ধ ০০ রি পু ০ ০ গ ০ ণে০ ০০ ০ ০ ০ অ

১ ২´ ৩ ০
I দা দা -র্সা না। র্সা র্সা -া -া। -া -র্সনা -র্সা -র্সা। -া -া -া দা I
ত এ ০ ব চি ন্ত ০ ০ ০ শে০ ০ ষ ০ ০ ০ ভা

১ ২´ ৩ ০
I দা না -র্সা র্সা। ঋাঃঋাঃ -া -া -র্সর্সা। -া নর্সা -ণা -দা। -পা -া -া পা I
ব স ০ ত্য নির্ব্বি ০ ০ ০০ ০শে০ ষ ০ ০ ০ ০ ম

১ ২´ ৩ ০
I দা দা র্ঋা র্সা। র্সা র্সা -া -া। -া নর্সা ণা -দা। -পা -া -া পা I
র ণ ০ স ম য়ে ০ ০ ০ ব০ স্থ ০ ০ ০ ০ এ

১ ২´ ৩ ০
I দা ণা ণদা -পণা। দা দা -া দা। -া দদা -পমা -গা। -মা -গা মা ণদা II II
ক মা ত্র০ ০০ তি নি ০ হ ০ন০ ০০ ০ ০ ০ "অ নি০"

রামকেলী—আড়াঠেকা।

এক দিন যদি হবে অবশ্য মরণ।
তবে কেন এত আশা এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।
এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ,
ধূলিসার হবে তার মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ॥

কথা—রাজা রামমোহন রায়। স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ২´ ৩ ০
{ মা -ণদা II -া দা পা -মা | পা মা -া -পগা | -া গা -ঋা -া | সা -া -া সা I
এ •• ক দি ন • য দি • •• • হ • • বে • • অ

১ ২´ ৩ ০
I ঋা মা -া গা | মা -দা -া -া | -া দদা -পমা -গা | -মা -গা } -া পা I
ব শ্য • ম র • • • • ণ• •• • • • • ত

১ ২´ ৩ ০
I পা দা -র্সা না | র্সা র্সা -া -া | -া নর্সা ণা -দা | -পা -া -া পা I
বে কে • ন এ ত • • • আ• শা • • • • এ

১ ২´ ৩ ০
I দা ণদা -ণদা পা | পমা ণদা -া দা | -া দদা -পমা -গা | -মা -গা মা -ণদা II
ত ত্ব• •• ন্ব কি• কা• • র • ণ• •• • • • "এ ••"

১ ২´ ৩ ০
-া পা II দা না -র্সা র্সা | র্সা র্সা -া -া | -া র্সনা -র্সা র্সা | -া -া -া দা I
• এ ই যে • মা র্জ্জি ত • • • দে• • হ • • • যা

১ ২´ ৩ ০
I দা না -র্সা র্সা | র্ঋা র্ঋা -া -র্সর্সা | -া নর্সা ণা -দা | -পা -া -া পা I
তে এ • ত ক র • • •• • স্নে• হ • • • • ধূ

১ ২´ ৩ ০
I দা দা -র্ঋা র্সা | র্সনা র্সা -া -া | -া নর্সা -ণা -দা | -পা -া -া পা I
লি সা ০ র হ• বে • • • তা• • • • • র ম

১ ২´ ৩ ০
I দর্সা ণদা -া -পা | -া দা দা -া | -া দদা -পমা -গা | -মা -গা মা -ণদা II
স্ত• ক• • • • চ র • • ণ• •• • • • "এ ••"

১ ২´ ৩ ০
-া সা II সা সা -া ঋা | মা মা -া -া | -া মা -া -া | -গা -া -া মা I
• য স্নে ভূ • ণ কা ষ্ঠ • • • খা • • • ন • র

১ ২´ ৩ ০
I মা -গা মা পা | পা দপা -ণা -দপা | -া দা -পা -া | -দা -মা -া পা |
হে • যু গ প রি• • •• • মা • • • • ণ কি

১ ২´ ৩ ০
I দা দা -র্সা না | র্সা র্সা -া -না | -র্সা ণা -দা -া | -পা -া -া পা I
স্ব য • স্নে দে হ • • • না • • • • শ না

১ ২´ ৩ ০
I -দা ণা -দা -পণা | -া -া -া দা | দা -া দদা -পমা | -গা -মা -া পা I
• হ • • য় • • • বা র • ণ• •• • • • অ

১ ২´ ৩ ০
I দা দা -র্সা না | র্সা র্সা -া -া | -া র্সনা -র্সা র্সা | -া -া -া দা |
ত এ • ব আ দি • • • অ• • স্ত • • • আ

১ ২´ ৩ ০
I দা না র্সা র্সা | র্ঋঃর্ঋঃ -া -া -র্সর্সা | -া নর্সা ণা -দা | -পা -া -া পা I
প না • র সদা • • • •• • চি• স্ত • • • • দ

১ ২´ ৩ ০
I দা দা -র্ঋা র্সা | র্সনা র্সা -া -া | -া নর্সা -না দা | পা -া -া পা I
য়া ক • র জী• রে • • • ন• • • ও • • স

১ ২´ ৩ ০
I দা ণা -ণদা -পণা | -া দা দা -া | -া দদা -পমা -গা | -মা -গা মা -ণদা II II
স্তো র •• •• • শ র • • ণ• •• • • • "এ ••

—০—

বি-পথে।

(শ্রীমতী অভ্ররেণু দেবী)

আর নয়, এই বার ফিরে চল মন!
ভুল পথে পায় পায় বহুদূরে করেছ গমন,
ভ্রান্তি মোহে ডুবি এতক্ষণ
শান্তি আশে চলিয়াছ মরীচিকা পানে,
—নিজভুলি ছুটিয়াছ আলেয়ার প্রতি—
আর নয় থাম এই খানে,
রোধ কর অসংযত গতি;
ফিরে চল অন্য পথে মন!
এখনো সময় আছে কর বিবেচন—
এখনো আঁধার রাশি পথখানি করেনি গোপন।

কোন মোহে—কোন্ প্রলোভনে
রঙায়েছে আঁখিতব—দেখায়েছে কি-ছবি গোপনে—
যার আশে বাধাবিঘ্ন করি অতিক্রম
হারাইয়া সকল সংযম
আমার নিষেধ-বাণী না তুলিয়া কানে
মত্তবৎ এসেছ এখানে?
সেকি শান্তি? সেকি সুখ?
সেকি কোনও অতৃপ্ত পিয়াসা?
যা'র তরে মোর কাছে লুকাইয়া মুখ
চুরি করে এইখানে আসা?
বল মন! কিবা আশা পুষিয়া অন্তরে
আসিয়াছ এ মরু প্রান্তরে?

"সংসারের শত প্রলোভন
জানি না কি মোহ-মদিরায়
সমাচ্ছন্ন করিয়া আমায়
সেই দিকে করে আকর্ষণ;
কতছবি—মোহময়, স্বপ্নময়—ভালোবাসাময়
মন্ত্র মুগ্ধ করি এ হৃদয়
—নিয়ত আমারে হায় করে গো চঞ্চল।
যেন কোনও যাদুকরী, দুলাইয়া অলস অঞ্চল
আমার সকল শক্তি করেছে হরণ,
—বারণ মানে না হায় অবোধ চরণ।
ছুটে যায় আত্মহারা দিশাহারা শান্তি-সুপ্তি-হারা—
মসীলিপ্ত আঁধার গগনে
সেই যেন মোর ধ্রুবতারা।
তোমার নিষেধ-বাণী পশে না শ্রবণে
মন্ত্রমুগ্ধ জনে
বাধাহীন ছুটে তার পানে—
মোহাচ্ছন্ন করেছে সে গানে।"

কিন্তু মন! এই পথে বল অগ্রসরি'
এত দিন ধরি'
কিবা সুখ কিবা শান্তি পেয়েছ অন্তরে?
পিপাসা তোমার বল কতটুকু হয়েছে শান্তরে?

"সত্য কথা বলিতে কি, হে সখা আমার!
মিটে নাই কণামাত্র আশা;
মরীচিকা পানে ধেয়ে বেড়ে গেছে অতৃপ্ত পিয়াসা;
দেখিতেছি চারিধার
যদিও রঙীন্ বড়, বড় মধুময়—
তবু মনে হয়
নিয়ত কে কহিছে আমায়
'অন্ধ তুই প্রবঞ্চিত হইয়া মায়ায়
চলেছিস্ কোথা ছুটি ধরিতে ছায়ায়?'
আগে ওগো কে জানিত হায়
ব্যথাময় জ্বালাময় এ পথ এমন
সুন্দর দেখায়
আলোকের শিখাটী যেমন।"

ফিরে চল, চল এইবার
মুছে ফেল নয়নের ধার,
শোনো মন! কথাটী আমার
মনে করে দেখ দেখি কতবার করেছি নিষেধ
'যেওনাক ফিরে এস' বলি,—
ভালোত লাগেনি তাহা অন্তরের বাড়িয়াছে খেদ
—ছুটে গেছ চলি,
যেতে যেতে অবসন্ন হেরিয়া তোমায়
এখন আবার বলি ফিরে এস মন!
ওপথে আর কোরোনা গমন;
শোনো পুনরায়
চক্ষে পরি মোহের অঞ্জন
যদিও দেখিতে বড় তৃপ্তিকর নয়ন-রঞ্জন
এ মায়া বীথিকা,
শত প্রলোভনময় আপাত-মধুর
গেলে তুমি আরো কিছু দূর,
কাটিলে মোহের ঘোর, দেখিবিরে শূন্য চারিধার
—জ্বালাময় অতীব পিচ্ছিল
অন্ধকার, গন্ধময়, দুর্গম পঙ্কিল।
তাই বলি
এখনো ফিরিয়া চল এই সুসময়
মনে যবে জেগেছে সংশয়,
দৃঢ় করে নেত্রপুট দলি'
ভেঙে ফেল মোহের স্বপন
মুহূর্ত আর বৃথা তুমি কোরো না যাপন;
তার পর মোর করে ধরি
চলে এস যাইব সেখানে,
অনুতাপ ব্যথা আর
নয়ন আসার
শত যুগে শত চেষ্টা করি
যেতে কভু পারে না সেখানে।

"তাই চল—হে আমার চির শুভ তারা!
জীবনের দীপ্ত ধ্রুবতারা!
লয়ে চল, কিরণে তোমায় দেখাইয়া সত্য পথখানি
মূঢ় আমি ক্ষীণ আমি কিছুই না জানি।
এমায়া রাজ্যেতে ওগো
উৎকণ্ঠার চির অবস্থান
চাহি না গো—চাহি না তা' আমি
তব সনে করিব প্রস্থান।"

———

নৌকা।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

মানবজাতির ধরাধামে আবির্ভাবের পর হইতেই নৌকার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় জল-প্লাবনের বৃত্তান্ত প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীরই প্রায় স্বীকার্য্য; এবং নৌকায় চড়িয়া প্রাণিবর্গের আত্মরক্ষার পৌরাণিক বৃত্তান্তও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর গ্রন্থেই স্থান পাইয়াছে। মৎস্যপুরাণে মৎস্যের সঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া তাহাতে জীবনিবহের রক্ষার ব্যবস্থা মৎস্যরূপী ভগবান্ নিজেই করিয়াছিলেন। (১) প্রকারান্তরে এই কথাটা বাইবেলেও গৃহীত হইয়াছে। ঔণাদিক প্রক্রিয়ানুসারে নিষ্পন্ন নৌ-শব্দও (২) পদার্থটির প্রাচীনতা ঘোষণা করিতেছে, সুতরাং উহার প্রাচীনতা স্থাপনের জন্য প্রমাণান্তর প্রদর্শন অনাবশ্যক।

আমরা কেবল ইহার শ্রেণী বিভাগ এবং তদনুযায়ী আকৃতির বিবরণ প্রভৃতি সংগ্রহের চেষ্টা করিব।

নৌকা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। তন্মধ্যে যাহা নদ-নদী খাল বিল প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়, তাহার সাধারণ নাম সাধারণ নৌকা, এবং যাহা সমুদ্রে ব্যবহারের যোগ্য তাহা মহা-নৌকা বা পোত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রামায়ণে "মহানৌ" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। (৩) মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহার্ণবে ব্যবহার্য্য নৌকা "পোত" নামে অভিহিত হইয়াছে। (৪) নৈষধ কাব্যেও পোত-শব্দেরই প্রয়োগ দেখা যায়। (৫)

দণ্ডীর দশকুমার চরিতে উহা "প্রবহণ" নামে কথিত হইয়াছে। যাহারা পোতে অর্থাৎ জাহাজে চড়িয়া বাণিজ্য করে, তাহারা পোতবণিক এবং সাংযাত্রিক নামে অভিহিত হইয়াছে। (৬)

যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদোক্ত চারি প্রকার বৃক্ষের কাষ্ঠ নৌকার উপাদান বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত চারি প্রকার কাষ্ঠ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে যে কাষ্ঠ লঘু, কোমল ও সুঘট (যাহা সহজে অন্যের সহিত যোড়া লাগে) তাহা ব্রাহ্মণ জাতি। যাহা দৃঢ়, লঘু ও অঘট (সহজে যোড়া মিলে না) তাহা ক্ষত্রিয় জাতি। যাহা কোমল অথচ গুরু তাহা বৈশ্য জাতি। এবং যাহা দৃঢ় ও গুরু তাহা শূদ্রজাতি। যদিও কাষ্ঠের চারি প্রকার শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি নৌকা নির্ম্মাণে ভোজের মতে কেবল ক্ষত্রিয়-জাতি কাষ্ঠ ব্যবহার্য্য এবং অন্যান্যের মতে লঘু ও সুদৃঢ় কাষ্ঠ ব্যবহার্য্য। (৭)

বিভিন্নজাতি কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত নৌকা সুখকর এবং মঙ্গলদায়ক হয় না। উহা জলে ডুবিয়া যায়। অথবা অল্পকাল মধ্যে জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। গ্রন্থকারের উক্তি হইতে ইহাও বুঝা যায়, সেকালে সমুদ্রগামিনী নৌকাকে লৌহের দ্বারা বাঁধান হইত না, কারণ সমুদ্রস্থিত অয়স্কান্ত-মণির আকর্ষণে লৌহবদ্ধ নৌকা জলে মগ্ন হইয়া যায়। (৮)

যুক্তিকল্পতরুর মতে সামান্য ও বিশেষ নৌকার এই দুইটি বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজহস্ত অর্থাৎ পরিমাণে ব্যবহার্য্য এক হস্ত দীর্ঘ হইলে তাহার ওসার ও খাড়াই এক হস্তের চতুর্থাংশ, এই অনুপাতে পরিমাণ গ্রহণ করিয়া নৌকা নির্ম্মাণ করিলে "ক্ষুদ্রা" নামক সামান্য নৌকা হইয়া থাকে।

(১) যুগান্তবাতাভিহতা যদা ভবতি নৌ র্নৃপ।
শৃঙ্গেঽস্মিন্ মম রাজেন্দ্র তদেমাং সংযমিষ্যসি। ১।৩২।

(২) নুদ্ প্রেরণে "গ্লানুদিভ্যাং ডৌঃ। উং—২।২৪।

(৩) প্রতিলোমেন বাতেন মহানৌরিব সাগরে।
সুন্দরকাণ্ড—১।১৭৭।

(৪) আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।

(৫) তব পোত ইবাবলম্বনং বিধিনাকল্পি কষ্টসন্নিধেঃ।২।৬০।

(৬) সাংযাত্রিকঃ পোতবণিক। অমর

(৭) বৃক্ষায়ুর্ব্বেদগদিতা বৃক্ষজাতিশ্চতুর্বিধা।
সমাসেনৈব গদিতং তেষাং কাষ্ঠং চতুর্বিধম্।
লঘু যৎ কোমলং কাষ্ঠং সুঘটং ব্রহ্মজাতি তৎ
দৃঢ়াঙ্গং লঘু যৎ কাষ্ঠমঘটং ক্ষত্রজাতি তৎ
কোমলং গুরু যৎ কাষ্ঠং বৈশ্যজাতি তদুচ্যতে।
দৃঢ়াঙ্গং গুরু যৎ কাষ্ঠং শূদ্রজাতি তদুচ্যতে।
লক্ষণ-দ্বয়-যোগেন দ্বিজাতিঃ কাষ্ঠসংগ্রহঃ।
ক্ষত্রিয়-কাষ্ঠৈর্ঘটিতা ভোজমতে সুখসম্পদ্ নৌকা।
অন্যে লঘুভিঃ সুদৃঢ়ৈর্বিদধতি জলদুষ্পদে নৌকাম্।

(৮) বিভিন্নজাতিদ্বয়কাষ্ঠজাতা ন শ্রেয়সে নাপি সুখায় নৌকা,
নৈষা চিরং তিষ্ঠতি পচ্যতে বা বিভিদ্যতে বারিণি মজ্জতে চ।
ন সিন্ধু গাদ্যা-(হ্য-) র্হতি লৌহবন্ধং
তল্লোহকান্তৈ র্হ্রিয়তে হি লৌহম্।
বিপদ্যতে তেন জলেষু নৌকা
গুণেন বন্ধং নিজগাদ ভোজঃ।

দেড়হাত দীর্ঘ, তদর্দ্ধ প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের এক-তৃতীয়াংশ উচ্চ এই অনুপাতে পরিমিত নৌকা মধ্যমা নামে অভিহিত। পরিমাপক রাজহস্ত এক এবং দেড় এই ক্রমে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করিয়া এবং দৈর্ঘ্যের পরিমাপক হস্তের অর্দ্ধাংশ হারে বিস্তার ও উন্নতির বৃদ্ধি করিয়া নৌকা প্রস্তুত করিলে যথাক্রমে ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পটলা, ভয়া, দীর্ঘা, পত্রপুটা, গর্ভরা ও মন্থরা এই দশ প্রকার সামান্য নৌকা হয়।

ইহাদের মধ্যে ভীমা, ভয়া ও গর্ভরা এই তিন প্রকার নৌকা অশুভ ফলদায়ক। মন্থরার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট যে কয় প্রকার নৌকার নাম কথিত হইয়াছে, সমুদ্রে সেই সকল নৌকাই যাতায়াত করিতে পারে; অর্থাৎ মন্থরা নৌকা সমুদ্রপথে গমনের অযোগ্য। সাধারণতঃ দৃঢ়তা ও প্রকীর্ণতা(?) ইহাদের গুণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (৯) বিশেষ নৌকার দীর্ঘা ও উন্নতা এই দুই প্রকারের ভেদ আছে। রাজহস্তদ্বয় দৈর্ঘ্যে তাহার অষ্টমাংশ বিস্তার এবং দৈর্ঘ্যের দশমাংশ উন্নতি, এই অনুপাতে পরিমাণানুসারে নির্ম্মিত নৌকা দীর্ঘিকা নামে অভিহিত। উহার এক-এক হস্ত পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে দীর্ঘিকা, তরণি, লোলা, গত্বরা, গামিনী, তরি, জঙ্ঘালা, প্লাবিনী, ধারিণী ও বেগিনী, দীর্ঘা নামক বিশেষ নৌকার এই দশ প্রকার নাম হইয়া থাকে। ইহাদের বিস্তার ও উন্নতি যথাক্রমে দৈর্ঘ্যের অষ্টমাংশ এবং দশমাংশ। ইহাদের মধ্যে লোলা, গামিনী ও প্লাবিনী নৌকা দুঃখপ্রদা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

লোলার পরিমাণ হইতে গত্বরা পর্য্যন্ত লোলার মত গুণই বুঝিতে হইবে। বেগিনীর পূর্ব্বে যে নৌকার নাম কথিত হইল, তাহার গুণও বেগিনীর মত শুভপ্রদ। উল্লিখিত নৌকাগুলির নামের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহাদের গতি প্রভৃতির অনেকটা স্বরূপ প্রতিভাত হয়। (১০)

ভোজদেব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নৌকার দৈর্ঘ্যের কোনও নিয়ম নাই। ইচ্ছানুসারেই পরিমাণ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আট চারি ও নয় ইহাদের অতিরিক্ত হস্ত সংখ্যা গৃহীত হইতে পারে না। অর্থাৎ দশকের পর ৪, ৮ অথবা ৯ থাকিতে পারে। যেমন চৌদ্দহাত, আঠার হাত, উনিশ হাত, চব্বিশ হাত, আঠাশ হাত উনত্রিংশ হাত এইরূপ দৈর্ঘ্য হইতে পারে। পনর, ষোল ইত্যাদি হইতে পারে না।

অষ্ট সংখ্যার অধিক হস্ত সংখ্যা হইলে নৌকা কুল, বল ও ধন এই কয়টি বিনাশ করে। নব্বইর অধিক ও চল্লিশের কম সংখ্যাও পরিত্যাজ্য। অপর দশক পর্য্যন্ত এই ফল বুঝিতে হইবে। (১১)

নৌকার চিত্রণ কার্য্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ কর্ত্তৃক স্ব-স্ব জাতির নৌকায় স্বর্ণ, রজত, তাম্র এবং মিলিত তিন ধাতু ব্যবহারের ব্যবস্থা দেখা যায়। নৌকার অঙ্কনে চারি, তিন, দুই ও এক শৃঙ্গ ব্যবহারেরও নিয়ম দেখা যায়। এই স্থলে শৃঙ্গ শব্দে শৃঙ্গাকার চিহ্ন অভিপ্রেত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আবার ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির নৌকায় যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও নীল রং ব্যবহারের উপদেশ দেখা যায়। (১২)

---

(৯) রাজহস্তমিতায়ামা তৎপাদপরিণাহিনী।
তাবদেবোন্নতা নৌকা ক্ষুদ্রেতি গদিতা বুধৈঃ।
অতঃ সার্দ্ধমিতায়ামা তদর্দ্ধপরিণাহিনী।
ত্রিভাগেনোত্থিতা নৌকা মধ্যমেতি প্রচক্ষ্যতে।
ক্ষুদ্রাথ মধ্যমা ভীমা চপলা পটলা ভয়া।
দীর্ঘা পত্রপুটা চৈব গর্ভরা মন্থরা তথা।
নৌকাদশকমিত্যুক্তং রাজহস্তৈরনুক্রমম্।
একৈকবৃদ্ধৈঃ সার্দ্ধৈশ্চ বিজানীয়াৎ দ্বয়ং দ্বয়ম্।
উন্নতিশ্চ প্রবীণা চ হস্তার্দ্ধাংশসম্মিতা।
অত্র ভীমা ভয়া চৈব গর্ভরা চাশুভপ্রদা।
মন্থরা-পরতো যাস্তু তাসামেবাম্বুধৌ গতিঃ।
তাসাং গুণস্তু সংক্ষেপাৎ দৃঢ়তা চ প্রকীর্ণতা। (!!)

(১০) দীর্ঘা চৈবোন্নতা চেতি বিশেষে দ্বিবিধা ভিদা।
রাজহস্তদ্বয়ায়ামা অষ্টাংশপরিণাহিনী॥
নৌকেয়ং দীর্ঘিকা নাম দশাঙ্গে (দশাংশে) নোন্নতাপি চ।
দীর্ঘিকা তরণির্লোলা গত্বরা গামিনী তরিঃ।
জঙ্ঘালা প্লাবিনী চৈব ধারিণী বেগিনী তথা॥
রাজহস্তৈকৈকবৃদ্ধ্যা নৌকা নামানি বৈদশ।
উন্নতিঃ পরিণাহশ্চ দশাষ্টাংশ মিতৌ ক্রমাৎ॥
অত্র লোলা গামিনী চ প্লাবিনী দুঃখদা ভবেৎ।
লোলায়া মানমারভ্য যাবৎ ভবতি গত্বরা॥
লোলায়াঃ ফলমাধত্তে এবং সর্ব্বাসু নির্ণয়ঃ
বেগিনাঃ পরতো যা তু সা শিবায়োক্তয়া মতা॥

(১১) নৌকা দীর্ঘং (দৈর্ঘ্যং) যথেচ্ছং স্যাত্তত্র তানি বিবর্জ্জয়েৎ
হস্তসংখ্যা পরিত্যাজ্যা বসুবেদগ্রহোত্তরে।
বষ্ট্যুত্তরমিতা নৌকা কুলং হন্তি বলং ধনম্॥
নবতেরুত্তরে যাপি যা চত্বারিংশতেঃ পরা॥
এতেন চত্বারিংশতিষষ্টি-নবতিসংখ্যা তৎপরতোঽপি।
যাবদপরদশকং তাবদেব তৎফলমিতি॥

(১২) ধাত্বাদীনামতো বক্ষ্যে নির্ণয়ং তরিসংশ্রয়ম্।
কণকং রজতং তাম্রং ত্রিতয়ঞ্চ যথাক্রমম্॥
ব্রহ্মাদিভিঃ পরিণ্যস্যেৎ নৌকা চিত্রণ-কর্ম্মণি॥
চতুঃশৃঙ্গা ত্রিশৃঙ্গাভা দ্বিশৃঙ্গা চৈক শৃঙ্গিনী॥
সিত-রক্ত পীত-নীল-বর্ণান্ দদ্যাদ্ যথাক্রমম্॥

সূর্য্যাদিগ্রহের দশায় জাত নৃপতিদিগের নৌকার মুখভাগে যথাক্রমে সিংহ, মহিষ, সর্প, হস্তী, ব্যাঘ্র, পক্ষী, ভেক ও মনুষ্য ইহাদের মুখাকৃতি বিন্যাসের ব্যবস্থা আছে। এবং অনূপাদি ত্রিবিধ দেশবাসী রাজাদের নৌকায় কলস, দর্পণ ও চন্দ্র এতত্রিতয়ের চিহ্ন স্থাপনের উপদেশ দেখা যায়। (১৩) সূর্য্যাদি গ্রহের দশাজাত রাজাদিগের নৌকার উপরে ক্রমে হংস, ময়ুর, শুক, সিংহ, হস্তী, সর্প, ব্যাঘ্র ও ভ্রমর ইহাদের আকৃতি বিন্যাসের ব্যবস্থা দেখা যায়।(১৪) নবদণ্ডের রীত্যানুসারে নৌকাতে মণির বিন্যাস করিতে হয়। (১৫) মুক্তার লহরের দ্বারা ভূষিত নৌকা সর্ব্বতোভদ্রা নামে অভিহিত হয়। নৌকাতে ন্যসনীয় স্বর্ণপ্রভৃতি ধাতুর মালা জয়মালা নামে পরিভাষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ স্বকীয় নৌকায় দুইটি করিয়া মালা নিহিত করিবেন, এবং বৈশ্য ও শূদ্রগণ এক একটি মালা বিন্যাস করিবেন। (১৬)

নির্গৃহ ও সগৃহভেদে নৌকার আরও দুই প্রকার বিভাগ দেখা যায়। নির্গৃহ নৌকার বিবরণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, অধুনা সগৃহ নৌকার বিবরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

সগৃহ-নৌকা।

যে নৌকার উপরে গৃহ অর্থাৎ ছৈ আছে, তাহা সগৃহ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরন্তু নামের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই ছাদগুলি সম্পূর্ণ গৃহাকারে সন্নিবেশিত হইত বলিয়াই মনে হয়। নৌকার অবয়ব বিশেষে গৃহের সন্নিবেশানুসারে আবার "সর্ব্ব-মন্দিরা" "মধ্য-মন্দিরা" ও "অগ্র-মন্দিরা" এই তিন প্রকার সংজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যে নৌকার সমস্তাংশ ব্যাপক গৃহ সন্নিবেশিত হয়, তাহার নাম সর্ব্বমন্দিরা, যাহার মধ্যভাগে গৃহ থাকে, তাহার নাম মধ্যমন্দিরা, এবং যাহার কেবল অগ্রভাগেই গৃহ থাকে, তাহার নাম অগ্রমন্দিরা। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বমন্দিরা নৌকায় রাজার ধন, অশ্ব ও রমণীদিগের গমনাগমনের ব্যবস্থা দেখা যায়। মধ্যমন্দিরা নৌকা রাজাদিগের বিলাস প্রভৃতির উপকরণরূপে এবং বর্ষাকালে ব্যবহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অগ্রমন্দিরা নৌকা চিরপ্রবাসে যুদ্ধকার্য্যে এবং বর্ষার অবসানে প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। (১৭)

নৌকার গৃহ কাষ্ঠজ ও ধাতুজ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কাষ্ঠজ-গৃহ সুখসম্পত্তিপ্রদ ও ধাতুজ-গৃহ বিলাসোপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (১৮) গ্রন্থকারের উক্তি হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, নৌকাস্থ গৃহমধ্যে শয্যা, আসন, চাঁদোয়া প্রভৃতির সমাবেশ ও শয্যাসনাদি প্রকরণোক্ত নিয়মই প্রতিপালিত হইত, এবং সাধারণতঃ নৌকার যে কিছু লক্ষণ কথিত হইল, উহা কেবল প্রধান নৌকার পক্ষেই বুঝিতে হইবে। (১৯) সুতরাং সাধারণ নৌকার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থান্তরে নিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ লঘুতা, দৃঢ়তা, শীঘ্রগামিতা, অছিদ্রতা ও সমতা এই কয়টি নৌকার গুণ বিবেচিত হইতেছে। (২০) যুক্তিকল্পতরুতেই নৌকাকে যুদ্ধের উপকরণরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনির ব্যাকরণে এবং অমর কোষ প্রভৃতি গ্রন্থে সেনাঙ্গ শ্রেণীতে হস্তী অশ্ব, রথ ও পদাতিই পরিগণিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় ভারতে নৌযুদ্ধের উদ্ভাবন প্রথমতঃ গৌড়েই হইয়াছিল। কালিদাসের লেখনীও রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় এই বিষয়ের সমর্থন করিতেছে। (২১)

---

(১৩) কেশরী মহিষো নাগো দ্বিরদো ব্যাঘ্র এব চ।
পক্ষী ভেকো মনুষ্যশ্চ এতেষাং বদনাষ্টকম্॥
নাবাং মুখে পরিণ্যাসা আদিত্যাদি-দশভুবাম্।
কলসো দর্পণশ্চন্দ্র স্ত্রৈদেশানাং মহীভুজাম্॥

(১৪) হংসঃ কেকী শুকঃ সিংহো গজোঽহিব্র্যাঘ্র-ষট্‌পদৌ।

(১৫) নৌকাসু মণিবিন্যাসো বিজ্ঞেয়ো নবদণ্ডবৎ।

(১৬) মুক্তাস্তবকৈর্যুক্তা নৌকা স্যাৎ সর্ব্বতো ভদ্রা॥
কণকাদীনাং মালা জয়মালেতি গদ্যতে সদ্ভিঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রে দ্বিতয়ে একৈকে বৈশ্যশূদ্রয়োর্যো॥

(১৭) নির্গৃহং সগৃহং বাথ তৎ সর্ব্বং দ্বিবিধং ভবেৎ।
নির্গৃহং পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং সগৃহাণি যথা শৃণু॥
সগৃহা ত্রিবিধা প্রোক্তা সর্ব্বমধ্যাগ্রমন্দিরা।
সর্ব্বতো মন্দিরং যত্র সা জ্ঞেয়া সর্ব্বমন্দিরা॥
রাজ্ঞাং কোশাশ্বনারীণাং যানমত্র প্রশস্যতে।
মধ্যতো মন্দিরং যত্র সা জ্ঞেয়া মধ্যমন্দিরা॥
রাজ্ঞাং বিলাস-যাত্রাদি বর্ষাসু চ প্রশস্যতে॥
অগ্রতো মন্দিরং যত্র সা জ্ঞেয়া অগ্রমন্দিরা।
চিরপ্রবাস-যাত্রায়াং রণে কালে ঘনাত্যয়ে॥

(১৮) কাষ্ঠজং ধাতুজঞ্চেতি মন্দিরং দ্বিবিধং ভবেৎ।
কাষ্ঠজং সুখসম্পত্ত্যৈ বিলাসে ধাতুজং মতম্।
অত্র শয্যাসনাদীনাং মন্দিরোল্লোচয়োরপি।
অন্যোন্যাঞ্চৈব যুক্তিভির্নির্ণয়ঃ পূর্ব্ববন্মতঃ॥

(১৯) দিঙ্‌মাত্রমিদমুদ্দিষ্টং নৌকালক্ষণমগ্রজম্।
প্রধানেষ্বেব নিয়মা অপ্রধানে ন নির্ণয়ঃ।

(২০) লঘুতা দৃঢ়তা চৈব গামিতাঽচ্ছিদ্রতা তথা।
সমতেতি গুণোদ্দেশো নৌকানাং সংপ্রকাশিতঃ॥

(২১) বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ সাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ। (৪।৩৬)

গৌড়ের সম্পর্কেই ভোজদেবের গ্রন্থমধ্যে নৌকা যুদ্ধোপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, এই কল্পনা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে চতুরঙ্গ সেনার বর্ণন প্রসঙ্গে প্রথমেই নৌবাটকের সমুল্লেখ দেখা যায়। বলাবাহুল্য যে, যুদ্ধার্থ ব্যবহারে সজ্জিত নৌকা-শ্রেণীই "নৌবাটক" নামে অভিহিত হইয়াছে।

(গৌড়লেখমালা ১৪পৃঃ দ্রষ্টব্য)

মহাভারতে "যন্ত্রচালিত" নৌকার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বিদুর কর্তৃক প্রেরিত মানব পার্থ দিগকে ক্ষিপ্রগামিনী "যন্ত্রযুক্তা" পতাকান্বিতা ও "সর্ব্ববাতসহা" নৌকা দেখাইয়াছিল। (২৩)

শব্দকল্পদ্রুমে এবং তাহার পরবর্ত্তী অভিধানে নিঃসন্দেহে উক্ত "যন্ত্রযুক্তা" নৌকা ইদানীন্তন ষ্টীমার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। "এতেন যন্ত্রবাহিতা নৌকা প্রতীয়তে। কলের নৌকা ইতি ইষ্টিম্বোট্ ইতি যস্যাঃ প্রসিদ্ধিঃ"। আমরা কিন্তু এই ব্যাখ্যার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ অধুনা অনেক যন্ত্র ষ্টিমের সাহায্যে পরিচালিত হয় দেখিয়া প্রাচীনকালেও যন্ত্রমাত্রই ষ্টিমের সাহায্যে পরিচালিত হইত, এই কল্পনা নিতান্তই ভিত্তিহীন। পূর্ব্বকালেও নানাকার্য্যের উপযোগী প্রভূত যন্ত্রের উল্লেখ সাহিত্যে দেখা যায়। কিন্তু ষ্টিমের ব্যবহারের উল্লেখ নাই। সুতরাং এই যন্ত্র বায়ুকে নিজের ইচ্ছানুরূপে তাহার প্রতিকূল দিকেও চালাইবার কল বলিয়াই প্রতিভাত হয়। বর্ণিত নৌকার "সর্ব্ববাতসহা" বিশেষণটি আমাদের ব্যাখ্যার সহায়তা করিতেছে। কারণ যাহা সর্ব্বপ্রকার বায়ুর বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়, তাহাই সর্ব্ববাতসহা শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। বায়ুর আঘাতে ভাঙ্গিয়া না পড়া তাৎপর্য্য নহে। তাহা নৌকামাত্রের সাধারণ গুণ দৃঢ়তার দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়।

গীতা-রহস্য অথবা কর্ম্মযোগ-পরিশিষ্ট।

ভাগ ৭—গীতা ও খৃষ্টানদিগের বাইবেল।

(শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

উপর্য্যুক্ত আলোচনা হইতে স্থির হইল যে, ভারতবর্ষে ভক্তিপ্রধান ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাব খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১৪ শতাব্দীতে হইয়াছিল, এবং খৃষ্টের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত সন্ন্যাসপ্রধান মূল বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবৃত্তিপ্রধান ভক্তিতত্ত্বের প্রবেশ বৌদ্ধগ্রন্থকারদিগেরই মতে, শ্রীকৃষ্ণপ্রণীত গীতারই কারণে হইয়াছে। গীতার অনেক সিদ্ধান্ত খৃষ্টানদিগের নূতন বাইবেলেও পাওয়া যায়; বস্, এই ভিত্তির উপরেই, খৃষ্টধর্ম্ম হইতে এই সকল তত্ত্ব গীতায় গৃহীত হইয়া থাকিবে এইরূপ কতকগুলি পাদ্রি স্বকীয় গ্রন্থে যাহা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, এবং বিশেষতঃ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার লরিনসর গীতার জর্ম্মন অনুবাদগ্রন্থে যাহা কিছু প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহার নির্মূলত্ব এক্ষণে স্বতই সিদ্ধ হয়। লরিনসর স্বকীয় পুস্তকের (গীতার জর্মন ভাষান্তরের) শেষে ভগবদ্গীতা ও বাইবেলের—বিশেষত নূতন বাইবেলের প্রায় শতাধিক স্থলে শব্দসাদৃশ্য দেখাইয়াছেন এবং তন্মধ্যে কতকগুলি অসাধারণ ও ভাবিয়া দেখিবার যোগ্যও আছে। উদাহরণ যথা—"সেইদিন তোমরা জানিতে পারিবে যে, আমি আমার পিতার মধ্যে, তোমরা আমার মধ্যে এবং আমি তোমাদের মধ্যে আছি" (জন ১৪. ২০), এই বাক্য গীতার "যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি" (গীতা. ৪. ৩৫), এবং "যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি" (গী ৬. ৩০) এই বাক্যগুলির সহিত সমানার্থকই নহে, প্রত্যুত শব্দশও একই। সেইরূপ জনের পরবর্ত্তী "যে আমাকে প্রীতি করে আমিও তাহাকে প্রীতি করি" এই বাক্যও (১৪. ২১), গীতার "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থং অহং স চ মম প্রিয়ঃ" (গী. ৭. ১৭) এই বাক্যের সহিত সর্ব্বাংশেই সদৃশ। এই বাক্য এবং এই প্রকার অন্য সদৃশ বাক্য হইতে ডাক্তর লরিনসর এইরূপ অনুমান করেন যে, বাইবেল গীতাকারের বিদিত ছিল, এবং গীতা খৃষ্টের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে রচিত হইয়া থাকিবে। ডাঃ লরিনসরের পুস্তকের এই অংশের ইংরাজী অনুবাদ 'ইণ্ডিয়ান আন্টিকোয়ারির' দ্বিতীয় খণ্ডে সেই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং ৺ তৈলং ভগবদ্গীতার যে পদ্যাত্মক ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন তাহার প্রস্তাবনায় তিনি লরিনসরের মতের সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছেন *। ডাঃ লরিনসর পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত ছিলেন না, এবং সংস্কৃত অপেক্ষা খৃষ্টধর্ম্মের জ্ঞান ও অভিমান তাঁহার অধিক ছিল। তাই, তাঁহার মত, শুধু ৺ তৈলঙ্গের নহে, কিন্তু মোক্ষমূলার প্রভৃতি প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগেরও অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছিল। বেচারা লরিনসরের মাথায় এ কল্পনাও হয় তো আসে নাই যে, একবার যখন গীতার কাল নিঃসংশয়রূপে খৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া স্থির হইল, তখনই গীতা ও বাইবেলের মধ্যে আমি যে শত শত অর্থসাদৃশ্য ও শব্দসাদৃশ্য দেখাইয়াছি তাহা ভূতের মতো উল্টা আমারই ঘাড়ে চাপিবে। কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যাহা

---

(২৩) ততঃ স প্রেষিতো বিদ্বান্ বিদুরেণ নরস্তদা।
পার্থানাং দর্শয়ামাস মনোমারুতগামিনীম্॥
সর্ব্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্বিস্রম্ভিভিঃ কৃতাম্॥
মহাভারত—১।১১০৫।৪।৫

* See *Bhagavadgita* translated into English Blank Verse with Notes &c. by K. T. Telang, 1875 (Bombay). This book is different from the translation in the S. B. E. Series.

কখনও স্বপ্নেরও গোচর হয় না, তাহাই কখন কখন চক্ষের সম্মুখে আসিয়া খাড়া হয় ও সত্যসত্য প্রত্যক্ষ হয়, তবে এখন ডাঃ লরিনসরের কথার উত্তর দিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। তথাপি কোন কোন বড় বড় ইংরাজী গ্রন্থে এখনও এই মিথ্যা মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাই এখানে এই সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণার পর যাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে বলা আবশ্যক মনে হয়। প্রথমে ইহা মনে রাখা উচিত যে, যখন কোন দুই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত একরকম হয়, তখন কেবল এই সিদ্ধান্তের সাম্য হইতেই কোন্ গ্রন্থটি প্রথম ও কোন্‌টি পরবর্ত্তী, তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে না। কারণ এস্থলে এই দুইটী সম্ভব যে, (১) এই দুয়ের মধ্যে প্রথম গ্রন্থের বিচার দ্বিতীয় গ্রন্থ হইতে কিম্বা (২) দ্বিতীয় গ্রন্থের বিচার প্রথম গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। তাই প্রথমে যখন দুই গ্রন্থের কাল স্বতন্ত্রভাবে স্থির করিয়া লওয়া হয়, তখন আবার বিচারসাদৃশ্য হইতে স্থির করিতে হয় যে, অমুক গ্রন্থ অমুক গ্রন্থ হইতে অমুক বিচার গ্রহণ করিয়াছেন। তাছাড়া একইরকম বিচার দুই বিভিন্ন দেশের দুই গ্রন্থকারের মনে স্বতন্ত্রভাবে একই কালে কিংবা অগ্রপশ্চাতে উদয় হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে; তাই, ঐ দুই গ্রন্থের সাম্য দেখিবার সময় ইহাও বিচার করিতে হয় যে, উহার উদ্ভব স্বতন্ত্রভাবে হওয়া সম্ভব কি না; এবং যে দুই দেশে এই গ্রন্থ রচিত হইল, তাহাদের মধ্যে তৎকালে যাতায়াত বা কারবার থাকায় এক দেশ হইতে এই বিচার অপর দেশে যাওয়া সম্ভব ছিল কি না। এই প্রকার সকল দিক্ হইতে দেখিলে দেখা যায় যে, খৃষ্টধর্ম্ম হইতে কোন বিষয়ই গীতায় গৃহীত হওয়া সম্ভব ছিল না; বরঞ্চ গীতার তত্ত্বসমূহের ন্যায় যে কিছু তত্ত্ব খৃষ্টীয় বাইবেলে পাওয়া যায়, সেগুলি বরং বাইবেলেই, অন্তত বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে—অর্থাৎ পর্য্যায়-ক্রমে গীতা হইতে বা বৈদিক ধর্ম্ম হইতেই—খৃষ্ট কিংবা তাঁহার শিষ্যদের কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়াই খুব সম্ভব; এবং কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এক্ষণে ইহা স্পষ্টরূপে বলিতেও আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রকারে দাঁড়িপাল্লা অন্যদিকে ঝুঁকিয়াছে দেখিয়া, গোঁড়া খৃষ্টভক্তেরা আশ্চর্য্য হইবেন এবং এই কথা অস্বীকারের দিকেই যদি তাঁহাদের মনের প্রবণতা হয়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু ইহাঁদিগকে আমি এইটুকু বলিতে চাহি যে, এই প্রশ্ন ধর্ম্ম-ঘটিত নহে, ইহা ঐতিহাসিক; অতএব ইতিহাসের চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে অধুনা উপলব্ধ বিষয়সমূহ হইতে শান্তভাবে বিচার করা আবশ্যক। তার পর ইহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেই সিদ্ধান্তই সকলেরই পক্ষে, বিশেষত বিচারসাদৃশ্যের প্রশ্ন যাঁহারা প্রথমে উপস্থিত করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে আনন্দের সহিত ও পক্ষপাতরহিত বুদ্ধিতে গ্রহণ করাই ন্যায্য ও যুক্তিসিদ্ধ।

ইহুদী বাইবেলে অর্থাৎ বাইবেলের পুরাতন বিধানে প্রতিপাদিত প্রাচীন ইহুদী ধর্ম্মের সংস্করণ হিসাবে খৃষ্টধর্ম্মের নববিধান বাহির হইয়াছে। ইহুদী ভাষায় ঈশ্বরকে 'ইলোহা' (আরবী 'ইলাহ') বলে। কিন্তু মোজেসের (Moses) স্থাপিত নিয়মানুসারে ইহুদীধর্ম্মের মুখ্য উপাস্য দেবতার বিশেষ সংজ্ঞা হইল 'জিহোভা'। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে, এই 'জিহোভা' শব্দ মূলে ইহুদী শব্দ নহে; খাল্দীয় ভাষার 'যহেব' (সংস্কৃত যহ্ব) শব্দ হইতে আসিয়াছে। ইহুদীরা মূর্ত্তিপূজক নহে। অগ্নিতে পশু বা অন্য বস্তুর হোম করা; ঈশ্বরের স্থাপিত নিয়মসকল পালন করিয়া জিহোভাকে সন্তুষ্ট করা এবং তাঁহার দ্বারা ইহলোকে নিজের ও নিজের জাতির কল্যাণ সাধন করা—ইহাই উহাদের ধর্ম্মের মুখ্য আচার। সংক্ষেপে বলিতে হইলে, বৈদিক ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড অনুসারে, ইহুদী ধর্ম্মকেও যজ্ঞময় ও প্রবৃত্তিপর, বলা যায়। ইহার বিরুদ্ধে অনেক স্থানে খৃষ্টের উপদেশ আছে যে, 'আমি (হিংসাকারক) যজ্ঞ চাহি না, আমি (ঈশ্বরের) কৃপা চাই (মাথ্যু. ৯. ১৩), 'ঈশ্বর ও দ্রব্য উভয়ের সাধন এক সঙ্গে হইতে পারে না' (মাথ্যু. ৬. ২৪), 'যে অমৃতত্ব লাভ করিতে চাহে, তাহাকে স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া আমার ভক্ত হইতে হইবে' (মাথ্যু ১৯. ২১); এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে ধর্ম্ম প্রচারার্থ যখন দেশ-বিদেশে প্রেরণ করেন তখন সন্ন্যাসধর্ম্মের এই নিয়ম সকল পালন করিবার জন্য খৃষ্ট তাঁহাদিগকে উপদেশ করিলেন যে, "তোমরা তোমাদের কাছে সোনা, রূপা কিংবা অনাবশ্যক বস্ত্রাচ্ছাদনও রাখিবে না" (মাথ্যু. ১০. ৯—১৩)। ইহা সত্য যে, আধুনিক খৃষ্টীয় রাষ্ট্রসকল খৃষ্টের এই সমস্ত উপদেশ গুটাইয়া তাকে উঠাইয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু আধুনিক কালের শঙ্করাচার্য্য হাতী ঘোড়া ব্যবহার করিলে শাঙ্কর সম্প্রদায়কে যেরূপ দরবারী বলা যায় না, সেইরূপ আধুনিক খৃষ্টীয় রাষ্ট্রসমূহের এই আচরণের জন্য মূল খৃষ্টধর্ম্মও এইরূপ প্রবৃত্তিপর ছিল, একথা বলা যায় না। মূল বৈদিক ধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ডাত্মক হইলে পরও, তাহার মধ্যে পরে যেপ্রকার জ্ঞানকাণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেইপ্রকার ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম্মেরও সম্বন্ধ। কিন্তু বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে ক্রমশ জ্ঞানকাণ্ডের ও তাহার পর ভক্তিপ্রধান ভাগবতধর্ম্মের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি শত শত বৎসর পর্য্যন্ত হইতে চলিয়াছে; খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কিন্তু তাহা বলা যায় না। বড় জোর খৃষ্টের প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে এসী বা এসীন নামক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ইহুদিদিগের দেশে সহসা উৎপন্ন হইয়াছিল এইরূপ ইতিহাস হইতে জানা যায়। এই এসী লোকেরা ইহুদীধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিংসাত্মক যাগযজ্ঞ ত্যাগ করিয়া উহারা নির্জ্জনস্থানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তায় কালাতিপাত করিত, এবং জীবিকার জন্য বড় জোর কৃষিকার্য্যের মত কোন নিরুপদ্রব ব্যবসায় করিত। অবিবাহিত থাকা, মদ্য-মাংস বর্জ্জন করা, হিংসা না করা, শপথ গ্রহণ না করা, সংঘের সহিত মঠে থাকা, এবং কেহ কোন দ্রব্য পাইলে তাহা সমস্ত সংঘের সামাজিক লাভ মনে করা প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের মুখ্য তত্ত্ব ছিল। এই মণ্ডলীর মধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে চাহিলে, তাহাকে তিন বৎসর উমেদারী করিয়া তাহার পর কতকগুলি নিয়ম পালন করিব বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। উহাদের মুখ্য মঠ মৃত্যু-সমুদ্রের পশ্চিমধারে এঙ্গদীতে ছিল; সেখানেই উহারা সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া শান্তিতে অবস্থিতি করিত। স্বয়ং খৃষ্ট এবং তাঁহার শিষ্যেরা নব-বিধান বাইবেলে এসী-সম্প্রদায়ের মতের যেরূপ সম্মান পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়াছেন

(মাথ্যু. ৫. ৩৪ ; ১৯. ১২ ; জেমস্ ৫. ১২ ; কৃত্য. ৪. ৩২-৩৫) তাহা হইতে দেখা যায়, যিশুখৃষ্ট এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন ; এবং এই পন্থার সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসধর্ম্ম তিনি অধিক প্রচার করিয়াছেন। খৃষ্টের সন্ন্যাসপর ভক্তিমার্গের পরম্পরা এই প্রকার এসী-সম্প্রদায়ের পরম্পরার সহিত মিলাইয়া দিলেও মূল কর্ম্মময় ইহুদী ধর্ম্মের মধ্যে সন্ন্যাসপর এসী সম্প্রদায়ই বা কি করিয়া প্রাদুর্ভূত হইল ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাহার কোন-না-কোন সযুক্তিক উপপত্তি বলা আবশ্যক। খৃষ্ট এসীন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। এখন ইহা সত্য বলিয়া মনে করিলেও বাইবেলের নববিধানে যে সন্ন্যাসপর ধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে তাহার মূল কি, কিংবা কর্ম্মপ্রধান ইহুদীধর্ম্মে তাহার আবির্ভাব সহসা কিরূপে হইল এই প্রশ্নটিকে এড়াইতে পারা যায় না। ইহাতে কেবল এইটুকু ভেদ হয় যে, এসীন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রশ্নের বদলে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক হয়। কারণ, সমাজশাস্ত্রের এই মামুলী সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গিয়াছে যে, "কোন বিষয় কোথাও হঠাৎ উৎপন্ন হয় না, উহা আস্তে আস্তে অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; এবং যেস্থলে এই প্রকার বৃদ্ধি নজরে না আসে, সেস্থলে প্রায়ই উহা পরকীয় দেশ হইতে কিংবা পরকীয় লোক হইতে গৃহীত হইয়া থাকে"। এই কঠিন সমস্যা প্রাচীন খৃষ্টীয় গ্রন্থকারদিগের নজরে আসে নাই এরূপ নহে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম য়ুরোপীয়দিগের জ্ঞানগোচরে আসিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তত্ত্বানুসন্ধায়ী খৃষ্টীয় বিদ্বানদিগের এইরূপ মত ছিল যে, গ্রীক ও ইহুদি লোকদিগের পরস্পর নিকট-সম্বন্ধ ঘটিলে পর গ্রীকলোকদিগের—বিশেষতঃ পাইথাগোরসের—তত্ত্বজ্ঞানের দরুণ, কর্ম্মময় ইহুদীধর্ম্মে এসী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসমার্গের আবির্ভাব হইয়া থাকিবে। কিন্তু আধুনিক গবেষণা হইতে এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া মানা যায় না। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, যজ্ঞময় ইহুদী ধর্ম্মে হঠাৎ সন্ন্যাসপর এসী-ধর্ম্মের বা খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাব হওয়া স্বভাবত সম্ভব ছিল না, এবং ইহুদীধর্ম্মের বাহিরে উহার অন্য কোন-না-কোন কারণ হইয়াছিল—এই কল্পনাটি নূতন নহে, কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে খৃষ্টান পণ্ডিতদিগেরও এই মত গ্রাহ্য হইয়াছিল।

পাইথাগোরসের তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানের কোথাও অধিক সাম্য আছে—এইরূপ কোলব্রুক * বলিয়াছেন ; তাই উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত ঠিক মনে করিলেও এসী-সম্প্রদায়ের জনকত্ব পরম্পরাক্রমে ভারতবর্ষেই আসে। কিন্তু এতটা ঘোর-ফের করিবারও কোন আবশ্যকতা নাই। বৌদ্ধগ্রন্থ ও বাইবেলের নব-বিধান তুলনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, পাইথাগোরীয় মণ্ডলীর সহিত এসী বা খৃষ্টধর্ম্মের যত সাম্য আছে, তদপেক্ষা অধিক ও বিশেষ সাম্য বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত শুধু এসীধর্ম্মেরই নহে, কিন্তু খৃষ্টচরিত্র ও খৃষ্ট-উপদেশেরও আছে। খৃষ্টকে ভুলাইবার জন্য যেরূপ সয়তান চেষ্টা করিয়াছিল এবং যে প্রকার সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইবার সময় খৃষ্ট যেরূপ ৪০ দিন উপবাস করিয়াছিলেন, সেইরূপ বুদ্ধকেও মারের ভয় দেখাইয়া মোহমুগ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করা হইহইয়াছিল এবং সেই সময় বুদ্ধ ৪৯ দিন (সাত সপ্তাহ) উপবাসী ছিলেন, ইহা বুদ্ধচরিত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সেইরূপ পূর্ণ শ্রদ্ধার প্রভাবে জলের উপর দিয়া চলা, মুখের দেহের কান্তি সম্পূর্ণ সূর্য্যের মতো করা, অথবা শরণাগত চোর ও বেশ্যাদিগকেও সদ্‌গতি দেওয়া, ইত্যাদি কথা বুদ্ধ ও খৃষ্ট উভয়ের চরিত্রে একই সমান পাওয়া যায় ; এবং "তুমি আপন প্রতিবেশীকে এবং বৈরীকেও প্রীতি করিবে" প্রভৃতি খৃষ্টের যে মুখ্য মুখ্য নৈতিক উপদেশ আছে, তাহাও কখন কখন একেবারে অক্ষরশঃ মূল বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে খৃষ্টের পূর্ব্বেই আসিয়াছে। উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, ভক্তির তত্ত্ব মূল বৌদ্ধধর্ম্মে ছিল না ; কিন্তু তাহাও পরে, অর্থাৎ খৃষ্টের অন্ততঃ দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বেই, মহাযান বৌদ্ধপন্থায় ভগবদ্‌গীতা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। ইহা মিঃ আর্থর লিলী স্বকীয় পুস্তকে প্রমাণের সহিত স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, এই সাম্য শুধু এইটুকু বিষয়েই পর্য্যাপ্ত নহে, ইহা ব্যতীত খৃষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে আরও শত শত ছোটখাটো বিষয়ে এইরূপই সাম্য আছে। অধিক কি, খৃষ্টকে ক্রুশে চড়াইয়া বধ করিবার দরুণ খৃষ্টানদিগের নিকট ক্রুশের চিহ্ন পবিত্র ও পূজ্য সেই ক্রুশের চিহ্নকে 'স্বস্তিক' 卐 আকারে বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম্ম লোকেরা খৃষ্টের শতশত বৎসর পূর্ব্বাবধিই শুভদায়ক বলিয়া মনে করিত ; এবং ইজিপ্ট প্রভৃতি পৃথিবীর পুরাতন খণ্ডের দেশের মধ্যে শুধু নহে, কিন্তু কলম্বসের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে আমেরিকার পেরু ও মেক্‌সিকো দেশেও স্বস্তিক-চিহ্ন শুভাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহা প্রত্নতত্ত্ববেত্তারা স্থির করিয়াছেন। * ইহা হইতে অনুমান করিতে হয় যে, খৃষ্টের পূর্ব্বেই যে স্বস্তিক চিহ্ন সমস্ত লোকের পূজ্য ছিল, পরে খৃষ্টভক্তেরা কোন-এক বিশেষ ধরণে উহারই উপযোগ করিয়া লয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও প্রাচীন খৃষ্টধর্ম্মোপদেশকদিগের, বিশেষত প্রধান পাদ্রীদিগের, পরিচ্ছদ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেও অনেক সাম্য আছে। উদাহরণ যথা, 'ব্যাপটিজ্‌ম্'-এর অনুষ্ঠান অর্থাৎ স্নানোত্তর দীক্ষা দিবার অনুষ্ঠানও খৃষ্টের পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। এক্ষণে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, দূর-দূর দেশে ধর্ম্মোপদেশক পাঠাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবার পদ্ধতি খৃষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশকের পূর্ব্বেই বৌদ্ধভিক্ষুরা সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিয়াছিল।

এই প্রশ্ন যে-কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, বুদ্ধ ও খৃষ্টের চরিত্র ও নৈতিক উপদেশে এবং এই দুই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানবিধির মধ্যেও এই যে অসাধারণ ও ব্যাপক সাম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ কি ? † বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রন্থের

* See Colebrooke's *Miscellaneous Essays*, Vol. I, PP. 399-400

* See *The Secret of the Pacific* by C. Reginald Enock, 1912. PP. 248-252.

† এই সম্বন্ধে মিঃ আর্থর লিলী *Buddhism in Christendom* এই নামে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিয়াছেন ; তাছাড়া স্বকীয় মত সংক্ষেপে *Buddha and Buddhism* নামক গ্রন্থের শেষ চার ভাগে স্পষ্টরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। আমি পরিশিষ্টের এই ভাগে যে বিচার আলোচনা করিয়াছি তাহা মুখ্যরূপে এই দ্বিতীয়

অনুশীলনের ফলে এই সাম্য যখন প্রথম-প্রথম পাশ্চাত্য-দিগের নজরে পাড়ল, তখন কোন কোন খৃষ্টীয় পাণ্ডিত বলিতে লাগিলেন যে, বৌদ্ধেরা এই তত্ত্ব 'নেষ্টোরিয়ন' নামক আসিয়াখণ্ডে প্রচলিত খৃষ্টীয় পন্থা হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবে। কিন্তু এই কথাই সম্ভবপর নহে; কারণ. নেষ্টার সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকই খৃষ্টের প্রায় সওয়া চারি শত বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; এবং এখন অশোকের শিলালিপি হইতে নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধ হইয়াছে যে, খৃষ্টের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে—এবং নেষ্টারের প্রায় নয় শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধের জন্ম হয়। অশোকের সময়—অর্থাৎ খৃষ্টের অন্তত আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের আশপাশের দেশে খুব প্রচলিত ছিল; এবং বুদ্ধ-চরিত্রাদি গ্রন্থও তখন রচিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাচীনত্ব যখন এইরূপ নির্ব্বিবাদ, তখন খৃষ্টীয় ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যে সাম্য দেখা যায় তৎসম্বন্ধে দুই পক্ষই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়; (১) ঐ সাম্য দুয়ের মধ্যেই স্বতন্ত্র ভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, কিংবা (২) বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে এই সকল তত্ত্ব খৃষ্ট কিংবা খৃষ্টের শিষ্যেরা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। প্রোঃ রিস-ডেভিড্‌স্ বলেন যে, এই বিষয়ে এই সাম্য, বুদ্ধ ও খৃষ্টের পরিস্থিতির ঐক্য নিবন্ধন, উভয়ের মধ্যেই স্বতন্ত্রভাবে স্বভাবতই উৎপন্ন হইয়াছে।† কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে যে, এই কল্পনা সন্তোষজনক নহে। কারণ, কোন নূতন বিষয় কোথাও যখন স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হয় তখন উহা ক্রমে ক্রমেই হইয়া থাকে এবং সেই জন্য উহার উন্নতির ক্রমও আমরা বলিতে পারি। উদাহরণ যথা—বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ড, এবং জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষৎ হইতেই পরে ভক্তি, পাতঞ্জল যোগ কিংবা শেষে বৌদ্ধধর্ম্ম কেমন করিয়া নিঃসৃত হইল, যুক্তিসহকারে তাহার ক্রমপরম্পরা ঠিক দেখান যাইতে পারে। কিন্তু যজ্ঞময় ইহুদীধর্ম্মের সন্ন্যাসপর এসী বা খৃষ্টধর্ম্মের উদ্ভব এই প্রকারে হয় নাই। উহা একে-বারেই উৎপন্ন হইয়াছে; এবং উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, প্রাচীন খৃষ্টান পণ্ডিতদিগেরও ইহা মনে হইয়াছিল যে, এই ভাবে উহার একেবারে উৎপন্ন হইবার কোন কিছু কারণ ইহুদীধর্ম্মের বাহিরে ঘটিয়া থাকিবে। তাছাড়া, খৃষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যে সাম্য দেখা যায় তাহা এত অসাধারণ ও সম্পূর্ণ যে, সেরূপ সাম্য স্বতন্ত্র-ভাবে উৎপন্ন হইতেই পারে না। ইহা যদি সপ্রমাণ হইয়া গিয়া থাকিত যে, সে সময় বৌদ্ধধর্ম্মের কথা ইহুদিদের জানাই সর্ব্বথা অসম্ভব ছিল, তবে সে কথা স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু অলেকজাণ্ডরের পরবর্ত্তী সময়ে—এবং বিশেষত অশোকের সময়েই (অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ২৫০ বৎসরে)—বৌদ্ধ যতিরা পূর্ব্বদিকে ইজিপ্টের অন্তর্গত 'অ্যালেক্‌জান্ড্রিয়া ও গ্রীস পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া ছিল, ইহা ইতিহাস হইতে সপ্রমাণ হয়। অশোকের এক শিলালিপিতে এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনি ইহুদীলোকদিগের ও আশপাশের দেশসমূহের গ্রীক রাজা আন্টিওকসের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। সেইরূপ আবার, খৃষ্ট যখন জন্মিয়াছিলেন তখন পূর্ব্বাঞ্চলের কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি জেরুজলেমে গিয়াছিলেন বাইবেলে ইহা বর্ণিত হইয়াছে (মাথ্যু. ২. ১)। এই জ্ঞানী পুরুষেরা 'মগী' অর্থাৎ সম্ভবত ইরাণী ধর্ম্মের লোক হইবে, ভারতবর্ষের নহে, এইরূপ খৃষ্টানেরা বলেন। কিন্তু যাহাই বল না কেন, উভয়ের অর্থ তো একই। কারণ, এই কালের পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার কাশ্মীর ও কাবুলে হইয়া গিয়াছিল; এবং উহা পূর্ব্বদিকে ইরান ও তুর্কিস্তান পর্য্যন্তও পৌঁছিয়াছিল, ইহা ইতিহাস হইতে স্পষ্ট জানা যায়। তাছাড়া, খৃষ্টের সময়ে ভারতবর্ষের এক যতি লোহিত-সমুদ্রের উপকূলে এবং অলেকজান্ড্রিয়ার আশপাশের প্রদেশে প্রতিবৎসর আসিতেন, এইরূপ প্লুটার্ক স্পষ্ট লিখি-য়াছেন।* তাৎপর্য্য, খৃষ্টের দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বেই, ইহুদীদের দেশে বৌদ্ধ যতিগণ যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে এখন আর কোন সংশয় নাই; এবং এই গতিবিধি যখন সপ্রমাণ হইল, তখন ইহুদী লোকের মধ্যে সন্ন্যাসপর এসী ধর্ম্মের এবং পরে সন্ন্যাসযুক্ত ভক্তিপর খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাব হইবার পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মই যে বিশেষ কারণ হইয়া থাকিবে তাহা সহজেই নিষ্পন্ন হয়। ইংরাজ গ্রন্থকার লিলীও ইহাই অনুমান করি-য়াছেন†; এবং ইহার পুষ্টিকরণার্থ ফরাসী পণ্ডিত এমিল্ বুর্ণুফ্ এবং রোস্নী—এই প্রকার মত আপন আপন গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন; এবং জর্ম্মন-দেশে লিপ্‌জিকের তত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক প্রোঃ সেডন এই বিষয়সংক্রান্ত স্বকীয় গ্রন্থে এই মতই প্রতিপাদন করিয়াছেন। জর্ম্মন প্রোফেসর শ্রডর তাঁহার এক প্রবন্ধে বলেন যে, খৃষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সমান নহে; দুয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাম্য থাকিলেও অন্য বিষয়ে বৈষম্যও অনেক আছে এবং সেই জন্য খৃষ্টধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে নিঃসৃত এই মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু এই কথায় আসল বিষয়টা পরিত্যক্ত হওয়ায় এই কথার কোন অর্থ নাই। খৃষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বাংশে একই, এ কথা কেহই বলে না; কারণ তাহা যদি হইত, তবে এই দুই ধর্ম্ম ভিন্ন বলিয়া ধরা হইত না। মুখ্য প্রশ্ন তো এই যে, যখন মূলে ইহুদ-

গ্রন্থের আধারেই করিয়াছি। *Buddha and Buddhism* গ্রন্থ The World's Ephoch-Makers Series-এর মধ্যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং তাহার দশম ভাগে, বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে প্রায় ৫০টা সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন।

† See *Buddhist Suttas*, S. B. E. Series Vol XI. p. 163.

* See *Plutarch's Morals—Theosophical Essays*, translation by C. N. King (George Bell & Sons) pp. 96. 97. পালীভাষার মহাবংশে (২৯।৩৯) যবনদিগের অর্থাৎ গ্রীকদিগের অলসন্দা (যোন-নগরাংলসন্দা) নামক নগরের উল্লেখ আছে; উহাতে কথিত হই-য়াছে যে, খৃষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে কয়েক বৎসর সিংহলে এক দেবালয়ের নির্ম্মাণকালে অনেক বৌদ্ধযতি উৎসব উপলক্ষে গিয়াছিল মহাবংশের ইংরাজী ভাষান্তরকার অলসন্দা শব্দে ইজিপ্টদেশের অন্তর্গত অলেকজান্ড্রিয়া গ্রহণ না করিয়া, কাবুলের মধ্যে এই নামে আলেকজান্দার এক যে গ্রামে স্থাপন করেন, অলসন্দা শব্দে এই স্থানই বিবক্ষিত এইরূপ বলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ, এই ক্ষুদ্র গ্রামকে কেহই যবনদিগের নগর বলিত না। তাছাড়া উপরি-উক্ত অশোকের শিলালিপিতেই যবনদিগের রাজ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু পাঠাইবার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

† See Lillie's *Buddha and Buddhism* pp. 158 ff.

ধর্ম্ম নিছক কর্ম্মময়, তখন উহাতে সংস্কারের আকারে সন্ন্যাসযুক্ত ভক্তিমার্গ প্রতিপাদক খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের সম্ভবতঃ কি কারণ হইয়াছিল। এবং খৃষ্টধর্ম্মাপেক্ষা বৌদ্ধধর্ম্ম নিঃসংশয় প্রাচীন; উহার ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সন্ন্যাসপর ভক্তি ও নীতির তত্ত্ব খৃষ্ট স্বতন্ত্ররূপে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এই কথা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। খৃষ্ট দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কি করিতেন, অথবা কোথায় ছিলেন এই সম্বন্ধে বাইবেলে কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, এই কাল তিনি সম্ভবত জ্ঞানার্জনে, ধর্ম্মচিন্তনে, ও প্রবাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতএব, জীবনের এই সময়ে তাঁহার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল কি না তাহা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কে বলিতে পারে? কারণ, বৌদ্ধ যতিদিগের গতিবিধি সেই সময়ে গ্রীস দেশ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। নেপালের এক বৌদ্ধ মঠের গ্রন্থে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, যিশু সেই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। নিকোলস নোটোভিস্ নামক এক রুসিয়ান ভদ্রলোক এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাহার ভাষান্তর ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। নোটোভিসের ভাষান্তর ভাল হইলেও মূল গ্রন্থ পরে কোন মিথ্যুক মিথ্যা করিয়া রচনা করিয়াছে, এইরূপ অনেক খৃষ্টান পণ্ডিত বলেন। উক্ত গ্রন্থ এই পণ্ডিতেরা সত্য মনে করুন বলিয়া আমারও বিশেষ কোন আগ্রহ নাই। নোটোভিস যে গ্রন্থ পাইয়াছেন তাহা সত্যই হউক বা প্রক্ষিপ্তই হউক, কেবল ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমি যে বিচার-আলোচনা উপরে করিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, খৃষ্টের না হউক, নিদান পক্ষে নববিধানে তাঁহার চরিত্রলেখক ভক্তদিগের বৌদ্ধধর্ম্মের কথা জানা অসম্ভব ছিল না; এবং ইহা যদি অসম্ভব না হয় তবে খৃষ্ট এবং বুদ্ধের চরিত্র ও উপদেশে যে অসাধারণ সাম্য পাওয়া যায়, উহার স্বতন্ত্র ভাবে উৎপত্তি স্বীকার করাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।* সার কথা, মীমাংসকদিগের নিছক কর্ম্মমার্গ, জনকাদির জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযোগ (নৈষ্কর্ম্য), উপনিষৎকারদিগের ও সাংখ্যদিগের জ্ঞাননিষ্ঠা ও সন্ন্যাস, চিত্তনিরোধরূপ পাতঞ্জল যোগ, এবং পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত ধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তি, এই সমস্ত ধর্ম্মাঙ্গ ও তত্ত্বই মূলে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মেরই অন্তর্ভূত। তন্মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিকে ছাড়িয়া, চিত্তনিরোধরূপ যোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস এই দুই তত্ত্বের ভিত্তিতে বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথম আপন সন্ন্যাসপর ধর্ম্ম চারি বর্ণকে উপদেশ করেন; কিন্তু পরে উহাতেই ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম মিলাইয়া দিয়া বুদ্ধের অনুগামীরা তাঁহার ধর্ম্ম চারিদিকে প্রচার করে। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের এই প্রকার প্রচার হইলে পর, নিছক কর্ম্মপর ইহুদীধর্ম্মে সন্ন্যাসমার্গের তত্ত্ব প্রবেশ করিতে আরম্ভ হয়; এবং শেষে উহাতেই ভক্তি যোগ করিয়া দিয়া খৃষ্ট স্বকীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। ইতিহাস হইতে নিষ্পন্ন এই পরম্পরা দেখিলে, ডাঃ লরিন্সরের এই উক্তি তো অসত্য সিদ্ধ হয় যে, গীতাতে খৃষ্টধর্ম্ম হইতে কোন কিছু গৃহীত হইয়াছে, বরং বিপরীতে, আত্মৌপম্যদৃষ্টি, সন্ন্যাস, নির্বৈরত্ব ও ভক্তির যে সকল তত্ত্ব বাইবেলের নব-বিধান-ভাগে পাওয়া যায় তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে বৈদিক ধর্ম্ম হইতে খৃষ্টধর্ম্মে গৃহীত হওয়া খুব সম্ভব মাত্র নহে, বরঞ্চ গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই বেশ বিশ্বাস হয়। এবং ইহার জন্য হিন্দুদিগকে অপরের মুখের দিকে তাকাইবার কোনও আবশ্যকতা ছিলই না, ইহা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়।

এই প্রকারে, এই প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত সাত প্রশ্নের বিচার শেষ হইল। এক্ষণে ইহারই সঙ্গে কতকগুলি এইরূপ প্রশ্ন উদ্গত হয় যে, ভারতবর্ষে যে ভক্তিপন্থা আজকাল প্রচলিত আছে, উহার উপর ভগবদ্গীতার কি পরিণাম ঘটিয়াছে? কিন্তু এই সকল প্রশ্ন গীতাগ্রন্থসম্বন্ধীয় বলা অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের আধুনিক ইতিহাসের অন্তর্গত এইরূপ বলাই সঙ্গত, সেইজন্য, এবং বিশেষতঃ এই পরিশিষ্ট প্রকরণ অল্প অল্প করিলেও আমার নির্দ্দিষ্ট সীমা অনেক অতিক্রম করিয়াছে; অতএব গীতার বহিরঙ্গের বিচার-আলোচনা এইখানেই শেষ করা গেল।

ইতি পরিশিষ্ট প্রকরণ সমাপ্ত।

* রমেশচন্দ্র দত্তেরও এইরূপ মত; তিনি তাঁহার গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। Romesh Chandra Dutt's *History of Civilization in Ancient India* Vol II, Chap. xx, p. 328-340.

বিশ্বভারতীর পরিষদ-সভার প্রতিষ্ঠা।

(শান্তিনিকেতন মাঘ, ১৩২৮, সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

বিগত ২৩শে ডিসেম্বর, ৮ই পৌষ বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রমের আম্রকুঞ্জে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নূতন শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্বভারতীর সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় বিশ্বভারতী পরিষদ গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর জন্য যে সংস্থিতি (constitution) প্রণীত হইয়াছে তাহা গৃহীত হয়। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য সিলভাঁ লেভি, ম্যাডাম লেভি, রাজগুরু ধর্ম্মাধার মহাস্থবির, ডাক্তার মিস্ ক্রামরিশ, শ্রীযুক্ত উইলিয়মস্ পিয়ার্সন, শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, শ্রীমতী প্রতিমাদেবী, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় স্যার নীলরতন সরকার, দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত এস্. কে রুদ্র, শ্রীযুক্ত মহিম চন্দ্র ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ, ডাক্তার শিশির কুমার মৈত্র, প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির উপবেশনের স্থানটি কলাভবনের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ কর্ত্তৃক আল্পনার দ্বারা চিত্রিত করা হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করিবার

প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং তদুপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত বক্তৃতাটি প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা

আজ বিশ্বভারতী পরিষদের প্রথম অধিবেশন। কিছু দিন থেকে বিশ্বভারতীর এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে আজ সর্ব্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ করে দেব। বিশ্বভারতীর যাঁরা হিতৈষিবৃন্দ ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাইরে আছেন, এর ভাবের সঙ্গে যাঁদের মনের মিল আছে, যাঁরা একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না, তাঁদেরই হাতে আজ একে সমর্পণ করে দেব।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে হঠাৎ আজ আমাদের মধ্যে কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু সমাগত হয়েছেন—যাঁরা দেশে ও দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সকলে জানেন আজ এখানে ডাক্তার শীল, ডাক্তার সরকার এবং ডাক্তার শিশির কুমার মৈত্র উপস্থিত আছেন। আমাদের আরো সৌভাগ্য যে সমুদ্রপার থেকে এখানে একজন মনীষী এসেছেন যাঁর খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত। আজ আমাদের কর্ম্মে যোগদান করতে আচার্য্য পরম সুহৃদ্ সিলভ্যাঁ লেভি মহাশয় এসেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে যখন আমরা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি সেই সভাতে আমরা এঁকে পাশ্চাত্য দেশের প্রতিনিধিরূপে পেয়েছি। ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে ইঁহার চিত্তের সম্বন্ধবন্ধন অনেক দিন থেকে স্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষের আতিথ্য তিনি আশ্রমে আমাদের মধ্যে লাভ করুন। যে সকল সুহৃদ আজ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা আমাদের হাত থেকে এর ভার গ্রহণ করুন। এই বিশ্বভারতীকে আমরা কিছুদিন লালনপালন করলুম, একে বিশ্বের হাতে সমর্পণ করবার এই সময় এসেছে। একে এঁরা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন, এর সঙ্গে আপনার চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপন করুন। এই কামনা নিয়ে আমি আচার্য্য শীল মহাশয়কে সকলের সম্মতিক্রমে বরণ করেছি; তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে কর্ম্ম সম্পন্ন করুন, বিশ্বের প্রতিনিধিরূপে আমাদের হাত থেকে একে গ্রহণ করে বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করুন। তিনি এ বিষয়ে যেমন করে বুঝবেন তেমন আর কেউ পারবেন না। তিনি উদার দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যকে দেখেছেন, কেবল অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেই তা হতে পারে না কারণ অনেক সময়ে পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভেদবুদ্ধি ঘটে। কিন্তু তিনি আত্মিক দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যের ভিতরের ঐক্যকে গ্রহণ করেছেন। আজকের দিনে তাঁর চেয়ে বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করবার যোগ্য আর কেউ নেই। আনন্দের সহিত তাঁর হাতে একে সমর্পণ করছি। তিনি আমাদের হয়ে সকলের সামনে একে উপস্থিত করুন এবং তাঁর চিত্তে যদি বাধা না থাকে তবে নিজে এতে স্থান গ্রহণ করুন, একে আপনার করে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করুন।

বিশ্বভারতীর মর্ম্মের কথাটি আগে বলি, কারণ অনেকে হয়তো ভাল করে তা জানেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পরম সুহৃদ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে সংকল্প হয়েছিল যে, আমাদের দেশে সংস্কৃত শিক্ষা যাকে বলা হয় তার অনুষ্ঠান ও প্রণালীর বিস্তার সাধন করা দরকার। তাঁর খুব ইচ্ছা হয়েছিল যে আমাদের দেশে টোল ও চতুষ্পাঠীরূপে যে সকল বিদ্যায়তন আছে তার অধিকারকে প্রসারিত করতে হবে। তাঁর মনে হয়েছিল যে, যে কালকে আশ্রয় করে এদের প্রতিষ্ঠা সে কালে এদের উপযোগিতার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তন হয়েছে। বর্ত্তমানে গবমেণ্টের দ্বারা যে সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে গুলি এই দেশের নিজের সৃষ্টি নয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পুরাকালের এই বিদ্যালয়গুলির মিল আছে, এরা আমাদের নিজের সৃষ্টি। এখন কেবল দরকার এদের ভিতর দিয়ে নূতন যুগের স্পন্দন তার আহ্বান প্রকাশ পাওয়া; না যদি পায় তো বুঝতে হবে তারা সাড়া দিচ্ছে না—মরে গেছে। এই সংকল্প মনে রেখে তিনি নিজের গ্রামে যান; সে সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ তখনকার মত বিযুক্ত হওয়াতে দুঃখিত হয়েছিলুম। যদিও আমি জানতুম যে ভিতরকার দিক দিয়ে সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তার পর নানা বাধায় তিনি গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করতে পারেন নি। তখন আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম। তাঁর ইচ্ছা সাধন এখানেই হবে, এই স্থানই তার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এমনি ভাবে বিশ্বভারতীর আরম্ভ হল।

গাছের বীজ ক্রমে ক্রমে প্রাণের নিয়মে বিস্তৃতি লাভ করে, সে বিস্তার এমন করে ঘটে যে সেই বীজের সীমার মধ্যে তাকে আর ধরেই না। তেমনি প্রথমে যে শিক্ষার আয়তনকে মনে করেছিলাম দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই আবরুদ্ধ থাকবে, ক্রমে তা বৃহৎ আকাশে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে লাগল। যে অনুষ্ঠান সত্য তার উপরে দাবী সমস্ত বিশ্বের,—তাকে বিশেষ প্রয়োজনে খর্ব্ব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই খর্ব্ব করা হয়। এবার পশ্চিমে গিয়ে দেখেছি যে, পূর্ব্বমহাদেশ কি সম্পদ দিতে পারে, তা সকলে জানতে চাচ্ছে। আজ মানুষকে বেদনা পেতে হয়েছে। সে পুরাকালে যে আশ্রয়কে নির্ম্মাণ করেছিল তার ভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে গেছে; তাতে করে মানুষের মনে হয়েছে এ আশ্রয় তার অভাবকে পূর্ণ করবার উপযোগী নয়। পশ্চিমের মনীষীরাও একথা বুঝতে পেরেছেন এবং মানুষের সাধনা কোন্ পথে গেলে সে অভাব পূর্ণ হবে তাঁদের তা উপলব্ধি করবার ইচ্ছা হয়েছে।

কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যবশতঃ আপন ধর্ম্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে, তবে সেই অহঙ্কারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্যসম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহঙ্কারের দ্বারা সত্যকে কেবলমাত্র স্বকীয় করতে যায় তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই বিশ্ববোধ উদ্বুদ্ধ হতে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে কি এই যুগের সাধনা স্থান পাবে না? আমরা কি এ কথাই বলব যে মানবের বড় অভিপ্রায়কে দূরে রেখে ক্ষুদ্র অভিপ্রায় নিয়ে আমরা থাকতে চাই? তবে কি আমরা মানুষের যে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত হ'ব না? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সঙ্কীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সব চেয়ে বড় গৌরব?

এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও এ'কে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে। কিন্তু

আমাদের দেবার কি আছে?' কল্যাণরূপী শিব তাঁর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছেন। সে ঝুলিতে কে কি দান করবে? শিব সমস্ত মানুষের কাছে সেই ঝুলি নিয়ে এসেছেন। আমাদের কি তাঁকে কিছু দেবার নেই? হাঁ, আমাদের দেবার আছে, এই কথা ভেবেই কাজ করতে হবে। এই জন্যই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

আমি ইচ্ছা করি আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় কিছু বলুন। আমাদের কি কর্ত্তব্য—এই বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর চিত্তের যোগ কোথায়, তা আমরা শুনতে চাই। আমি এই সুযোগ গ্রহণ করে আপনাদের অনুমতি ক্রমে তাঁকে সভাপতির পদে বরণ করলুম।

তাঁহার বক্তৃতার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় অধিষ্ঠাতা আচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবটির অনুমোদন করেন। তিনি বলেন যে—

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে গুরুদেব যা বল্লেন, তাকে প্রকাশ করার জন্য উপনিষদের একটি বাক্য আমরা গ্রহণ করেছি, 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্', "যেখানে বিশ্ব একনীড়ে বাস করে"। বিশ্বভারতীর প্রধান কথা এই যে বাহিরের বিশ্ব সেখানে পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে। বাহির ও ভিতর এ দুয়ের সামঞ্জস্য না হলে যথার্থ কল্যাণ হয় না, শান্তি লাভ করা যায় না। হয় তো কেউ মনে করতে পারেন যে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে একথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়েও এ সত্যকে উপলব্ধি করতে বলা হয়েছে, একথার মধ্যে এই দৃঢ় ভাব নিহিত আছে। আমরা যেন সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারি। এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য শীল মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করবার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা আমি আনন্দে ও সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

তৎপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাক্তার শীল মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহাকে আশ্রমের পক্ষ হইতে পুষ্পচন্দনের দ্বারা বরণ করা হইল। তিনি আসন পরিগ্রহ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন নিম্নে দেওয়া হইল।

ডাক্তার শীলের বক্তৃতা

এই আশ্রমের গুরুর অনুজ্ঞায় ও আপনাদের অনুমতিতে আমাকে যে সভাপতির ভার দেওয়া হ'ল, তাহা আমি শিরোধার্য্য করে নিচ্ছি। আমি এ ভারের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু আজকের এই প্রতিষ্ঠান বিপুল ও বহুযুগব্যাপী। তাই ব্যক্তিগত বিনয় পরিহার করে আমি এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হ'লাম। বহুবৎসর ধরে এই আশ্রমে একটা শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই ধরণের educational experiment দেশে খুব বিরল। এই দেশ তো আশ্রম-সংঘ-বিহারের দেশ। কোথাও কোথাও 'গুরুকুল' এর মত দু' একটা এমনি বিদ্যালয় থাকলেও, এটি এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত, এর স্থান আর কিছুতে পূর্ণ হতে পারে না। এখানে খোলা আকাশের নীচে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেঘ-রৌদ্র-বৃষ্টি-বাতাসে বালক-বালিকারা লালিত-পালিত হচ্ছে। এখানে শুধু বহিরঙ্গ প্রকৃতির আবির্ভাব নয়,—কলাসৃষ্টির দ্বারা অন্তরঙ্গ প্রকৃতিও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জেগে উঠেছে। এখানকার বালক-বালিকারা এক-পরিবারভুক্ত হয়ে আচার্য্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ personality এখানে সর্ব্বদাই এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছেন। এমনি ভাবে এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আজ সেই ভিত্তির প্রসার ও পূর্ণাঙ্গতা সাধন হতে চলল। আজ এখানে বিশ্বভারতীর অভ্যুদয়ের দিন। 'বিশ্বভারতী'র কোষানুযায়িক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে, যে 'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আরেকটি ধ্বনিগত অর্থও আছে;—বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত করে, ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে, আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা আছে।

একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। ভারতের মহাপ্রাণ কোন্‌টা? যে মহাপ্রাণ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, তাকে ধরতে গিয়ে আমরা যদি বিশ্বের সঙ্গে কারবার স্থাপন ও আদান-প্রদান না করি তবে আমাদের আত্মপরিচয় হবে না। "Each can realise himself only by helping other as a whole to realise themselves" এ যেমন সত্য এর converse অর্থাৎ "Others can realise themselves by helping each individual to realise himself"ও তেমনি সত্য। অপরে আমার লক্ষ্যের পথে, যাবার পথে যেমন মধ্যবর্ত্তী তেমনি আমিও তার মধ্যবর্ত্তী; কারণ আমাদের উভয়কে যেখানে ব্রহ্ম বেষ্টন করে আছেন সেখানে আমরা এক, একটি মহা ঐক্যে অন্তরঙ্গ হয়ে আছি। এভাবে দেখতে গেলে বিশ্বভারতীতে ভারতের প্রাণ কি তার পরিচয় পেতে হবে, তাতে করে জগতের যে পরিচয় ঘটবে তার রূপে আত্মাকে প্রতিফলিত দেখতে পাব।

আমি আজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আজ জগৎ জুড়ে একটি সমস্যা রয়েছে। সর্ব্বত্রই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে, সে বিদ্রোহ প্রাচীন সভ্যতা, সমাজতন্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, অনুষ্ঠান সকলের বিরুদ্ধে। আমাদের আশ্রম, দেবালয় প্রভৃতি যা কিছু হয়েছিল, তা যেন সব ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্রোহের অনল জ্বলছে, তা order progress কে মানে না, reform চায় না, কিছুই চায় না। যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেল, এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড় যুদ্ধ চলে আসছে। গত মহাযুদ্ধ তারই একটা প্রকাশ মাত্র। এই সমস্যার পূরণ কেমন করে হবে, শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে? সকল জাতিই এর উত্তর দেবার অধিকারী। এই সমস্যায় ভারতের কি বলবার আছে, দেবার আছে?

আমরা এতকালের ধ্যানধারণা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার দ্বারা এই সমস্যাপূরণ করবার কিছু আছে কিনা? ইয়োরোপে এসম্বন্ধে যে চেষ্টা হচ্ছে সেটা পোলিটিক্যাল অ্যাডমিনিষ্ট্রেষণের দিক দিয়ে হয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর "treaty" "convention" "pact" এর ভিতর দিয়ে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে; এ হবে এবং হবার দরকারও আছে। দেখছি সেখানে Multiple Alliance হয়েও হ'ল না, বিরোধ ঘটল। Arbitration Court এবং Hague Conference এ হল না, শেষে League of Nations এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার অবলম্বন হচ্ছে limitation of arma-

ments; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে এ ছাড়া আরো অন্য দিকে চেষ্টা করতে হবে, কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক দিকে এর চেষ্টা হওয়া দরকার। Universal simultaneous disarmament of all nations এর জন্য নূতন humanisim এর religious movement হওয়া উচিত। তার ফলস্বরূপ যে machinery হবে তা পার্লামেণ্ট বা cabinet এর diplomacyর অধীন থাকবে না। পার্লামেণ্ট সমূহের joint sitting তো হবেই, সেই সঙ্গে বিভিন্ন peopleএরও conference হলে তবেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিষ আবশ্যক হবে massএর life, massএর religion। বর্ত্তমান কালের কেবল মাত্র individual salvationএ চলবে না, সর্ব্বমুক্তিতেই এখন মুক্তি, না হ'লে মুক্তি নেই। ধর্ম্মের এই mass lifeএর দিকটা সমাজে স্থাপন করতে হবে।

ভারতের এ সম্বন্ধে কি বাণী হবে? ভারতও শান্তির অনুধাবন করেছে, চীনদেশও করেছে। চীনে সামাজিক দিক দিয়ে তার চেষ্টা হয়েছে। যদি social fellowship of man with man হয় তবেই international peace হবে, নয় তো হবে না। কনফিউসিয়সের গোড়ার কথাই এই যে, সমাজ একটা পরিবার, শান্তি সামাজিক fellowshipএর উপর স্থাপিত; সমাজে যদি শান্তি হয় তবেই বাইরে শান্তি হতে পারে। ভারতবর্ষে এর আরেকটা ভিত্তি দেওয়া হয়েছে,—তা হচ্ছে অহিংসা, মৈত্রী, শান্তি। প্রত্যেক individualএ বিশ্বরূপ দর্শন এবং তারই ভিতর ব্রহ্মের ঐক্যকে অনুভব করা, এই ভাবের মধ্যে যে Peace আছে ভারতবর্ষ তাকেই চেয়েছে। ব্রহ্মের ভিত্তিতে স্থাপন করে যে peace, compact হবে তাতেই শান্তি আনবে। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় চীন দেশের social fellowship এবং ভারতের আত্মার শান্তি এই দুইই চাই, নতুবা লীগ অফ্ নেশনে কিছু হবে না। Great warএর থেকেও বিশালতর যে দ্বন্দ্ব জগৎ জুড়ে চলছে তার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীকে বাণী দিতে হবে।

ভারতবর্ষ দেখেছে যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে State আছে তা কিছু নয়। সে বলেছে যে নেশনের বাইরেও মহা সত্য আছে, সনাতন ধর্ম্মেই তার স্বাজাত্য রয়েছে। যেখানে আত্মার বিকাশ ও ব্রহ্মের আবির্ভাব সেখানেই তাহার দেশ। ভারতবর্ষ ধর্ম্মের বিস্তৃতির সঙ্গে এই extraterritorial nationality তে বিশ্বাস করেছে। এই ভাবের অনুসরণ করে লীগ অফ নেশন এর nationalityর ধারণাকে সংশোধিত করতে হবে। তেমনি আত্মার দিক দিয়ে extra-territorial sovereigntyর ভাবকে স্থান দিতে হবে। এমনি ভাবে Federation of the world স্থাপিত হতে পারে, এখনকার সময়ের উপযোগী করে লীগ অফ্‌নেশনে এই extra territorial nationalityর কথা উত্থাপন করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে। আমরা দেখতে পাই যে বৌদ্ধ প্রচারকগণ এই ভাবটি প্রচার করেছিলেন যে, প্রত্যেক রাজার code এমন হওয়া উচিত যা শুধু নিজের জাতির নয়, অপর সব জাতির সমানভাবে হিতসাধন করতে পারবে। ভারতের ইতিহাসে এই বিধিটি সর্ব্বদা রক্ষিত হয়েছে, তার রাজারা জয়ে পরাজয়ে—রাজচক্রবর্ত্তী হয়েও—এমনি করে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন।

সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের message কি? আমাদের এখানে group ও communityর স্থান খুব বেশী। এরা intermediary body between state and individual.। রোম প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে state ও individualএ বিরোধ বেধেছিল, শেষে individualism এর পরিণতি হল anarchyতে, এবং state, military socialismএ গিয়ে দাড়াল। আমাদের দেশের ইতিহাসে গ্রামে, বর্ণাশ্রমে এবং ধর্ম্মসংঘের ভিতরে communityর জীবনকেই দেখতে পাই। বর্ণাশ্রমে যেমন প্রতি ব্যক্তির কিছু প্রাপ্য ছিল, তেমনি তার কিছু দেয়ও ছিল, তাকে কতকগুলি নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য পালন করতে হত। Community in the Individual যেমন আছে, তেমনি the Individual in the Communityও আছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে group personality এবং individual personality জাগ্রত আছে, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে। Group personalityর ভিতর individualএর স্বাধিকারকে স্থান দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে ত্রুটি রয়ে গেছে যে, আমাদের individual personalityর বিকাশ হয়নি, co-ordination of power in the stateও হয়নি। আমরা individual personalityর দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, বূহবদ্ধ শত্রুর হাতে আমাদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

আজকাল ইয়োরোপে group principleএর দরকার হচ্ছে। সেখানে political organization, economic organization এ সবই group গঠন করার দিকে যাচ্ছে। আমাদেরও এই পথে সমস্যা পূরণ করবার আছে। আমাদের যেমন ইউরোপের কাছ থেকে State এর centralization ও organization নেবার আছে তেমনি ইউরোপকেও group principle দেবার আছে। আমরা সেদেশ থেকে economic organazationকে গ্রহণ করে আমাদের village communityকে গড়ে তুলব। কৃষিই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন. সুতরাং ruralizationএর দিকে আমাদের চেষ্টাকে নিয়োগ করতে হবে। অবশ্য আমি সেজন্য বলছি না যে town lifeকে develop করতে হবে না, তারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের ভূমির সঙ্গে প্রাণের যোগ সাধন করতে হবে। ভূমির সঙ্গে ownership এর সম্বন্ধ হলে তবে স্বাধীনতা থাকতে পারে। কারখানার জাবনও দরকার আছে, কিন্তু ভূমি ও বাস্তুর সঙ্গে individual ownershipএর যোগকে ছেড়ে না দিয়ে large scale production আনতে হবে, বড় আকারে energyকে আনতে হবে কিন্তু দেখতে হবে কলের energy মানুষের আত্মাকে পীড়িত অভিভূত না করে, যেন জড় না করে দেয়। সমবায়-প্রণালীর দ্বারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে। এমনি ভাবে economic organizationএ ভারতকে আত্মপরিচয় দিতে হবে। আমাদের standard of life এত নিম্ন স্তরে আছে যে আমরা decadent হয়ে মরতে বসেছি। যে প্রণালীতে efficient organisation এর নির্দ্দেশ করলাম তাকে না ছেড়ে বিজ্ঞানকে আমাদের প্রয়োজন সাধনে

লাগাতে হবে। আমাদের বিশ্বভারতীতে তাই রাষ্ট্রনীতি সমাজধর্ম্ম ও অর্থনীতি যে যে institution পৃথিবীতে আছে সে সবকেই study করতে হবে এবং আমাদের দৈন্য কেন ও কোথায় তা বুঝে নিয়ে আমাদের অভাব পূরণ করতে হবে। কিন্তু এতে করে নিজের প্রাণকে ও সৃজনীশক্তিকে যেন বাইরের চাপে নষ্ট না করি। যা কিছু গ্রহণ করব তাকে ভারতের ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে; আমাদের সৃজনীশক্তির দ্বারা তারা coined into our flesh and blood হয়ে যাওয়া চাই।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির Scheme of life আছে কিন্তু তাদের ইতিহাস ও ভূপরিচয়ের মধ্যেও একটি বৃহৎ ঐক্য আছে, এই বিভিন্নতার মধ্যেও এক জায়গায় unity of human race আছে। তাদের সেই ইতিহাস ও ভূগোলের বিভিন্ন environmentএর জন্য যে life values সৃষ্ট হয়েছে, পরস্পরের যোগাযোগের দ্বারা তাদের বিবৃতি হওয়া প্রয়োজন। এই life schemes গুলির আদান-প্রদানে বিশ্বে তাদের বৃহৎ লীলাক্ষেত্র তৈরী হবে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে কি কি অভাব আছে, কি কি আমাদের বাইরে থেকে আহরণ করতে হবে? আমাদের মূল ত্রুটি হচ্ছে আমরা বড় একপেশে, emotional আমাদের ভিতরে will ও intellectএর মধ্যে, subjectivity ও objectivityর মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে। আমরা হয় খুব subjective নয় তো খুব universal। অনেক সময়েই আমরা universalisim বা সাম্যের চরম সীমায় চলে যাই, কিন্তু differentiationএ যাইওনা আমাদের objectivityর পূর্ণ বিকাশ হওয়া দরকার। প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ ও observation এর ভিতর দিয়ে মনের সত্যানুবর্ত্তিতাকে ও শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের intellect এর characterএর অভাব আছে, সুতরাং আমাদের intellectual honestyর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তা হলেই দেখব যে কর্ত্তব্য-বোধ জাগ্রত হয়েছে। অন্য দিকে আমাদের moral ও personal responsibilityর বোধকে জাগাতে হবে; law, justice ও equalityর যা লুপ্ত হয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, এ সকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষা আহরণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে বিশ্বকে না পেলে আমরা নিজেকে পাব না। তাই বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা আত্মপরিচয় লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।

এদেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অনেক প্রতিষ্ঠান আছে; কিন্তু সেখান থেকে cast iron ও rigid standardised product তৈরী হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে naturalness এর স্থান হয়েছে, আশা করি বিশ্বভারতীতে সেই spontanietyর বিকাশের দিকে দৃষ্টি থাকে। Univesityকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। এসিয়ার genius, universal humanismএর দিকে, অতএব ভারতের এবং এসিয়ার interestএ এরূপ একটি Universityর প্রয়োজন আছে। পূর্ব্বে যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ যুগের উপযোগী করে, সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্বভারতীরূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে।

অতঃপর ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি সভায় উপস্থিত করেন। প্রস্তাবটি এই—"স্থির হইল যে বিশ্বভারতী পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হউক এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার প্রথম সভ্যরূপে গণ্য হউন":—

১। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ২। আচার্য্য সিলর্ভ্যা লেভি, ৩। ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র, ৪। প্রিন্সিপাল সুশীলকুমার রুদ্র, ৫। ধর্ম্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির, শ্রীযুক্ত,—৬। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৭। বিধুশেখর শাস্ত্রী ৮। জগদানন্দ রায়, ৯। ক্ষিতিমোহন সেন, ১০। নন্দলাল বসু, ১১। প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ, ১২। নেপালচন্দ্র রায়, ১৩। ফণীভূষণ অধিকারী, ১৪। ভীমরাও শাস্ত্রী, ১৫। অসিতকুমার হালদার, ১৬। উইলিয়ম পিয়ার্সন, ১৭। সি এফ্ অ্যাণ্ড্রুজ, ১৮। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, ২০। সুরেন্দ্রনাথ কর, ২১। গৌরগোপাল ঘোষ, ২২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২৩। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৪। তেজেশচন্দ্র সেন, ২৫। নগেন্দ্রনাথ আইচ, ২৬। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি।

এই উপলক্ষ্যে ডাক্তার সরকার মহাশয় বলেন—

আজ পশ্চিম দেশেও হাহাকার পড়ে গেছে—প্রচলিত শিক্ষায় মানবত্বের বিকাশ হল না। ধন লালসার ভিতর দিয়ে জাতির অবনতি দেখে সে দেশের চিন্তাশীলেরা নিরাশ হয়েছেন। তাঁরা আজ পূর্ব্বের দিকে চেয়ে আছেন—সেখান থেকে এদিক দিয়ে কি আশ্বাস-বাণী পাওয়া যায়। কে কত মানুষকে দাস রূপে পরিণত করতে পারে, কে কত দেশ অধিকার করতে পারে পশ্চিমে তার প্রতিযোগিতা চলছে; এই ব্যাপার দেখে একটি কথা মনে পড়ে। কম্বোডিয়া এক সময়ে বাংলাদেশের অধীন ছিল। সে দেশবাসীরা ভারতবর্ষ থেকে নানা শিক্ষা লাভ করলেন। তাঁদের মধ্যে আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হল; যখন তাঁরা স্বাধীনতার কামনা করলেন, তখন আমাদের পূর্ব্ব পিতামহরা কামান বন্দুক দিয়ে আট ঘাট বাঁধার চেষ্টা না করে, আনন্দের সঙ্গে বলেন—"তথাস্তু!"—এ শিক্ষা আমাদের পৃথিবীকে দেবার আছে।

ভবিষ্যতে বিশ্বমানবের অভিব্যক্তির জন্য কি প্রয়োজন হবে তার সম্পূর্ণ ধারণা করা আজ আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়—কিন্তু মানবের কল্পনা যতদূর যেতে পারে ততদূর পর্য্যন্ত ভেবে একটা ব্যবস্থা স্থির করা হয়েছে। বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যকে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে—তার সংস্থিতিকে যথাসম্ভব ব্যাপক করা হয়েছে—আশা করা যেতে পারে ভবিষ্যতের বৃদ্ধির পথে এ সংস্থিতি অন্তরায় হবে না।

উক্ত প্রস্তাব বিশ্বভারতীর ইতিহাসাধ্যাপক ফরাসী পণ্ডিত মসিয়র সিলভ্যাঁ লেভি অনুমোদন করেন এবং শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন, মিষ্টার উইলিয়াম পিয়ার্সন এবং শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমর্থন করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন।

"স্থির হইল যে নিম্নলিখিত সংস্থিতি গৃহীত হউক; আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অধিষ্ঠাতা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া লইবেন।"

এই প্রস্তাব প্রিন্সিপ্যাল এস্ কে রুদ্র মহাশয় অনুমোদন করেন। তিনি বলেন,—"শান্তিনিকেতনে এসে আমার মনে হয় নিজের জায়গাতেই এসেছি। এখান থেকে গিয়ে যখন দিল্লীর কাজে যোগদান করি তখন দুটি জিনিস আমাকে চেপে ধরে, সরকার এবং আমার ধর্ম্মসম্প্রদায়। এখানে এসে আমি নূতন জিনিস দেখতে পাই, আমাদের যা যথার্থ সম্পদ তা মরে নি। কিন্তু এটি গুরুদেবের শক্তির প্রভাবে হয়েছে। শান্তিনিকেতনের যিনি স্থাপয়িতা তাঁর প্রাণের ঐশ্বর্য্য একে নূতন প্রাণ দিয়েছে। এখানকার বাণী সমস্ত পৃথিবীতে যেতে পারবে সে কথা আজ আবার নূতন করে উপলব্ধি করছি। সাধনার দ্বারাই আমরা আমাদের নিজের অধিকারকে ফিরিয়ে আনতে পারব। আমি এই প্রস্তাবটি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।"

রুদ্র মহাশয় ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ মহাশয় তাহা সমর্থন করেন।

ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র মহাশয় চতুর্থ প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন:—

"স্থির হইল, যে অধিষ্ঠাতা-আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে ১২, ২৩ ও ২৬ ধারানুযায়ী প্রথম তালিকা প্রস্তুত করিবার এবং কর্ম্মসমিতি ও শিক্ষাসমিতির প্রথম বর্ষের সভ্য নিযুক্ত করিবার ভার অর্পণ করা হউক।"

শিশির বাবু প্রস্তাব উপস্থাপন কালে বলেন "বিশ্বভারতীর প্রাণস্বরূপ তাঁকে এই যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এ তো অতি সামান্য। আমরা তাঁর স্বভাব জানি। ত্যাগই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র তিনি প্রভুত্ব ভাল বাসেন না। তিনি আশ্রমকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন।" উক্ত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় অনুমোদন এবং শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় সমর্থন করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন "ডাক্তার শীল মহাশয়ের জ্ঞানের কাছে কেবল আমাদের দেশ নয়, সমস্ত বিশ্ব ঋণী। তিনি আমাদের গৌরবের সামগ্রী, আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা তাঁকে পেয়েছি।"

পরিশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। লেভি সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান কালে তিনি বলেন—"অধ্যাপক মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, আমার আহ্বান স্বীকার করে তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন। এ দেশের জন্য তাঁর অকৃত্রিম প্রেম। যে কোনো ভারতীয় ছাত্র বিদেশে তাঁর কাছে গেছে তাঁর প্রেমে তার চিত্ত অভিষিক্ত হয়ে গেছে। তারা ইহার মুখে ভারতের অশেষ গুণগান শুনেছে, ভারতের প্রতি তাঁর প্রেম কিরূপ জানতে পেরেছে। তিনি বহুদূর থেকে দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার করে এসেছেন। আমেরিকায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর যাবার কথা ছিল। তিনি সেই সম্পত্তিশালী দেশের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করে আমাদের আশ্রমে এসেছেন। আমরা বাহ্যসম্পদে সে দেশের চেয়ে অনেক দরিদ্র তিনি শুধু প্রেমের আকর্ষণে আমাদের এখানে এসে জুটেছেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের যে যোগ এই পুণ্যক্ষেত্রে সাধিত হ'ল আজ তাহারই প্রথম অনুষ্ঠান। এই যোগই বিশ্বভারতীর বড় জিনিষ। পশ্চিমের প্রতিনিধিরূপে তিনি যে বিশেষভাবে বিশ্বভারতীর ভার গ্রহণ করেছেন তজ্জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।"

অতঃপর সভাভঙ্গ হইল। সভাস্থলে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই বিশ্বভারতী পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য আবেদন পত্র স্বাক্ষর করিয়া গিয়াছেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

৭ই পৌষ।

৭ই পৌষের পুণ্যদিবসে সর্ব্বদিনব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বে আশ্রম-বৈতালিকগণ আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া "আমার মুখের কথা
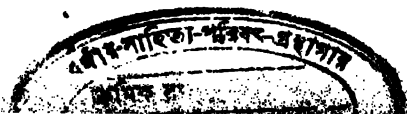
তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে" গানটি গাহিয়া সকলের নিদ্রাভঙ্গ করে। মন্দিরের পার্শ্বে সুমধুর ধ্বনিতে শানাই বাজিয়া উঠিয়া চারিদিকে উৎসবের ভাব আনিয়া দিয়েছিল। আশ্রমবাসী সকলে এবং আগত অতিথি-অভ্যাগতগণ মন্দিরের বৃহৎ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে মন্দিরে সমবেত হইলেন। গুরুদেব মন্দিরে যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার সারমর্ম্ম আগামী বারে প্রকাশিত হইবে। মন্দিরের পর সকলে "কর তাঁর নাম গান" গানটি মহর্ষিদেবের সাধনক্ষেত্র সপ্তপর্ণবেদী প্রদক্ষিণ করিয়া গাহিয়াছিলেন। তৎপর মেলার দিকে সকলে যাত্রা করিলেন।

এবার মেলায় কিছু কিছু নূতন বিষয়ের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের বয়ন-বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের বিভিন্ন প্রকারের তাঁত আনিয়া তাহাদের কার্য্যপ্রণালী সকলকে দেখাইয়াছিলেন। কলিকাতা রিসার্চ ট্যানারী হইতে নানারকমের চামড়া চর্ম্মব্যবসায়ীদের দেখাইবার জন্য আনান হইয়াছিল। তিন রকমের চরকার কাজও মেলায় প্রদর্শিত হয়। বিশ্বভারতীর উত্তরবিভাগের চিত্রশিল্পী ও পূর্ববিভাগের ছাত্রছাত্রীদিগের অঙ্কিত চিত্রাবলী মেলায় চিত্রপ্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীর ফলে অনেক উদীয়মান অজ্ঞাত নবীন চিত্রশিল্পীর পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। একদল কীর্ত্তনীয়ারা মেলায় কীর্ত্তন গাহিয়া বেড়াইয়াছিল। আশ্রমের কয়েকজন ছাত্র ও অধ্যাপক মেলাক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিয়া কীর্ত্তন ও অন্যান্য গান গাহিয়া অনেককে আনন্দ দান করিয়াছিলেন।

স্থানীয় সাঁওতালদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য তীরধনুক দিয়া লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বৈকালে তাহারা দলে দলে নৃত্যগীত করিয়া মেলায় উৎসব করিয়াছিল।

দ্বিপ্রহরে সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও যাত্রাগীত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ভক্তগায়ক ৺নীলকণ্ঠের পুত্র বরাবর আশ্রমে উৎসবের দিন যাত্রা গান করিয়া থাকেন। এবারও তাঁহার দলই এই ভার লইয়াছিল।

সন্ধ্যার সময়ে বিপুল জনতার কিয়দংশকে লইয়া ছায়াচিত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হয়। ইক্ষুচাষ ধানকাটা, বন্যজন্তু ধরা প্রভৃতির ছবি ও বায়স্কোপের সাহায্যে দেখানো হয়। এগুলি সকলে বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিয়াছিল।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও বাজী পোড়ানো হইয়াছিল। সায়ংকালে সহস্র সহস্র নরনারীর কলকোলাহলে আমাদের নিস্তব্ধ প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

৮ই পৌষ।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ গুরুদেব "ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম" নাম দিয়া একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩১৮ সালের ৮ই পৌষ হইতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সাম্বৎসরিক উৎসব নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। ১৩২৬ সালের ৮ই পৌষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে উচ্চতর শিক্ষা দিবার জন্য "বিশ্বভারতীর" গোড়া পত্তন হয়। এই দুই বৎসর ধরিয়া বিশ্বভারতীর উদ্যোগপর্ব্ব চলিতেছিল। এ বৎসর গুরুদেব তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী এই দুই প্রতিষ্ঠানকে একনামে অভিহিত করিয়া "বিশ্বভারতী" অথবা The Santiniketan University নাম দিয়া ইহার সংস্থিতি প্রস্তুত করিয়া দেশের লোককে ইহা উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। ৮ই পৌষ সকালে ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। ইহার বিবরণ অন্যত্র প্রকাশিত হইল।

বিশ্বভারতীর পরিষদ সভার পরে প্রাক্তন ও বর্ত্তমান আশ্রমবাসীগণের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের প্রস্তাবক্রমে ডাক্তার শিশির কুমার মৈত্র মহাশয় এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভারম্ভে 'যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ণ ধ্মাতো হদ্রিবঃ—এই বেদ গানটি গীত হয়। তৎপরে গত বৎসরের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় ও বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় আশ্রমের ও বিশ্বভারতীর বাৎসরিক প্রতিবেদন পাঠ করেন। তাহার পর আশ্রমের যে সকল পুরাতন ছাত্র অধ্যাপক ও হিতৈষীরা অদ্যকার দিনে আশ্রমে উপস্থিত হইতে পারেন নাই তাঁহাদের পত্রাদি পঠিত হয়। অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

ডাক্তার মৈত্রের অভিভাষণের সারমর্ম্ম

আপনারা আমাকে এই আসনে আহ্বান করিয়া বিপদগ্রস্ত করিয়াছেন—এ সম্মানের আমি অনুপযুক্ত। জীবনে এ পর্য্যন্ত কোনও সত্যে উপনীত হই নাই, সত্যের পথে আমি তীর্থযাত্রী মাত্র, কর্ম্মের জগতে সামান্য মজুর এমন জ্ঞানী এবং কর্ম্মীদের সভায় আমার সভাপতির আসন গ্রহণ করা হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার। তথাপি আপনারা আমাকে যখন আহ্বান করিয়াছেন, তখন সে আহ্বান আমার শিরোধার্য্য।

এ শান্তিনিকেতন প্রকৃতই শান্তির নিকেতন। কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়া যে কি শান্তিলাভ করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। উত্তেজনা মানুষের পক্ষে কিছু

ডিম মন্দ নয়, কিন্তু বরাবর উত্তেজনার মধ্যে মানুষের প্রাণ বাঁচে না।

এখানকার যে শান্তি সে নির্জ্জীবতার শান্তি নয়—it is not the wintry peace of the grave yard—এ শান্তি গতির শান্তি; এ শান্তি মৃত্যুর বাহক নহে, ইহা যৌবনের দূত। এখানে এই কথাই শুনিতেছি "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত"। শান্তির পথিক, তোমার যেন মনে থাকে, তেজো বৈ সঃ, তিনি তেজ স্বরূপ।

জগতের উৎপত্তিই যখন গতিশীল, তখন গতিহীন স্তব্ধতা কখনো শান্তি দিতে পারে না। বাস্তবিক কর্ম্ম-সন্ন্যাস ত্যাগই নহে। নৈষ্কর্ম্ম্যে ত্যাগের ধর্ম্ম প্রকটিত নহে।

ত্যাগ বলিতে আমরা বুঝি, দ্বন্দ্ব প্রলোভনের মধ্যে সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, শাশ্বতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আরামকে বিলাসকে তুচ্ছজ্ঞান করতঃ কঠিন কর্ত্তব্যকে বরণ করিয়া লওয়া। ত্যাগে সংসারের প্রতি উদাসীনতা নাই, কেবল ভোগের প্রতি আছে। ত্যাগী পুরুষ কর্ম্মী।

আজ শান্তিনিকেতনে যে ত্যাগের ভাব দেখিতেছি তাহা এইরূপ কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে। যে জলন্ত ত্যাগের উদাহরণ শান্তিনিকেতনের কি ছাত্র, কি অধ্যাপক, কি দর্শককে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা আর একদিকে কর্ম্মীরই উদাহরণ। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বাংলার গৌরব, ভারতবর্ষের এবং জগতের গৌরব কবি রবীন্দ্রনাথ একজন প্রকৃষ্ট কর্ম্মী—এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইতে সকল কর্ম্মেই তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তি কবির সহিত এই আশ্রমকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবনে আমরা একাধারে ত্যাগ ও কর্ম্মনিষ্ঠার অধিষ্ঠান দেখিতে পাই। প্রত্যেক ছাত্রটীও এখানে ত্যাগ ও কর্ম্ম উভয়ের মিলন নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করে। ভোগ বিলাস ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে আত্মোৎসর্গ না করা ইঁহাদের পক্ষে কঠিন।

একাধারে এই ত্যাগ ও কর্ম্মের সমাবেশে আশ্রমটি এমন শান্তিময় হইয়াছে। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—ভোগের আশা মনে না করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। এইরূপ কর্ম্ম যতদূর শাখা-প্রশাখা মণ্ডিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ততই মঙ্গল। অনেকদিন পর্য্যন্ত মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল—সমাজনীতি এবং সামাজিক জীবনেরই একাংশ মাত্র যে রাষ্ট্রনীতি, ছাত্রদের পক্ষে তাহার চর্চ্চা একেবারেই বর্জ্জনীয়। আমার মনে হয় এ ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। এই আশ্রম-বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণস্বরূপ কবি রবীন্দ্রনাথও এ ধারণা পোষণ করেন না। সেইজন্যই এই আশ্রমে এত স্বাধীন চিন্তা আমরা দেখিতে পাই। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে কোনও প্রতিবন্ধকতাই তিনি রাখেন নাই। মানব-প্রকৃতি যে বিশ্বনিয়মের অনুবর্ত্তী, তাহা ইংরেজের শাসন মানে না, সমাজরক্ষকের শাসনও মানে না। যাহা স্বাভাবিক, যাহা নৈসর্গিক তাহাকে জোর করিয়া বন্ধ করিতে গেলেই তাহা চতুর্গুণ শক্তিতে বাধা ঠেলিয়া অস্বাভাবিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। শান্তিনিকেতনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ত্যাগ আছে বলিয়াই ত্যাগ এবং সংযম এখানকার ছাত্রদের মজ্জাগত। সমাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সেইজন্যই এত স্বাভাবিকভাবে তাহারা আলোচনা করিতে পারে, এ সকল হইতে কোনও অনিষ্ট তাহাদের ঘটে না।

আমি এই মাসের "Calcutta Review"এ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে কবি রবীন্দ্রনাথের মূল মন্ত্র হইতেছে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব, humanity in its totality। এই মূল মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। এই শান্তিনিকেতনেও তাহারই উদাহরণ দেখিতে পাই। এখানে সর্ব্বাগ্রে এই কথাই মনে হয়, এখানকার ছাত্রজীবন কলিকাতার ছাত্রজীবনের তুলনায় কত বেশী পূর্ণ। বহুমূল্য অট্টালিকা, সাজসরঞ্জামসত্বেও এখানকার তুলনায় সে জীবন রিক্ত।—সমবায় বোধ (coroporate feeling) সেখানে কতই কম, অন্য ছেলেদের সুখ দুঃখ সেখানে কয়জনের নিকটেই বা বাস্তব বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু এখানে সকলেই পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ—সে বন্ধন শুধু একত্র বাসের বন্ধন নহে আশ্রমের প্রত্যেক গাছটি প্রত্যেক গৃহের প্রত্যেক ইষ্টকটির সহিত তাহাদের একটা নাড়ীর টান আছে। ইহাদের সব চিন্তা বইয়ের পাতার মধ্যে আবদ্ধ নহে, দেশের এবং দশের কথা ইহারা চিন্তা করে, social service এখানকার ছাত্রজীবনের একটি অঙ্গ। Co operative movement এখানে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। আশা করা যায় নবাগত Mr. Elmhirst এর চেষ্টায় ইহা আরও পল্লবিত হইয়া উঠিবে। কৃষিশিক্ষার এখানে বিশেষ আয়োজন চলিয়াছে সঙ্গীত ও কলাবিদ্যার শিক্ষা এই আশ্রমের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহা ইহাদের জীবনকে যে স্ফূর্ত্তি এবং পূর্ণতা দিতেছে, অন্যত্র তাহা দেখা যায় না।

আজ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা এখানে হইল। যে আদর্শে শান্তিনিকেতন এতদিন চালিত হইয়াছিল সেই আদর্শ বিশ্বভারতীও গ্রহণ করিল। সমগ্র জগৎ নূতন আলোক পাইবার আশায় এই বিশ্বভারতীর দিকে

তাকাইয়া আছে—কেননা যে ভাবে এই শান্তিনিকেতন এতদিন চালিত হইয়াছে তাহাতে এই বিশ্বভারতীর নিকট হইতেই আমরা সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারি যাহা আমাদিগকে অসৎ হইতে সতে, তমঃ হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইতে পারে।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পরে আশ্রমপ্রতিষ্ঠার দিন রচিত "মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ" গানটি গীত হইলে সভা ভঙ্গ হয় এবং সকলে আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া "আমাদের শান্তিনিকেতন" গান করেন।

৮ই বৈকালে পুরাতন ও বর্ত্তমান ছাত্রদের sports হইয়াছিল। ইহাতে শ্রীবিনায়ক মাসোজী (বিশ্বভারতী) শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (প্রাক্তন) ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বর্ত্তমান) বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সাঁওতাল বনাম আশ্রমের tug of warএ সাঁওতালগণ এবং সাঁওতাল বনাম প্রাক্তনদের tug of warএ প্রাক্তনগণ জয়ী হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যাবেলা নাট্যশালায় প্রধানতঃ প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্যোগে "বিসর্জ্জন" নাটকটি এবং সংস্কৃত "বেণীসংহারের" কিয়দংশ অভিনীত হইয়াছিল। প্রধান পাত্রগণের অংশ নিম্নলিখিতরা লইয়াছিলেন :—গোবিন্দ মাণিক্য শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার নক্ষত্র রায়, শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী, রঘুপতি শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জয়সিংহ ও অশ্বত্থামা (বেণীসংহার) শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। সকলেরই বিশেষতঃ রঘুপতির ও অশ্বত্থামার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। বিসর্জ্জনের অনন্তর দৃশ্যগুলি সরোজরঞ্জন, বিশ্বভারতীর ছাত্র শচীন্দ্র কর প্রভৃতি খুব জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়ের দরুণ মোট ৭২॥০ টাকা আদায় হইয়াছিল। তাহা প্রাক্তনছাত্রদের গৃহনির্ম্মাণ ফণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান ছাত্রগণ বিনা টিকিটেই অভিনয় দেখিয়াছিল।

৺ প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

আমরা গভীর শোকের সহিত ৺প্রতিভা দেবীর স্বর্গারোহণ সংবাদ প্রকাশ করিতেছি। প্রতিভা দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র ৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং স্বনামধন্য সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী। প্রতিভা দেবী আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া বিগত ২৩ পৌষ শনিবার রাত্রিশেষে ব্রহ্মমুহূর্ত্তে হৃদরোগে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পরলোকগমনে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতা মহিলাগণের মধ্যে যে স্থান শূন্য হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। ৺ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিত করিবার জন্য যে বিপুল আয়াস পাইতেন, তাহা সংসারে, বিশেষত সে কালে ভারতবাসীগণের মধ্যে নিতান্ত বিরল ছিল। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বালিকাগণের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রতিভা দেবীকে বেথুন স্কুলে প্রেরণ করেন। ইতিপূর্ব্বে বালিকাগণ সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার অতিরিক্ত বিশেষ কোন শিক্ষা লাভ করিত না। যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিতে না করিতে পিতামাতারা কন্যাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ দিয়া প্রকৃত শিক্ষালাভে বঞ্চিত করিতেন। হেমেন্দ্রনাথ প্রতিভা দেবীকে বেথুন স্কুলে যতদূর সম্ভব ততদূর পড়াইয়াছিলেন। তাঁহারই উপলক্ষ্যে হেমেন্দ্রনাথ স্বীয় ভগ্নীপতি ৺সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বারা বেথুন স্কুলের তৎকালীন কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া ঐ স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বেথুন স্কুলে প্রত্যেক শ্রেণীতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। এই স্কুলে তাঁহারই জন্য পিয়ানো-শিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। একবার পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে তাঁহার বাজানো শুনিয়া অনারেবল মিস বেয়ারিং এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি প্রতিভা দেবীকে রৌপ্যনির্ম্মিত একটী ফুলদানী বিশেষ পারিতোষিক দিয়াছিলেন। এখানে প্রতিভা দেবী তাঁহার সস্নেহ ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে শিক্ষয়িত্রী ও সহপাঠীগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনেককে আজীবন বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

বেথুন স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই হেমেন্দ্রনাথ প্রতিভা দেবীকে লোরেটো হাউসে ভর্ত্তি করাইয়া দেন। ভারতবাসী বালিকাদের মধ্যে তিনিই এখানে প্রথম ভর্ত্তি হন। এখানেও সে সময়ে প্রবেশিকার ব্যবস্থা ছিল না। যত দূর শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল, ততদূর প্রতিভা দেবী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে কি ইংরাজীতে, কি ফরাসিতে, কি পিয়ানোতে, কি সঙ্গীতে, এবং কি চিত্রবিদ্যাতে যে বিষয় তিনি শিক্ষা করিতেন সেই বিষয়েই তিনি বরাবর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেন। এইরূপ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেও একদিনের জন্যও তাঁহার মনে গর্ব্ব স্থান পায় নাই। আজীবন তিনি আপনার শিশু-সরল ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। লোরেটো হাউসেও তিনি নিজের ব্যবহারগুণে শিক্ষয়িত্রী ও সহপাঠীদিগকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।

মাঘোৎসবে বালক বালিকারা যে সঙ্গীত করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন, প্রতিভা দেবীই তাহার পথ-প্রদর্শক। আমাদের মনে পড়ে যে ৭।৮ বৎসর বয়সে তিনি যখন আদিসমাজের সঙ্গীতবেদীর নিম্নস্তরে তাঁহার দুএকটী কনিষ্ঠ ভাইয়ের সহিত বসিয়া সর্ব্ব প্রথম সঙ্গীত করিয়াছিলেন, তখন শ্রোতাদিগের অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব বৈরাগ্য জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি দেশীয় ও বিদেশীয় উভয়বিধ সঙ্গীত বিদ্যায় ভারতমহিলাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বিবাহের পর ইউরোপীয়গণের সমাগমে যেমন পিয়ানো বাজাইয়া ও বিদেশীয় সঙ্গীত করিয়া ইউরোপীয়দিগের মুগ্ধ করিতেন, সেইরূপ বিবাহের পূর্ব্বে "বিদ্বজ্জন সমাগমে" দেশীয় যন্ত্রবাদ্যে এবং দেশীয় গানে শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতেন। "বিদ্বজ্জন সমাগমে" সঙ্গীত ও যন্ত্রবাদ্যে উৎকর্ষ দেখাইবার কারণে তিনি ৺ রঘুনন্দন ঠাকুর এবং ৺ ডাক্তার রাজশ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট বিশেষ পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। এই বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি প্রতিভা" সর্ব্বপ্রথম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে অভিনীত হয়। প্রতিভা দেবী সেই অভিনয়ে সরস্বতীর অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিনয়ে দর্শকগণের মনে যে কি স্বর্গীয় ভাব আসিয়াছিল, তাহা সেই সময়ে "আর্য্য-দর্শন পত্রে কবিবর ৺ রাজকৃষ্ণ রায় লিখিত "বাল্মীকি-প্রতিভা" নামক কবিতায় সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে।

শেষ বয়সে বিশেষভাবে দেশীয় সঙ্গীতের উন্নতি সাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার কায়মনধন সকলই নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রথমে গৃহে "আনন্দ সভা" স্থাপন করিয়া পরিশেষে তাহারই কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিবার জন্য "সঙ্গীত সংঘ" সংস্থাপন করিলেন এবং সমগ্র বঙ্গদেশে দেশীয় সঙ্গীতের বহুল প্রচার কামনায় "আনন্দ-সঙ্গীত" পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করেন।

তাঁহার মধুর চরিত্র তাঁহার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয় কুলকেই মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার মাতৃবিয়োগের পরেও তাঁহার ভাই ভগ্নীগণ তাঁহার মঙ্গল দৃষ্টির বহির্ভূত হয় নাই।

তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে ষোড়শোপচারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ শিরোমণি পৌরোহিত্য করেন। সুগায়ক শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত ও কথকশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন মহাশয় কয়েকটী সময়োপযোগী গান করিয়া শ্রাদ্ধ সভার উপস্থিত জনগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীযুক্ত আশুতোষের এবং তাঁহার পরিবার বর্গের অন্তরে শান্তিপ্রদান করুন এবং পরলোকগত আত্মাকে স্বীয় সুশীতল ক্রোড়ে স্থানদান করুন।

একমেবাদ্বিতীয়ং

বিংশ কল্প

তৃতীয় ভাগ

ফাল্গুন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯২

৯৪৩ সংখ্যা ১৮৪৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিনবতিতম মাঘোৎসব।

(জনৈক দর্শক)

মাঘোৎসবের 'যিনি দেবতা তিনি আনন্দময় ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিবৎসরই ব্রহ্মোৎসবে নিত্য নব আনন্দের বিকাশ হয়; এ বৎসরেও তাহার কোনই অভাব হয় নাই। অধিকন্তু বর্ত্তমানে দেশব্যাপী যে স্বাধীনতার আন্দোলন চলিতেছে, তাহার মধ্যে যতটুকু উদার ও মহৎভাব আছে, তাহার প্রতি এই উৎসবের দেবতারও নিত্য আশীর্ব্বাদ আছে বলিয়াই এবারকার উৎসব যেন একটু বিশিষ্ট মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছিল।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও মহর্ষিদেবের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে প্রাতঃকালের এবং সায়ংকালের উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছিল। সমগ্র প্রাঙ্গন ও উপাসনাবেদিটী পুষ্পমালা ও দীপাবলীতে সুসজ্জিত ও সুশোভিত হইয়া সমাগত ভক্তগণের হৃদয়ে একটী প্রগাঢ় শান্তভাব ও আনন্দ জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

প্রাতঃকালে একে একে ভক্তগণ সমবেত হইলে যথারীতি নির্দ্ধারিত সময়ে অর্চ্চনাগীত গাহিবার পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মধ্যে লইয়া শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করিলেন। তৎপরে সুগায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গায়কগণ এবং বালিকাগণ কর্ত্তৃক কয়েকটী গান গীত হইলে সুধীন্দ্র বাবু একটী কবিতায় উৎসবের উদ্বোধন করিলেন। তাহার পর ক্ষিতীন্দ্র বাবু তাঁহার সবল কণ্ঠে সহজ সরল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় ভক্তজনগণকে ব্রহ্মোপাসনার জন্য উদ্বোধিত করিয়া তুলিলেন।

তৎপরে যথারীতি উপাসনাকার্য্য সুসম্পন্ন হইলে পর উদীয়মান নবীন গীতিকবি প্রিয়দর্শন শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল তাঁহার একটী স্বরচিত গীত সুমিষ্ট কণ্ঠে গাহিয়া বড়ই আনন্দ দিয়াছিলেন। তাহার পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটী হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে "ছেড়োনা আমায়, হে মোর ভরসা" ক্ষিতীন্দ্র বাবুর রচিত এই গানটী শ্রীমতী বাণী দেবী কর্ত্তৃক নানা তান লয় সহকারে গীত হইয়া সকলকে ভক্তিভাবে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

সায়ংকালের উৎসবে অপরাহ্ণ হইতেই লোকসমাগম হইতে আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যার বহু পূর্ব্বেই উৎসবপ্রাঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যায় যখন মঙ্গলশঙ্খ ধ্বনিত হইয়া উঠিল অমনি "ওঁ পিতা নোঽসি" এই বেদমন্ত্রটী সমবেত কণ্ঠে গম্ভীর স্বরে গীত হইতে লাগিল। এই মন্ত্রটীকে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে বহুবারই শুনিয়াছি, কিন্তু স্বরসংযোগে সংগীতের আকারে ইহা গীত

হইয়া ভক্তচিত্তে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব আনয়ন করিয়াছিল।

বেদগানের পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদী গ্রহণ করিলেন। আরম্ভোচিত সংগীত হইবার পর চিন্তামণি বাবু ব্রহ্মোপাসনার জন্য সকলকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। উপাসনার সমাপ্তিতে ক্ষিতীন্দ্র বাবু তাঁহার "আমাদের কর্ত্তব্য" বিষয়ক একটী উপদেশ পাঠ করিলেন। উপদেশটী সময়োচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সমগ্র দেশের সম্মুখে যে ভীষণ দুর্দ্দিন মুখ ব্যাদান করিয়া দাড়াইয়া আছে, তাহাতে শিশু বৃদ্ধ যুবা প্রত্যেকেরই মনে জাগিতেছে—এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমাদের মনে হয়, শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীন্দ্র বাবু তাঁহার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটীর মধ্যে দেশব্যাপী ঐ প্রশ্নের যথাযথ উত্তরটী বাহির করিয়া আমাদের সম্মুখে দিতে পারিয়াছেন। তিনি এই উপদেশে সকলকে ভগবানের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উচ্চ তটভূমিতে আরোহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। সেই আহ্বান তাঁহার সবল কণ্ঠস্বরে অভিব্যক্ত হইয়া সমবেত জনগণের হৃদয়ে ব্রহ্মশক্তিকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও শ্রীমতী মণীষা দেবীর নিয়ন্তৃত্বে বালিকাগণ এবং সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার শিষ্যগণ ব্যতীত শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, কথকশ্রেষ্ঠ শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্ন, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সঙ্গীত করিয়া সমস্ত সভাকে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ধর্ম্মসংস্কার ও চিরসত্য।*

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

গোমুখীবিনির্গতা গঙ্গা হিমাচলের পদপ্রান্ত বিধৌত করিয়া নানা জনপদের মধ্য দিয়া সাগর অভিমুখে ছুটিয়াছে। কিন্তু বঙ্গের শস্যশ্যামল উর্ব্বর ক্ষেত্রের উপর দিয়া গঙ্গার যে খরস্রোত প্রবাহিত, তাহার সেই বারিরাশি পরীক্ষা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে, উহাতে নানা শাখা নদী ও উপনদীর জল মিশ্রিত রহিয়াছে। তেমনি দেখিবে, ধর্ম্মের যে ধারা সমগ্র ভারতবর্ষকে সুধাসিক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা নিরবচ্ছিন্ন বৈদিকযুগের ধর্ম্মপ্রবাহ নহে। পরবর্ত্তী সময়ে মানুষ আপনার অভিজ্ঞতা, সাধনার বলে, অতীন্দ্রিয়জ্ঞানে, যে কিছু সত্য লাভ করিয়াছে, তাহা দিয়া উহার কলেবরকে পরিপুষ্ট পরিবর্দ্ধিত করিয়া আসিয়াছে। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বাহুল্যের মধ্যে অগ্নি, মৃত্যু, বজ্র, বিদ্যুতের অপরিসীম প্রতাপ সন্দর্শনে যখন বৈদিক ঋষিরা বহুদেবতার কল্পনা করিতেছিলেন, জ্ঞানোন্নত উপনিষদের ঋষিরা আবির্ভূত হইয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া উঠিলেন, এ যে একই দেবতা—যাঁহার শক্তির স্ফূর্ত্তি বিশ্বভুবনের যাবতীয় পদার্থে। বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতির ভিতরে তাঁহাকে অনুভব করিয়া কখন বা ভীতিবিহ্বল কখন বা আনন্দপুলকে নিমগ্ন হইতেন; কিন্তু উপনিষদের ঋষিগণ পরবর্ত্তী সময়ে নিজের আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে প্রেমভরে সন্দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া সে বাণী চারিদিকে ঘোষণা করিলেন। ক্রমে বেদান্ত আসিয়া আত্মা ও পরমাত্মার অভেদ, যুক্তি ও বিচারপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লালায়িত হইল। এইরূপ ক্রমিকই ধর্ম্মের অভিনব তত্ত্বের বিকাশ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়ের বিকাশের সূচনা।

মানুষ যখন বিশেষ যুক্তি তর্ক ও ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনুকূল মতের লোক লইয়া সম্প্রদায় গঠন করে এবং নিজ ধারণাকে পূর্ণ বিকাশ দান করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হয়, এবং উহারই কল্পে আপনার সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করে, তখন বাহিরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ ম্লান হইয়া আইসে, এবং পার্থক্য দিন দিন বাড়িয়া যায়। ক্রমে সে আপনার সম্প্রদায়ের বিশেষ মতকে একান্ত করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হয়, এবং উহাকেই অকাট্য সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে। ফলে, বাহির হইতে নব সত্য, নব আলোক লাভের প্রবেশপথ চিররুদ্ধ হইয়া যায়।

বৃক্ষ যেমন নিজ জীবনে কেবলমাত্র একটি দিনের আলোক, উত্তাপ ও বর্ষণ লাভ করিয়া জীবিত

---

* দ্বিনবতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ভবনে ১৮৪৩ শক ১১ই মাঘ বুধবার প্রাতঃকালে বিবৃত।

থাকিতে পারে না, প্রতিদিন আলোক উত্তাপাদি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখে, আমাদিগকেও ধর্ম্মজগতে সঞ্জীবিত থাকিতে হইলে, বাহির হইতে সত্য ও আলোক লাভ করিবার পথকে চিরপ্রমুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। কালভেদে অবস্থার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। বহির্জ্জগতে ও অন্তর্জ্জগতে নব নব সত্য দিন দিন আবিষ্কৃত হইতেছে; নব নব আলোকরশ্মি আসিয়া আমাদিগকে সচকিত করিয়া তুলিতেছে, এবং সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণ ও জীর্ণ-মতের রুদ্ধ দ্বারকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছে। এই নবাগত আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই যে চিরপোষিত মতের সংস্কার সাধন করিতে হইবে, এমন কথা নহে, কিন্তু আপনার সঙ্কীর্ণতা ও মতান্ধতার ভাবকে শিথিল করিয়া সত্য বলিয়া যাহা আপাততঃ প্রকটিত হইতেছে, আপনার নির্ম্মল জ্ঞানে তাহার সত্যতা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া উদারভাবে সেই নবাগত সত্যকে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৌদ্ধধর্ম্ম বাসনানিবৃত্তির ও অহিংসার যে মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিল, তাহার ফলে ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মের ধারার উপরে একটি প্রবল তরঙ্গ সমুত্থিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম নামে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অস্থিমজ্জার বহুল অংশ প্রাচীন ধর্ম্মধারা গ্রাস করিয়া আপন কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছে।

বেদান্ত-ধর্ম্মের অন্য কথায় অদ্বৈতবাদের সঙ্গে সঙ্গেই বলিলে হয়, বৌদ্ধধর্ম্ম বা কর্ম্মবিমুখতার ভাব, যাহা স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে পরবর্ত্তী সময়ে, জনসাধারণকে কর্ম্মপ্রমুখ করিবার জন্য গীতার ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল। কর্ত্তব্য সাধন কর, জগতে ইহাই তোমার ধর্ম্ম, গীতার এই যে বাণী, তাহাও প্রচলিত ধর্ম্মকে কত কাল ধরিয়া পুষ্টিদান করিয়া আসিয়াছে, এখনও করিতেছে।

তান্ত্রিক যুগে ঈশ্বরকে মাতৃরূপে আবেগভরে সম্বোধন করিবার যে মোহন রব ভক্তের অন্তরে জ্বলন্ত আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল, সেই মাতৃ-ভাবের অপূর্ব্ব সাধনা এদেশের ধর্ম্মকে সরল ও বিপুলতর করিয়া তুলিয়াছে। পৌরাণিক যুগের নিষ্ঠা এবং ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া ভোগ্যবস্তুর উপভোগ, জনসাধারণকে বিনয় ও দীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া প্রচলিত ধর্ম্মকে নবশ্রী দান করিয়াছে। গৌরাঙ্গদেব-প্রবর্ত্তিত অহেতুকী ভক্তির সাধনা ও জীবে দয়ার মহতী বার্ত্তা এ দেশীয় ধর্ম্মকে আরও ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে।

বর্ষার জলপ্লাবন নদীর উভয় কূলের বহুদূর পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দেয়। শরৎ ঋতুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জল সরিয়া যায় বটে, কিন্তু পশ্চাতে রাখিয়া যায়, পলিমাটীর স্তর। সে স্তর নিতান্ত স্থূল না হইলেও উপকূলভাগকে বর্ষে বর্ষে সমুচ্চ করিয়া তোলে এবং তাহার অন্তর্নিহিত অসাড় উর্ব্বর শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া তোলে। এই ভারতবর্ষের উপর দিয়া অগণিত ধর্ম্মের তরঙ্গ চলিয়া গিয়াছে। কোন কোন তরঙ্গের আঘাতফলে এ দেশের প্রাচীন গৌরবের অনেক নিদর্শন বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোনটি বা প্রভূত আধ্যাত্মিক সম্পদ আনিয়া দেশীয় ধর্ম্মকে আরও গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। এইরূপে এ দেশে বিবিধ মত বিবিধ সম্প্রদায়ের অভিব্যক্তি হইলেও আমাদিগকে চিনিয়া লইতে হইবে, কোন্‌টি আমাদের নিকটে চিরন্তন সত্য। ভগবৎকৃপায় ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম এ দেশে আবির্ভূত হইয়া সেই চিরন্তন ও শাশ্বত সত্যের দিকে আমাদিগের দৃষ্টিকে ও চিন্তাকে নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

যে দেশে যত ধর্ম্মসংস্কার অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহার মূলে কার্য্য করিয়াছে দুইটি বিভিন্ন কারণ। যখন জ্ঞানের ও যুক্তির সঙ্গে প্রচলিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া উঠে, তখন মঙ্গলময় পরমেশ্বরের বিধানে, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সাধু মহাত্মা সেই বৈষম্য দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া, অমিত তেজে সেই প্রাচীন মতের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া নব মতের নব সত্যের বাণী ঘোষণা করিয়া দেন। জনসাধারণ তাঁহার অমানুষিক শক্তি সন্দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া সহজে তাঁহার মতের বশ্যতা স্বীকার করে। এইরূপে সম্পূর্ণ নব ধর্ম্মের ও নব মতের অভ্যুদয় ঘটে। দ্বিতীয় প্রকারের ধর্ম্মসংস্কারের ভাব আমূল পরিবর্ত্তন নহে, কিন্তু উহার ত্রুটি-সংশোধন। আদিব্রাহ্মসমাজ এই পুণ্য তিথিতে সেই পুণ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া

এ দেশে অবতীর্ণ। এই আদিব্রাহ্মসমাজ পুরাতন আরণ্যক ঋষিদিগের সেই প্রাচীন ধর্ম্মকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন; ইহার গাত্রে কাল পরম্পরায় যে মলিনতা স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা বিধৌত করিয়া দিয়াছেন, অথচ কর্ম্ম ও প্রেম ভক্তির সহিত ইহার সংযোগ সাধন করিয়া দিয়াছেন, এবং ইহাকে বর্ত্তমান সময়ের সাধনের ও গ্রহণের উপযোগী করিয়া দিয়াছেন।

আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে যে ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মভাব চির-নবীন, চির উন্নতিশীল। আদিব্রাহ্মসমাজ কোন কৃত্রিম গণ্ডী দিয়া ইহাকে বাঁধিতে চেষ্টা করেন নাই, প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক ভাবে ইহার প্রবেশদ্বারকে জনসাধারণের জন্য প্রমুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

৯২ বৎসর হইতে চলিল, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যেও নব আলোক আসিয়া দেখা দিয়াছে। জীবে নিরবচ্ছিন্ন দয়া নহে, কিন্তু দরিদ্রসেবা, রুগ্ন ও অসহায়কে পথ্য বিধান ও আশ্রয় দান, যাহা পরমহংসদেব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গকে পুষ্টিবিধান করিতেছে। ত্যাগ সহিষ্ণুতা ও সংযমের মহান আদর্শ ভারতের পক্ষে পুরাতন হইলেও ঐ যে মহাপুরুষের অজেয় বাণী এ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে, রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে উহা সমুচ্চারিত হইলেও, তাহাও ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে নব সাধনায় আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে; বিলাস-বিভ্রমের উপরে আমাদের তীব্র বিতৃষ্ণা আনয়ন করিতেছে।

আজ আমাদের মহোৎসব। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া ভগবৎকৃপা, যাহা বিশেষ ভাবে এই পুণ্য দিনে এ দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিল, আলোচনা করিতে গিয়া আমরা স্তব্ধ হইয়া যাইতেছি। তাঁহারই কৃপায় আমরা সার সত্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং সাধনপথের সমস্ত জঞ্জাল অপসারিত হইয়াছে। জ্ঞানের সঙ্গে যুক্তির সঙ্গে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে। দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে যিনি আবার এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে আকার ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদান করিলেন, ইহার উন্নতি-কল্পে আপনার দেহপাত করিলেন এবং আপনার জ্ঞানোজ্জ্বল ও প্রেমোজ্জ্বল আদর্শ দেখাইয়া সাধন-পথে আমাদিগকে অগ্রসর করিয়া দিলেন, সেই মহর্ষিদেবের ভিতর দিয়া ভগবৎকৃপা যে ভাবে আমাদের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাও আজ গভীর ভাবে আলোচনা করিতে গিয়া বিহ্বল হইয়া যাইতেছি। জগতের সেই যে চিরদেবতা, ভারতের উপরে তাঁহার চিরকরুণা চির দয়া। তাই তিনি অগণিত ধর্ম্মপ্লাবনে এই ভারতের মৃত্তিকাকে অনাদিকাল হইতে সরস করিয়া রাখিয়াছেন।

ব্রহ্মন্! চারিদিকে ভয়াবহ কোলাহল, চারিদিকে ভীষণ অশান্তি। জানি না ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-চক্র কি ভাবে গঠিত হইবে। বহু যুগ হইতে ভারতবর্ষ তাহার ঐহিক সম্পদরাজি জলাঞ্জলি দিয়া আসিতেছে। বন্ধন তাহার উপর কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়াছে। কিন্তু এই পতিত ভারত বাহিরের এই সুতীব্র দৈন্যের ভিতরে থাকিয়াও নিরাশায় আপনার হৃদয়কে মরুময় হইতে দেয় নাই, অবিশ্বাসে অন্তর্দ্দেশকে পাষাণ-কঠিন করিতে পারে নাই। তোমারই প্রেমমুখের দিকে তাকাইয়া সমস্ত বেদনা নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছে। তোমাকেই জীবনের ধ্রুবতারা করিয়া সংসার-পথে বিচরণ করিতেছে। বিপদ যতই কেন ঘনীভূত হউক না, অত্যাচার দাবানলের ন্যায় চারিদিক হইতে যতই তাহার লোল জিহ্বা বিস্তার করুক না, মঙ্গলময় বিধাতা! আমরা যেন তোমার করুণার গান গাহিতে গাহিতে চারিদিক মঙ্গল করিয়া তুলিতে পারি, নিরাশ অন্তরে আশার সঞ্চার করিতে পারি, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি; উৎসবের দিনে তুমি আমাদিগকে সেই চির-সৌভাগ্য দান কর, তোমার প্রেমামৃত পান করিবার অধিকারী কর, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রাতঃকাল।

রাগিণী গান্ধারী-তোড়ী—তাল মধ্যমান।

নিশিদিন মোর পরাণে প্রিয়তম মম
কত না বেদনা দিয়ে বারতা পাঠালে।
ভরিলে চিত্ত মম নিত্য তুমি প্রেমে প্রাণে গানে
হায় থাকি আড়ালে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
নিয়োনা নিয়োনা সরায়ে।
জীবন-মরণ সুখ-দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে॥
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে॥
চির পিপাসিত বাসনা বেদনা,
বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারিনা ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাগিণী তোড়ি-ভৈরবী—তাল তেতালা।

শুনিয়া তোমার অভয় বাণী ঘুচিল বেদনা-জ্বালা!
নিখিল সকল চিত্ত-দহন ফুটিল কুসুম-মালা!
দূরে গেল মোহ-তিমির-ভার ঘুচে গেল ভয়
ছুটিল আঁধার,—
শান্তি-কমল শুভ্র-অমল করিল জীবন আলা!
সংসার-পথে বিচরিব সুখে
তোমারে ডাকিব ভয়ে দুখে শোকে
নির্ভয়ে আমি গাহি যাব গান, জীবন পায়ে দিব ডালা!
আজ, দুঃখ নাহি মোর, বেদন নাহি,
আনন্দে আজি সবার মুখ চাহি
আনন্দে আমি তব গান গাঁহি গাঁথি হৃদি ফুল-মালা॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

ছেড়োনা আমায়
হে মোর ভরসা।
দেহ দেখা আমারে॥
আছে আমার যাহা কিছু
সকলি হে—
লও—শুধু পদে রাখ আমারে॥

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাগিণী ভৈরবী—তাল দাদ্‌রা।

ব্যথাই আমার আনল ব্যথার পারে,
আনল আমায় প্রভাত আলোর দ্বারে।
সারাটি রাত কেবল আমার প্রাণে
অশ্রুজলের সুর লেগেছে গানে,
চেয়ে দেখি রাত্রি অবসানে
হঠাৎ আলো ফুটল অন্ধকারে।
একি তোমার লীলা জানি নাক,
দুঃখ দিয়েই দুঃখ তুমি ঢাক।
আঘাত করে কেবল আঘাত করে,
যা কিছু মোর লও যে তুমি হরে
শেষে দেখি সকল শূন্য ভরে
সারা জীবন চেয়ে ছিলাম যারে॥

শ্রীঅমিয়নাথ চক্রবর্ত্তী।

উদ্বোধন।*

আজ আমাদের পবিত্র মহোৎসব। অদ্যকার উৎসবকোলাহল সমস্ত নগরীকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। আজিকার এই উৎসবব্যাপার নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীত লইয়া উৎসব নহে, কিন্তু ইহা ব্রহ্মনামের উৎসব এবং সাদর আহ্বান ও অভিবাদনেরও উৎসব। আজ আমরা এই বিপুল জনসংঘকে ডাকিয়া আনিয়াছি সকলকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, এবং ইহাই তারস্বরে ঘোষণা করিবার জন্য যে, নিজ নিজ জীবনের আদর্শ আজ হইতেই স্থির করিয়া লও। অমূল্য মানবজীবন লাভ করিয়াছ। বিফলে ইহাকে বিনাশ করিও না। লক্ষ্যহারা হইয়া সংসারে অবস্থান করিও না। জীবনের লক্ষ্য সর্ব্বাগ্রে স্থির করিয়া উহাকে সম্মুখে তুলিয়া ধর, এবং ঐ লক্ষ্যেরই পশ্চাতে প্রধাবিত হও।

পোতবাহী অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিবার সময়ে যেমন গন্তব্য পথের আলেখ্য সম্মুখে ধরিয়া দিগ্‌দর্শনের সাহায্যে তাহার তরণীকে পরিচালিত করে, আমাদিগকেও তদপেক্ষা অধিকতর সাবধানতার সহিত দেহতরীকে চালাইতে হইবে। কোথায় কোন্ গুপ্ত পর্ব্বত অতর্কিত ভাবে দেহতরীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও নিমগ্ন করিয়া দেয়, তাহার জন্য সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হইবে।

মানবজীবন—যাহা লাভ করিয়াছ, তাহা—কিছু নিশার স্বপন নহে। দায়ীত্বপূর্ণ এ জীবন যে সত্য জীবন, ইহা যে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দান। নিজ

* গত মাঘোৎসব উপলক্ষে সায়ংকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভবনে ব্রহ্মোপাসনা শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবৃত।

নিজ আদর্শ স্থির করিয়া সাধনার প্রভাবে ইহাকে মহিমান্বিত করিয়া তোল, এবং শ্রীসম্পদে ইহাকে বিভূষিত কর। জীবনের সমুচ্চ আদর্শকে ম্লান করিলে চলিবে না, অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ভীত হইলে চলিবে না। যদি তুমি তোমার আদর্শকে চিরজীবন ধরিয়া অম্লান অবস্থায় রাখিতে পার, এবং সুদৃঢ় পদে অধ্যবসায়ের সহিত অগ্রসর হইতে পার, তবে নিশ্চয় জানিও, বিজয়লক্ষ্মী তোমারই হস্তে।

আজ আমরা এই উৎসবক্ষেত্রে অন্য আদর্শের কথা ছাড়িয়া দিয়া, একেশ্বরবাদের আদর্শের কথা বলিতে চাই। হিমালয়ের পদপ্রান্তে বসিয়া উপনিষদের ঋষিরা দিব্যজ্ঞানে যে একেশ্বরবাদের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন, পুরাণতন্ত্রের বিবিধ জটিলতা ও কলাল্যবণ্যে যে একেশ্বরবাদকে বিনষ্ট হইতে দেয় নাই, দেশবিদেশের শাস্ত্ররাজি যে একেশ্বরবাদকে সমস্বরে প্রতিপন্ন করিতেছে, সময়ের আহ্বানে যে একেশ্বরবাদ এই পুণ্যভারতে বহু শতাব্দী পরে আপনার পরিপূর্ণ ভাস্বর জ্যোতিতে আবার অবতীর্ণ, সেই একেশ্বরবাদের বিজয়নিশান ব্রাহ্মসমাজ জনসমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, সকলকে তাহারই তলদেশে সম্মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। যদি জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাক, যদি এই দুঃখদুর্দ্দিনে ধর্ম্মের অক্ষয় কবচে আবৃত হইয়া অনাহত থাকিতে চাও, প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে চাও, যদি দেশব্যাপী অত্যাচারের শাণিত ক্ষুরধারাকে বিকুণ্ঠিত করিতে চাও, যদি সংযমের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চাও, যদি সংসারের বন্ধুর পথে অজেয় হইতে চাও, তবে সকলে একেশ্বরবাদকে ভগবানের বিধান জানিয়া গ্রহণ কর। বাহির হইতে আহ্বান আসিতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের গণ্ডী চূর্ণ করিয়া পরস্পরকে উদারভাবে আলিঙ্গন কর। জ্ঞানের আলোকে মতগত বৈষম্য পরিহার কর। সম্মিলিতভাবে মহেশের মহত্বশ ঘোষণা কর। স্মরণে রাখিও, ধর্ম্মকে ধরিয়াই এই পুণ্যভারত সকল দেশের উপর আপন মস্তক উত্তোলন করিতে পারিয়াছিল। নিশ্চয় জানিও সেই ব্রহ্মজ্ঞান, অহিংসা ও সংযমকে সহায় করিয়া নব আদর্শে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, এবং নবভাবে ইতিহাসের ধারাকে সংরচিত করিতে আরম্ভ করিবে।

উপনিষদের বাণী আজ সকলকে উদ্বোধিত করিয়া ঘোষণা করিতেছে, সংগচ্ছধ্বং—একই পথে যাত্রা আরম্ভ কর; সংবদধ্বং—একই ভাবের কথা তোমাদের সকলের মুখ হইতে উচ্চারিত হউক। সংবো মনাংসি জানতাং—তোমাদের মন একই ভাবে বিগঠিত হউক। সেই অরূপী ঈশ্বরকে, একমেবাদ্বিতীয়ং সেই জাগ্রত বিধাতাকে সকলের কেন্দ্রগত করিয়া, নিজ নিজ দুর্ব্বল কণ্ঠের বাণী, পরস্পরের সহিত মিলাইয়া মিলনের বিরাট রবে গগনাভোগ পূর্ণ কর। নিশ্চয় জানিও কালব্যাপী ঘোর নিদ্রার অবসানে ইহাই তোমাদের প্রকৃত জাগরণ। ইহা হইতেই তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা। ইহা হইতেই সর্ব্ববিধ বন্ধন তিরোহিত হইবে, ইহা হইতেই মুক্তিলাভ করিয়া মানবজীবন সত্যসত্যই ধন্য হইবে।

আমাদের কর্ত্তব্য।*

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ।
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার, তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার।

আজ আমাদের উৎসবের দিবস, আনন্দের দিবস। এই পুণ্য মাঘ মাসের শুভ একাদশ দিবসে আজ প্রায় শত বৎসর ধরিয়া আমাদের পিতৃপিতামহ এবং তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরাও আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া এই পবিত্র প্রাঙ্গনে উৎসবানন্দে অবগাহন করিয়া কত না আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিতেছি। এই মাঘোৎসব বলিতে গেলে আজ সমগ্র ভারতের একটা জাতীয় উৎসবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই মাঘোৎসবের আনন্দতরঙ্গ সুদূর ইংলণ্ডকেও স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কিসের জন্য এই ১১ই মাঘ উৎসবের দিন, আনন্দের দিন বলিয়া পরিগণিত হইল? কিসের জন্য এই জাতীয় মহোৎসবের অনুষ্ঠান সমগ্র ভারতে দেশব্যাপী হইয়া পড়িল? এই শুভ পবিত্র ১১ই মাঘে ব্রাহ্মসমাজ স্বাধীনতার উৎস ব্রহ্মনাম প্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে মানবাত্মার স্বাধীনতাও ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার বাণী শুনিতে পাইয়া এই দুর্ব্বল দরিদ্র ভারতবাসীর প্রাণে যথাসম্ভব সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা লাভের এক অস্ফুট আশায় ধ্বনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল। সেই কারণেই এতদিন ভারতবাসী এই উৎসবের আনন্দে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া আসিতেছে।

কিন্তু আজ যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই মনে হয় যেন স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ। দেশের মঙ্গলের জন্য যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব, অনেক স্থলে তাহা মুখ ফুটিয়া বলিবার অধিকার আমাদের আছে বলিয়া মনে হয় না। যে সকল অনুষ্ঠান দেশের পক্ষে কল্যাণজনক বলিয়া অন্তরে উপলব্ধি করিব, সেই সকল অনুষ্ঠানও

* ১৮৪৩ শক, ১১ই মাঘ বুধবার সায়ংকালে দ্বিনবতিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভবনে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

অনেক স্থলে কার্য্যে পরিণত করিবার অধিকার আমাদের নাই। এই প্রকার স্বাধীনতার পথে অর্গল দেওয়া দেখিয়া আমরা ভুলিয়া যাই যে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার আর একটী পথ খোলা আছে—সেটী আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা। সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান সময়ে প্রবল রাজনৈতিক আকার পরিগ্রহ করিয়া দেশকে একেবারে মন্থন করিয়া ফেলিতেছে, দেশের প্রাণকে একেবারে আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসী রাজনৈতিক দিক হইতে স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ দেখিয়া তাহাই উন্মুক্ত করিবার চেষ্টায় সমস্ত প্রাণমন সমস্ত শক্তি ও বল নিয়োগ করিতে উদ্যুক্ত। এই সমস্ত গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া আজ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি যে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই সর্ব্ববিধ স্বাধীনতার মূল, কারণ সর্ব্ববিধ স্বাধীনতার উৎস হইলেন ভগবান এবং তাঁহার সঙ্গে মানবাত্মার প্রত্যক্ষ যোগই হইল আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা। আজ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি যে, সেই প্রত্যক্ষ যোগের পথ, সেই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার পথ চির উন্মুক্ত। মানুষের শক্তি নাই, সাধ্য নাই যে, সেই পথ কেহ অবরুদ্ধ করিতে পারে।

এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার মূল কথা গীতায় কি সুন্দর ভাবায় উক্ত হইয়াছে—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—সকল প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবানেরই আশ্রয় গ্রহণ কর। এই একমাত্র ভগবানে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনই হইল প্রকৃত সত্যধর্ম্ম। এই সত্যধর্ম্মই হইল আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার আদি এবং ইহাই হইল আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার শেষ। এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই যখন সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার কেন্দ্র, তখন বলা বাহুল্য যে, সত্যধর্ম্মকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতাও সহজেই আমাদের হস্তগত হইবে। সত্যধর্ম্মের প্রকৃতি এবং তাহার সহিত সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার একান্ত যোগ প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিলেই বুঝা যাইবে যে, কেবল তোমার একার অন্তরে নহে, আমার একার অন্তরে নহে, কিন্তু দেশবাসী প্রত্যেকের অন্তরে এই সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা লাভ করা কত সহজ। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য বলিয়া সংসারের কর্ম্ম করিতে থাকিলে, দেশের কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, আমাদের শুভ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হইবে—তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছার যোগ হইলে, সে ইচ্ছার বেগ কে প্রতিরুদ্ধ করিতে পারে? প্রত্যেক ভারতবাসীকে যদি আমরা এই মন্ত্রে শিক্ষিত দীক্ষিত করিতে পারি যে আমরা প্রত্যেকেই সেই মহান অগ্নি হইতেই নিঃসৃত এক একটী অগ্নিকণা এবং আমরা প্রত্যেকেই তাঁহার শক্তিতে মহাশক্তি হইবার ক্ষমতা ধারণের অধিকারী, তখন দেখিব যে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতালাভের বিলম্ব নাই।

পরব্রহ্মের শক্তিতে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের বলে যদি আমাদের সত্য সত্য আস্থা থাকে, তবে শত বিপদের মুখেও মুহ্যমান হওয়া দূরে থাক, আশান্বিত চিত্তে অগ্রসর হইতে দ্বিধা বোধ করিব না। যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়াবহ সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়—ক্লীবভাব কাপুরুষের ভাব পরিত্যাগ কর। আমরাও আজ এই উৎসবের দিনে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া জানাইতেছি যে, বর্ত্তমান সময় যেমন কোন সূত্রেই বৃথা আমোদ আহ্লাদে গা ভাসাইবার সময় নহে, তেমনি কাপুরুষের ন্যায় বৃথা হা-হুতাশে অধীরতা প্রকাশেরও এখন আর অবসর নাই।

এই দুঃখদুর্দ্দৈবের দিনে আমাদের জানিতে হইবে, অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, ভগবানই আমাদের একমাত্র ভরসা, কারণ তিনিই আমাদের পিতা, তিনিই আমাদের মাতা। দেশের দুঃখকষ্ট হইতে, ভয়ভাবনা হইতে উদ্ধারের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় তো দেখি না। আজ যদি আমরা তাঁহারই সন্তানের উপযুক্ত ভাবে তাঁহার সিংহাসনতলে দাঁড়াইয়া কোটী কণ্ঠে কাতর প্রাণে দেশের দুঃখকষ্ট মলিনতা দূর করিয়া দিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহাকে ডাকিবার মত ডাকি, তবে তাঁহার অটল সিংহাসনও যে নিশ্চয়ই টলিয়া যাইবে। বিগত লোকক্ষয়কর ইউরোপীয় যুদ্ধ যে দিন ঘোষিত হইয়াছিল, সেই দিন সমগ্র সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ইংরাজকে যুদ্ধে মিত্রসংঘের জয়ের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। আবার আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদিগকে, কেবল একদিনের জন্য নহে, প্রতিদিন মধ্যাহ্নে অন্তত কয়েক মুহূর্ত্তেরও জন্য একবার করিয়া মিত্রসংঘের জয়ের জন্য ভগবানের সহায়তা প্রার্থনা করিতে বলা হইয়াছিল। আমরা তো প্রত্যক্ষ করিলাম যে, মিত্রসংঘের এই প্রকার কাতর প্রার্থনার নিকটে বিপক্ষের শত সহস্র লোকবল, লক্ষকোটী কামান বন্দুক আর গোলাগুলি, এবং শতসহস্র লক্ষকোটী যুদ্ধের উপকরণসমূহ পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হইয়াছিল।

সেইরূপ আমাদেরও অন্তরের কথা এই যে, যে ১১ই মাঘের পবিত্র দিবসে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া আমাদের দেশে মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছিল, এদেশের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতালাভের জন্য, এদেশবাসীর শুভবুদ্ধিলাভের জন্য, এবং জগতের কল্যাণ কামনায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার এমন শুভ দিন যেন হেলায় না হারাই। কেবল এই এক দিন কেন, প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর অন্তস্তল ভেদ করিয়া, ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর সমবেত কণ্ঠে এই প্রার্থনা উঠুক—হে দেব, হে পিতা আমাদিগকে বিনাশ করিও না, এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে পরিত্যাগ করিও না। এইরূপ সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা উঠিলে আমরা নিশ্চয়ই দেখিব যে, ভগবানেরও সিংহাসন টলিয়াছে। তখন তিনি নিশ্চয়ই আমাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে বাধ্য হইবেন; তখন তিনি নিশ্চয়ই আমাদের অন্তরে শুভ বুদ্ধি ও শুভ অনুষ্ঠানের শক্তি ও সামর্থ্য প্রদান করিবেন; তখন তিনি নিশ্চয়ই আমাদের আত্মাকে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন। জ্ঞানে, ধর্ম্মে, বুদ্ধিতে, বলেতে, শরীরে ও মনে এই প্রকার তাঁহার সহায়তা লাভ করিলে সর্ব্ববিধ পরাধীনতা বিদূরিত হইয়া সর্ব্ববিধ কল্যাণ যে সহজেই আমাদের হস্তগত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

যে ভারতের মূল প্রাণ ধর্ম্মের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত, সেই ভারতের অধিবাসী আমাদের নিকট এই সত্য কিছু নূতন নহে। জড়বাদী পাশ্চাত্যগণ একান্ত

প্রার্থনার বল অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে কি না সন্দেহ, কারণ, তাহাদের অনেককেই এই মন্ত্র সত্য বলিয়া অন্তরে দৃঢ়রূপে পোষণ করিতে শোনা যায় যে, প্রার্থনা করিতে হয় কর, কিন্তু বারুদ শুষ্ক রাখিতে ভুলিও না, অস্ত্রশস্ত্রে মরিচা ধরিতে দিও না। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বলিতে গেলে পংক্তিতে পংক্তিতে ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনার অপ্রতিহত বল শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আমরা জন্মগ্রহণ অবধি মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত ভগবানে একান্ত নির্ভরশীল হইবার, তাঁহার সহায়তালাভের জন্য কাতর প্রার্থনার সফলতায় সম্পূর্ণ আস্থা রাখিবার শিক্ষা প্রতিপদে লাভ করিয়া থাকি। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ভগবানের লীলায় আমরা বিশ্বাস করি, এবং সেই জাগ্রত ভগবানে নির্ভরশীল ভারতবাসী আমরা ইহা স্থির জানি যে, ভগবানকে ডাকিবার মত ডাকিতে পারিলে পর্ব্বতও টলিয়া যাইবে, প্রবল ঝটিকাও স্তব্ধ হইবে এবং খরস্রোত নদীও দ্বিধাবিভক্ত হইয়া সাধুদিগের চলাচলের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে।

দেশের কল্যাণকামী হইলে ভগবানের দ্বারে উপস্থিত হইতে হইবে বটে, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে বটে, কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় প্রার্থনা করিলে চলিবে না; ইহা দাও, উহা দাও বলিয়া ভিক্ষুকের মত উপস্থিত হইলে চলিবে না। সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা এবং সর্ব্ববিধ কল্যাণ নিজের জন্যই বল, অথবা দেশের জন্যই বল, লাভ করিতে চাহিলে এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও পাতা, এই বিরাট ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবানকে আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে প্রকাশিত করিতে হইবে, উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু উপনিষদের ঋষি বজ্রনিনাদে এই একটী সত্য ঘোষিত করিয়াছেন যে, বলহীনের আত্মাতে ভগবান স্বীয় উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন না। সর্ব্ববিধ স্বাধীনতার উৎস, সর্ব্ববিধ কল্যাণের আকর, এই বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর যে আমাদের পিতা, আমরা যে তাঁহার সন্তান; এবং সেই কারণেই যে আমরা স্বাধীনতা লাভের ও সর্ব্ববিধ কল্যাণের অধিকারী, এইটী খুব স্পষ্ট করিয়া আমাদিগের বুঝিতে হইবে, অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে। কেবল মুখে নহে, এই সত্য অন্তরে প্রকৃতই ধারণ করিতে পারিলে, তখন আর কাপুরুষের ন্যায় ক্লীবভাব ধারণের অবসরই থাকিবে না। দূরে যাক কাপুরুষের দুর্ব্বলতা, মুছে যাক সমস্ত মলিনতা। সত্যধর্ম্মের বলের দ্বারা সমস্ত অধর্ম্মকে বিচূর্ণ করিতে হইবে, প্রতিজ্ঞার সম্মার্জনী দ্বারা সমস্ত দুর্ব্বলতা মুছিয়া ফেলিতে হইবে, এবং অশ্রুজলে সমস্ত মলিনতা ধৌত করিতে হইবে। তবেই দেশের আত্মাতে ভগবান স্বপ্রকাশ হইবেন; তবেই পরাধীনতা বিতাড়িত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা সহজেই হস্তগত হইবে; তবেই দেশ কল্যাণের রসায়ন সেবন করিয়া অচিরে নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিবে। কেবল মুখের কথায় কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না; আর অন্তরের সাধনার নিকটেও কোন কার্য্যই অসিদ্ধ থাকিবে না।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম আলোচনা করিলে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেরই উপলব্ধি হইবে যে, সত্যযুগ আসিয়াছে। নবযুগের সুবিমল বায়ুহিল্লোল আজ আমাদের কাহাকে না স্পর্শ করিয়াছে? আমরা তো প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, সত্যধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, স্বাধীনতার বিধাতা ও শান্তির প্রতিষ্ঠাতা ভগবান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগতের মঙ্গল বিধানের জন্য স্বয়ং নামিয়া আসিয়াছেন এবং অন্যায় অধর্ম্ম বিদূরিত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহারই বিধানে আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতেছি যে, সকল স্বাধীনতার সকল কল্যাণের মূল হইল ধর্ম্ম। রাজনীতিই বল, সমাজনীতিই বল, সকল নীতিই ধর্ম্মেতেই অবলম্বিত; এবং সেই কারণেই দয়া ক্ষমা প্রভৃতি ধর্ম্মের মূলমন্ত্রই সর্ব্ববিধ অকল্যাণের সর্ব্ববিধ অত্যাচার অবিচারের বিষদন্ত ভাঙ্গিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ। তাঁহারই কৃপায় আমরা স্পষ্টই জানিতেছি যে, পশুভাবের পরাজয়ের কাল আসিয়াছে; ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া যাহা কিছু গড়িয়া তোলা হইবে, ভগবানের বিধানে প্রাকৃতিক নিয়মেই তাহা নিজের উত্তাপে নিজেই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে; অন্যায় অধর্ম্মের মধ্যে এমন একটা বিষকীট লুক্কায়িত থাকিয়া শতবিধ প্রবল উপকরণকেও অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে যে, তাহার ফলে সেই অন্যায় অধর্ম্ম নিজের মহাগর্ব্বের ভিতর দিয়াই, একাধিক জয়ের ভিতর দিয়াই পরাজয়ের পথে দ্রুতগতি অগ্রসর হয়।

আজ আমরা যেরূপ দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া চিন্তাকুল হইয়া উঠিয়াছি, সেইরূপ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে অর্জ্জুনও তাঁহার সময়ে দেশের অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে এই সত্য আশ্বাসবাণী দ্বারা আশ্বস্ত করিয়াছিলেন যে, ভগবানে একান্ত নির্ভরশীল হইলে তিনি ভক্তের যোগক্ষেমও বহন করেন অর্থাৎ তাঁহার ঐহিক সুখ ও কল্যাণও বিধান করেন। আজ আবার পাঁচ হাজার বৎসর পরে ব্রাহ্মধর্ম্মও সেই একই সত্য আশ্বাসবাণী দিয়া বলিতেছেন যে ভগবানে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনরূপ উপাসনা দ্বারা মানবের কেবল পারত্রিক নহে, ঐহিক মঙ্গলও সাধিত হয়। এই সত্য আশ্বাসবাণী হৃদয়ে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া আমাদের অন্যায় অধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে; কপটতা পরিহার করিতে হইবে; প্রাণের ভিতর হইতে দ্বেষ হিংসা বিদূরিত করিতে হইবে; মনকে সামঞ্জস্যের উপর দাঁড় করাইতে হইবে। অধর্ম্ম অবিচারের বিরুদ্ধে, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের যদি কোন নালিস থাকে, তবে তাহা আমাদের পিতা, জগতের পিতা ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দিব, তাঁহার সেই মহান্ শক্তির সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি মিলাইয়া দিয়া অন্যায় অধর্ম্মের, অত্যাচার ও অবিচারের প্রতীকার প্রার্থনা করিব। আমি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়াইয়া ইহা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তিনি সেই প্রার্থনা শুনিবেন—শুনিবেন—নিশ্চয়ই শুনিবেন। সেই বিশ্বপিতা অখিলমাতার শুভ ন্যায়বিচারের প্রতি সংশয়ে ডুবিয়া আপনাকে বিনাশের পথে লইয়া যাইও না। পশুবলের জয়লাভ যে ভগবানের অভিপ্রেত নহে, ধর্ম্মেরই যে জয় হইবে, প্রেমেরই জয় যে নিশ্চিত, সমগ্র মানবজাতির অভিব্যক্তির ইতিহাস, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি ধর্ম্মভাবের অভিব্যক্তি ও প্রসারের ইতিহাস সে বিষয়ে জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কান পাতিয়া শ্রবণ কর, শুনিবে যে, ভারতমাতা তাঁহার সকল সন্তানকে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগবানের চরণতলে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। বিলাস-ব্যসন ছাড়িয়া মায়ের দেওয়া মোটা ভাত খাইয়া মোটা কাপড় পরিয়া সেই পুরাকালের ধর্ম্মবলে বলীয়ান ঋষিদের ন্যায় প্রয়োজনমত ভগবানকে আমাদের জীবনে নামাইয়া আনিবার শক্তিসামর্থ্য ধারণ করিতে হইবে। সমগ্র দেশবাসীকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এই দুঃখদুর্দ্দিনের দিনে বর্ত্তমান বজ্রঝঞ্ঝার মধ্যেও এক ধ্যানে এক জ্ঞানে ধর্ম্মপথে চলিতে হইবে, ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধনের পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে হইবে। বিন্দু বিন্দু জলবাষ্প হইতেই তড়িৎ সঞ্চিত হইয়া ভীষণ বজ্রেরও সৃষ্টি হয়। তেমনি আমাদেরও প্রত্যেকের হৃদয় হইতে মঙ্গলচিন্তার সাধুভাবের কল্যাণপ্রসূ তড়িৎকণাসকল সঞ্চিত হইতে থাকিলে পরিণামে কি যে মহা সুফল প্রসব করিবে, দেশ স্বাধীনতার পথে, উন্নতির পথে, ধর্ম্মের পথে যে কিরূপ ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হইবে, তাহা আমরা কয়জন উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছি? যে জগন্মাতা নিত্যকাল সর্ব্বত্র সমানরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার অনন্ত-জ্ঞান ও প্রেমের পরিচয় জগতের ইতিহাসের প্রতি অক্ষরে পাইতেছি, যাঁহার জ্ঞানের কণামাত্র পাইয়া পণ্ডিতেরা নিত্য নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইতেছেন, যাঁহার প্রেমের কণামাত্র পাইয়া মাতা নিজের শেষ রক্তবিন্দু দিয়াও সন্তানকে রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হন না, সংশয়রহিত বুদ্ধিতে সেই প্রেমের সাগর রসস্বরূপ ভগবানে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া একসঙ্গে মঙ্গল চিন্তা কর, একসঙ্গে মঙ্গলকার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিবে। নিজের শক্তি কম বলিয়া ভীত হইও না—কিসের ভয়? ক্ষণকালের জন্য নীরব হইয়া অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর—সেই জগন্মাতার মাভৈঃ-রবের দুর্জ্জয় ভেরী নিনাদিত হইতেছে। শুনিয়া লও, আর অভয় হইয়া যাও। প্রার্থনার সাহায্যে তোমার আমার একার নহে, ত্রিশকোটী ভারতবাসীর সেই জগৎপিতা অনন্তদেবের অনন্ত শক্তিকে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের ব্যবহারে আনিতে হইবে। ত্রিশকোটী ভারতবাসী সত্যধর্ম্মের মঙ্গলবন্ধনে বদ্ধ হইয়া মিলিতভাবে কল্যাণের পথে চলিতে থাকিলে গঙ্গোত্রী হইতে নির্গত খরস্রোত জাহ্নবীরও অধিক দুর্জ্জয় বেগ ধারণ করিবে। সে বেগের সম্মুখে অমঙ্গল, অকল্যাণ যাহা কিছু পড়িবে, তাহা কোথায় ভাসিয়া যাইবে। ভগবানের শক্তিসাগরে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া দুর্ব্বলতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে হইবে। আমাদের এক-একজনের উৎসাহে দশজন, শতজন করিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠুক। আমাদের প্রত্যেকের সাহস ও সহানুভূতি শত শত দেশবাসীর অন্তরে নির্ভীকতা আনয়ন করুক এবং প্রেম আকর্ষণ করুক। আমার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এই সমাগত ভক্তজনগণকে আমি কি প্রকারে উৎসাহিত করিব জানি না। আমি গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণেরই উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে চাহি যে, "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"—হৃদয়ের ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ উপাসনার পথে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাক। তোমাদের নিজের মঙ্গল হইবে, দেশের মঙ্গল হইবে, জগতের মঙ্গল হইবে।

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

সায়ংকাল।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

মন জাগো বিশ্বনাথে
আজি এ মধুর উজল রাতে।
তাঁহারে বরি' হৃদয় মাঝে
অভয় হও সকল কাজে
চল রে ভুবনে বীরের সাজে
দুঃখ-ঝঞ্ঝা-ঘাতে।
জীবনে তাঁহারে বাসরে ভাল
জ্বালোরে হৃদয়ে তাঁহারি আলো।
বিশ্বভুবনে তাঁহারে দেখি
ভকতচিত্তে শান্তি একি
চরম দুঃখে পরম সুখী
মিলি তাঁহার সাথে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

রাগিণী আড়ানা—তাল ঝাঁপতাল।

নিত্য-সত্যে চিন্তন কররে বিমল হৃদয়ে
নির্ম্মল অচল সুমতি রাখ ধরি সতত।
সংশয়-নৃশংস সংসারে প্রশান্ত রহ
তাঁর শুভ ইচ্ছা স্মরি বিনয়ে রহ বিনত।
বাসনা কর জয়, দূর কর ক্ষুদ্র ভয়,
প্রাণধন করিয়া পণ চল কঠিন শ্রেয় পথে;
ভোল প্রসন্ন মুখে স্বার্থসুখ আত্মদুখ,
প্রেম-আনন্দরসে নিয়ত রহ নিরত॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাগিণী ইমন পুরবী—তাল একতালা।

সন্ধ্যা হল গো—
ওমা, সন্ধ্যা হল বুকে ধর!
অতল কালো স্নেহের মাঝে
ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর॥
ফিরিয়ে নে, মা, ফিরিয়ে নে গো,
সব যে কোথায় হারিয়েছে গো
ছড়ানো এই জীবন, তোমার
আঁধারমাঝে হোক্ না জড়॥
আর আমারে বাইরে তোমার
কোথাও যেন না যায় দেখা।
তোমার রাতে মিলাক আমার
জীবন-সাঁঝের রশ্মিরেখা।

আমায় ঘিরি' আমায় চুমি'
কেবল তুমি, কেবল তুমি!
আমার বলে যাহা আছে, মা,
তোমার করে সকল হর॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাগিণী সাহানা—তাল একতালা।

কে জাগে দিবস রজনী হের চেতন চির নিকেতনে
যুগ-যুগান্ত যেতেছে বহিয়া নিমেষ নাহি নয়নে।
চির-উদ্ভব প্রলয় মাঝে
চির শাশ্বত কে বিরাজে
লাজে তেজে কোটী দ্বিজরাজে জ্যোতির্ম্ময় আসনে,
স্থির বিনীরব মৌন-মহিমা
চির ভাস্বর দৃপ্ত গরিমা
নাহিক আদি,নাহি সীমা দেশ-কালাতীত বন্ধনে।
তাপবিহীন স্নিগ্ধ কিরণ
পীযূষরাশি করে বিকীরণ
আবরণহীন চির চিন্ময় চিদানন্দ গগনে।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন।

রাগিণী বেহাগ—তাল তেওরা।

কি যে গান শুনিলাম—
হিয়ার মাঝারে আনন্দ ঝঙ্কারে।
নীরব নিশীথে সব-অলখিতে
শিশির নীরে আসিয়া ধীরে
শোনাও গানে পাগল প্রাণে
মোহিয়া লও হে ভবের পারে॥
গ্রহের সাথে জোছনা রাতে
বেড়াব ঘুরে হৃদয় পুরে—
বাতাসে খোলা পরাণ ভোলা
অসীম নীল আকাশ পারে।
আনন্দ সাগরে ডুবি চিরতরে
পূজিব গোপনে তোমারি চরণে
জীবন যৌবন সোনার বরণ
উঠিবে ফুটিয়া মরম মাঝারে॥

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহর্ষিদেবের তিরোভাব।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারি) শুক্রবার।

[গত ৬ই মাঘ মহর্ষিদেবের তিরোভাব উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যে সাম্বৎসরিক সভা হয় তাহার কার্য্যবিবরণ আমরা গত ১৩ই মাঘের তত্ত্বকৌমুদী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তং সং]

প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

আজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোক গমনের দিন। এদিন আমাদের নিকট বিশেষ স্মরণীয়। মহর্ষির জীবন কেবল ব্রাহ্মসমাজের নিকটই মূল্যবান নহে, তাহা সমগ্র মানবজাতির নিকটেই মূল্যবান; মহর্ষি বর্ত্তমান যুগের জন্য একটা বাণী (message) আনয়ন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা Evelyn Underhill ইংরাজীতে অনুবাদিত মহর্ষির আত্মজীবনের উপক্রমণিকায়, তাঁহাকে St Francis of Assisi, Madame Guyon প্রভৃতির মধ্যে স্থান দিয়াছেন; তাঁহাকে একজন mystic বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁহার জীবনের message আরও গভীর। মানবসমাজের গতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, সাধারণ মানব সংসারের ধনমান, সুখসম্পদ প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত আছে। এই যে লক্ষকোটি মানুষ দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, লইয়া অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটিয়াছে, তাহাদের দেখিলে মনে হয় না যে, ধন, মান, পদ, সুখ সমুদায়ের উপরে আর কিছু আছে। যদি ইহাদের কার্য্য ও চিন্তা দ্বারাই বিচার করিতে হইত, তবে বলিতে হইত যে, মানবজীবনে উন্নততর আকাঙ্ক্ষা, গভীরতর উদ্দেশ্য কিছুই নাই। কিন্তু মানব-সমাজে এক এক সময়ে এক একজন লোক আসেন, যাঁহাদের জীবন দৈনন্দিন স্রোতের উপরে উঠিয়াছে। যেমন এই বিশাল সমতল ভূমিতে স্থানে স্থানে পর্ব্বতশৃঙ্গ উঠিয়াছে—মনে হয় যেন ভূপৃষ্ঠ উন্নত হইয়া আকাশ ছুঁইতে গিয়াছে—তেমনি মানব-ইতিহাসে সময়ে সময়ে এক একজন মহাপুরুষ আসেন, যাঁহাদের জীবন, সাধারণ মানবের জীবন ও চিন্তার সমতলভূমি নিম্নে ফেলিয়া, মহত্ত্বের উন্নত শিখর স্পর্শ করে; যেন মানবাত্মার নিভৃত আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ের মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বুদ্ধদেবের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি রাজার ছেলে, সংসারের সকল সুখসম্পদে পরিবেষ্টিত ছিলেন, রাজ্যের উত্তরাধিকারী, গৃহে সুন্দরী গুণবতী পত্নী, নবজাত পুত্র! কিন্তু এ সকল কিছুই তাঁহাকে বাঁধিতে পারিল না। মানবের দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইল; তিনি মানবের ক্লেশ নিবারণের কোন উপায় আছে কি না, তাহার সন্ধানে বাহির হইলেন। মানবাত্মার এই যে অতৃপ্তি ও ক্রন্দন, ইহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। শ্রীচৈতন্যদেব আর একজন এই প্রকারের লোক। ইহার জীবন পাঠ করিলে মনে হয় যে, বাল্যকালে তিনি অতি চঞ্চল প্রকৃতির বালক ছিলেন; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আশ্চর্য্য বুদ্ধি ও অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ হইল। কিন্তু তখনও তিনি অতি দাম্ভিক যুবক মাত্র, তাঁর ভবিষ্যৎ ধর্ম্মভাবের কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই। বাইশ বৎসর বয়সে দেশপ্রচলিত রীতি অনুসারে পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য গয়ায় গেলেন; তথা হইতে যখন ফিরিলেন তখন একেবারে নূতন মানুষ হইয়া ফিরিলেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে কি এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব দেখা দিল, কি গভীর ব্যাকুলতা, কি উচ্ছ্বসিত ভক্তি! দেখিয়া মানুষ মুগ্ধ হইয়া গেল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর লোক। তিনিও ধনীর সন্তান; অতুল বিত্তসম্পদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সেই সময়ে বঙ্গদেশের মধ্যে একজন প্রধান লোক ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের মধ্যে ডুবিয়া ছিলেন। হঠাৎ যে কি

হইল, এ সকলে আর তাঁহার মনের তৃপ্তি সাধিত হইল না। বুদ্ধদেব ও শ্রীচৈতন্যের মত তাঁহার আত্মাও জাগিয়া উঠিল। মানবাত্মার এই জাগরণ অতি বিস্ময়কর ব্যাপার; তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভূগর্ভস্থ তাপ যেমন ঘনীভূত হইয়া আগ্নেয় পর্ব্বত সৃষ্টি করে, তেমনি যেন মানব-সমাজের নিগূঢ় ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা ঘনীভূত হইয়া এই সকল মহাপুরুষ সৃষ্টি করে। মহর্ষির ধর্ম্মজীবনের উন্মেষ অত্যাশ্চর্য্য—তাঁহার আত্মজীবনীতে তিনি স্বয়ংই তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পিতামহীর মৃত্যু সময়ে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে গঙ্গাতীরে একখানি চালায় বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ যে তাঁহার মনে কি এক অপূর্ব্ব আনন্দলহরী খেলিয়া উঠিল, তিনিও তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু সেই আনন্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। সেই আনন্দ যখন অন্তর্হিত হইল, তখন তাঁহার প্রাণ অস্থির হইল। তাঁহার তখনকার মানসিক অবস্থা তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সংসারের চিরপরিচিত সুখ-সম্পদ ভোগ-বিলাস তাঁহার নিকট অর্থশূন্য হইয়া গেল। তিনি সেই রাত্রির আনন্দের জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাহা না পাইয়া মনের যাতনায় তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া গেলেন। গৃহে থাকিতে না পারিয়া এক-একদিন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতেন। তখন দ্বিপ্রহরের রৌদ্র তাঁহার নিকট ধূমের ন্যায় কালো মনে হইত। কি প্রকার মানসিক যাতনায় এই অবস্থা হয়, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। মহর্ষির জীবনের প্রথম কথা-ঈশ্বরের জন্য এই ব্যাকুলতা।

আমি বলিয়াছি, সাধারণ মানুষকে দেখিলে মনে হয় যে, মানুষ কেবল ভোগ ও সুখের পশ্চাতে ছুটিয়াছে। কিন্তু এই পার্থিব সুখে মানব-হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা কি মিটিবে? কখনই না। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কম্‌ট (Comte) বলিয়াছেন যে, অতীন্দ্রিয় ধর্ম্মের যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন প্রত্যক্ষবাদের যুগ আসিয়াছে; যাহা হাতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, মানুষ তাহা আর এখন গ্রাহ্য করিবে না। কিন্তু এ কথা সত্য নয়, বরং তাহার বিপরীত কথাই সত্য। মানুষের মন কখনই কেবল প্রত্যক্ষ স্থূল পদার্থ লইয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। মানবআত্মা চিরদিনই অতীন্দ্রিয় রাজ্যের জন্য পিপাসু। "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং"—পুত্র, কন্যা, সংসারের ধন, মান, পদে মানবাত্মা কখনও চিরদিন তৃপ্ত থাকিতে পারে না; অনন্তেই মানবাত্মার আনন্দ।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমাসম্পৎ
এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরমআনন্দঃ।

এই পরমাত্মাই মানবের পরম গতি; ইনিই তাহার পরম সম্পদ। ইনিই তাহার পরম লোক, ইনিই তাহার পরম আনন্দ।

মহর্ষির জীবন আমাদের সম্মুখে সুজন করিয়া এই সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। মানবের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নির্ব্বাপিত হইয়া যায় নাই; বর্ত্তমান কালেও যে মানবাত্মা প্রাচীনসময়ের ঋষিদের ন্যায় অনন্তের জন্য ব্যাকুল হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

মহর্ষির জীবনের দ্বিতীয় শিক্ষা—কিরূপ একাগ্রতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিতে হয়, তাহা বর্ত্তমান কালের লোককে বলিয়া দেওয়া। বর্ত্তমান সময়ে আমরা ধর্ম্মকে সহজে—অল্পমূল্যে—লাভ করিতে চাই। গভীর ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে যে তপস্যা আবশ্যক, আমরা তাহা করিতে প্রস্তুত নই। আমরা প্রাচীন কালের সাধু ও ঋষিগণের কথা বলি; কিন্তু কি কঠোর সাধনায় তাঁহারা সে ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া যাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন আমাদিগকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৮ বৎসর বয়সে যখন তাঁহার ধর্ম্মজীবনের উন্মেষ হইয়াছিল, তখন হইতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত দীর্ঘ জীবন তিনি কি গভীর সাধনাই করিয়াছিলেন! আক্ষেপ হয় যে, তাঁহার সেই সাধনার ইতিহাস বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ হয় নাই। লোকমুখে অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে, একবার তিনি নৌকায় পদ্মানদীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন; একদিন প্রভাতে উঠিয়া নৌকার ছাদে দাঁড়াইয়া সূর্য্যোদয় দেখিতে দেখিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; সেই ধ্যানে মগ্ন হইলেন, সারাদিন আর চক্ষু খুলিলেন না। রৌদ্রের তেজ প্রখর হইল, একজন ভৃত্য ছাতা খুলিয়া মাথায় ধরিল; সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল, অপর একজন ভৃত্য ছাতা ধরিল; সেও ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন আর একজন ভৃত্য আসিল; অপরাহ্ণ ৩টার সময় মহর্ষির ধ্যান ভঙ্গ হইল। এমনি করিয়া সারা জীবন তিনি ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের তৃতীয় কথা—নিরাকারের উপাসনা। অতি প্রাচীনকালে ভারতের ঋষিগণ ভগবানকে আত্মার পরমাত্মারূপে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কোনও মূর্ত্তি নাই,—"যত্তদদ্রেশ্য-মগ্রাহ্যমগোত্রম-বর্ণমপাণিপাদং"—চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায় না, হস্ত দ্বারা তাঁহাকে ধরা যায় না, তাঁহার জন্ম নাই, হাত নাই, পা নাই। কিন্তু উত্তরকালে মানুষ এই কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। তাই সাকার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ভারতের নবযুগে আবার নিরাকার সত্যস্বরূপ ভগবানের আধ্যাত্মিক পূজা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সে গৌরব তাঁরই; রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তিনি কেবলমাত্র পথ নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন। তাঁহার অসামান্য প্রতিভায় তিনি উদার আধ্যাত্মিক সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের বিরাট আদর্শ মানস চক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, এবং নিজ অন্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিবারে ও সমাজে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। রামমোহন রায়ের অসম্পূর্ণ কার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদন করিয়াছিলেন। মানুষ মনে করিত, নিরাকারের উপাসনা কি করিয়া হইবে? এখনও হাজার হাজার লোক সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতে পারে না যে, নিরাকারের উপাসনা হইতে পারে; তাঁহারা মনে করেন কোন একটা মূর্ত্তি না হইলে ঈশ্বরের পূজা সম্ভবপর নয়। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন সাক্ষ্য দিতেছে নিরাকারের উপাসনা সম্ভবপর ও সত্য। রামমোহন রায় দেশের লোককে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন দেবেন্দ্রনাথ নিজ জীবনে তাহা দেখাইলেন। আঠারো বৎসর বয়সে তিনি যে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ধরিলেন, কেহ তাঁহাকে তাহা হইতে টলাইতে পারিল না। নিরাকারের উপাসনার কি গভীর,

কি উন্নত ধর্ম্মজীবন গঠিত হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহার জলন্ত প্রমাণ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের চতুর্থ শিক্ষা—সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন। ব্রহ্মজ্ঞান ভারতবর্ষে নূতন জিনিস নয়। নিরাকার সত্যস্বরূপ ভগবানের উপাসনা ব্রাহ্মসমাজ আবিষ্কার করেন নাই। বহু প্রাচীনকালে উপনিষদের ঋষিগণ এই সত্য ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান তপোবনে লুক্কায়িত ছিল। উপনিষদের ঋষিগণ বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে গৃহসংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের নূতন কথা এই যে, এই সংসারে, সমাজে ও গৃহে থাকিয়া ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিতে হইবে। এ আদর্শ সত্য হইলেও অতি কঠিন। এমন কি অনেক সময়ে আমাদের মনে সন্দেহ আসে,—মনে হয় ও কথা শুনিতেই ভাল, কাজে বুঝি হয় না। কিন্তু মহর্ষির জীবন সে সময় আমাদিগকে আশ্বাস দেয়। এই সংসারে থাকিয়া কিরূপে ধর্ম্মসাধন করিতে হয়, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরসপান করা যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের জন্য এবং জগতের জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এই স্থায়ী শিক্ষা। আমরা মহর্ষির পথ হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমাদের ধ্যান, আমাদের সাধনা যদি এই এইরূপই থাকে, আমাদের মধ্যে মহর্ষির ন্যায় ধ্যানপরায়ণ লোক যদি না আসেন, তবে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। আজ মহর্ষির মৃত্যুদিনে আমরা স্মরণ করি, তিনি কেমন ভাবে ভগবানকে খুঁজিয়াছিলেন। তেমনি ব্যাকুল হইয়া না খুঁজিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। কাতর হইয়া তদ্গতচিত্ত হইয়া ভগবানকে খুঁজিতে হইবে। এই মাঘোৎসবে আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যা'ক—ব্রাহ্মসমাজে নব শক্তি, আমাদের প্রাণে নূতন সংকল্প, আসুক।

সায়ংকালে মহর্ষির জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী বি-এ, বক্তৃতা করেন।

রাঁচীস্থ "শান্তিধামে" মাঘোৎসব।

(শ্রীচুনিলাল চৌধুরী)

গত ১৫ই মাঘ প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শান্তিধামে' বাৎসরিক মাঘোৎসবের অধিবেশন হয়। গিরিগাত্রস্থিত কুসুমতলার উপাসনা-সভায় অধিবেশন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে ঐ স্থানটী অতি সুচারুরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। স্থানটী স্বভাবতঃই অতি মনোরম; পশ্চিম দিকে মন্দিরশীর্ষ গিরিশৃঙ্গ প্রখর সূর্য্যকিরণ হইতে স্থানটীকে আড়াল করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; আর তিন দিকে দিগন্তধাবিত উন্মুক্ত প্রান্তর, তার মাঝে মাঝে দুই একটী ক্ষুদ্র পাহাড় ধ্যাননিরত মুনি-ঋষির ন্যায় নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নানা কৃত্রিম উপায়ে রমণীয়তর করা হইয়াছিল। পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত যে সিঁড়ি আছে, তাহাও উভয় পার্শ্বে নানা রংয়ের কাগজ ও পত্রপুষ্প দ্বারা শোভিত করা হইয়াছিল; সুবমাসঙ্গত ভাবে সজ্জিত হইয়া স্থানটী মন ও নয়নের তৃপ্তিপ্রদ হইয়াছিল।

উপরে শান্তিভবনের প্রবেশদ্বারে শ্রদ্ধাস্পদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং সমাগত ভক্তবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া কুসুমতলায় লইয়া যান। সেখানে এক পার্শ্বে মহিলাবৃন্দ ও অপর পার্শ্বে পুরুষেরা উপবেশন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু জয়কালী দত্ত মহাশয় আচার্য্যপদে বৃত হইয়া বেদীর উপর আসন গ্রহণ করেন; তন্নিম্নে শ্রোতৃবর্গ সমাসীন ছিলেন।

প্রারম্ভে সেই পক্কশ্মশ্রু গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি ভ্রাতৃযুগল (পূজ্যপাদ সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) দণ্ডায়মান হইয়া 'পিতা নোহসি', বৈদিক স্তোত্র গান করেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া ও সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মনে হইল, আমরা যেন সুদূর অতীত যুগের কোন শান্ত তপোবনে উপস্থিত হইয়া তপোনিষ্ঠ মুনিকণ্ঠ-নিঃসৃত বেদগান উপভোগ করিতেছি। তৎপরে পর পর "বিমল প্রভাতে মিলি এক সাথে বিশ্বনাথে করহ প্রণাম" "অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতম হে", "দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান", "জানিহে যবে প্রভাত হবে",—সঙ্গীত কয়েকটী গীত হইল।

তৎপরে আচার্য্য উপাসনা করিলেন এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম," "আনন্দরূপ মমৃতং যদ্বিভাতি," "শান্তং শিবমদ্বৈতম্," "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" এই মন্ত্র কয়েকটী অবলম্বন করতঃ একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, ঈশ্বর অন্তরে ও বাহিরে প্রকাশমান, অন্তরে তিনি সত্যজ্ঞানরূপে ও বাহিরে শোভা-সৌন্দর্য্যরূপে, আনন্দরূপে এবং অমৃতরূপে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন।

তৎপরে পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কয়েকটী মন্ত্রের উৎপত্তি বিষয়ে বলেন যে মহর্ষিদেব এই মন্ত্র কয়েকটী আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। এ তাঁহার এক অমূল্য দান। উপনিষদ-খনি হইতে যে সমস্ত স্বর্ণটুকরা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এ মন্ত্র কয়েকটী আমাদের ব্রহ্মোপাসনার অঙ্গীভূত। পরে এই সম্বন্ধে মহর্ষিদেব স্বীয় আত্মজীবনীতে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা পাঠ করেন। মহর্ষির আত্মজীবনী হইতে পাঠকের অবগতির জন্য সেটুকু আমরা এখানে উদ্ধৃত করিব। "এত দিন ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম উপসনাতে "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি" এই দুই মহাবাক্য ছিল, ইহা অপূর্ণ ছিল। এখন তাহাতে "শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্" যোগ হওয়ায় তাহা পূর্ণ হইল। যিনি আত্মায় অন্তর্যামী ব্রহ্ম এবং তাহাতে নিয়ত জ্ঞানধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছেন, তিনি 'সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'। তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করি। যখন সেই 'সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'কে এই অসীম আকাশস্থিত শোভাসৌন্দর্য্যের মধ্যে দেখি, তখন দেখি যে আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি, তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন. তিনি অন্তরে বাহিরে থাকিয়াও আপনাতে

আপনি আছেন এবং আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন ও সম্পন্ন করিতেছেন, তিনি শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্। সাধকদিগের সর্ব্ব স্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন এবং আপনাতে আপনি যে আছেন, সেই ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন। আমরা একই সময়ে সব ভাবিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু যে যোগী সেই একই সময়ে তাঁহার এই ত্রিত্ব দেখিতে পান, তিনি আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের অন্তরে আছেন, আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের বাহিরে আছেন এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন ও সাধন করিতেছেন। তিনি ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" এই অংশটুকু পাঠান্তে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন যে আজ আমরা তাঁহাকে 'শান্তম্ শিবমদ্বৈতম'রূপে পূজা করিব। বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র অশান্তি বিদ্যমান; সমগ্র জগৎ দ্বেষ, হিংসা ও বিদ্রোহে পরিপূর্ণ, আমাদের আত্মাতেও অশান্তি—এ হেন অশান্তির সময়ে ভগবান আমাদের উপরে শান্তিবারি বর্ষণ করুন—এই বলিয়া ঐকান্তিক প্রার্থনা করিলেন।

পরে ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক "বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি" এই সঙ্গীতটী গীত হইল।

অনন্তর আচার্য্য বেদী হইতে জলদগম্ভীর ভাষায় বক্তৃতা করিলেন, তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

আমাদের জীবনের একটা মহাভ্রান্তি এই—যে বিরাট বিশ্ব প্রকৃতি নিরন্তর আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে তাহার সহিত আমাদের অন্তরের কোন যোগ নাই। কেন যে ভগবান্ মানুষকে বিশ্বের প্রাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সাধারণ মানুষ এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। চন্দ্র-সূর্য্য প্রতিদিন কত সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে আমাদের সম্মুখে উদয় হয় আমরা যেন তাহা দেখিয়াও দেখি না—আমরা যেন চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। অনন্ত নীলাকাশ চিরদিন আমাদের মস্তকের উপর নীল চন্দ্রাতপের মত অবস্থিত রহিয়াছে, আমরা সেদিকে দৃষ্টিপাত করি না। প্রতি রজনীতে আকাশে অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী স্বর্গীয় ফুলের মত ফুটিয়া উঠে, তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার এবং সে বিমল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার অবসর আমাদের নাই। আনন্দস্বরূপের আনন্দপূর্ণ বিশ্ব আমাদের নিকট অবসন্ন; ক্ষুদ্র পৃথিবীর অধিবাসী আমরা তাহার একবিন্দু স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, একটি ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে থাকিতেই ভালবাসি। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিনৈপুণ্যের প্রতি চক্ষু বুজিয়া, তাঁহার বাণী অগ্রাহ্য করিয়া আমরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া দিই।

Emerson বলিয়াছেন—"The universe is the property of every individual in it. Every rational creature has all nature for his dowry and estate. It is his, if he will. He may divest himself of it; he may creep into a corner and abdicate his kingdom, as most men do, but he is entitled to the world by his constitution."

সত্য সত্য আমরা বিশাল বিশ্বরাজ্য ত্যাগ করিয়া স্বরচিত এক ক্ষুদ্র রাজ্যে চিরদিন বাস করি। ইহার ফল এই হইয়াছে যে আমাদের মনপ্রাণ আত্মা সব চিরদিন সঙ্কুচিত রহিয়া যাইতেছে, আমাদের জীবনপুষ্প কিছুতেই বিকশিত হইতে পারিতেছে না।

বিধাতা আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও উপভোগের জন্য এই বিরাট বিশ্ব চিরদিন আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন। এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের অন্তরের যোগ সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। বিশ্বের মধ্যে বিশ্ববিধাতাকে দেখিবার যে সাধন সেই সাধন জীবনে অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা মুখে বলি ভগবান্ সর্ব্বত্র বিরাজমান, এটা আমাদের পক্ষে একটা বিচারসিদ্ধ সত্য মাত্র কিন্তু উপলব্ধির বিষয় নহে। যাঁরা এই সত্য উপলব্ধি করেন, তাঁরা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্বেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাঁহার জাগ্রত শক্তি অনুভব করিয়া কৃতার্থ হন।

ভাই, ভগ্নি, এস আমরা শ্রদ্ধার সহিত এই বিশ্বকে বরণ করিয়া অন্তরে গ্রহণ করি; সাধনা দ্বারা তাহার মধ্যে বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করি।

তৎপরে শ্রীমতী উমাদেবী কর্ত্তৃক "যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু"—এই সঙ্গীতটী গীত হইল। অনন্তর পূজ্যপাদ সত্যেন্দ্রনাথ একটী প্রার্থনা করেন। তৎপরে "জয় জয় পরব্রহ্ম"—গানটী গীত হইবার পর সত্যেন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাদানন্তর উপাসনাসভা ভঙ্গ হইল।

শেষটা অবশ্য মধুরেণ সমাপ্ত, কিন্তু মধুর অর্থাৎ মিষ্টের যে কত প্রকার নমুনা আমদানি হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। শান্তিধামের এ বৎসরের মাঘোৎসব ভগবানের আশীর্বাদে অপার শান্তি ও আনন্দ সহকারে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে।

জ্যেষ্ঠ ভগ্নী
৺প্রতিভা দেবী।

(৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)*

(১)

তুমি যবে ছিলে ঘরে, উজলিত ঘর
পিয়ানো সারঙ্গ বীণ এস্রাজ সেতারে;
খেলিতে যে খেলা তুমি ললিত অমর—
মনে আছে জেগে আছে হৃদয় মাঝারে।
রাশি রাশি কোলাহলে যবে ম্রিয়মাণ,
আশঙ্কায় দুরু দুরু কেঁপে উঠে হিয়া,—
মধুর গানের সেই তোমার অমনি
স্মৃতিগুলি একেকটা যেন ফুলমণি
ছুটে আসে কাছাকাছি—পাই সে আঘ্রাণ
জীবনের পথ যবে খুঁজি আকুলিয়া,
তোমার সে গীত আসি করে আলিঙ্গন—
কিবা সে ঝঙ্কার তুলি মাতায় পরাণ।
মুখরিত হ'ল আজি জগতপ্রাঙ্গন
মধুর বীণায় তব শুনিয়া সে গান।

* ৺প্রতিভা দেবীর বিবাহের পরেই তাঁহার ভ্রাতা ৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত। হিতেন্দ্রনাথের পুরাতন হস্তলিপি হইতে প্রাপ্ত। ভং সং

(২)

যাঁহার ঘরেতে গেছ আমাদের ছেড়ে—
লয়ে গেছ সেই সাথে উৎসব গীতের ;
আমাদের কাছ থেকে ল'য়ে গেছ কেড়ে
সঙ্গীত-ঐশ্বর্য্য সব সম্পদ হিতের।
দূর হ'তে স্নেহময় আস্বাদ তোমার
সঙ্গীতের মন্ত্রবলে পাই কতবার ;
কি এক উৎসাহ ভাব জাগেরে তখন।
তোমার বীণার সুরে হইয়া মগন
মুখরিয়া উঠে যত শুষ্ক ভাব-তরু,
শ্যামল হইয়া উঠে জীবনের মরু ;
পরাণের মাঝে তবে কিবা প্রাণ পাই
বীণার ঝঙ্কার উঠে—ডাকি' সবে ভাই।
গীতিময়ী প্রতিভার পাইয়া পরশ
জগত ভরিয়া হেরি তোমারি দরশ।

দাসত্ব।

দাসত্ব কি ? পরের চরণে আপনাকে বলি দেওয়া। যে ব্যক্তি যত অধিক আপনাকে বলি দিতে পারিবে, সে দাসত্বের তত শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। আত্মবলি দুই প্রকারে হয়—এক, প্রেমেতে, দ্বিতীয় বলেতে। প্রেমেতে যে আত্মবলি দেওয়া হয়, তাহাই প্রকৃত আত্মবলি। প্রেমের নিকট তাহা দাসত্ব হইলেও সাধারণতঃ তাহাকে দাসত্ব বলা যায় না। প্রেমের নিকট আত্মবলি দিবার ফলে, দাসত্ব স্বীকারের ফলে, যে সকল মনোবৃত্তি লইয়া আমাদের মনুষ্যত্ব, সেই সকল মনোবৃত্তি আশ্চর্য্য রকমে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু বলের নিকটে যে আত্মবলি দেওয়া হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ দাসত্ব বলা হয়, এবং তাহাই প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব,—তাহা প্রকৃতপক্ষে স্বেচ্ছায় আত্মবলি নহে। অপরের শারীরিক বলপ্রয়োগে, অথবা অপরের প্রদত্ত অর্থ বা সম্মান প্রভৃতির লোভে, অথবা ভয়প্রদর্শন প্রভৃতি মানসিক বলপ্রয়োগে, যে কোন প্রকার বলপ্রয়োগে আমাকে আত্মবলি দিতে বাধ্য করিলেই তাহা প্রকৃত দাসত্ব হইল। এই প্রকার দাসত্ব স্বীকারের ফলে মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিবার পরিবর্ত্তে বিনষ্টই হইয়া যায়, শুকাইয়া যায়। যিনি যত বড়ই চাকরী করুন—চাকরী চাকরীই, চাকরী মাত্রই দাসত্ব। বড় হইতে ছোট পর্য্যন্ত সকল দাসই এমনভাবে দাসত্বের গণ্ডীর মধ্যে ঢুকিয়া যান যে, চক্ষের সম্মুখে নিজেদের মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হইতে দেখিলেও সকল দাসেরই, অন্ততঃ অধিকাংশেরই, সেই গণ্ডী কাটিয়া বাহির হওয়া বড়ই কঠিন হয়। আমি জানিতেছি যে আমার উপরিতন কর্ম্মচারীর আদেশে আমি আমার বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছি ; অথবা তিনি নিজেই এমন কাজ করিতেছেন, যাহাতে আমার বিবেক সায় দিতেছে না, তখন আমি নিজেকে স্তোক দিলাম যে আমি তো নিজে এই অন্যায় কাজ করিতেছি না—আমার উপরিতন কর্ম্মচারী করিতেছেন, তা আমি কি করিব ? এইরূপ স্তোক দিয়া নিজের বিবেককে অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে নিরস্ত করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অন্যায়ের উপর ঘৃণা চলিয়া যাওয়ায় পরিণামে অন্যায় কার্য্যে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আমরা নিজেরাই অগ্রসর হইতে থাকি। এইরূপে দ্রুতগতিতে আমাদের দাসভাব বা slave-mentality আসিয়া পড়ে। এই ভাবটী আসিলেই মানুষের নিজস্ব বা মনুষ্যত্ব খুব শীঘ্রই চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়।

চাকরীর সুবিধার মধ্যে নিয়মিত বেতন প্রভৃতি পাওয়া। ঘড়ির কাঁটার মত ঠিক নির্দ্দিষ্ট দিনে বেতনটী পাইলাম বটে। কিন্তু একবার যদি ভাবিয়া দেখা যায় যে, কি ত্যাগের ফলে এই বেতনটী পাইতেছি, তাহা হইলে এ প্রকার নির্দ্দিষ্ট বেতনের উপর প্রত্যেক মানুষেরই আন্তরিক ঘৃণা উপস্থিত হইবে। এই নির্দ্দিষ্ট আয় থাকিবার কারণেই আবার ব্যয়ও নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়ে। প্রায়ই দেখা যায় যে, আয়ের অনুপাতেই ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করা হয়। অতিরিক্ত বাকী থাকে খুবই কম। সেই জন্য এক আধটা বিপদ আপদ পড়িলেই আর সেই নির্দ্দিষ্ট আয়ে কুলায় না, মাথায় হাত দিয়া বসিতে হয়। তখন অগতির গতি মহাজনের নিকট ছুটিতে হয়—বেশী সুদে ঋণ করিতে হয়। এই ঋণ শুধিবার সঙ্গতি থাকে না। তখন আবার এই ঋণের দায়ে পড়িয়া আর দাসত্ব ছাড়িবার উপায় থাকে না—চাকরী যাইবার নাম হইলেই প্রাণের ভিতর মহা আতঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হয় ; তখন কাজেই উপরিতন কর্ম্মচারীর শত গালাগালি, শত পাদুকাপ্রহার সহ্য করিয়াও চাকরী কামড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে হয়। এইখানেই স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা এবং মহত্ত্ব লাভের আশার মূলে কুঠারাঘাত। এইরূপে দেখা যায় যে, চাকরীর ফলে মহদ্‌ভাবগুলি শুকাইয়া মরিয়া যায় ; আবার সেগুলি মরিয়া গেলে তখন আবার চাকরীকেই একমাত্র অধমতারণ বলিয়া মনে হয়। ভারতের অদৃষ্টে অনেকটা এইরূপ ঘটিয়াছে।

এই দাসভাব অনেকের অস্থিমজ্জায় এমন মিশিয়া যায় যে, তাঁহারা যেমন নিজেরা দাসত্বের চরণে আত্মবলি দিয়া থাকেন, তেমনি তাঁহারা অপরেরও দাসত্ব স্বীকার দেখিতে ভাল বাসেন।

তাঁহারা নিজের কর্ম্মস্থলে গিয়া যেমন উপরিতন কর্ম্মচারীর পদমর্দ্দন করিতে ভাল বাসেন এবং তাঁহার গালিগালাজকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া লয়েন, সেইরূপ তাঁহারা বাড়ীতে আসিয়া দেখিতে চাহেন যে, চারিদিক হইতে সকলে তাঁহাকে সেলাম প্রভৃতি করিতেছে; গৃহে পরিজনগণের প্রতি রূঢ় বাক্য প্রভৃতি বলিয়া নিজের দাসত্বকে নিজের প্রভুত্ব-বোধে পরিতৃপ্তি লাভ করেন। আমি জানি যে, গবর্ণমেণ্টের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পেনসন লইবার পর দেখিলেন যে, পেয়াদা প্রভৃতি জনসাধারণ আর পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে সেলাম করে না। তিনি ইহাতে যে মনোব্যথা পাইয়াছিলেন, তাহা বন্ধুদের নিকট ব্যক্ত করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। এই প্রকার কল্পিত অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি পেনসন লইবার পর ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু-মুখে পড়িলেন। এই একটী দৃষ্টান্ত দিলাম বটে; কিন্তু খুঁজিয়া দেখিলে এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এদেশের অস্পৃশ্য জাতির অস্পৃশ্যত্বও এই কারণেই দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এই দাসভাব কাটাইবার একমাত্র উপায় নিজেকে ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করা। ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে মোটা ভাত মোটা কাপড়েই জীবনযাত্রা সহজেই নির্ব্বাহ হইতে পারে, সুতরাং দাসখত লিখিয়া দিবার প্রয়োজনই হয় না। ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই দাসভাব ঝাড়িয়া ফেলা আমাদের জীবনরক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যে দাঁড়াইলে আমি ধূলি ধরিলে সোনা ফলিবে। ভারতবাসীরা ভগবানকে ছাড়িয়া নানা উপধর্ম্মকে আঁকড়াইয়া ধরাতেই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই কারণেই দাসভাবের নিকট খত লিখিতে বাধ্য হইয়াছে।

স্বাধীনতার জন্য কেবল উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিলে তাহা আমাদের হস্তগত হইবে না। স্বাধীনতার যিনি উৎস, তাঁহাকে প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহার নিয়ম পালন পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যে দাঁড়াইয়া দাসভাব মন হইতে বিদূরিত করিয়া স্বাধীনতালাভের উপযুক্ত হইলেই স্বাধীনতা নিজে আসিয়া ধরা দিবে। নিজে স্বাধীনতার উপযুক্ত হইবে এবং অপর সকলকেও স্বাধীনতার উপযুক্ত করিয়া তুলিবে—তখন দেখিবে স্বাধীনতা তোমার আশে পাশে সকল দিকে। নান্যঃ পন্থাঃ—স্বাধীনতালাভের দ্বিতীয় পথ নাই।

নৌকাপ্রবন্ধের সংযোজন।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

মনুসংহিতায় অনূপদেশে অর্থাৎ জলবহুল দেশে নৌকার দ্বারা যুদ্ধের উপদেশ আছে।* কিন্তু এই উপদেশের সার্থকতা গৌড়েই রক্ষিত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়।

সংবাদ।

গত ১১ মাঘ বুধবার কটক জিলার অধীন পাণ্ডুয়ার নব প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক মাঘোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র সমাজ-গৃহটী পত্রপুষ্পে উৎসবোচিত নূতন বেশেই সজ্জিত হইয়াছিল। ১১ মাঘের প্রভাতে প্রত্যেক সভ্যের মুখেই একটী আনন্দ-জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইয়াছিল। স্থানীয় অশিক্ষিত লোকগণ যদিও উৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় নাই, তথাপি তাহারা সে দিবস অভিনব ভাবে উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। প্রাতঃকালে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক মহাশয় বেদীগ্রহণ করিয়া একটী প্রাণস্পর্শী উদ্বোধন করিয়া সকল সভাবৃন্দকে উদ্বোধিত করিলে পর যথারীতি আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা হয়। উপাসনা অন্তে "জগৎমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ভক্তগণ তাঁহারই প্রসাদে জড়রাজ্য ভেদ করিয়া দেখিতে পায়" এই সম্বন্ধে মহর্ষিদেবের ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান হইতে একটী উপদেশ পঠিত হয়। পরিশেষে "ওহে জীবন বল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ" এই সংকীর্ত্তনটী গীত হইয়া প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ হইয়াছিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্থানীয় যুবকবৃন্দ খোল ও করতাল-যোগে সুমধুর সংকীর্ত্তনে উৎকলবাসীর হৃদয়ে উৎসব-আনন্দ বিশেষরূপে নিহিত করিয়া দিয়াছিল।

সন্ধ্যার উপাসনায় শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় বেদীগ্রহণ করিয়া প্রথমে সমাজের গত বৎসরের বিবরণী পাঠ করেন; পরে যথানিয়মে উপাসনা সম্পন্ন করিয়া "ব্রহ্মদর্শন" সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। স্থানীয় সভ্যবৃন্দ উৎসবোচিত ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিয়া দর্শকবৃন্দের মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে গ্রামবাসী যুবকগণ প্রায় দুই ঘণ্টা কাল প্রমত্তভাবে সংকীর্ত্তন করিয়া উৎসবটীকে বিশেষভাবে জমাট করিয়া তুলিয়াছিলেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীভিখারীচরণ বিশ্বাল।

জেলে মাঘোৎসব।

আমরা অবগত হইলাম যে, এবার খিদিরপুর জেলে ধৃত ব্রাহ্মকয়েদীগণ, জেলের ভিতরই মাঘোৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। সমবেত হিন্দু, মুসলমান ও শিখ প্রভৃতি কয়েদীগণের সকলেই আনন্দের সহিত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। জেলের মধ্যে মাঘোৎসব এই প্রথম। যাহা হউক কয়েদীগণ জেলের মধ্যে থাকিয়াও যে ভগবানের অমৃত রসাস্বাদন করিতে পারিয়াছেন ইহাতেই আমরা পরম সুখী হইলাম।

* স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুধ্যেদনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা। ৭।১৯২।

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে।
কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে।
মাতৃ-গর্ত্ত-অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে,
অন্তে পুনঃ অন্ধকার সংসার দেখিবে।
প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন,
সেই সব উপদ্রব শেষেও ঘটিবে।
অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান,
পরহিতে মন দিযে সত্যকে চিন্তিবে॥

কথা—রাজা রামমোহন রায়
সুর—৺ বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ২´ ৩ ০
মা পদা II -া দা পা -মা। পা মা -া পগা। া গা -ঋা -া। সা -া -া সা I
এ ক ০ বা র ০ ভ্র মে ০ ০ ০ ০ তে ০ ০ ও ০ ০ ম

১´ ২´ ৩ ০
I ঋা মা -া গা। মা দা -া -া। -া দদা -পমা -গা। -মা -গা } -া পা I
নে না ০ ভা বি ০ ০ ০ ০ বে ০০ ০ ০ ০ ০ কি

১´ ২´ ৩ ০
I পা দা -র্সা না। র্সা র্সা -া -া। -া নর্সা না -দা। -পা -া -া পা I
ক ষ্টে ০ জ ন্মি য়া ০ ০ ০ ছি০ লে ০ ০ ০ ০ কি

১ ২ ৩ ০
I দা পদা] -পদা পা। পমা পদা -া দা। -া দদা -পমা -গা। -মা -গা মা পদা II
দুঃ খে০ ০০ তে প্রা০ ণ০ ০ যা ০ বে০ ০০ ০ ০ ০ "এ ক০"

১ ২´ ৩ ০
-া পা II দা না -র্সা র্সা। র্সা র্সা -া -া। -া র্সনা -র্সা র্সা। -া -া -া দা I
০ মা তৃ গ ০ র্ত্ত অ ন্ধ ০ ০ ০ কা০ ০ রে ০ ০ ০ ব

১ ২´ ৩ ০
I দা না র্সা র্সা। র্ঋা র্ঋা -া র্সর্সা। -া নর্সা না দা। -পা -া -া পা I
দ্ধ ছি ০ লে কা রা ০ ০০ ০ গা০ রে ০ ০ ০ ০ অ

১ ২´ ৩ ০
I দা দা -র্ঋা র্সা। র্সনা র্সা -া -া। -া নর্সা গা -দা। পা -া -া পা I
ন্তে পু ০ নঃ অ০ ন্ধ ০ ০ ০ কা০ র ০ ০ ০ ০ সং

১ ২´ ৩ ০
I -দর্সা পদা -া পা। দা দা -া -া। -া দদা -পমা -গা। -মা -গা না পদা II
০০ সা০ ০ র দে খি ০ ০ ০ বে০ ০০ ০ ০ ০ "এ ক০"

১ ২´ ৩ ০
-া সা I সা সা -া ঋা | মা মা -া -া | -া মা -া -া | -গা -া -া মা I
০ প্র থ মে ০ তে সং জ্ঞা ০ ০ ০ হী ০ ০ ০ ০ ন্ ছি

১ ২´ ৩ ০
I মা গা মা পা | পা দপা ণা দপা | -া দা -া পা | -দা -মা -া পা I
লে ০ প ড় প রা০ ০ ০০ ০ ধী ০ ০ ০ ০ ন সে

১ ২´ ৩ ০
I দা দা -র্সা না | র্সা র্সা -া -না | -র্সা ণা -দা -া | -পা -া পা পা I
হি স ০ ব উ প ০ ০ ০ ক্র ০ ০ ০ ০ ব শে

১ ২´ ৩ ০
I দা ণা -দা পণা | -া -া -া দা | দা -া দদা -পমা | -গা -মা -া পা I
যে ও ০ ০০ ০ ০ ০ য টি ০ বে০ ০০ ০ ০ ০ অ

১ ২´ ৩ ০
I দা দা -র্সা না | র্সা র্সা -া -া | র্সা না র্সা -া | -া -া -া দা I
ত এ ০ ব সা ব ০ ০ ধা ০ ০ ০ ০ ০ ন্ যে

১ ২´ ৩ ০
I দা না র্সা র্সা | র্ঋঃ র্ঋঃ -া -া র্সসা | -া নর্সা -ণা দা | -পা -া পা দা I
অ ব ০ ধি থা কে ০ ০ ০০ ০ জ্ঞা০ ০ ০ ০ ০ ন্ প

১ ২´ ৩ ০
I দা দা র্ঋা র্সা | র্সা -া -া -া | -া নর্সা না -দা | -পা -া -া পা |
র হি ০ তে র ০ ০ ০ ন দি০ বে ০ ০ ০ ০ স

১ ২´ ৩ ০
I দা ণা ণদা পণা | -া -া দা -া | -া দদা -পমা -গা | -মা -গা মা গদা II
তো তে চি০ ০০ ০ ০ স্থি ০ ০ বে০ ০০ ০ ০ ০ "এ ক০"

রামকেলী—আড়াঠেকা।

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে ;
এ সুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে।
শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে,
গলিত কপোল কণ্ঠ হবে কিছু দিনে।
লোল চর্ম্ম কদাকার, কফ কাস দুর্নিবার.
হস্ত পদ শিরঃকম্প ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে।
অতএব ত্যজ গর্ব্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব্ব,
দয়া জীবে নম্র তাকে ভাব সত্য নিরঞ্জনে।

কথা—রাজা রামমোহন রায়
সুর—৺ বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

{ মা ণদা II -া দা -পা মা। পা মা -া -পগা। -া গা -ঋা -া। -সা -া -া সা I
ক ত০ ০ আ ০ র সু খে ০ ০০ ০ মু ০ ০ খ ০ ০ দে

I ঋা মা মা -গা। মা -দা -া -া। -া দদা -পমা -গা। -মা -গা } -া পা I
খি বে দ ০ র্প ০ ০ ০ ০ ণে০ ০০ ০ ০ ০ ০ এ

I দা দা -র্সা না। র্সা র্সা -া -া। -া নর্সা -ণা -দা। -পা -া -া পা I
মু খে ০ র প রি ০ ০ ০ ণা০ ০ ০ ০ ০ ম বা

I দা ণদা -ণদা পা। পমা ণদা -া দা। -া দদা -পমা -গা। -মা -গা মা নদা II
রে ক০ ০০ না ভা০ ব০ ০ ম ০ নে০ ০০ ০ ০ ০ "ক ত০"

-া পা II দা না -র্সা র্সা। র্সা র্সা -া -া। -া র্সনা -র্সা র্সা। -া -া -া দা I
০ শ্যা ম কে ০ শ খে ত ০ ০ ০ হ০ ০ বে ০ ০ ০ ক্র

I দা র্না -র্সা র্সা। র্ঋা র্ঋা -া -র্সর্সা। -া নর্সা না -দা। -পা -া -া পা I
মে স ব ব দ ন্ত ০ ০০ ০ যা০ বে ০ ০ ০ ০ গ

I দা দা -র্ঋা র্সা। র্সনা র্সা -া -া। -া নর্সা ণা -দা। -পা -া -া পা I
লি ত ০ ক পো০ ল ০ ০ ০ ক০ ঠ ০ ০ ০ ০ হ

I দর্সা ণদা -া পা। -া -া দা -া। -া দদা -মপা -গা। -মা -গা মা ণদা II
বে০ কি০ ০ ছু ০ ০ দি ০ ০ নে০ ০০ ০ ০ ০ "ক ত০"

-া সা II সা সা -া ঋা। মা মা -া -া। -া মা -া -া। -গা -া -া মা I
০ লো ন চ ০ র্ম ক দা ০ ০ ০ কা ০ ০ ০ ০ র ক

I গা মা -পা -া। পা দপা -ণা -দপা। -া দা -পা -া। -দা -মা -া পা I
ক্‌ কা ০ স্‌ দৃ র্নি০ ০ ০০ ০ বা ০ ০ ০ ০ র হ

I দা দা -র্সা না। র্সা র্সা -া -না। -র্সা না দা -া। -পা -া -া পা I
স্ত প ০ দ শি রঃ ০ ০ ০ ক ম্প ০ ০ ০ ০ ভ্রা

I দা ণা দা -পণা। -া -া -া দা। -া -া দদা -পমা। -গা -মা -া পা I
ন্তি ক ণে ০০ ০ ০ ০ ক ০ ০ ণে০ ০০ ০ ০ ০ অ

১ ২´ ৩ •
I দা দা -র্সা না। র্সা র্সা -া -া। র্সা -না -র্সা র্সা। -া -া -া দা I
ত এ • ব ত্য জ • • গ • • র্ব • • • অ

১ ২´ ৩ •
I দা না -র্সা র্সা। ঋঃ ঋঃ া -া -র্সর্সা। -া নর্সা ণা -দা। -পা -া -া পা I
নি ত্য • আ নি বে • • • •• • স • র্ব • • • • হ

১ ২´ ৩ •
I দা দা -র্ঋা র্সা। র্সা র্সা -া -া। -া নর্সা ণা -দা। -পা -া -া পা I
রা জী • বে ন ম্র • • • ভা • বে • • • • তা

১ ২´ ৩ •
I দা ণা ণদা -পণা। দা দা -া দা। -া দদা -পমা -গা। মা -গা মা ণদা II II
ব স্ ত্য • • • নি য় • শ্র • নে • • • • • • "ক ত •"

—— o ——

রামকেলী—আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে।
তথাপি বিষয়ে মত্ত সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হলো এত,
বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।
এসব কথার ছলে, কিম্বা ধন-জন-বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দর্শনে।
অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে।

কথা—রাজা রামমোহন রায়
সুর—৺বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ২´ ৩ •
{ মা ণদা II -া দা পা -মা। পা -মা -া পপা। -া গা -ঋা -া। সা -া -া সা I
গ্রা • • স্ ক রে • কা • • • • ল্ প • • র • • মা

১ ২´ ৩ •
I ঋা মা মা -া। মা -দা -া -া। -া দদা -পমা -গা। -মা -গা } -া পা I
য়ু প্র তি • ক্ষ • • • • ণে • •• • • • • ত

১ ২´ ৩ •
I পা দা -র্সা না। র্সা র্সা -া -া। -া নর্সা ণা -দা। -পা -া -া পা I
থা পি • বি ষ য়ে • • • ম • ত্ত • • • • স

১ ২´ ৩ •
I দা ণদা -ণদা পা। পমা ণদা -া। দা দদা -পমা -গা। -মা -গা মা -ণদা II
দা ব্য • • • স্ত উ • পা • • র্জ্জ নে • • • • • • "গ্রা • •"

১ ২´ ৩ •
-া পা II দা না -র্সা র্সা। র্সা র্সা -া -া। -া র্সনা -র্সা র্সা। -া -া -া দা I
• গ ত হ • য় আ য়ু • • • য • • ত • • • স্নে

১ ২´ ৩ •
I দা না -র্সা র্সা। র্ঋা র্ঋা -া -র্সর্সা। -া নর্সা ণা -দা। -পা -া -া পা I
হে ক • হ হ লো • •• • এ • ত • • • • ব

১ ২´ ৩ •
I দা র্রা র্ঋা র্সা | র্সনা র্সা -া -া | -া নর্সা ণা -দা | -পা -া -া পা I
র্ব গে ০ লে ক০ র্ষ ০ ০ ০ বৃ০ দ্ধি ০ ০ ০ ০ য

১ ২´ ৩ •
I দর্সা ণদা -া পা | -া -া দা -া | -া দদা -পমা -পা | -মা -গা মা -ণদা II
লে০ য০ ০ দ্ধ ০ ০ প ০ ০ পে০ ০০ ০ ০ ০ "প্রা ০০"

১ ২´ ৩ •
-া সা II সা সা -া ঋা | মা -া -া -া | -া মা মা -া | -গা -া -া মা I
০ এ স ব ০ ক থা ০ ০ ০ বৃ হ লে ০ ০ ০ ০ কিং

১ ২´ ৩ •
I মা -গা মা পা | পা দপা -পা -দপা | -া দা পা -া | -দা -মা -া পা I
বা ০ ধ ন জ ন০ ০ ০০ ০ ব লে ০ ০ ০ ০ তি

১ ২´ ৩ •
I দা দা -র্সা না | র্সা -া -া -না | র্সা ণা -দা -া | -পা -া -া পা I
লে ক ০ নি ত্বা ০ ০ ০ র মা ০ ০ ০ ০ ই কা

১ ২´ ৩ •
I দা ণা দা -পণ | -া -া -া দা | -া -া দদা -পমা | -পা -মা -া পা I
লে র দ ০০ ০ ০ ০ র্ণ ০ ০ নে০ ০০ ০ ০ ০ অ

১ ২´ ৩ •
I দা দা -র্সা না | র্সা র্সা -া -া | র্সা -না -র্সা র্সা | -া -া -া দা I
ন্ত এ ০ ব লি র ০ ০ ত্ত ০ ০ র ০ ০ ০ চি

১ ২´ ৩ •
I দা না -র্সা র্সা | র্ঋঃ র্ঋঃা -া -র্সর্সা | -া নর্সা না -দা | -পা -া -া পা I
ন্ত ন ০ অ প রা০ ০ ০০ ৎ প০ র ০ ০ ০ ০ বি

১ ২´ ৩ •
I দা দা -র্ঋা র্সা | র্সা র্সা -া -া | -া নর্সা ণা -দা | -পা -া -া পা I
বে ক ০ বৈ রা গ্য ০ ০ ০ হ০ লে ০ ০ ০ ০ কি

১ ২´ ৩ •
I দা পা পদা -পণা | -া -া দা -া | -া দদা -পমা -পা | -মা -গা মা -ণদা II II
ত র য০ ০০ ০ ০ র ০ ০ পে০ ০০ ০ ০ ০ "প্রা ০০"

—•—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রহস্য।

গীতার মূল শ্লোক, বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনী।

উপোদ্ঘাত।

জ্ঞান ও শ্রদ্ধা দ্বারা, ইহার মধ্যেও বিশেষত ভক্তির সুগম রাজমার্গের দ্বারা যতদূর সম্ভব, সমবুদ্ধি করিয়া লোকসংগ্রহের নিমিত্ত স্বধর্মানুসারে নিজ নিজ কর্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে আমরণ করিতে থাকাই প্রত্যেক মনুষ্যের পরম কর্তব্য; ইহাতেই উহার ঐহিক ও পারলৌকিক পরম কল্যাণ নিহিত; এবং উহার মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য কর্ম ছাড়িয়া বসিবার অথবা অন্য কোন অনুষ্ঠান করিবারও প্রয়োজন নাই। গীতারহস্যে প্রকরণক্রমে সবিস্তার যাহা প্রতিপাদন করিয়াছি, তাহাই গীতাশাস্ত্রের ফলিতার্থ। এই প্রকার চতুর্দশ প্রকরণে ইহাও দেখাইয়া আসিয়াছি যে, ঐ উদ্দেশ্যে গীতার আঠারো অধ্যায়ের সঙ্গতি কেমন সুন্দর ও সহজে পাওয়া যায়; এবং এই কর্মযোগ-প্রধান গীতাধর্মে অন্যান্য মোক্ষসাধনের কোন্ কোন্ অংশ কি প্রকারে আসিল। এই সকল করিবার পর, বস্তুত গীতার শ্লোকসমূহের যথাক্রমে আমার মতানুসারে (দেশীয়) ভাষাতে সরল অর্থ বলার অতিরিক্ত কোন কাজ বাকী থাকে না। কিন্তু গীতারহস্যের সাধারণ আলোচনায় গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়বিভাগ কিপ্রকার হইয়াছে, কিংবা টীকাকারগণ নিজেদের সম্প্রদায়ের পুষ্টির জন্য কোন বিশেষ শ্লোকে পদগুলির কিপ্রকার টানাবোনা করিয়াছেন, তাহা বলিবার সুবিধা হয় নাই। এই কারণে এই দুই বিষয়ের বিচার করিবার জন্য, এবং যেখানকার সেইখানেই পূর্বাপর সঙ্গতি দেখাইয়া দিবার জন্যও, অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার ভাবে কিছু টিপ্পনী দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আরও, যে সকল বিষয় গীতারহস্যে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের কেবল দিগ্‌দর্শন করাইয়া দিয়াছি, এবং গীতারহস্যের যে প্রকরণে ঐ বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে উহার কেবল উল্লেখ করিয়াছি। এই টিপ্পনীসকল মূল গ্রন্থ হইতে যাহাতে পৃথক জানা যায়, তজ্জন্য এই [ ] চতুষ্কোণ ব্র্যাকেটের ভিতর রাখা গিয়াছে এবং মার্জিনে (কিনারায়) ভাঙ্গা খাড়া রেখাও লাগানো হইয়াছে। শ্লোকের অনুবাদ, যতদূর সম্ভব, শব্দশঃ করা হইয়াছে এবং অনেক স্থলেই মূলেরই শব্দ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং "অর্থাৎ"এর সহিত জুড়িয়া দিয়া উহার অর্থ খুলিয়া দিয়াছি এবং ছোটখাটো টিপ্পনীর কাজ অনুবাদ হইতেই বাহির করা হইয়াছে। এই সমস্ত করিলে পরও, সংস্কৃত ভাষার এবং (দেশীয়) ভাষার প্রণালী বিভিন্ন হইবার কারণে, মূল সংস্কৃত শ্লোকের পূর্ণ অর্থও (দেশীয়) ভাষাতে ব্যক্ত করিবার জন্য কিছু বেশী শব্দ প্রয়োগ অবশ্য করিতে হয়, এবং অনেক স্থলে মূলের শব্দ অনুবাদে প্রমাণার্থ গ্রহণ করিতে হয়। এই শব্দের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য ( ) এইরূপ কোষ্ঠকে (ব্র্যাকেটে) ইহা রাখা হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে শ্লোকের সংখ্যা শ্লোকের শেষে থাকে; কিন্তু অনুবাদে আমি এই সংখ্যা প্রথমেই, আরম্ভেই রাখিয়াছি। অতএব কোন শ্লোকের অনুবাদ দেখিতে হইলে অনুবাদে ঐ সংখ্যার পরবর্তী বাক্য পড়িতে হইবে। অনুবাদের রচনা প্রায় এমন করা হইয়াছে যে, টিপ্পনী ছাড়িয়া নিছক অনুবাদই পড়িলেও অর্থে কোনই ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এই প্রকার যেখানে মূলে একই বাক্য, একাধিক শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে, সেখানে সেই কয়টী শ্লোকেরই অনুবাদে ঐ অর্থ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। অতএব কতকগুলি শ্লোকের অনুবাদ মিলাইয়াই পড়িতে হইবে। এইরূপ শ্লোক যেখানে যেখানে আছে, সেখানে সেখানে শ্লোকের অনুবাদে পূর্ণ-বিরাম চিহ্ন (।) দাঁড়ি দেওয়া হয় নাই। আর ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, অনুবাদ শেষে অনুবাদই। আমি নিজের অনুবাদে গীতার সরল, স্পষ্ট ও মুখ্য অর্থ আনিবার চেষ্টা করিয়াছি সত্য, কিন্তু সংস্কৃত শব্দ এবং বিশেষত ভগবানের প্রেমযুক্ত, রসপূর্ণ, ব্যাপক ও প্রতিক্ষণে নবরুচিপ্রদ বাক্যে লক্ষণা দ্বারা নানা ব্যঙ্গার্থ উৎপন্ন করিবার যে সামর্থ্য আছে, তাহা একটুও না কমাইয়া বাড়াইয়া অন্য শব্দে যেমনটী-তেমনটী আরোপ করা অসম্ভব; অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংস্কৃত জানেন, তিনি অনেক স্থলে লক্ষণা দ্বারা গীতার শ্লোকসমূহের যেরূপ উপযোগ করিবেন, গীতার নিছক অনুবাদ যিনি পড়িবেন, তিনি সেরূপ করিতে পারিবেন না। অধিক কি বলিব, তাঁহার হাবুডুবু খাইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব সকলের নিকট আমার সাগ্রহ মিনতি এই যে, গীতাগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেই অধ্যয়ন করুন; এবং অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গেই মূল শ্লোক রাখিবারও ইহাই প্রয়োজন। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয় জানিবার সুবিধার জন্য এই সকল বিষয়ের—অধ্যায়ক্রমে প্রত্যেক শ্লোকের—অনুক্রমণিকাও পৃথক দিয়াছি। এই অনুক্রমণিকা বেদান্তসূত্রের অধিকরণমালার অনুকরণে করিয়াছি। প্রত্যেক শ্লোক পৃথক পৃথক না পড়িয়া অনুক্রমণিকার এই ভিত্তিতে গীতার শ্লোক একত্র পড়িলে পর, গীতার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে যে ভ্রম প্রচারিত হইয়াছে তাহা কোন কোন অংশে দূর হইতে পারে। কারণ সাম্প্রদায়িক টীকাকারগণ গীতার শ্লোকসমূহের টানাবোনা করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের পুষ্টির জন্য কতক শ্লোকের যে পৃথক অর্থ করিয়াছেন, তাহা প্রায় এই সন্দর্ভের পৌর্বাপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই করা হইয়াছে। উদাহরণ যথা—গীতা ৩. ১৯; ৬. ৩; এবং ১৮. ২ দেখ। এই দৃষ্টিতে দেখিলে বলিবার কোনই বাধা নাই যে, গীতার এই অনুবাদ এবং গীতারহস্য, উভয়ে পরস্পরের পূর্ণতাসাধক। এবং যিনি আমার বক্তব্য ভালরূপে বুঝিতে চাহেন, তাঁহাকে এই দুই অংশেরই প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। ভগবদ্গীতা-গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিবার রীতি প্রচলিত আছে, তাই উহাতে গুরুতর পাঠভেদ কোথাও পাওয়া যায় না। আরও, ইহা বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান কালে প্রাপ্ত গীতাভাষ্যসমূহের মধ্যে যাহা প্রাচীনতম, সেই শাঙ্কর ভাষ্যেরই মূল পাঠকেই আমি প্রমাণ মানিয়াছি।

গীতার অধ্যায়সমূহের শ্লোকশঃ বিষয়ানুক্রমণিকা।

[নোট—এই অনুক্রমণিকাতে গীতার অধ্যায়ান্তর্গত বিষয়সমূহের, শ্লোকানুক্রমে, যে বিভাগ করা গিয়াছে, তাহা মূল সংস্কৃত শ্লোকসমূহের পূর্বে § § এই চিহ্ন দ্বারা দেখানো হইয়াছে; এবং অনুবাদে এই প্রকার শ্লোক হইতে পৃথক প্যারাগ্রাফ আরম্ভ করা হইয়াছে।]

প্রথম অধ্যায়—অর্জ্জুন-বিষাদযোগ।

১ সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন। ২-১১ দুর্যোধনের দ্রোণাচার্য্যের নিকট দুই দলের সৈন্য বর্ণনা। ১২-১৯ যুদ্ধের আরম্ভে পরস্পরের অভিনন্দনের জন্য শঙ্খধ্বনি। ২০-২৭ অর্জ্জুনের রথ সম্মুখে আসিলে সৈন্যনিরীক্ষণ। ২৮-৩৭ উভয় সেনাদলে নিজেরই বান্ধব আছেন, ইহাঁদিগকে মারিলে কুলক্ষয় হইবে—ইহা চিন্তা করিয়া অর্জ্জুনের বিষাদ আসিল। ৩৮-৪৪ কুলক্ষয় প্রভৃতি পাপের পরিণাম। ৪৫-৪৭ যুদ্ধ না করা অর্জ্জুনের অভিপ্রায় এবং ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ। পৃঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়—সাংখ্যযোগ।

১-৩ শ্রীকৃষ্ণের উত্তেজনা। ৪-১০ অর্জ্জুনের উত্তর, কর্ত্তব্যমূঢ়তা এবং কর্ত্তব্যনির্ণয়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া। ১১-১৩ আত্মার অশোচ্যত্ব। ১৪, ১৫ দেহ ও সুখ-দুঃখের অনিত্যতা। ১৬-২৫ সদসদ্বিবেক এবং আত্মার নিত্যত্বাদি স্বরূপ-কথনের দ্বারা উহার অশোচ্যত্ব সমর্থন। ২৬, ২৭ আত্মার অনিত্যত্ব পক্ষের উত্তর। ২৮ সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে ব্যক্ত ভূত সকলের অনিত্যত্ব ও অশোচ্যত্ব। ২৯, ৩০ লোকসকলের আত্মা দুর্জ্ঞেয় সত্য; কিন্তু তুমি সত্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া শোক করা ছাড়িয়া দাও। ৩১-৩৮ ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধ করিবার আবশ্যকতা। ৩৯ সাংখ্যমার্গ অনুসারে বিষয়প্রতিপাদনের সমাপ্তি, এবং কর্ম্মযোগ প্রতিপাদনের আরম্ভ। ৪০ কর্ম্মযোগের স্বল্প আচরণও শুভজনক। ৪১ ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির স্থিরতা। ৪২-৪৪ কর্ম্মকাণ্ডের অনুযায়ী মীমাংসকদিগের অস্থির বুদ্ধির বর্ণন। ৪৫, ৪৬ স্থির ও যোগস্থ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার উপদেশ। ৪৭ কর্ম্মযোগের চতুঃসূত্রী। ৪৮-৫০ কর্ম্মযোগের লক্ষণ এবং কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ত্তার বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা। ৫১-৫৩ কর্ম্মযোগের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি। ৫৪-৭০ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে, কর্ম্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ; এবং উহাতেই প্রসঙ্গানুসারে বিষয়াসক্তি হইতে কাম প্রভৃতির উৎপত্তির ক্রম। ৭১, ৭২ ব্রাহ্মীস্থিতি।...পৃঃ

তৃতীয় অধ্যায়—কর্ম্মযোগ।

১, ২ অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন—কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত, বা করিতে থাকা উচিত; কোন্‌টী ঠিক? ৩-৮ সাংখ্য (কর্ম্মসন্ন্যাস) ও কর্ম্মযোগ দুই নিষ্ঠা থাকিলেও কর্ম্ম কেহ ছাড়িতে পারে না, তাই কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া অর্জ্জুনকে ইহাই আচরণ করিবার জন্য নিশ্চিত উপদেশ। ৯-১৬ মীমাংসকদিগের যজ্ঞার্থ কর্ম্মকেও আসক্তি ছাড়িয়া করিবার উপদেশ, যজ্ঞচক্রের অনাদিত্ব এবং জগতের ধারণার্থ উহার আবশ্যকতা। ১৭-১৯ জ্ঞানী পুরুষে স্বার্থ থাকে না, তাই তিনি প্রাপ্ত কর্ম্ম নিঃস্বার্থ অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাকেন, কারণ কর্ম্ম কেহই ছাড়িতে পারে না। ২০-২৪ জনক প্রভৃতির উদাহরণ; লোকসংগ্রহের মহত্ব এবং স্বয়ং ভগবানের দৃষ্টান্ত। ২৫-২৯ জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কর্ম্মে ভেদ, এবং জ্ঞানী ব্যক্তির নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞানীকে সদাচরণের আদর্শ প্রদর্শনের প্রয়োজন। ৩০ জ্ঞানীপুরুষের ন্যায় পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিতে যুদ্ধ করিবার জন্য অর্জ্জুনকে উপদেশ। ৩১, ৩২ ভগবানের এই উপদেশ অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আচরণ করা অথবা না করার ফল। ৩৩, ৩৪ প্রকৃতির বল ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। ৩৫ নিষ্কাম কর্ম্মও স্বধর্ম্মেরই করিবে, উহাতে মৃত্যু হইলেও কোনই ভয় নাই। ৩৬-৪১ কামই মনুষ্যকে উহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপ করিবার জন্য উত্তেজিত করে; ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা উহার নাশ। ৪২, ৪৩ ইন্দ্রিয়সকলের শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম এবং আত্মজ্ঞানপূর্ব্বক উহাদের নিয়মন ।.. পৃঃ

চতুর্থ অধ্যায়—জ্ঞান-কর্ম্ম-সন্ন্যাস-যোগ।

১-৩ কর্ম্মযোগের সম্প্রদায়পরম্পরা। ৪-৮ জন্মরহিত পরমেশ্বর মায়া দ্বারা দিব্য জন্ম অর্থাৎ অবতার কখন্ এবং কি কারণে গ্রহণ করেন—তাহার বর্ণন। ৯, ১০ এই দিব্য জন্মের এবং কর্ম্মের তত্ত্ব জানিলে পুনর্জন্ম নিবৃত্ত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তি। ১১, ১২ অন্য প্রণালীতে ভজনা করিলে ঐরূপ ফল, উদাহরণার্থ এই লোকের ফল পাইবার জন্য দেবতাদের উপাসনা। ১৩-১৫ ভগবানের চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রভৃতি নির্লিপ্ত কর্ম্ম, উহার তত্ত্ব জানিলে কর্ম্মবন্ধের নাশ এবং ঐরূপ কর্ম্ম করিবার উপদেশ। ১৬-২৩ কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের ভেদ, নিঃসঙ্গ কর্ম্ম অকর্ম্মই। উহাই প্রকৃত কর্ম্ম এবং উহা দ্বারাই কর্ম্মবন্ধের নাশ হয়। ২৪-৩৩ অনেক প্রকার লাক্ষণিক যজ্ঞের বর্ণন; এবং ব্রহ্মবুদ্ধিতে কৃতযজ্ঞের অর্থাৎ জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা। ৩৪-৩৭ জ্ঞাতা দ্বারা জ্ঞানোপদেশ, জ্ঞানের দ্বারা আত্মৌপম্য দৃষ্টি ও পাপপুণ্যের নাশ। ৩৮-৪০ জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়—বুদ্ধি(-যোগ) ও শ্রদ্ধা। ইহার অভাবে নাশ। ৪১, ৪২ (কর্ম্ম-) যোগ ও জ্ঞানের পৃথক উপযোগ বলিয়া, উভয়ের আশ্রয়ে যুদ্ধ করিবার উপদেশ।

পঞ্চম অধ্যায়—সন্ন্যাসযোগ।

১, ২ এই স্পষ্ট প্রশ্ন—সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ বা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে ভগবানের এই নিশ্চিত উত্তর যে, উভয়ই মোক্ষপ্রদ, কিন্তু কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। ৩-৬ সংকল্প ছাড়িয়া দিলে কর্ম্মযোগী নিত্যসন্ন্যাসীই হয়, এবং কর্ম্ম বিনা সন্ন্যাসও সিদ্ধ হয় না। এইজন্য বস্তুত উভয়ই এক; ৭-১৩ মন সর্ব্বদাই সন্ন্যস্ত থাকে, এবং কেবল ইন্দ্রিয়গণই কর্ম্ম করে, তাই কর্ম্মযোগী সর্ব্বদা অলিপ্ত, শান্ত ও মুক্ত থাকেন। ১৪, ১৫ প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রকৃতির, কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ আত্মার অথবা পরমেশ্বরের মনে হয়। ১৬, ১৭ এই অজ্ঞানের নাশে পুনর্জন্মের নিবৃত্তি। ১৮-২৩ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে প্রাপ্ত সমদর্শিত্ব, স্থির বুদ্ধি এবং সুখদুঃখের ক্ষমতা বর্ণন। ২৪-২৮ সর্ব্বভূতের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করিতে থাকিলেও কর্ম্মযোগী এই লোকেই সর্ব্বদাই ব্রহ্মভূত, সমাধিস্থ ও মুক্ত থাকেন। ২৯ (কর্ত্তৃত্ব নিজের উপর না লইয়া) পরমেশ্বরকে যজ্ঞতপের ভোক্তা ও সর্ব্বভূতের মিত্র জানিবার ফল।

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধ্যানযোগ।

১, ২ ফলাশা ছাড়িয়া কর্ত্তব্য যে করে সে-ই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী। সন্ন্যাসীর অর্থ নিরগ্নি ও অক্রিয় নহে। ৩, ৪ কর্ম্মযোগীর সাধনাবস্থায় ও সিদ্ধাবস্থায় শম এবং কর্ম্মের কার্য্যকারণের পরিবর্ত্তনের এবং যোগারূঢ়ের লক্ষণ। ৫, ৬ যোগ সিদ্ধ করিবার জন্য আত্মার স্বাতন্ত্র্য। ৭-৯ জিতাত্মা যোগযুক্তের মধ্যেও সমবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা। ১০-১৭ যোগসাধনের জন্য আবশ্যক আসন ও আহার-বিহারের বর্ণন। ১৮-২৩ যোগীর ও যোগসমাধির আত্যন্তিক সুখের বর্ণন। ২৪-২৬ মনকে ধীরে ধীরে সমাধিস্থ শান্ত ও আত্মনিষ্ঠ কিরূপে করিতে হইবে? ২৭, ২৮ যোগীই ব্রহ্মভূত ও অত্যন্ত সুখী। ২৯-৩২ প্রাণীমাত্রে যোগীর আত্মৌপম্যবুদ্ধি। ৩৩-৩৬ অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চঞ্চল মনের নিগ্রহ। ৩৭-৪৫ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে যোগভ্রষ্ট অথবা জিজ্ঞাসুরও জন্মজন্মান্তরে উত্তম ফল মিলিলে শেষে পূর্ণসিদ্ধি কিরূপে লাভ হয় সেই বিষয়ের বর্ণন। ৪৬, ৪৭ তপস্বী, জ্ঞানী ও নিছক্ কর্ম্মী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী—এবং উঁহাদেরও মধ্যে ভক্তিমান কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব অর্জ্জুনকে (কর্ম্ম-) যোগী হইবার বিষয়ে উপদেশ।

সপ্তম অধ্যায়—জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ।

১-৩ কর্ম্মযোগের সিদ্ধির জন্য জ্ঞানবিজ্ঞান নিরূপণ আরম্ভ। সিদ্ধির জন্য প্রযত্নকারীদিগের স্বল্পপ্রাপ্তি। ৪-৭ ক্ষরাক্ষর বিচার। ভগবানের অষ্টধা অপরা ও জীবরূপী পরা প্রকৃতি; ইহার পরে সমস্ত বিস্তার। ৮-১২ বিস্তারের সাত্ত্বিক আদি সমস্ত অংশে গ্রথিত পরমেশ্বর-স্বরূপের দিগ্দর্শন। ১৩-১৫ পরমেশ্বরের ইহাই গুণময়ী ও দুস্তর মায়া, এবং উঁহারই শরণাগত হইলে মায়া হইতে উদ্ধার হয়। ১৬-১৯ ভক্ত চতুর্ব্বিধ; তন্মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। অনেক জন্মে জ্ঞানের পূর্ণতা ও ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ নিত্য ফল। ২০-২৩ অনিত্য কাম্য ফলের জন্য দেবতা-দিগের উপাসনা; কিন্তু ইহাতেও উঁহার শ্রদ্ধার ফল ভগবানই দেন। ২৪-২৮ ভগবানের সত্য স্বরূপ অব্যক্ত; কিন্তু মায়ার কারণে ও দ্বন্দ্বমোহের কারণে উহা দুর্জ্ঞেয়। মায়ামোহের নাশে স্বরূপের জ্ঞান। ২৯, ৩০ ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম এবং অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ সমস্ত এক পরমেশ্বরই—ইহা জানিলে শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞানসিদ্ধি হয়।

অষ্টম অধ্যায়—অক্ষরব্রহ্মযোগ।

১-৪ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ ও অধিদেহ, ইহাদের ব্যাখ্যা। ঐ সকলে একই ঈশ্বর আছেন। ৫-৮ অন্তকালে ভগবৎ-স্মরণে মুক্তি। কিন্তু যাহা মনে নিত্য থাকে, তাহাই অন্তকালেও থাকে; অতএব সর্ব্বদাই ভগবানকে স্মরণ করিবার এবং যুদ্ধ করিবার জন্য উপদেশ। ৯-১৩ অন্ত-কালে পরমেশ্বরের অর্থাৎ ওঙ্কারের সমাধিপূর্ব্বক জ্ঞান ও তাহার ফল। ১৪-১৬ ভগবানের নিত্য চিন্তনে পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি। ব্রহ্মলোকাদি গতি নিত্য নহে। ১৭-১৯ ব্রহ্মার দিনরাত, দিনের আরম্ভে অব্যক্ত হইতে সৃষ্টির উৎপত্তি এবং রাত্রির আরম্ভে উহাতেই লয়। ২০-২২ এই অব্য-ক্তেরও অতীত অব্যক্ত ও অক্ষর পুরুষ। ভক্তি দ্বারা তাঁহার জ্ঞান এবং উঁহার প্রাপ্তিতে পুনর্জন্মনিবৃত্তি। ২৩-২৬ দেবযান ও পিতৃযানমার্গ; প্রথম পুনর্জন্মনাশক এবং দ্বিতীয় তাহার বিপরীত। ২৭, ২৮ এই দুই মার্গের তত্ত্ব যে যোগী জানেন, তাঁহার অত্যুত্তম ফল লাভ হয়; অতএব তদনুসারে সর্ব্বদা ব্যবহার করিবার উপদেশ।

নবম অধ্যায়—রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ।

১-৩ জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত ভক্তিমার্গ মোক্ষপ্রদ হইলেও প্রত্যক্ষ ও সুলভ; অতএব রাজমার্গ। ৪-৬ পরমেশ্বরের অপার যোগসামর্থ্য। প্রাণীমাত্রে থাকিয়াও তাঁহাতে থাকেন না; এবং প্রাণীমাত্রও তাঁহাতে থাকিয়াও থাকে না। ৭-১০ মায়াত্মক প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্টির উৎপত্তি ও সংহার, ভূতসকলের উৎপত্তি ও লয়। এত করিলেও তিনি নিষ্কাম, অতএব অলিপ্ত। ১১, ১২ ইহা না বুঝিলে মোহে পড়িয়া মনুষ্যদেহধারী পরমেশ্বরের অবজ্ঞাকারী মূর্খ ও আসুরী। ১৩-১৫ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অনেক প্রকারের উপাসক দৈবী। ১৬-১৯ ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, তিনিই জগতের পিতামাতা, স্বামী, পোষক এবং ভাল-মন্দের কর্ত্তা। ২০-২২ শ্রৌত যাগযজ্ঞ প্রভৃতির দীর্ঘ উদ্যোগ স্বর্গপ্রদ হইলেও সেই ফল অনিত্য। যোগক্ষেমের জন্য ইহা আবশ্যক মনে করিলেও উহা ভক্তি দ্বারাও সাধ্য। ২৩-২৫ অন্যান্য দেবতাদিগের প্রতি ভক্তি পর্য্যায়ক্রমে পরমেশ্বরেরই প্রতি ভক্তি, কিন্তু যে প্রকার ভাবনা হইবে এবং যে প্রকার দেবতা হইবে, ফলও সেই প্রকারই প্রাপ্ত হইবে। ২৬ ভক্তি থাকিলে পরমেশ্বর ফুলের পাঁপড়িতেও সন্তুষ্ট হন। ২৭, ২৮ সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবার উপদেশ। ইহা দ্বারাই কর্ম্মবন্ধন-মোচন ও মোক্ষ। ২৯-৩৩ পরমেশ্বর সকলেরই একই। দুরাচারী হউক বা পাপযোনি হউক, স্ত্রী হউক বা বৈশ্য বা শূদ্র হউক, নিঃসীম ভক্ত হইলে সকলেরই একই গতি লাভ। ৩৪ এই মার্গই স্বীকার করিবার জন্য অর্জ্জুনকে উপদেশ।

দশম অধ্যায়—বিভূতিযোগ।

১-৩ জন্মরহিত পরমেশ্বর দেবগণের এবং ঋষিগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা জানিলে পাপনাশ হয়। ৪-৬ ঐশ্বরিক বিভূতি ও যোগ। ঈশ্বর হইতেই বুদ্ধি প্রভৃতি ভাব-সমূহের, সপ্তর্ষিদিগের, এবং মনুর এবং পরম্পরাক্রমে সকলের উৎপত্তি। ৭-১১ যে ভগবদ্ভক্ত ইহা জানেন, তাঁহার জ্ঞানপ্রাপ্তি; কিন্তু তাঁহারও বুদ্ধি-সিদ্ধি ভগবানই দেন। ১২-১৮ নিজের বিভূতি এবং যোগ বুঝাইবার জন্য ভগবানের নিকট অর্জ্জুনের প্রার্থনা। ১৯-৪০ ভগ-বানের অনন্ত বিভূতির মধ্য হইতে মুখ্য-মুখ্য বিভূতির বর্ণন। ৪১, ৪২ যে কিছু বিভূতিশালী, শ্রীমান এবং ভাস্বর আছে, সে সমস্ত পরমেশ্বরেরই তেজ; কিন্তু আংশিক।

একাদশ অধ্যায়—বিশ্বরূপদর্শনযোগ।

১-৪ পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত স্বকীয় ঐশ্বরিক রূপ দেখা-ইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা। ৫-৮ এই আশ্চর্য্যকারক ও দিব্যরূপ দেখিবার জন্য অর্জ্জুনের দিব্যদৃষ্টি-জ্ঞান। ৯-১৪ বিশ্বরূপের সঞ্জয়কৃত বর্ণন। ১৫-৩১ বিস্ময় ও ভয়ে নম্র হইয়া অর্জ্জুনকৃত বিশ্বরূপ-

স্তুতি, এবং প্রসন্ন হইয়া 'আপনি কে' বুঝাইবার জন্য প্রার্থনা। ৩২-৩৪ প্রথমে 'আমি কাল' ইহা বলিয়া পরে পূর্ব্ব হইতেই এই কালের দ্বারা গ্রস্ত বীরগণকে তুমি নিমিত্ত হইয়া নিহত কর অর্জ্জুনকে এই উৎসাহজনক উপদেশপ্রদান। ৩৫-৪৬ অর্জ্জুনকৃত স্তব, ক্ষমা-প্রার্থনা এবং পূর্ব্বের সৌম্য রূপ দেখাইবার জন্য মিনতি। ৪৭-৫১ :অনন্য ভক্তি ব্যতীত বিশ্বরূপের দর্শনলাভ দুর্লভ। পুনরায় পূর্ব্বস্বরূপধারণ। ৫২-৫৪ ভক্তি বিনা বিশ্বরূপদর্শন দেবতাদেরও সম্ভব নহে। ৫৫ অতএব ভক্তি পূর্ব্বক নিঃসঙ্গ ও নির্ব্বৈর হইয়া পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধি দ্বারা কর্ম্ম করিবার বিষয়ে অর্জ্জুনকে সর্ব্বার্থসারভূত চরম উপদেশ।

দ্বাদশ অধ্যায়—ভক্তিযোগ।

১ পূর্ব্ব অধ্যায়ের চরম সারভূত উপদেশের উপর অর্জ্জুনের প্রশ্ন—ব্যক্তোপাসনা শ্রেষ্ঠ বা অব্যক্তোপাসনা? ২-৮ উভয়েতেই একই গতি; কিন্তু অব্যক্তোপাসনা ক্লেশকারক, এবং ব্যক্তোপাসনা সুলভ ও শীঘ্রফলপ্রদ। অতএব নিষ্কাম কর্ম্মপূর্ব্বক ব্যক্তোপাসনা করিবার বিষয়ে উপদেশ। ৯-১২ ভগবানে চিত্তকে স্থির করিবার অভ্যাস, জ্ঞান-ধ্যান প্রভৃতি উপায়, এবং ইহাদের মধ্যে কর্ম্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠতা। ১৩-১৯ ভক্তিমান পুরুষের অবস্থা বর্ণন এবং ভগবৎ-প্রিয়তা। ২০ এই ধর্ম্মের আচরণকারী শ্রদ্ধাবান ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ।

১, ২ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাখ্যা। ইহার জ্ঞানই পরমেশ্বরের জ্ঞান। ৩, ৪ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচার উপনিষদের ও ব্রহ্মসূত্রের। ৫, ৬ ক্ষেত্র-স্বরূপলক্ষণ। ৭-১১ জ্ঞানের স্বরূপলক্ষণ। তদ্বিরুদ্ধ অজ্ঞান। ১২-১৭ জ্ঞেয়ের স্বরূপ-লক্ষণ। ১৮ এই সমস্ত জানিবার ফল। ১৯-২১ প্রকৃতি-পুরুষবিবেক। করিবার—ধরিবার প্রকৃতি, পুরুষ অকর্ত্তা কিন্তু ভোক্তা দ্রষ্টা ইত্যাদি। ২২, ২৩ পুরুষই দেহেতে পরমাত্মা। এই প্রকৃতিপুরুষজ্ঞান হইতে পুনর্জন্ম-নিবৃত্তি হয়। ২৪, ২৫ আত্মজ্ঞানের মার্গ—ধ্যান, সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণের দ্বারা ভক্তি। ২৬-২৮ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে স্থাবরজঙ্গমের সৃষ্টি; ইহার মধ্যে যে অবিনশ্বর আছেন তিনিই পরমেশ্বর। নিজের চেষ্টা দ্বারা তাঁহাকে লাভ। ২৯, ৩০ করিবার, ধরিবার প্রকৃতি এবং আত্মা অকর্ত্তা; সমস্ত প্রাণীই একেতে আছে এবং এক হইতে সমস্ত প্রাণীই উৎপন্ন হয়। ইহা জানিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি। ৩১-৩৩ আত্মা অনাদি ও নির্গুণ, অতএব উহা ক্ষেত্রের প্রকাশক হইলেও নির্লেপ। ৩৪ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ জানিলে পরম সিদ্ধি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—গুণত্রয়-বিভাগযোগ।

১, ২ জ্ঞানবিজ্ঞানান্তর্গত প্রাণী-বৈচিত্র্যের গুণভেদে বিচার। ইহাও মোক্ষপ্রদ। ৩, ৪ প্রাণীমাত্রের পিতা পরমেশ্বর এবং তাঁহার অধীনে প্রকৃতি মাতা। ৫-৯ প্রাণীমাত্রে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ আসিলে তাহার পরিণাম। ১০-১৩ এক এক গুণ পৃথক থাকিতে পারে না। কোন দুইটী চাপিয়া তৃতীয়ের বৃদ্ধি; এবং প্রত্যেকের বৃদ্ধির লক্ষণ। ১৪-১৮ গুণ-প্রবৃদ্ধি অনুসারে কর্ম্মের ফল, এবং মৃত্যুর পর প্রাপ্ত গতি। ১৯, ২০ ত্রিগুণাতীত হইলে মোক্ষপ্রাপ্তি। ২১-২৫ অর্জ্জুনের প্রশ্নের পর ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ ও আচার বর্ণন। ২৬, ২৭ একান্তভক্তি দ্বারা ত্রিগুণাতীত অবস্থার সিদ্ধি, এবং পরে সমস্ত মোক্ষের, ধর্ম্মের, এবং সুখের চরম স্থান পরমেশ্বর-প্রাপ্তি।

পঞ্চদশ অধ্যায়—পুরুষোত্তমযোগ।

১, ২ অশ্বত্থরূপী ব্রহ্মবৃক্ষের বেদোক্ত ও সাংখ্যোক্ত বর্ণনার মিল। ৩-৬ অসঙ্গের দ্বারা ইহাকে কাটিয়া ফেলাই ইহার অতীত অব্যয় পদ-প্রাপ্তির মার্গ। অব্যয় পদ-বর্ণনা। ৭-১১ জীব ও লিঙ্গশরীরের স্বরূপ ও সম্বন্ধ। জ্ঞানীর নিকট প্রত্যক্ষ। ১২-১৫ পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপকতা। ১৬-১৮ ক্ষরাক্ষর-লক্ষণ। ইহার অতীত পুরুষোত্তম। ১৯, ২০ এই গুহ্য পুরুষোত্তমজ্ঞান হইতে সর্ব্বজ্ঞতা ও কৃতকৃত্যতা।

ষোড়শ অধ্যায়—দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগ।

১-৩ দৈবী সম্পত্তির ছাব্বিশ গুণ। ৪ আসুরী সম্পত্তির লক্ষণ। ৫ দৈবী সম্পত্তি মোক্ষপ্রদ এবং আসুরী বন্ধনকারণ। ৬-২০ আসুরী লোকদিগের বিস্তৃত বর্ণন। উহাদিগের জন্ম-জন্ম অধোগতি লাভ। ২১, ২২ নরকের ত্রিবিধ দ্বার—কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই সকল হইতে দূরে থাকিলে মঙ্গল। ২৩, ২৪ শাস্ত্রানুসারে কার্য্য-অকার্য্যের নির্ণয় ও আচরণ করিবার বিষয়ে উপদেশ।

সপ্তদশ অধ্যায়—শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ।

১-৪ অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলে প্রকৃতি-স্বভাব অনুসারে সাত্ত্বিক প্রভৃতি ত্রিবিধ শ্রদ্ধার বর্ণন। যেমন শ্রদ্ধা তেমনি পুরুষ। ৫, ৬ ইহা হইতে ভিন্ন আসুর। ৭-১০ সাত্ত্বিক রাজস ও তামস আহার। ১১-১৩ ত্রিবিধ যজ্ঞ। ১৪-১৬ তপস্যার তিন ভেদ—শারীর, বাচিক ও মানস। ১৭-১৯ ইহারা প্রত্যেকে সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভেদে ত্রিবিধ। ২০-২২ সাত্ত্বিক প্রভৃতি ত্রিবিধ দান। ২৩ ওঁতৎসৎ ব্রহ্মনির্দ্দেশ।

২৪-২৭ তন্মধ্যে ওঙ্কারে আরম্ভসূচক, 'তৎ' পদে নিষ্কাম এবং 'সৎ' পদে প্রশস্ত কর্ম্মের সমাবেশ হয়। ২৮ শেষ অর্থাৎ অসৎ ইহলোকে ও পরলোকে নিষ্ফল।

অষ্টাদশ অধ্যায়—মোক্ষসন্ন্যাসযোগ।

১, ২ অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলে সন্ন্যাস ও ত্যাগের কর্ম্ম-যোগমার্গের অনুগত ব্যাখ্যা। ৩-৬ কর্ম্মের ত্যাজ্য অত্যাজ্য-নির্ণয়; যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মও অন্যান্য কর্ম্মের ন্যায় নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে করাই কর্ত্তব্য। ৭-৯ কর্ম্মত্যাগের তিন ভেদ—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস; ফলাশা ছাড়িয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই সাত্ত্বিক ত্যাগ। ১০, ১১ কর্ম্মফল-ত্যাগীই সাত্ত্বিক ত্যাগী, কারণ কেহই কর্ম্ম ছাড়িয়া থাকিতেই পারে না। ১২ কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল সাত্ত্বিক-ত্যাগী পুরুষের বন্ধন কারণ হয় না। ১৩-১৫ কোনও কর্ম্ম হইবার পাঁচ কারণ, কেবল মনুষ্যই কারণ নহে। ১৬, ১৭ অতএব আমি করিতেছি, এই অহঙ্কারবুদ্ধি দূর হইলে কর্ম্ম করিলেও অলিপ্ত থাকে। ১৮, ১৯ কর্ম্ম-প্রেরণা ও কর্ম্মসংগ্রহের সাংখ্যোক্ত লক্ষণ, এবং উঁহার তিন ভেদ। ২০-২২ সাত্ত্বিক আদি গুণভেদে জ্ঞানের তিন ভেদ। 'অবিভক্তং বিভক্তেষু' ইহা সাত্ত্বিক জ্ঞান। ২৩-২৫ কর্ম্মের ত্রিবিধতা। ফলাশারহিত কর্ম্ম সাত্ত্বিক। ২৬-২৮ কর্ত্তার তিন ভেদ। নিঃসঙ্গ কর্ত্তা সাত্ত্বিক। ২৯-৩২ বুদ্ধির তিন ভেদ। ৩৩-৩৫ ধৃতির তিন ভেদ। ৩৬-৩৯ সুখের তিন ভেদ। আত্ম-বুদ্ধি-প্রসাদ হইতে উৎপন্ন সুখ সাত্ত্বিক। ৪০ গুণভেদে সমস্ত জগতের তিন ভেদ। ৪১-৪৪ গুণভেদে চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের স্বভাবোৎপন্ন কর্ম্ম। ৪৫, ৪৬ চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিহিত স্বধর্ম্মাচরণেই চরম সিদ্ধি। ৪৭-৪৯ পরধর্ম্ম ভয়াবহ, স্বধর্ম্ম সদোষ হইলেও অত্যাজ্য; সমস্ত কর্ম্ম স্বধর্ম্ম অনুসারে নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে করিলেই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। ৫০-৫৬ সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকিলেও সিদ্ধি কিরূপে লাভ হয় তাহার নিরূপণ। ৫৭, ৫৮ এই মার্গ স্বীকার করিবার বিষয়ে অর্জ্জুনকে উপদেশ। ৫৯-৬৩ প্রকৃতিধর্ম্মের সম্মুখে অহঙ্কারের জোর চলে না। ঈশ্বরেরই শরণাগত হইতে হইবে। এই গুহ্য বিষয় বুঝিয়া পরে যাহা ইচ্ছা তাহা কর, অর্জ্জুনের প্রতি এই উপদেশ। ৬৪-৬৬ সকল ধর্ম্ম ছাড়িয়া "আমার আশ্রয় লও," সমস্ত পাপ হইতে "আমি তোমাকে মুক্ত করিব" ভগবানের এই চরম আশ্বাস দান। ৬৭-৬৯ কর্ম্মযোগমার্গের পরম্পরা পরে প্রচলিত রাখিবার শ্রেয়। ৭০, ৭১ উহার ফলমাহাত্ম্য। ৭২, ৭৩ কর্ত্তব্য-মোহ নষ্ট হইয়া, অর্জ্জুনের যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হওয়া। ৭৪-৭৮ ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা শুনাইবার পর সঞ্জয়কৃত উপসংহার।

গ্রন্থ পরিচয়।

স্বরমূর্চ্ছনা—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা রচিত। কলিকাতা ৪নং ড্যালহৌসি স্কোয়ারে শরৎ ঘোষ এণ্ড কোম্পানির নিকট প্রাপ্তব্য। ইহাতে ৩৩টী গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকটী এবং পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুইটী গানের স্বরলিপি সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থটীকে সাধারণের আদরের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন। কয়েকটী নির্ব্বাচিত গান একটু দীর্ঘ বলিয়া মনে হইল। এবং কয়েকটী গান বালক বালি-কার সম্মুখে ধরিবার সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া বোধ হইল না। গ্রন্থের শেষে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী লিখিত স্বরলিপির উপকারিতা সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ সন্নি-বেশিত করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী খুবই ভাল কাজ করিয়াছেন। স্বরলিপি সম্বন্ধে আমাদের দুএকটী বক্তব্য আছে। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণের সময় গ্রন্থকর্ত্রী সেগুলি একটু আলোচনা করিয়া দেখিবেন। কয়েকটী গানের স্বরলিপিতে গানের ছন্দে ও স্বরলিপির তালে বড়ই বৈষম্য দেখা গেল। গ্রন্থকর্ত্রী ত্রিমাত্রিক ছন্দের গানকেও ৪ মাত্রা করিয়া ভাগ করিয়া ১৬ মাত্রা করিয়া কাওয়ালি তাল বসাইয়াছেন—গাহিবার সময়ে তাহাতে বড়ই অসুবিধা হয়, এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও চলে। দু একটী গানের সুরের, আমাদের মনে হয়, আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকায় অথবা কোন পুস্তকে সঙ্গীতাচার্য্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃত, স্বরলিপি দেখিয়াছি। সেই স্বরলিপিগুলির উল্লেখ করিয়া স্বীকার করিলে ভাল হয়। জানি না গ্রন্থকর্ত্রী সেগুলি দেখিয়াছেন কি না। তাঁহার জানিবার ইচ্ছা থাকিলে আমরা তাঁহাকে জানাইতে পারি। আরও কতকগুলি ভুল দেখিলাম, সেগুলি খুব সম্ভবত তাড়াতাড়ি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ঘটিয়াছে। এরূপ গ্রন্থ প্রকাশ গ্রন্থকর্ত্রীর প্রথম প্রয়াস, সুতরাং গ্রন্থে ভ্রম থাকা কিছু আশ্চর্য্য নহে। তবে আশা করি তিনি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ নির্ভুল করিয়া ইহাকে সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই আদরণীয় করিয়া তুলিবেন।

"দুটি ভাই"—শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র বর্ষীয়ান শিতিকণ্ঠ বাবুর বয়স এক্ষণে প্রায় ৭৫ বৎ-সর। এ বয়সেও তাঁহার উৎসাহ ম্লান হয় নাই। তিনি উদ্যমের সহিত আজও ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার রচিত উল্লিখিত পুস্তক খানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সাধনা প্রভাবে কেমন করিয়া একটি ভাই আদর্শ-চরিত্র হইতে পারিয়া-ছিলেন এবং অন্যটি কুসংসর্গে পড়িয়া কেমন করিয়া নিজের বিনাশের পথ প্রমুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাই উক্ত পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে; শ্রেয় ও প্রেয় লইয়াই তাঁহার পুস্তকের উপসংহার। তাঁহার চেষ্টা যে সফল হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

৺সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।*

আজ দশদিন পূর্ব্বে আমাদের এই গৃহের নিম্নতলস্থ দক্ষিণদিকের সুপরিচিত ঘরে যে জীবনপ্রদীপটি সহসা নিভিয়া গিয়াছে, তাহার আলোক স্নিগ্ধতায়, মধুরতায়, পুণ্যপ্রভায় অতুলনীয় ছিল। গৃহকোণের এই একটি হেমপ্রদীপের আলোক নির্ব্বাপিত হওয়ায় আজ আমরা আমাদের সারাগৃহ অন্ধকারময় দেখিতেছি। আমাদের সোমকাকা—ছোট বড় সকলের সমান আদরের প্রিয় সোমকাকা, যিনি আজ বাঁচিয়া থাকিলে এই গৃহের সারা-বরময় ঘুরিয়া বেড়াইয়া সকলেরই তত্ত্ব লইয়া কিছি-

* গত ২৩ মাঘ আজসভায় শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত।

তেন, তিনি না জানি কোন্ সুখের ঘরের সন্ধান পাইয়া সহসা আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—কোন কথাই বলিয়া গেলেন না! আজ সোমকাকার অভাবে সত্যসত্যই আমরা সকলে মর্ম্মাহত হইয়াছি।

সোমেন্দ্রনাথ—তাঁহার এই নাম যথার্থ সার্থক হইয়াছে; অন্তর বাহিরে তিনি চন্দ্রেরই মত স্নিগ্ধহ্যতিমান ছিলেন। এমন সাদা, সরল, উদার, পরদুঃখকাতর উচ্চপ্রাণ জগতে কদাচিৎ দেখা যায়। যিনি আমাদের সোমকাকার সংস্পর্শে একবার আসিয়াছেন, তিনিই এই কথার সাক্ষ্য দিবেন। সাধারণে এমন লোকটিকে চিনিবার অবসর পান নাই, কিন্তু যে 'বিশ্বতশ্চক্ষু' মানব-অন্তরের নিভৃততম প্রদেশের সকল বার্ত্তারই সন্ধান রাখেন, তিনি জানেন তাঁহার এ সন্তান কি মহাপ্রাণ, কি অসামান্য সদ্‌গুণসৌন্দর্য্যে বিভূষিত ছিলেন; এবং তিনিই যে আমাদের প্রিয় সোমকাকাকে সংসারের সকল দুঃখজ্বালার হাত হইতে নিষ্কৃতি দান করিয়া, তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া প্রিয় সন্তানের পারলৌকিক পূর্ণ সদ্‌গতিবিধান করিয়াছেন এ বিষয়ে আমাদের মনে আজ সন্দেহমাত্রও নাই, এবং এই জ্ঞান ও বিশ্বাসেই আজ আমরা আমাদের এই দুর্ব্বিষহ শোকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতেছি; কিন্তু তবুও সোমকাকার জন্য আমাদের প্রাণ এখনও থাকিয়া থাকিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে।

সোমকাকা আজীবন বায়ুরোগে কষ্ট পাইয়াছেন। জীবদ্দশায় যখনই তাঁহার এই রোগ প্রবল আকার ধারণ করিত, তখনই তাঁহার অন্তরের প্রকৃত নিগূঢ় ভাবসকল পরিস্ফুট হইয়া উঠিত; তখন তিনি লোকনির্ব্বিচারে সকলকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেন, সকলের করমর্দ্দন করিতেন, কুকুরকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেন, সকলের উচ্ছিষ্ট আহারের জন্য লালায়িত হইতেন, এমন কি, মেথরকে পর্য্যন্ত ঘরে আনিয়া তাঁহার পালঙ্কে বসাইতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। সাংসারিক লোকের চক্ষে ইহা উন্মাদের পূর্ণলক্ষণ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যিনি মানবপ্রাণের মানবচরিত্রের ভিতরকার কথা, নিগূঢ় রহস্যতত্ত্বের সমাচার রাখেন, তিনিই জানেন, ইহা কি মহৎপ্রাণের সমবেদনার ব্যাকুল অভিব্যক্তি। সোমকাকা বাস্তবিকই বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন; বিশ্বপ্রেম, সমদর্শনই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। আজ একাদিক্রমে প্রায় চল্লিশ বৎসর আমি সোমকাকার সহিত একঘরে একসঙ্গে কাটাইয়াছি, তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিবার জানিবার আমার যেমন সুযোগ ঘটিয়াছে এমন আর কাহারও ঘটে নাই। এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতিদিন আমি দেখিতাম প্রাতরাশের সময় কাকামহাশয় তাঁহার পানীয় দুগ্ধের কিয়দংশ কুকুর বা বিড়ালের আহারের জন্য রাখিয়া দিতেন, রুটির টুক্‌রা ছোলা পাখিদের আহারের জন্য বাগানে নিক্ষেপ করিতেন, একদিনও ইহার ব্যতিক্রম দেখি নাই। 'ক্রিকি' নামক কুকুরটিকে দেখিলেই বুঝা যায় সে-ও আজ কত না শোকাকুল! জীবজন্তুর প্রতি যাঁহার প্রাণের এত মমতা, মানুষকে যিনি এতটা ভালবাসিতে পারেন, তিনি যদি পাগল হন, এমন পাগল হওয়া বাঞ্ছনীয়, এমন পাগল জগতে ধন্য চিরধন্য।

সোমকাকা তাঁহার জীবনের প্রথম অবস্থায় আমাদের দেশের বালক-যুবকদিগের শারীরিক ও মানসিক বলসাধন এবং নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য নানাবিধ ব্যায়াম-ক্রীড়া ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া নারিকেলডাঙ্গায় এক শিক্ষালয় স্থাপন করেন। আমরাও বালককালে এই শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম প্রতি সপ্তাহে সোমকাকা আমাদের শিক্ষা ও আমোদের জন্য আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাদুঘর, আলিপুরের চিড়িয়াখানা, বোটানিকাল গার্ডেন প্রভৃতি নানস্থানে ঘুরাইয়া আনিতেন। সোমকাকা রোগাক্রান্ত হওয়ায় এই শিক্ষালয়টি উঠিয়া যায়। বঙ্গদেশের জাতীয় জীবনবিকাশের ইতিহাসে এই বিষয়ে সোমকাকারই নাম সর্ব্বোচ্চস্থান পাইবার যোগ্য—এই বিষয়ে তিনিই প্রকৃত নেতৃস্থানীয় ছিলেন। দর্শনশাস্ত্রের প্রতি সোমকাকার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল; তিনি যদি ভাল থাকিতেন, এদেশের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন। সোমকাকা অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন; তিনি প্রায়ই বলিতেন, মা আমাদের ছেলেবেলায় এটা রান্না ক'রে খাওয়াতেন, আমাদের অসুখ হ'লে মা এই টোট্‌কা ঔষধ দিতেন,—বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দু'টি জলে ভরিয়া উঠিত। তিনি আমাকে প্রায়ই বলিতেন, আমার যদি শরীর ভাল থাকৃত, হাতে তেমন টাকা থাক্‌ত, দেখ্‌তিস্ আমি কত না কাজ করতুম। কাকা মহাশয় কত কথাই না বলিতেন, কত আশাই না তাঁহার প্রাণের মধ্যে অপূর্ণ ছিল! কিন্তু জগতে সদিচ্ছা সাধুভাবের যদি কোন মূল্য পুরস্কার থাকে, ঊর্দ্ধে বিশ্বরাজদরবারে সোমকাকার জয়মাল্য পুরস্কার সুনিশ্চিত। প্রান্তরের প্রস্ফুটিত সুন্দর সুগন্ধি কুসুমের নিজ পরিপূর্ণতার মধ্যে যেমন তাহার সকল সার্থকতা, তেমনি শুদ্ধসত্ত্বভাবের পরিপূর্ণতায় সোমকাকার জীবন ধন্য সার্থক হইয়াছে। আমরা না বুঝিয়া সোমকাকার চরণে কত সময়ে কত না অপরাধই করিয়াছি—আজ তাঁহার এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে অনুতপ্তচিত্তে করযোড়ে তাঁহার নিকট আমরা আমাদের সকল অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তিনি প্রসন্নচিত্তে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া লোকান্তর হইতে তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ আমাদের প্রতি বর্ষণ করুন।

হে পরমেশ্বর, আজ এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে তুমি দয়া করিয়া এই সারসত্যটি আমাদের মনে বদ্ধমূল গ্রথিত করিয়া দাও যে, এ জগতে আমরা কখনও কাহাকেও হারাই না, সকলেই তোমাতেই স্থান পায়। যে আমাদের প্রিয়জন সে তোমার নিকট আরও প্রিয়। যখন কেবল আমরা তোমাকে হারাই, তখনই আমরা সকলকে হারাই, সকলই হারাই। তুমি আজ আমাদের এই দুঃখের দিনে আমাদিগকে এই সত্যটি সত্যরূপে জানাইয়া আমাদের সকল দুঃখ হরণ করিয়া লও। আমাদের সোমকাকাকে তুমি ভাল রাখ, সুখে রাখ, তাঁহার সকল আশা পূর্ণ কর, তাঁহার সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধন কর,—আমাদের এই গৃহ, পরিবার, দেশ, সকলের প্রতি তুমি কৃপা কর,—তোমার চরণে আজ আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা। তুমিই সত্য, তুমিই সত্য, প্রভু তুমিই জগতে একমাত্র সত্য।
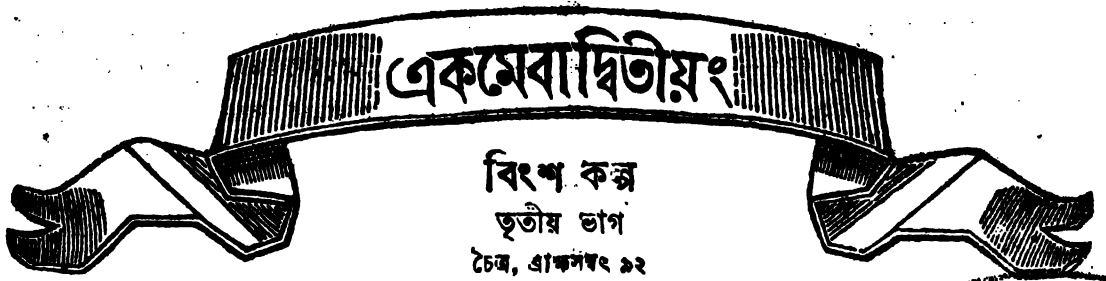
"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস।

(ডাঃ সার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকার কর্তৃক ব্যাখ্যান
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত)

তুজ্মী কাঁটাড়লা তরী। আহ্মা ন সোডনে হরি ॥১॥
জাবেঁ কবণিয়া ঠায়া। সাঁগা বিনবি তোঁ পায়াঁ ॥২॥
কেলী জীবা সাটী। আতাঁ সুখে লাগা পাঠীঁ ॥৩॥
তুকা ম্হণে ঠাব। ন তে সোডণেঁ হাচি ভাব ॥৪॥

তুকারাম ধর্ম্মমার্গের সাধনায় স্বীয় অন্তরে যাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং সেই সকল উপলব্ধি-সংক্রান্ত বহুবিধ প্রসঙ্গে যে সকল উচ্ছ্বাস-বাক্য তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ইহা একটি। এবং তিনি তাহাতে আগ্রহের সহিত ঈশ্বরকে বলিয়াছেন 'হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে বারংবার কষ্ট দিই, তুমি হয় ত বিরক্ত হইয়া থাকিবে, তবু কোন চিন্তা নাই। তোমাকে আমি ছাড়িব না। তোমার চরণে মস্তক রাখিয়া বিনতি করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমাকে ছাড়িয়া আমি কাহার কাছে যাইব? তুমিই বল। যাই হোক্ না, আমার পিঠে সুখে আঘাত কর, তোমার কাছ থেকে আমি কিছুতেই যাব না; ইহাই আমার দৃঢ় নিশ্চয়।" এই উচ্ছ্বাসবাক্যগুলি চমৎকার। কারণ, মনুষ্য মনুষ্যের বিরক্তিকর হয়। কোনও উচ্চপদস্থ কিংবা কোন অধিকার-সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট, তোমার আমার মত সাধারণ মনুষ্য পুনঃ পুনঃ গিয়া ভিড় করিতেছে দেখিলে, সেই পদস্থ ব্যক্তি আপন নারাজি দেখাইবার জন্য মুখের উপর সংবাদ পত্র লইয়া পাঠ করিবার ভাণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে এরূপ হওয়া কি সম্ভব? এইরূপ বিরক্তি ঈশ্বরের কি কখন হইতে পারে? ঈশ্বরের উদ্দেশে এইরূপ বলিবার কি কোন অর্থ আছে? আচ্ছা। আমরা এত বৎসর সাধু-সমাগমে ও ঈশ্বরের চিন্তন পূজন ও ভজনে অতিবাহিত করিয়াছি, তথাপি অনেক সময় ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার পাই না, তাঁহার দর্শনে আনন্দ পাই না। এইরূপ অবস্থা হইলে, ঈশ্বর আমাদের উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহা হইতে আমাদিগকে দূরে রাখিতেছেন, এই কথা কি বলিতে পারা যায় না? ঈশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন আছেন, এই বিশ্বাস আমরা কখন্ পোষণ করিতে পারি? না, যখন আপন অন্তঃকরণকে শুষ্ক না রাখিয়া, তাহা ভক্তি ও প্রেমরসে সিক্ত করিতে পারিব এবং সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে উহাতে জীবন্তভাব আনিতে পারিব অর্থাৎ প্রেম-রসে সিক্ত থাকিয়া চিত্ত শাশ্বত শান্তি ও সন্তোষ প্রাপ্ত হইবে। কোন মনুষ্য, ঐশ্বর্য্যশালী অথবা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট কোন মৎলবে যাওয়া-আসা করিতে থাকিলে, এই আপদ কোথা হইতে আসিল মনে করিয়া, তাহাকে "আসুন, বসুন, কোথা হইতে আসিলেন" প্রভৃতি আদর-আতিথ্য

করিয়া কুশল প্রশ্ন করা দূরে থাক্, তাহাকে যেন লক্ষ্যই করেন নাই এই ভাবে সংবাদ-পত্র পড়িতে থাকেন কিংবা পত্র লিখিতে থাকেন, সেইরূপই যেন ঈশ্বর আমাদের প্রতি বিরক্তির ভাব দেখাইয়া থাকেন—পরবর্ত্তী অভঙ্গে ইহার বর্ণনা করা হইয়াছে যথা :—

কাঁহো দেবা বাঁহী ন বোলাচি গোষ্টী।
কাঁ মজ হিঁপুটী করীত স না॥ ১ ॥
কঁঠী প্রাণ পাহেঁ বচনাসি আস।
তোঁ দিসে উদাস ধরিলেঁ ঐসেঁ॥ ২ ॥
যেনেঁ কালেঁ বুঁথী যেতাসীসে খোল।
কাঁ নযে বিটাল হোঁউ মাঝা॥ ৩ ॥
লাজ বাটে মজ ক্ষণবিতাঁ দেবাচা।
ন পুসসী ফুকাচা তুকা ক্ষণে॥ ৪ ॥

ইহাতে এইরূপ বলা হইয়াছে যে "হে দেব, আমি কত দিন তোমার ধ্যান, মনন, কীর্ত্তন করিয়া কাটাইলাম; তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে, এই জন্যই এসেছি; কিন্তু তুমি ত আমার দিকে একবারও তাকাও না, আমার অবস্থা সম্বন্ধে তোমার উৎকণ্ঠা আছে একটি শব্দেও ত তাহা প্রদর্শন কর না; মৌনব্রত ধারণ করিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছ—কি কারণে আমার উপর তুমি অসন্তুষ্ট হইয়াছ? আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে এবং আমাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য একটি শব্দও তোমার মুখ হইতে বাহির হইবে বলিয়া আমি অপেক্ষা করিতেছি এবং আমার সম্বন্ধে তোমার এরূপ অনাস্থা দেখা যাইতেছে যে, এই সময়ে আমার পাতকের একটি কণাও তোমার উপর পড়িয়া পাছে উহার পাপত্ব ঘুচিয়া যায় এইজন্য তুমি যেন একটা অবগুণ্ঠন পরিয়া বসিয়া আছ, এইরূপ আমার মনে হইতেছে। কোন খর্চ্চা লাগে না এইরূপ দুইটা ফাঁকা শব্দ বলিয়া আমার জিজ্ঞাসাবাদও তুমি কর না। এইজন্য লোকের নিকট তোমার দাস বলিয়া পরিচয় দিতে আমার লজ্জা বোধ হইতেছে।

বড় লোকদের সাধারণ ব্যবহারে, অন্যের প্রতি বিরক্তি দেখাইবার আর এক উপায় আছে। তাহা এই—উপরি-উক্ত রীতি অনুসারে সাক্ষাৎ করিতে অনিচ্ছা দেখাইলেও যে জেদ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহাকে বাড়ীর দরজার কাছে আসিতে দেখিয়া গৃহস্বামী তাহার উপর কুকুর লেলাইয়া দেন। ধর্ম্মমার্গস্থ সাধকের এই প্রকার অনুভবও কিরূপে আইসে, তুকারাম এক অভঙ্গে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন; সেই অভঙ্গটি এই :—

কাম-ক্রোধ মাঝে লাবি যেলে পাঠী।
বহুত হিঁপুটী ঝালো দেবা॥১॥
আচরিতাঁ তুঝে তুজ নাবরতী।
থোর বাটে চিন্তী আশ্চর্য্য হেঁ॥ ২ ॥
তুঝিয়া বিনোদে আম্হাঁ প্রাণ সাটী।
ভয়ভীত পোটী সদা দুঃখী॥ ৩ ॥
তুকা ক্ষণে মাঝ্যা কপালাচা গুণ।
তুলা হাঁসে কোণ সমর্থাসী॥ ৪ ॥

তুকারাম বলিতেছেন:—"হে দেব, এই মনুষ্য অতিশয় নছোড়বন্দা প্রার্থী; আমার কাছে না আসিলেই ভাল হয়; উহার অন্তঃকরণ একইরকম (যেমনকে-তেমনি) শুষ্ক থাকায় আমি উহার উপর সুপ্রসন্ন নহি এইরূপ দেখাইয়াছি, তবু সে আবার দ্বারের নিকট আসিতেছে; তাই ভয় দেখাইলে সে যদি ফিরিয়া যায় এইজন্য আমার পিছনে কাম-ক্রোধরূপ কুকুর লাগাইয়াছ দেখিতে পাইতেছি। তোমার আশেপাশে আসিতে না দেওয়ার বেশ এক উত্তম উপায় বাহির করিয়াছ! কিন্তু তুমি আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছ,—তাহার তুমি একটা বিচার কর। সকলের কর্ত্তা, শাসয়িতা ও প্রভু একমাত্র তুমিই; তুমি যাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছ সেই কুকুরগুলা তোমার আয়ত্তের মধ্যে নাই, এই কথা কল্পনা করিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়; ফলতঃ তোমার এই আমোদই চলিতেছে, কিন্তু দেব, তোমার এই খেলায় আমার প্রাণসংশয় হইয়াছে; মরণাপেক্ষাও দুঃসহ এই অবস্থা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং পরে আমার গতি কি হইবে এই বিষয়ে ভয়ে আকুল হইয়া আমি অনিবার্য্য দুঃখ পাইতেছি; কৃপা করিয়া এইদিকে একটু লক্ষ্য কর।"

কিন্তু এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবে ঈশ্বরের উপর দোষারোপ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট আপন অবস্থা নিবেদন করিয়া আবার আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, তুকা-

রাম তাঁহার মনের শেষ উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। উপরোক্ত দুইটি ছাড়া বিরক্তি দেখাইবার আর একটি ধরণ আছে; তাহা কি?—না, রোগতাপ প্রভৃতি চিত্তোদ্বেগকারী অনেক কারণ ও সাংসারিক বিঘ্ন মনুষ্যের উপর আনিয়া তাহাকে পরোথ করিয়া দেখা। এইরূপ প্রসঙ্গেও আপন মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে এবং সেই অবস্থায় তাঁহার মনে কিরূপ চিন্তা আসিয়াছে তাহার দর্শক তুকারামের এক অভঙ্গ আছে—তাহা এই:—

নিশ্চিতানেঁ হোতোঁ করুনিয়া সেবা।
কাঁ জী মন দেবা উদ্বেগিলেঁ॥ ১॥
অনন্ত উঠতী চিন্তাচে তরঙ্গ।
করাবা হা ত্যাগ বাটত সে॥ ২॥
কোণ তুঝাবিণ মনাচা চালক।
তুজেঁ সাঙ্গা এক নারায়ণা॥ ৩॥
তুকা ম্হণে মাঝা মাণ্ডিলা বিনোদ।
করবু নেণেঁ ছন্দ করাল কাঈ॥ ৪॥

'দেব! আমি চুপচাপ বসিয়া তোমার নাম গাহিতেছিলাম; যথাশক্তি তোমার সেবা করিতেছিলাম; আমার নিজের সংসার কি করিয়া নির্ব্বাহ হইবে এবং আমার স্ত্রী-পুত্রদিগের কি করিয়া ভরণ-পোষণ হইবে তাহার চিন্তা না করিয়া তোমারই ভজন-পূজন করিতেছিলাম; তাহাতে মনের উদ্বেগ আসিয়া মন বিচলিত হইতেছে, বহুপ্রকার কল্পনা উত্থিত হইতেছে এবং আজ পর্য্যন্ত যে আমি তোমার চিন্তাতেই মগ্ন—কিন্তু ইহার কোন অর্থ নাই; তাহা হইতে কেবল অনেক প্রকার সঙ্কট ও দুঃখ আপনার উপর আনিয়াছি; এই ক্রম এখন ত্যাগ করিব এবং ঐহিক সুখলাভের প্রযত্ন করিব,—এইরূপ মনে আসিতেছে; এইরূপ অনেক চিন্তা যাহা মনে উদয় হইতেছে, তাহার কারণ ত তুমিই দেব। ভাল কিংবা মন্দ—মনুষ্যের বুদ্ধিকে পরিচালিত করিবার অধিকার তোমারই আছে। এ ক্ষমতা আর কাহারও যদি থাকে, তবে তুমিই আমাকে তাহা বল। সবশুদ্ধ দেখিতে গেলে তুমি আমাকে পরিহাস করিতেছ; আমার ন্যায় দুর্ব্বলের হাত দিয়া ভাল-মন্দ কার্য্য করাইবার কি ফন্দি করিবে আমি তাহা জানি না।"

আপন অন্তঃকরণে ধর্ম্মজাগৃতি উৎপন্ন হইয়া ঈশ্বরের চরণসেবায় প্রবৃত্ত হইলে যে সকল বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় স্বকীয় আধ্যাত্মিক গতি কুণ্ঠিত হয়, ঈশ্বর আমাদের উপর বিরক্ত হইয়া দূরে থাকিবার জন্য ঐ সকল বাধাবিঘ্ন আমাদের উপর আনিয়াছেন, এইরূপ তুকারাম প্রেমিকের ভাবে উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন।

এই উৎপ্রেক্ষা তিন প্রকারের। এক প্রকার এই যে—আমরা দেবারাধনা বা পূজার্চ্চনা যতই করি না কেন, পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্কাম ভক্তি, ও মানব-ভ্রাতৃগণের প্রতি প্রেম আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হয় নাই, হৃদয় দ্রব হয় নাই, হৃদয় শুষ্ক—তাহার অস্বস্থ ও অশান্তিকর অবস্থাই রহিয়া গিয়াছে; এইরূপ হওয়ায় আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং আমরা যে সেবা করিয়াছি, তাহা দেবের পছন্দ হয় নাই, তাই তাঁহার প্রসাদ আমাদের মিলে নাই। উপর-উপর ভাবে আমরা যে ভজন-পূজন করিয়াছি, তাহাতে তাঁহার বিরক্তি জন্মিয়াছে—এই উৎপ্রেক্ষা। সেইরূপ আবার, যখন আমরা নানা রকমের ধর্ম্মসাধন করিবার চেষ্টা করি তখন কামাদি বৈরী আমাদের পরিপন্থী হয়। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা দূরে থাক্, শুধু রবিবারে সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনার্থ যাইবার কথা—কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য দিকে কোন লোকপ্রিয় কিংবা লাভের কাজ উপস্থিত হইলে আমরা মনে করি—সমাজ ত আমাদেরই নিজের, উপাসনায় ত আমরা অনেকবার যাইয়া থাকি, তবে একবার রবিবারে যদি না যাই তাহাতে আর কি হইল? এবং প্রতিষ্ঠা কিংবা পয়সা পাইবার এই সুযোগ আবার যে আসিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ আপনার মনকে বুঝাইয়া, ধনমানের লালসার বশীভূত হইলে কেবল ক্ষতিই হইবে জানিবে। সেইরূপ আবার, পরমেশ্বরের স্মরণ, সত্যভাষণ ও সত্যানুসরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া যিনি মনে করেন তিনি একটু মিথ্যা কথা বলিয়া হাজার কেন, লক্ষ টাকা পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও ইতস্তত করেন এবং চাহিনা ঐ হাজার, চাহিনা ঐ লাখ, আমার মনোদেবতা সত্য যদি হন, তিনি যাহা বলিতেছেন সেই অনুসারেই আমি চলিব। তখন ঐহিক লাভের প্রতি

যাঁহাদের লক্ষ্য তাঁহারা তাগকে বলেন; "আরে মূর্খ! দুটা মিথ্যা কথা বলিয়া যদি বহু ধনলাভের সম্ভাবনা থাকে, তবে কেন উহার উপর পদাঘাত করিতেছিস।" এই কথা শুনিয়া মনুষ্য লোভের বশীভূত হইয়া ঈশ্বরকে একেবারে পরিত্যাগ করে। ধর্ম্মমার্গে কামক্রোধাদি, পরমেশ্বরের সান্নিধ্য হইতে আমাদিগকে ডাকিয়া আনিবার জন্য আমাদিগকে আক্রমণ করে—এই আর এক উৎপ্রেক্ষা। কিন্তু এই ডাক শুনিয়া সেদিকে যাওয়া ঠিক নহে; তাহাদের ভয়ে একবার পিছনে ফিরিলেই তাহাদের অধীন হইয়া যাইবে আর অমনি রসাতলে নিমগ্ন হইবে। এই অনুসারে, কোন ভীষণ রোগ দেখা দিলে, কিংবা অত্যন্ত সাংসারিক দুঃখকষ্ট উপস্থিত হইলে, আমাদের মন এমন উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে যে, কোথাও সাপ্তাহিক উপাসনায় না যাইয়া অথবা বার্ষিক উৎসবের জন্য না থাকিয়া আর কোথাও চলিয়া যাই এইরূপ মনে হয়। এইরূপ ছোট-খাটো বিঘ্নে আমরা মুহ্যমান হই এবং আমাদের কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হইয়া, আমাদের উন্নতির জন্য অথবা পরীক্ষার অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর হইতে যে প্রসঙ্গের যোজনা হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গের যোগে আমরা বিহ্বল হইয়া পড়িয়া ধর্ম্মমার্গে অগ্রসর হইতে পারি না—আমরা পতিত হই; এবং উহা হইতেই আমাদের অবনতি আরম্ভ হয়। এইরূপ অনেক প্রকারে ঈশ্বর আমাদের উপর বিরক্ত হইয়াছেন—এই উৎপ্রেক্ষাটি এই সম্বন্ধে খাটে। কিন্তু কঠিন প্রসঙ্গ যতই উপস্থিত হউক, অপরিহার্য্য বিঘ্ন যতই আসুক,—খাঁটি ভক্ত হইলে, আমাদের উপর পরমেশ্বর যে সব ঘটনা আনয়ন করেন তাহা আমাদের উন্নতির জন্য, কিংবা আমাদের পরীক্ষার জন্য; এবং আমরা পরীক্ষায় কিরূপ উত্তীর্ণ হইতে পারি ইহার বিচার করিয়া, এই উদ্দেশে আমাদের যত্নবান হওয়া আবশ্যক—এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই সম্বন্ধে তুকারামের এক অভঙ্গ আছে:—

'দেব ভক্তা লাগীঁ কর্ঁ নেদী সংসার।
অঙ্গে ধারাবার করোনি ঠৈবী॥ ১॥
ভাগ্যা দ্যাবেঁ ভরী অঙ্গীঁ ভয়ে ভাঠা।
অধুনি করন্টা করোনি ঠৈবী॥ ২॥
স্ত্রী দ্যাবী গুণবন্তী নসতী শুভে আশা।
যালাগী কর্কশা পাঠী লাবী॥ ৩॥
তুকা ম্হণে মজ প্রচীত আলী দেখা।
আনীক যা লোকাঁ কায় সাঙ্গো॥ ৪॥

এই অভঙ্গে, সংসারে দারিদ্র্য ও কর্কশ স্ত্রী থাকা প্রযুক্ত সুখ হওয়া ত অসম্ভব; এবং সংসার চির-কাল কষ্টময় হওয়াই খুব সম্ভব; তাই সংসার-পাশে যাহাতে আমরা বদ্ধ না হই, ধনরাশি সঞ্চিত হওয়ায় আমাদের চিত্তে অভিমান প্রবেশ না করে এবং গুণী পত্নীর যোগে আশাপাশ উৎপন্ন না হয় এবং ভক্তের ভক্তিসাধনায় বাধা না আসে এই সদভিপ্রায়ে ঈশ্বর আমাদের মত ভক্তকে দরিদ্রদশায় স্থাপন করিয়া, কর্কশ পত্নীর সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দেন, এইরূপ নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাই তুকারাম এই অভঙ্গে বলিয়াছেন। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, অনেক প্রসঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহাতে ভীত হইয়া বা বিরক্ত হইয়া পিছু হটিয়া যাওয়া ঠিক নহে। "তুম্হী কণ্টারলা তরী"—এই অভঙ্গে তুকারাম এইরূপ বলিয়াছেন যে, 'হে দেব, আমি তোমার সন্নিকটে আসিলে তুমি এই গরীবের দিকে চাহিয়া দেখ কিংবা না দেখ, তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎকার হইয়া আমার অন্তঃকরণ দ্রব হউক বা না হউক, আমি আসিলে তোমার ভাল লাগুক বা না লাগুক, আমার পীড়া অবগত হইয়া উহা দূর হইতেই এড়াইবার জন্য তুমি বিভীষিকা-রূপ কুকুর আমার উপর ছাড়িয়া দেও; অথবা আমার ভার-বল কতটা টিকিয়া থাকিবার মত, তাহা দেখিবার জন্য কিংবা আমার ভক্তিসাধনায় একটুও বাধা না আসে ও আমার উন্নতি হয় এই উদ্দেশে তুমি যতদূর সম্ভব, বিপদ ও কঠিন প্রসঙ্গের যোজনা কর; আমার দৃঢ় সঙ্কল্প এই যে, তোমার চরণ ছাড়িয়া দূরে যাইব না; কারণ, তুমিই আমার গতি, তোমার কাছে যাওয়াই আমার জীবনের উদ্দেশ্য, তোমার নিকট হইতেই আমার উন্নতি শান্তি ও আরাম; তাই তুমি বিরক্ত হইলেও, অর্থাৎ আমার উপর যতই দারুণ বিপত্তি আসুক না কেন, তোমাকে ছাড়িয়া আমি যাইব না। লোকে আমাকে নীচ, সংসারের কণ্টক ও পাগল বলুক না,

আমাকে ধিক্কার করুক না; যা-ইচ্ছা আমার নিন্দাস্তুতি করুক না;—স্বভাবতই তুমি যে তোমার সেবা ও ভজনা নিয়ম আমাদের অন্তরে অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছ তাহা পালন করা চাই, ইহার একটুও ব্যতিক্রম করা নহে, ইহাই আমার দৃঢ়নিশ্চয়।

তোমার ন্যায় সবল নির্ভয় আশ্রয়স্থান অন্য যদি কিছু থাকে, তবে, তোমার পায়ে পড়ি, কৃপা করিয়া আমাকে দেখাইয়া দেও। নচেৎ তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি; এবং তোমার যেরূপ মনে হয় সেই প্রকারেই আমাকে পরোখ করিয়া দেখ। তাহাতে আমি দ্বিরুক্তি করিব না। তোমার মতো নির্ভয় স্থান পাইয়াছি, অতএব যাহাই হোক্‌না কেন, আমি তোমাকে ছাড়িব না, ইহাই আমার দৃঢ় সঙ্কল্প।"

তুকারাম বাবার ন্যায় ঈশ্বরানুরাগ অল্প লোকেরই আছে; এবং তাঁহার মতো সিদ্ধি লাভ করা বড়ই কঠিন; তথাপি তিনি যেরূপ অনুভব করিয়াছেন, ধর্ম্মমার্গে যেরূপ দৃঢ় নিশ্চয়ের পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাহার আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা নিরন্তরচিন্তা করিয়া, তদনুরূপ আচরণ করা আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।

প্রার্থনা।

(শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত)

ধীরে নিভে আসে আলো, তিমির-বসনা
সন্ধ্যা বুঝি দেখা দেয় এ জীবনে মম,
আশার প্রদীপ-মালা—জাগ্রত চেতনা—
আজি ত উঠে না ভাতি তারা-হার সম!
শ্রাবণের অশ্রু-স্নাতা অমার রজনী
এ যে ঘনাইয়ে এল হে হৃদি-রাজন,
অদৃষ্টের ক্রূর-হাসি হানিছে অশনি,
বহে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস মরম-বেদন।
কার পাশে যাব আর মাগিতে শরণ
নিখিল-শরণ তুমি অচ্যুত অন্তর,
আরো কাছে এস নাথ, দাও আলিঙ্গন,
প্রশান্ত হউক্ মোর বিক্ষুব্ধ অন্তর!

নিভৃত মিলন-পূত সুখের শর্ব্বরী
কে যেন কহিছে প্রাণে দয়াল শ্রীহরি।

মনীষী কিশোরীচাঁদ মিত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সাধনা।

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম এ)

আমরা ইংরাজী শিক্ষার সহিত ক্রমে ক্রমে জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কাউয়েল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বেথুন সভায় বলিয়াছিলেন, "ভারত কেবল পাশ্চাত্য জগতের অনুকরণ করিবে না (অনেক হিন্দু তাহাই করিতে প্রস্তুত)—যেন জাতীয়তাবিহীন হিন্দু-গঠনই আমাদিগের শিক্ষার উদ্দিষ্ট ফল। ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর হইবে না। প্রাচ্য প্রাচ্য থাকিবে—প্রতীচ্যশিক্ষা তাহার নিম্নে থাকিবে, ইহাই ভারতবর্ষের কাম্য।" কিশোরীচাঁদ ইংরাজী সাহিত্যরসে আজীবন বিভোর ছিলেন, ইংরাজী সমাজে সর্ব্বদা মিশিতেন, এমন কি সময়ের প্রভাবে তিনি অনেক বিষয়ে ইংরাজের গুণ অনুকরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের গৌরবের কথা—তিনি ইংরাজী শিক্ষার সহিত জাতীয়তা বিসর্জ্জন দেন নাই। তাঁহার জীবনের প্রতি পর্ব্বে হিন্দু-জাতীয়তার চিহ্ন পরিস্ফুট। সেই আর্য্যসুলভ সরলতা ও নির্ভীকতা, মহত্ব ও উদারতা, অনুপম সাধনা ও আত্মত্যাগ, তাঁহার জীবনের প্রতি অঙ্কে দেখিতে পাই। মহত্ব কোনও জাতির একচেটিয়া নহে বটে কিন্তু হিন্দুর ইতিহাসে যে নিষ্কাম কর্ম্ম, সাত্বিক দান, কঠোর সাধনার মহিমোজ্জ্বল উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের বিশ্বাস তাহা পৃথিবীর আর কোনও জাতীর ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

শিক্ষিত কিশোরীচাঁদ বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সাহিত্যচর্চ্চা ত্যাগ করিলেন না, কিম্বা আপনার স্বার্থান্বেষণে ব্যাপৃত হইলেন না বা আপনাকে বিলাসসাগরে মজ্জিত করিলেন না। প্যারীচাঁদের সহবাসে থাকিয়া এই অল্প বয়সেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শিক্ষিত ব্যক্তির দায়িত্ব কত অধিক, দেশের অবস্থা কত শোচনীয়, দেশ তাঁহার নিকট কি চাহে,—তিনি দেশের জন্য কি করিতে পারেন। অজ্ঞতার অন্ধকারে দেশবাসী নিদ্রিত, কুৎসিত লোকাচারে উদারতম ধর্ম্ম সঙ্কুচিত, কুসংস্কারের নিগড়ে সমাজ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। দেশের লোক আপনার রাজনৈতিক অধিকার বুঝে না, বুঝিতে চাহে না, রাখিতে জানে না, রাখিতে পারে না। এই অজ্ঞতার অন্ধকারে

জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিবার ভার কাহার উপর? এই সঙ্কীর্ণতায় পূর্ণ ধর্ম্মকে প্রচারিত করিবার ভার কাহার উপর? এই সমাজের সর্ব্ববিধ কলঙ্ক মোচনের ভার কাহার উপর? এই রাজনীতিক অধিকার অর্জ্জন, রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার ভার কাহার উপর?—মুষ্টিমেয় শিক্ষিত যুবকের উপর। শত বাধা, শত বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইবে কিসের দ্বারা?—উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের দ্বারা। কিশোরীচাঁদ দেশের কল্যাণের জন্য কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলেন। রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের জীবন তাঁহার আদর্শ হইল।

এই সময়ে একজন পবিত্রচেতা, উদারহৃদয় মহাত্মার সহিত কিশোরীচাঁদ পরিচিত হইলেন। তিনি আর কেহই নহেন চিরস্মরণীয় ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ। যে অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ একাগ্রতা লইয়া এই তেজস্বী ধর্ম্মযাজক এদেশে শিক্ষাবিস্তার ও নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য প্রযত্ন করিতেছিলেন তাহা কিশোরীচাঁদ লক্ষ্য করিলেন—মুগ্ধ হইলেন। তিনি অবিলম্বে ডাক্তার ডফের মহৎ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহাকে শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ডফের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কিশোরীচাঁদ সেই বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষাদান করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং কিয়ৎকাল শিক্ষকতা করিলেন। এই সময়ে ডাক্তার ডফের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হইল এবং ডফ কিশোরীচাঁদের একজন প্রধান বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইলেন। এই বন্ধুত্ব চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল এবং কি সম্পদে কি বিপদে ডাক্তার ডফের উপদেশ, সহানুভূতি ও উৎসাহ তাঁহার হৃদয়ে নব আশা নব বল সঞ্চারিত করিত। যিনি বাল্যে প্যারীচাঁদ কর্ত্তৃক, কৈশোরে ডেভিড হেয়ার কর্ত্তৃক, এবং যৌবনে আলেক্‌জাণ্ডার ডফ কর্ত্তৃক জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছেন তিনি যে উত্তরকালে অসাধারণ কর্ম্মবীর বলিয়া অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কোথায়?

কিশোরীচাঁদ এই সময় হইতেই সাহিত্যসেবা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমে 'বেঙ্গল হরকরা' নামক বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন; পরে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক দ্বিভাষীপত্রিকা প্রকাশিত হইলে প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির সহিত তিনিও এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক হন এবং অনেকগুলি মনোহর প্রবন্ধ দ্বারা উক্ত পত্রিকা অলঙ্কৃত করেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন তারিখে দেশের অকৃত্রিম বন্ধু "এদেশে ইংরাজী শিক্ষার পিতা" ডেভিড্ হেয়ার তাঁহার অসংখ্য ছাত্রকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ডেভিড্ হেয়ারের সহিত কিশোরীচাঁদের কিরূপ স্নেহের সম্বন্ধ ছিল তাহা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই ঘটনা কিশোরীচাঁদের তরুণ হৃদয়ে কিরূপ আঘাত করে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। হেয়ারের দেহ সমাধিস্থ হইলে তাঁহার অসংখ্য হিন্দু ভক্ত কর্ত্তৃক স্মৃতিস্তম্ভ, প্রস্তরমূর্ত্তি ও স্মৃতিফলক নির্ম্মিত ও স্থাপিত হইল। কিশোরীচাঁদ এই সকল অনুষ্ঠানে আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; পরন্তু যাহাতে বৎসর বৎসর তাঁহার পবিত্র স্মৃতি পূজিত হয়, নবীনযুগের ছাত্রগণের হৃদয়ে তাঁহার মহৎজীবনের পুণ্যকর্ম্মগুলি সর্ব্বদা জাগরূক থাকে ও উন্নতভাবগুলি প্রতিফলিত হয় এতদুদ্দেশ্যে স্বীয় ভবনে হেয়ারের বন্ধু ও ভক্তগণকে আহুত করিয়া হেয়ার বার্ষিক উৎসব সমিতি গঠিত করিলেন। কিশোরীচাদ ইহার প্রথম সম্পাদক হইলেন। এই সমিতির উদ্যোগে প্রতি বৎসর ১লা জুন তারিখে হেয়ার-স্মৃতি-সম্মিলনীতে ভারতবাসীদিগের মানসিক বা নৈতিক উন্নতিসম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত বা প্রবন্ধ পঠিত হইত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রাজকর্ম্মানুরোধে কলিকাতা ত্যাগকাল পর্য্যন্ত কিশোরীচাঁদ এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং পরে পুনরায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিলে উৎসাহের সহিত ইহাতে যোগদান করেন। তিনি নিজে এই বাৎসরিক স্মৃতিসম্মিলনীতে কয়েকটি মনোহর প্রবন্ধ পাঠ করেন। যথা;—১৮৬২ খৃষ্টাব্দে "Hindoo college and its founder", ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে "The Medical college and its first Secretary" এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে "Memoris of Dwarkanath Tagore." তিনি কয়েকবার উক্ত সম্মিলনীতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াও কয়েকটি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। হেয়ারের পুণ্যস্মৃতি কিশোরীচাঁদ আজীবন ভক্তি, স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ইহার কয়েক মাস পরেই কিশোরীচাঁদ আর একটি শোকের ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২৬শে অক্টোবর (১১ই কার্ত্তিক ১২৪৯ বঙ্গাব্দ) দিবসে তাঁহার পিতা রামনারায়ণ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি পিতাকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। কিশোরীচাঁদের সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক লিখিত একটি অসমাপ্ত জীবন-চিত্র হইতে দৃষ্ট হয় যে, এই দুর্ঘটনায় কিশোরীচাঁদের কোমল হৃদয় এত আঘাত

প্রাপ্ত হয় যে, এই শোক-সংবাদ কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহার নবীন হৃদয় ভগ্ন ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

কিন্তু তাঁহার মানসিক অবসাদ অধিক কাল স্থায়ী হইল না। মহাত্মা ডফ্ তাঁহার যুবক বন্ধুর এই অবসাদপূর্ণ নিশ্চেষ্টভাব দর্শন করিয়া তদ্দূরীকরণাভিপ্রায়ে সান্ত্বনাপূর্ণ উপদেশাদি দ্বারা তাঁহাকে পুনরায় কর্ম্মজীবনে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিলেন। এই সময়ে ডাক্তার ডফের উপদেশে কিশোরীচাঁদ প্রাকৃতিক ধর্ম্মবিজ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার মন পুনরায় সুস্থ হইল। পুনরায় মানবজীবনের দায়িত্ব তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সমুদিত হইল। যাহাতে প্রত্যেক মানবের প্রতি প্রত্যেকের প্রেম এবং সর্ব্বোপরি সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরমেশ্বরের প্রতি অনুরাগ উদ্দীপ্ত হয়, তজ্জন্য তিনি সচেষ্ট হইলেন এবং এতদুদ্দেশ্যে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী দিবসে স্বীয় ভবনে Hindu Theo-Philanthropic Society নামক বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সভায় বিবিধ সম্প্রদায়ের সাধু ও সত্যপ্রিয় ব্যক্তি যোগদান করেন। তন্মধ্যে ডাক্তার ডফ্, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও প্যারীচাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সভায় প্রতি মাসে একটি করিয়া অধিবেশন হইত এবং তাহাতে ইংরাজী অথবা বাঙ্গালা ভাষায় ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণ এবং নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধাদি পঠিত হইত।

এই সভার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই সভায় পঠিত "প্রবন্ধাবলীর" * ভূমিকার নিম্নলিখিত অনুবাদ হইতে প্রতীয়মান হইবে।

"হিন্দু বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এই সভার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজনীয় বোধ করেন। ভারতের নবজীবন যে তাহার নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উন্নতির প্রতি যত্নবান্ না হইলে সম্ভবপর নহে, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে এই যে সত্যটি অপ্রতিহতভাবে উত্থিত হইতেছে—ইহাই এই সভার জন্মহেতু।

"১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী দিবসে দেশবাসীর নৈতিক উন্নতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সমবেত কতিপয় এতদ্দেশীয় বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উন্নতির বিপক্ষে বহুবিধ প্রবল এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সকল প্রকার মহৎ এবং সৎকার্য্যের অবিচ্ছেদ্য বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এইরূপে প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষুদ্র সমবায় উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং একণে চিরস্থায়ী ও কল্যাণপ্রদ অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। নৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক সাধনার আবশ্যকতা ও উপকারিতা যে শিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক জনও কার্য্যতঃ সমর্থন করেন, গত বর্ষের কার্য্যবিবরণী তাহার আনন্দজনক নিদর্শন।

"হিন্দু পৌত্তলিকতা বিনষ্ট করা এবং ঈশ্বর, পরলোক, সত্য ও সুখ সম্বন্ধে যুক্তিসম্মত ও উন্নত অভিমত প্রচার করাই এই সভার উদ্দেশ্য। হিন্দুগণকে পরমাত্মা এবং সত্যরূপে ঈশ্বরকে পূজা করিতে শিক্ষা দেওয়া এবং তাঁহাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, স্বজাতীয়গণ এবং আপনাদিগের প্রতি যে সকল নৈতিক ও পবিত্রতম কর্ত্তব্য আছে, তাহা পালন করান ইহার অভিলষিত উদ্দেশ্য।

"ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, যে সকল সত্য প্রচার করা ইহার উদ্দেশ্য, সে সকল কোনও ধর্ম্মাবলম্বীদিগের স্বীকৃত সত্য বা মিথ্যার উপর নির্ভর করিবে না; পরন্তু সমগ্র মানবজাতির নৈসর্গিক বিশ্বাসের অনুযায়ী হইবে। যদিও সকল ধর্ম্মমত হইতে পৃথক্, তথাপি এই সত্যগুলি, বলিতে কি, সকল ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল। এই বিশ্বের যে একজন স্রষ্টা ও নৈতিক শাসনকর্ত্তা আছেন, মানবের মধ্যে এমন যে কিছু আছে যাহা দেহপিঞ্জর ভঙ্গ হইলেই বিনাশ পায় না এবং চিরস্থায়ী, পুণ্যের সহিত যে সুখ এবং পাপের সহিত যে দুঃখ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, এই সকল সত্যই সভ্য এবং অসভ্য উভয় জাতিরই ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ, মূলতত্ত্ব। এতদ্দেশের সাধারণ দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক এই সকল মত কার্য্যতঃ স্বীকার করা ভারতের যথার্থ হিতৈষীদিগের আনন্দের কারণ না হইয়া থাকিতে পারে না।

"এই সভার উদ্দেশ্য, ঈশ্বর এবং মানবের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি করা। ইহার নামেই সে উদ্দেশ্য স্বপ্রকাশ। সকল ধার্ম্মিক এবং সহৃদয় ব্যক্তি যে ইহার উদ্দেশ্যে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই।

"এই সভার মাসিক অধিবেশন হইয়া থাকে এবং তথায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি পঠিত হয়। ধর্ম্ম ও নীতিতত্ত্বই এই সকল প্রবন্ধাদির বিষয়। ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ, ঐ বিষয়ক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ এই সভার উদ্দেশ্যসাধনের অন্যতম উপায় বলিয়া অবলম্বিত হইয়াছে।

"এই সভার উদ্দেশ্য এত উদার যে অস্মদ্দেশস্থ সকল শিক্ষিত য়ুরোপীয় ও ভারতীয় যে ইহাতে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন এই আন্তরিক আশা করা যায়।

* Discourses read at the Meeting of the Hindu Theo-Philanthropic Society Vol. I Calcutta, P. S. D, Rozario & Co 1844.

"কলিকাতা, ১লা অক্টোবর ১৮৫৫।"

এই সভার উদ্দেশ্য কিশোরীচাঁদ কর্তৃক লিখিত প্রথম প্রবন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। "কলিকাতা রিভিউ" পত্রের ৫ম সংখ্যায় ডাক্তার ডফ্ সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—"সকল প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই প্রবন্ধটি কয়েক বিষয়ে অতি শক্তিশালী এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। * * * * অধিকন্ত এই রচনার মধ্যে যে আন্তরিকতা প্রকাশ পাইতেছে—যাহা আমাদের বর্ত্তমান তুষার-শীতল ঔদাসীন্যের মধ্যে একটি মনোমুগ্ধকর ব্যাপার। মানুষের মধ্যে যে বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় ধর্ম্ম ও নীতিশক্তিও নিহিত আছে, এবং উহার ন্যায় এগুলিরও চর্চ্চা এবং বর্দ্ধন করা উচিত, এই মহান্ অথচ সতত উপেক্ষিত সত্যটি এইরূপ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"মানুষের প্রকৃতির আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আরও কিছু আছে। সে কেবল বুদ্ধিমান নহে; পরন্তু ধর্ম্ম ও নীতি-প্রবণ জীব।:. সে ঈশ্বর, স্বজাতি এবং আপনার নিকট তিন প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ। প্রথম সম্বন্ধে ভক্তি, দ্বিতীয়ে পরোপকারিতা এবং তৃতীয়ে হিতাহিতজ্ঞান দ্বারা সে বিভূষিত। মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা ভক্তি ও প্রীতির বীজ উপ্ত হইয়াছে; কিন্তু কর্ষণ না করিলে তাহা বিকশিত ও ফলপ্রসূ হইতে পারে না। আমাদের ধর্ম্ম ও নৈতিক বৃত্তিসকল এবং প্রেমের বিকাশই আমাদের জীবনের প্রধান কর্ম্ম। কিন্তু কিরূপে ইহা সম্পূর্ণ হইতে পারে? নিশ্চয়ই কেবল বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের দ্বারা নহে? না—বুদ্ধিবৃত্তিগুলির চর্চ্চা করা ধর্ম্ম ও নৈতিকবৃত্তি বিকাশের সহিত এক নহে। প্রথমের সহিত শেষবৃত্তিগুলি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত নহে। শিক্ষাসমিতি কর্ত্তৃক অনুসৃত শিক্ষাপদ্ধতি যদিও ভারতবর্ষের পরমোপকারী ফলসমূহ প্রসব করিতে পারে; তথাপি ইহা শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্যসমূহ যথেষ্টভাবে লাভ করিতে অসমর্থ। ইহার মস্তিষ্কের সহিত সম্বন্ধ আছে হৃদয়ের সহিত নহে। ইহার সহিত বুদ্ধিবৃত্তিযুক্ত মানুষের সম্বন্ধ আছে নৈতিক ও ধর্ম্মবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের সম্পর্ক নাই। কিন্তু মানুষ কেবল বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অন্বিত জীব নহে; নীতি এবং ধর্ম্মপ্রবণ জীব অর্থাৎ অতি সুন্দর বিকাশক্ষম করুণা ও স্নেহান্বিত জীব—এই পার্থিব জগৎ, এমন কি, আকাশের অসীমতার মধ্যে ঘূর্ণায়মান সূর্য্য এবং গ্রহসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও যাহারা জীবিত থাকিবে সেই অনন্তকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট জীব হইয়া আমাদের নৈতিক ও ধর্ম্মবৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধনে অবহেলা করার ন্যায় আমাদের জীবনের মহান্ উদ্দেশ্যের ঠিক বিপরীত কার্য্য আর কিছুই করিতে পারি না। এই সভার সংগঠন যে আমাদের নৈতিক ও ধর্ম্মবৃত্তিসমূহের পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধনের সহায় হইবে তাহা স্বীকৃত হইবে। আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের ইহা একটী উৎকৃষ্ট উপায়। সংমিলিত শক্তি ও উদ্যম আশ্চর্য্য সাধন করিতে পারে।

"যে সকল উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্ততঃ মনে মনে হিন্দুধর্ম্মের ভয়াবহ কুসংস্কারসমূহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও কোনও শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম অবলম্বন অথবা অন্বেষণ করিতে কোনও চেষ্টা করিতেছেন না, এই অথচ সত্যটি এইরূপ সুন্দরভাবে স্বীকৃত ও শান্তভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

"আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলে একদিকে যেরূপ শিক্ষার অনন্ত শক্তিসম্ভূত মহান পরিবর্ত্তন সকল দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই, অপরদিকে শিক্ষিত অথবা তথাকথিত শিক্ষিত দেশবাসীগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক ধর্ম্মের অভাবের শোচনীয় চিত্র দেখিতে পাই। * * * বর্ত্তমান কালের এই সকল স্বাধীনপ্রকৃতিক পুরুষগণের, দেশের তথাকথিত সংস্কারকগণের জানা উচিত যে, তাঁহাদিগের জ্ঞান, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, জনসাধারণ হইতে তাঁহাদিগের উন্নতি স্বপ্নমাত্র—কল্পনামাত্র। যদি কুসংস্কারের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার সময় তাঁহারা তাঁহাদিগের ধর্ম্মবৃত্তিসমূহের বিকাশের জন্য, পরমেশ্বরের অদ্ভুত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যে পরিদৃশ্যমান তাঁহার শক্তি ও মঙ্গলেচ্ছার বিষয় অনুধাবন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন ও বিস্তারার্থে সেইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা জাতির গৌরব, দেশের আলোক বলিয়া অভিনন্দিত হইতেন। কিন্তু ধর্ম্মচর্চ্চায় তাঁহাদিগের অবহেলা ও ঔদাসীন্যের বিষয় চিন্তা করিলে তাঁহাদিগের লৌকিক ধর্ম্ম ত্যাগ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না এবং তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান না করিয়া তাঁহাদের কুসংস্কারাপন্ন দেশভ্রাতৃগণ অপেক্ষা নিম্ন আসনে স্থাপন করিতে। সাধারণ দেশবাসীগণের সত্য হউক, মিথ্যা হউক, একটা ধর্ম্ম আছে। তাহাদের সৎকার্য্যসাধনেচ্ছার সম্পূর্ণ অভাব নাই—কুসংস্কার তাহাদিগকে সৎকার্য্যসাধন হইতে বিরত করে না। তাহাদের নরকে অর্থাৎ ঈশ্বরের শাস্তি ও সুবিচারে বিশ্বাস তাহাদিগকে পুণ্যকর্ম্মে প্রণোদিত ও পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত করে। কিন্তু আমাদিগের কতিপয় শিক্ষিত বন্ধু (আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি) একেবারে পরলোকে অবিশ্বাস করেন এবং আমাদের সকল আশা এবং

আকাঙ্ক্ষা ইহলোকেই আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন। * * *

"নৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কারের নেতৃগণ যাহা সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি হইতে অবিচ্ছেদ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন, জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে এই প্রবন্ধরচয়িতা সেই সকল গম্ভীর ও শান্ত মতসমূহ গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। রাজনীতিক সংস্কার যে ভারতের ভ্রান্তি ও ভারতের বিষম রোগসমূহের একমাত্র মহৌষধ, এইরূপ স্বপ্ন যাঁহারা দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ন্যায় ভয়ানক মতিভ্রম বোধ হয় আর কাহারও ঘটে নাই এবং একজন শিক্ষিত হিন্দু কর্ত্তৃক এই সকল সঙ্কীর্ণ ও ভ্রান্তিজনক মতের আবিষ্কর্ত্তা এবং পোষকগণকে কিছু স্বাধীনভাবে এইরূপে যথোচিত নিন্দিত হইতে দেখা কিছু আশ্চর্য্য ও আনন্দের বিষয়।

"আমরা গবর্ণমেণ্টের অবিচারের কথা বলি। আমরা আমাদের লিডনহল ষ্ট্রীটের প্রভুগণের স্বার্থপর ও পক্ষপাতী নীতির কথা উত্থাপিত করি। আমরা দেশের রাজনীতিক হীনতার কথা বলি। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন যে দেশের নবজীবন-প্রদানরূপ মহৎ কার্য্য কেবলমাত্র রাজনীতিক উন্নতির দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। আমাদের দেশ বহুবিধ রোগে আক্রান্ত এবং আমাদের রাজনীতিক অপেক্ষা নৈতিক রোগই অধিক। এতদ্দ্বারা এমন বুঝিবেন না যে, রাজনীতিক সংস্কারে আমাদের সহানুভূতি নাই। বরঞ্চ ইহার বিপরীত। আমাদিগের বণিক্‌রাজগণের—আমাদিগের যৌথসম্রাটগণের সঙ্কীর্ণ ও ভ্রান্তিজনক নীতির প্রতিবাদ করিতে, বাণিজ্যে তাঁহাদিগের লবণ ও আফিমের আধিপত্য বন্ধ করিতে, তাঁহাদিগের শাসনবিষয়ে একাধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে আমি সর্ব্বাপেক্ষা উৎসুক। তাহা হইলে দেশবাসিগণ অবাধবাণিজ্যের সুফল লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহাদিগের প্রাপ্য দায়িত্বপূর্ণ ও উচ্চ পদসমূহ অধিকার করিতে পারেন। আমার স্থির বিশ্বাস যে, ভারতকে নবজীবন প্রদান করিতে হইলে, উন্নত করিতে হইলে তাহার প্রতি রাজনীতিক সুবিচার করা অন্যতম প্রধান উপায়—ভারতবর্ষ যে সকল রাজনীতিক ব্যবস্থায় কষ্ট পাইতেছে, সে সকল হইতে তাহাকে মুক্ত করা, রাজনীতিক অনধিগম্য পথ তাহার সন্তানগণকে মুক্ত করিয়া দেওয়া—শেষ সনন্দের ৮৭ তম নিয়মে যে উদার মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রবর্ত্তিত করা—তাঁহাদিগকে দেশশাসন-কার্য্যে নিযুক্ত করা, শ্বেতচর্ম্মের উচ্চ আসন দূর করিয়া এবং বর্ণনির্ব্বিশেষে কার্য্য দেখিয়া পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক অন্ধস্বার্থপরতা-জনিত চিহ্নিত এবং সাধারণ রাজকর্ম্মের পার্থক্য দূর করা। আমি পুনশ্চ বলি, উচ্চ নৈতিক শিক্ষা, ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক ভাবসমূহের চর্চ্চা, কুসংস্কার ও কুনীতির বিনাশ, দেশবাসীর মধ্যে ঈশ্বরসম্বন্ধে বিশুদ্ধ এবং উন্নত মতসমূহ বিস্তার এবং যে ধর্ম্মে তিনি একই আরাধ্য দেবতা, এই শিক্ষা দেয়, সেই ধর্ম্ম দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক গ্রহণের উপায়-বিধান ব্যতীত দেশে নবজীবন প্রদান অসম্ভব। লোককে নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করুন, লোক পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে। নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও পুনর্জ্জীবিত ভারত, আধ্যাত্মিক দাসত্ব হইতে বিমুক্ত ভারত, যে কুসংস্কারে প্রতিমাপূজা এবং এক নিরাকার ঈশ্বরকে তেত্রিশ কোটি ভাগে বিভাগ করিতে প্রণোদিত করে, ব্রাহ্মণগণের সেই কুসংস্কারে নিমগ্ন হইতে মুক্ত ভারত অপ্রতিহতভাবে এবং দ্রুতগতিতে উন্নতির সোপানে উঠিবে এবং সভ্যতা ও স্বাধীনতার গুণ এবং অধিকারে বিভূষিত হইবে।"

এই সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রাগুল্লিখিত "প্রবন্ধাবলীতে" নিম্নলিখিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট ছিল :—

1. Discourse read at the Inaugural Meeting of the Hindu Neophilanthrophic Society.
2. পরমেশ্বরের শক্তি ও দয়া।
3. The Godness of the deity manifested in a leaf.
4. The System of Philosophy inculcated in the Bhagavat Geeta.
5. On the Bhagavat Geeta.
6. ব্রহ্মোপাসনায় আনন্দ।
7. The Power, Wisdom and Godness of the deity as displayed in the organisation of the Zoophyte.
8. নীতিজ্ঞান।
9. On Hinduism as it is.
10. The Phenomena of reproduction—an argument for the goodness of God and the immortality of the soul.
11. যথার্থ প্রেম এবং ভক্তিদ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য।
12. The association of virtue with happiness and of vice with misery—an argument for the goodness of the deity.
13. On the Immortality of the Soul as inculcated in the Hindu religion.
14. পরোপকার।
15. Conformity and Nonconformity.

বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলির প্রায় সমস্তগুলিই মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যে কাহারও রচিত বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজী প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক কিশোরীচাঁদের লিখিত। On the Bhagavat Geeta এবং Conformity and Nonconformity এই দুইটি প্রবন্ধ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত। ইহার প্রথমটি কিশোরীচাঁদের On the system of philosophy inculcated by the Bhagavat Geetaর প্রত্যুত্তর। এই প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ গীতা হইতে বহুসংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গীতার প্রধান প্রধান উপদেশগুলির ব্যাখ্যা করেন।

গীতার প্রধান প্রধান উপদেশগুলির ব্যাখ্যা করিয়া কিশোরীচাঁদ প্রতীচ্য নীতিকারগণের উপদেশের সহিত

তুলনায় সমালোচনা করিয়া গীতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। উপসংহারে তিনি বলেন :—

"সত্য বটে, গীতার উপদেশ আমাদিগকে এত উচ্চ নৈতিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে শিক্ষা দেয় যে, বর্ত্তমান অবস্থায় মানব-প্রকৃতিতে ততদূর উন্নতি অসম্ভব। কিন্তু ইহাতে কি আইসে যায়? চরম উৎকর্ষ লাভই কি আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে? যাহা উচ্চ, যাহা কষ্টসাধ্য তাহারই অনুসরণ করিতে মানবকে উত্তেজিত করা উচিত নহে কি? এই প্রচেষ্টাই কি তাহার প্রচ্ছন্ন শক্তিকে বিকশিত করে না? আদর্শের সহিত তাহার যে গভীর হৃদয়োন্মাদকারী সম্বন্ধ আছে তাহাই কি তাহার সাধনায় শক্তিপ্রদান করে না এবং প্রথমে যে সকল বাধাবিপত্তি অনতিক্রমণীয় বোধ হয় তাহা লঙ্ঘন করিতে সামর্থ্য প্রদান করে না? যে সকল উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা হয়ত মানবজীবনে সফল হওয়া অসম্ভব, সেই সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষাই কি সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলময় বিধাতার প্রদত্ত মানবহৃদয়ের সুন্দর ও আশ্চর্য্য মনোবৃত্তিসমূহ বিকশিত করিতে সাহায্য করে না? ইংলণ্ডের কোনও সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা বলেন :—"আলস্য ও ইন্দ্রিয়সুখাসক্তির সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার নিমিত্ত আধুনিক নীতিকারগণ যেরূপ মানবের নৈতিক আদর্শ হীন করিয়াছেন প্রাচীন নীতিকারগণ সেরূপ করেন নাই, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি আমার শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। তাঁহারা কখনও সমগ্র মানবজাতিকে শিষ্যত্ব প্রদান করিবার অভিলাষ করেন নাই, বরঞ্চ সংসার হইতে যত দূরে সম্ভব তত দূরে অবস্থান করিতেন। তাঁহারা সরল ভাষায় বলিয়া দিতেন, কিরূপ আত্মত্যাগ প্রয়োজন এবং তাহা হইতে কিরূপ সিদ্ধিলাভ সম্ভব। যদি তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে চাহ—এইরূপ সাধনার প্রয়োজন; এই এই ক্রিয়ানুষ্ঠান আবশ্যক, দ্বিতীয় পথ নাই। যদি তুমি না করিতে পার, অজ্ঞানদিগের সমাজে প্রবেশ কর।'"

The Immortality of the Soul as inculcated in the Hindu religion নামক প্রবন্ধেও কিশোরীচাঁদ বেদবেদান্ত গীতা ও রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া জীবাত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদের অসংখ্য রচনার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব।

কিশোরীচাঁদ গীতার উক্ত উপদেশগুলি তাঁহার জীবনের Motto করিয়া লইয়াছিলেন এবং আজীবন এই সকল উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। (আমরা আশা করি পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদসমূহে পাঠকগণকে ইহা স্পষ্টভাবে দেখাইতে সমর্থ হইব।)

তিনি ব্যবহারিক হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারপ্রার্থী ছিলেন এবং সময়ে সময়ে পৌত্তলিকতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তীব্র মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যথার্থ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যে তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল তাহা প্রাগুক্ত প্রবন্ধের উদ্ধৃত উপসংহার হইতে প্রতীয়মান হইবে। একজন লেখক প্যারীচাঁদের সহিত কিশোরীচাঁদের তুলনায় সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন "উভয়েই সংস্কারক ছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধীরভাবে নীতি-উপদেশ দ্বারা দেশের কুসংস্কার দূর করিতে প্রয়াস পাইতেন, কনিষ্ঠ প্রাচীন আচারসমূহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া অধিকাংশ লোকের হৃদয়ে আঘাত করিতেন। একজন আমাদিগের শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, শাস্ত্রগ্রন্থাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শিত করেন এবং রচনায় ও কথোপকথনে শাস্ত্রবাক্যের উল্লেখ করেন, অপর ভ্রাতা কেবলমাত্র বিজাতীয় ঘৃণাবশতঃ এই সকল শাস্ত্র পাঠ করা অপ্রয়োজনীয় বোধ করিতেন।"

তিনি আমাদের শাস্ত্রাদি যে নিতান্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন না, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বোধ হয় আমাদের আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। পুরাণাদির গল্পাংশের সত্যতাসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা, অর্থহীন অনুষ্ঠানপদ্ধতির সহিত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধ নির্ণয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করা, হিন্দুশাস্ত্রে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার সহিত একার্থবাচক নহে। পক্ষান্তরে যিনি গীতার উজ্জ্বল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদনে চেষ্টা করিয়াছিলেন শত দোষ সত্ত্বেও তাঁহাকে যথার্থ হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি।

এই বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সমালোচনায় উপসংহারে ডাক্তার ডফ্ বলেন :—

"যখন আমরা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করি এবং দৃষ্টিগোচর করি যে, স্বর্গকে অবজ্ঞা করিয়া এবং পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিয়া, পরমেশ্বরের অবমাননা করিয়া এবং মানবাত্মাকে কলুষিত করিয়া, অসংখ্য মানবমণ্ডলীর দ্বারা দেবার্চ্চনার নামে নানাপ্রকার পৈশাচিক অত্যাচার, অর্থহীন অনুষ্ঠান এবং শিশুজনোচিত ক্রিয়াকলাপ সংসাধিত হইতেছে, তখন অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত মানুষের অবনতিকর কুসংস্কারের দৃঢ় নিগড় হইতে মুক্তিপ্রয়াসী বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভার সভ্যগণের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট বা বিচলিত না হওয়া অসম্ভব। ইহা নিশ্চয়ই উন্নতির একটি সোপান এবং যুগপরিবর্ত্তনকারী কয়েকটি মহাশক্তির অস্তিত্ব ও ক্রিয়ার পরিচায়ক। এতকালের নির্জ্জীবতার পরে নবজীবনপ্রবাহের ক্ষীণতম আশা দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? ঘৃণ্য পৌত্তলিকতার পঙ্কিলভূমি হইতে উত্থান করিবার ইচ্ছা, ক্রিয়াকলাপের অর্থহীন অভিনয় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক নাস্তিকতার যুক্তিবিরুদ্ধতা প্রচার করিবার আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়নিহিত ধর্ম্মবৃত্তি ও নৈতিকবৃত্তিসমূহের স্ফূর্ত্তি প্রদানের ইচ্ছা (ইহাই যথার্থ ভগবদ্ভক্তি) এবং অত্যন্ত পৌত্তলিক জাতির সম্মুখে ঈশ্বরকে পরমাত্মা ও সত্যরূপে পূজা করিবার ইচ্ছা—এই সকল আকাঙ্ক্ষা যতই অল্পমাত্রায় বিদ্যমান থাকুক, যেরূপ ভাবেই পোষণ করা যাউক, যেরূপ ভাবেই অনুসৃত হউক, ভবিষ্যৎ সুদিনের আশায় সঞ্চার করে।"

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় ৩য় ভাগে ৫ম সংখ্যায় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "The Transition states of the Hindu mind" নামক প্রবন্ধে তত্ত্ববোধিনী সভা ও এই বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভার কার্য্যবিবরণীর তুলনায় সমালোচনা করিয়া শেষোক্ত সভার উদারতার ও উচ্চতর আদর্শের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সভা অধিককাল স্থায়ী হইল না এবং ইহাতে দেশের যেরূপ কল্যাণ সম্ভাবিত হইয়াছিল তাহা আশানুযায়ী সাধিত হইল না। ইহার কারণ এই যে, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মব্রত কিশোরীচাঁদ, যিনি এই সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন, রাজকর্ম্মানুরোধে কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং আমাদের দেশের অন্যান্য যে সকল মঙ্গলকর অনুষ্ঠান একজন ব্যক্তির একান্ত প্রযত্ন, উদ্যম ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর করে, সে সকল যেরূপ উক্ত ব্যক্তির তিরোধানের সহিত বিলুপ্ত হয়, এই সভাও সেইরূপ বিলুপ্ত হইল।

যখন কিশোরীচাঁদ অদম্য উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম-বিজ্ঞানানুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন তখন তিনি দেশের অন্যান্য কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে বিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর পার্লিয়ামেণ্টের অন্যতম সদস্য, বিখ্যাত বাগ্মী ও ভারতহিতৈষী মহাত্মা জর্জ্জ টমসনকে বিলাত হইতে এই দেশে আনয়ন করেন। ইনি রামমোহন রায়ের অন্যতম বন্ধু মিষ্টার আড্যাম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ানসভার (British Indian Society) একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। ভারতসম্বন্ধীয় তথ্যসংগ্রহমানসে এবং দেশবাসিগণকে রাজনৈতিক শিক্ষা প্রদানার্থ ইনি এতদ্দেশে আগমন করিয়া Chuckerburty Faction * নামে অভিহিত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ নব্য বঙ্গদিগের নিকট রাজনৈতিক শিক্ষাপ্রদ কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন, "যেমন চুম্বকে লোহা লাগিয়া যায়, তেমনি রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি জর্জ্জ টমসনের সহিত মিশিয়া গেলেন।"

ফৌজদারী বালাখানার প্রদত্ত ইঁহার কয়েকটি বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া Friend of India সম্পাদক মার্শম্যান বলেন, "এখন দুই দিকে বজ্রধ্বনি হইতেছে; পশ্চিমে বালাহিসারে ও কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানায়, টমসনের বক্তৃতা এতদ্দেশীয় শিক্ষিত যুবকগণকে এক নূতন কর্ম্মক্ষেত্র প্রদর্শন করাইল।" সে বক্তৃতাও কিরূপ হৃদয়োন্মত্তকারিণী। রাজা দিগম্বর মিত্রের চরিতে শ্রদ্ধাস্পদ ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন, "যাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টের অন্যতম সভ্য জর্জ্জ টমসনের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্ট সভার বক্তৃতা কিরূপ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। ডেভিড্ হেয়ার এ দেশে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, জর্জ্জ টমসন তাহাতে রাজনৈতিক শিক্ষার বীজ বপন করিলেন। তাঁহার স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে 'অভাবমোচয়িতা টমসন' নামে অভিহিত করিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু এতদ্দেশে রাজনৈতিক সভাসমূহের জন্মদাতা বলিয়া তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন"।

বলা বাহুল্য বিংশতিবর্ষীয় যুবক কিশোরীচাঁদও এই Chuckerburty Factionএর মধ্যে থাকিয়া টমসনের সহিত পরিচিত হইলেন এবং তাঁহারই নিকট রাজনৈতিক শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করিলেন। টমসনের বক্তৃতার ফলে রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দেব, প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদের যত্নে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল দিবসে বঙ্গদেশে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয়। টমসন ইহার সভাপতি ও প্যারীচাঁদ ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪২—৩ খৃষ্টাব্দের Bengal Spectator পত্রে দেখা যায় যে, কিশোরীচাঁদ এই সভার অধিবেশনে মধ্যে মধ্যে প্রস্তাবাদি উত্থাপিত করিতেন।

এই সময় জন্ সালিভান (John Sullivan) নামক একজন মান্দ্রাজ সিবিলিয়ান ইংলণ্ডে East Indian Stockএর স্বত্বাধিকারিগণের নিকট প্রস্তাব করেন যে, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের Charter Actএর ৮—৭ম ধারা এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করা হউক যে, শিক্ষিত ভারতবাসিগণকে শাসনকার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারিবে। আমাদের ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীও এই সময়ে দেশবাসীগণের কার্য্যক্ষমতাসম্বন্ধে বিস্তর যুক্তি প্রদর্শিত করিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। উক্ত সভার সদস্যগণ টাউনহলে একটি সভা করিয়াও সালিভ্যানকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া একটি অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিই এই সভায় যোগদান ও বক্তৃতাদি করেন। কলিকাতার তদানীন্তন High Sheriff মিষ্টার আড্যাম ফেরী স্মিথ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখের Bengal Harkuru and India Gazette পত্রে এই সভার যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে দৃষ্ট হইবে যে, কিশোরীচাঁদও এই সভায় একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন:—

"Raja Burodacant Roy moved the second Resolution.

'That the following address be adopted and signed by all favorable to its object and that it be then forwarded to England for presentation to Mr. Sullivan.' Babu Kissory Chand Mittra rose to second the resolution. We will give his able speech on a future occasion."

সাধারণ প্রকাশ্য সভায় কিশোরীচাঁদের এই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতা। দুঃখের বিষয়, আমরা এই বক্তৃতাটি সংগ্রহ করিতে পারি নাই এবং এই বিষয়ে পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে অক্ষম।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১০ অক্টোবর দিবসে লর্ড হার্ডিং বাহাদুর তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক বিখ্যাত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করেন। ইহাতে প্রকাশ করা হয়, রাজকার্য্যে নিয়োগকালে অশিক্ষিত অপেক্ষা শিক্ষিত দেশবাসিগণকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। শিক্ষিত দেশবাসিগণ এই সিদ্ধান্ত প্রকাশে তাঁহাদের অকৃত্রিম আনন্দ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ২৫শে নভেম্বর দিবসে ফ্রিচার্চ্চ ইনষ্টিটিউসনে একটি বিরাট সভার আয়োজন করেন। ঐ বৎসরের ২৮শে নভেম্বর তারিখের Bengal Harkuru পত্রে এই সভার বিস্তৃত কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল। দেশবাসিগণের শিক্ষার নিমিত্ত বড়লাট

---

* Friend of India সম্পাদক Mr. Marshman হিন্দুকলেজে শিক্ষিত নব্য সংস্কারকগণকে উপহাস করিয়া Chuckerburty Faction নাম প্রদান করেন।

বাহাদুরের আন্তরিক সহানুভূতির জন্য দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনবিষয়ক প্রথম প্রস্তাব রামগোপাল ঘোষ কর্ত্তৃক উত্থাপিত হইলে কিশোরীচাঁদ উহার সমর্থনে যে সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন কৌতূহলী পাঠকগণের জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব :—

Gentlomen, I belive I speak the sonse of a large majority of this meeting when I declare that no Governor General came out to India with a stronger conviction that the true and legitimate object of Government is the happiness of the governed than Sir Henry Harding, and that no administration has opened under happier auspices than Sir Henry's. His Excellency has begun his Government by recognising the paramount duty of educating the people and is at this moment, I have reason to think, engaged in the consideration of several important measures with refernce to education which will be, ere long, adopted. The Resolution of 10th October is obviously, a practical recognition of the great truth that education is the grand remedial agent for regenerating and elevating our country. That ignorance is the root of all the evils she is labouring under, cannot be doubted. You talk of the diabolical system of Mofussil Police. You talk of the crushed and prostrate energies of the great mass of your countrymen, and of their sqalid misery and destitution. I admit and deplore these facts. I seek not to apologize for that cold apathy to all but the animal wants of life which characterizes them. I disguise not from myself that ages of misrule have extinguished all generous aspirings in their breasts. But educate the people and you will find them manfully resisting the oppressions of the Zamindar. Educate the people and they will cease to be victimised by the Daroga. Educate the people and they will burst asunder those fetters by which they are now bandaged and trampled upon. The clear benevolence and enlightened statesmanship which have dictated this resolution cannot be sufficiently appreciated. The practical operation of it will be fraught with results of the last importance to our country at the same time that it would benefit the State largely by the introduction of men of superior intelligence and moral integrity into those offices which are now held by those who, as it is generally expressed, make the best of them; it cannot fail to subserve most powerfully the great cause of education. Among the formidable obstacles which oppose themselves to the progress of education in our country, the absence of all connection between education and pecuniary success in the world is one of the principal. Why is it that the generous and enlightened efforts of our rulers to disseminate its blessings in the North-Western provinces have resulted in, I may almost say, utter failure and have been crowned with a large measure of success in Calcutta and its vicinity? Why?—but because an acquaintance with English, and the knowledge, of which it is the vehicle, is not, in the North-West, as it is, in some degree, in Calcutte, a passport to wealth and distinction. I hail therefore this resolution as, by recognizing the claims of educated, above those of uneducated, natives to Government employ, it cannot but further the mighty work of moral and intelletual enlightenment of our countrymen. The Resolution, I have the honor of seconding embodies our thanks to the Governor General. By adopting it, you will show and convince your friends here and elsewhere, that whatever might be the faults of your national character, ingratitude to your benefactors, or an incapacity to appreciate their exertions, is not one of them. *

* তখনকার শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনের ভাব বুঝাইবার জন্য আমরা এই ইংরাজী বক্তৃতাটি মুদ্রিত করিলাম। তং সং।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

প্রথম অধ্যায়।

[ভারতীয় যুদ্ধের আরম্ভে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে গীতার উপদেশ করিয়াছেন, লোকদিগের মধ্যে তাহার প্রচার কি প্রকারে হইল, এই বিষয়ের পরম্পরা বর্ত্তমান মহাভারত গ্রন্থেই এই প্রকার প্রদত্ত হইয়াছে—যুদ্ধ আরম্ভ হইলে প্রথমে ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যাইয়া বলিলেন যে, "যদি তোমার যুদ্ধ দেখিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে দৃষ্টি প্রদান করিতেছি।" তদুত্তরে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন যে, আমি নিজের কুলক্ষয় নিজচক্ষে দেখিতে চাহি না। তখন একই স্থানে বসিয়া বসিয়া সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ জানিবার জন্য সঞ্জয় নামক সূতকে ব্যাসদেব দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিলেন। এই সঞ্জয়ের দ্বারা যুদ্ধের অবিকল বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে অবগত করাইবার ব্যবস্থা করিয়া ব্যাসদেব চলিয়া গেলেন (মভা. ভীষ্ম. ২)। যখন পরে যুদ্ধে ভীষ্ম আহত হন, এবং উক্ত ব্যবস্থা অনুসারে সংবাদ শুনাইবার জন্য প্রথমে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গেলেন, তখন ভীষ্মের নিমিত্ত শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যুদ্ধের সমস্ত বিষয় বলিবার জন্য আদেশ করিলেন। তদনুসারে সঞ্জয় প্রথমে উভয় দলের সৈন্যদিগের বর্ণনা করিলেন; এবং, পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে গীতা বলিতে আরম্ভ করিলেন। পরে এই সকল কথাই ব্যাসদেব নিজের শিষ্যদিগকে, ঐ শিষ্যদিগের মধ্যে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে, এবং শেষে সৌতি শৌনককে শুনাইয়াছেন। মহাভারতের মুদ্রিত সকল সংস্করণেই ভীষ্মপর্ব্বের ২৫ম অধ্যায় হইতে ৪২ম অধ্যায় পর্য্যন্ত এই গীতাই কথিত হইয়াছে। এই পরম্পরা অনুসারে—]

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন—(১) হে সঞ্জয়! কুরুক্ষেত্রের পুণ্যভূমিতে একত্রিত আমার এবং পাণ্ডুর যুদ্ধেচ্ছু পুত্রগণ কি করিল ?

[হস্তিনাপুরের চতুর্দ্দিকে কুরুক্ষেত্রের ময়দান আছে। বর্ত্তমান দিল্লীনগর এই ময়দানের উপরেই সংস্থাপিত। কৌরব-পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বপুরুষ কুরু নামক রাজা এই ময়দানে অত্যন্ত কষ্টের সহিত হলচালনা করিয়াছিলেন; তাই ইহাকে ক্ষেত্র (বা ক্ষেত) বলা হয়। যখন ইন্দ্র কুরুকে এই বর প্রদান করিলেন যে, এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তপস্যা করিতে করিতে, বা যুদ্ধে, প্রাণত্যাগ করিবে, তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে, তখন তিনি এই ক্ষেত্রে হলচালনা পরিত্যাগ করিলেন (মভা. শল্য. ৫৩)। ইন্দ্রের এই বরদানের কারণেই এই ক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র বা পুণ্যক্ষেত্র নামে পরিচিত। এই ময়দানের বিষয়ে এই কথা প্রচলিত আছে যে, এইখানে পরশুরাম একুশ বার সমস্ত পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন; এবং আধুনিক কালেও এই ক্ষেত্রেই বড় বড় লড়াই হইয়া গিয়াছে।]

সঞ্জয় উবাচ।

§§ দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—(২) সেই সময়ে পাণ্ডবসেনাকে ব্যূহরচিত (দণ্ডায়মান) দেখিয়া, রাজা দুর্য্যোধন (দ্রোণ) আচার্য্যের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন যে—

[মহাভারতের (মভা. ভী. ১৯. ৪-৭; মনু ৭. ১৯১) গীতার পূর্ব্বলিখিত অধ্যায়সমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন কৌরবসেনার ভীষ্মরচিত ব্যূহ পাণ্ডবগণ দেখিলেন এবং যখন তাঁহারা নিজসৈন্য কম দেখিলেন, তখন তাঁহারা যুদ্ধবিদ্যা অনুসারে বজ্র নামক ব্যূহ রচনা করিয়া নিজসৈন্যদিগকে দাঁড় করাইলেন। যুদ্ধে প্রতিদিন এই ব্যূহ পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন।]

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূং।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥
অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

(৩) হে আচার্য্য! পাণ্ডুপুত্রদিগের এই বৃহৎ সেনা দেখুন, আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র (ধৃষ্টদ্যুম্ন) এই সেনার ব্যূহ রচনা করিয়াছেন। (৪) ইহার মধ্যে শূর, মহাধনুর্দ্ধর, ও যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনের সমান যুযুধান (সাত্যকি), বিরাট ও মহারথী দ্রুপদ, (৫) ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও বীর্য্যবান কাশিরাজ, পুরুজিৎ কুন্তিভোজ এবং নরশ্রেষ্ঠ শৈব, (৬) এই প্রকারই পরাক্রমশালী যুধামন্যু ও বীর্য্যবান উত্তমৌজা, এবং সুভদ্রার পুত্র (অভিমন্যু), এবং দ্রৌপদীর (পাঁচ) পুত্র—এই সকল মহারথীই আছেন।

[দশ হাজার ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধার সঙ্গে একক সংগ্রামকারীকে মহারথী বলে। উভয় দিকের সেনাদলে যে সকল রথী, মহারথী অথবা অতিরথী ছিলেন, উদ্যোগপর্ব্বের (১৬৪ হইতে ১৭১ পর্য্যন্ত) আট অধ্যায়ে তাঁহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে। সেইখানে বলা হইয়াছে যে, ধৃষ্টকেতু শিশুপালের পুত্র। এই প্রকারই, পুরুজিৎ কুন্তিভোজ, ইহা দুই বিভিন্ন পুরুষের নাম নহে। যে কুন্তিভোজ রাজাকে কুন্তী পালন করিয়াছিলেন, পুরুজিৎ তাঁহার ঔরস পুত্র ছিলেন, এবং কুন্তিভোজ তাঁহার কৌলিক নাম; এবং ইহাও বর্ণিত দেখা যায় যে, তিনি ধর্ম্ম, ভীম এবং অর্জ্জুনের মামা ছিলেন (মভা. উ. ১৭১. ২)। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, উভয়েই পাঞ্চাল্য ছিলেন, এবং চেকিতান একজন যদুবংশীয় ছিলেন। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, এই দুইজন অর্জ্জুনের চক্ররক্ষক ছিলেন। শৈব্য শিবিদেশের রাজা ছিলেন।

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সোমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮ ॥

অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥
অপর্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং ॥ ১০ ॥

(৭) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এখন আমার দিকে যে সকল প্রধান প্রধান সেনাপতি আছেন, তাঁহাদের নামও আমি আপনাকে শুনাইতেছি; অবহিত হইয়া শুনুন। (৮) আপনি এবং ভীষ্ম, কর্ণ এবং রণজিৎ কৃপ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ (দুর্য্যোধনের অন্যতম ভ্রাতা), এবং সোমদত্তের পুত্র (ভূরিশ্রবা), (৯) এবং ইঁহারা ব্যতীত অন্যান্য অনেক শূর আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন, এবং সকলেই নানাবিধ শস্ত্রচালনে নিপুণ ও সংগ্রামে অভিজ্ঞ। (১০) এই প্রকার স্বয়ং ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত আমার এই সৈন্য অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ অপরিমিত বা অগণ্য; কিন্তু ভীম কর্ত্তৃক রক্ষিত ঐ পাণ্ডবদিগের সৈন্য পর্য্যাপ্ত অর্থাৎ পরিমিত বা গণনার আয়ত্ত।

[এই শ্লোকে 'পর্য্যাপ্ত' ও 'অপর্য্যাপ্ত' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 'পর্য্যাপ্তের' সাধারণ অর্থ 'বস্' বা 'যথেষ্ট'; তাই কেহ কেহ এই অর্থ করেন যে, "পাণ্ডবদিগের সেনা যথেষ্ট আছে এবং আমার যথেষ্ট নাই," কিন্তু এই অর্থ ঠিক নহে। পূর্ব্বে উদ্যোগপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিজের সৈন্য বর্ণন করিবার সময় উক্ত মুখ্য মুখ্য সেনাপতিদের নাম বলিয়া, দুর্য্যোধন বলিতেছেন যে "আমার সেনা বৃহৎ ও গুণসম্পন্ন, এই কারণে আমারই জয় হইবে" (উ. ৫৪. ৬০-৭০)। এই প্রকার পরে ভীষ্মপর্ব্বে, যখন দ্রোণাচার্য্যের নিকট দুর্য্যোধন পুনরায় সেনার বর্ণন করিতেছিলেন, সেই সময়েও, গীতার উপরিউক্ত শ্লোকগুলিরই সহিত একই ভাবের শ্লোক তিনি নিজমুখে যেমনটী তেমনই বলিয়াছেন (ভীষ্ম. ৫১. ৪-৬)। এবং, তৃতীয় কথা এই যে, সমস্ত সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্যই আহ্লাদের সহিত এই বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিচার করিলে, এই স্থানে 'অপর্য্যাপ্ত' শব্দের "অসংখ্য, অপার বা অসীম" ব্যতীত অন্য কোন অর্থ হইতেই পারে না। 'পর্য্যাপ্ত' শব্দের ধাত্বর্থ "চারি দিকে (পরি-) বেষ্টন করিবার যোগ্য (আপ্ = প্রাপণে)"। কিন্তু "অমুক কার্য্যের জন্য পর্য্যাপ্ত" বা "অমুক মনুষ্যের জন্য পর্য্যাপ্ত" এই প্রকার পর্য্যাপ্ত শব্দের পশ্চাতে, চতুর্থী অর্থের অন্য শব্দ যোগ করিয়া দিলে পর্য্যাপ্ত শব্দের এই অর্থ হয়—"ঐ কার্য্যের জন্য বা মনুষ্যের জন্য যথেষ্ট বা সমর্থ"। এবং, যদি 'পর্য্যাপ্তের' পশ্চাতে অপর কোন শব্দ না রাখা যায়, তবে কেবল 'পর্য্যাপ্ত' শব্দের অর্থ হয় 'যথেষ্ট, পরিমিত বা যাহা গণিতে পারা যায়'। আলোচ্য শ্লোকে পর্য্যাপ্ত শব্দের পশ্চাতে অপর কোন শব্দ নাই, তাই এস্থলে উহার উপরি-উক্ত দ্বিতীয় অর্থ (পরিমিত বা গণনার আয়ত্ত)ই বিবক্ষিত; এবং মহাভারতের অতিরিক্ত অন্যত্রও এইরূপ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত ব্রহ্মানন্দগিরিকৃত টীকাতে প্রদত্ত হইয়াছে। কেহ কেহ এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, দুর্য্যোধন ভয়ে নিজের সৈন্যকে 'অপর্য্যাপ্ত' অর্থাৎ 'যথেষ্ট নহে' বলিতেছেন; কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ দুর্য্যোধনের ভয় পাইবার কথা কোথাও বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু ইহার বিপরীত ইহা বর্ণিত দেখা যায় যে, দুর্য্যোধনের সুবৃহৎ সেনা দেখিয়া পাণ্ডবগণ বজ্র নামক ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন এবং কৌরবদিগের অপার সেনা দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছিল (মভা. ভীষ্ম. ১৯. ৫ ও ২১. ১)। পাণ্ডবসেনার সেনাপতি ছিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন, কিন্তু "ভীম রক্ষা করিতেছেন" বলিবার কারণ এই যে প্রথম দিনে পাণ্ডবগণ বজ্র নামক যে ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার রক্ষার জন্য ঐ ব্যূহের অগ্রভাগে ভীমকেই নিযুক্ত রাখা হইয়াছিল, অতএব সেনারক্ষক হিসাবে ভীমকেই দুর্য্যোধন সম্মুখে দেখিতে পাইয়াছিলেন (মভা. ভীষ্ম. ১৯. ৪-১১, ৩৩, ৩৪); এবং, এই অর্থেই এই উভয় সেনার বিষয়ে, মহাভারতে গীতার পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে "ভীমনেত্র" ও "ভীষ্মনেত্র" উক্ত হইয়াছে (মভা. ভী. ২০. ১ দেখ।)]

অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্বএব হি ॥ ১১ ॥

(১১) (তবে এখন) নিয়োগ অনুসারে সকল অয়নে অর্থাৎ সেনার বিভিন্ন প্রবেশদ্বারে থাকিয়া তোমার সকলের সহিত মিলিত হইয়া ভীষ্মকেই সকল দিক হইতেই রক্ষা করিতে হইবে।

[সেনাপতি ভীষ্ম স্বয়ং পরাক্রান্ত এবং কাহা হইতেও পরাজিত হইবার লোক ছিলেন না। 'সকল দিক হইতেই সকলের উহাঁকেই রক্ষা করিতে হইবে', এই উক্তির কারণস্বরূপে দুর্য্যোধন অন্যস্থলে (মভা. ভী. ১৫. ১৫-২০; ৯৯. ৪০, ৪১) এই কথা আনিয়াছেন যে, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল যে আমি শিখণ্ডীর প্রতি শস্ত্র চালাইব না, এই কারণে শিখণ্ডীর দিক হইতে ভীষ্মের নিহত হইবার সম্ভাবনা ছিল। অতএব সকলকে সাবধান করিতে হইবে—

অরক্ষ্যমাণং হি বৃকো হন্যাৎ সিংহং মহাবলং।
মা সিংহং জম্বুকেনেব ঘাতয়েথাঃ শিখণ্ডিনা ॥

["মহাবলবান সিংহকে রক্ষা না করিলে নেকড়ে বাঘ তাহাকে বধ করিবে; অতএব জম্বুকসদৃশ শিখণ্ডীর দ্বারা সিংহকে নিহত হইতে দিও না।" শিখণ্ডী ব্যতীত অপর সকলকে ঠেকাইবার জন্য ভীষ্ম একাকীই সমর্থ ছিলেন, কাহারও সহায়তার জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইত না।]

§§ তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শংখং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥
ততঃ শংখাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শংখৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশংখং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শংখান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

(১২) (ইতিমধ্যে) দুর্য্যোধনের আনন্দ জন্মাইয়া প্রতাপান্বিত বৃদ্ধ কৌরব পিতামহ (সেনাপতি ভীষ্ম) সিংহের ন্যায় মহা গর্জন করিয়া (লড়াইয়ের শিষ্টাচার হিসাবে) নিজের শংখ বাজাইলেন। (১৩) ইহারই সঙ্গে অনেক শংখ, ভেরী (নওবত), পণব, আনক ও গোমুখ (এই সকল যুদ্ধের বাদ্য) বাজিতে লাগিল এবং এই সমস্ত বাদ্যের ধ্বনি চারিদিকে অত্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। (১৪) অনন্তর শ্বেত অশ্বযুক্ত বৃহৎ রথে উপবিষ্ট মাধব (শ্রীকৃষ্ণ) ও পাণ্ডব (অর্জ্জুন) (প্রত্যুত্তর স্বরূপে নিজ পক্ষও যে প্রস্তুত আছে, তাহাই জানাইবার জন্য) দিব্য শংখ বাজাইলেন। (১৫) হৃষীকেশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য (নামক শংখ), অর্জ্জুন দেবদত্ত, ভয়ঙ্করকর্ম্মা বৃকোদর অর্থাৎ ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক বৃহৎ শংখ বাজাইলেন; (১৬) কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল ও সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক, (১৭) মহাধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অজেয় সাত্যকি, (১৮) দ্রুপদ ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, এবং মহাবাহু সৌভদ্র (অভিমন্যু), ইঁহারা সকলে, হে রাজা (ধৃতরাষ্ট্র)! চারিদিকে নিজের নিজের শংখ পৃথক্ পৃথক্ বাজাইলেন। (১৯) আকাশ ও পৃথিবীকে কাঁপাইয়া তুমুল শব্দ কৌরবদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল।

§§ অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০ ॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমং ॥ ২৪ ॥

(২০) অনন্তর কৌরবদিগের ব্যবস্থা দেখিয়া, পরস্পরের প্রতি শস্ত্রপাতের সময় আসিলে পর, কপিধ্বজ পাণ্ডব অর্থাৎ অর্জ্জুন, (২১) হে রাজা ধৃতরাষ্ট্র! শ্রীকৃষ্ণকে ইহা বলিলেন—অর্জ্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত! আমার রথ উভয় সেনাদলের মধ্যে লইয়া চলিয়া দাঁড় করাও, (২২) ইতিমধ্যে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত এই লোকদিগকে আমি দেখি; এবং আমাকে এই রণসংগ্রামে কাহাদের সঙ্গে লড়িতে হইবে, এবং (২৩) যুদ্ধে দুর্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের কল্যাণকামনায় এখানে সংগ্রামেচ্ছু যাহারা একত্র হইয়াছে, তাহাদিগকে আমি দেখিয়া লই। সঞ্জয় বলিলেন—(২৪) হে ধৃতরাষ্ট্র! গুড়াকেশ অর্থাৎ আলস্যজয়ী অর্জ্জুন এই প্রকার বলিলে হৃষীকেশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ (অর্জ্জুনের) উত্তম রথ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে লইয়া যাইয়া দাঁড় করাইলেন; এবং—

[হৃষীকেশ ও গুড়াকেশ শব্দের যে অর্থ উপরে প্রদত্ত হইল, তাহা টীকাকারদিগের মতানুযায়ী। নারদ-পঞ্চরাত্রেও 'হৃষীকেশের' এই নিরুক্তি আছে যে হৃষীক =ইন্দ্রিয়গণ এবং উহাদের প্রভু=স্বামী (না-পঞ্চ. ৫. ৮. ১৭); এবং ক্ষীরস্বামীকৃত অমরকোষটীকায় লিখিত আছে যে, হৃষীক (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ) শব্দ হৃষ্= আনন্দ দেওয়া, এই ধাতু হইতে উৎপন্ন, ইন্দ্রিয়সকল মনুষ্যকে আনন্দ দেয় তাই উহাদিগকে হৃষীক বলে। তথাপি সন্দেহ হয় যে, হৃষীকেশ ও গুড়াকেশের উপরি-প্রদত্ত অর্থ ঠিক কি না। কারণ হৃষীক (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গণ) এবং গুড়াকা (অর্থাৎ নিদ্রা বা আলস্য) এই শব্দ অপ্রচলিত; হৃষীকেশ ও গুড়াকেশ এই দুই শব্দের ব্যুৎপত্তি অন্য প্রণালীতেও স্থির করা যাইতে পারে। হৃষীক+ঈশ এবং গুড়াকা+ঈশ ইহার পরিবর্ত্তে হৃষী +কেশ এবং গুড়া+কেশ এই প্রকার পদচ্ছেদও করা যাইতে পারে; এবং আবার এই অর্থ হইতে পারে যে, হৃষী অর্থাৎ আনন্দে দণ্ডায়মান বা প্রশস্ত যাঁহার কেশ (চুল) তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, এবং গুড়া অর্থাৎ গূঢ় বা ঘন যাঁহার কেশ তিনিই অর্জ্জুন। ভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ গুড়াকেশ শব্দের এই অর্থ গী. ১০. ২০ সম্বন্ধীয় নিজের টীকায় বিকল্পে বলিয়াছেন; এবং সূতের পিতার রোমহর্ষণ নাম হইতে হৃষীকেশ শব্দের উল্লিখিত দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিকেও অসম্ভব বলা যায় না। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বান্তর্গত নারায়ণীয়োপাখ্যানে বিষ্ণুর মুখ্য মুখ্য নামের নিরুক্তি দিতে দিতে এই অর্থ করা হইয়াছে যে, হৃষী অর্থাৎ আনন্দদায়ক এবং কেশ অর্থাৎ কিরণ, এবং বলা হইয়াছে যে, সূর্য্য-চন্দ্র রূপ নিজের বিভূতিসমূহের কিরণ দ্বারা সমস্ত জগতকে আনন্দ প্রদান করেন, তাই উঁহাকে হৃষীকেশ বলা হয় (শান্তি. ৩৪১. ৪৭ এবং ৩৪২. ৬৪, ৬৫ দেখ; উদ্যো. ৬৯. ৯); এবং পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকসমূহে বলা হইয়াছে যে, এই প্রকার কেশব শব্দও কেশ অর্থ কিরণ শব্দ হইতে উৎপন্ন (শাং. ৩৪১. ৪৭)। তন্মধ্যে যে কোন অর্থ গ্রহণ কর না কেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এই নাম রাখিবার সর্ব্বাংশে যোগ্য কারণ বলা যাইতে পারে না। তবে এই দোষ নিরুক্তিকারদিগের নহে। যে ব্যক্তিবাচক বা বিশেষ নাম অত্যন্ত রূঢ় হইয়া গিয়াছে, তাহার নিরুক্তি ব্যাখ্যাকালে এই প্রকার আপত্তি আসা বা মত-ভেদ হওয়া খুবই সহজ কথা।]

ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাং।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥ ২৬ ॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ॥ ২৭ ॥
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

(২৫) ভীষ্ম, দ্রোণ ও সমস্ত রাজাদের সম্মুখে (তিনি) বলিলেন যে, "অর্জ্জুন! এই স্থলে একত্রিত এই কৌরবদিগকে দেখ"। (২৬) তখন অর্জ্জুন

দেখিলেন যে, ঐস্থলে একত্রিত সমস্ত (নিজেরই) অতি বৃদ্ধ, পিতামহ, আচার্য্য, মামা, ভাই, পুত্র, নাতি, মিত্র, (২৭) শ্বশুর এবং স্নেহপাত্র উভয় সেনাদলেই আছে; (এবং এই প্রকার) একত্রিত ঐ সকলেই আমার বান্ধব, ইহা দেখিয়া কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন (২৮) পরম করুণাগ্রস্ত হওয়ায় দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

অর্জ্জুন উবাচ।

§§ দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতং ॥ ২৮ ॥
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখংচ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯ ॥
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্‌ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ॥ ৩০ ॥
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ॥ ৩১ ॥
ন কাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ॥৩২॥
যেষামর্থে কাংক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ৩৩ ॥
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৪ ॥
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিংনু মহীকৃতে ॥ ৩৫ ॥
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬ ॥
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্‌ স্ববান্ধবান্‌।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! যুদ্ধেচ্ছায় (এখানে) একত্রিত এই স্বজনগণকে দেখিয়া (২৯) আমার গাত্র শিথিল হইতেছে, মুখ শুষ্ক হইতেছে, শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে; (৩০) গাণ্ডীব (ধনুক) হাত হইতে স্খলিত হইতেছে এবং সমস্ত দেহ দগ্ধ হইতেছে; দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছি না এবং আমার মন চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। (৩১) এই প্রকার হে কেশব! (আমি সমস্ত) লক্ষণ বিপরীত দেখিতেছি এবং স্বজনদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়া শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাণ (হইবে এরূপ) দেখিতেছি না। (৩২) হে কৃষ্ণ! আমার জিতিবার ইচ্ছা নাই, রাজ্যও চাহি না আর সুখও চাহি না। হে গোবিন্দ! রাজ্য, উপভোগ বা প্রাণ থাকিলেই বা তাহাতে কি প্রয়োজন? (৩৩) যাহাদের জন্য রাজ্যের, উপভোগের এবং সুখের ইচ্ছা করিতে হইত, সেই সকল এই লোকেরা জীবন ও সম্পত্তির আশা ছাড়িয়া যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান। (৩৪) আচার্য্য, অতিবৃদ্ধ, বালক, দাদা, মামা, শ্বশুর, নাতি, শালা ও সম্বন্ধী, (৩৫) যদিও ইহারা (আমাকে) মারিবার জন্য দণ্ডায়মান, তথাপি হে মধুসূদন! ত্রৈলোক্য রাজ্যেরও জন্য আমি (ইহাদিগকে) মারিবার ইচ্ছা করি না; পৃথিবী তো দূরের কথা। (৩৬) হে জনার্দ্দন! এই কৌরবদিগকে মারিয়া আমার কি ভাল হইবে? যদিও ইহারা আততায়ী, তথাপি ইহাদিগকে মারিলে আমার পাপই হইবে। (৩৭) তাই নিজেরই বান্ধব কৌরবদিগকে আমার মারা উচিত নহে, কারণ হে মাধব! স্বজনদিগকে মারিয়া আমি কি প্রকারে সুখী হইব?

[অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাহরশ্চৈব ষড়েতে আততায়িনঃ॥ (বসিষ্ঠ. স্মৃ. ৩. ১৬) অর্থাৎ গৃহে অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য আগত, বিষদাতা, শস্ত্রহস্তে মারিবার জন্য আগত, সম্পত্তিহরণকারী এবং স্ত্রী বা ক্ষেত্রের অপহারক—এই ছয়জন আততায়ী। মনুও বলেন যে, এই দুষ্টদিগকে বেধড়ক মারিয়া বধ করিবে, ইহাতে কোন পাপ নাই (মনু. ৮. ৩৫০, ৩৫১)।]

§§ যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকং ॥ ৩৮ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৯ ॥

(৩৮) লোভেতে নষ্টবুদ্ধি উঁহারা কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহের পাপ যদিও না দেখে, (৩৯) তথাপি হে জনার্দ্দন! কুলক্ষয়ের দোষ আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, অতএব এই পাপ হইতে পরাঙ্মুখ হইবার বিষয় আমার মনে কি প্রকারে না আসিয়া থাকিতে পারে?

[প্রথম হইতেই যুদ্ধে গুরুবধ, সুহৃদ্বধ ও কুলক্ষয় হইবে, ইহা প্রত্যক্ষ হইলে পর যুদ্ধ সম্বন্ধীয় স্বীয় কর্ত্তব্য বিষয়ে অর্জ্জুনের যে সংশয় আসিয়াছিল, তাহার মূল কি? গীতাতে যাহা পরে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? এবং ঐ হিসাবে প্রথম অধ্যায়ের মহত্ব কি? এই সকল প্রশ্নের বিচার গীতারহস্যের প্রথম এবং পরে চতুর্দ্দশ প্রকরণে আমি করিয়াছি, তাহা দেখ। এই স্থলে এমন সাধারণ যুক্তিরই উল্লেখ করা হইয়াছে যে তাহা দ্বারা লোভেতে বুদ্ধিনাশের কারণে দুষ্টেরা নিজেদের দুষ্টভাব জানিতে না পারিলেও দুষ্টদিগের ফাঁদে চতুর ব্যক্তিগণের পড়িয়া দুষ্ট হওয়া উচিত নহে—ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাং—উঁহাদিগের নীরব থাকা উচিত। এই সাধারণ যুক্তি সকল এইরূপ প্রসঙ্গে কতদূর পর্য্যন্ত প্রযুক্ত হইতে পারে, অথবা প্রয়োগ করা উচিত?—ইহাও উপরের সমানই এক গুরুতর প্রশ্ন, এবং গীতার অনুযায়ী ইহার উত্তর আমি গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণে (পৃষ্ঠা) নিরূপণ করিয়াছি। গীতার পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে যে বিচার আছে, তাহা প্রথম অধ্যায়ে অর্জ্জুনের যে সন্দেহ আসিয়াছিল, সেই সন্দেহ নিবৃত্তি করিবার জন্য করা হইয়াছে: এই কথার উপর মনোযোগ রাখিলে গীতার তাৎপর্য্য বুঝিবার পক্ষে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভারতীয় যুদ্ধে একই রাষ্ট্রের ও একই ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের মধ্যে বিরোধবিবাদ আসিয়াছিল এবং তাহারা পরস্পর মরিতে-মারিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। এই কারণেই উক্ত আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। আধুনিক ইতিহাসে যেখানে যেখানে এইরূপ প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেইখানে সেইখানে এইরূপ প্রশ্নই উপস্থিত হইয়াছে। থাক্‌; পরে কুলক্ষয় হইতে যে যে অনর্থ হয়, অর্জ্জুন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন।]

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥ ৪০ ॥

অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২ ॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩ ॥
উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৪ ॥

(৪০) কুলক্ষয়ের ফলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়, এবং (কুল-) ধর্ম নষ্ট হইলে সমুদয় কুল অধর্মে অভিভূত হয়; (৪১) হে কৃষ্ণ! অধর্মের প্রসার হইলে কুলস্ত্রীগণ বিপথগামী হয়; হে বার্ষ্ণেয়! স্ত্রীলোকেরা বিপথগামী হইলে বর্ণসঙ্কর আসে। (৪২) এবং বর্ণসঙ্কর আসিলে উহা কুলঘাতককে ও (সমগ্র) কুলকে নিশ্চয় নরকে লইয়া যায়, এবং পিণ্ডদান ও তর্পণাদি ক্রিয়া সকল লুপ্ত হইলে তাহাদের পিতৃগণও পতিত হয়। (৪৩) কুলঘাতকদিগের এই বর্ণসঙ্করকারক দোষের ফলে পুরাতন জাতিধর্ম ও কুলধর্ম উৎসন্ন হয়; (৪৪) এবং হে জনার্দন! আমি শুনিয়া আসিতেছি যে, যে মনুষ্যগণ কুলধর্ম হইতে বিচ্যুত হয়, তাহাদের নিশ্চয়ই নরকবাস হয়।

§§ অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ং।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫ ॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭ ॥

(৪৫) দেখ, আমি রাজ্যসুখের লোভে স্বজনহত্যায় উদ্যত হইয়াছি বটে, (সত্যই) ইহা দ্বারা আমি বড়ই পাপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি! (৪৬) ইহা অপেক্ষা নিঃশস্ত্র হইয়া প্রতীকার করা ছাড়িয়া দিলে, (এবং এই) শস্ত্রধারী কৌরব আমাকে যুদ্ধে নিহত করিলে আমার অধিক মঙ্গল হইবে। সঞ্জয় বলিলেন— (৪৭) রণভূমিতে এই প্রকার বলিয়া, শোকব্যথিত-চিত্ত অর্জুন (হাতের) ধনুকবাণ পরিত্যাগ করিয়া রথে স্বস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

[রথে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার প্রণালী ছিল, অতএব "রথে স্বস্থানে বসিয়া পড়িলেন" এই শব্দ হইতে, খিন্ন হইবার কারণে উঁহার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল না, এই অর্থই অধিক ব্যক্ত হইতেছে। মহাভারতের কোন কোন স্থলে এই রথের যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ভারতের সমসাময়িক রথ প্রায় দুই চাকায় হইত; বড় বড় রথে চার-চার ঘোড়া জোতা যাইত এবং রথী ও সারথী—উভয়ে সম্মুখ ভাগে পরস্পর পরস্পরের পাশাপাশি বসিত। রথ চিনিবার জন্য প্রত্যেক রথের উপর একপ্রকার বিশেষ ধ্বজা লাগানো হইত। ইহা প্রসিদ্ধ কথা যে, অর্জুনের ধ্বজার উপর স্বয়ং হনুমানই বসিয়া থাকিতেন।]

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

এই প্রকার শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগ—অর্থাৎ কর্মযোগ—শাস্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে অর্জুনবিষাদ-যোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

[গীতারহস্যের প্রথম (পৃষ্ঠা), তৃতীয় (পৃষ্ঠা), এবং একাদশ (পৃষ্ঠা) প্রকরণে এই সংকল্পের অর্থ করা হইয়াছে এই যে, গীতাতে কেবল ব্রহ্মবিদ্যাই নহে, কিন্তু উহাতে ব্রহ্মবিদ্যামূলক কর্মযোগ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সংকল্প মহাভারতে না থাকিলেও ইহা গীতার উপর সন্ন্যাসমার্গীয় টীকা রচিত হইবার পূর্ববর্তী হইবে; কারণ সন্ন্যাসমার্গের কোন পণ্ডিতই এইরূপ সংকল্প লিখিবেন না। এবং ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, গীতাতে সন্ন্যাসমার্গ প্রতিপাদিত হয় নাই; কিন্তু কর্মযোগের, শাস্ত্র বুঝিয়া, সংবাদরূপে আলোচনা হইয়াছে। সংবাদাত্মক ও শাস্ত্রীয় পদ্ধতির ভেদ গীতারহস্যের চতুর্দশ প্রকরণের আরম্ভে উক্ত হইয়াছে।]

"ভালই হবে"।

(শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

ভালই হবে—ভালই হবে—!
আকাশ ভরা আঁধার যত
আলোই হবে—আলোই হবে!
আছে বলেই আঁধার কালো
তাইতো প্রভাত এতই ভাল
রাত্রিশেষে বল্‌তে হবে
ভাগ্যে নিশা এসেছিল।
আজকে কাঁটাই পড়ছে চোখে—
পুষ্প হয়ে ফুটলে ক'ব
ভাগ্যে কাঁটা ছিল বুকে!
মন! খুসী হয়েই ওঠ্ রে আজি
বিশ্বখানি ফুলের সাজি
আঁধার কালো—সবই ভাল
একই সুরে উঠে বাজি' ॥

ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিভাগ।

(শ্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি পাঠে বুঝিতে পারা যে, অধ্যয়ন সদাচারপালন প্রভৃতির তারতম্যানুসারে এবং জীবিকার উৎকর্ষাপকর্ষের ফলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়াছে। যে পর্য্যন্ত সমাজের বলবদবস্থা ছিল, সেই পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় শাসনের ব্যতিক্রমে সামাজিকের অপকর্ষ বিবেচিত এবং অবধারিত হইত। সদাচার প্রভৃতির অভাবে কেবল পূর্ব্বপুরুষের মাহাত্ম্যবশতঃ বংশানুক্রমে উৎকর্ষ অভিমত হইত না। প্রস্তাবিত বিষয়ে ঋষিদিগের বচনাবলী সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঋষি অঙ্গিরার মতে ব্রহ্মযোনিতে উৎপত্তি, বিদ্যা, সদাচার, বেদপাঠ ও যথোচিত ধর্ম্মাচরণ, এই কয়েকটি কারণে সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব উৎপন্ন হয়।

জন্ম-শরীর-বিদ্যাভিরাচারেণ শ্রুতেন চ।
ধর্ম্মেণ চ যথোক্তেন ব্রাহ্মণত্বং বিধীয়তে।

পরাশর-মাধব ১৫৯ পৃষ্ঠা

ব্যাস বলিয়াছেন, ব্রহ্মবীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াও যে ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারবর্জ্জিত ও জাতিমাত্রোপজীবী, সে অব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। যেজন গর্ভাধান প্রভৃতি সংস্কারযুক্ত ও বৈদিক উপনয়নে সংস্কৃত হয়, অথচ অধ্যয়ন অধ্যাপনা করে না তাদৃশ ব্যক্তি "ব্রাহ্মণব্রুব" নামে পরিচিত।

ব্রহ্মবীজসমুৎপন্নো ব্রহ্মসংস্কারবর্জিতঃ।
জাতিমাত্রোপজীবী যঃ সোঽব্রাহ্মণ উদাহৃতঃ।
গর্ভাধানাদিসংস্কারৈর্বেদোপনয়নৈর্যুতঃ।
নাধ্যাপয়তি নাধীতে স ভবেদ্ ব্রাহ্মণব্রুবঃ॥

মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন—যাহারা গায়ত্রী সন্ধ্যা-বন্দন ও অগ্নিক্রিয়া জানে না, অর্থাৎ এই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠানরহিত, অথচ কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত, তাদৃশ ব্যক্তি "নামধারক" ব্রাহ্মণ, ইহারা মুখ্য ব্রাহ্মণ নহে। পরন্তু ইহাদের সহস্র ব্যক্তির সম্মেলনেও প্রায়শ্চিত্তোপদেশ দিবার অধিকার নাই।

সাবিত্র্যাশ্চাপি গায়ত্র্যাঃ সন্ধ্যোপাস্ত্যগ্নিকার্য্যয়োঃ।
অজ্ঞানাৎ কৃষিকর্ত্তারো ব্রাহ্মণা নামধারকাঃ॥
অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে। ৮. ৩

মহর্ষি অত্রির মতে ব্রাহ্মণের দশ প্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—দেবব্রাহ্মণ, মুনিব্রাহ্মণ, দ্বিজব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ, বৈশ্যব্রাহ্মণ, শূদ্রব্রাহ্মণ, নিষাদব্রাহ্মণ, পশুব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছব্রাহ্মণ ও চাণ্ডাল ব্রাহ্মণ। ইহাদের মধ্যে যিনি সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, নিত্যদেবতাপূজা, অতিথি-সৎকার ও বৈশ্যদেবানুষ্ঠান করেন, তিনি দেবব্রাহ্মণ। যিনি ফলমূল শাকপত্র আহার করেন, অথচ নিরন্তর বনবাসরত এবং অহরহ শ্রাদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, তিনি মুনিব্রাহ্মণ। যিনি সাধারণের সংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য বেদান্ত পাঠ করেন, এবং সাংখ্যযোগ বিচার করেন, তিনি দ্বিজব্রাহ্মণ। যিনি সম্মুখযুদ্ধে ধনুর্ধারী বিপক্ষদিগকে পরাজয় করেন, তিনি ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ। যিনি কৃষিকার্য্য গোপালন ও বাণিজ্যব্যবসায় অবলম্বন করেন, তিনি বৈশ্যব্রাহ্মণ। যিনি লাক্ষা, লবণ, কুসুম্ভ, ক্ষীর, ঘৃত, মধু ও মাংস বিক্রয় করেন, তিনি শূদ্র-ব্রাহ্মণ। গূঢ়চর-কার্য্যে ব্যাপৃত, তস্কর, অন্যের দোষানুসন্ধান-নিরত, দংশক এবং মৎস্যমাংসভক্ষণে সর্ব্বদা লুব্ধ ব্রাহ্মণ নিষাদ বলিয়া কথিত হয়। ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না, অথচ কেবল যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ্যের অভিমানকারী ব্রাহ্মণ পশু নামে কথিত হয়। বাপী, কূপ, তড়াগ, উপবন ও সরোবর এই সকলের অবরোধকারী ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ বলিয়া উক্ত হয়। ক্রিয়ারহিত মূর্খ (সার্থ-গায়ত্রীরহিত) সর্ব্বধর্ম্মরহিত ও সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াশূন্য বিপ্র চাণ্ডাল বলিয়া বিবেচিত হয়।

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥
সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্যদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদারতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥
অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥
কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥
লাক্ষালবণসংমিশ্রকুসুম্ভ-ক্ষীর-সর্পিষঃ।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥
চারশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥
বাপীকূপ-তড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥

এই সমস্ত বচনের অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মবীজ হইতে ব্রহ্মযোনিতে উৎপত্তিনিবন্ধনই সাধারণ ব্রাহ্মণত্ব জন্মে,বৈদিক সংস্কারের দ্বারা এবং তপঃ প্রভৃতির দ্বারা সেই ব্রাহ্মণ্যের পরিপুষ্টি ও বিকাশ হয় মাত্র। এই বিষয়ে ঋষিদিগের অভিমত সমীচীন দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। পরাশর বলিয়াছেন যে, চিত্রকর্ম্ম (অঙ্কিত চিত্র) যেমন অনেকগুলি অঙ্গের দ্বারা ক্রমে ক্রমে উন্মীলিত অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যযুক্ত হয়, তেমনই জাতিগত ব্রাহ্মণ্যও বৈদিক সংস্কার প্রভৃতির দ্বারা উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। এই বচনের অর্থ মাধবাচার্য্য অতীব বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—চিত্রকর যেমন পত্র প্রভৃতি অঙ্কিত করিতে হইলে প্রথমতঃ কেবল কালির রেখার দ্বারা সর্ব্বাবয়বপূর্ণ মনুষ্য প্রভৃতির আকার আঁকিয়া লয়, কিন্তু কেবল রেখাপাতের দ্বারা এই আকৃতির সৌন্দর্য্য সম্পন্ন হয় না, অতএব পুনরায় তাহাতে যথাস্থানে নানাপ্রকার বর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া থাকে এবং তাহাতেই চিত্রের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, তেমনই ব্রাহ্মণ-যোনিতে উৎপত্তি হইলেই জাতিব্রাহ্মণ্যও প্রথম সম্পূর্ণ বিকশিত হয় না, কিন্তু যথোচিত সংস্কার বেদপাঠ ও তপশ্চর্য্যা প্রভৃতির দ্বারা ক্রমে উন্মেষ প্রাপ্ত হয়। ইহার অনুরূপ বচন অঙ্গিরাও বলিয়াছেন।

চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বদ্ধি সংস্কারৈর্মন্ত্রপূর্ব্বকৈঃ॥

চিত্রকরঃ প্রথমং পটাদৌ মসীরেখাভিঃ সর্ব্বাবয়বপূর্ণানি মনুষ্যাদিরূপাণি লিখতি। নচ তানি তাবতা দর্শনীয়ত্বমাপদ্যন্তে। পুনস্তান্যেব রূপাণি নানাবিধবর্ণপ্রক্ষেপেনৈবোন্মীলিতানি দর্শনীয়তামাপদ্যন্তে, এবং জাতিব্রাহ্মণ্যং শাস্ত্রীয়সংস্কারৈরুৎকৃষ্যতে। মন্ত্রসংস্কারেণ বিদ্যাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে।

অতএবাঙ্গিরাঃ ("জন্ম-শরীর" ইত্যাদি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।)

চিত্রং কর্ম্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্ব্বকৈঃ॥

১৭১ পৃ ২য় খণ্ড পরাশর মাধব।

ঋষিরা প্রত্যেকেই প্রায় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতির জীবিকার বিষয় বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের উপদেশমত চলিতে পারিলে বোধহয় সমাজের বর্ত্তমান এই শোচনীয় অবস্থা হইত না। মনু প্রভৃতি কতিপয় ঋষির সংহিতায় অনাপদ্ধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম, এই দুই প্রকার ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধর্ম্ম শব্দের অর্থ সময়োচিত আচরণ। অনাপদবস্থায় যে বৃত্তি বা জীবিকা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, আপদবস্থায় তাহাই আবার অবলম্বনীয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মনু ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, অনাপদবস্থায় ব্রাহ্মণ এমন বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, যাহাতে অন্যের পীড়া না হয়, অথবা অল্প পীড়া হয়। অতঃপর ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত ও সত্যানৃত এই প্রকার বৃত্তির বিধান করিয়া সেবাকে কুক্কুরের বৃত্তি নামে উল্লেখপূর্ব্বক উহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মতে "উঞ্ছ ও "শিল" এই দুইটি বৃত্তির নাম "ঋত"। এক-একটি করিয়া ক্ষেত্র হইতে কৃষকের পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রহ "উঞ্ছ" এবং ছড়া ধরিয়া সংগ্রহ করা "শিল"। কাহাকেও প্রার্থনা করা হয় নাই, এমত অবস্থায় নিজ সমীপে ভোগার্থ উপস্থিত বস্তুর নাম অমৃত। যাচ্ঞার দ্বারা অন্য হইতে সংগৃহীত বস্তুর নাম "মৃত", কারণ ইহাতে (প্রার্থয়িতার) মরণতুল্য যাতনা অনুভূত হয়। কৃষিকর্ম্মের নাম "প্রমৃত", কারণ ইহাতে অনেক প্রাণীর প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। বাণিজ্যের নাম "সত্যানৃত", কারণ এই ব্যাপারে প্রায়ই সত্য ও মিথ্যা বাক্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "তেন চৈবাপি" এই চ-শব্দের দ্বারা কুসীদও গৃহীত হইয়াছে। অস্বয়ংকৃত অর্থাৎ অন্যের দ্বারা সম্পাদিত কৃষি বাণিজ্য ও কুসীদের দ্বারাও জীবন ধারণ করিবে। সেবা কুক্কুরের বৃত্তির তুল্য, তাহা নিতান্তই পরিত্যাগ করিবে। "কুশূলধান্যক" অথবা "কুম্ভীধান্যক" হইবে, তিনদিনের উপযুক্ত খাদ্য সংগ্রহকারী হইবে, অথবা "অশ্বস্তনিক" হইবে, অর্থাৎ আগামী দিবসের জন্য কিছুই সংগ্রহ করিয়া রাখিবে না। (কলিতে গৃহস্থের অশ্বস্তনিকতা নাই, ইহা পরাশরভাষ্যে প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।)

এই চারি প্রকার গৃহস্থের মধ্যে ক্রমশঃ পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, কারণ বৃত্তির সঙ্কোচে অর্থাৎ অল্পতায় পুণ্যের আধিক্য হয়, তাহাতে স্বর্গাদি লোক লাভ করা যায়।

অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ।
যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি॥৪।২
যাত্রামাত্রপ্রসিদ্ধ্যর্থং স্বৈঃ কর্ম্মভিরগর্হিতৈঃ।
অক্লেশেন শরীরস্য কুর্ব্বীত ধন-সঞ্চয়ন্॥৩
ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥৪
ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতম্।
সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে॥
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।
কুশূলধান্যকো বা স্যাৎ কুম্ভীধান্যক এব বা।
ত্র্যৈহিকো বাপি ভবেদশ্বস্তনিক এব বা।

চতুর্ণামপি চৈতেষাং দ্বিজানাং গৃহমেধিনাম্।
জ্যায়ান্ পরঃ পরো জ্ঞেয়ো ধর্ম্মতো লোকজিত্তম॥
৪ অ।৮॥

যে পরিমাণ ধান্যাদি দ্বারা তিন বৎসর অথবা তাতোধিক কাল পোষ্যবর্গের পোষণ হইতে পারে, তৎপরিমাণ ধান্যযুক্ত মানুষ "কুশূল ধান্য" নামে অভিহিত হইয়াছে। ষন্মাসোপযোগী ধান্যের নাম "কুম্ভীধান্য"। মহর্ষি মনু চতুর্থাধ্যায়ে সুস্থাবস্থায় ব্রাহ্মণের অবলম্বনীয় বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দশমাধ্যায়ে আপদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ আপৎকালে অবলম্বনীয় জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি তথায় বলিয়াছেন যে, বিদ্যা, শিল্প, ভৃতি, সেবা, গোরক্ষণ, বিপণি কৃষি, ধৃতি, ভৈক্ষ ও কুসীদ এই দশটি জীবনের হেতু অর্থাৎ এই সকল বৃত্তির মধ্যে যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আপৎকালে জীবন রক্ষা করিবে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় মহামতি কুল্লূকভট্ট বলিয়াছেন, যে, এই বচনটি আপৎপ্রকরণে পঠিত হইয়াছে, বিদ্যা প্রভৃতি জীবনের হেতু এ কথাও বলা হইয়াছে; সুতরাং অনাপদবস্থায় ইহাদের মধ্যে যে জাতির পক্ষে যে বৃত্তি নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, আপদবস্থায় তাহারই পক্ষে সেই বৃত্তির অভ্যনুজ্ঞা অর্থাৎ অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। যেমন ব্রাহ্মণের পক্ষে সেবা প্রভৃতি। শিল্পাদি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইস্থানে বিদ্যাশব্দে বেদবিদ্যার অতিরিক্ত বৈদ্যক (আয়ুর্বেদ) তর্কবিদ্যা ও ভূতবিষাপনয়নাদি বিদ্যা আপদবস্থায় সকলেরই জীবিকারূপে অবলম্বনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শিল্পশব্দের অর্থ লিখন প্রভৃতি। ভৃতি (আজ্ঞাবাহকরূপে বেতন গ্রহণ) সেবা (পরের আজ্ঞাসম্পাদন) গো রক্ষন (পশু পালন) বিপণি (বাণিজ্য) কৃষি (স্বয়ংকৃত চাষবাস) ধৃতি (সন্তোষ উহা থাকিলে মানুষ অত্যল্প বস্তুর দ্বারাও বাঁচিতে পারে) ভৈক্ষ্য (ভিক্ষাসমূহ) কুসীদ (বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ)।

বিদ্যা শিল্পংভৃতিঃ সেবা গোরক্ষং বিপণিঃ কৃষিঃ।
ধৃতি র্ভৈক্ষ্যং কুসীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ।১।১১৬।

বিদ্যেতি আপৎপ্রকরণাজ্জীবনহেতব ইতি নির্দ্দেশাৎ, এষাং মধ্যে যয়া বৃত্ত্যা যস্যানাপদি জীবনং নিষিদ্ধং তস্য তস্যাপদ্যভ্যনুজ্ঞায়তে। যথা ব্রাহ্মণস্য ভৃতি সেবাদি। এবং শিল্পাদাবপি জ্ঞেয়ং। বিদ্যা বেদবিদ্যাব্যতিরিক্তা বৈদ্যকতর্ক বিষাপনয়নাদিবিদ্যা সর্ব্বেষামাপদি জীবনার্থং ন দুষ্যতি। শিল্পং লিখনাদিকরণম্। ভৃতিঃ প্রেষ্যভাবেন বেতনগ্রহণম্। সেবা পরাজ্ঞাসম্পাদনম্। গোরক্ষং পশুপালনম্। বিপণির্বাণিজ্যং। কৃষিঃ স্বয়ংকৃতা। ধৃতিঃ সন্তোষঃ। তস্মিন্ সতি অল্পকেনাপি জীব্যতে। ভৈক্ষ্যং ভিক্ষাসমূহঃ। কুসীদং বৃদ্ধ্যা ধনপ্রয়োগঃ। স্বয়ংকৃতোঽপি ইত্যেভির্দশভিরাপদি জীবনীয়ম্।

মহর্ষি গৌতম অতি সুস্পষ্ট ভাবে আপদ্ধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মসূত্রের কিয়দংশ এইস্থলে উদ্ধৃত হইল "সর্ব্বথা বৃত্তিরশক্তাবশৌদ্রেণ" ৭ম অ ২২ সূ। যে কয়েকটি প্রকার বলা হইল, উহার দ্বারা পোষ্যবর্গের পোষণব্যাপার অসম্ভব হইলে উক্ত সর্ব্বপ্রকার নিষিদ্ধ বৃত্তিও অবলম্বন করিবে। অন্যান্য সমস্ত বৃত্তি অবলম্বন করিলেও শূদ্রের বৃত্তি সেবা কিছুতেই স্বীকার করিবে না।

কিন্তু অত্যন্তাপদবস্থায় শূদ্রবৃত্তি স্বীকারের ব্যবস্থাও ঋষি করিয়াছেন, "তদপ্যেতে প্রাণসংশয়ে" ৭।২৩। কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে "শূদ্রবৃত্তি"ও অবলম্বন করিবে। কিন্তু প্রাণসঙ্কটাবস্থায় শূদ্রবৃত্তি আশ্রয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার, এরূপস্থলে কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করিতে হইবে, সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ত্রিকালদর্শী মহর্ষি সে কথা বলিতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি উপদেশ করিয়াছেন, "তদ্বর্ণসঙ্করাভক্ষ্যনিয়মস্তু"।৭।২৪। শূদ্রবৃত্তিস্থিত হইয়াও ব্রাহ্মণ শূদ্রবর্ণের সহিত একত্র উপবেশন পরস্পর অঙ্গসংমেলন প্রভৃতি সঙ্কর ও অভক্ষ্য লশুন প্রভৃতি ভক্ষণ করিবে না।* আমি শূদ্রবৃত্তি হইয়াছি, আমার আর ভক্ষ্যাভক্ষ্য প্রভৃতির বিচার কি? এই কুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যথেষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইবে না।

নিয়মো বর্ত্তনম্। শূদ্রবৃত্তিস্থিতেনাপি ব্রাহ্মণেন ন শূদ্রবর্ণেন সহাসনাঙ্গসংমেলনাদিসঙ্করং: অভক্ষ্যঞ্চলশুনাদি, তদুভয়বর্জ্জনং কর্ত্তব্যম্। নতু শূদ্রবৃত্তিরস্মীতি যথাকাম্যামতি। মিতাক্ষরা টীকা হরদত্তকৃতা।

আপদবস্থায় নিন্দিত বৃত্তি অবলম্বন করিলেও আপদুত্তরণের সঙ্গে সঙ্গেই উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে তবে রাজা এবং বহুবিদ্য ব্রাহ্মণ তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন।

ঋষি এ কথাও বলিয়াছেন—"দ্বৌলোকে ধৃতব্রতৌ রাজা ব্রাহ্মণশ্চ বহুশ্রুতঃ" ৮।১। প্রত্যেক দেশেই রাজা এবং বহুবিদ্য ব্রাহ্মণ সমস্ত প্রজার কর্ম্মব্যবস্থা করিবেন। রাজা দণ্ডের দ্বারা ও ব্রাহ্মণ উপদেশের দ্বারা সকলের সকল প্রকার আপৎ নিবারণ করিবেন।

* এই বিধি সে সময়ের উপযোগী ও হিতকর হইলেও বর্ত্তমানে কতদূর উপযোগী ও মঙ্গলজনক তাহা বিচার্য্য। তং সং

ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

দম্ভভাবে কত রবে হও সাবধান।
কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান।
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে,
মুগ্ধ হয়ে নিজ দোষ না কর সন্ধান।
রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি
অথচ অমর বলি মানে মনে ভান।
অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও,
অবশ্য মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান॥

কথা—রাজা রামমোহন রায়
সুর—৺ বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্বরলিপি—শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ২´ ৩ ০
{ মা ণদা II -া দা পা মা। পা মা -া পগা। -া গা -ঋা -া। সা -া -া সা I
দ ম্ভ০ ০ ভা বে ০ ক ত ০ ০০ ০ র ০ ০ বে ০ ০ ০ হ

১ ২´ ৩ ০
I ঋা মা মা গা। মা দা -া -া। -া দদা পমা গা। মা গা } -া পা I
ও সা ব ০ ধা ০ ০ ০ ০ ন০ ০০ ০ ০ ০ ০ কে

১ ২´ ৩ ০
I দা দা র্সা না। র্সা র্সা -া -া। -া নর্সা গা -দা। পা -া -া পা I
ন এ ০ ত ত মো ০ ০ ০ গু০ ণ ০ ০ ০ ০ কে

১ ২´ ৩ ০
I দা ণদা ণদা পা। পমা ণদা -া দা। -া দদা -পমা গা। -মা -গা মা ণদা II
ন এ০ ০০ ত অ০ ভি০ ০ মা ০ ন০ ০০ ০ ০ ০ দ ম্ভ০

১ ২´ ৩ ০
-া পা II দা দা র্সা না। র্সা র্সা -া -া। র্সা না র্সা র্সা। -া -া -া দা I
০ কা ম ক্রো ০ ধ লো ভ ০ ০ মো ০ ০ হে ০ ০ ০ প

১ ২´ ৩ ০
I দা না র্সা র্সা। র্ঋা র্ঋা -া র্সর্সা। -া নর্সা গা -দা। -পা -া -া পা I
র নি ০ ন্দা প র ০ ০০ ০ দ্রো০ হে ০ ০ ০ ০ মু

১ ২´ ৩ ০
I দা দা র্ঋা র্সা। র্সনা র্সা -া -া। -া নর্সা গা -দা। পা -া -া পা I
গ্ধ হ ০ য়ে নি০ জ ০ ০ ০ দো০ ষ ০ ০ ০ ০ না

১ ২´ ৩ ০
I দা গা দা পা। পা দা -া -া। -া দদা পমা গা। মা গা মা ণদা II
ক র ০ স ন্ধা ০ ০ ০ ০ ন০ ০০ ০ ০ ০ "দ ম্ভ০"

১ ২´ ৩ ০
-া সা II সা সা -া ঋা। মা মা -া -া। -া মা মা -া। গা -া -া মা I
০ রো গে তে ০ কা ত র ০ ০ ০ অ তি ০ ০ ০ ০ শো

১ ২´ ৩ ০
I মা গা মা পা। পা দপা ণা দপা। -া দা পা -া। -দা -মা -া পা I
কে ০ তে ব্যা কু ল০ ০ ০০ ০ ম তি ০ ০ ০ ০ অ

১ ২´ ৩ ০
I দা দা -র্সা না। র্সা র্সা -া -া। -া নর্সা ণা দা। পা -া -া পা I
থ চ- ০ অ ম র ০ ০ ০ ব০ লি ০ ০ ০ ০ মা

১ ২´ ৩ ০
I দা ণা দা পণা। -া -া -া দা। -া -া দদা পমা। গা মা -া { পা I
নে ম নে ০০ ০ ০ ০ ভা ০ ০ ন০ ০০ ০ ০ ০ অ

১ ২´ ৩ ০
I দা দা র্সা না। র্সা র্সা -া -া। র্সা না র্সা -া। -া -া -া দা I
ত এ ০ ব ন ভ্র ০ ০ হ ০ ০ ০ ০ ০ ও স

১ ২´ ৩ ০
I দা না র্সা র্সা। ঋা ঋা -া র্সর্সা। -া নর্সা ণা দা। পা -া -া } দা I
বি ন ০ য় বা ক্য ০ ০০ ০ ক০ ০ ০ ০ ০ ও অ

১ ২´ ৩ ০
I দা দা ঋা র্সা। র্সনা র্সা -া -া। -া নর্সা ণা দা। পা -া -া পা I
ব শ্য ০ ম রি০ বে ০ ০ ০ জা০ নি ০ ০ ০ ০ স

১ ২´ ৩ ০
I দা ণা ণদা পণা। -া -া দা -া। -া দদা পমা গা। মা গা মা ণদা II II
ত্য ক র০ ০০ ০ ০ ধ্যা ০ ০ ন০ ০০ ০ ০ ০ "দ ত্ত০"

৺ প্রতিভা দেবীর স্মৃতি, উৎসবে।

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

যে দেবীর বর-পুত্রী ছিলে তুমি দেবি,
কাটাইলে আজীবন যাঁর পদ সেবি',
মিলেছি আমরা তাঁর অর্চ্চনার তরে,
আজিকে নয়নে কিন্তু শুধু অশ্রু ঝরে।
উৎসবে বাজিতে গিয়া কেঁদে ওঠে বীণা,
সকল এবে অন্ধকার তব সঙ্গ বিনা।
জানি না কোথায় তুমি, আছ কত দূরে,
পশে কি না পশে কাণে ক্ষীণ মর্ত্ত্য সুর ;
যেথা থাক সুখে থাক এ মোর প্রার্থনা,
শান্তিধামে লভ' শান্তি এ মোর কামনা।
সৌম্য মূর্ত্তি নেত্র-পথে যদি অদর্শন,
স্মৃতিপটে সদা তারে করিব রক্ষণ,
—যে বৃক্ষ রোপিলে তুমি—করিব সেচন ॥

কথা—ইন্দিরা দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২´ ৩ • ১ ২´ ৩
II সা সা। দা -া দা। দা দা। পা -া দপা I মা পা। মপা -দণা ণা।
যে, দে বী • র ব র পু • ত্রী• ছি লে তু• •• মি

• ১ ২´ ৩ • ১
। দপা -া। মপা -মজ্ঞা -া I জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা -মা মা। জ্ঞা জ্ঞা। ঋা -া সা I
দে• • বি •• • কা টা ই • লে আ জী ব • ন

২´ ৩ • ১ ২´ ৩ •
I সা সা। সা -ঋা ণ্া। সা -া। সা -া -া I সা সা। মদা -া দা। দা ণা।
যাঁ র প • দ সে • বি • • মি লে ছি • আ ম রা

১ ২´ ৩ • ১ ২´
। র্সা -া র্সা I র্ঋা র্ঋা। র্ঋা -া ণা। র্সা -া। র্সা -া -া I পা পা।
তাঁ • র অ র্চ্চ না • র ত • রে • • আ জি

৩ • ১ ২´ ৩ •
। পদা -ণা ণা। দা পা। মপা -মজ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা। মা -া মা। মা -জ্ঞা।
কে• • ন য় নে কি• •• ন্তু শু ধু অ • শ্রু ঝ •

১
। ঋা -সা -া II
রে • •

২´ ৩ • ১ ২´ ৩
II সা সা। সা -া সা। ঋা জ্ঞা। মা মা -া I জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা -রা মা।
উৎ স বে • বা জি তে গি য়া • কেঁ দে ও • ঠে

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| জ্ঞা -ঋা | ঋা -া -া I সা ণ্দা | দা -ণা দা | দা পা | মা -জ্ঞা -ঋা I
বী ০ ণা ০ ০ স ব এ ০ বে অ ন্ধ কা ০ র্

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I সা ঋা | জ্ঞা -মা মা | মা -জ্ঞা | ঋা -সা -া I ণ্দা মা | দা -া ণা |
ত ব স ০ জ বি ০ না ০ ০ জা নি না ০ কো

০ ১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
| র্সা র্সা | র্সা -া র্সা I র্সা র্সা | র্ঋা -া ণা | র্সা -া | -া -া -া I পা পা |
থা য় তু ০ মি আ ছ ক ০ ত দূ ০ ০ ০ র্ প শে

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
| দা -ণা ণা | দা পা | মা -জ্ঞা মা I পা দণা | দা -পা মা | মা -জ্ঞা |
কি ০ মা প শে কা ০ পে ক্ষী ণ ০ ম ০ র্ত্ত্য সু ০

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
| -ঋা -া সা I সা সা | সা -া ঋা | জ্ঞা জ্ঞা | মা -া মা I জ্ঞা জ্ঞা |
০ ০ র্ খে থা থা ০ কো সু খে থা ০ কো এ, মো

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
| জ্ঞা -া মা | জ্ঞা -ঋা | ঋা -সা -া I সা দা | দা -ণা দা | দা পা |
র ০ প্রা র্থ ০ না ০ ০ শা ন্তি ধা ০ মে ন ভ

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
| মা -জ্ঞা মা I পা মা | জ্ঞা -া মা | মা -জ্ঞা | ঋা -সা -া I দা মা |
শা ০ ন্তি এ, মো র ০ কা ম ০ না ০ ০ সৌ ম্য

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
| পা -া দা | ণা র্সা | র্সা -া র্সা I র্ঋা র্ঋা | র্ঋা -া ণা | র্সা -া |
মূ ০ র্ত্তি নে ত্র প ০ থে য দি অ ০ দ র্শ ০

১ ২´ ৩ ০ ১ ২´
| -া -া -া I পা পা | পা -ণা দা | পা পা | মা -জ্ঞা মা I পা ণা |
০ ০ ন্ স্মৃ তি প ০ টে স দা তা ০ রে ক রি

৩ ০ ১ ২´ ৩ ০
| দা -া পা | মা -জ্ঞা | -ঋা -সা -া I { ঋা সা | ণ্া -দ্া ণ্া | সা ঋজ্ঞা |
ব ০ র ক্ষ ০ ০ ০ ন্ যে রূ ক্ষ ০ রো পি লে

১ ২´ ৩ ০ ১
| রা জ্ঞা -া I ঋা সা | সা -ঋা ণ্া | সা -া | -া -া -া } II II
তু মি ০ ক রি ক্ষ ০ মে চ ০ ০ ০ ন্

———

বিপদ।

(কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ)

বিপদ তুমি আস যদি পঙ্গপালের মত
তোমায় ভয় করিনা আর,
তোমায় কর্‌ব নমস্কার,
আদর করে' লব ডেকে মাথা করি নত !
তোমায় বস্‌তে দেব শ্রেষ্ঠ আসন,
অর্ঘ্য রচি' মনের মতন—
পূজ্‌ব তোমার চরণ দু'টী ওগো অভ্যাগত !

বিশ্বনাথ।

(আসাম-পর্য্যটক শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী)

বিশ্বনাথ বর্ত্তমান আসাম প্রদেশের একটী প্রাচীন ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। ইহা তেজপুর হইতে ২০ মাইল পূর্ব্বে এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তটদেশে দরঙ্গ জেলায় অবস্থিত। এই স্থানের নামাকরণ সম্বন্ধে দুইটী মত প্রচলিত। এক পক্ষের মতে বলিপুত্র বাণরাজ এই স্থানে ৺বিশ্বনাথ নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করায় বিশ্বনাথ নামকরণ হইয়াছে। অন্য পক্ষের মতে রাজা বিশ্বকেতুর এখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেই নাম হইতে ঐ স্থানের নাম হইয়াছে বিশ্বনাথ। রাজা বিশ্বকেতু এখানে একটী মন্দির ও তন্মধ্যে এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই স্থানের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকেই ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত এবং অপর দুই দিকে গড়ের চিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান। এককালে বহুসংখ্যক নৃপতি এখানে রাজদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। এখানকার ও পারিপার্শ্বিক স্থানচিচয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দর্শকাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই স্বীকার করিতেই হইবে যে বিশ্বনাথ রাজধানী সুরক্ষিত রাখিবার প্রকৃষ্ট স্থান। এখান হইতে ১০ মাইল দূরে একটী গড় অদ্যাবধি বিদ্যমান। কথিত আছে, উহা প্রতাপ রাজারই গড়। রাজা প্রতাপচন্দ্র জিতারি বংশীয় ধর্ম্মপাল নামক জনৈক ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসীর কনিষ্ঠ পুত্র। এই গড়ের মধ্যে এক্ষণে প্রতাপগড় নামক একটী প্রকাণ্ড চা-বাগান গঠিত হইয়াছে। বিশ্বনাথ স্থানটী ইহার অদূরস্থ চা ক্ষেত্রের জন্য ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। এখানে একটী পোষ্টঅফিস ও কয়েক জন কাঁইয়ার বড় বড় দোকান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাঁইয়াদের মধ্যে শ্রীযুক্ত চণ্ডুলাল আগরওয়ালার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৭ আইন দ্বারা অব্দে ১৯১৫-১৬ সালে এখানকার ৺বিশ্বনাথ বিগ্রহটী গভর্ণমেণ্টের রক্ষিত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ৺বিশ্বনাথ যে সুগভীর পর্ব্বতগুহায় অবস্থান করেন যোগিনী তন্ত্রে তাহা "মৈনাক" নামে উল্লিখিত—মৈনাকে বিশ্বনায়ক। কালিকাপুরাণে বিশ্বনাথের উল্লেখ আছে :—

> বৃদ্ধগঙ্গাজলস্যান্তস্তীরে ব্রহ্মসুতস্য বৈ।
> বিশ্বনাথহবয়ো দেব শিবলিঙ্গ সমন্বিতঃ ॥ ২৩
> (অশীতিতমঅধ্যায়)

অর্থাৎ "বৃদ্ধগঙ্গার জলমধ্যে ব্রহ্মপুত্রের তীরে বিশ্বনাথ নামে শিবলিঙ্গ অবস্থিত।" বিগত ১৯২০ অব্দের ২৬ শে অক্টোবর তারিখে লেখক উক্ত স্থানে শ্রীযুক্ত ডিম্বেশ্বর শর্ম্মার নিকট "নন্দী সংহিতা" নামক একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি দেখিয়াছিলেন। তাহাতে ৺বিশ্বনাথের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

> চতুস্ত্রিংশৎ শকাব্দেতু কুবাচ গত রাষ্ট্রকে।
> তস্মিন্‌কালে সমুৎপত্তি বৃদ্ধগঙ্গা সমীপত ॥
> বিশ্বনাথং ভৈরবঞ্চ তথা মঙ্গল চণ্ডিকাং।
> লৌহিত্য সোত্তর গতাং গঙ্গাঞ্চ মণিকর্ণিকাং ॥
> লিঙ্গার্দ্ধ সংষ্ট শ্রীবিষ্ণু অন্নপূর্ণাঞ্চ মাতৃকাং।

* * * *

এখানকার পাণ্ডারা বিশ্বনাথকে "বালাকাশী" বলিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে অনেক পৌরাণিক বিবরণও পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মৈনাক শৈলস্থ গভীর গহ্বর মধ্যে ৺বিশ্বনাথ নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই অনুচ্চ শৈলটী বৃদ্ধ গঙ্গা (বুড়িগাং) ও ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। বৃদ্ধ গঙ্গা এক্ষণে ক্ষীণস্রোতা। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত মৈনাক শৈল জলমধ্যে

নিমজ্জিত থাকে; তৎপরে ক্রমে ক্রমে জল অপসারিত হয়। একারণ ১লা মাঘ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ঐ দেবের বিষয়ভোগী ব্রাহ্মণ দ্বারা ৺বিশ্বনাথের পূজা হয়। মাঘসংক্রান্তির দিন ৺বিশ্বনাথের উৎসব হইয়া থাকে। ঐ দিন তাঁহাকে পরপারে বিশ্বনাথ নামক স্থানে ৺শিবনাথ নামক দেবালয়ে স্থানান্তরিত করা হয়। উৎসবকালে এখানে নেপালী, অসমীয়া ও বাঙ্গালী যাত্রিগণে সমাগম হয়। বর্ত্তমানে উৎসব তেমন আড়ম্বরপূর্ণ হয় না। ৺বিশ্বনাথের যে সম্পত্তি আছে, তাহা হইতে এই উপলক্ষে কিঞ্চিৎ ব্যয় করা হয়।

বিশ্বনাথে সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত চণ্ডুলাল আগরওয়ালা মহোদয়ের বাটীতে স্থানীয় ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহার্থ অবস্থানকালে ধ্বংসোন্মুখ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দেবমন্দিরসমূহের দর্শনে এবং কতকগুলির বিলোপপ্রাপ্তির সংবাদে উহাদের ঐতিহাসিক বিবরণ অবগত হইবার জন্য আমার সাতিশয় কৌতূহল জন্মে। বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন সংবাদ প্রাপ্তিতে পরিতৃপ্তি না হওয়ায় প্রাচীন পুঁথি, আবিষ্কৃত তাম্রশাসন, প্রস্তরলিপি, ইষ্টকলিপি প্রভৃতির অনুসন্ধান লইতে লাগিলাম। এই সময় ৺বিশ্বনাথের পাণ্ডা শ্রীযুক্ত ডিম্বেশ্বর শর্ম্মা বড় ঠাকুর মহোদয়ের সহিত সৌভাগ্যক্রমে আমার পরিচয় হয়। প্রথমে তিনি আমাকে আসাম সরকার তরফের লোক ভাবিয়া দ্বিধাভাব প্রকাশ করেন। অতঃপর বিবিধ কথাপ্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম যে, আসাম গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহার (Circular) অনুসারে ১৮৯৬ অব্দে তিনি তেজপুর মহকুমার Deputy Collector শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর নিকট অহম ভাষায় উৎকীর্ণ যে তাম্রশাসনখানি প্রদান করেন, চৌধুরী মহাশয় তৎকালীন কৃষি ও ভূমিবিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত গেইট সাহেবের নিকট তাহা পাঠাইয়াছিলেন। গেইট মহোদয় ঐ ফলকখানির ভাষান্তরার্থ জোড়হাটের Deputy Inspector এর নিকট প্রেরণ করেন।

তাম্রফলকটীর পুনঃপ্রাপ্তিতে অত্যধিক বিলম্ব ঘটায় ১৯০৬ অব্দের ১২ই জুলাই তারিখে শ্রীযুক্ত ডিম্বেশ্বর শর্ম্মা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্র (petition) প্রেরণ করেন। উহার ফলে ১৯০৯ সালের ৩রা জুলাই তারিখে তেজপুরের Deputy Commissioner এর পক্ষে শ্রীযুক্ত অভয়চন্দ্র সেন তাঁহাকে পত্রের (P. No. D. 6 6 7—09) দ্বারা জানান,—"প্রেরিত ফলকের একখানি ইংরাজী অনুবাদ ও অহম ভাষায় নকল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বড়ুয়ার নিকট প্রাপ্তব্য। উহা এখনও ছাপা হয় নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় ঐ ফলক হারাইয়া গিয়াছে। উহার জন্য আপনাকে কোন রকম সন্তোষ করা যাইবে লিখিলাম"।

ইংরাজী নকলে ৮০ পুরার উল্লেখ দেখিলাম। শ্রীযুক্ত ডিম্বেশ্বর মহোদয় আমাকে বলেন যে, ঐ তাম্রফলকে ৮৪ পুরা উৎকীর্ণ ছিল।

অহমরাজ শ্রীগদাধর সিংহ ৺বিশ্বনাথের পাদপদ্মে ঐকান্তিক ভক্তিমান হইয়া তাঁহার সেবার জন্য কিরূপ বিপুল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত ডিম্বেশ্বর শর্ম্মার অধিকারভুক্ত অসমীয়া ভাষায় উৎকীর্ণ দুইখানি তাম্রফলক তাহার একমাত্র জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। তদীয় সৌজন্যে উহাদের অনুলিপি মৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া বঙ্গাক্ষরে (অসমীয়া ভাষার "র ও য়" বাঙ্গালায় অন্যরূপ বলিয়া) যথাযথ বিবৃত হইল:—

১ নং তাম্রফলক।*

শ্রীশ্রীস্বর্গদেনারায়ণ দেব সৌমারেশ্বর শ্রীগদাধর সিংহ মহারাজার আজ্ঞারে শ্রীবিশ্বনাথের সমস্তে অলঙ্কার ন করি গড়াই দিয়ে নারায়ণ কমলাবর ঠাকুর হাতত সোনার কোসা ২, রুপর কোসা ৪, তামর হারি (১) ৪ অর্ঘা ২ ঘণ্টা ২ দীর্ঘা ২ শংখ্য ২ বামুন ৪ সুদ্র ৪০ নতিনী ৮ শক ১৬০৭ বৈশাখৎ বেজদলৈ নাতি উত্তালিব বর কাকতী ঋদিয়ানন্দ বলরাম নারায়ণক মাটি ২৬ পুয়া (২) মানুহ ২ গোট প্রবর্ত্তি বলৈ।

২ নং তাম্রফলক।*

স্বস্তিঃ শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বর পদাম্বুজ মধুকর মলধর

* প্রশস্তিতে সপ্তম পংক্তি। (১) হারি—কলস। (২) পুরা—আমাদের দেশে ৩ বিঘা ২ কাঠার সমতুল্য। (৩) গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী—ডিম্বেশ্বর শর্ম্মা বড়ঠাকুরের ইনি আদি পুরুষ। ইঁহার বাটী ছিল নদীয়ায়। অহমরাজ ইঁহাকে তথা হইতে আনেন। ইঁহারা পার্ব্বতীয় গোঁসাইয়ের শিষ্য। (৪) মানুহ—ঘর মানুষ। (৫) নিবন্ধকৈ—বন্দোবস্ত করিয়া। (৬) গরিয়া—মুসলমান (৭) দোম—ধীবর। (৮) ভেত্তেরি বিল—এই বিল বিশ্বনাথ হইতে উত্তর দিকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এখন উহার নাম হইয়াছে "গেরে কি বিল"। (৯) মরবর পথার—একখণ্ড শস্যশালিনী জমী।

সোদর যশোরাশি পরিপূরিত দিগন্তর নিরন্তর বাসববংশবতংশ শ্রীস্বর্গদেব শ্রীগদাধর সিংহ নরেন্দ্রেন স্বর্ণ মকর কুণ্ডল যজ্ঞোপবিতাদিরলঙ্কৃত্য শ্রীবিশ্বেশ্বরপূজন কর্ম্মণি শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী (৩) বিপ্রঃ নিয়োজিতঃ ব্রাহ্মণক পোষণার্থে দেবালয়রে ৪ মানুহ (৪) নিবন্ধকৈ (৫) দিয়ারে বঙ্গাল মানুহ গরিয়া (৬) ৩ দোম (৭) ১ তেতেরি বিল (৮) ১ ময়বর পথার (৯) ৬০ পুরামাটী উৎসর্গকে দিলেঁ। শক ১৬০৬ মহীপতিঃ শ্রীগদাধর সিংহ নামাত্মবির্য্য প্রার্থয়িতেন এষা দত্তা ময়া। ব্রাহ্মণবৃত্তিরেষা যদাত্মবস্তিঃ পরিপালনীয়া।

নানা-কথা।

মহাত্মা গান্ধীর কারাবাস। যাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা তাঁহারাই ঋষি বলিয়া অভিহিত। আধ্যাত্মিক সত্য ঋষির চিদাকাশে আপনা হইতেই প্রতিফলিত হয়। দেশের প্রকৃত কল্যাণ কোন্ পথে কি ভাবে আবিভূত হইবে, তাহার পূর্ব্বাভাস যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিপ্রভাবে বহুপূর্ব্ব হইতে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট দেখিতে পান, তাঁহাদিগকেও ঋষি বলিয়া অভিহিত করিতে কাহারও কুণ্ঠা থাকিতে পারে না। আমরা বলি মহাত্মা গান্ধি ঠিক এই শ্রেণীরই অন্তর্ভূত। তিনি কেবল মহাত্মা নহেন, তিনি একজন ঋষি। তাহার উপর তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ, অনন্যাসাধারণ সংযম, তাঁহার অনুপম বিশ্বপ্রেম, নিজ নিষ্কলঙ্ক জীবনের প্রভাব, হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ের উপর তাঁহার অসীম আধিপত্যের কথা যখন আলোচনা করি, তখন আমরা সত্য সত্যই স্তম্ভিত হইয়া যাই। ধর্ম্মক্ষেত্র এদেশে অনেক মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মত নিজ জীবদ্দশায় এদেশকে এরূপ বিশালভাবে অন্য কেহ আলোড়িত করিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না। অহিংসাকে মূল করিয়া দেশাত্মবোধকে জাগাইবার এরূপ প্রবল চেষ্টা মহাত্মা গান্ধীরই মৌলিক সাধনা। অনন্ত তাঁহার উদ্যম, অবিশ্রান্ত তাঁহার চেষ্টা, অঙ্গের ভূষণ তাঁহার দীনতা। তাঁহার ভাস্বর আদর্শ হইতে বিস্ফুলিঙ্গ লইয়া শত সহস্র ভাগ্যবান ব্যক্তি আপন আপন জীবনের দীপগুলি পরিপূর্ণভাবে জ্বালাইয়া লইয়াছেন, এবং অগণিত অত্যাচার সহ্য করিয়া মহাত্মার প্রদর্শিত পথে তাঁহারা যেরূপ বিপুল উদ্যমে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহাতে মহাত্মার ছয় বৎসরব্যাপী কারাবাসে এদেশের জাগরণ চেষ্টা কিছুমাত্র ম্লানভাব ধারণ করিবে না, ইহাই আমাদের ধারণা।

ওঁ পিতানোঽসি সম্বন্ধে—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র।

"ওঁ পিতানোঽসি"তে তুমি যে সুর বসিয়েছ, তা বেশ হয়েছে—ভাবের উপযোগী ও সহজ হয়েছে। আমরা এখন প্রতিদিন উপাসনার সময় "পিতানোঽসি" পাঠের পর আবার তোমার প্রদত্ত সুরে গান গাহিয়া থাকি।

শোক-সংবাদ।

৺পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি। বিগত ২৫ বৎসর ধরিয়া শিরোমণি মহাশয় আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুযায়ী যাবতীয় অনুষ্ঠানে তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাইতাম। কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন; মধ্যে মধ্যে বেদীর আসনও গ্রহণ করিতেন। তিনি উদারচেতা নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। মাসাধিক কাল ধরিয়া তিনি রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। ডবল নিউমোনিয়া রোগের পরিণামে গত ১০ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। শিরোমণি মহাশয়ের আত্মা কল্যাণ লাভ করুক ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যা ও জামাতাকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

৺ রায়বাহাদুর যোগেশচন্দ্র মিত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ভবানীপুরে যে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, যোগেশবাবু তাহার অন্যতম ছাত্র ছিলেন। সম্ভ্রান্তবংশে তাঁহার জন্ম। তিনি নিজ চেষ্টাতে মুনসেফী হইতে দায়রার জজ পদে উন্নীত হন। পরে অবসর লইয়া অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও ধর্ম্মচর্চ্চা বিস্মৃত হন নাই। দুই

বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে "ভক্তি" বিষয়ে স্বরচিত একটি উপাদেয় প্রস্তাব পাঠ করেন। অবকাশ পাইলেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগ দিতেন। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। বিগত ৬ই ফাল্গুন শনিবার রাত্রিতে হৃদ্‌রোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। পরম পিতা পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার শীতল ছায়ায় রক্ষা করুন।

৺কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত। প্রতিভাসম্পন্ন কবি জীবেন্দ্রনাথ দত্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। চট্টগ্রাম হইতে তাঁহার কবিত্বের ঝঙ্কার সমুদ্ভূত হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে আকৃষ্ট করিত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও তাঁহার কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি আশা দিয়াছিলেন যে, নিয়মিতভাবে কবিতাপ্রকাশে আমাদিগকে পত্রিকাপরিচালনে সহায়তা করিবেন। তাঁহার রচিত "তপোবন" "অঞ্জলি" ও "ধ্যানলোক" চিরদিন ধরিয়া তাঁহার স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবে। কোন কালেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আজীবন ধরিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে সত্য সত্যই আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। ঈশ্বর তাঁহার অমর আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৩০শে চৈত্র বৃহস্পতিবার বর্ষশেষ। প্রত্যেক জীবনের একটী বৎসর নিঃশেষিত হইবে। জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে। অতএব সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজ।

পরদিন ১লা বৈশাখ শুক্রবার নববর্ষ। এদিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ প্রত্যূষে ৬॥ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সূচীপত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বর্ত্তমান বৎসরের সূচীপত্র আগামী বৈশাখ সংখ্যায় সংযোজিত হইবে।